ফিকাহুস সুন্নাহ

১ম খন্ড

সাইয়্যেদ সাবেক

সাইয়্যেদ সাবেক

ফিক্‌হুস সুন্নাহ

১ম খণ্ড

সাইয়্যেদ সাবেক

ফিক্‌হুস সুন্নাহ

১ম খণ্ড

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে লেখা
ইসলামের বিধি-বিধান ও মাসায়েল

অনুবাদ
আকরাম ফারূক
আবদুস শহীদ নাসিম

সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

ফিক্‌হুস সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড
সাইয়্যেদ সাবেক

ISBN : 978-984-645-052-1
শ প্র : ৬৮

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেইলগেট, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৩১৭৪১০, মোবা: ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল: shotabdipro@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১০
তৃতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৫

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স, ঢাকা

মুদ্রণে
আনিকা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা

মূল্য: ৫০০.০০ টাকা মাত্র

FIQHUS SUNNAH By Sayyed Sabiq, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wirless Railgate, Dhaka-1217. Phone: 8317410, Mob: 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. 1st Edition: January 2010. 3rd print: October 2015.

Price Tk. 500.00 Only

আমাদের কথা

আমাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও প্রভু মহান আল্লাহ্‌ই সমস্ত প্রশংসার মালিক। আমাদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ সীমাহীন অবারিত। সালাত ও সালাম আমাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি।

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী আধুনিক কালের প্রখ্যাত ফকীহ্ ও শরিয়াহ্ বিশেষজ্ঞ আল উস্তায সাইয়্যেদ সাবেক প্রণীত ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ গ্রন্থখানি আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা শেষ করে বাংলাভাষী পাঠকগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করতে যাচ্ছে। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে ইনশাল্লাহ।

এ গ্রন্থটি ফিক্‌হ শাস্ত্রের এক অমর কীর্তি। শহীদ হাসানুল বান্নার অনুরোধ, উৎসাহ ও পরামর্শে আল উস্তায সাইয়্যেদ সাবেক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি আধুনিক বিশ্বে ইসলামের অনুসারী (practicing muslim) শিক্ষক ও ছাত্রদের গাইড বই।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইতিহাসে এ গ্রন্থটি একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। এ যাবত সাধারণত মাযহাব ভিত্তিক ফিক্‌হ গ্রন্থাবলি রচিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সেসব গ্রন্থ থেকে ভিন্ন এবং উজ্জ্বল। সংক্ষেপে এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

০১. এটি কোনো মাযহাব ভিত্তিক ফিক্‌হ গ্রন্থ নয়।

০২. এটি দলিল ভিত্তিক ফিক্‌হ গ্রন্থ।

০৩. শরয়ী বিধি বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট স্বব্যাখ্যাত আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

০৪. বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ত রসূলুল্লাহ সা.-এর সংশ্লিষ্ট সুন্নাহ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্ধৃত করা হয়েছে সে সংক্রান্ত হাদিস সমূহ।

০৫. সাহাবায়ে কিরামের আছার উল্লেখ করা হয়েছে।

০৬. ইজতিহাদ কিয়াস এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী মুজতাহিদগণের ব্যাখ্যা ও মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

০৭. পরবর্তীকালের মুজতাহিদ ফকিহ্‌গণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

০৮. বিভিন্ন মাযহাবের এবং মাযহাবের ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

০৯. যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও প্রাপ্ত হয়েছে, বিভিন্ন ইসলামী আদালতের রায় ও পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. কোথাও কোথাও অগ্রাধিকারযোগ্য মত ও পথের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় এই গ্রন্থখানা সাধারণ মুসলিম, আহলুল হাদিস, আহলুর রায় এবং বিভিন্ন মাযহাবের মুকাল্লিদ (অনুসারী)- সকলের অনুসরণযোগ্য এক অসাধারণ গ্রন্থ।

ইসলামী শরিয়তের বিশুদ্ধ ও সঠিক অনুসরণের জন্যে সকল শিক্ষিত মুসলিমেরই গ্রন্থখানা পাঠ করা প্রয়োজন এবং সকলের ঘরে ঘরে থাকা প্রয়োজন মনে করছি।

এ গ্রন্থের অনুবাদ এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি যদি কারো নযরে আসে, তাহলে প্রকাশকের ঠিকানায় লিখিতভাবে কিংবা ফোন করে জানালে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে নেয়া হবে ইনশাল্লাহ।

গ্রন্থখানি থেকে ইসলামের অনুসারিগণ উপকৃত হলেই সার্থক হবে আমাদের চিন্তা, পরিকল্পনা ও সার্বিক শ্রম। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

তারিখ : জানুয়ারি ১৯, ২০১০ ঈসায়ী

শহীদ ইমাম হাসান আল বান্নার ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। আর সালাত ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের ও সাহাবাদের প্রতি।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ، وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

অর্থ : মুমিনদের সকলের এক সাথে বের হওয়া জরুরি ছিলনা। কিন্তু কতোই না ভালো হতো যদি তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একটা দল অন্তত বেরিয়ে আসতো, তারা দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতো এবং ফিরে এসে নিজ নিজ কওমের মানুষকে সতর্ক করতো, যাতে তারা সতর্ক হয়। (সূরা ৯, আত্-তাওবা : আয়াত ১২২)

মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ইসলামের জ্ঞান ও দাওয়াতের প্রসার ঘটানো, সেই সাথে ইসলামী বিধিমালা বিশেষত, ফিকহী বিধিমালার প্রসার ঘটানো, যাতে করে সর্বস্তরের জনগণ তাদের ইবাদত ও আমল সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

"আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। শিক্ষার মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন করা যায়। নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) দুনিয়ায় টাকা কড়ি রেখে যাননি, তাঁরা রেখে গেছেন শুধু দীনের জ্ঞান। এই জ্ঞান যে অর্জন করবে তার তা প্রচুর পরিমাণেই অর্জন করা উচিত।"

ইসলামী ফিক্হ, বিশেষত ইবাদত সংক্রান্ত বিধিমালা এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য উপস্থাপিত সাধারণ ইসলামী বিষয়সমূহ অধ্যয়নের সবচেয়ে সরল, উপকারী, হৃদয়গ্রাহী ও মনমগজ আকৃষ্টকারী পদ্ধতি হলো, ফিকহ্কে নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় ও বিদ্যাগত পরিভাষা ও কল্পিত খুঁটিনাটি বিধিসমূহ থেকে মুক্ত রাখা। সেই সাথে ফিক্হকে যতোদূর সম্ভব সহজভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উৎসসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং যতোটা সুযোগ পাওয়া যায় ইসলামের যৌক্তিকতা ও কল্যাণময় দিকগুলো সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করা, যাতে করে ফিক্হ অধ্যয়নকারীগণ উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই অধ্যয়ন দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এবং এতে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। ইসলামের অধিকতর জ্ঞান অর্জনে এটা তাদের সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যোগাবে।

আল্লাহ তায়ালা বিশিষ্ট প্রবীণ আলেম আল উস্তায সাইয়্যেদ সাবিককে এই পথে পদচারণার প্রেরণা ও তৌফিক দান করেছেন। তাই তিনি উৎসের সহজ ও সাবলীল উল্লেখসহ বিপুল তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন এবং এতে অতীব সুন্দর পদ্ধতিতে ফিক্হী বিধিসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ চাহেন তো এর দ্বারা তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যেমন উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন, তেমনি ইসলামকে নিয়ে গর্ববোধকারী সারা বিশ্বের মুসলিম জনতাকেও করতে পারবেন অভিভূত। দীন ও উম্মতের প্রতি তাঁর এই সুমহান কীর্তি এবং দীনের দাওয়াতে তাঁর এই মূল্যবান অবদানের জন্য আল্লাহ তাঁকে যথোচিতভাবে পুরস্কৃত করুন, তাঁর দ্বারা মানুষকে উপকৃত করুন এবং তাঁর হাত দিয়ে তাঁর নিজের ও জনগণের কল্যাণ সাধন করুন। আমীন।

হাসান আল-বান্না

গ্রন্থকারের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মহাজগতের মালিক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। সালাত ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি, যিনি পূর্ব ও পরবর্তী প্রজন্মের সমগ্র মানব জাতির নেতা। আর তাঁর অনুসারী ও সাহাবিদের প্রতি এবং কেয়ামত পর্যন্ত যতো লোক তার আদর্শ অনুসরণ করবে তাদের সবার প্রতি ক্ষমা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ইসলামী ফিকহের বিধিমালা সম্বলিত। সেই সাথে এতে রয়েছে উক্ত বিধিমালার পক্ষে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত প্রমাণসমূহ, সহীহ হাদিসসমূহ এবং উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তসমূহ। সাথে সাথে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভংগিতে ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে মুসলমানদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ। সাধারণভাবে মতভেদ বর্ণনা থেকে বিরত থাকার নীতি অবলম্বন করা হলেও যেখানে সহজবোধ্য মনে হয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে গ্রন্থখানি সবার সামনে রসূলুল্লাহ সা. আনীত ইসলামী ফিক্হের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির পথ মানুষের সামনে উন্মুক্ত করেছে, মাযহাবী বিদ্বেষ ও কোন্দল নামক জঘন্য বিদ'আতকে পরিহার করেছে এবং ইজতিহাদ (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে চিন্তা গবেষণা)-এর দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে- এই উদ্ভট তত্ত্ব খণ্ডণ করেছে।

এই প্রচেষ্টা দ্বারা আমাদের দীনের খিদমত করা ও আমাদের ভাইদের সেবা ও উপকার করাই আমার উদ্দেশ্য। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেনো এ গ্রন্থ দ্বারা যথার্থভাবেই মানুষের উপকার ও কল্যাণ সাধন করেন এবং আমাদের এ কাজকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হিসেবে কবুল করেন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।

সাইয়্যেদ সাবেক
কায়রো, ১৫ শাবান, ১৩৬৫ হিজরী

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
	রোগীর আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব	৪০৮
	মৃত আসন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে যা করা মুস্তাহাব	৪০৯
	মৃত্যু পথযাত্রীর জন্য যা যা করা সুন্নত	৪০৯
৩.	মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে করণীয়	৪১২
	কোনো মুসলমানের মৃত্যুর সংবাদে যা করা মুস্তাহাব	৪১২
	মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনদেরকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানানো মুস্তাহাব	৪১৩
	মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা	৪১৪
	উচ্চ স্বরে বিলাপ করা	৪১৫
	মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালন	৪১৫
	মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার সরবরাহ করা মুস্তাহাব	৪১৫
	মৃত্যুর পূর্বে কাফন ও কবর প্রস্তুত রাখা বৈধ	৪১৬
	মক্কা বা মদিনায় মৃত্যু কামনা করা মুস্তাহাব	৪১৭
	আকস্মিক মৃত্যু	৪১৭
	যার সন্তান মারা যায়	৪১৭
	মুসলিম উম্মাহর জনগণের বয়স	৪১৭
	মৃত্যু এক ধরনের পরিত্রাণ	৪১৭
	মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন	৪১৮
	মৃত ব্যক্তির গোসল	৪১৮
	গোসলের নিয়ম	৪২০
	পানির অভাবে মৃত ব্যক্তিকে তাইয়াম্মুম করানো	৪২১
	স্বামী ও স্ত্রী কর্তৃক পরস্পরকে গোসল করানো	৪২২
	মহিলা কর্তৃক বালককে গোসল করানো	৪২২
৪.	জানাযা, দাফন কাফন ও কবর যিয়ারত	৪২২
	কাফন	৪২২
	মৃত ব্যক্তির জানাযা	৪২৫
	জানাযার নামাযের নিয়ম	৪২৯
	কফিন বহন ও শবযাত্রা	৪৩৭
৫.	জানাযা ও দাফন কাফনে যা যা মাকরূহ	৪৩৯
৬.	দাফন ও কবর খনন	৪৪৩
৭.	কবর প্রসঙ্গ	৪৪৬
	মৃতদের গালিগালাজ করা নিষিদ্ধ	৪৫৫
	কবরের কাছে কুরআন পাঠ	৪৫৬
	কবর দেয়ার পর পুনরায় খোড়া	৪৫৬
	কবর থেকে মৃতকে স্থানান্তর	৪৫৭
	শোক সন্তপ্তদের সান্ত্বনা দান	৪৫৮
৮.	কবর যিয়ারত	৪৬১
	মৃত ব্যক্তির জন্যে উপকারী আমলসমূহ	৪৬৪
৯.	কবরের প্রশ্ন	৪৬৭
১০.	রূহ কোথায় থাকে?	৪৭২
	রূহের চার জগৎ	৪৭৪

বিষয়		পৃষ্ঠা

মহান আল্লাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদার, মহৎ ও সর্বপ্রকারের বৈষম্যমুক্ত একত্ববাদী জীবন ব্যবস্থা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য পূর্ণাঙ্গ সর্বাত্মক বিধান বা শরীয়া দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই শরীয়া সমগ্র মানব জাতির জন্য অতীব সম্ভ্রান্ত ও সুসভ্য জীবনের নিশ্চয়তা দেয় এবং তাদের পূর্ণতা ও উন্নতি-উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করায়।

তিনি তেইশ বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। মানুষের নিকট আল্লাহর দীনকে পৌঁছে দেয়া ও তার উপর মানব জাতিকে প্রতিষ্ঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার যে সংকল্প তিনি নিয়ে এসেছিলেন, তা এই তেইশ বছরে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন।

১. মুহাম্মদ সা.-এর রিসালতের সার্বজনীনতা

মুহাম্মদ সা.-এর রিসালত কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যে, পূর্ববর্তী রিসালতগুলোর মতো তা কোনো বিশেষ প্রজন্মের জন্য বা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং অন্যান্য প্রজন্ম ও সম্প্রদায় তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। বরঞ্চ তার রিসালত সমগ্র মানব জাতির জন্য সর্বব্যাপী ও সার্বজনীন। মহান আল্লাহর রাজত্ব যেমন সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীতে বিরাজমান সব কিছুর উপর বিস্তৃত। তেমনি তাঁর শেষ রসূলের রিসালতও। তা কোনো বিশেষ শহর বা এলাকার মধ্যেও সীমিত নয়, কোনো বিশেষ যুগ বা কালের মধ্যেও নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ○:

"কল্যাণময় সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী গ্রন্থ নাযিল করেছেন, যাতে করে সে গোটা বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হয়।" (সূরা ২৫, আল-ফুরকান : আয়াত ১)

তিনি আরো বলেন :
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ○

"আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।" (সূরা ৩৪, আস-সাবা : আয়াত ২৮)

তিনি আরো বলেন :

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَانِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ○

"(হে মুহাম্মদ!) বলো : হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সকলের কাছে আল্লাহর রসূল, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। তিনি ব্যতিত আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর প্রেরিত সেই নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনো, যে স্বয়ং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। তোমরা তার অনুসরণ করো। আশা করা যায়, তোমরা হেদায়াত লাভ করবে।" (সূরা ৭, আল-আ'রাফ : আয়াত ১৫৮)

সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক নবী নিজ নিজ কওমের নিকট বিশেষভাবে প্রেরিত হতেন। আমি প্রেরিত হয়েছি সাদা কালো নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির নিকট।"

মুহাম্মদ সা. এর রিসালতের এই ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা নিম্নোক্ত তথ্যাবলী দ্বারা অধিকতর নিশ্চিত হয় :

১. তাঁর আনীত এই দীনে এমন কোনো জিনিস নেই, যা বিশ্বাস করা বা যা অনুসারে কাজ করা মানুষের পক্ষে কঠিন ও দুঃসাধ্য। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার অসাধ্য কোনো কাজের দায়িত্ব দেননা।" (সূরা ২, আল-বাকারা : আয়াত ২৮৬)

তিনি আরো বলেছেন : يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান; যা কষ্টকর তা চাননা।" (বাকারা : আয়াত ১৮৫)

তিনি আরো বলেছেন : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ .

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।" (সূরা ২, আল-হাজ্জ : আয়াত ৭৮)

সহীহ বুখারিতে আবু সাঈদ আল-মাকবারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

إِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ يُسْرًا، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ .

"এই দীন সহজ, যে ব্যক্তিই দীন পালন করার জন্য কঠোর পন্থা অবলম্বন করবে, সে সফল হবেনা।"

হীহ মুসলিমের একটি হাদিস নিম্নরূপ : اَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللّٰهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ .

"উদার তাওহীদবাদী দীনই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।"

২. ইসলামের যে সকল মূলনীতি স্থান ও কালের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়না, যেমন আকায়েদ ও ইবাদত, তা সর্বাত্মক বিস্তারিত বিবরণ সহকারে বিবৃত এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত আয়াত ও হাদিস দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে। তাই এগুলোতে সামান্যতম কম বা বেশি করার অধিকার কারো নেই। আর যেসব বিষয় স্থান ও কালের ব্যবধানে পরিবর্তত হয়, যেমন নাগরিক জীবনের কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি, রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়াদি- তা এসেছে সংক্ষিপ্ত আকারে। এর উদ্দেশ্য হলো, এ সকল মূলনীতি যেন সকল যুগে মানুষের কল্যাণ সাধনের সহায়ক হয় এবং শাসক, সমাজপতি ও নেতাগণ সত্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় তা দ্বারা পথনির্দেশ লাভ করতে পারে।

৩. মুহাম্মদ সা. এর রিসালতে তথা তাঁর আনীত ইসলামী বিধানে যা কিছু দিক নির্দেশনা এসেছে, তা দ্বারা কেবল ইসলামের সুরক্ষা, জীবনের সুরক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তির সুরক্ষা, প্রজাতির সুরক্ষা এবং সম্পদ ও সম্পত্তির সুরক্ষাই কাম্য। আর এটা যে মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি ও চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ, তার বুদ্ধি-বিবেকের অনুকূল, তার উন্নতি ও প্রগতির সহায়ক এবং সকল স্থান ও কালের উপযোগী, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ○ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ○

"বলো, কে নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহর সেসব সুন্দর বস্তু ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য উৎপন্ন করেছেন? তুমি বলো, যারা ঈমান এনেছে, এগুলো দুনিয়ার জীবনে, বিশেষত: কেয়ামতের দিন তাদের (ভোগের) জন্য। এভাবে আমি জ্ঞানীদের জন্য আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি। বলো, আমার প্রভু তো কেবল যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপাচার, অসংগত অবাধ্যতা, আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করা, যার কোনো প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জাননা।" (সূরা ৭, আল-আরাফ : আয়াত ৩২-৩৩)

মহামহিম আল্লাহ আরো বলেন :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

"আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আমি তা লিখে দেবো তাদের জন্য, যারা সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে, যারা অনুসরণ করে এই রসূলের যে নিরক্ষর নবী, যাকে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পায়। সে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। সে যাবতীয় পবিত্র বস্তু তাদের জন্য হালাল করে, অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং তাদের উপর যে গুরুভার ও শৃংখল ছিলো, তা তাদের উপর থেকে অপসারিত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং তার সাথে অবতীর্ণ আলোর অনুসরণ করেছে, তারাই প্রকৃত সফলকাম।" (আ'রাফ : ১৫৬-১৫৭)

২. মুহাম্মদ সা. এর রিসালতের উদ্দেশ্য

ইসলামের রিসালতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে জানা, চেনা ও তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে পবিত্র করা, মানবীয় সম্পর্কগুলোকে মজবুত করা এবং স্নেহ, ভালোবাসা, দয়া, সৌভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সুবিচারের ভিত্তির উপর সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। এসব কাজ দ্বারাই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ق وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের জন্যে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায় এবং তাদেরকে পবিত্র করে। আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিলো।" (সূরা ৬২, আল-জুম'য়া : আয়াত ২)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "আমি তোমাকে পুরো জগতবাসীর জন্য করুণারূপেই পাঠিয়েছি।" (সূরা ৬২, আল-আম্বিয়া : আয়াত ১০৭)

রসূল সা. বলেছেন : أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ "আমি উপহারস্বরূপ প্রদত্ত রহমত।"

৩. ইসলামী আইন প্রণয়ন বা ফিক্হ

ইসলামী রিসালতের আওতাভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইসলামী আইন প্রণয়ন। এটি ইসলামী রিসালতের তাত্ত্বিক দিক।

নিরেট দীনি আইনের একমাত্র উৎস হলো আল্লাহর অহি, যা কুরআন এবং সুন্নাহয় বিধৃত অথবা রসূল সা. এর সেই ইজতিহাদ অহি দ্বারা বহাল রাখতেন। এই অহি কুরআন ও সুন্নাহর আকারে সুরক্ষিত রয়েছে। নিরেট দীনি আইনের উদাহরণ হলো ইবাদতের বিধান বা আহ্কাম। এ ক্ষেত্রে রসূলের দায়িত্ব আল্লাহর অহিকে হুবহু ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার চেয়ে বেশি নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰىo إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰىo

"সে নিজের মনগড়া কথা বলেনা, যা বলে তা প্রেরিত অহি ছাড়া আর কিছু নয়।" (সূরা ৫৩, আন নাজম : আয়াত ৩-৪)

তবে যে সকল ইসলামী আইন পার্থিব বিষয়াদি যথা বিচার, রাজনীতি ও সমরনীতির সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর ব্যাপারে পরামর্শ করতে রসূল সা. কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি কখনো কখনো একটি মত পোষণ করতেন, আবার পরক্ষণেই তা থেকে সরে এসে তাঁর সাহাবিদের মতামত গ্রহণ করতেন। যেমন বদর ও ওহুদের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে। অথচ সাধারণভাবে সাহাবিগণ রা. সেসব ব্যাপারে তাঁরই শরণাপন্ন হতেন, যা তাঁরা জানতেন না। তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন। কুরআন ও হাদিসের যেসব অর্থ তাদের কাছে অজানা থাকতো, তা তাঁর কাছে জানতে চাইতেন, নিজেরা তার যে অর্থ বুঝতেন, তা তাঁর কাছে পেশ করতেন। তিনি কখনো তাদের বুঝকে বহাল রাখতেন। আবার কখনো তাদের বুঝের যেখানে ভুল হয়েছে, তা ধরিয়ে ও শুধরে দিতেন।

ইসলাম কিছু সাধারণ মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার আলোকে মুসলমানরা চলতে পারে। সেগুলো হলো :

১. যে ঘটনা বা সমস্যা এখনো সংঘটিত হয়নি, সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তার সমাধান অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ج وَإِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ط عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌo

"হে মুমিনগণ! সেসব জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করোনা, যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যখন কুরআন নাযিল করা হয়, তখন যদি এরকম জিজ্ঞাসা করো, তাহলে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।" (সূরা ৫, আল-মাইদা : আয়াত ১০১)

হাদিসে আছে : "রসূলুল্লাহ সা. যেসব সমস্যা বাস্তবে এখনো দেখা দেয়নি, তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন।"

২. অধিক মাত্রায় প্রশ্ন করা এবং জটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে বিরত থাকা :

রসূল সা. বলেছেন : "আল্লাহ তোমাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন কথা বলা, মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্ন করা এবং অর্থ সম্পদ অপচয় করা অপছন্দ করেছেন।"

তিনি আরো বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا، وَعَنْهُ أَيْضًا : أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْهُ شَيْئٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

"আল্লাহ কিছু সংখ্যক কাজকে ফরয করেছেন, সেগুলোকে তোমরা অবহেলা করোনা। কিছু সংখ্যক সীমা নির্ধারণ করেছেন, তা লংঘন করোনা। কিছু সংখ্যক জিনিসকে হারাম করেছেন, তা অমান্য করোনা। আর কিছু সংখ্যক জিনিস সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বন করেছেন তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে, ভুলে গিয়ে নয়। কাজেই সেগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়োনা।"

রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন : সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় অপরাধী, যে নিষিদ্ধ ছিলনা- এমন জিনিস নিয়ে প্রশ্ন করলো। আর তার প্রশ্ন করার কারণে তা নিষিদ্ধ হলো।"

৩. দীন নিয়ে মতবিরোধ ও দলাদলি থেকে দূরে থাকা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : . وَأَنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً "এটি তোমাদেরই উম্মাহ, একটি মাত্র উম্মাহ।" (সূরা ২৩, আল মুমিনুন : আয়াত ৫২)

আল্লাহ আরো বলেছেন : وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا "তোমরা সকলে এক সাথে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং দলে দলে বিভক্ত হয়োনা।" (সূরা-৩, আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩)

আল্লাহ আরো বলেন : وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ "পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা, তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমাদের উদ্যম ও প্রভাব নষ্ট হবে।" (সূরা ৮, আল আনফাল : আয়াত ৪৬)

আল্লাহ আরো বলেছেন : إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ

"যারা তাদের দীনকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।" (সূরা ৬, আল-আনয়াম : আয়াত ১৫৯)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ○

"তোমরা তাদের মতো হয়োনা, যারা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ তাদের নিকট আসার পরও তারা কলহ-কোন্দলে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব।" (সূরা ৩, আলে ইমরান : আয়াত ১০৫)

৪. বিতর্কিত বিষয়সমূহ কুরআন ও সুন্নাহর নিকট সোপর্দ করা : এ কাজ আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীসমূহের আলোকে সম্পন্ন করতে হবে

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

"যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়, তাহলে সেটিকে আল্লাহ এবং এই রসূলের নিকট সোপর্দ করো।" (সূরা ৪, আন নিসা : আয়াত ৫৯)

- وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ "যে জিনিসেই তোমরা মতভেদে লিপ্ত হবে, তার ফায়সালা আল্লাহর প্রতি অর্পিত হবে।" (সূরা ৪২, আশশূরা : আয়াত ১০)

এর কারণ হলো, আল্লাহর কিতাব দীনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ .

"আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সকল বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত।" (সূরা ১৬, আন নাহল : আয়াত ৮৯)

আল্লাহ আরো বলেছেন : مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি কোনো বিষয়ই আল কিতাবে লিখতে বাদ রাখিনি। (সূরা-৬, আল আনয়াম : আয়াত ৩৮)

শুধু কুরআন নয়, রসূলের বাস্তব সুন্নাহর মাধ্যমেও তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন :

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ .

"আমি তোমার প্রতি স্মারক অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে তুমি মানুষকে তাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দাও।" (সূরা ১৬, আন নাহল : আয়াত ৪৪)

আল্লাহ আরো বলেছেন : اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰىكَ اللّٰهُ.

"আমি তোমার প্রতি সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেছি। যাতে করে আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন, তদনুসারে মানুষের মাঝে ফায়সালা করো।" (সূরা ৪, আন নিসা : আয়াত ১০৫)

বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে সকল বিবাদের মীমাংসা করার জন্যই আদেশ দেয়া হয়েছে এবং যাবতীয় পথনির্দেশনা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা ৫, আল মাইদা : আয়াত ৩)

যতোদিন পর্যন্ত দীনের বিধিবিধান এই নিয়মে বিশ্লেষিত হতে থাকবে এবং বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্য এর মূল উৎসের নিকট প্রত্যাবর্তন যে অপরিহার্য, তা যতোদিন সকলের নিকট সুবিদিত থাকবে, ততোদিন এই দীনে মতভেদের কোনো সুযোগও নেই, অর্থও নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ .

"যারা কিতাবে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। তারা সুদূর প্রসারী দ্বন্দ্ব-কলহে নিপতিত।" (সূরা ২, আল বাকারা : আয়াত ১৭৬)

আল্লাহ আরো বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○

"তোমার প্রভুর শপথ, তারা যতোদিন পর্যন্ত তাদের বিবাদ বিসম্বাদে তোমাকে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী না মানবে, অতপর তুমি যে নিষ্পত্তি করে দিয়েছ তা মেনে নিতে অন্তরে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবেনা এবং পরিপূর্ণরূপে প্রশান্ত চিত্তে তা মেনে নেবে, ততোদিন পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবেনা।" (সূরা ৪, আননিসা : আয়াত ৬৫)

এই নীতিমালার আলোকেই সাহাবিগণ ও তাদের পরবর্তী কল্যাণময় শতাব্দীসমূহের মুসলমানগণ জীবন অতিবাহিত করেছেন। মুষ্টিমেয় কতোক মাসআলা ব্যতিত কোনো

ব্যাপারেই তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়নি। যে কয়টি বিষয়ে মতভেদ হয়েছে, তার কারণ ছিলো, কুরআন ও সুন্নাহর সংশ্লিষ্ট ভাষ্যসমূহের তাৎপর্য অনুধাবনে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট ভাষ্যসমূহের কোনো কোনোটি তাদের কারো কারো জানা ছিলো, কারো বা জানা ছিলনা।

তারপর যখন চার মাযহাবের ইমামদের আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তীদের রীতি অনুসরণ করেন। তবে তাঁদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী রসূলের সুন্নাহর অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। যেমন হিজাযবাসীগণ, যাদের মধ্যে রসূলের সুন্নাহ ও সাহাবিদের আছার (উক্তি) বহনকারীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিলো। অপর গোষ্ঠী নিজেদের বিচারবুদ্ধির অধিকতর কাজে লাগিয়েছেন, যেমন ইরাকবাসীদের মধ্যে হাদিসের হাফেযের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিলো। অহি নাযিলের স্থান থেকে তাঁদের আবাসভূমির দূরত্বই ছিলো এর কারণ।

এই ইমামগণ জনগণকে ইসলামের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে ও ইসলামের পথে পরিচালিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁরা জনগণকে তাদের অন্ধ অনুকরণ করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন : আমাদের মতের সপক্ষে আমরা যে প্রমাণ দর্শাই তা না জেনে আমাদের মত গ্রহণ করা ও তদনুসারে বক্তব্য প্রদান করা কারো জন্য বৈধ নয়। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, সহীহ হাদিসই তাঁদের মাযহাব। পাপমুক্ত ও ভুলত্রুটিমুক্ত রসূলের ন্যায় তাদেরকেও চোখ বুঝে অনুসরণ করা হোক- এটা তারা চাইতেননা। মানুষকে আল্লাহর হুকুম বুঝতে সাহায্য করাই ছিলো তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষের মনোবল নিস্তেজ ও সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ায় তাদের মধ্যে অন্ধ অনুকরণের প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফলে তাদের প্রতিটি গোষ্ঠী একটা নির্দিষ্ট মাযহাব নিয়ে সন্তুষ্ট হয়। সেই মাযহাবের মধ্যেই তাদের চিন্তা গবেষণা ও ধ্যান জ্ঞান সীমিত হয়ে পড়ে। তার উপরই তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তার গোঁড়া সমর্থকে পরিণত হয়। তার সমর্থন ও সহায়তায় সর্বশক্তি তারা নিয়োগ করে। নিজেদের ইমামের উক্তিকে আল্লাহ ও রসূলের উক্তির সমান মর্যাদা দেয়। তাদের ইমামের মতের বিপরীতে কোনো ফতোয়া দেয়াও এই গোষ্ঠীর কোনো আলেম বৈধ মনে করেনা। নিজ নিজ মাযহাবের ইমামের প্রতি অন্ধ ভক্তির মাত্রা এতোদূর বেড়ে যায় যে, কারখী বলেন : "আমাদের ইমামদের মতের বিরুদ্ধে যায় এমন আয়াত বা হাদিস মাত্রই হয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নচেত রহিত।"

মাযহাবের অন্ধ অনুকরণ ও গোঁড়া পক্ষপাতিত্বের দরুন মুসলমানদের কিছু কিছু গোষ্ঠী কুরআন ও সুন্নাহর হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হতে আরম্ভ করে। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে- এই মর্মে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। ফকীহরা যা বলেন, তাই হয়ে দাঁড়ায় শরিয়ত। ফকীহদের বক্তব্য ও মতামতের মধ্যেই শরীয়া সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফকীহদের মত থেকে যে-ই ভিন্ন মত অবলম্বন করে তাকে বিদ'আতী আখ্যায়িত করা হয়। তার মত অগ্রহণযোগ্য ও তার ফতোয়া অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয়।

এই সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির ব্যাপকতর প্রসারে যে জিনিসটি সহায়কের ভূমিকা পালন করে তা ছিলো শাসক ও ধনিক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহ এবং সেই সব মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয়কে নির্দিষ্ট একটি মাযহাব বা মাযহাবের শিক্ষা দানে সীমিত রাখা। একাজ ঐসব মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও ইজতিহাদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার মোক্ষম কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যাতে করে তাদের জন্য যে জীবিকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা বহাল থাকে। কথিত আছে, আবু যারয়া তার উস্তাদ বালকিনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আচ্ছা বলুন তো, শেখ

তাকিউদ্দীন সাবকীর ইজতিহাদ থেকে বিরত থাকার হেতু কী? ইজতিহাদের যাবতীয় যোগ্যতা ও উপকরণ তো তাঁর করায়ত্ব! বালকিনী চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর আবু যারয়া বললেন : "আমার তো মনে হয়, এ থকে বিরত থাকার একমাত্র কারণ হলো সেই সকল চাকুরি, যা চার মাযহাবের ফকীহদের জন্য বরাদ্দ হয়ে আছে। যারা এই চার মাযহাবের বাইরে যাবে, তারা কোনো চাকুরিই পাবেনা। তাদের কেউ যেমন কাযী হতে পারবেনা, তেমনি জনগণও তাদের ফতোয়া গ্রহণ করবেনা, বরং তাদেরকে বিদ'আতী বলে আখ্যায়িত করা হবে।" একথা শুনে বালকিনী মুচকি হাসলেন এবং তাকে সমর্থন করলেন।

এহেন তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণের জটাজালে আবদ্ধ হয়ে, কুরআন ও সুন্নাহর হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা মেনে নিয়ে মুসলিম উম্মাহ ঘোরতর বিপাক ও বিপর্যয়ে পতিত হয়েছে এবং সেই গুঁইসাপের গর্তে ঢুকেছে, যা থেকে রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন।

এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, মুসলিম উম্মাহ নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি হানাফী মাযহাবের মেয়ের সাথে শাফেয়ী মাযহাবের ছেলের বিয়ে জায়েয হবে কিনা তা নিয়ে পর্যন্ত কেউ কেউ মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : এ ধরনের বিয়ে জায়েয হবেনা। কারণ হানাফীরা শাফেয়ীদের ঈমান নিয়েই সন্দেহ পোষণ করে। অন্যেরা বলেন : বৈধ। কারণ কোনো ইহুদী খৃস্টান নারীর সাথে যখন বিয়ে বৈধ, তখন এদের সাথেও বৈধ হবে।[১] এর ফলে বিদ'আতেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, ইসলামের চিরন্তন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তিক চেষ্টা সাধনা স্তব্ধ হয়ে যেতে বসেছে, চিন্তা গবেষণামূলক তৎপরতা স্থবির হয়ে যাচ্ছে এবং জ্ঞানগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর এসব উপসর্গ মিলিত হয়ে মুসলিম জাতির স্বকীয়তাকে দুর্বল ও নিস্তেজ করে দিয়েছে, তাকে তার উৎপাদনশীল জীবন থেকে বঞ্চিত করেছে। তার উন্নতি ও অগ্রগতি থামিয়ে দিয়েছে। আর এই সুযোগে তার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশকারী শত্রুরা ফাঁক ফোকর দিয়ে ইসলামের মূল অস্তিত্বে ঢুকে পড়েছে।

এভাবে বহু বছর কেটে গেছে। বহু শতাব্দী পার হয়ে গেছে। আল্লাহর চিরন্তন রীতি হলো, তিনি কিছুকাল পরপরই এই উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিগণকে পাঠান, যারা তাদের দীনকে নতুন করে উপস্থাপন করেন, উম্মাহকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। তাকে সত্য ও ন্যায়ের পথের দিশা দেখান। তবে এ উম্মাহ তার পূর্ববর্তী শোচনীয় অবস্থা বা তার চেয়েও কঠিন অবস্থায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুম থেকে যেনো জাগতেই চাইছেনা।

অবশেষে এসেছে ইসলামী আইন প্রণয়নের পালা, যা দ্বারা আল্লাহ সমগ্র মানব জাতির জীবনকে সুশৃংখল ও সংগঠিত করেছেন। একে তাদের ইহকাল ও পরকালের অবলম্বন বানিয়েছেন। অথচ এই আইন প্রণয়নের কাজকে এতো নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে, যার কোনো নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়না। একে এক গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। একে নিয়ে চিন্তা গবেষণা ও চেষ্টা সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা মনমগজবিনাশী ও সময় অপচয়কারী কাজ, যা আল্লাহর দীনেরও কোনো কল্যাণ সাধন করেনা, মানুষের পার্থিব জীবনকে সুশৃংখল করতেও কোনো অবদান রাখেনা।

এখানে উদাহরণস্বরূপ শেষ যুগের জনৈক ফকীহর লিখিত ফিকহ গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি : "ইবনে আরাফা 'ইজারা' (ভাড়া দেয়া) এর সংজ্ঞা দিয়েছেন : নৌকা ও প্রাণী ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির উপকারিতা বিক্রয় করা, যার মধ্য থেকে উৎপন্ন কোনো বিনিময় দ্বারা তাকে

১. কারণ আল্লাহ চাহেন তো আমি মুমিন এ কথা বলা শাফেয়ীদের মতে বৈধ।

উপলব্ধি করা যায় না, যাকে খণ্ড বিখণ্ড করলে তার অংশ বের হয়।" এ সংজ্ঞা শুনে তাঁর, জনৈক ছাত্র আপত্তি জানালো যে, এর 'অংশ' শব্দটি সংজ্ঞাকে সংক্ষেপিত করার পরিপন্থী। এটি উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। উক্ত ফকীহ দুইদিন কোনো জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকলেন। তারপর এমন জবাব দিলেন যা একেবারেই নিরর্থক।"

বস্তুত: ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজ এতোটাই নিম্নস্তরে উপনীত হয়েছিল। আলেমগণ কিতাবের মূল ভাষা ব্যতীত অন্য কিছুকে গুরুত্ব দিতেননা। বড়জোর তার টিকা, টিকাতে যে সকল তথ্য আপত্তি ও হেঁয়ালি থাকে এবং তা নিয়ে যেসব আলোচনা লেখা হয়, সেগুলো তারা পড়তো। এহেন পরিস্থিতিতেই শেষ পর্যন্ত একদিন ইউরোপ প্রাচ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার আগ্রাসী থাবা দিয়ে সব কিছু তছনছ ও পা দিয়ে মাড়িয়ে সব কিছু ধুলিস্মাত করে দিলো। আগ্রাসনের আঘাতে আঘাতে একদিন যখন প্রাচ্যবাসীর ঘুম ভাঙলো এবং ডানে বামে তাকালো, তখন দেখলো, দ্রুত ধাবমান বিশ্ববাসীর জীবন থেকে তারা অনেক পিছিয়ে আছে। সভ্যতার চলমান কাফেলা সামনে এগিয়ে চলেছে। আর তারা বসে আছে নির্বিকারভাবে। দেখলো, তারা এক নতুন বিশ্বের মুখোমুখি, যে বিশ্ব জীবনের জয়গানে মুখর, যে বিশ্ব শক্তি ও উৎপাদনশীলতায় অপ্রতিহত গতিতে আগুয়ান। সে দৃশ্য দেখে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। তন্মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী যারা নিজেদের ইতিহাস ভুলে গেছে। নিজেদের পূর্ব পুরুষদের অবাধ্য সন্তানে পরিণত হয়েছে এবং নিজের দীন ও ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে গেছে, তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো : ওহে প্রাচ্যবাসী। এই দেখ ইউরোপ কত উন্নতি সাধন করেছে! এসো, তার পদাংক অনুসরণ করো। তারা ইউরোপকে নির্দ্বিধায় ও চোখ বুজে অনুকরণ করা শুরু করলো, চাই তা ঈমানের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক কিংবা কুফরী হোক। ভালো হোক কি মন্দ হোক। আর যারা আকণ্ঠ জড়তা ও গোঁড়ামীতে নিমজ্জিত ছিলো তারা গ্রহণ করলো নেতিবাচক অবস্থান। ঘন ঘন "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" ও "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়া, নিজেদের জীবন ধারাকে সামাল দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়া এবং ঘরের কোনে গিয়ে বসা- এই হয়ে দাঁড়ালো তাদের কর্মপন্থা। আর এ কর্মপন্থা ইসলামের অহংকারী শত্রুদের নিকট আরো একটা প্রমাণ তুলে ধরলো- ইসলামী শরিয়ত উন্নতি ও প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনা এবং যুগোপযোগী নয়। তারপর যে পরিণাম অনিবার্য ছিলো, তাই হলো। আগ্রাসী বিদেশী আইনই প্রাচ্যবাসীর জীবনে কর্তৃত্বশীল ও নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ালো। অথচ তা ছিলো প্রাচ্যবাসীর ধর্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমনকি ইউরোপীয় রীতিনীতি ও জীবনাচার পরিবারে, রাস্তাঘাটে, সভা সমিতিতে, স্কুল কলেজে ও শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলোতে পর্যন্ত আগ্রাসন চালাতে লাগলো। শুধু তাই নয়, ইউরোপের সাংস্কৃতিক জোয়ার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জোরদার ও পরাক্রান্ত হয়ে উঠতে লাগলো। আর এর পরিণামে প্রাচ্য তার ধর্ম ও ঐতিহ্যকে ভুলে যাওয়ার উপক্রম করলো। তার অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যেতে বসলো। তবে আল্লাহর একটা চিরন্তন নিয়ম হলো, পৃথিবী তাঁর দীন প্রতিষ্ঠাকারী লোক থেকে শূন্য থাকেনা। তাই সংস্কারের আহ্বায়করা তৎপর হয়ে উঠলো। তারা পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রতারিতদের হুঁশিয়ার করতে লাগলো : সাবধান হয়ে যাও! পাশ্চাত্য সভ্যতার পক্ষে প্রচারণা থেকে নিবৃত্ত হও। কারণ পাশ্চাত্যবাসীর নৈতিক অধোপতন তাদেরকে চরম শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন না করে ছাড়বেনা। বিশুদ্ধ ঈমান দ্বারা তারা যদি তাদের স্বভাবকে সংশোধন না করে এবং নৈতিক চরিত্রের উচ্চতম ও উৎকৃষ্টতম আদর্শের অনুকরণে তারা যদি তাদের চরিত্রকে না বদলায়, তাহলে অচিরেই তাদের বিজ্ঞান সর্বনাশা হাতিয়ারে পরিণত হবে, যা তাদের মনোরম নগরীগুলো এমন অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করবে, যা তাদেরকে গ্রাস করবে এবং

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন : "তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক তাদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তারা ছিলো ইরাম গোত্রভুক্ত, সুউচ্চ স্তম্ভের মতো দেহধারী, যাদের মতো আর কোনো মানুষ দেশগুলোতে সৃষ্ট করা হয়নি। আর ছামুদের সাথেই বা কেমন ব্যবহার করা হয়েছিল, যারা পাহাড়ের উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহনির্মাণ করেছিল, আর ফেরাউনের সাথেই বা কেমন আচরণ করা হয়েছিল, যে ছিলো বহু শিবিরের অধিপতি, যারা দেশে সীমা লংঘন করেছিল এবং সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। তাই তোমার প্রভু তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। তোমার প্রভু ওঁৎ পেতে আছেন।" (সূরা ৮৯, আল ফজর : আয়াত ৬-১৪)

সংস্কারের আহ্বায়করা ঘরকুনো নিশ্চল লোকদের চিৎকার করে বলতে লাগলো : তোমরা নির্ভুল জ্ঞানের উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো, এই উৎস দু'টি থেকে তোমাদের দীনকে খুঁজে নাও, আর এ দ্বারা অন্যদেরকেও সুসংবাদ দাও। তাহলে এই উদভ্রান্ত বিশ্ব তোমাদের সাহায্যে সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে এই নির্যাতিত পৃথিবী। আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○

"আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ- তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করে।" (আল-আহযাব : আয়াত ২১)

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী, কিছু সংখ্যক পুণ্যবান ও মহৎ লোক এই ডাকে সাড়া দিয়েছে। তারা একাগ্র চিত্তে এ দাওয়াতকে গ্রহণ করেছে। এ দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে এমন একদল যুবক ও তরুণ, যারা তাদের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ ও জীবন এই দাওয়াতের কাজে নিয়োগ করেছে।

এই মহতী উদ্যোগ জনমনে কৌতূহল ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আশা ও উদ্দীপনার আতিশয্যে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে : এবার কি তাহলে আল্লাহ পৃথিবীকে তাঁর আলোতে নতুন করে প্রজ্জ্বলিত হবার অনুমতি দিলেন? তিনি কি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, এখন মানুষ ঈমান ইহসান, সুবিচার ও সৌভ্রাতৃত্বে উদ্দীপিত পবিত্র ও নির্মল জীবন যাপন করুক? নিম্নের আয়াত দু'টি এই বিষয়েই তো সাক্ষ্য দিচ্ছে :

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে তাকে অন্য সকল মত ও পথের উপর বিজয়ী করে দেন, আর আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।" (সূরা ৪৮, আল ফাত্হ, : আয়াত ২৮)

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

"আমি অচিরেই তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেব দিগন্ত জুড়ে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যাতে করে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এ কুরআন সত্য। তোমার রব সর্ববিষয়ে সাক্ষী- এটা কি যথেষ্ট নয়?" (সূরা ৪১, হামীম সাজদাহ : আয়াত ৫৩)

❖❖❖

প্রথম অধ্যায়

তহারাত (পবিত্রতা অর্জন)

১. পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ব্যবহার এবং পানির প্রকারভেদ

প্রথম প্রকার : সাধারণ পানি

সাধারণ পানির বিধি হলো, এ পানি পবিত্র এবং পবিত্র করে। নিম্নলিখিত পানিগুলো সাধারণ পানির পর্যায়ভুক্ত :

১. বৃষ্টির পানি, বরফগলা পানি ও তুষারের পানি : কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ .

"তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করেন।" (সূরা ৮, আনফাল : আয়াত ১১)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

"আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি।" (সূরা-২৫, আল ফুরকান : আয়াত ৪৮)

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযে তাকবীর বলতেন, কিরাতের পূর্বে সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি একদিন বললাম : হে রসূলুল্লাহ! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। তাকবীর ও কিরাতের মাঝে আপনার যে নীরবতা, এর কারণ কী? আপনি এ সময়ে কী বলেন ? রসূল সা. বললেন : আমি বলি :

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

"হে আল্লাহ! পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে আপনি যতো দূরত্ব সৃষ্টি করছেন, আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে ততোটা দূরত্ব সৃষ্টি করুন। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহগুলো থেকে সেভাবে পরিষ্কার করুন, যেভাবে কাপড়কে পরিষ্কার করা হয় ময়লা থেকে। হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, পানি ও তুষার দিয়ে আমার গুনাহগুলো থেকে ধুয়ে মুছে মাফ করে দিন।" -তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত।

২. সমুদ্রের পানি : আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, হে রসূলুল্লাহ! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করে থাকি। সে সময় আমাদের সাথে অল্প পানি থাকে। তা দিয়ে যদি অযু করি তাহলে পিপাসায় কষ্ট পেতে হয়। সুতরাং আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে অযু করতে পারি? রসূলুল্লাহ সা. বলেলেন : সমুদ্রের পানি পবিত্রতা দানকারী [১] আর সমুদ্রের মৃত প্রাণী (মাছ) হালাল।" পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযি বলেছেন : 'এ হাদিস সহীহ ও উত্তম। আমি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারিকে জিজ্ঞাসা করলাম এ হাদিস কেমন? তিনি বললেন : সহীহ।'

১. রসূলুল্লাহ সা. প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ' বলেননি। কারণ তিনি বিধির সাথে সাথে তার যুক্তি উল্লেখ করতে চেয়েছেন। সেটি হচ্ছে পানির পবিত্রতা দানের বৈশিষ্ট্য। সেই সাথে তিনি আরো একটি বিধি জানিয়ে দিলেন, যা জিজ্ঞেস করা হয়নি। সেটি হলো, পানি মধ্যের মৃত প্রাণী হালাল। এভাবে তার জবাবটি তথ্যগত দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করলো এবং জিজ্ঞেস করা হয়নি- এমন একটি বর্ধিত বিধিও জানিয়ে দেয়া হলো। বিধিটির যখন প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন এটি কাজে লাগবে। এটি ফতোয়ার একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য।

৩. যমযমের পানি : আলী রা. বর্ণনা করেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. এক বালতি যমযমের পানি আনার আদেশ দিলেন। অতপর সে পানি থেকে কিছুটা পান করলেন এবং বাকীটুকু দ্বারা অযু করলেন।" (মুসনাদে আহমদ)

৪. রং পরিবর্তিত পানি : দীর্ঘ দিন আবদ্ধ থাকার কারণে, চৌবাচ্চা বা পাত্রে থাকার কারণে কিংবা শ্যাওলা ও গাছের পাতা ইত্যাকার যেসকল বস্তু, পানির সাথে প্রায়শ যুক্ত হয়, তার মিশ্রণের কারণে যে পানি পরিবর্তন হয়ে যায়, আলেমগণ এ ধরনের পানিকেও সাধারণ পানি মনে করেন।

এ পর্যায়ে মূলনীতি হলো, যে পানিকে সাধারণ পানিরূপে গণ্য করা হয় এবং কোনো বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়না, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا .

"যদি পানি না পাও সেক্ষেত্রে তাইয়াম্মুম করে।" (সূরা ৫, মায়েদা : আয়াত ৬)

দ্বিতীয় প্রকার : ব্যবহৃত পানি

এটি অযুকারী ও গোসলকারীর অংগ প্রত্যংগ থেকে ঝরে পড়া পানি। এর বিধি হলো, সাধারণ পানির মতোই এটি পবিত্রতাদানকারী। মূল পানি যেমন পবিত্রকারী, এটিও অবিকল তেমনি পবিত্রকারী। উভয়টিই সমান। এটিকে পবিত্রকারী পানি থেকে ব্যতিক্রমী সাব্যস্ত করার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া, রুবাই' বিনতে মুয়াওয়ায বর্ণিত হাদিস থেকেও এটি প্রমাণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সা. এর অযুর বিবরণ দিয়ে বলেছেন : "আর তিনি তাঁর অযুর যে পানি হাতে লেগে ছিলো তা দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন।" -আহমদ ও আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।

আবু দাউদ বর্ণিত বক্তব্য এরূপ : "রসূলুল্লাহ সা. তাঁর হাতে লেগে থাকা অবশিষ্ট পানি দিয়ে তাঁর মাথা মাসেহ করলেন।"

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. এর সাথে মদিনার এক রাস্তায় তার সাক্ষাত হলো। আবু হুরায়রা তখন বীর্যপাতজনিত কারণে অপবিত্র তথা 'জুনুবি'। তাই তিনি রসূল সা. এর সামনে থেকে চলে গেলেন, গোসল করলেন এবং তারপর ফিরে এলেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বললেন : আমি অপবিত্র ছিলাম। অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে একত্রে বসা আমি পছন্দ করিনি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : সুবহানাল্লাহ, মুমিন কখনো অপবিত্র হয়না। -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

এ হাদিস থেকে ব্যবহৃত পানি যে পবিত্রকারী তা প্রমাণিত হয়। কোনো মুমিন যখন নাপাক হয়না, তখন নিছক তার দেহের স্পর্শে আসার কারণেই পানি তার পবিত্রকারী বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে-এর কোনো কারণ নেই। এই স্পর্শে বড়জোর এক পবিত্র জিনিস আরেক পবিত্র জিনিসের সাথে মিলিত হয়। তাতে কোনোই ক্ষতি হয়না। ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলী, ইবনে উমর, আবি উমামা, আতা, হাসান, মাকহুল ও নাখ্‌য়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাথা মাসেহ করতে ভুলে গেছে। তারপর দেখতে পেলো, তার দাড়ি ভিজা, ঐ দাড়ির পানি দিয়ে মাথা মাসেহ করা তার জন্য যথেষ্ট হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা ব্যবহৃত পানিকে পবিত্রকারী মনে করেন। আমিও এই মতই পোষণ করি। এটি ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব- এই মর্মে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে হাযম বলেছেন, এটি সুফীয়ান ছাওরী, আবু ছাওর ও সকল যাহেরি উলামার অভিমত।

তৃতীয় প্রকার : যে পানির সাথে কোনো পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়, যেমন সাবান, যাফরান ও আটা প্রভৃতি এবং যে পানি এসব থেকে প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হয়না

এর বিধি হলো, যতোক্ষণ তা সাধারণ পানি পদবাচ্য থাকে ততোক্ষণ তা পবিত্রকারী থাকবে। কিন্তু যদি সাধারণ পানি পদবাচ্য না থাকে তাহলে তার বিধি এই যে, তা নিজে পবিত্র কিন্তু অপরকে পবিত্র করবেনা। উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : "রসূল সা. তাঁর মেয়ে যয়নবের মৃত্যুর পর আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন : তোমরা ওকে তিনবার গোসল করাও, অথবা পাঁচবার অথবা আরো বেশিবার। তোমরা যদি ভালো মনে করো, বরইর পাতা ও পানি দিয়ে গোসল করাও। অতপর শেষবারের গোসলে কর্পুর অথবা কর্পুর থেকে তৈরি কোনো দ্রব্য ব্যবহার করো। যখন গোসল শেষ হবে তখন আমাকে ডাকবে। গোসল শেষে তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর লুঙ্গী আমাদের দিলেন এবং বললেন, এটি দিয়ে ওকে আবৃত করে দাও।" হাদিসটি সহীহ্ হাদিস গ্রন্থগুলোর সব কটিতেই বর্ণিত হয়েছে।

আর মৃত ব্যক্তিকে একমাত্র সেই পানি দিয়েই গোসল করনো জায়েয, যা দিয়ে জীবিত ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন জায়েয।

আর আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে খুযায়মা উম্মে হানীর হাদিস বর্ণনা করেন : রসূল সা. ও তাঁর স্ত্রী মাইমুনা রা. একই পাত্র থেকে গোসল করেছেন। সেটি ছিলো তাঁর স্ত্রী খাদ্যদ্রব্য রাখার এমন একটি পাত্র, যাতে আটার চিহ্ন ছিলো।

দেখা যাচ্ছে, উভয় হাদিসেই পানির সাথে মিশ্রণ পাওয়া গেছে, তবে এই মিশ্রণ এতো বেশি নয় যে, তার উপর পানি নামটির প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে।

চতুর্থ প্রকার : যে পানির সাথে নাপাক জিনিসের মিশ্রণ ঘটে

মিশ্রণ দু'রকমের হতে পারে :

এক : নাপাক দ্রব্যের মিশ্রণের কারণে পানির স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। এরূপ পানি দ্বারা সর্বসম্মতভাবেই পবিত্রতা অর্জন জায়েয হয়না। ইবনুল মুনযির ও ইবনুল মুলকিন একথা বলেছেন।

দুই : পানি তার স্বাভাবিক অবস্থায় বহাল থাকবে এবং তার উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটিও পরিবর্তিত হবেনা। এর বিধি হলো, এই পানি নিজেও পবিত্র, অন্যকেও পবিত্র করে, চাই কম হোক, বা বেশি হোক। এর প্রমাণ আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদিস : "জনৈক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে তাতে প্রস্রাব করলো। লোকেরা তৎক্ষণাৎ তার দিকে তেড়ে গেলো এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে তো পাঠানো হয়েছে দীনকে সহজভাবে পেশ করার জন্য, কঠিনভাবে পেশ করার জন্য তোমাদের পাঠানো হয়নি।" এ হাদিস মুসলিম ব্যতিত আর সবকটি হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত।

আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদিস দ্বারাও এটি প্রমাণিত। তিনি বলেন : জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : "হে রসূলুল্লাহ! আমরা কি বুযায়ার কূয়া থেকে অযু করবো? [২] রসূলুল্লাহ সা. বললেন : পানি

২. বুযায়া' হচ্ছে মদিনার একটি কূয়া। আবু দাউদ বলেছেন : কুতায়বা ইবনে সাঈদকে বলতে শুনেছি, বুযায়া' কূয়ার তত্ত্বাবধায়ককে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার গভীরতা কতোটুকু? তিনি বললেন : সবচেয়ে বেশি পানি যখন হয় তখন তলপেট পর্যন্ত হয়। আমি বললাম : যখন কমে? তিনি বললেন : শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখার হুকুম রয়েছে তার নিচ পর্যন্ত। আবু দাউদ বলেছেন : আমি আমার চাদর দিয়ে বুযায়ার কূয়া মেপেছি। চাদরটি তার ওপর লম্বা করে রেখে পরে মেপে দেখেছি, তার প্রশস্ততা ছয় হাত। যে ব্যক্তি আমাকে বাগানের দরজা খুলে দিয়ে তার ভেতরে প্রবেশ করলো তাকে জিজ্ঞেস করলাম : এই কূয়া আগে যেমন ছিলো তা থেকে কি কোনো পরিবর্তন করা হয়েছে? সে বললো না। আমি ঐ কূয়ার পানির রং পরিবর্তিত দেখেছি।

পবিত্রকারী, তাকে কোনো জিনিস অপবিত্র করেনা।" হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, শাফেয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযি। তিরমিযি এটিকে ভালো হাদিস এবং আহমদ সহীহ হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইয়াহিয়া ইবনে মঈন এবং আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযমও বলেছেন এটি সহীহ হাদিস।

ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, হাসান বসরী, ইবনুল মুসাইয়াব, ইকরামা, ইবনে আবি লায়লা, ছাওরী, দাউদ যাহেরী, নাখয়ী ও মালেক প্রমুখ এই মতই পোষণ করতেন। গাযযালী বলেছেন : শাফেয়ীর মাযহাব যদি পানির ব্যাপারে মালেকের মাযহাবের মতো হতো তবে আমার মতে ভালো হতো।

"রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, পানি যখন দুই কুল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা নাপাকি দূর করতে পারেনা"। ইবনে উমর রা. থেকে পাঁচটি হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত এ হাদিসটি সনদ ও মূল ভাষা উভয় দিক দিয়েই দুর্বল। (বড় কলসীকে কুল্লা বলা হয় -অনুবাদক)

ইবনে আব্দুল বার ভূমিকায় বলেছেন : ইমাম শাফেয়ী অনুসৃত দুই কুল্লা সংক্রান্ত হাদিস যুক্তির দিক দিয়ে যেমন দুর্বল, সনদের দিক দিয়েও তেমনি প্রমাণসিদ্ধ নয়।

পঞ্চম প্রকার : এটো বা উচ্ছিষ্ট পানি

পানি কারো পান করার পর পাত্রে যেটুকু পানি অবশিষ্ট থাকে সেটা উচ্ছিষ্ট। উচ্ছিষ্ট কয়েক প্রকারের :

১. **মানুষের উচ্ছিষ্ট** : এটা পবিত্র- চাই মুসলমানের হোক, অমুসলমানের হোক, বীর্যপাতজনিত অপবিত্র বা ঋতুবতীর হোক। অবশ্য আল্লাহ যে বলেছেন : 'মুশরিকরা তো অপবিত্র।' (সূরা ৯, আত্-তাওবা : আয়াত-২৮) তার অর্থ হলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা। মুশরিকদের বাতিল আকীদা বিশ্বাসের কারণে এবং নাপাকি ও নোংরামি থেকে আত্মরক্ষা না করার কারণে এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অপবিত্রতার সৃষ্টি হয়। তাদের দেহ ও জিনিসপত্র বা অপবিত্র ব্যাপার তা নয়। তারা তো মুসলমানদের সাথে মেলামেশা করতো এবং তাদের দূতেরা ও প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ সা.-এর কাছে আসতো, এমনকি মসজিদে নববীতেও প্রবেশ করতো। তিনি কখনো তাদের দেহের সংস্পর্শে আসার কারণে কোনো জিনিসকে ধুয়ে ফেলতে আদেশ দেননি।

"আয়েশা রা. বলেছেন : আমি ঋতুবতী থাকা অবস্থায় কতো কি পান করতাম, তারপর সেই জিনিস রসূলুল্লাহ সা. কে দিতাম। আমি যেখানে মুখ রেখে পান করতাম সেইখানে মুখ রেখে তিনিও পান করতেন।" -মুসলিম।

২. **হালাল জন্তুর উচ্ছিষ্ট** : এটা পবিত্র। কেননা এসব জন্তুর লালা পবিত্র গোশত থেকে সৃষ্ট। তাই এটাও পবিত্র। আবু বকর ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলেমগণের সর্বসম্মত মত হলো, যে জন্তুর গোশত হালাল, তার উচ্ছিষ্ট পানি পান করাও জায়েয। তা দিয়ে অযু করাও বৈধ।

৩. **গাধা, খচ্চর, হিংস্র জন্তু ও শিকারী পাখির উচ্ছিষ্ট** : এটা পবিত্র। "জাবের রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো : গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে কি আমরা অযু করতে পারবো? তিনি বললেন, হাঁ। শুধু তাই নয়, যাবতীয় হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট দিয়ে অযু করা চলবে"। (শাফেয়ী, দারু কুতনি ও বায়হাকি) এ হাদিসের বহু সনদ রয়েছে যা মিলিত হলে এটি সবল হয়।

"ইবনে উমর রা. বলেন : একবার রসূলুল্লাহ্ সা. রাত্রিকালে সফরে বের হলেন। তিনি সদলবলে এমন এক ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলেন, যে তার একটি পানির চৌবাচ্চার সামনে

বসেছিল। উমর রা. বললেন : আপনার চৌবাচ্চা থেকে কি কোনো হিংস্র প্রাণী রাতের বেলা পানি চেটে খেয়েছে? রসূল সা. তৎক্ষণাৎ লোকটাকে বললেন : হে চৌবাচ্চার মালিক! ওকে জানিওনা। সে একজন খুঁতখুতে স্বভাবের মানুষ। হিংস্র প্রাণী যদি কিছু খেয়ে থাকে তবে তা তার পেটে আছে। আর যা অবশিষ্ট আছে তা আমাদের জন্য পান যোগ্য ও পবিত্রকারী"। -দার কুতনি।

"ইয়াহিয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত, উমর রা. একটি কাফেলার সাথে সফরে বের হলেন। সেই কাফেলায় আমর ইবনুল আ'স ছিলেন। কাফেলা যখন একটা কূয়ার কাছে পৌঁছলো, তখন আমর ইবনুল আ'স বললেন : হে কূয়ার মালিক! আপনার কূয়ায় কি কোনো হিংস্র জন্তু আসে? উমর রা. তৎক্ষণাৎ বললেন : আপনি এ খবর জানাবেননা। কারণ আমরাও হিংস্র জন্তুর কাছে যাই, তারাও আমাদের কাছে আসে।" -মুয়াত্তায়ে মালেক।

৪. বিড়ালের উচ্ছিষ্ট : এটাও পবিত্র। কেননা আবু কাতাদার সংসারে অবস্থানকারিণী কাবশা বিনতে কা'ব বলেছেন : "আবু কাতাদা আমার কাছে এলেন। আমি তাকে পানি ঢেলে দিলাম। এ সময় একটা বিড়াল পানি পান করতে এলো। আবু কাতাদা তার দিকে পানির পাত্রটা এগিয়ে দিলেন এবং বিড়াল তা থেকে পানি পান করলো। কাবশা বললেন : আবু কাতাদা দেখলেন, আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন : হে আমার ভাতিজী, তুমি কি অবাক হচ্ছো? আমি বললাম : হাঁ, তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। বিড়াল তো সর্বক্ষণ তোমাদের আশপাশে ঘুরে বেড়ায়।" (পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত, তিরমিযি বলেছেন : এটি সহীহ ও ভালো হাদিস, বুখারি প্রমুখ একে সহীহ বলেছেন।

৫. কুকুর ও শুকরের উচ্ছিষ্ট : এটি অপবিত্র এবং এটি থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হওয়ার কারণ হলো, বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে: "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কুকুর তোমাদের কোনো পাত্র থেকে পানি পান করে তখন ঐ পাত্রকে সাত বার ধোয়া আবশ্যক।"

"আর আহমদ ও মুসলিমে আছে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কোনো পাত্র কুকুরে চাটলে সেটি সাত বার ধুলে পবিত্র হবে। তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে ঘষে ধুতে হবে।"

আর শুকরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র শুকরের অপবিত্রতা ও নোংরামীর কারণে।

২. নাপাকি এবং নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায়

নাজাসা বা নাপাকি হলো সেই ময়লা বা নোংরামী, যা থেকে পবিত্র হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক এবং যার কোনো অংশ তার গায়ে বা কাপড়ে লাগলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করা অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "তোমার কাপড় পবিত্র করো।" (সূরা ৭৪, আল-মুদদাসসির : আয়াত-৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা ২ আল-বাকারা, আয়াত : ২২২)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ. "পবিত্রতা ঈমানের অংগ।"

এ বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করছি :

● নাপাকির প্রকারভেদ[৩]

১. মৃত প্রাণী :

মৃত প্রাণী হলো সেগুলো, যেগুলো : স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে, অর্থাৎ যবাই ব্যতিত।[৪] যে প্রাণীকে জীবিতাবস্থায় কেটে ফেলা হয় তাও এই শ্রেণীভুক্ত। আবু ওয়াকেদ লাইছী বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "জীবিতাবস্থায় যে চতুষ্পদ জন্তুকে কেটে ফেলা হয় তা মৃত প্রাণী।" (আবু দাউদ ও তিরমিযি) তিরমিযি এটাকে ভালো হাদিস আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন : আলেমগণ এ হাদিস অনুসরণ করে থাকেন।

মৃত প্রাণীর আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্তগুলো নাপাক নয় :

ক. মাছ ও পংগপালের মৃতদেহ :

এগুলো পাক। ইবনে উমর রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দুটো মৃত দেহ ও দুটো রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। মৃত দেহ দুটো হলো মাছ ও পংগপালের। আর রক্ত দুটো হলো যকৃত ও প্লিহা।" (আহমদ, শাফেয়ী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকি ও দারু কুতনি কর্তৃক বর্ণিত।) হাদিসটি দুর্বল, তবে ইমাম আহমদের মতে এটি মওকুফ কিন্তু সহীহ। (যে হাদিসের সনদ সাহাবি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। রসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছেনি তাকে মওকুফ বলে)। আবু যারআ' ও আবু হাতেমও এটাকে মওকুফ ও সহীহ বলেছেন। এ ধরনের হাদিস মারফুর (যার সনদ রসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছেছে) পর্যায়ভুক্ত। কোনো কোনো সাহাবি যখন বলেন "এটা আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ও এটা আমাদের উপর হারাম করা হয়েছে" তখন তা অবিকল "আমাদেরকে অমুক কাজ করতে আদেশ ও অমুক কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে" বলার সমপর্যায়ের।

ইতিপূর্বে রসূল সা. এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে সমুদ্র সম্পর্কে : "সমুদ্র পবিত্রকারী, তার পানি পবিত্র, তার ভেতরের মৃত প্রাণী হালাল।"

খ. প্রবহমান রক্তের অধিকারী নয় এমন প্রাণীর মৃত দেহ। যেমন পিঁপড়ে ও মৌমাছি ইত্যদি। এগুলো পাক। এগুলো কোনো জিনিসের ভেতর পড়লে ও মারা গেলে সেই জিনিস নাপাক হয়না। ইবনুল মুনযির বলেছেন : এসব মৃত দেহ যে জিনিসে পড়ে তার পাক হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী ব্যতিত কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেছে বলে আমার জানা নেই। তাঁর মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ মত হলো এটা নাপাক তবে কোনো তরল জিনিসে পড়লে যতোক্ষণ তা ঐ তরল জিনিসকে পরিবর্তিত না করবে ততোক্ষণ তা পাক থাকবে।

গ. প্রাণীর মৃত দেহের হাড়, শিং, নখ, চুল, পালক, চামড়া এবং এই জাতীয় সব কিছুই পাক। এসব জিনিসের মূল অবস্থা হলো পবিত্রতা। নাপাক হওয়ার জন্য কোনো প্রমাণ নেই। হাতি প্রভৃতি জন্তুর মৃত দেহের হাড়গোড় সম্পর্কে বলেছেন : প্রাচীন আলেমদের অনেককে দেখেছি এর চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়াতে ও এর তেল ব্যবহার করতে। তারা এতে কোনো আপত্তির কিছু দেখেননি। বুখারি কর্তৃক বর্ণিত।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, "তিনি বলেছেন : মাইমুনার এক মুক্ত বাদীকে একটা ছাগল ছদকা করা হয়েছিল। পরে সেই ছাগল মারা গেলো। রসূল সা. তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

---

৩. নাপাকি দু'রকমের : এক. যা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। যেমন : পেশাব, পায়খানা, রক্ত। দুই. যা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়না। যেমন : বীর্যপাতজনিত নাপাকি।

৪. এ দ্বারা শরিয়তসম্মত যবাই বুঝানো হয়েছে।

তিনি বললেন : তোমরা ছাগলটির চামড়া নিয়ে পাকিয়ে কাজে লাগালেনা কেনো? তারা বললো : ওটা তো মৃত ছিলো। রসূল সা. বললেন : মৃত জন্তু তো শুধু খাওয়া হারাম।" (ইবনে মাজাহ ব্যতিত সব ক'টি হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত)

ইবনে মাজাহ এ হাদিস মাইমুনা থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারি ও নাসায়ীতে চামড়া পাকানোর উল্লেখ নেই। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি সূরা আল আনয়ামের ১৪৫নং আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন : এর যে জিনিস খাওয়া হয় সেটাই অর্থাৎ গোশত হারাম করা হয়েছে। চামড়া, চামড়া থেকে নির্গত বস্তু, দাঁত, হাত, চুল, পশাম - এসবই হালাল (ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবি হাতেম কর্তৃক বর্ণিত) (সূরা ৬, আয়াত ১৪৩)

দুধ, মৃত ছাগল ছানার পেট থেকে বের হওয়া জমাট দুধ পবিত্র। সাহাবীগণ যখন ইরাক জয় করলেন তখন সেখানকার অগ্নি উপাসকদের তৈরি পনির খেয়েছিলেন। যা মৃত ছাগল শিশুর পেটের জমাট দুধ দিয়ে তৈরি হতো। অথবা তাদের যবাই করা জন্তুকে মৃতদেহ বিবেচনা করা হতো। সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণিত : তাকে পনির, ঘি ও পশুর লোমের তৈরি পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল আর যা তার কিতাবে হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে মৌনতা অবলম্বন করেছেন সেসব ক্ষেত্রে তিনি অব্যাহতি দিয়েছেন। সালমান যখন মাদায়েনে উমর রা.-এর প্রতিনিধি ছিলেন তখন তাঁকে মূলত অগ্নি উপাসকদের পনির সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

২. রক্ত :

চাই প্রবাহিত রক্ত হোক- যেমন যবাইকৃত জন্তু থেকে প্রবাহিত রক্ত। অথবা ঋতুবতীর রক্ত হোক। তবে এর খুব সামান্য পরিমাণকে অব্যাহতি দেয়া হয়। উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত "অথবা প্রবাহিত রক্ত" সম্পর্কে ইবনে জুরাইজ বলেছেন, এর অর্থ : যে রক্ত ঝরানো হয়। অবশ্য মৃত প্রাণীর রগের ভেতরে যে রক্ত রয়ে যায় তাতে কোনো আপত্তি নেই। ইবনুল মুনযির কর্তৃক বর্ণিত।

রক্ত সম্পর্কে আবু মিজলায থেকে বর্ণিত আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রক্ত ছাগলের যবাইয়ের জায়গায় থাকলে বা ডেগের উপরে দেখা দিলে কেমন হবে? তিনি বললেন : কোনো দোষ নেই। নিষিদ্ধ হয়েছে শুধু প্রবাহিত রক্ত। এটি আবদ বিন হোমায়েদ ও আবুশ শায়খ থেকে বর্ণিত।

আয়েশা রা. বলেছেন : ডেগচির উপরিভাগে যখন রক্তের রেখা দৃষ্টিগোচর হতো এমতাবস্থায় আমরা গোশ্‌ত খেতাম। আর হাসান বলেছেন : মুসলমানরা তাদের যখম নিয়েই নামায পড়তো। -বুখারি।

বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে, উমর রা.-এর যখম থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে এমতাবস্থায় নামায পড়েছেন। হাফেয ইবনে হাজর ফতহুল বারীতে বলেছেন : আবু হুরায়রা রা. নামাযে দু'এক ফোটা রক্ত টপকালেও দূষণীয় মনে করতেননা। তবে কীট পতংগের রক্ত ও ফোঁড়া থেকে নির্গত রক্ত সাহাবিগণের এসব উক্তির আলোকে ক্ষমার যোগ্য। শরীরে ও কাপড়ে পুঁজ লাগা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আবু মিজলায বললেন : পুঁজ কোনো দূষণীয় জিনিস নয়। আল্লাহ রক্তের উল্লেখ করেছেন পুঁজের উল্লেখ করেননি। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : পুঁজ, রক্তমিশ্রিত পুঁজ ও রক্তবিহীন পুঁজ কাপড়ে লাগলে কাপড় ধোয়া জরুরি। তবে তিনি বলেছেন : এগুলোর নাপাক হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। যাহোক, এগুলো থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকা উচিত।

৩. শুকরের গোশ্‌ত :

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ ـ

"বলো, আমার কাছে যে অহি এসেছে তাতে আমি কোনো আহারকারীর আহারের জন্য নিষিদ্ধ কিছু পাইনা কেবল মৃতদেহ, প্রবহমান রক্ত, অথবা শুকরের গোশত ব্যতিত। কেননা ওটা নাপাক।" (সূরা-৬, আল-আনয়াম : আয়াত-১৪৫)

অর্থাৎ উল্লিখিত তিনটি জিনিসই নোংরা যা সুস্থ মনের অধিকারীরা পছন্দ করেনা।

আলেমদের প্রসিদ্ধ মত অনুসারে শুকরের পশম দিয়ে সেলাই এর কাজ করা জায়েয।

৪-৬. মানুষের বমি, পেশাব ও মল :

এ জিনিসগুলোর নাপাক হওয়া সর্বসম্মত। তবে স্বল্পপরিমাণ বমি মার্জনীয়। আর যে শিশু এখনো শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করেনি, তার পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া যথেষ্ট। কারণ উম্মে কায়েস রা. বলেন : তিনি তার শক্ত খাবার খাওয়ার যোগ্য হয়নি এমন শিশুপুত্রকে নিয়ে রসূল সা. এর কাছে এলেন। তাঁর সেই শিশুপুত্র রসূল সা. এর কোলে পেশাব করে দিল। রসূল সা. পানি আনতে বললেন এবং তাঁর কাপড়ে একটু বেশি করে ছিটিয়ে দিলেন ধুলেননা।" -বুখারি, মুসলিম।

আলী রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটাতে হবে, আর মেয়ে শিশুর পেশাব ধুতে হবে। কাতাদা বলেন : যতোদিন তারা শক্ত খাবার না খায় ততোদিনের জন্য এই বিধি। যখন শক্ত খাবার ধরবে, তখন উভয়ের পেশাব ধুতে হবে। -আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আলোচ্য হাদিসের ভাষা আহমদ থেকে উদ্ধৃত।

হাফেয ইবনে হাজর ফতহুল বারীতে বলেছেন : এ হাদিসের সনদ শুদ্ধ। আর পানি ছিটানো ততোদিনই যথেষ্ট হবে যতোদিন শিশু শুধু দুধ খায়। পুষ্টির জন্য যখন অন্য খাবার খাওয়া শুরু করে তখন সর্বসম্মতভাবে ধোয়া ওয়াজিব। শুধু পানি ছিটানোর অনুমতি দেয়ার কারণ সম্ভবত মানুষের শিশু সন্তানকে সাথে নিয়ে চলার প্রতি অত্যধিক আসক্তি। যার বলে কোলে প্রস্রাবের ঘটনা বেশি ঘটে এবং বারবার কাপড় ধোয়ায় বেশি কষ্ট হয়। তাই এই অনুমতি দ্বারা কষ্ট লাঘব করা হলো।

৭. ওদি

ওদি এক ধরনের সাদা ঘন পানি, যা পেশাবের পর বের হয়। এটি সর্বসম্মতভাবে নাপাক। আয়েশা রা. বলেছেন ওদি পেশাবের পরে বের হয়। যার এটা হবে সে তার জননেন্দ্রিয় ধুয়ে অযু করবে। গোসল করার প্রয়োজন নেই। ইবনুল মুনযির কর্তৃক বর্ণিত, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : মনি (বীর্য) বেরুলে গোসল করতে হবে। আর মযি ও ওদি বের হলে অযু করে পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। আছরাম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত। বায়হাকীর ভাষা হলো : ওদি ও মযি সম্পর্কে তিনি বলেছেন : তোমরা যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেল এবং নামাযের অযুর মতো অযু করো।

৮. মযি

সাদা পিচ্ছিল পানি, যা সহবাসের চিন্তা করলে বা নরনারীর মেলামেশা ও আদর সোহাগের

সময় নির্গত হয়। এটা নির্গত হওয়ার কথা মানুষ টের নাও পেতে পারে। নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থেকেই এটা নির্গত হয়ে থাকে। তবে নারীর যৌনাঙ্গ থেকেই অধিকতর। এটি সর্বসম্মতভাবে নাপাক। তবে এটা যখন শরীরে লাগবে তখন শরীর ধোয়া ওয়াজিব হবে। আর কাপড়ে লাগলে পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট হবে। কেননা এটা এমন নাপাকি যা থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর। কারণ অবিবাহিত যুবক-যুবতীর কাপড়ে এটা খুব ঘন ঘনই লাগে। কাজেই ছেলে শিশুর পেশাবের চেয়ে এটির ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া অগ্রগণ্য। "আলী রা. বলেছেন : আমার খুব বেশি মযি নির্গত হতো। একজনকে আদেশ দিলাম রসূল সা.কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে। নিজে করিনি তাঁর মেয়ের বিদ্যমানতার কারণে। লোকটি জিজ্ঞাসা করলে রসূল সা. জবাব দিলেন : তোমার পুরুষাংগ ধৌত করো এবং অযু করো।" -বুখারি ও অন্যন্য গ্রন্থ।

সাহল বিন হানিফ রা. বলেছেন : "আমি মযির কারণে খুবই কষ্ট ভোগ করতাম আর এর জন্য আমি ঘন ঘন গোসল করতাম। বিষয়টা রসূল সা. এর নিকট ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন : তোমার তো অযু করাই যথেষ্ট। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ! আমার কাপড়ে যে মযি লাগে, তার প্রতিকার কিভাবে করবো? তিনি বললেন : তোমার কাপড়ের যেখানে লেগেছে বলে মনে হয় সেখানে এক কোষ পানি ছিটায়ে দেয়াই যথেষ্ট হবে। আবু দাউদ ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযি এটাকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

আছরাম রা.ও এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষা এ রকম : "মযির কারণে আমি খুব কষ্টে ছিলাম, তাই রসূল সা. এর নিকট এলাম এবং তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন : তুমি এক কোষ পানি নিয়ে তা ছিটায়ে দাও এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

৯. মনি (বীর্য)

কোনো কোনো আলেম বীর্যকে নাপাক বলেছেন। তবে দৃশ্যত এটা পাক। কিন্তু ভিজে থাকা অবস্থায় একে ধুয়ে ফেলা এবং শুকনো অবস্থায় ঢলে বা খুটে তুলে ফেলা মুস্তাহাব। "আয়েশা রা. বলেছেন : আমি রসূল সা. এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য খুটে ফেলে দিতাম এবং ভিজা বীর্য ধুয়ে ফেলতাম।" -দারু কুতনি, বাযযার, আবু আওয়ানা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : "কাপড়ে লেগে থাকা বীর্য সম্পর্কে রসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেছেন : ওটা তো কফ ও থুথুর মতো। একটা নেকড়া বা ইযখির ঘাস দিয়ে মুছে ফেললেই যথেষ্ট হবে।"-দার কুতনী, বায়হাকি ও তাহাবি হাদিসটি মারফু না মাওকুফ সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

১০. যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া না জায়েয সেগুলোর পেশাব ও গোবর

এ দুটোই নাপাক। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. পায়খানায় গেলেন। অতপর আমাকে আদেশ দিলেন যেনো তিন টুকরো পাথর এনে তাঁকে দেই। আমি পেলাম দুটো পাথর, তৃতীয়টা খুঁজলাম, কিন্তু পেলামনা। একটা শুকনো গোবর পেলাম এবং সেটাই তাঁকে দিতে এলাম। তিনি পাথর দুটো নিলেন এবং গোবরটা ফেলে দিলেন। তিনি বললেন : এটা নাপাক।" -বুখারি ও ইবনে খুযায়মা।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে সংযোজিত হয়েছে : "এটা নাপাক। এতো গাধার গোবর।" এর সামান্য পরিমাণকে নাপাক হওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কারণ এ থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা কঠিন।

অলিদ বিন মুসলিম বলেছেন : আওযায়ী'কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : যেসব চতুষ্পদ জন্তুর গোশ্ত খাওয়া জায়েয নেই, যেমন খচ্চর, গাধা ও ঘোড়া, সেগুলোর পেশাবের কী হবে? তিনি

জবাব দিলেন : মুসলমানগণ তাদের যুদ্ধবিগ্রহের সময় এগুলোর পেশাব দ্বারা আক্রান্ত হতো। কিন্তু তারা শরীর বা দেহ থেকে তা ধুতোনা। যেসকল জন্তুর গোশ্‌ত হালাল, তার পেশাব ও পায়খানাকে ইমাম মালেক, আহমদ ও শাফেয়ী মাযহাবের একাংশ পবিত্র মনে করেন। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : কোনো সাহাবিই একে নাপাক বলেননি, বরং একে নাপাক বলা একটা নতুন উদ্ভাবন যা সাহাবাদের কেউ বলেননি। আনাস রা. বলেছেন : "ইকল বা উরাইনা গোত্রের একদল লোক মদিনায় এসে দীর্ঘস্থায়ী পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলো। রসূল সা. তাদেরকে দুগ্ধবতী উটনীর পেশাব ও দুধ খেতে আদেশ দিলেন।" -আহমদ, বুখারি, মুসলিম।

এ হাদিস উটের পেশাবের পবিত্রতার প্রমাণ বহন করে। উট ছাড়া অন্যান্য হালাল জন্তুকেও তদ্রূপ মনে করতে হবে। ইবনুল মুনযির বলেন : যারা দাবি করে এটা শুধু উরাইনা বা ইকলের জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো, তারা ভুল বলেছেন। কেননা কোনো বিশিষ্টতা বিনা প্রমাণে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন : আলেমগণ কর্তৃক প্রাচীন ও সম্প্রতিককালে তাদের বাজারগুলোতে ছাগল ও ভেড়ার মল বিক্রি এবং ওষুধে উটের পেশাব ব্যবহারে আপত্তি না করা দ্বারা প্রমাণিত হয়, এগুলো পাক। শওকানি বলেছেন : হালাল জন্তু মাত্রেরই মলমূত্র বাহ্যত পাক। কেননা এর মৌলিক অবস্থা হলো পবিত্রতা। নাপাক হওয়া শরিয়তে এমন একটা বিধি, যা তার মূল পবিত্রাবস্থা থেকে তাকে ভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত করে।

কাজেই তাকে পরিবর্তন করার উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া পরিবর্তিত করার দাবিদারদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। যারা একে নাপাক বলেন, তাদের কাছ থেকে এ বক্তব্যের সপক্ষে আমরা কোনো প্রমাণ পাইনি।

১১. মলখোর জন্তু

মলখোর জন্তুর পিঠে আরোহণ, গোশ্‌ত খাওয়া ও দুধ খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, "মলখোর প্রাণীর দুধ খেতে রসূল সা. নিষেধ করেছেন।" এটি ইবনে মাজাহ ব্যতিত অবশিষ্ট পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযি একে সহীহ বলেছেন। অপর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে : রসূল সা. মলখোর জন্তুর পিঠে চড়তেও নিষেধ করেছেন- আবু দাউদ। আমর বিন শুয়াইব বর্ণিত হাদিসে রসূল সা. গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে এবং মলখোর জন্তুর পিঠে আরোহণ ও গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।" -আহমদ, নাসায়ী ও আবু দাউদ।

মলখোর প্রাণী দ্বারা সাধারণত উট, গরু, ভেড়া, হাঁস ও মুরগী ইত্যাদির মধ্য থেকে যেগুলো বিষ্টা খায় এবং একারণে তাদের ঘ্রানে পরিবর্তন আসে, সেগুলোকে বুঝায়। কিছুকাল আটকে রেখে বিষ্টা খাওয়া বন্ধ রাখলে এবং পবিত্র জিনিস খাওয়ালে যদি গোশ্‌ত পবিত্র হয়ে যায় এবং তাকে আর বিষ্টাখোর জন্তু বলে আখ্যায়িত না করা হয়, তাহলে হালাল হয়ে যাবে।

কারণ যে কারণে পরিবর্তন এসেছিল, সেটিই ছিলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। সে কারণ যখন দূর হয়েছে, তখন আর নিষিদ্ধ রইলনা।

১২. মদ

অধিকাংশ আলেমের মতে মদ নাপাক। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ .

"মদ, জুয়া প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর- এসব নোংরা-অপবিত্র, শয়তানের কাজ।" (সূরা ৫, মায়েদা : আয়াত ৯০)

এক দল মদকে পাক বলে রায় দিয়েছেন। তাদের মতে 'নোংরা' শব্দটির অর্থ হলো নৈতিক দিক দিয়ে নোংরা। 'নোংরা' কথাটা মদকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। অন্য যে কটি জিনিস আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবিকপক্ষে মোটেই নাপাক বিশেষণে ভূষিত হয়না। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন : "তোমরা নাপাক মূর্তিগুলো ত্যাগ করো।" স্পষ্টতই মূর্তি নৈতিকভাবে নাপাক। সেগুলো স্পর্শ করার কারণে কেউ নাপাক হয়না। আয়াতে যেভাবে এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, ওটা শয়তানের কাজ, মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি করে এবং নামায ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বাধা দেয়। একথা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নোংরা অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে নোংরা ও নাপাক। সুবুলুস সালাম গ্রন্থে বলা হয়েছে :

প্রকৃত ব্যাপার হলো, দ্রব্য ও বস্তুমাত্রই মূলত পবিত্র। কোনো বস্তু হারাম হলেই তা নাপাক হওয়া অবধারিত হয়না। যেমন- গাজা হারাম, কিন্তু তা পবিত্র। নাপাক জিনিস মাত্রই অনিবার্যভাবে হারাম। কিন্তু হারাম জিনিস মাত্রই নাপাক নয়। কেননা কোনো জিনিসের নাপাক হওয়ার হুকুম বা বিধি হলো সর্বাবস্থায় তার স্পর্শ থেকে দূরে থাকা জরুরি। কাজেই কোনো বস্তুকে নাপাক বলে আখ্যায়িত করা তাকে হারাম ঘোষণা করারই নামান্তর। কিন্তু কোনো বস্তুকে হারাম ঘোষণা করলেই তাকে নাপাক ঘোষণা করা হয়না। পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশম পরা হারাম। অথচ এ দুটোই সর্বসম্মতভাবে পবিত্র। সুতরাং মদকে হারাম ঘোষণাকারী আয়াত ও হাদিস দ্বারা তার নাপাক হওয়া প্রমাণিত হয়না। এজন্য অন্য কোনো প্রমাণ জরুরি। নচেত মূলত পবিত্র থাকার সর্বসম্মত নীতিমালার আলোকে তা পবিত্রই থাকবে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত দাবি করবে তার দাবির সপক্ষে তাকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

১৩. কুকুর

কুকুর নাপাক। কুকুর কোনো জিনিসকে জিভ দিয়ে চাটলে তা সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে ধুতে হবে।

"রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমাদের কোনো পাত্র যদি কুকুর চাটে, তবে তাকে পাক করার জন্য সাতবার ধুতে হবে, তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে।" -মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ ও বায়হাকি। প্রথমবার মাটি দিয়ে ধোয়ার অর্থ মাটির সাথে পানি মিশিয়ে ধুতে হবে। আর যে পাত্রে শক্ত খাবার রয়েছে তা চাটলে চাটা খাবার ও তার আশপাশের খাবার ফেলে দিতে হবে। বাকি অংশ আগের পবিত্রাবস্থায় বহাল থাকবে এবং তা ব্যবহার করা যাবে। তবে কুকুরের পশম পাক। কারণ এর নাপাক হওয়ার প্রমাণ নেই।

শরীর ও কাপড় পাক করার নিয়ম

শরীর ও কাপড়ে যদি নাপাকি লাগে এবং তা যদি দেখা যায়, যেমন- রক্ত, তবে তা দূর না হওয়া পর্যন্ত পানি দিয়ে ধোয়া ওয়াজিব। ধোয়ার পর যদি কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, যা দূর করা কঠিন হয়, তবে তা মার্জনীয়। আর যদি দেখা না যায়, যেমন পেশাব, তবে তা ধোয়াই যথেষ্ট হবে- এমনকি যদি একবারও ধোয়া হয় তবে তাতেই চলবে। আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেছেন : এক মহিলা রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এসে বললো : "আমাদের একজনের কাপড়ে ঋতুর রক্ত লেগেছে, সে কী করবে? রসূল সা. বললেন : সে আংগুল দিয়ে খুটে ও ঢলে পরিষ্কার করবে, অতপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে। তারপর তা দিয়ে নামায পড়বে।" -বুখারি ও মুসলিম।

আর যখন মহিলার কাপড়ের আঁচলে নাপাকি লাগে, তখন মাটিই তাকে পবিত্র করবে। কেননা হাদিসে আছে, "এক মহিলা উম্মে সালামা রা.-কে বললো : আমি আমার কাপড়ের আঁচল লম্বা

৬—

রাখি এবং ময়লা জায়গা দিয়ে চলাফেরা করি। উম্মে সালামা রা. বললেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কাপড়ে ময়লা লাগার পরে মাটি লাগলে তা-ই তাকে পাক করে দেবে।" -আহমদ, আবু দাউদ।

ভূমি পবিত্র করার পদ্ধতি

ভূমিতে নাপাকি লাগলে তার উপর পানি ঢেলে দিলে পাক হয়ে যাবে। কেননা আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : "জনৈক বেদুঈন মসজিদে গিয়ে পেশাব করলো। লোকেরা তৎক্ষণাৎ তার উপর আক্রমণ করতে ছুটে গেলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ওকে ছেড়ে দাও। ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে তো সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্য পাঠানো হয়নি।" -মুসলিম ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

ভূমি ও ভূমির সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত জিনিস যথা গাছ ও ভবনের ভিত শুকালেই পাক হয়ে যায়। আবু কুলাবা বলেছেন : ভূমির শুকানোই তার পবিত্র হওয়া। আয়েশা রা. বলেছেন : 'ভূমির পবিত্রতা তার শুষ্কতা।' ইবনে আবি শায়বা কর্তৃক বর্ণিত। এ হচ্ছে নাপাকি যখন তরল হয় তখনকার কথা। নাপাকি যখন শক্ত দেহধারী হয়, তখন তার অস্তিত্ব অপসারিত ও নিশ্চিহ্ন হওয়া ব্যতিত নাপাকি দূর হয়না।

ঘি ইত্যাদির পবিত্র করার উপায়

ইবনে আব্বাস কর্তৃক মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। ঘির মধ্যে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি জবাব দিলেন : "ইঁদুরটি ও তার পাশের অংশ উঠিয়ে ফেলে দাও। তারপর তোমাদের ঘি খাও।" -বুখারি।

হাফেয বলেছেন : ইবনে আবদুল বার সর্বসম্মত মত উদ্ধৃত করে বলেছেন, জমাট পদার্থে যখন কোনো মৃত প্রাণী পড়ে, তখন তা ও তার আশপাশের জিনিস ফেলে দিতে হবে। যদি নিশ্চিত হওয়া যায়, উক্ত মৃত প্রাণীর কোনো অংশ ঐ স্থানের বাইরে যায়নি। অবশ্য তরল পদার্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে নাপাকি মিশ্রিত হওয়ার দরুন পুরো জিনিসটাই নাপাক হয়ে যায়। তবে যুহরি ও আওযায়ীসহ একটি দল এর বিপরীত মত পোষণ করেন।[৫]

মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্র করার উপায়

মরা প্রাণীর চামড়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক দিয়েই পবিত্র হয় দাবাগত অর্থাৎ পাকানো বা পরিশোধনের মাধ্যমে। কারণ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "চামড়া যখন পাকানো হয় তখন তা পবিত্র হয়।" - বুখারি ও মুসলিম।

আয়না ইত্যাদির পবিত্রকরণ

আয়না, ছুরি-চাকু, তলোয়ার, নখ, হাড়, কাঁচ, তৈলাক্ত পাত্র এবং শান দেয়ার এমন ধাতব উপকরণ, যাতে কোনো অতিক্রমণের সূক্ষ্ম পথ নেই- এসব জিনিস থেকে নাপাকি মুছে ফেললেই তা পাক হয়ে যায়। সাহাবিগণ তাদের রক্তমাখা তরবারি বহন করে নামায পড়তেন। তারা রক্ত মুছে ফেলতেন এবং তাকেই যথেষ্ট মনে করতেন।

---

৫. এই দু'জনের মতে তরল পদার্থের বিধি পানির বিধির মতো। নাপাকির মিশ্রণে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটা ব্যতিত তা নাপাক হয়না। পরিবর্তিত নাহলে পাক থাকবে। এ মত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও বুখারির এবং এটাই সঠিক।

জুতা পবিত্রকরণ

নাপাকিযুক্ত জুতা ও মোজা ভূমির সাথে ঢলে মুছে ফেলার পর নাপাকির চিহ্ন দূর হলেই পাক হয়ে যায়। কারণ আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল (স.) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার জুতা দিয়ে কোনো নাপাকি জিনিস মাড়ায়, তখন মাটি তাকে পবিত্র করে। -আবু দাউদ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : যখন কেউ তার মোজা দিয়ে নাপাক জিনিস মাড়ায়, তখন মাটি দিয়ে সেই মোজা পবিত্র করা য়ায। আর আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে, তখন সে যেনো তার জুতো উল্টিয়ে দেখে নেয়। তাতে যদি কোনো নাপাকি দেখতে পায়, তবে তা যেনো ভূমির সাথে রগড়িয়ে মুছে ফেলে। তারপর তা নিয়ে নামায পড়ে। -আহমদ, আবু দাউদ।

মাটি দিয়ে মুছে ফেলা জুতো পবিত্র হওয়ার আর একটি কারণ এই যে, এটা এমন একটা জায়গা, যার সাথে বারবার প্রায় নাপাকি লেগে থাকে। তাই তাকে জমাট পদার্থ দিয়ে মোছাই যথেষ্ট। যেমন- পেশাব, পায়খানা কুলুখ দিয়ে মুছে ফেলার জায়গাটি। অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগের স্থান। এখান দিয়ে মাত্র দু'বার বা তিনবার নাপাকি নির্গত হয় ও নাপাকি লাগে। অথচ সেটা কুলুখ দিয়ে মোছাতেই পাক হয়ে যায়। জুতোয় তো তার চেয়েও বেশিবার নাপাকি লাগে। সুতরাং জুতো পাক হওয়া আরো বেশি যুক্তি সংগত।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য

১. যে রশিতে ধোয়া কাপড় নাড়া হয়, তাতে নাপাক কাপড়ও নাড়া হয়। তারপর রোদে বা বাতাসে ঐ রশি শুকিয়ে যায়। তারপর ঐ রশিতে পাক কাপড় নাড়লে ক্ষতি নেই।

২. কোনো ব্যক্তির উপর কোনো তরল পদার্থ পড়লো। কিন্তু ওটা পানি না পেশাব তা সে জানেনা। এমতাবস্থায় তার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। আর জিজ্ঞাসা করলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির জবাব দেয়া জরুরি নয়, যদিও সে জানে ওটা নাপাক পদার্থ। এমতাবস্থায় তার ওটা ধোয়ার দরকার নেই।

৩. রাতের বেলা কারো পায়ে বা কাপড়ে কোনো ভিজে জিনিস লাগলো। সে জানেনা জিনিসটা কী? এমতাবস্থায় ঘ্রাণ শুকে জিনিসটির পরিচয় লাভ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ বর্ণিত আছে, একদিন উমর রা. কোথাও যাচ্ছিলেন। সহসা তার গায়ে ছাদের পাইপ থেকে কি যেনো পড়লো। উমর রা.-এর সাথে একজন সংগি ছিলো। সে জিজ্ঞাসা করলো ওহে পাইপওয়ালা! আপনার পানি পাক না নাপাক? উমর রা. বললেন : হে পাইপওয়ালা! আপনি আমাদেরকে এটা জানাবেননা? তারপর তিনি চলে গেলেন।

৪. রাস্তার কাদা লাগলে তা ধোয়া জরুরি নয়। কামাইল বিন যিয়াদ বলেছেন : আমি আলী রা.-কে দেখেছি, বৃষ্টির কাদা পাড়িয়ে মসজিদে ঢুকলেন এবং পা না ধুয়েই নামায পড়লেন।

৫. কোনো লোক নামায শেষ করে চলে যাওয়ার পর তার দেহে বা কাপড়ে নাপাক জিনিস দেখলে, যা তার অজ্ঞাতসারেই লেগেছিল অথবা সে জানতো, কিন্তু ভুলে গিয়েছিল, অথবা ভুলে যায়নি কিন্তু তা দূর করতে অক্ষম ছিলো, তার নামায শুদ্ধ হবে। দ্বিতীয়বার পড়তে হবেনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "তোমরা যে ভুল করে ফেলেছ, তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।" (সূরা ৩৩, আহযাব : আয়াত-৫)

সাহাবি ও তাবেয়ীদের অনেকেই এই রায় মোতাবেক ফতোয়া দিয়েছেন।

৬. কাপড়ের ঠিক কোন্ জায়গায় নাপাকি লেগেছিল তা অজ্ঞাত থাকলে পুরো কাপড় ধোয়া

ওয়াজিব। কারণ পুরোটা ধোয়া ছাড়া পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার আর কোনো উপায় নেই। কাজেই এটা "যে কাজ না করলে ওয়াজিব আদায় হয়না সে কাজ ওয়াজিব" এই মূলনীতির আওতাভুক্ত।

৭. কয়েকটি কাপড় এক সাথে রয়েছে। তন্মধ্যে একটি নাপাক। কিন্তু কোন্টি তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এমতাবস্থায় কেবলা অজানা থাকলে যেমন কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে যে দিক সম্বন্ধে ধারণা প্রবলতর হয় সেটি স্থির করতে হয়। এখানেও তেমনি করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে একটি কাপড়ে মাত্র একবার নামায পড়া যাবে। চাই কাপড়ের সংখ্যা বেশি হোক বা কম হোক।

মলমূত্র ত্যাগের বিধি

মলমূত্র ত্যাগের জন্য কিছু নিয়ম কানুন বা বিধিমালা রয়েছে যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. আল্লাহর নাম লিখিত আছে এমন কোনো জিনিস মলমূত্র ত্যাগকারী সাথে নিয়ে যাবেনা। অবশ্য হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে অথবা সংরক্ষিত জিনিস হিসেবে সাথে থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা আনাস রা. বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. একটি আংটি পরতেন, যাতে 'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ' কথাটি খোদিত ছিলো। তিনি যখনই পায়খানায় যেতেন, সেটি খুলে রেখে যেতেন। -চারটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত।

হাফেয এ হাদিসেকে দুর্বল এবং আবু দাউদ অগ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন। হাদিসের প্রথম অংশ সহীহ।

২. জনসাধারণের সান্নিধ্য থেকে দূরে বা আড়ালে বা পায়খানায় যাওয়া উচিত, বিশেষত মলত্যাগের বেলায়, যাতে কোনো শব্দ না শোনা যায় ও গন্ধ না পাওয়া যায়। কারণ জাবির রা. বলেছেন : "আমরা এক সফরে রসূল সা. এর সাথে বের হলাম। সফরে তিনি যখনই মলত্যাগ করতে যেতেন, অদৃশ্য হয়ে যেতেন এবং তাকে দেখা যেতনা। - ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ।

আবু দাউদের ভাষা এরকম : "যখন তিনি মলত্যাগ করতে চাইতেন, এমন জায়গায় চলে যেতেন যে, কেউ তাঁকে দেখতোনা এবং অনেক দূরে চলে যেতেন।"

৩. মলমূত্র ত্যাগের ঘরে প্রবেশের সময় ও কাপড় উপরে তোলার সময় সশব্দে আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে। কারণ আনাস রা. বলেছেন : "রসূল সা. যখনই পায়খানা বা পেশাবখানায় যেতেন তখন বলতেন : "হে আল্লাহ! আমি নোংরা পুরুষ ও নোংরা স্ত্রীদের থেকে তোমার আশ্রয় চাই : (অর্থাৎ পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তান থেকে)। -সব কয়টি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

৪. পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করবে। এমনকি যিকির, সালাম ও আযানের জবাব দেয়া থেকেও বিরত থাকবে। তবে একান্ত জরুরি কথা বলা যাবে। যেমন- কোনো অন্ধ ব্যক্তি, যাকে পথের সন্ধান না দিলে তার প্রাণহানি ঘটার আশংকা রয়েছে, তার সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে। এ সময় হাঁচি হলে মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। এর জন্য জিহবা নাড়াবেনা। কেননা ইবনে উমর রা. বর্ণিত হাদিসে আছে : "রসূলুল্লাহ সা. পেশাব করছিলেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে রসূল সা.-কে সালাম করলো, কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না। -বুখারি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

আর আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন : "আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, দু'জন লোক যখন সতর খুলতে খুলতে ও পরস্পর কথা বলতে বলতে পেশাবখানায় বা পায়খানায় যায় তখন আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবেন মাজাহ।

এ হাদিস দৃশ্যত কথা বলাকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করে। তবে ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) হলো এ সময় কথা বলা মাকরূহ।

৫. কেবলার মর্যাদা সুন্নত রাখবে। কেবলাকে সামনেও রাখবেনা পেছনেও রাখবেনা। কেননা আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমাদের কেউ যখন তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে বসবে, তখন কেবলাকে সামনেও রাখবেনা, পেছনেও রাখবেনা"। -আহমদ ও মুসলিম।

এ হাদিস দ্বারা কাজটি মাকরূহ বুঝানো হয়েছে। কেননা ইবনে উমর রা. বলেন : "আমি একদিন হাফসা রা.-এর বাড়ির ছাদে উঠলাম। সেখান থেকে দেখলাম রসূল সা. প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছেন সিরিয়ার দিকে মুখ করে কাবা শরিফকে পেছনে রেখে।" -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

উভয় হাদিসের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য বলা যেতে পারে, খোলা মাঠে কেবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করা নিষেধ। আর বাড়ি ঘরে জায়েয়। (বস্তুত এই মতটি পূর্ববর্তী মত অর্থাৎ মাকরূহ সাব্যস্ত করার চেয়ে ভালো)। মারওয়ান আল আসগর রা. বলেন : "ইবনে উমর রা.-কে দেখেছি, নিজের বাহক জন্তুকে থামিয়ে কেবলার দিকে পেশাব করলেন। আমি বললাম : হে আবু আবদুর রহমান! এ কাজটি কি নিষিদ্ধ করা হয়নি? তিনি বললেন হাঁ, এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে খোলা ময়দানে। তবে যেখানে তোমার ও কেবলার মাঝে এমন কোনো জিনিস থাকবে, যা তোমাকে আড়াল করে, সেখানে কেবলার দিকে মুখ করে বা কেবলাকে পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগে দোষের কিছু নেই। -আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা, হাকেম।

৬. এমন জায়গা খুঁজে নিতে হবে যা নরম ও নিচু। যাতে নাপাকির ছিটা নিজের শরীর ও কাপড়ে আসা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। কারণ আবু মূসা রা. বলেন : "রসূলুল্লাহ সা. একটা দেয়ালের পাশের একটা সমতল জায়গায় এলেন ও পেশাব করেলেন এবং বললেন : তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে, তখন সে যেনো পেশাব করার জন্য (উপযুক্ত) স্থান অনুসন্ধান করে।" -আহমদ, আবু দাউদ।

হাদিসটিতে একজন অচেনা বর্ণনাকারী থাকলেও এর বক্তব্য সঠিক।

৭. গর্তের ভেতরে পেশাব পায়খানা করা থেকে বিরত থাকবে, যাতে গর্তের কোনো প্রাণী তাকে দংশন না করে। কাতাদা বর্ণিত হাদিসে আছে, তিনি বলেন : "রসূলুল্লাহ সা. গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা কাতাদাকে বললো : গর্তে পেশাব করা কি কারণে অপছন্দ করা হয়? তিনি বললেন : কেননা গর্তগুলো জিনদের বাসস্থান। -আহমদ, নাসায়ী, আবু দাউদ, হাকেম, বায়হাকি, ইবনে খুযায়মা, ইবনুস সাকান।

৮. যেসকল গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম নেয়, যেসব পথ দিয়ে মানুষ চলাফেরা করে ও কথাবার্তা বলে, সেখানে পেশাব পায়খানা করবেনা। কেননা আবু হুরায়রা রা. বলেন : রসূল সা. বলেছেন : "তোমরা অভিশাপদানকারীদের থেকে বেঁচে থাকো (অর্থাৎ অভিশাপের কারণসমূহ থেকে)। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : অভিশাপকারী কী হে রসূলুল্লাহ! রসূল সা. বললেন : মানুষের চলাফেরার রাস্তায় ও গাছের ছায়ার নিচে পেশাব পায়খানা করা।" -আহমদ, মুসলিম ও আবু দাউদ।

৯. গোসলখানায় প্রবহমান বা অপ্রবহমান পানিতে পেশাব করবেনা। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন : "তোমাদের কেউ যেনো নিজের গোসলখানায় পেশাব না করে। অতপর সেখানেই অযু না করে। কেননা প্রধানত এ কারণেই শয়তানের

কু-প্ররোচণা সৃষ্টি হয়। -পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত। তবে "সেখানেই অযু না করে" কথাটা শুধু আহমদ ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।" - আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

জাবির রা. থেকে আরো বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. প্রবহমান পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। -মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে বলা হয়েছে, এটি তাবারানি বর্ণনা করেছে এবং এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। তবে গোসলখানায় যদি পানি সরানোর নল বা নর্দমা থাকে তাহলে তাতে পেশাব করা দূষণীয় নয়।

১০. দাঁড়িয়ে পেশাব করবেনা। কেননা এটা সম্মান, গাম্ভীর্য ও উত্তম চরিত্রের বিপরীত। তাছাড়া এতে গায়ে ছিটে আসার আশংকা থাকে। ছিটে আসার আশংকা না থাকলে জায়েয আছে।

আয়েশা রা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি তোমাদেরকে বলবে- রসূল সা. দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তার কথা বিশ্বাস করোনা। তিনি বসে ছাড়া পেশাব করতেননা।" -আবু দাউদ ব্যতিত পাঁচটি হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

তিরমিযির মতে, এটি এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ হাদিস। তবে আয়েশার রা. হাদিসটির ভিত্তি হলো তিনি যা জানতেন তাই। তাই হুযায়ফা থেকে বর্ণিত হাদিস তার বিরোধী নয়। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, "রসূলুল্লাহ সা. একটি গোত্রের বর্জ্য নিক্ষেপের জায়গায় গিয়ে থামলেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। আমি সরে গেলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন : কাছে এসো। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি অযু করলেন ও তার মোজায় মসেহ করলেন।" -সব কটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

ইমাম নববী বলেছেন : বসে পেশাব করা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। দাঁড়িয়ে পেশাব করাও জায়েয। সবটাই রসূল সা. থেকে প্রমাণিত।

১১. মল ও মূত্র নির্গমনের স্থান থেকে নাপাকি দূর করতে হবে। একাজটি পাথর দ্বারা কিংবা অনুরূপ এমন কোনো শক্ত পবিত্র জিনিস দ্বারা করবে, যা নাপাকি দূর করতে সক্ষম এবং যা কোনো সম্মানার্হ বা পবিত্র বস্তু নয়, অথবা শুধু পানি দিয়েই ধুয়ে ফেলবে, অথবা দুটোই ব্যবহার করবে। কেননা আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে, তখন তিনটে পাথর দিয়ে শরীর থেকে নাপাকি দূর করবে। এটাই তার জন্য যথেষ্ট। -আহমদ, নাসায়ী, আবু দাউদ, দার কুতনি।

আনাস রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি ও আমার মতো একটা ছেলে এক বদনা পানি ও একটা লাঠি তার সাথে নিয়ে যেতাম। অতপর তিনি সেই পানি দিয়ে পবিত্র হতেন। -বুখারি ও মুসলিম।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. দুটো কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : এরা দু'জন আযাব ভোগ করছে। তবে তেমন বড় কোনো কারণে আযাব ভোগ করছেনা। (অর্থাৎ যে কাজের জন্য আযাব ভোগ করছে তা ত্যাগ করা তাদের জন্য কঠিন কিছু ছিলনা।) তাদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করতোনা এবং তা থেকে বেঁচে থাকতোনা। আর অপর জন চোগলখুরি করে বেড়াতো।" -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কবরের আযাব প্রধানত তা থেকেই হয়ে থাকে।

১২. ডান হাত দিয়ে ইসতিনজা (মলমূত্র থেকে পবিত্রতা অর্জন) করবেনা। আবদুর রহমান বিন যায়েদের বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, সালমানকে বলা হলো : আপনাদের নবী তো আপনাদেরকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছেন, এমনকি মলমূত্র সম্পর্কেও। সালমান বললেন, অবশ্যি। ...আমাদেরকে তিনি কেবলার দিকে মুখ করে পেশাব বা পায়খানা করতে, ডান হাত দিয়ে ইসতিনজা করতে, অথবা তিনটের কম পাথর (কুলুফ) দ্বারা ইসতিনজা করতে এবং কোনো নাপাক জিনিস দ্বারা বা হাঁড় দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করেছেন। -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি।

হাফসা রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. পানাহার করা, কাপড় পরা, নেয়া ও দেয়ার জন্য ডান হাত এবং এগুলো ছাড়া অন্য সকল কাজের জন্য বাম হাত ব্যবহার করতেন। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ও বায়হাকি।

১৩. ইসতিনজার পর পুনরায় হাত মাটি দিয়ে মুছে অথবা সাবান ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে যাতে হাতে লেগে থাকা দুর্গন্ধ দূর হয়। কারণ আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন পেশাবখানা বা পায়খানায় যেতেন তখন আমি তাঁর কাছে একটা তামার পাত্রে বা চামড়ার পাত্রে করে পানি নিয়ে যেতাম, তারপর সেই পানি দিয়ে তিনি ইসতিনজা করতেন, অতপর তার হাত মাটি দিয়ে মুছতেন।" -আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকি, ইবনে মাজাহ।

১৪. পেশাব করার পর গুপ্তাংগে ও পরনের কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দেবে। এতে করে ওয়াসওয়াসা (শয়তানের কু-প্ররোচনা) দূর হয়। পরে যখন ভিজে দেখবে, মনে মনে বলবে, এতো পানি ছিটানোর ভিজা। হাকাম বিন সুফিয়ান অথবা সুফিয়ান বিন হাকাম বলেছেন : "যখন রসূল সা. পেশাব করতেন, তখন অযু করতেন এবং পানি ছিটাতেন।" অপর বর্ণনায় রয়েছে : রসূল সা.কে দেখেছি, পেশাব করেছেন, তারপর নিজের গুপ্তাংগের উপর পানি ছিটিয়েছেন। আর ইবনে উমর রা. তার গুপ্তাংগের উপর এতো পানি ছিটাতেন যে, তার পায়জামা ভিজে যেতো।

১৫. পেশাবখানা বা পায়খানায় প্রবেশের সময় আগে বাম পা বাড়িয়ে দেবে। আর বের হবার সময় আগে ডান পা বের করবে আর বলবে : "গুফরানাকা।" আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. যখন পেশাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হতেন, বলতেন : "গুফরানাকা।" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। -নাসায়ী ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

আয়েশা রা.-এর উক্ত হাদিসই এ বিষয়ে বর্ণিত সর্বাপেক্ষা সহীহ হাদিস। দুর্বল সনদে বর্ণিত এক হাদিসে রয়েছে, রসূল সা. বলতেন :

"আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি আমার নিকট থেকে কষ্ট ও অপবিত্রতা দূর করেছেন এবং আমাকে শক্তি দিয়েছেন।" অথবা "আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে তাঁর স্বাদ উপভোগ করিয়েছেন, আমার মধ্যে তাঁর শক্তি বহাল রেখেছেন এবং আমার কাছ থেকে কষ্ট ও নোংরা জিনিস দূর করেছেন।"

৩. প্রকৃতিগত সুন্নতসমূহ

আল্লাহ তায়ালা নবীদের আ. জন্য কিছু সুন্নত (চিরন্তন রীতি প্রথা) মনোনীতে করেছেন এবং আমাদেরকে সেগুলো অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। সেগুলোকে এমন কিছু রীতি প্রথারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা ঘন ঘন সংঘটিত হয়, যা দ্বারা তাদের অনুসারীদের চিহ্নিত করা যায় এবং যা দ্বারা অন্যদের থেকে তারা স্বতন্ত্র বলে পরিচিত হয়। এসব রীতি প্রথাকে "শাশ্বত

ইসলামী রীতি প্রথা" বা "সুনানুল ফিতরাত-শাশ্বত রীতি" বলা যায়। এগুলোর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

১. খতনা করা : পুরুষাংগের অগ্রভাগ আবৃতকারী চামড়াকে কেটে ফেলার নাম খতনা। এর উদ্দেশ্য হলো, এর ভেতরে ময়লা জমা হতে না দেয়া, পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের সুবিধা নিশ্চিত করা এবং সহবাসের আনন্দ পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করতে সমর্থ হওয়া। এ হলো পুরুষের খতনা। পক্ষান্তরে প্রাচীন প্রথা অনুসারে নারীর যৌনাংগের উপরের অংশ কেটে ফেলা হলো নারীর খতনা। তবে নারীর খতনা সম্পর্কে যতোগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার সবই দুর্বল, একটিও সহীহ্ নয়।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : "দয়াময় আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম আ. আশি বছর বয়সে সিরিয়ার কাদুম নামক স্থানে অথবা কাদুম নামক অস্ত্র দ্বারা খতনা করেছেন।"-বুখারি।

অধিকাংশ আলেমের মতে এটি ওয়াজিব। শাফেয়ীগণ সাত দিন পর পর এটি মুস্তাহাব মনে করেন। শওকানি বলেন : এর জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং কোথাও একে ওয়াজিব বলা হয়নি।

২-৩. নাভির নিচের লোম কামানো ও বগলের লোম উপড়ে ফেলা : এ দুটো কাজও সুন্নত। কামানো, ছেটে ফেলা, উপড়ে ফেলা ও লোমনাশক পাউডার ব্যবহার- এসবের যে কোনো একটি পন্থা প্রয়োগ করা যথেষ্ট।

৪-৫. নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা বা কামানো : প্রত্যেকটির পক্ষে হাদিস রয়েছে।

ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, "রসূল সা. বলেছেন : তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো, দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ কামাও।" -বুখারি, মুসলিম।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন : পাঁচটি বিষয় হলো চিরন্তন সুন্নত : নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, খতনা করা, গোঁফ ছাটা, বগলের লোম উপড়ানো ও নখ কাটা। -সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ।

কাজেই গোঁফ ছাটা বা কামানো- যে কোনোটি করলেই চলবে। উদ্দেশ্য হলো, গোঁফ যেনো লম্বা না হয়, লম্বা হলে খাদ্য ও পানীয় তাতে লেগে যেতে পারে এবং তাতে ময়লা জমা হয়ে যেতে পারে। যায়েদ বিন আরকাম রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গোঁফ খাটো করেনা, সে আমার দলভুক্ত নয়। -আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযি এটিকে সহীহ্ বলেছেন।

সর্বোচ্চ মানের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং মনের স্বস্তি অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি সপ্তাহেই নাভির নিচের লোম সাফ করা, বগলের লোম উঠানো, নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা বা কামানো উত্তম। কেননা শরীরে কিছু লোম অবশিষ্ট থাকলেই এক ধরনের অস্বস্তি ও কষ্ট অনুভূত হয়। চল্লিশ দিন পর্যন্ত এগুলো সাফ না করারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। চল্লিশ দনি পর সাফ না করার পক্ষে কোনো ওযর দেয়া যাবেনা। আনাস রা. বলেছেন : রসূল সা. আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের লোম পরিষ্কার করা ও নাভির নিচের লোম কামানোর কাজ যেনো চল্লিশ দিনের চেয়ে বেশি ফেলে না রাখি। -আহমদ, আবু দাউদ প্রমুখ।

৬. দাড়িকে ছেড়ে দেয়া, যাতে তা বাড়ে এবং ব্যক্তিত্বের প্রতীকে পরিণত হয়। কাজেই এমনভাবে ছাঁটা যাবেনা, যা কামানোর কাছাকাছি মনে হয় এবং এতটা ছেড়েও দেয়া যাবেনা, বালখিল্যতায় পরিণত হয়। বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। বস্তুত: সব কিছুতেই মধ্যম

পন্থা সর্বোত্তম। মনে রাখতে হবে, দাড়ি পৌরুষ ও বীরত্বের পূর্ণতার প্রতীক। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : তোমরা মুশরিকদের বিপরীত আচরণ করো, দাড়ি বাড়াও গোঁফ কামাও। -বুখারি ও মুসলিম।

বুখারি সংযোজন করেছেন : "ইবনে উমর যখন হজ্জ বা ওমরায় যেতেন, তাঁর দাড়িকে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরতেন, এক মুঠের চেয়ে বেশি যা হতো, ছেঁটে ফেলতেন।"

৭. চুল যখন রাখা হয় ও বাড়ে, তখন তার যত্ন নেয়া : কেননা আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদিসে রসূল সা. বলেছেন : যার চুল আছে, সে যেনো যত্ন করে। -আবু দাউদ।

আতা ইবনে আবি ইয়াসার বলেন : "এক ব্যক্তি এমন অবস্থায় রসূল সা. এর কাছে এলো যে, তার চুল ও দাড়ি এলোমেলো, তেলবিহীন উস্কো খুস্কো। রসূল সা. তার দিকে এমনভাবে ইংগিত করলেন যেনো তাকে তার চুল ও দাড়ি ঠিক করতে আদেশ দিচ্ছেন। সে চুল দাড়ি ঠিক করে ফিরে এলো। রসূল সা. বললেন : শয়তানের মতো উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে আসার চেয়ে এটা কি ভালো হয়নি?" -মালেক।

আবি কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত : আবু কাতাদার বড় বাবরী চুল ছিলো। তিনি সে সম্পর্কে রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে চুলের যত্ন নিতে ও প্রতিদিন আঁচড়াতে আদেশ দিলেন। -নাসায়ী।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন : হে রসূলুল্লাহ, আমার তো ঘাড় পর্যন্ত বারবী চুল। আমি কি তা আঁচড়াবো। রসূল সা. বললেন, হাঁ, বরং তার আরো যত্ন নেবে। তারপর আবু কাতাদা প্রায় প্রতিদিন দু'বার চুলে তেল মাখতেন শুধু রসূল সা. কর্তৃক চুলের যত্ন করার আদেশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে। আর মাথার চুল কামানো জায়েয। যে ব্যক্তি চুলের যত্ন করতে পারবে, তার জন্য তা লম্বা করাও জায়েয। কেননা ইবনে উমর রা. বলেছেন, রসূল সা. বলেছেন : হয় পুরো চুল রাখো, নতুবা পুরো চুল কামাও।" -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী।

মাথার কিছু অংশ কামিয়ে কিছু অংশ রাখা মাকরূহ তানযিহী। নাফে ইবনে উমর রা. থেকে বলেন : রসূল সা. কাযা' করতে নিষেধ করেছেন। নাফে'কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কাযা কী? তিনি বললেন : শিশুদের মাথার কিছু অংশ কামিয়ে কিছু অংশ রেখে দেয়া। -বুখারি ও মুসলিম।

এ ছাড়া ইবনে উমর রা. এর উপরোক্ত হাদিসটিও বিবেচ্য।

৮. পেকে যাওয়া চুল মাথার হোক বা দাড়িতে হোক রেখে দেয়া। এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান। কেননা আমর ইবনে শুয়াইব বর্ণিত হাদিসে রসূল সা. বলেছেন : পাকা চুল তোলা উচিত নয়। কেননা ওটা মুসলমানের নূর। কোনো মুসলমানের মুসলমান থাকা অবস্থায় চুল পাকলে প্রতিটি পাকা চুলের জন্য একটা সওয়াব, একটা মর্যাদা বৃদ্ধি ও একটি গুনাহ মোচন করা হবে। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা মাথা ও দাড়ি থেকে সাদা চুল তোলা অপছন্দ করতাম। -মুসলিম।

৯. পাকা চুলে মেহেদী, লাল, হলুদ ইত্যাদি রং লাগানো। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন : ইহুদী ও খৃষ্টানরা চুলে রং দেয়না। তোমরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করো। সব কটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আর আবু যর রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন : তোমাদের যৌবনে পরিবর্তিত হবার অর্থাৎ পাকা চুলকে বদলানোর সর্বোত্তম রং হলো মেহেদী ও কাতাম (কাতাম এক ধরনের তৃণ, যা রংকে লালচে কাল করে)। -পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

চুলে দাড়িতে খেযাব লাগানো মাকরূহ- এই মর্মেও হাদিস রয়েছে। মনে হয়, বয়স ও রীতি প্রথা ভেদে এটা বিভিন্ন হয়। কোনো কোনো সাহাবি বলেছেন, খেযাব (রং দেয়া) বর্জন করা উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, খেযাব করা উত্তম। তাদের কেউ কেউ হলুদ খেযাব করতেন, কেউবা মেহেন্দী ও কাতাম খেযাব লাগাতেন, কেউ বা জাফরান দিতেন। একদল কালো খেযাবও লাগাতেন। জাহেয বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে শিহাব যুহরী বলেছেন : মুখমণ্ডল যখন তরতাজা থাকতো তখন আমরা কালো খেযাব নিতাম। কিন্তু যখন চেহারা ও দাঁতের চমক অবশিষ্ট থাকতোনা তখন আমরা তা বর্জন করতাম। তবে জাবির রা. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : আবু বকর রা. এর পিতা আবু কুহাফাকে যখন মক্কা বিজয়ের দিন, রসূল সা.-এর নিকট আনা হলো, তখন তাঁর মাথার চুলে 'ছাগামা'র (সাদা) খেযাব ছিলো। রসূল সা. বললেন, ওকে তার কোনো স্ত্রীর নিকট নিয়ে যাও, সে যেনো তার চুলকে অন্য একটি রং দিয়ে পাল্টে দেয় এবং তারা তাকে কালো খেযাব লাগিযে দেয়। -বুখারি ও তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

এ হাদিস একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সংশিষ্ট, যা সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়না। তাছাড়া আবু কুহাফার ন্যায় এক ব্যক্তি, যার চুল সাদা হয়ে গেছে বার্ধক্যবশত তার চুল কালো রং এ রঞ্জিত করা শোভন নয়। কাজেই এটা বৃদ্ধ বয়েসের ব্যক্তির সাথে খাপ খায়না।

১০. মনকে আনন্দিত ও প্রফুল্ল করে এমন সুগন্ধি মাখানো। কেননা আনাস রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন : حُبِّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلَاةِ.

"পৃথিবীতে আমার নিকট প্রিয় বানোনো হয়েছে নারী ও সুগন্ধিকে, আর নামাযকে বানানো হয়েছে আমার চক্ষু শীতলকারী।" -আহমদ ও নাসায়ী।

আর আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন : যাকে কোনো সুগন্ধি দেয়া হয়, সে যেনো তা প্রত্যাখ্যান না করে। কেননা তা বহনে হাল্কা, গন্ধে উত্তম। -মুসলিম, নাসায়ী ও আবু দাউদ।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. বলেছেন : মেশক হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি। - বুখারি ও ইবনে মাজাহ ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

আর নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবনে উমর ধুপ দেয়ার কাঠ 'উলুয়া' অন্য কিছুর সাথে মিশ্রিত না করেই ব্যবহার করতেন ও নিজেকে সুরভিত করতেন। - মুসলিম ও নাসায়ী।

৪. অযু

অযু সুপরিচিত। অযু হলো পানির সাহায্যে যে পবিত্রতা অর্জিত হয় তার নাম। এ পবিত্রতার সম্পর্ক মুখমণ্ডল, দু'হাত, মাথা ও দু'পায়ের সাথে। এর আওতাভুক্ত বিষয়গুলো একে একে আলোচিত হচ্ছে :

১. অযুর শরয়ী প্রমাণ

তিনটি প্রমাণ দ্বারা শরিয়তের দৃষ্টিতে অযুর আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

প্রথম প্রমাণ : পবিত্র কুরআন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ۝

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামায পড়ার উদ্যোগ নেবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিও। তোমাদের মাথায় মুছে নিও। আর গিরে পর্যন্ত তোমাদের পা ধুয়ে নিও।" (সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত ৬)

দ্বিতীয় প্রমাণ : রসূলের সা. সুন্নাহ : আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমাদের কোনো ব্যক্তি যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন সে অযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার নামায কবুল করেননা।" -বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি।

তৃতীয় প্রমাণ : ইজমা : রসূল সা. এর আমল থেকে আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে অযুর অপরিহার্যতা সম্পর্কে পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করে আসছে। সুতরাং ইসলামে অযুর আবশ্যকতা সর্বজন বিদিত।

২. অযুর মর্যাদা ও গুরুত্ব

অযুর ফযিলত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি :

ক. আবদুল্লাহ আস-সোনাবিজী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বান্দা যখন অযু করে তখন কুলি করা মাত্র তার মুখ দিয়ে গুনাহগুলো বের হয়ে যায়। তারপর যখন নাকে পানি দেয় তখন তার নাক দিয়ে গুনাহগুলো বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে মুখ ধোয়, তখন গুনাহগুলো তার মুখমণ্ডল থেকে বের হয়ে যায়। এমনকি তা তার চোখের পলকের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার দু'হাত ধোয়, তখন গুনাহগুলো তার হাত দিয়ে বের হয়ে যায়। এমনকি তার হাতের নখ দিয়েও বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে মাথা মাসেহ করে, তখন গুনাহগুলো তার মাথা থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু'কান থেকেও বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার পা দু'খানা ধোয়, তখন গুনাহগুলো তার দু'পা দিয়ে বের হয়ে যায়। এমনকি তা তার দু'পায়ের নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। তারপর তার মসজিদে গমন ও নামায পড়া একটা অতিরিক্ত কল্যাণময়। (অর্থাৎ অযুর পর তার গুনাহ আর অবশিষ্ট থাকেনা যে, নামায দ্বারা অবশিষ্ট গুনাহ মাফ করার প্রয়োজন হবে।) -মালেক, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকেম।

খ. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মানুষের ভেতরে বিদ্যমান প্রতিটি ভালো গুণ দ্বারা আল্লাহ তার যাবতীয় কাজ সংশোধন করে থাকেন। তবে নামাযের জন্য তার পবিত্রতা অর্জন এমন ভালো গুণ, যার দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করেন। এরপর তার নামাযটা তার জন্য অতিরিক্ত হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। -আবু ইয়া'লা, বাযযার, তাবারানি।

গ. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ কিসের দ্বারা গুনাহ মোচন করেন এবং কিসের দ্বারা মর্যাদা বাড়ান- তা কি আমি তোমাদের বলবো? লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, বলুন। তিনি বললেন : কষ্টকর অবস্থার মধ্যদিয়েও ভালোভাবে অযু করা। মসজিদের দিকে বেশি বেশি করে পা ফেলা এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটা হলো রিবাত, এটা হলো রিবাত এটা হলো রিবাত।[৬] -মালেক, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী।

ঘ. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. কবরস্থানে এলেন। তারপর বললেন : হে মুমিনদের ঘরে অবস্থানকারী লোকেরা, তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ চাহেন তো আমরা

---

৬. রিবাত অর্থ আল্লাহর পথে জিহাদ। অর্থাৎ সদাসর্বদা অযু করা ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে ইবাদত করা আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতুল্য।

শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমার বড়ই ইচ্ছা হয়, যদি আমাদের ভাইদের দেখতে পেতাম! লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন : তোমরা আমার সাথি। আর আমার ভাই হলো তারা যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, আপনার উম্মতের যারা এখনো আসেনি, তাদের আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন : ভেবে দেখেছ কি, এক ঝাঁক কালো ঘোড়ার মধ্যে যদি কারো এক পাল সাদা ঘোড়া থাকে, তবে সে কি তার ঘোড়াগুলোকে চিনতে পারবেনা? লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, পারবে। তিনি বললেন : আমার উম্মতের সেই ভাইয়েরা অযুর কারণে উজ্জ্বল অংগ প্রত্যংগ নিয়ে আসবে, আমি হাউজে (সুপেয় পানির পুকুর) তাদের কাছে এগিয়ে নিয়ে আসবো। সাবধান, বহু লোককে আমার হাউজ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে যেমন পথহারা উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমি ডেকে বলবো : ওহে এসো। আমাকে বলা হবে, ওরা আপনার পরে আপনার নীতি বিকৃত করে ফেলেছে। তখন আমি বলবো : দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। -মুসলিম।

৩. অযুর ফরযসমূহ

অযুর কিছু ফরয ও রুকন (অপরিহার্য স্তম্ভ) রয়েছে, যেগুলো দ্বারা অযুর মূল কাঠামো তৈরি হয়। এর কোনো একটি ফরয বাদ পড়লে অযু বাস্তবায়িত হয়না এবং শরিয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হয়না। সেগুলো হলো :

প্রথম ফরয : নিয়ত : নিয়ত হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছা, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এটা মনের একটা কাজ। এতে জিহ্বার কোনো ভূমিকা নেই। এ সংকল্পকে মুখে উচ্চারণ করতে হবে- এমন কোনো বিধান শরিয়ত প্রবর্তন করেনি। এর ফরয হওয়ার প্রমাণ উমর রা. এর হাদিস :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "নিয়ত দ্বারাই আমল সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক মানুষ যা নিয়ত করবে, তাই পাবে।" -সহীহ বুখারি।

দ্বিতীয় ফরয : একবার মুখ ধোয়া : অর্থাৎ সমগ্র মুখমণ্ডলে পানি প্রবাহিত করা। কেননা ধোয়া বলতে পানি প্রবাহিত করাই বুঝায়। মুখমণ্ডলের সীমা হলো কপালের সর্বোচ্চ অংশ থেকে চোয়ালের সর্বনিম্ন অংশ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে, আর এক কানের লতি থেকে আর এক কানের লতি পর্যন্ত প্রস্থে।

তৃতীয় ফরয : কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া : হাতের মধ্যস্থলের গ্রন্থিকে কনুই বলা হয়। অযুতে হাতের যেটুকু ধোয়া অপরিহার্য, কনুই তার অন্তর্ভুক্ত। এটা রসূল সা. এর রেখে যাওয়া ঐতিহ্য। তিনি কনুই না ধুয়ে কখনো অযু করেছেন এটা কোথাও বর্ণিত হয়নি।

চতুর্থ ফরয : মাথা মাসেহ করা অর্থাৎ মোছা : মাসেহ হলো ভিজে হাতে স্পর্শ করার নাম। মাসেহকারী অংগটিকে মাসেহকৃত অংগের সাথে যুক্ত করে নাড়ানো বা চালিত করা ছাড়া মাসেহ কার্যসম্পন্ন হতে পারেনা। তাই হাত বা আংগুলকে মাথা বা অন্য কোথাও রেখে দিলেই তাকে মাসেহ বলা যায়না। আল্লাহ তায়ালার উক্তি : "মাথায় মাসেহ করো" দৃশ্যত: সমগ্র মাথা মাসেহ করার বাধ্যবাধকতা বুঝায়না, বরং এ দ্বারা বুঝায় মাথার অংশ বিশেষ মাসেহ করাই হুকুম পালনের জন্য যথেষ্ট। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সা. এর কাছ থেকে, তিনটি নিয়ম সংরক্ষিত হয়েছে :

ক. পুরো মাথা মাসেহ করা : আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে- "রসূলুল্লাহ সা. তাঁর উভয় হাত দিয়ে নিজের মাথা মাসেহ করলেন। একবার সামনের দিকে আর একবার পেছনের দিকে টেনে নিলেন। প্রথমে মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করলেন, অতপর হাত দু'খানা মাথার পেছনের দিকে টেনে নিয়ে গেলেন, অতপর পুনরায় হাত দুখানা সেই জায়গায় ফিরিয়ে আনলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। -সব কটি হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত।

খ. শুধুমাত্র পাগড়ির উপর মাসেহ করা : আমর ইবনে উমাইয়া বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে তাঁর পাগড়ি ও মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। -আহমদ, বুখারি ও ইবনে মাজাহ। আর বিলাল বলেন : রসূল সা. বলেছেন : তোমরা মোজার উপর ও মাথার উপর রক্ষিত খিমারের উপর (পাগড়ি বা অন্য কোনো কাপড়) মাসেহ করো। -আহমদ। আর উমর রা. বলেছেন : পাগড়ির উপর মাসেহ যাকে পবিত্র করেনা, আল্লাহ তাকে যেনো পবিত্র না করেন। বুখারি মুসলিম ও অন্যান্য ইমামগণ এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। আলেমদের মধ্যে অনেকে তদনুসারে আমলও করেছেন বলে জানা যায়।

গ. কপালে ও পাগড়ির উপরে মাসেহ করা। মুগিরা ইবনে শু'বা রা. বর্ণিত হাদিসে আছে : "রসূলুল্লাহ সা. অযু করলেন এবং নিজের কপাল, পাগড়ি ও মোজার উপরে মাসেহ করলেন। -মুসলিম।

এটাই রসূল সা. থেকে সংরক্ষিত হয়েছে। মাথার অংশ বিশেষের উপর মাসেহ তাঁর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত নেই- যদিও আয়াতের বাহ্যিক ভাষা সেটাই দাবি করে। ঠিক মাথা বরাবর থেকে, বাইরে ঝুলে থাকা চুলের উপর মাসেহ করা যথেষ্ট হবেনা- যেমন খোপার উপর যথেষ্ট হবেনা।

পঞ্চম ফরয : গিরেসহ পা ধোয়া : রসূল সা. এর কথা ও কাজ থেকে এটাই প্রমাণিত এবং সকল সাহাবি ও বর্ণনাকারীর মাধ্যমে একথা সংরক্ষিত হয়ে এসেছে।

ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. একবার এক সফরে আমাদের থেকে পেছনে পড়ে গেলেন। একটু পরে যখন আমাদের কাছে এসে পৌঁছুলেন, তখন আসরের ওয়াক্ত বিলম্বিত হয়ে গেছে। তাই আমরা অযু করতে লাগলাম এবং আমাদের পায়ে মাসেহ করতে লাগলাম। তখন রসূল সা. সুউচ্চ কণ্ঠে দু'বার বা তিনবার বললেন : "খবরদার, গিরেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাও।" -বুখারি ও মুসলিম।

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেছেন : রসূল সা. এর সাহাবিগণ পায়ের গিরে দুটো ধোয়া জরুরি- এ মর্মে একমত হয়েছেন। উপরোক্ত ফরযগুলো সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। আয়াতটি উপরে উল্লেখ হয়েছে।

৬ষ্ঠ ফরয : ধারাবাহিকতা : আল্লাহ তায়ালা অযুর ফরযগুলোকে উক্ত আয়াতে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে, হাত ও পায়ের ব্যাপারে ফরয হলো ধোয়া। অথচ এ দুটোর মাঝখানে মাথার উল্লেখ করেছেন, যার ব্যাপারে ফরয হলো মাসেহ করা। আরবদের রীতি হলো, কোনো প্রয়োজন বা সার্থকতা ছাড়া তারা একই ধরনের দুটো জিনিসের মাঝখানে তৃতীয় জিনিসের উল্লেখ করেনা। এখানে এই সার্থকতা ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। আয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জরুরি করণীয় কাজ বর্ণনা করা। আর যেহেতু সহীহ হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. সাধারণভাবে বলেছেন : "আল্লাহ যেভাবে শুরু করেছেন তোমরা সেভাবে শুরু করো।" অযুর ফরযগুলোর মধ্যে এই বাস্তব ধারাবাহিকতাই ক্রমাগতভাবে চলে আসছে। রসূল সা. এই ধারাবাহিকতা ছাড়া অযু করেছেন- এমন কথা কেউ কখনো বলেনি। অযু হলো একটা ইবাদত। আর প্রত্যেক ইবাদতেরই গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে দ্বিধাহীন চিত্তে তার আনুগত্যের উপর।

সুতরাং রসূল সা. এর অযুর যে পদ্ধতি চিরন্তনভাবে ও সর্বসম্মতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে, তার বিপরীত করার অধিকার কারো নেই।

৪. অযুর সুন্নতসমূহ

সুন্নত হলো যে সমস্ত কাজ, কথা ও রীতি রসূল সা. থেকে সঠিক বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত এবং যেগুলো বাধ্যতামূলকও নয় আর যে ব্যক্তি এগুলো বর্জন করে তার প্রতি কোনো অসন্তোষও প্রকাশ করা হয়নি। এসব সুন্নতের বিবরণ নিম্নরূপ :

১. শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা : অযুর জন্য বিমসিল্লাহ বলার পক্ষে কিছু দুর্বল হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে সেগুলো একত্রিত হয়ে তাতে যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করে এবং প্রমাণ করে যে, এগুলোর একটা ভিত্তি আছে। তাছাড়া এটা মূলত একটা ভালো কাজ এবং সামগ্রিক বিবেচনায় এটা শরিয়ত সম্মত কাজ।

২. মেসওয়াক করা : এ দ্বারা যে গাছের ডাল দিয়ে সচরাচর দাঁত পরিষ্কার করা হয়, তা ব্যবহারপূর্বক দাঁত পরিষ্কার করাও বুঝায়, আবার শুধু উক্ত গাছের ডাল বা অনুরূপ এমন যে কোনো শক্ত জিনিস দ্বারা দাঁত মাজাকেও বুঝায়, যা দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা হয়। সবচেয়ে ভালো মেসওয়াক হলো হেজায থেকে আমদানি করা, 'আরাক' গাছের ডাল। কেননা এটা দাঁতের গোঁড়া শক্ত করে, দাঁতের রোগ প্রতিরোধ করে, হযম শক্তি বাড়ায় ও পেশাবের বাধা দূর করে। অবশ্য ব্রাশ জাতীয় এমন যে কোনো জিনিস দ্বারাও সুন্নত আদায় হয়ে যায়, যা দাঁতের হলুদ রং দূর করে এবং মুখকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার উম্মতের অত্যধিক কষ্ট হবে- এ আশংকা যদি আমি বোধ না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক অযুতে মেসওয়াক করার আদেশ দিতাম। -মালেক, শাফেয়ী, বায়হাকি, হাকেম।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মেসওয়াক করলে মুখ পবিত্র হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। -আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযি। বস্তুত মেসওয়াক করা সব সময়ই মুস্তাহাব। কিন্তু পাঁচটি সময়ে অধিকতর মুস্তাহাব :

১. অযুর সময় ২. নামাযের পূর্বে ৩. কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে ৪. ঘুম থেকে জেগে উঠে ৫. মুখের অবস্থার পরিবর্তন হলে। কেউ রোযাদার হোক বা অ-রোযাদার হোক, দিনের প্রথম ভাগে বা শেষ ভাগে সমভাবে মেসওয়াক করতে পারে। কেননা আমের ইবনে রবীয়া রা. বলেছেন : "আমি রসূল সা. কে অগণিত বার রোযাদার অবস্থায় মেসওয়াক করতে দেখেছি।" -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি।

আর পরিচ্ছন্নতার খাতিরে প্রতিবার মেসওয়াক ব্যবহারের পর তা ধুয়ে ফেলা সুন্নত। কেননা আয়েশা রা. বলেছেন : "রসূল সা. মেসওয়াক করতেন। আর মেসওয়াক করার পর আমাকে মেসওয়াকটি দিতেন যেনো আমি তা ধুয়ে রাখি। অতপর আমি তা দিয়ে আবার মেসওয়াক করে আবার ধুয়ে রাখতাম এবং তা তাঁকে দিতাম।" -আবু দাউদ, বায়হাকি।

যার দাঁত নেই, তার জন্য শুধু আংগুল দিয়ে দাঁত মেজে ফেলা সুন্নত। কেননা আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, "তিনি বললেন : হে রসূলুল্লাহ, যার দাঁত পড়ে গেছে, সেও কি মেসওয়াক করবে? তিনি বললেন : হাঁ। আমি বললাম : কিভাবে করবে? তিনি বললেন : নিজের আংগুল মুখে ঢুকিয়ে। -তাবারানি।

৩. অযুর শুরুতে তিনবার হাতের তালু ধোয়া : আওস বিন আওস সাকাফী বলেছেন : আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ সা. অযু করলেন এবং তিনবার হাতের তালু ধুলেন। -আহমদ, নাসায়ী।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন তার হাত তিনবার না ধুয়ে যেনো পানির পাত্রে না ডুবায়, কারণ সে জানেনা তার হাত রাত্রে কোথায় ছিলো।" -সব কটি হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত। তবে বুখারি হাত ধোয়ার সংখ্যা উল্লেখ করেনি।

৪. তিনবার কুলি করা : লাকীত বিন সাবেরা রা. বলেন : "রসূল সা. বলেছেন, তুমি যখন অযু করবে, তখন কুলি করো।" -আবু দাউদ, বায়হাকি।

৫. নাকে পানি দেয়া ও নাক সাফ করা : আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন অযু করে, তখন সে যেনো তার নাকে পানি দেয়, অতপর নাক পরিষ্কার করে।" -বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ।

সুন্নত হলো, নাকে ডান হাত দিয়ে পানি দেবে এবং বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে। আলী রা. এর হাদিসে রয়েছে : "তিনি (আলী) অযুর পানি আনতে বললেন, অতপর কুলি করলেন, তারপর নাকে পানি দিলেন ও বাম হাত দিয়ে নাক সাফ করলেন। এ রকম তিনবার করলেন। তারপর বললেন : এ হচ্ছে আল্লাহর নবী সা. এর পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি। -আহমদ, নাসায়ী।

আর যখন কোনোভাবে নাক ও মুখ পর্যন্ত পানি পৌঁছে যাবে, তখন কুলি ও নাকে পানি দেয়ার কাজ আপনা থেকেই সম্পন্ন হয়ে উভয় সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তবে রসূল সা. থেকে বিশুদ্ধভাবে এটাই প্রমাণিত যে, তিনি এ কাজ দু'টি সংযুক্তভাবে (অর্থাৎ কুলির অব্যবহিত পর নাকে পানি দেয়া) সম্পন্ন করতো। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত : "রসূল সা. তিন মুষ্টি পানি দিয়ে কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন।" -বুখারি, মুসলিম।

যে রোযাদার নয়, তার জন্য সুন্নত হলো খুব ভালো করে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া। লাকীত রা. বর্ণিত হাদিসে আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আমাকে অযুর নিয়ম শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন : ভালোভাবে অযু করো, আংগুলের মাঝে খিলাল করো (অর্থাৎ পানি পৌঁছাও) এবং খুব ভালোভাবে নাকে পানি দাও। তবে রোযাদার হলে তা করোনা। -পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত। তিরমিযি এটিকে সহীহ বলেছে।

৬. দাড়ি খিলাল করা : উসমান রা. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. দাড়ি খিলাল করতেন। -ইবনে মাজাহ, তিরমিযি।

আর আনাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন অযু করতেন, তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তার তাঁর চোয়ালে ঢুকিয়ে দিতেন এবং তা দিয়ে খিলাল করতেন। আর বলতেন : আমার প্রতিপালক এভাবেই আমাকে আদেশ দিয়েছেন। -আবু দাউদ, বায়হাকি, হাকেম।

৭. আংগুলের মধ্যে খিলাল করা : ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তুমি অযু করবে, তখন তোমার দু'হাত ও দু'পায়ের আংগুলের মাঝখানে খিলাল করবে। (আংগুল ঢুকিয়ে মর্দনপূর্বক ধুয়ে ফেলা) -আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ।

মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ রা. থেকে বর্ণিত : আমি রসূল সা. কে তাঁর কনিষ্ঠ আংগুল দিয়ে দু'পায়ের আংগুলগুলোকে খিলাল করতে দেখেছি। -আহমদ ব্যতিত পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ বর্ণিত। কিছু কিছু হাদিস থেকে আংটি, চুড়ি, কঙ্কন ইত্যাদি নাড়ানো মুস্তাহাব বলে জানা যায়। তবে সে হাদিসগুলো সহীহ নয়। তথাপি উত্তমরূপে অযু করার আদেশের আওতায় পড়ে বিধায় সেই হাদিসগুলোর উপর আমল করা ভালো।

৮. তিনবার করে ধোয়া : এটা সেই সুন্নত, যা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। এর বিপরীত যেসব হাদিস আছে, তা শুধু বৈধতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন আমার বিন

শুয়াইবের দাদা বলেছেন : জনৈক বেদুঈন রসূল সা. এর কাছে এলো এবং অযুর নিয়ম জিজ্ঞাসা করলো। রসূল সা. তাকে তিনবার করে দেখালেন এবং বললেন : এ হচ্ছে অযু। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি করবে, সে অন্যায় করবে, বাড়াবাড়ি করবে ও যুলুম করবে। -আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

আর উসমান রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তিনবার তিনবার করে অযু সম্পন্ন করেছেন। -আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি।

সহীহ হাদিস থেকে এও প্রমাণিত, তিনি একবার একবার করে ও দু'বার দু'বার করে অযু সম্পন্ন করেছেন। তবে মাথা মাসেহ একবারই করেছেন। এটাই অধিক বর্ণিত।

৯. ডান দিক থেকে শুরু করা : অর্থাৎ দু'হাত ও দু'পা ধোয়ার সময় বাম হাত ও বাম পার আগে ডান হাত ও ডান পা ধোয়ার মাধ্যমে শুরু করা। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন ও সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। -বুখারি ও মুসলিম।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমরা অযু করবে ও পোশাক পরবে, তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী।

১০. মর্দন : কোনো অংগের উপর পানি দিয়ে বা পানি ব্যবহারের পর হাত চালানো। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. এর নিকট এক মুদের এক তৃতীয়াংশ পানি আনা হলো। তিনি অযু করলেন, অতপর তার বাহু দুটি মর্দন করতে লাগলেন। -ইবনে খুযায়মা।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে অপর এক রেওয়ায়েত এরূপ : রসূল সা. অযু করলেন, তারপর বলতে লাগলেন : এভাবে মর্দন করতে হয়। -আবু দাউদ, তায়ালিসী, আহমদ, ইবনে হিব্বান, আবু ইয়ালা।

১১. বিরতিহীন প্রক্রিয়া : অর্থাৎ একটা অংগ ধৌত করার পর বিরতিহীনভাবে অপর অংগ ধৌত করা, যেনো অযুকারী অযুর মাঝখানে অন্য এমন কোনো কাজ করে অযু বন্ধ করে না দেয়, যার দরুন সে অযু বর্জন করেছে বলে মনে করা হয়। অযু করার এরূপ বিরতিহীন প্রক্রিয়াই ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে চালু রয়েছে এবং মুসলমানগণ এই নিয়মই অনুসরণ করে আসছেন।

১২. দু'কান মাসেহ করা : সুন্নত হলো তর্জনী আংগুল দিয়ে কানের ভেতরে ও বুড়ো আংগুল দিয়ে কানের বাইরে মাথা মাসেহ করার অবশিষ্ট পানি দিয়ে মাসেহ করা। কেননা কান মাথারই অংশ। মিকদাম ইবনে মাদীকারাব রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. অযুর সময় তাঁর মাথা ও উভয় কানের ভেতর ও বাহির মাসেহ করলেন এবং তার দু' আংগুলকে তার কানের গহ্বরে প্রবেশ করালেন। -আবু দাউদ ও তাহাবি।

ইবনে আব্বাস রা. রসূল সা. এর অযুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন : তিনি তার মাথা ও দু'কান এক সাথেই মাসেহ করলেন। -আহমদ ও আবু দাউদ।

অন্য রেওয়ায়েতে রয়েছে : তিনি তার মাথা ও কানের অভ্যন্তরে উভয় তর্জনী দিয়ে এবং উভয় কানের বাইরে বুড়ো আংগুল দিয়ে মাসেহ করলেন।

১৩. ললাটের ও হাত পায়ের শুভ্রতা দীর্ঘায়িত করা : ললাটের শুভ্রতা দীর্ঘতর করার উপায় হলো মাথার সামনের এমন একটা অংশ ধৌত করা, যা মুখমণ্ডল ধৌত করার ফরয অংশের অতিরিক্ত। আর হাত-পায়ের শুভ্রতা দীর্ঘতর করার পন্থা হলো কনুই ও পায়ের গিরের উপর খানিকটা অংশ ধৌত করা। কেননা আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদিসে আছে : রসূলুল্লাহ সা.

বলেছেন : আমার উম্মত কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে, তাদের মুখমণ্ডল ও হাত পা অযুর আলামত হিসেবে উজ্জ্বল শুভ্র থাকবে।[৭] আবু হুরায়রা বলেছেন : সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার শুভ্রতা দীর্ঘতর করতে পারে সে যেনো তা করে। -আহমদ, বুখারি ও মুসলিম।

আবু যারআ' থেকে বর্ণিত : "আবু হুরায়রা অযুর পানি আনতে আদেশ দিলেন, অতপর অযু করলেন এবং হাত এমনভাবে ধুলেন যে, কনুই ছাড়িয়ে গেলো। তারপর যখন পা ধুলেন, তখন পায়ের গিরে ছাড়িয়ে খোড়া পর্যন্ত ধুলেন। আমি বললাম : এটা কী? তিনি বললেন : এটা হচ্ছে শুভ্রতার শেষ সীমা। -আহমদ।

১৪. যথাসাধ্য কম পানি ব্যবহার করা উচিত- যদিও সমুদ্র থেকে কোষ ভরে পানি নেয়া হয় : কারণ আনাস রা. বর্ণিত হাদিসে আছে : "রসূলুল্লাহ সা. এক 'সা'[৮] থেকে পাঁচ 'মুদ' পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক 'মুদ' দিয়ে অযু করতেন। -বুখারি ও মুসলিম।

আর উবাইদুল্লাহ ইবনে আবি ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত : "এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রা. কে বললো : কতোটুকু পানি আমার অযুর জন্য যথেষ্ট? তিনি বললেন : এক মুদ। সে বললো : গোসলের জন্য কতোটুকু পানি যথেষ্ট? তিনি বললেন : এক সা। লোকটি বললো : এটা আমার জন্য যথেষ্ট হবেনা। ইবনে আব্বাস বললেন : তোমার কোনো মা নেই! (মৃদু ভর্ৎসনামূলক প্রবাদ বাক্য) তোমার চেয়ে যিনি উত্তম সেই রসূল সা.-এর জন্যও এটা যথেষ্ট হয়েছিল। -আহমদ, বাযযার, তাবারানি।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. সা'দের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সা'দ তখন অযু করছিলেন। তিনি বললেন : এই অপচয়ের কারণ কী হে সা'দ? সা'দ বললেন : পানিতেও অপচয় হয় নাকি? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হাঁ, প্রবহমান নদীতেও যদি অযু করো তাহলেও (অপচয় হতে পারে।) -আহমদ, ইবনে মাজাহ।

শরিয়ত সম্মত প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলেই তা অপচয় গণ্য হবে, যেমন তিনবারের বেশি ধোয়া।

আমর বিন শুয়াইব বর্ণিত হাদিসে আছে : জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এলো এবং তাঁকে অযুর নিয়ম জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তাকে তিনবার করে ধোয়া দেখালেন। তারপর বললেন : এ হলো অযু। যে ব্যক্তি এরচেয়ে বেশি করবে সে অন্যায় করবে, বাড়াবাড়ি করবে ও যুলুম করবে। -আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা।

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি : এই উম্মতে অচিরেই এমন কিছু লোক আবির্ভূত হবে, যারা পবিত্রতা ও দোয়ায় বাড়াবাড়ি করবে। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। ইমাম বুখারি বলেছেন : অযুর পানিতে রসূল সা. এর কাজ দ্বারা সাব্যস্ত পরিমাণ অতিক্রম করাকে আলেমগণ অপছন্দ করেছেন।

১৫. অযুর মাঝে দোয়া : একমাত্র আবু মূসা আশআরী রা. বর্ণিত হাদিস ব্যতিত রসূল সা. থেকে অযুর আর কোনো দোয়া প্রমাণিত হয়নি। আবু মূসা রা. বলেন : রসূল সা. কে অযুর পানি এনে দিলাম। তিনি অযু করলেন। তখন শুনলাম, তিনি দোয়া করছেন :

---

৭. উম্মতের মুখমণ্ডল ও হাত পা উজ্জ্বল শুভ্র থাকবে এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার অর্থ হলো, তাদের মুখমণ্ডল ও হাত পা আলোয় উদ্ভাসিত ও জ্যোতির্ময় হবে, এগুলো থেকে আলো ঠিকরে বেরুবে। আর এটা হবে এ উম্মতের বিশেষ আলামত ও বৈশিষ্ট্য।

৮. চার মুদে এক সা' এবং ১২৮ দিরহাম ও এক দিরহামের চার সপ্তমাংশের কিঞ্চিৎ বেশিতে এক মুদ হয়।

"হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করে দাও, আমার গৃহে প্রশস্ততা দাও এবং আমার জীবিকায় বরকত দাও।" আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমি আপনাকে এই শব্দাবলী দ্বারা দোয়া করতে শুনলাম। তিনি বললেন : এই শব্দাবলী কি কিছু বাদ রেখেছে? -নাসায়ী ও ইবনুস সুন্নি সহীহ সনদে। তবে নাসায়ী এ হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে : "অযুর শেষে যা বলতে হবে"। আর ইবনুস্ সুন্নির শিরোনাম হলো : "অযুর ভেতরে যা বলতে হয়।" নববী বলেছেন : উভয় শিরোনামই যথার্থ হতে পারে।

১৬. অযুর পরের দোয়া : উমর রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ উত্তমরূপে অযু করার পর বলবে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সা. তার বান্দা ও রসূল।" তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। তন্মধ্যে সে যেটি দিয়ে প্রবেশ করতে চায় করবে। -মুসলিম।

আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি অযু করার পর বলবে :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই। তোমার কাছে ক্ষমা চাই ও তওবা করি।" তার এই দোয়া প্রথমে একটি সাদা কাগজের ফলকে লেখা হবে, তারপর একটি সিলমোহরে সংরক্ষিত করা করা হবে। তারপর আর কেয়ামত পর্যন্ত তা ভাংবেনা। -তাবারানি, নাসায়ী। নাসায়ীর রেওয়ায়েতের শেষে বলা হয়েছে : "তার উপর সিল মেরে আরশের নিচে রাখা হবে। অতপর কেয়ামত পর্যন্ত তা আর ভাংবেনা।"

তিরমিযিতে কিঞ্চিৎ দুর্বল সনদে এই দোয়াটিও বর্ণিত হয়েছে : "হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।"

১৭. অযুর পরে দু'রাকাত নামায পড়া : আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বিলালকে বললেন : হে বিলাল, তুমি ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে বেশি আশাপ্রদ যে নেক কাজটি করেছো, তা আমাকে বলো। আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। তিনি বললেন : আমি দিনে বা রাতে যখনই পবিত্রতা অর্জনের কোনো কাজ করেছি, তখন সেই পবিত্রতা নিয়ে যতোটা আমার ভাগ্যে জুটেছে নামায পড়েছি। এরচেয়ে বেশি আশাপ্রদ কোনো নেক কাজ করিনি। -বুখারি, মুসলিম।

উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর একান্ত মনোযোগ সহকারে দু'রাকাত নামায পড়বে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। -মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে খুযায়মা।

উসমান রা. এর স্বাধীনকৃত গোলাম খুমরান থেকে বর্ণিত : তিনি উসমান রা. কে দেখলেন অযুর পানি আনতে বললেন। তারপর পাত্র থেকে কিছু পানি নিজের ডান হাতে ঢেলে হাতটি তিনবার ধুলেন, তারপর তার ডান হাত অযুর পানিতে ঢুকালেন, তারপর তিনবার কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, নাক সাফ করলেন ও মুখ ধুলেন। তারপর বললেন : আমি রসূল সা. কে আমার এই অযুর মতো অযু করতে দেখেছি। যে ব্যক্তি আমার এই অযুর মতো অযু করবে, তারপর দু'রাকাত নামায পড়বে, এই সময়ে নিজের মনে মনে কোনো কথা বলবেনা। তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। -বুখারি, মুসলিম ইত্যাদি।

এছাড়া চোখের পাতা ও মুখমণ্ডলের ভাজ মর্দন, আংটি নাড়ানো, ঘাড় মাসেহ করা, এসবের উল্লেখ করলামনা। কারণ এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো সহীহর পর্যায়ভুক্ত নয়। তবে পরিচ্ছন্নতাকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে এ কাজগুলো করা হয়ে থাকে।

৫. অযুর মাকরূহসমূহ

উপরোক্ত সুন্নতগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি ত্যাগ করা অযুকারীর জন্য মাকরূহ। এতে সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে পারে। কেননা মাকরূহ কাজ করা সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর সুন্নত তরক করাই মাকরূহের সমার্থক।

৬. অযু ভঙ্গের কারণসমূহ

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় এবং যে কাজের উদ্দেশ্যে অযু করা হয়েছে সে কাজ করা অবৈধ হয়ে যায়, সেগুলো নিম্নরূপ :

১. পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে যে কোনো জিনিস নির্গত হওয়া, যেমন :

ক. পেশাব,

খ. মল।

আল্লাহ বলেন : "অথবা তোমাদের কেউ যদি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে আসে।" এ কথা দ্বারা পেশাব ও পায়খানা দুটোই বুঝানো হয়েছে।

গ. মলদ্বার থেকে নির্গত বায়ু।

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমাদের কেউ যখন নাপাক হয়, তখন অযু না করা পর্যন্ত তার নামায আল্লাহ কবুল করেননা।" হাজরামাউত থেকে আগত এক ব্যক্তি বললো : নাপাক হওয়ার অর্থ কী হে আবু হুরায়রা? তিনি বললেন : 'বায়ু নি:সরণ।' -বুখারি ও মুসলিম।

আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন পেটে কিছু অনুভব করে কিন্তু পেট থেকে কিছু বের হয়েছে কিনা বুঝতে পারেনা, তখন সে যেনো কিছুতেই মসজিদ থেকে বের না হয়, যতোক্ষণ না কোনো শব্দ শুনতে পায় অথবা দুর্গন্ধ টের পায়। -মুসলিম।

প্রকৃতপক্ষে শব্দ শোনা বা গন্ধ পাওয়া শর্ত নয়। এ দ্বারা পেট থেকে কিছু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াই বুঝানো হয়েছে।

ঘ. ঙ. চ. মনি (বীর্য), মযি ও ওদি নির্গমন :

রসূলুল্লাহ সা. মযি সম্পর্কে বলেছেন : "এতে অযু করা লাগবে।" আর মনি সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : মনি নির্গত হলে গোসল করতেই হবে। তবে মযি ও ওদি সম্পর্কে তিনি বলেছেন : তোমার গুপ্তাংগ ধুয়ে ফেলো এবং নামাযের জন্য অযু করো। -বায়হাকি।

২. এমন ঘুম যাতে চেতনা থাকেনা এবং যথাস্থানে বসেও থাকতে পারেনা। সাফওয়ান বিন আসসাল রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে সফরে থাকা অবস্থায় আদেশ দিতেন যেনো 'জানাবাত' (বৃহত্তর অপবিত্রতা) ব্যতিত মোজা না খুলি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত। তবে পেশাব, পায়খানা ও ঘুমের কারণে খোলা যায়। -আহমদ, নাসায়ী ও তিরমিযি। তাই যখন কেউ বসে বসে ঘুমায় এবং যথাস্থানে বসে থাকতে সক্ষম হয়। তখন তার অযু নষ্ট হবেনা। আনাস রা.-এর এ হাদিসটি থেকেও একই কথা বুঝা যায়। তিনি বলেন : রসূল সা. এর সাহাবিগণ রাতের শেষ ভাগে এশার নামায পড়ার জন্য অপেক্ষায় থাকতে থাকতে তাদের মাথা

ঢুলে পড়তো, তারপর অযু না করেই নামায পড়তেন। -শাফেয়ী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি।
শু'বার সূত্রে বর্ণিত হাদিসে তিরমিযির ভাষা এরূপ : আমি রসূলের সাহাবিদেরকে দেখেছি, নামাযের জন্য তাদেরকে জাগানো হতো, এমনকি তাদের কারো কারো নাক ডাকানিও শুনতাম, তারপর তারা উঠে নামায পড়তেন, অযু করতেননা। ইবনুল মুবারক বলেছেন আমাদের মতে তারা তখন বসা অবস্থায় থাকতেন।

৩. সংজ্ঞা লোপ পাওয়া : চাই এটা মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে ঘটুক, অজ্ঞান হওয়ার কারণে ঘটুক, মাতাল হওয়ার কারণে হোক, কিংবা কোনো ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ঘটুক, চাই অল্প হোক বা বেশি হোক এবং চাই যথা স্থানে বসে থাকতে পারুক বা না পারুক। কেননা এসব কারণে যে সংজ্ঞাহীনতা ঘটে, তা ঘুমের চেয়ে অনেক বেশি। এর উপর আলেমগণ একমত।

৪. আবরণ ছাড়াই গুপ্তাংগ স্পর্শ করা : বুস্‌রা বিনতে সাফওয়ান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গুপ্তাংগ স্পর্শ করেছে, সে যেনো অযু না করা পর্যন্ত নামায না পড়ে। -পাঁচটি সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত। তিরমিযি এটিকে সহীহ বলেছেন। বুখারি বলেছেন, এটি এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ্ হাদিস। মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখও এটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ বলেছেন : আমি ইমাম আহমদকে বললাম : বুস্‌রার হাদিসটি সহীহ নয়। তিনি বললেন : অবশ্যই ওটা সহীহ। আহমদ ও নাসায়ীতে বুস্‌রা থেকে বর্ণিত : তিনি রসূল সা. কে বলতে শুনেছেন : "যৌনাংগ স্পর্শ করলে অযু করতে হবে।" নিজের যৌনাংগ ও অপরের যৌনাংগ উভয়ই এর আওতাভুক্ত। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো আবরণ ছাড়াই হাত দিয়ে যৌনাংগ স্পর্শ করলো, তার জন্য অযু করা ওয়াজিব। -আহমদ, ইবনে হিব্বান, হাকেম। হাকেম ও ইবনে আবদুল বার এটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনুস্ সাকান বলেছেন : এ অধ্যায়ে এটিই সবচেয়ে সহীহ হাদিস। ইমাম শাফেয়ীর হাদিসের ভাষা হলো : তোমাদের কেউ যখন এমন অবস্থায় যৌনাংগে হাত দেয় যে, হাত ও যৌনাংগের মাঝে কোনো আবরণ নেই, তখন তার অযু করা জরুরি। আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে ও তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন : যে কোনো পুরুষ নিজের গুপ্তাংগ স্পর্শ করুক এবং যে কোনো নারী নিজের গুপ্তাংগ স্পর্শ করুক, উভয়কে অযু করতে হবে। -আহমদ। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন : হাযেমীর মতে এটি সহীহ্ বর্ণনা। একটি বিশুদ্ধ হাদিসের ভিত্তিতে হানাফীদের মত হলো, গুপ্তাংগ স্পর্শ করলে অযু ভংগ হয়না। হাদিসটি হলো : এক ব্যক্তি রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলো : "এক ব্যক্তি নিজের পুরুষাংগ স্পর্শ করলো। তার কি অযু করতে হবে? তিনি বললেন : না। ওটা তো তোমারই একটা অংশ।" -পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত। ইবনে হিব্বান এটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনুল মদিনী বলেছেন : এটি বুস্‌রার হাদিসের চেয়ে উত্তম।*

৭. যে সমস্ত কারণে অযু ভঙ্গ হয়না

সেই কারণগুলো উল্লেখ করা সমীচীন মনে হচ্ছে, যেগুলোকে অযু ভংগকারী বলে মনে করা হয়, অথচ সেগুলো অযু ভংগকারী নয়। কেননা সেগুলোর সপক্ষে কোনো নির্ভুল প্রমাণ নেই। সেগুলো নিম্নরূপ :

---

*. যৌনাংগ স্পর্শের কারণে অযু ভংগ 'হওয়া' এবং 'না হওয়া' উভয় প্রকার হাদিস বর্তমান থাকায় এ প্রসংগে দুটি মত সৃষ্টি হয়েছে। উভয় মতের ভিত্তিই সহীহ হাদিস। তাই হাদিস অনুসরণকারী ব্যক্তি যে কোনো একটি মতই অনুসরণ করতে পারেন। - সম্পাদক

১. আবরণ ব্যতিত স্ত্রীকে স্পর্শ করা : আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. রোযাদার অবস্থায় তাকে চুমু খেয়েছেন এবং বলেছেন : চুমু খেলে অযুও ভংগ হয়না, রোযাও ভংগ হয়না। -ইসহাক বিন রাহওয়াই এটি বর্ণনা করেছেন। বাযযার এটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। আবদুল হক বলেছেন : এ হাদিসের এমন কোনো ত্রুটি জানিনা যার জন্য তা বর্জন করতে হবে।

আয়েশা রা. থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন রাতে দেখলাম, রসূলুল্লাহ সা. বিছানায় নেই। আমি তাকে খুঁজতে লাগলাম। সহসা তার পায়ের মধ্যস্থলে আমার হাত পড়লো। তিনি তখন মসজিদে। তাঁর পা দুটো বিস্তৃত। তিনি বলছিলেন : "হে আল্লাহ আমি তোমার অসন্তোষ থেকে সন্তুষ্টির নিকট পানাহ চাই। তোমার আযাব থেকে তোমার ক্ষমার নিকট পানাহ চাই। তোমার থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করতে পারিনা। তুমি তেমনই, যেমন নিজের প্রশংসা করেছো।" - মুসলিম, তিরমিযি।

আয়েশা রা. থেকে আরো বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তাঁর জনৈক স্ত্রীকে চুমু খেলেন। তারপর মসজিদে গেলেন। অযু করলেননা। -আহমদ ও চারটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণিত।

আয়েশা রা. থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি রসূল সা. এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম। তখন আমার পা দুটো তাঁর সামনে থাকতো (অর্থাৎ সাজদার জায়গায়) তাই যখন তিনি সাজদায় যেতেন, আমাকে হাত দিয়ে টিপতেন, আমি তৎক্ষণাত পা গুটিয়ে নিতাম। অন্য বর্ণনার ভাষা হলো : তিনি যখন সাজদা করতে চাইতেন, আমার পায়ে টিপ দিতেন। -বুখারি ও মুসলিম।

২. স্বাভাবিক নির্গমন স্থান ব্যতিত অন্য স্থান থেকে রক্ত নির্গমন, চাই জখমের কারণে হোক, কিংবা শিংগা লাগানোর কারণে হোক, কিংবা নাক দিয়ে রক্ত পড়ুক, আর চাই তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি। হাসান রা. বলেছেন : মুসলমানরা নিজেদের ক্ষতস্থান নিয়েই নামায পড়তো। -বুখারি।

বুখারি আরো বলেছেন : ইবনে উমর তার ব্রণ বা ফুসকুড়িতে চাপ দিলেন, অমনি তা থেকে রক্ত বেরুলো। কিন্তু তিনি অযু করলেননা। ইবনে আবি আওফার থুথুর সাথে রক্ত বের হওয়া সত্ত্বেও তিনি নামায অব্যাহত রাখলেন। আর উমর রা. এর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল এ অবস্থায় তিনি নামায পড়েছেন। আব্বাদ বিন বিশর নামাযরত অবস্থায় তীরবিদ্ধ হলেন এবং তিনি নামায অব্যাহত রাখলেন। -আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা ও বুখারি।

৩. বমি : চাই মুখ ভর্তি বমি হোক বা কম হোক, এ দ্বারা অযু ভংগ হয়- এ মর্মে কোনো প্রামাণ্য হাদিস পাওয়া যায়নি।

৪. উটের গোশত খাওয়া : চার খলিফা ও বহু সংখ্যক সাহাবি ও তাবেয়ীর মতে উটের গোশত খেলে অযু ভংগ হয়না। তবে এ জন্য অযু করার আদেশ সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। জাবের বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত : "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, ভেড়া বা ছাগলের গোশত খেয়ে অযু করবো নাকি? তিনি বললেন : ইচ্ছা হলে করো, নচেত করোনা। সে বললো : উটের গোশত খেয়ে অযু করবো কি? তিনি বললেন : হাঁ। উটের গোশত খেয়ে অযু করো। সে বললো : ছাগল ভেড়ার থাকার জায়গায় নামায পড়তে পারবো কি? তিনি বললেন : হাঁ। সে বললো : উটের থাকার জায়গায় নামায পড়া যাবে কি? তিনি বললেন : না। -আহমদ ও মুসলিম।

বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত : রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো : উটের গোশত খেয়ে কি অযু করতে হবে? তিনি বললেন : অযু করো। জিজ্ঞাসা করা হলো : ছাগল ভেড়ার গোশত খেয়ে? তিনি বললেন : অযু করো না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : উটের পালের থাকার জায়গায় কি নামায পড়া যাবে? তিনি বললেন : ওখানে নামায পড়োনা। ওটা শয়তানের জায়গা। ছাগল ভেড়ার থাকার জায়গায় নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন : ওখানে নামায পড়ো। কারণ ওটা বরকতের জায়গা। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান। ইবনে খুযায়মা বলেছেন : এই হাদিসের বর্ণনাকারীর সততার কারণে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে হাদিস বিশারদদের মধ্যে কোনো মতভেদ দেখিনি। ইমাম নববী বলেছেন : এই মত প্রমাণের দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত সবল- যদিও অধিকাংশ আলেম এ মতের বিপক্ষে।

৫. অযুকারীর অযু হওয়া নিয়ে সন্দেহ : যখন পবিত্র ব্যক্তির সন্দেহ হয় অযু ভংগ হয়েছে কিনা, তখন এই সন্দেহে কোনো ক্ষতি হবে না এবং অযু ভংগ হবেনা, চাই নামাযের ভেতরে থাকুক বা বাইরে। অযু ভংগ হয়েছে মর্মে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অযু ভংগ হবেনা। আব্বাদ বিন তামীম থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত : এক ব্যক্তি রসূল সা. কে জানালো যে, নামাযের মধ্যে তার ধারণা জন্মে তার একটা কিছু হয়েছে। (অর্থাৎ অযু ভংগকারী কিছু ঘটেছে।) তিনি বললেন : কোনো শব্দ না শোনা বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত নামায ছেড়ে যাবেনা। -তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার পেটে (অস্বাভাবিক) কিছু টের পায়। কিন্তু পেট থেকে কিছু বেরিয়েছে কিনা বুঝতে পারেনা, তখন সে যতোক্ষণ কোনো শব্দ না শুনবে কিংবা কোনো গন্ধ না পাবে, ততোক্ষণ যেনো মসজিদ থেকে বের না হয়। -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি। এখানে নির্দিষ্টভাবে শব্দ শোনা ও গন্ধ পাওয়াই উদ্দেশ্য নয়, বরং নিশ্চিত হওয়া, পেট থেকে কিছু বের হয়েছে কিনা। ইবনুল মুবারক বলেছেন : নাপাক হওয়া সম্পর্কে কেবল সন্দেহ হলে অযু করার প্রয়োজন নেই, যতোক্ষণ না ততোটা নিশ্চিত হয় যে, কসম খেতে পারে। কিন্তু যখন নাপাক হওয়া নিশ্চিত হয় এবং পাক থাকা নিয়ে সন্দেহ হয়, তখন মুসলমানদের সর্বসম্মত মত অনুসারে তাকে অযু করতে হবে।

৬. নামাযে অট্ট হাসিতে অযু ভংগ হবেনা। কেননা এ সংক্রান্ত হাদিস সহীহ নয়।

৭. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে অযু করা জরুরি নয়, কারণ অযু ভংগ হওয়ার প্রমাণ দুর্বল।

৮. যেসব কাজে অযু জরুরি

এক : যে কোনো নামায পড়ার জন্য, চাই তা ফরয হোক বা নফল হোক। এমনকি জানাযার নামায পড়তে হলেও অযু করা চাই। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামায পড়তে ইচ্ছা করবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধৌত করো, তোমাদের মাথা মাসেহ করো, আর গিরে পর্যন্ত দু'পা ধৌত করো।" অর্থাৎ তোমরা বে অযু থাকো, তখন নামায পড়তে চাইলে ধৌত করো। আর রসূল সা. বলেছেন : আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতিত নামায কবুল করেননা, আর গনিমতের মাল বণ্টন হওয়ার আগে আত্মসাৎ করলে তা থেকে সদকা কবুল করেননা। -বুখারি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

দুই : পবিত্র কাবা'র তওয়াফ করার জন্যে। কেননা ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তওয়াফ নামাযই। কেবল আল্লাহ এর ভেতর কথা বলা জায়েয করেছেন। তবে যে কথা বলবে, সে যেনো ভাল কথা বলে। -তিরমিযি ও দার কুতনি। হাকেম, ইবনে সাকান ও ইবনে খুযায়মা এটিকে সহীহ বলেছেন।

তিন : পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা। কেননা আবু বকর বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. ইয়ামানবাসীর নিকট একটা চিঠিতে লিখলেন : পবিত্র ব্যক্তি ব্যতিত কুরআনকে স্পর্শ করবেনা। -নাসায়ী, দার কুতনি, বায়হাকি, আছরাম। ইবনে আবদুল বার বলেছেন : এ হাদিসটি জনগণের ব্যাপক গ্রহণের কারণে মুতাওয়াতিরের কাছাকাছি চলে গেছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কুরআনকে পবিত্র ব্যক্তি ব্যতিত স্পর্শ করবেনা। -মাজমাউয যাওয়ায়েদ। বস্তুত এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, পবিত্র অবস্থায় ব্যতিত কুরআন শরিফ স্পর্শ করা জায়েয নয়। তবে 'পবিত্র' শব্দটা একাধিক অর্থবোধক। বৃহৎ নাপাকি (বীর্য স্খলন বা ঋতু উত্তর নাপাকি) থেকে মুক্ত থাকা, ক্ষুদ্র নাপাকি (পেশাব পায়খানা বা বায়ু নির্গমনজনিত নাপাকি) থেকে মুক্ত থাকা, মুমিন ব্যক্তি- যার শরীরে কোনো নাপাকি নেই- এসব ব্যক্তিকে পবিত্র বলা হয়। একটি অর্থ থেকে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য কোনো প্রতীক থাকা প্রয়োজন। তাই ক্ষুদ্র নাপাকিতে লিপ্ত ব্যক্তিকে কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করার জন্য এ হাদিস কোনো অকাট্য প্রমাণ নয়। কুরআনের উক্তি : . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "এ গ্রন্থকে পবিত্র লোকেরা ব্যতিত স্পর্শ করেনা।" (সূরা ৫, ওয়াকিয়া : আয়াত ২৯)

স্পষ্টতই এ আয়াতে গোপনে সুরক্ষিত কিতাব 'লওহে মাহফুয'কে বুঝানো হয়েছে। কেননা ওটাই নিকটতর। আর পবিত্র লোকেরা অর্থ ফেরেশতাগণ। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ.

"সম্মানিত গ্রন্থসমূহে রক্ষিত, সুউচ্চ স্থানে উন্নীত পবিত্র, সম্মানিত মহান লেখকগণের হাতে।" (সূরা ৮০, আবাসা : আয়াত ১৩-১৬)

ইবনে আব্বাস শা'বী, দাহাক, যায়েদ বিন আলী, আল-মুয়াইয়াদ বিল্লাহ, দাউদ যাহেরি, ইবনে হাযম ও হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমানের মতে ছোট নাপাকিতে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য কুরআন স্পর্শ করা জায়েয। আর স্পর্শ না করে কুরআন পড়া সর্বসম্মতভাবে জায়েয।

৯. যেসব অবস্থায় অযু করা মুস্তাহাব

১. আল্লাহকে স্মরণ করা বা তাঁর নাম উচ্চারণ করার সময় :

মুহাজির বিন কুনফুয রা. বলেছেন : তিনি রসূলুল্লাহ সা.কে সালাম করলেন। তখন তিনি অযু করছিলেন। অযু শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সালামের জবাব দিলেননা। অযুর শেষে জবাব দিলেন এবং বললেন : তোমার সালামের জবাব না দেয়ার একমাত্র কারণ হলো, আমি পবিত্রাবস্থায় ব্যতিত আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা পছন্দ করিনি।" কাতাদা বলেন : এ কারণে হাসান পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত কুরআন পাঠ বা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অপছন্দ করতেন। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

আবু জুহাইম ইবনুল হারেস রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. বিরে জামাল (মদিনার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গা) থেকে এলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলো ও তাঁকে সালাম করলো। রসূল সা. তার জবাব না দিয়ে একটি প্রাচীরের কাছে এলেন, তারপর তার মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করলেন (অর্থাৎ তাইয়াম্মুম করলেই) তারপর সালামের জবাব দিলেন। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী। এ হচ্ছে মুস্তাহাব ও উত্তম কাজ। অন্যথায় পবিত্রাবস্থা, অপবিত্রাবস্থা, বসা, দাঁড়ানো, শোয়া, হাঁটা- সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর বা স্মরণ করা জায়েয। কেননা আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. সব সময় আল্লাহর যিকর করতেন। -নাসায়ী ব্যতিত পাঁচটি হাদিস গ্রন্থ। বুখারি এটিকে সনদ ব্যতিত উদ্ধৃত করেছেন।

আলী রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. পায়খানা থেকে এসে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। একমাত্র জানাবাত (বৃহৎ নাপাকি) ব্যতিত কোনো কিছুই তাকে কুরআন থেকে বিরত রাখতোনা। -পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ, তিরমিযি ও ইবনে সাকান এটিকে সহীহ বলেছেন।

২. ঘুমানোর পূর্বে :

বারা ইবনে আযেব রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তুমি বিছানায় আসবে, তখন নামাযের অযুর মতো অযু করবে। তারপর ডান কাতে শুয়ে বলবে : হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার প্রাণ সমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার যাবতীয় বিষয় তোমার নিকট অর্পণ করলাম। আমার পিঠ তোমার উপর ঠেকালাম। তোমার প্রতি আগ্রহ ও ভীতি পোষণ করি। তোমার কাছ থেকে মুক্তি ও আশ্রয় লাভের স্থান তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। হে আল্লাহ, তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো, তার প্রতি ঈমান আনলাম, তুমি যে নবী পাঠিয়েছ তার প্রতি ঈমান আনলাম।" এরপর তুমি সেই রাতে মারা গেলে ঈমানের অবস্থায় মারা যাবে। তবে এই কথাগুলোর পর আর কোনো কথা বলবেনা।" বারা বলেন : আমি এই কথাগুলো রসূল সা. এর সামনে পুনরাবৃত্তি করলাম। যখন এই পর্যন্ত পৌঁছলাম : "হে আল্লাহ, তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো, তার প্রতি ঈমান আনলাম।" তখন বললাম, "এবং তোমার রসূলের উপর", রসূল সা. বললেন : না, বলো : "তোমার সেই নবীর উপর যাকে পাঠিয়েছ।" -আহমদ, বুখারি, তিরমিযি।

"জানাবত" অর্থাৎ বৃহত্তর নাপাকিতে লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইবনে উমর রা. বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আমাদের কেউ কি জানাবত অবস্থায় ঘুমাবে? তিনি বললেন : "হাঁ, অযু করে।" আর আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন জানাবত অবস্থায় ঘুমাতে চাইতেন, গুপ্তাংগ ধুয়ে নামাযের অযুর মতো অযু করতেন।" -সব ক'টি হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত।

৩. জুনুবীর জন্য অযু মুস্তাহাব :

বৃহত্তর নাপাকিতে লিপ্ত ব্যক্তি যখন পানাহার করতে বা পুনরায় সহবাস করতে চায় তখন অযু করে নেয়া মুস্তাহাব। কেননা আয়েশা রা. বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন জুনুবী (বৃহত্তর নাপাকিতে লিপ্ত) থাকতেন এবং আহার করতে বা ঘুমাতে চাইতেন, তখন অযু করে নিতেন। -অনেকগুলো গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

আম্মার বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত : জুনুবী যখন পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তখন তাকে নামাযের অযুর মতো অযু করতে রসূল সা. অনুমতি দিয়েছেন। -আহমদ, তিরমিযি।

আর আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন স্ত্রী সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চায় তখন তার অযু করে নেয়া উচিত। -বুখারি ব্যতিত সব ক'টি হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত।

ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান এবং হাকেমও এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা একটি কথা সংযোজন করেছে : "কেননা তা পুনঃ সহবাসের জন্য অধিকতর প্রেরণাদায়ক।"

৪. ওয়াজিব বা মুস্তাহাব গোসলের আগে :

আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন জানাবতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে দু'হাত ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢালতেন, তারপর গুপ্তাংগ ধৌত করতেন। তারপর নামাযের অযুর মতো অযু করতেন। -সব ক'টি সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

৫. আগুন স্পর্শ করেছে এমন খাদ্য খাওয়ার পর অযু করা মুস্তাহাব :

ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন কারিয বলেন : "আমি আবু হুরায়রার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি অযু করছিলেন। তিনি বললেন : তুমি কি জানো, কেন অযু করছি? কারণ আমি পনির খেয়েছি। আমি রসূল সা. কে বলতে শুনেছি : যে খাদ্যে আগুন স্পর্শ করেছে, তা খেয়ে অযু করো।" -আহমদ, মুসলিম ও চারটি হাদিস গ্রন্থ।

আর আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আগুন যাকে স্পর্শ করেছে, তা খেয়ে অযু করো।" -আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

উল্লেখ্য যে, এখানে অযুর আদেশকে মুস্তাহাব অর্থে গ্রহণ করা হয়। কেননা আমর বিন উমাইয়া আদ দুমারির বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, তিনি বলেন ; রসূলুল্লাহ সা.কে দেখেছি, একটা ছাগলের (রান্না করা) ঘাড় থেকে গোশত কেটে নিলেন ও খেলেন। পরক্ষণে নামাযের আহ্বান এলো। তখন তিনি উঠলেন, ছুরি রেখে দিলেন এবং অযু না করেই নামায পড়লেন। -বুখারি ও মুসলিম। নববী মন্তব্য করেছেন! এ হাদিসে ছুরি দিয়ে গোশত কাটা জায়েয হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান।

৬. প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন অযু করা মুস্তাহাব :

বুরাইদা রা. বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক নামাযের সময় অযু করতেন। যখন মক্কা বিজয়ের দিন এলো, অযু করলেন। মোজার উপর মাসেহ করলেন এবং এক অযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়লেন। উমর রা. তাকে বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আপনি এখন যা করলেন, আগে তা করতেননা। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে উমর, এটা আমি ইচ্ছাপূর্বকই করেছি। -আহমদ ও মুসলিম ইত্যাদি।

ইবনে আমর বিন আমের আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আনাস ইবনে মালেক বলতেন : রসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক নামাযের সময় অযু করতেন। আমি বললাম : আপনারা কিভাবে নামায পড়তেন! তিনি বললেন : আমরা যতোক্ষণ নাপাক না হতাম, এক অযু দিয়ে বহু নামায পড়তাম। -আহমদ ও বুখারি।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার উম্মতের যদি কষ্ট না হতো, তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযে অযু করতে আদেশ দিতাম এবং প্রত্যেক অযুতে মেসওয়াক করতে আদেশ দিতাম। -আহমদ।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলতেন : যে পবিত্র থাকা সত্ত্বেও অযু করে, তার জন্য দশটি সওয়াব লেখা হয়। -আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ।

১০. অযু সংক্রান্ত কতিপয় জরুরি জ্ঞাতব্য

১. অযুর মাঝে নির্দোষ কথাবার্তা বলা জায়েয। এটা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ হাদিসে নেই।

২. অংগ প্রত্যংগ ধৌত করার সময় বিভিন্ন দোয়া পড়ার কোনো ভিত্তি নেই। ইতিপূর্বে অযুর সুন্নতসমূহের বিবরণে যেসব দোয়ার উন্মেষ করা হয়েছে, সেগুলো পড়াই যথেষ্ট।

৩. কয়বার ধৌত করা হলো, এ নিয়ে সন্দেহ হলে যেটি নিশ্চিত, সেটিই ধর্তব্য হবে- অর্থাৎ কম সংখ্যক বার।

৪. অযুর অংগ প্রত্যংগসমূহের যে কোনোটিতে মোম বা অনুরূপ কোনো আবরণ থাকলে অযু বাতিল হয়ে যাবে। তবে শুধু রং যেমন মেহেদী, কলপ ইত্যাদি থাকলে অযুর ক্ষতি হবেনা। কেননা এতে চামড়ায় পানি পৌঁছা ব্যাহত হয়না।

৫. মুস্তাহাযা (যার মাসিক দশদিনের চেয়ে বেশি ও তিনদিনের চেয়ে কম হয়), সর্বক্ষণ পেশাব টপকানো ও বায়ু নি:সরণের রোগী বা অনুরূপ ওযরধারী ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে- যখন এই ওযর পুরো নামাযের সময়ব্যাপী অব্যাহত থাকে অথবা নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। ওযর থাকা সত্ত্বেও তাদের নামায শুদ্ধ গণ্য হবে।

৬. অযুতে অন্যের সাহায্য নেয়া জায়েয।

৭. অযুর পর রুমাল দিয়ে ভিজে অংগ মোছা শীত গ্রীষ্ম-উভয় ঋতুতে জায়েয।

৫. মোজার উপর মাসেহ করা

১. এর শরয়ী প্রমাণ :

রসূলুল্লাহ সা. থেকে সহীহ হাদিস দ্বারা মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয সাব্যস্ত হয়েছে। নববী বলেছেন : যে সকল আলেমের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তারা মোজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার পক্ষে একমত হয়েছেন, চাই নিজের আবাসিক এলাকায় থাকুক কিংবা সফরে থাকুক এবং চাই প্রয়োজনে হোক কিংবা অপ্রয়োজনে। এমনকি সার্বক্ষণিকভাবে ভৃত্যগিরীতে নিয়োজিত মহিলা কিংবা অচল প্রতিবন্ধীর জন্যও জায়েয। কেবল শিয়া ও খারেজীগণ এর বিরোধিতা করে। তাদের বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়। হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে বলেছেন : হাদিসের একদল হাফেয সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মোজার উপর মাসেহ একটি মুতাওয়াতির (সার্বজনীন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত) ব্যাপার। কেউ কেউ এর বর্ণনাকারীদের তালিকা তৈরি করেছেন, যা আশি (৮০) ছাড়িয়ে গেছে। মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রামাণ্য হাদিসটি বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযি ইমাম নাখয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হলো :

জারির বিন আবদুল্লাহ পেশাব করলেন, তারপর অযু করলেন ও নিজের মোজার উপর মাসেহ করলেন। তাকে বলা হলো : আপনি এটা করলেন? অথচ আপনি তো পেশাব করেছেন। জারির বললেন : হ্যাঁ, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে দেখেছি, পেশাব করলেন, তারপর অযু করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন। ইবরাহীম বলেন, এ হাদিস তাদেরকে বিস্মিত করতো। কেননা জারির ইসলাম গ্রহণ করেন সূরা মায়েদা নাযিল হওয়ার পর। অর্থাৎ তিনি সূরা মায়েদার অযুর বিধান সম্বলিত যে আয়াতে দু'পা ধোয়ার আদেশ রয়েছে, সেটি নাযিল হবার পর দশম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং তার হাদিস থেকে একথা প্রমাণিত যে, আয়াতে ধৌত করার যে হুকুম পাওয়া যায়, তা মোজা পরিহিত নয় এমন ব্যক্তির জন্য। আর যে মোজা পরিহিত, তার জন্য ওয়াজিব হলো মাসেহ করা। কাজেই হাদিস দ্বারা আয়াতের প্রয়োগস্থল নির্দিষ্ট হতে পারে।

২. চামড়ার মোজার উপর মাসেহ্র বৈধতা

জাওরাব বা চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। বহু সংখ্যক সাহাবি থেকে এটি বর্ণিত। আবু দাউদ বলেছেন : আলী বিন আবু তালেব, ইবনে মাসউদ, বারা বিন আযেব, আনাস বিন মালেক, আবু উমামা, সাহল বিন সা'দ ও আমর বিন হুরাইছ জাওরাবের উপর মাসেহ করেছেন। আর উমর ইবনুল খাত্তাব এবং ইবনে আব্বাস থেকেও একথা বর্ণিত হয়েছে। আম্মার, বিলাল ও ইবনে উমর থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল কাইয়েম রচিত তাহযীবুস্ সুনানে ইবনুল মুনযির থেকে বর্ণিত : জাওরাবের উপর মাসেহ বৈধ- এটা ইমাম আহমদ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এটা তার সঠিক সিদ্ধান্ত। এটা এ সকল সাহাবির ইচ্ছাকৃত কাজ ও সুস্পষ্ট কিয়াস। কেননা মোজা ও জাওরাব (চামড়ার মোজা)-এর মাঝে তেমন বাস্তব পার্থক্য দৃষ্টি

গোচর হয়না। তাই মোজার হুকুম জাওরাবের উপর প্রয়োগ করা চলে। আর উভয়টির উপর মাসেহ জায়েয- এটা অধিকাংশ আলেমের অভিমত। যারা উভয়টির উপর মাসেহ জায়েয বলেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন- সুফিয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক, আতা, হাসান বস্‌রি ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ বলেছেন : মোজা ও চামড়ার মোজা যদি এতো ঘন হয় যে, তার নিচে কি আছে দেখা যায়না, তাহলে তার উপর মাসেহ জায়েয। আবু হানিফা ঘন চামড়ার মোজার উপরও মাসেহ নাজায়েয বলতেন। তবে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন বা সাত দিন আগে মত পাল্টান এবং জায়েয বলে রায় দেন। তখন অসুস্থ অবস্থায় তিনি চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করেন এবং যারা তাকে দেখতে এসেছিল তাদেরকে বলেন, আমি যা করতে নিষেধ করতাম তা এখন নিজেই করলাম। মুগীরা ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত :

রসূলুল্লাহ সা. অযু করলেন এবং জুতা ও চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করলেন।[৯] -আহমদ, তাহাবি, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। তিরমিযি একে সহীহ ও আবু দাউদ দুর্বল বলেছেন। জাওরাব তথা চামড়ার মোজার উপর মাসেহই মূল লক্ষ্য ছিলো। না'ল বা জুতার উপর মাসেহ্‌র বিষয়টি নিছক আনুসংগিকভাবে এসে গেছে।

জাওরাব বা চামড়ার মোজার উপর মাসেহ যেমন জায়েয, তেমনি পায়ের উপর পরিধেয় যে কোনো আবরণ তথা মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয- যেগুলো ঠাণ্ডার ভয়ে, আঘাত লাগার ভয়ে বা নগ্ন পদতার ভয়ে বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণে পরা হয়। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, "পায়ের আবরণের উপর মাসেহ করা জায়েয। মোজা ও চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করার চেয়ে আবরণের উপর মাসেহ অগ্রগণ্য। কারণ সচরাচর প্রয়োজনের খাতিরেই আবরণ পরা হয় এবং তা খুললে নানা রকম ক্ষতি হয়। হয় ঠাণ্ডা লাগে, না হয় নগ্ন পদজনিত কষ্ট হয়, নচেত আঘাত লাগে। কাজেই মোজা ও চামড়ার মোজার উপর মাসেহ যখন জায়েয, তখন আবরণের উপর মাসেহ অবশ্যই জায়েয হবে। যে ব্যক্তি এর কোনো একটিতে আলেমদের ইজমা অর্থাৎ ঐকমত্যের দাবি করে, সে নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ করে। খ্যাতনামা দশজন আলেমও একে নিষিদ্ধ বলেছেন বলে প্রমাণ করা যাবেনা, ইজমা তো দূরের কথা। ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন : যে ব্যক্তি রসূল সা. এর উক্তি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে এবং যথার্থভাবে কিয়াস করবে, সে বুঝবে এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা খুবই প্রশস্ত ও ব্যাপক। এটা শরিয়তের একটি কল্যাণময় বৈশিষ্ট্য এবং শরিয়তের উদারতা ও মহানুভবতা।" মোজায় বা জাওরাবে যদি ছেঁড়া ফাটা থাকে, তাহলে মাসেহ করাতে আপত্তি নেই, যতোক্ষণ তা প্রথাগতভাবে পরিধান করা হয়। ছাওরী বলেন : মুহাজির ও আনসারদের মোজা ছেঁড়া ফাটা থেকে মুক্ত থাকতোনা। এজন্য যদি মাসেহ নিষিদ্ধ হতো, তবে তা তাদের কাছ থেকে অবশ্যই উদ্ধৃত হতো।

৩. মোজা ইত্যাদির উপর মাসেহ্‌র শর্তাবলি

মোজা বা অনুরূপ আবৃতকারী কোনো জিনিসের উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার শর্ত হলো, অযু থাকা অবস্থায় তা পরা চাই। কেননা মুগীরা ইবনে শু'বা বর্ণনা করেন : আমি এক রাতে সফরে রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে ছিলাম। তখন আমি তাঁকে বদনা থেকে পানি ঢেলে দিলাম। তা দিয়ে তিনি নিজের মুখমণ্ডল ও দু'হাত ধুলেন এবং মাথা মাসেহ করলেন। এরপর আমি তাঁর মোজা

---

৯. এ হাদিসে মূল শব্দ দুটি হলো না'ল (نعل) ও জাওরাব (جورب)। না'ল হলো, যা পাকে মাটি থেকে রক্ষা করে। এটা মোজা নয়। জুতা, স্যান্ডেল বা খড়ম জাতীয় জিনিস হতে পারে। রসূল সা. এর না'লের দুটো ফিতে ছিলো। একটি ফিতে পায়ের বুড়ো আংগুল ও তার পার্শ্ববর্তী আংগুলের মাঝখানে এবং অপরটি মধ্যমা ও তার পার্শ্ববর্তী আংগুলের মাঝে থাকতো। আর এই দুটো ফিতে পায়ের পিঠের উপরের ফিতের সাথে মিলিত হতো, যাকে শিরাক বলা হয়। আর জাওরাব হলো, পায়ের পাতা জুড়ে থাকা চামড়ার মোজা, যাকে শিরাক বলা হয়।

খোলার জন্য নিচু হলাম। তখন তিনি বললেন : থাক, মোজা খুলোনা। কারণ আমি পবিত্র অবস্থায় ও দুটো পরেছি। অতপর তিনি সেগুলোর উপর মাসেহ করলেন। -আহমদ, বুখারি ও মুসলিম।

হুমায়দী স্বীয় মুসনাদে মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমরা বললাম, "হে রসূল, আমরা কি মোজার উপর মাসেহ করবো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যদি তা পবিত্র অবস্থায় পায়ে ঢুকানো হয়।" কোনো কোনো ফকীহ শর্ত আরোপ করেছেন, মোজা ফরযের স্থানটিকে আবৃতকারী হওয়া চাই এবং কোনো ফিতে ইত্যাদি দিয়ে বাঁধা ছাড়াই পায়ে লেগে থাকে- এমন হওয়া চাই। আর সেই সাথে তা পরে অবিরাম চলা ফেরা করার যায় এমন হওয়া চাই। তবে ইবনে তাইমিয়া তার ফতোয়া গ্রন্থে এসব শর্তকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

৪. মাসেহ্র স্থান

শরিয়ত নির্ধারিত মাসেহের স্থান হলো মোজার পিঠ। কারণ : মুগীরা রা. বলেন : আমি রসূল সা.কে মোজার পিঠের উপর মাসেহ করতে দেখেছি। -আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি।

আলী রা. বলেছেন : "ইসলাম যদি মানুষের মতামত ভিত্তিক ধর্ম হতো, তাহলে মোজার উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ মাসেহ করাই অগ্রগণ্য হতো। আমি রসূল সা.কে মোজার উপরিভাগে মাসেহ করতে দেখেছি।" -আবু দাউদ, দার কুতনি। আর শাব্দিক ও আভিধানিকভাবে মাসেহ বলতে যা বুঝায়, সেটাই ওয়াজিব। এর মধ্যে নির্দিষ্ট করার কিছু নেই। আর এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদিসে কিছুই উল্লেখ নেই।

৫. মাসেহ্র মেয়াদ

বাড়িতে অবস্থানকালে মোজার উপর মাসেহ্র মেয়াদ এক দিন ও এক রাত, আর সফরে তিন দিন তিন রাত।

সাফওয়ান বিন আস্সাল রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে মোজার উপর মাসেহ করার আদেশ দিয়েছেন যখন পবিত্র অবস্থায় তা পায়ে ঢুকাবো, সফরে তিন দিন এবং বাড়িতে এক দিন ও এক রাত। আর জানাবত (বৃহত্তর নাপাকি) ব্যতিত আমরা তা যেনো না খুলি।" -শাফেয়ী, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, তিরমিযি ও নাসায়ী।

শুরাইহ বিন হানী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আয়েশা রা.কে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আলী রা.কে জিজ্ঞাসা করো। কেননা সে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ভালো জানে। সে রসূল সা. এর সাথে সফর করতো। তাই আমি আলী রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাব দিলেন, রসূল সা. বলেছেন : "মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত। আর মুকীমের (বাড়িতে অবস্থানকারীর) জন্য এক দিন ও এক রাত।" -আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। বায়হাকি বলেছেন : এ অধ্যায়ে এটাই সবচেয়ে সহীহ হাদিস। মেয়াদ শুরু হবে মাসেহ শুরু করার সময় থেকে। কেউ কেউ বলেন : মোজা পরার পর যখন অযু করার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন থেকে।

৬. মাসেহর নিয়ম

অযুকারী যখন তার অযু শেষ করবে এবং মোজা বা চামড়ার মোজা পরবে, তারপর থেকে প্রতিবার অযুর সময় তার জন্য মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। পা ধোয়ার প্রয়োজন নেই। তাকে বাড়িতে অবস্থানকালে এক দিন এক রাত এবং প্রবাসে তিন দিন তিন রাত এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে জানাবত হলে মোজা খুলতে হবে। কেননা ইতিপূর্বে উল্লিখিত সাফওয়ানের হাদিসে এটাই বলা হয়েছে।

৭. মাসেহ যে কারণে বাতিল হয়

মোজার উপর মাসেহ বাতিল হয় : (১) মেয়াদ শেষ হলে, (২) জানাবত হলে এবং (৩) মোজা খুললে। মেয়াদ শেষ হলে বা মোজা খুললে, যদি অযু করা থাকে, তবে শুধু পা দু'খানা ধুয়ে ফেলবে।

৬. গোসল

গোসল অর্থ সমগ্র শরীরে পানি প্রবাহিত করা। এটি শরিয়তের আওতাভুক্ত একটি কাজ। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন :. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا "কিন্তু যদি তোমরা সর্বোচ্চ মাত্রায় অপবিত্র থাকো তবে উত্তমরূপে পবিত্র হবে।" (সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত ৬ অংশ বিশেষ)।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ لا وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ○

অর্থ : "তারা তোমার কাছে রক্তস্রাবের বিষয়ে প্রশ্ন করে। তুমি বলো : ওটা একটা অপবিত্রাবস্থা। সুতরাং তোমরা রক্তস্রাব চলাকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকবে। তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে যাবেনা। যখন তারা উত্তমরূপে পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের কাছে আল্লাহ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন সেভাবে যাবে। আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা ২, বাকারা : আয়াত ২২২)

গোসলের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু জরুরি বিধিমালা রয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে :

১. যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়

এক. ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনা সহকারে নারী বা পুরুষের বীর্য নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব হয়। এটা সকল ফকীহর অভিমত। আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন :

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "পানি থেকে পানি।" (পানি অর্থাৎ বীর্য স্খলনের কারণে সারা শরীরে পানি ঢেলে গোসল করতে হবে।) -মুসলিম।

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, উম্মে সুলাইম রা. বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আল্লাহ তো সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেননা। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ, যদি পানি দেখতে পায়। -বুখারি ও মুসলিম প্রমুখ।

এ প্রসঙ্গে প্রায়ই সংঘটিত হয় এমন কিছু অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা সমীচীন মনে করছি। কেননা বিষয়গুলো প্রয়োজন হয়ে থাকে :

ক. কোনো কামোত্তেজনা ছাড়া, রোগ বা ঠাণ্ডাজনিত কারণে বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয়না। কেননা আলী রা. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, তোমার যখন প্রচণ্ড বেগে বীর্যপাত হয়, তখন গোসল করো। -আবু দাউদ।

মুজাহিদ বলেছেন : আমরা ইবনে আব্বাসের কতিপয় শিষ্য– তাউস, সাঈদ বিন জুবাইর ও ইকরামা মসজিদে সমবেত ছিলাম, আর ইবনে আব্বাস নামায পড়ছিলেন, এ সময় জনৈক ব্যক্তি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে বললো : এখানে কি কোনো মুফতী আছে? আমরা বললাম : যা জিজ্ঞাসা করতে চাও করো। সে বললো : আমি যখনই পেশাব করি, তখনই পেশাবের পরপর তীব্র বেগে পানি নির্গত হয়। আমরা বললাম : যে পানিতে সন্তান জন্মে,

তাই? সে বললো : হ্যাঁ। আমরা বললাম : তোমাকে গোসল করতে হবে। এ কথা শুনে লোকটি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে পড়তে চলে গেলো। ইবনে আব্বাস দ্রুত নামায সমাপ্ত করলেন। তারপর ইকরামাকে বললেন : এই লোকটিকে আমি চাই। তারপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : তোমরা এই লোকটিকে যে ফতোয়া দিলে, তা কি আল্লাহর কিতাব থেকে দিয়েছ? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : তবে কি রসূল সা. থেকে? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : তবে কি রসূল সা. এর সাহাবিদের থেকে? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : তবে কোথা থেকে? আমরা বললাম : আমাদের নিজস্ব বুদ্ধি থেকে। তিনি বললেন : এ জন্যই তো রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : একজন ফকীহ (শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানী) শয়তানের উপর এক হাজার আবেদের চেয়েও শক্তিশালী। এই পর্যায়ে লোকটি ফিরে এলো। ইবনে আব্বাস তার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন : তুমি যে বিষয়টা উল্লেখ করেছ, ওটা যখন হয়, তখন তোমার পুরুষাংগে কি কোনো উত্তেজনা অনুভব করো? সে বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি তোমার শরীরে কোনো অসাড়তা টের পাও? সে বললো : না। তিনি বললেন : এটা নিছক দুর্বলতা। এটার জন্যে অযু করাই তোমার যথেষ্ট।

খ. যখন কারো স্বপ্নদোষ হয়, কিন্তু বীর্য দেখতে পায়না, তখন তাকে গোসল করতে হবেনা। ইবনুল মুনযির বলেছেন : যে সকল আলেমের নিকট থেকে আমি দীনের শিক্ষা লাভ করেছি, তারা সর্বসম্মতভাবে এই মত পোষণ করেন। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত উম্মে সুলাইমের হাদিসে রয়েছে : কোনো মহিলার স্বপ্নদোষ হলে তার গোসল করতে হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে রসূল সা. বলেছেন : হ্যাঁ, যদি সে পানি অর্থাৎ বীর্য দেখতে পায়। উক্ত হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয়, বীর্য না দেখা গেলে গোসলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঘুম থেকে উঠার পর যদি বীর্য নির্গত হয়, তাহলে গোসল করতে হবে।

গ. যখন ঘুম থেকে উঠে আর্দ্রতা দেখতে পায়, অথচ স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে পড়েনা, তখন ঐ আর্দ্রতা বীর্য বলে নিশ্চিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায়, ঐ আর্দ্রতা স্বপ্নদোষ থেকেই হয়েছে, কিন্তু সে ভুলে গেছে। আর যদি সন্দেহ হয় জিনিসটা বীর্য কিনা, কিন্তু নিশ্চিত না হয়, তাহলে সতর্কতাবশত গোসল করা ওয়াজিব। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন : বীর্য বলে নিশ্চিত বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত গোসল ওয়াজিব হবেনা। কেননা স্বাভাবিক অবস্থায় পবিত্রতাই নিশ্চিত। সন্দেহের কারণে নিশ্চিত বিশ্বাস বিলুপ্ত হতে পারেনা।

ঘ. কামোত্তেজনার সময় বীর্যের স্খলন টের পেয়েছে কিন্তু পুরুষাংগ চেপে ধরেছে। ফলে তা বের হতে পারেনি। এর কারণও পূর্বোক্ত হাদিস, যাতে রসূল সা. বীর্য দেখতে পাওয়ার সাথে গোসলকে শর্তযুক্ত করেছেন। কাজেই বীর্য দেখা ছাড়া গোসল ওয়াজিব হবেনা। তবে পুরুষাংগ ছেড়ে দিয়ে চলাফেরা শুরু করলে যদি বীর্য বের হয়, তাহলে গোসল করতে হবে।

ঙ. কাপড়ে বীর্য দেখতে পেলো। কিন্তু কখন বেরুলো জানেনা। ইতিমধ্যে ঐ অবস্থায় নামায পড়ে ফেলেছে। তাকে শেষবারের ঘুমের পর থেকে নামায দোহরাতে হবে। তবে যদি এমন কোনো লক্ষণ দেখতে পায়, যা দ্বারা বুঝা যায়, শেষবারের ঘুমের আগেই বীর্য বেরিয়েছে, তাহলে যে ঘুমেই তা হয়েছে বলে সন্দেহ হোক, তারপর থেকে নামায দোহরাতে হবে।

দুই. দুই যৌনাঙ্গের মিলন। অর্থাৎ পুরুষাংগের অগ্রভাগ স্ত্রীর যোনিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলে গোসল ওয়াজিব- যদিও বীর্যপাত না হয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন : "যদি তোমরা সর্বোচ্চ মাত্রায় অপবিত্র হও, তবে উত্তমরূপে পবিত্র হও।" ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : আরবদের ভাষায় 'জানাবত' (বৃহত্তম অপবিত্রতা) প্রত্যক্ষ ও শাব্দিক অর্থে সহবাস বোধক- চাই বীর্যপাত হোক বা

না হোক। যদি বলা হয়, অমুক পুরুষ অমুক মেয়ে দ্বারা অপবিত্র (জুনুবি) হয়েছে, তবে বুঝা যায়, সে তার সাথে সহবাস করেছে- যদিও বীর্য স্খলন না হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন : যে যিনার কারণে শরিয়তে বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে, তা হলো সহবাস, যদিও তাতে বীর্য স্খলিত না হয়। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : পুরুষ যখনই নারীর দুই বাহু ও দুই পায়ের মাঝে বসে এবং নারীর অভ্যন্তরে নিজের লিংগ ঢুকিয়ে দেয়, তখনই গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। বীর্যপাত হোক বা না হোক। -আহমদ ও মুসলিম।

আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত : আবু মূসা আশয়ারী রা. আয়েশা রা.কে বললেন : আমি আপনার নিকট একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। কিন্তু লজ্জা লাগছে। আয়েশা রা. বললেন : জিজ্ঞাসা করো। লজ্জা করোনা। আমি তো তোমার মা। তখন আবু মূসা জিজ্ঞাসা করলেন, যে ব্যক্তি সহবাস করলো কিন্তু বীর্যপাত করলোনা, তার বিধান কী? আয়েশা রা. রসূল সা. এর বরাত দিয়ে বললেন : "দুই গুপ্তাংগের মিলন ঘটলেই গোসল ওয়াজিব হবে।" -আহমদ ও মালেক।

তবে মনে রাখতে হবে, লিংগের প্রবেশ জরুরি। প্রবেশ ছাড়া শুধু স্পর্শ করলে দু'জনের কারো উপরই গোসল ওয়াজিব হয়না।

তিন. হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) ও নিফাস (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) বন্ধ হলে : আল্লাহ বলেছেন : "যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয় ততোক্ষণ তাদের নিকটবর্তী হয়োনা। যখন তারা পবিত্র হয়ে যায় তখন তাদের কাছে যেভাবে আল্লাহ আদেশ করেছেন সেভাবে আসো।" আর রসূল সা. ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ রা.কে বলেছিলেন : "যে কয়দিন তোমার মাসিক স্রাব চলে, সে ক'দিন নামায বর্জন করো। তারপর গোসল করো ও নামায পড়ো।" -সহীহ বুখারি ও মুসলিম।

এ হাদিস যদিও হায়েজ সংক্রান্ত। কিন্তু সাহাবিগণের সর্বসম্মত মতানুসারে নিফাস হায়েজের মতোই। আর যদি প্রসব হয় অথচ রক্তস্রাব না হয়, তাহলে কেউ বলেন, গোসল ওয়াজিব। কেউ বলেন, গোসল ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদিসে কোনো নির্দেশনা নেই।

চার. মৃত্যু : যখন কোনো মুসলমান মারা যায়, তাকে গোসল করানো সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। যথাস্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে।

পাঁচ. কোনো কাফির যখন ইসলাম গ্রহণ করে : যখন কাফির ইসলাম গ্রহণ করে, তার উপর গোসল ওয়াজিব। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন :

"ছুমামা হানাফি যুদ্ধবন্দী হলো। রসূল সা. প্রতিদিন সকালে তার কাছে গিয়ে বলতেন : তোমার বক্তব্য কী হে ছুমামা? ছুমামা বলতো : আমাকে যদি হত্যা করেন তবে একজন রক্তওয়ালাকে (বীরকে) হত্যা করবেন, আর যদি করুণা করেন তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে করুণা করবেন। আর যদি আপনি রক্তপণ চান, তবে আপনি যা চান দেবো। রসূল সা. এর সাহাবিগণ রক্তপণ পছন্দ করতেন এবং বলতেন, একে হত্যা করে কী লাভ? এরপর রসূল সা. তার কাছে গেলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। রসূল সা. তাকে ছেড়ে দিলেন। তাকে আবু তালহার বাগানে পাঠিয়ে দিলেন এবং গোসল করার আদেশ দিলেন। সে গোসল করলো এবং দু'রাকাত নামায পড়লো। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমাদের ভাই-এর ইসলাম গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো। -আহমদ, বুখারি ও মুসলিম।

২. জুনুবির জন্যে যেসব কাজ নিষেধ

জুনুবির উপর নিম্নোক্ত কাজগুলো নিষিদ্ধ :

১. নামায।

২. তওয়াফ।

যেসব কাজের জন্য অযু করা জরুরি, সেগুলোর বিবরণে এগুলোর প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. কুরআন স্পর্শ করা ও বহন করা : এটা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে অনেক ইমাম একমত, তবে ইমাম দাউদ ও ইবনে হাযম জুনুবির কুরআন স্পর্শ করা ও বহন করাকে জায়েয মনে করেন এবং একে দূষণীয় মনে করেনা। তারা বুখারি ও মুসলিমের যে হাদিসটিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন সেটি হলো :

"রসূলুল্লাহ সা. হিরাক্লিয়াসের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিলো : বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম..... অবশেষে সূরা আলে-ইমরানের এ আয়াতও লেখা ছিলো :

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

অর্থ : "হে আহলে কিতাব, এসো এমন একটি বাণীর দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক, তা হলো : আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবোনা। তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবোনা এবং আমরা একে অপরকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবোনা। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বলে দিও : তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম।" (সূরা আল ইমরান : আয়াত ৬৪)

ইবনে হাযম বলেন : রসূল সা. খৃষ্টানদের নিকট এই আয়াত সম্বলিত চিঠিটি পাঠালেন। তিনি তো নিশ্চিত জানতেন, তারা এই চিঠি স্পর্শ করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ এই যুক্তির জবাবে বলেছেন : এতো একটা চিঠি। চিঠি, তফসীর ও ফিকহের কিতাব ইত্যাদিতে আয়াত থাকা সত্ত্বেও তা স্পর্শ করাতে কোনো দোষ নেই। কারণ এগুলোকে কুরআন বলা হয়না এবং এগুলো কুরআনের ন্যায় সম্মানিত নয়।*

৪. কুরআন পড়া : অনেক ইমামের নিকট জুনুবির জন্য কুরআনের কোনো অংশ পড়া নিষেধ। আলী রা. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : "জানাবত (গোসল ওয়াজিব হয় এমন অপবিত্রতা- যার বিবরণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে) ব্যতিত আর কোনো জিনিস রসূল সা.কে কুরআন থেকে দূরে রাখতোনা।" -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : কেউ কেউ এ হাদিসের কোনো কোনো বর্ণনাকারীকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। তবে এটি উত্তম হাদিস, যা থেকে প্রমাণ নেয়া যেতে পারে। আলী রা. থেকে আরো বর্ণিত : আমি রসূল সা.কে দেখলাম, অযু করলেন, তারপর কুরআনের একাংশ পড়লেন, তারপর বললেন : যে ব্যক্তি জুনুবি নয়, তার জন্য এরূপ করা জায়েয। জুনুবির জন্য নয়- এমনকি একটি আয়াতও নয়। -আহমদ ও আবু ইয়ালা। হায়ছামী বলেছেন : এ হাদিসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। শওকানি বলেছেন : "এ হাদিস যদি সহীহ হয়, তাহলে এ দ্বারা

---

* তবে জুনুবির জন্যে কুরআন স্পর্শ করা ও বহন করা নিষেধ হবার ব্যাপারে কুরআন বা হাদিসে প্রমাণ নেই। কুরআনের সম্মানার্থে ইমামগণ এটাকে নাজায়েয মনে করেন। তবে তাঁরা শিক্ষার জন্যে জায়েয মনে করেন। ইমাম দাউদ যাহেরি ও ইবনে হাযম সর্বাবস্থায় জায়েয মনে করেন। -সম্পাদক

জুনুবির কুরআন পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে প্রমাণ দর্শানো যায়। কিন্তু প্রথমোক্ত হাদিসটিতে এমন কোনো বক্তব্য নেই, যা দ্বারা কুরআন পড়া নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। কেননা এতে সর্বাধিক যেটি জানা যায় তা হলো, রসূল সা. জানাবতের অবস্থায় কুরআন পড়া থেকে বিরত ছিলেন। এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা কুরআন পড়া মাকরূহও প্রমাণিত হয়না, হারাম কিভাবে প্রমাণিত হবে?" ইমাম বুখারি, তাবারানি, দাউদ যাহেরি ও ইবনে হাযমের মতে জুনুবির জন্য কুরআন পড়া জায়েয। ইমাম বুখারি বলেছেন : ইবরাহীমের বক্তব্য হলো, ঋতুবতী মহিলা কুরআনের আয়াত পড়তে পারে। আর ইবনে আব্বাস রা. জুনুবির কুরআন পড়াকে দূষণীয় মনে করেননা। রসূল সা. সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন। হাফেয ইবনে হাজার এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, জুনুবি ও ঋতুবতী মহিলার কুরআন পড়া নিষিদ্ধ- এই মর্মে বর্ণিত কোনো হাদিস ইমাম বুখারি সহীহ মনে করোনা। এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো সামগ্রিকভাবে অন্যদের নিকট প্রামাণ্য হলেও এর বেশির ভাগ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

৫. মসজিদে অবস্থান করা : জুনুবির জন্য মসজিদে অবস্থান করা নিষেধ। আয়েশা রা. বলেছেন : একদিন রসূল সা. এলেন। তখন তাঁর সাহাবিদের বাড়ি মসজিদমুখী ছিলো। তিনি বললেন : এ সমস্ত বাড়ির দরজা মসজিদ থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও। এ কথা বলে রসূল সা. (নিজ ঘরে বা মসজিদে) প্রবেশ করলেন। লোকেরা কিছু করলোনা। তারা আশা করছিল, তাদের জন্য কোনো অবকাশ নাযিল হবে। পরক্ষণে রসূল সা. তাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন : তোমরা এসব ঘরের দরজা মসজিদ থেকে ঘুরিয়ে দাও। কেননা আমি কোনো ঋতুবতী ও জুনুবির জন্য মসজিদকে বৈধ রাখিনা। -আবু দাউদ।

আর উম্মে সালামা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এই মসজিদের চত্বরে প্রবেশ করে ঘোষণা করলেন : মসজিদ জুনুবি ও ঋতুবতীর জন্য হালাল নয়। -ইবনে মাজাহ ও তাবারানি।

উল্লিখিত উভয় হাদিস জুনুবি ও ঋতুবতীর জন্য মসজিদ হালাল নয়- এটিই প্রমাণ করে। তবে মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করা জুনুবি ও ঋতুবতী উভয়ের জন্য জায়েয। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "হে মুমিনগণ, তোমরা যখন মাতাল থাকো, তখন নামাযের কাছে যেওনা- যতোক্ষণ না তোমরা কী বলছ তা বুঝতে পারো। আর যখন জুনুবি থাক, তখনো নামাযের নিকট যেওনা- যতোক্ষণ না গোসল করো। তবে পথ অতিক্রমকারী হিসেবে হলে দোষ নেই।" (সূরা ৪ নিসা, আয়াত : ৪৩)

জাবির রা. বলেন : আমাদের কেউ কেউ জুনুবি অবস্থায় মসজিদের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করতো। -ইবনে আবি শায়বা ও সাঈদ ইবনে মানসুর।

আর যায়দ বিন আসলাম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবিগণ জুনুবি অবস্থায় মসজিদের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতেন। -(ইবনুল মুনযির)। ইয়াযীদ বিন হাবীব রা. থেকে বর্ণিত : আনসারদের কিছু লোকের বাড়ির দরজা মসজিদমুখী ছিলো। তাদের জানাবত হতো। কিন্তু তারা মসজিদ ছাড়া পানি সংগ্রহ করতেও পানির কাছে যেতে পারতোনা। তাই আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন : জুনুবি অবস্থায়ও নামাযের নিকট যেওনা, কেবল পথ অতিক্রমকারী হিসেবে ব্যতিত। -ইবনে জারির।

শওকানি এরপর বলেন : এ দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। আয়েশা রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন : মসজিদ থেকে আমাকে রুমালটি এনে দাও। আমি বললাম : আমি ঋতুবতী। তিনি বললেন : তোমার ঋতু তো তোমার হাতে নেই। -বুখারি ব্যতিত সকল হাদিস গ্রন্থ।

মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত : "ঋতুবতী অবস্থায় আমাদের কারো কারো ঘরে রসূল সা. আসতেন। তার কোলে মাথা রেখে কুরআন পড়তেন। অথচ সে ঋতুবতী। তারপর আমাদের কেউ তার রুমাল নিয়ে মসজিদে রেখে আসতো ঋতুবতী অবস্থায়।" -আহমদ ও নাসায়ী। এই বক্তব্য সম্বলিত আরো হাদিস রয়েছে।

৩. মুস্তাহাব গোসল

অর্থাৎ যে গোসলের প্রশংসা করা হয় ও সওয়াব হয়, কিন্তু না করলে কোনো তিরস্কারও করা হয়না, গুনাহও হয়না। এ ধরনের গোসল ছয়টি :

১. জুমার গোসল : যেহেতু জুমার দিন মুসলমানদের ইবাদত ও নামাযের জন্য সমবেত হওয়ার দিন। তাই শরিয়ত প্রণেতা রসূলুল্লাহ সা. এদিন গোসল করার আদেশ দিয়েছেন ও তার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে মুসলমানরা তাদের সমাবেশে উৎকৃষ্টতম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে উপস্থিত হয়। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের উপর জুমার দিন গোসল করা ও সাধ্যমত সুগন্ধি ব্যবহার করা ওয়াজিব। -বুখারি ও মুসলিম।

'ওয়াজিব' অর্থ গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব। এর প্রমাণ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত বুখারির এই হাদিস : জুমার দিন উমর ইবনুল খাত্তাব দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সহসা রসূল সা. এর সাহাবিদের মধ্য থেকে জনৈক প্রবীণ মুহাজির উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন উসমান। উমর তাকে ডেকে বললেন : এখন কোন্ সময়? তিনি বললেন : আমি কাজে নিয়োজিত ছিলাম। ঘরে ফেরার আগেই আযান শুনতে পেলাম। ফলে অযুর বেশি কিছু করতে পারিনি। উমর বললেন : মাত্র অযু? অথচ আপনি তো জানেন, রসূল সা. গোসল করার আদেশ দিতেন।"

ইমাম শাফেয়ী বলেন : উসমান যখন গোসল না করতে পারায় নামায ছাড়েননি। আর উমরও তাকে গোসল করার জন্য মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেননি। তখন প্রমাণিত হলো যে, তারা উভয়ে জানতেন, গোসল ইচ্ছাধীন ব্যাপার। আর গোসল যে মুস্তাহাব সেটা প্রমাণিত হয় আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত মুসলিমের এই হাদিস থেকেও। রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি ভালোভাবে অযু করে জুমার নামাযে আসবে এবং নীরবে শুনবে, এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত এবং আরো তিন দিন পর্যন্ত তার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

এই হাদিস দ্বারা কিভাবে মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুরতবী বলেন : অযু ও তৎসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের উল্লেখ করে তার সওয়াব বর্ণনা, যা নামাযের বিশুদ্ধতার দাবি জানায়, প্রমাণ করে, অযুই যথেষ্ট। হাফেয ইবনে হাজার তাঁর গ্রন্থ 'তালখীসে' বলেছেন : জুমার গোসল যে ফরয নয় এ হাদিস তার সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রমাণ। যেহেতু গোসল বাদ দেয়ায় কোনো ক্ষতি হয়না, তাই এটিকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। তবে গোসল বাদ দেয়ার কারণে যদি ঘাম ও দুর্গন্ধের দরুন মানুষের কষ্ট হয়, কিংবা অনুরূপ খারাপ কিছু হয়, তাহলে গোসল ওয়াজিব ও তা বাদ দেয়া হারাম হবে। একদল আলেম গোসল বাদ দিলে যদি কারো কষ্ট না-ও হয়, তথাপি জুমার জন্য গোসল ওয়াজিব বলে রায় দিয়েছেন। তারা আবু হুরায়রার নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণ দর্শান, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সপ্তাহে একদিন গোসল করা জরুরি। সে যেনো নিজের মাথা ও শরীর ধৌত করে। -বুখারি ও মুসলিম।

এ বিষয়ে যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তারা সেগুলোকে বাহ্যিক অর্থেই (অর্থাৎ ওয়াজিব) গ্রহণ করেন এবং এর বিপরীত অর্থ প্রত্যাখ্যান করেন।

গোসলের সময় ফজর থেকে শুরু করে জুমার নামায পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য গোসল করার অব্যবহিত পর নামাযে যাওয়া মুস্তাহাব। আর গোসলের পর অযু ভংগকারী নাপাকি সংঘটিত

হলে অযু করাই যথেষ্ট হবে। আছরাম বলেছেন : শুনেছি, ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : ইমাম যে ব্যক্তি গোসল করেছে, তারপর তার অযু ভংগ হয়েছে, তার কি অযু যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এ ব্যাপারে আমি আবদুর রহমান ইবনে আবযার হাদিসের চেয়ে উত্তম কিছু শুনিনি। ইবনে আবযা তার সাহাবি পিতা থেকে বর্ণনা করেন : তিনি জুমার দিন গোসল করতেন। আর গোসলের পর অযু ভংগ হলে শুধু অযু করতেন। পুন: গোসল করতেননা। জুমার নামায শেষ হওয়ার সাথে গোসলের সময় শেষ হয়। কাজেই যে ব্যক্তি জুমার নামাযের পর গোসল করে, তার গোসল জুমার গোসল হবেনা। এই গোসল দ্বারা মুস্তাহাবও আদায় হবেনা। কেননা ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুমার নামাযে আসতে চায়, তখন সে যেনো গোসল করে। -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

ইবনে আবদুল বার বলেছেন, এ ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য হয়েছে।

২. ঈদের গোসল : আলেমগণ ঈদের গোসলকে মুস্তাহাব বলেছেন। এ বিষয়ে কোনো সহীহ হাদিস পাওয়া যায়না। বদরে মুনীর গ্রন্থে বলা হয়েছে : ঈদের গোসল সংক্রান্ত হাদিস দুর্বল। তবে এ সম্পর্কে সাহাবিদের কিছু ভালো উক্তি রয়েছে।

৩. যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়েছে তার গোসল : বহু আলেমের মতে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়েছে, তার গোসল করা মুস্তাহাব। কেননা আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালো, সে যেনো গোসল করে, আর যে তাকে বহন করেছে, সে যেনো অযু করে। -আহমদ ও সুনানের গ্রন্থসমূহ।

তবে ইমামগণ এ হাদিসের সমালোচনা করেছেন। আলী ইবনুল মাদায়েনী, আহমদ, ইবনুল মুনযির ও রাফেয়ী প্রমুখ বলেছেন, হাদিস বিশারদগণ এ বিষয়ে কোনো হাদিসকেই সহীহ আখ্যায়িত করেননি। তবে হাফেয ইবনে হাজার এ হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন : এ হাদিসকে তিরমিযি উত্তম ও ইবনে হিব্বান সহীহ বলেছেন। এটি বহু সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে কমের পক্ষে উত্তম না হয়েই পারেনা। যাহাবী বলেছেন : ফকীহগণ প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন এমন বহু হাদিসের চেয়ে এ হাদিসের সনদ অধিকতর শক্তিশালী। উক্ত হাদিসে যে আদেশ সূচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে, তা দ্বারা মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে। কেননা উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমরা মৃত ব্যক্তি গোসল করাতাম। এরপর আমাদের কেউ গোসল করতো, কেউ করতোনা। হাদিসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন খতীব। আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তাকে গোসল করালেন, তখন গোসলের পর বেরিয়ে এসে সেখানে উপস্থিত মুহাজিরদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : আজ বড় কঠিন ঠাণ্ডার দিন। আমি রোযাদার। আমার কি গোসল করা জরুরি? তারা বললেন : না। -মালেক।

৪. ইহরামের গোসল : অধিকাংশ আলেমের মতে হজ্জ যা উমরার জন্য ইহরাম করতে সংকল্প করলে গোসল করা মুস্তাহাব। কেননা যায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেছেন : তিনি রসূল সা.কে দেখেছেন, তিনি তার ইহরামের জন্য পোশাক খুলেছেন ও গোসল করেছেন। -দার কুতনি, বায়হাকি, তিরমিযি। তিরমিযি এ হাদিসকে উত্তম ও উকাইলী দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

৫. মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল : যে ব্যক্তি মক্কা শরিফে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। কেননা : ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. যখন মক্কায় যেতেন, তার আগের রাত যি তুয়ায় সকাল পর্যন্ত অবস্থান করতেন, তারপর দিনের বেলা মক্কায়

প্রবেশ করতেন। তিনি রসূল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি গোসল করতেন। -বুখারি ও মুসলিম।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : সকল আলেমের মতেই মক্কায় প্রবেশের প্রাক্কালে গোসল করা মুস্তাহাব। তবে না করলে কোনো ফিদিয়া দিতে হবেনা। অধিকাংশ আলেম বলেছেন : অযু করাই যথেষ্ট হবে।

৬. আরাফায় অবস্থানের জন্য গোসল : হজ্জের উদ্দেশ্যে আরাফায় অবস্থানে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। কেননা নাফে' থেকে মালেক বর্ণনা করেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ইহরামের জন্য ইহরামের প্রাক্কালে, মক্কায় প্রবেশের জন্য ও বিকালে আরাফায় অবস্থানের জন্য গোসল করতেন।

৪. গোসলের আরকান

শরিয়ত নির্দেশিত গোসল দুটো জিনিস ছাড়া সম্পন্ন হয়না :

১. নিয়ত :

এটাই মানুষের স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত কাজকর্ম আর ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। নিয়ত নিছক মনের কাজ। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার যে প্রথা লোকেরা রপ্ত ও চালু করেছে এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তা একটা নতুন আবিষ্কৃত ও শরিয়ত বহির্ভূত কাজ। এই প্রথা বর্জন করা উচিত। ইতিপূর্বে অযু সংক্রান্ত আলোচনায় নিয়তের হাকিকত ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে এসেছি।

২. সকল অংগ প্রত্যংগ ধৌত করা :

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "আর যদি তোমরা জুনুবি হয়ে থাকো তবে উত্তমরূপে পবিত্র হও।" (সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত ৬) অর্থাৎ গোসল করো। আল্লাহ আরো বলেছেন : "তারা তোমাকে মাসিক রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো, ওটা একটা অপবিত্র ও বিব্রতকর অবস্থা। কাজেই রক্তস্রাব চলাকালে তোমরা স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখো। তারা পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের কাছে যেওনা।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২২২)

উভয় আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের অর্থ যে গোসল করা, তার প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াতে সুস্পষ্ট : "হে মুমিনগণ, তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়োনা যতোক্ষণ না তোমরা কী বলছো তা অবগত হও। আর জুনুবি অবস্থায়ও কেবল রাস্তা অতিক্রমের জন্য ব্যতিত নামাযের নিকটবর্তী হয়োনা, যতোক্ষণ না গোসল করো।" (সূরা ৪, নিসা : আয়াত ৪৩) বস্তুত, গোসল অর্থই হলো সকল অংগ প্রত্যংগ ধোয়া।

৫. গোসলের সুন্নতসমূহ

রসূল সা. যেভাবে গোসল করতেন, প্রত্যেক গোসলকারীর সেভাবে গোসল করা সুন্নত। প্রথমে : (১) দু'হাত তিনবার ধৌত করবে, (২) তারপর গুপ্তাংগ ধৌত করবে, (৩) তারপর নামাযের অযুর মতো পূর্ণাংগভাবে অযু করবে। যখন কোনো ক্ষুদ্র পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করা হয়, তখন গোসলের শেষ পর্যায় পর্যন্ত পা ধোয়া বিলম্বিত করতে পারে। (৪) তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে, সেই সাথে চুলে আংগুল চালিয়ে চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি প্রবেশ করাবে। (৫) তারপর সারা শরীরে পানি ঢালবে, প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে। সেই সাথে বোগল, কানের ভেতরে, নাভির ভেতরে ও পায়ের আংগুলের মাঝে ও সমগ্র শরীরকে যতোটা পারা যায় কচলাবে। এ সম্পর্কে আয়েশা রা. এর হাদিসে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে,

তিনি বলেন : "রসূল সা. যখন জানাবত থেকে পবিত্র হবার জন্য গোসল করতেন তখন শুরুতে তাঁর হাত ধুতেন, তারপর নিজের ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে তা দিয়ে নিজের গুপ্তাংগ ধুতেন, তারপর নামাযের অযুর মতো অযু করতেন। তারপর পানি নিয়ে চুলের গোড়ায় আংগুল ঢুকিয়ে পানি পৌছাতেন। যখন নিশ্চিত হতেন চুলের গোড়ায় পানি পৌছে গেছে, তারপরও মুঠো ভরে তিনবার মাথায় পানি দিতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন।" -বুখারি ও মুসলিম।

বুখারি ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে : অতপর নিজের দু'হাত দিয়ে চুলের মধ্যে খিলাল করতেন বা বিলি দিতেন, এভাবে যখন বুঝতেন, মাথার চামড়া পানি দিয়ে সিক্ত করেছেন, তখন মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে দিতেন। বুখারি ও মুসলিমে আয়েশার অপর হাদিসে বলা হয়েছে : রসূল সা. যখন জানাবতের গোসল করতেন, তখন পানি আনাতেন, হাতের তালুতে পানি ঢালতেন, তারপর প্রথমে মাথার ডান পাশে তারপর বাম পাশে পানি দিতেন, তারপর উভয় হাতের তালু মাথার উপর ঘোরাতেন।

মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত : "আমি রসূল সা. এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম, তিনি দুই হাতে পানি ঢাললেন, দু'হাত দু'বার বা তিনবার ধুলেন, তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢাললেন, সেই পানি দিয়ে গুপ্তাংগ ধুলেন, তারপর মাটি দিয়ে হাত কচলালেন, তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর মুখ ও হাত ধুলেন, তারপর তিনবার মাথা ধুলেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন, তারপর তাঁর দাঁড়ানোর জায়গা থেকে সরে গিয়ে পা ধুলেন। এরপর আমি তাঁকে এক টুকরো কাপড় দিলাম, কিন্তু তিনি তা নিলেননা। (বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন।) বরং হাত দিয়ে পানি ঝাড়তে লাগলেন।" -সব কটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

৬. মহিলাদের গোসল

নারীর গোসল পুরুষের গোসলের মতোই। কিন্তু নারীর জন্য খোপা খোলা জরুরি নয়। চুলের গোড়ায় পানি পৌছানোই যথেষ্ট। কেননা উম্মে সালামা রা. বলেন : "জনৈক মহিলা জিজ্ঞাসা করে : হে রসূলুল্লাহ! আমি তো খোপা বেঁধে থাকি। জানাবতের গোসলের সময় কি তা খুলবো? রসূল সা. বললেন : তুমি তোমার মাথায় তিনবার কোষ ভরে পানি দেবে এবং তারপর সমগ্র শরীরে পানি ঢালবে- এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এতেই তুমি পাক হয়ে যাবে। -আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযি।

তিরমিযি একে উত্তম ও সহীহ্ বলেছেন। উবাইদ বিন উমাইর রা. থেকে বর্ণিত : আয়েশা রা. জানতে পারলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. মহিলাদেরকে গোসলের সময় মাথার খোপা খুলতে আদেশ দেন। আয়েশা বললেন : ইবনে উমরের জন্য অবাক হচ্ছি। সে মহিলাদের গোসলের সময় মাথার খোপা খুলতে আদেশ দিচ্ছে। তাদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলার জন্য আদেশ দিচ্ছেনা কেন? আমি ও রসূল সা. একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনবার মাথায় পানি ঢেলে দেয়ার চেয়ে বেশি কিছু তো করতামনা। -আহমদ ও মুসলিম।

কোনো মহিলা মাসিক ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর স্রাব শেষে যখন গোসল করে, তখন তার জন্য মুস্তাহাব হলো : এক টুকরা তুলা বা অনুরূপ কিছু নেবে, তাতে মেশ্‌ক বা অন্য কোনো সুগন্ধি লাগাবে, তারপর তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলবে। এতে জায়গাটা সুগন্ধিযুক্ত হবে, সেখান থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : "আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা. রসূলুল্লাহ সা. কে ঋতুস্রাবোত্তর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রসূল সা. বললেন : তোমাদের কোনো

মহিলা গোসলের সময় প্রয়োজনীয় পানি ও বরুই পাতা নেবে, তারপর ভালো মতো অযু করবে। তারপর মাথায় পানি ঢালবে, মাথা জোরে জোরে কচলাবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে। তারপর তার উপর পানি ঢালবে। তারপর মেশ্‌কযুক্ত এক টুকরো ন্যাকড়া নেবে এবং তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা বললেন : মেশ্‌কযুক্ত ন্যাকড়া দিয়ে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ! তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে! আয়েশা বললেন : সে (আসমা) সম্ভবত বিষয়টি গোপন করছিলো (অর্থাৎ বুঝেও না বুঝার ভান করছিল)। তুমি রক্তের চিহ্নগুলো মুছে ফেলবে। তারপর সে জানাবতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। রসূল সা. বললেন : তুমি তোমার প্রয়োজনীয় পানি নেবে, তারপর উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর মাথায় পানি ঢালবে, মাথা কচলাবে যাতে চামড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর উপর থেকে পানি ঢালবে। আয়েশা রা. বললেন : আনসার রমণীগণ কতো ভালো! দীন সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞান অর্জনে লজ্জা তাদের বাধা দেয়না। -তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ।

৭. গোসল সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল

১. ঋতুস্রাব ও জানাবত- উভয়ের জন্য, জুমা ও ঈদের জন্য, কিংবা জানাবত ও জুমার জন্য একই গোসল যথেষ্ট হবে- যদি উভয়ের জন্য নিয়ত করা হয়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিয়ত করবে, তেমন ফল পাবে।

২. জানাবতের জন্য যখন গোসল করা হয়, তার পূর্বে অযু না করলেও গোসলেই অযুর কাজ হয়ে যাবে। আয়েশা রা. বলেছেন : রসূল সা. গোসলের পর অযু করতেননা। ইবনে উমর রা. বলেছেন : এক ব্যক্তি তাকে বললো : আমি গোসলের পর অযু করে থাকি। ইবনে উমর রা. তাকে বললেন : তুমি অতিমাত্রায় করছো। আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেছেন : আলেমগণ একমত হয়েছেন, অযু গোসলের আওতাধীন। আর জানাবত থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত ক্ষুদ্রতর নাপাকি থেকেও পবিত্রতা অর্জন করিয়ে দেয় ও নাপাকি দূর করে। কেননা জানাবতের বাধা 'হাদাসে'র (ক্ষুদ্রতর নাপাকির) বাধার চেয়ে অনেক বেশি। তাই ক্ষুদ্রতর নাপাকি থেকে মুক্তির নিয়ত বৃহত্তর নাপাকি থেকে মুক্তির আওতাভুক্ত হয়ে যায় এবং বৃহত্তরটির নিয়ত যথেষ্ট হয়ে যায়।

৩. জুনুবি ও ঋতুবতীর জন্য লোম অপসারণ, নখ কাটা ও বাজারে যাওয়া জায়েয। এটা মাকরূহও নয়। আতা বলেছেন : জুনুবি ক্ষৌর কাজ সম্পাদন করবে, নখ কাটবে ও মাথার চুল কামাবে। অযু করুক বা না করুক- তাতে কিছু যায় আসেনা। -বুখারি।

৪. গোসলখানায় প্রবেশ করাতে কোনো দোষ নেই- যদি প্রবেশকারী কারো শরীরের গোপনীয় অংশের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকে এবং অন্য কেউ তার গোপনীয় অংশের দিকে না থাকায়। আহমদ বলেন : যদি জানো, গণ-গোসলখানায় যারা আছে তারা লুংগি বা পাজামা পরিহিত আছে, তবে প্রবেশ করো, নচেত করোনা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কোনো পুরুষ অপর পুরুষের এবং কোনো নারী অপর নারীর গোপন অংগের দিকে তাকাবেনা।" গোসল খানায় আল্লাহর নাম উচ্চারণে বাধা নেই। আল্লাহর স্মরণ সর্বাবস্থায় ভালো কাজ- যতোক্ষণ না কোনো নিষেধাজ্ঞা আসে। রসূল সা. সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন।

৫. রুমাল তোয়ালে ইত্যাদি দিয়ে অংগ প্রত্যংগ মোছা অযুতে, গোসলে, শীতে ও গ্রীষ্মে জায়েয।

৬. নারীর গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষের গোসল এবং পুরুষের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে নারীর গোসল জায়েয। অনুরূপ, স্বামী ও স্ত্রীর একই পাত্র থেকে এক সাথে গোসল করাও

জায়েয। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. এর জনৈক স্ত্রী একটি পাত্রে গোসল করলেন। এরপর সেই পাত্র থেকে অযু করার জন্য অথবা গোসল করার জন্য রসূল সা. এলেন। স্ত্রী বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আমি জুনুবি ছিলাম। রসূল সা. বললেন : পানি কখনো জুনুবি হয়না। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি।

আয়েশা রা. রসূল সা. এর সাথে একই পাত্র থেকে একই সাথে গোসল করতেন আর একে অপরকে বলতেন : "আমার জন্য একটু পানি রেখো।"

৭. জনসমক্ষে উলংগ হয়ে গোসল করা জায়েয নেই। কোনো সতর খোলা হারাম। কাপড় ইত্যাদি দিয়ে আঁড়াল করে নিলে ক্ষতি নেই। ফাতেমা রা. রসূল সা. কে কাপড় দিয়ে আঁড়াল করে দিতেন এবং তিনি গোসল করতেন। অবশ্য লোকজনের দৃষ্টি থেকে দূরে উলংগ হয়ে গোসল করলে দোষ নেই। মূসা (আ.) উলংগ হয়ে গোসল করেছিলেন- যেমন বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আইয়ূব (আ.) যখন নগ্ন হয়ে গোসল করছিলেন, তখন সহসা তার উপর এর থলি স্বর্ণমুদ্রা পড়লো। আইয়ূব (আ.) সেটি নিজের কাপড়ের মধ্যে লুকাতে লাগলেন। আল্লাহ তাকে বললেন : হে আইয়ূব, তুমি যা দেখতে পাচ্ছো, তা থেকে কি তোমাকে আমি অভাবশূন্য করিনি? আইয়ূব বললেন : হে আল্লাহ, তোমার সম্মানের শপথ, অবশ্যই করেছো, তোমার বরকত থেকে আমি কখনো অভাবশূন্য নই। -আহমদ, বুখারি, নাসায়ী।

৭. তাইয়াম্মুম

১. তাইয়াম্মুমের সংজ্ঞা

তায়াইম্মুমের আভিধানিক অর্থ : ইচ্ছা বা সংকল্প করা। তাইয়াম্মুমের পারিভাষিক অর্থ : নামায যাতে বিশুদ্ধ হয়, সে উদ্দেশ্যে দু'হাত ও মুখমণ্ডলকে মাটি দিয়ে মোছা বা মাসেহ করার ইচ্ছা করা।

২. শরিয়তে তাইয়াম্মুমের বৈধতা

শরিয়তে তাইয়াম্মুমের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা (মুসলমানদের মতৈক্য) দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا .

"যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও অথবা প্রবাসে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ পেশাব বা পায়খানা করে আসে, কিংবা তোমরা স্ত্রী সহবাস করে থাকো, অথবা পানি পাওনি, তাহলে পবিত্র মাটি পাওয়ার ইচ্ছা করো, তারপর তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যধিক মার্জনাকারী, অত্যধিক ক্ষমাশীল।" (সূরা ৪, নিসা : আয়াত ৪৩)

সুন্নাহ বা হাদিসের প্রমাণ : আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন :

جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِيْ وَلِأُمَّتِيْ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ طَهُوْرُهُ.

"সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য ও আমার উম্মতের জন্য মসজিদ ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কোনো ব্যক্তির নিকট যে কোনো স্থানে নামাযের সময় সমাগত হোক, তার কাছে তার পবিত্রকারী রয়েছে।" -আহমদ।

ইজমা : বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, অযু ও গোসলের বিকল্প হিসেবে তাইয়াম্মুম শরিয়তে বৈধ- এ ব্যাপারে মুসলমানগণ মতৈক্যে উপনীত হয়েছে।

৩. এটা উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বিশেষত্ব

বস্তুত তাইয়াম্মুম এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা আল্লাহ এই উম্মতকে বিশেষভাবে চিহ্নিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কাউকে দেয়া হয়নি : (১) এক মাসের দূরত্ব থেকে মানুষ আমাকে ভয় পায়- যা দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কোনো ব্যক্তির নিকট নামায সমাগত হোক, সে যেনো নামায পড়ে নেয়। (৩) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে- যা আমার পূর্ববর্তী কারোর জন্য হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) ইতিপূর্বে প্রত্যেক নবী শুধু নিজের জাতির নিকট প্রেরিত হতেন। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির নিকট। -বুখারি ও মুসলিম।

৪. তাইয়াম্মুম শরিয়তে বিধিবদ্ধ হবার কারণ

"আয়েশা রা. বর্ণনা করেন : একদিন আমরা কোনো এক সফরে রসূল সা. এর সাথে বের হলাম। এক মরু প্রান্তরে আমার একটি হার হারিয়ে গেলো। হারটি খোঁজার জন্য রসূল সা. যাত্রাবিরতি করলেন। লোকেরাও (সাহাবিগণ) তাঁর সাথে যাত্রাবরিতি করলো। অথচ সেখানে পানি ছিলোনা। সাহাবিদের নিকটও পানি ছিলোনা। অগত্যা লোকেরা আবু বকরের রা. কাছে এলো। তারা বললো : দেখতে পাচ্ছেন না, (আপনার মেয়ে) আয়েশা কী করেছে? (হার হারিয়ে সবাইকে যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য করেছে)। আবু বকর আমার কাছে এলেন। তখন রসূলুল্লাহ সা. আমার উরুর উপর ঘুমিয়ে। আবু বকর আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং আল্লাহ যেমন চেয়েছিলেন তেমন বকাঝকা করলেন। তারপর ক্রমাগত আমার কোমরে ধাক্কা দিতে লাগলেন (যাতে উঠে রওনা হই), কিন্তু রসূল সা. আমার উরুর উপর ঘুমিয়ে থাকার কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারছিলামনা। অবশেষে সকাল পর্যন্তই তিনি পানিবিহীন অবস্থায় ঘুমিয়ে রইলেন। তখন আল্লাহ "তাইয়াম্মুম করো" আদেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল করলেন।

উসাইদ বিন হুয়াইর বললেন : হে আবু বকরের বংশধর! এটাই তোমাদের একমাত্র বরকত (শুভাশীষ) নয় (তোমাদের আরো বহু বরকত বা শুভাশীষ রয়েছে)। আয়েশা বলেন : সহসা আমি যে উটটির উপর ছিলাম, তাকে উঠালাম। তার নিচেই হারটি পেয়ে গেলাম।" -তিরমিযি ব্যতিত সবকটি হাদিস গ্রন্থ।

৫. যে সকল কারণে তাইয়াম্মুম বৈধ

তাইয়াম্মম বৈধ ক্ষুদ্র অপবিত্রতায় যাতে অযুর প্রয়োজন হয় এবং বড় অপবিত্রতায় যাতে গোসলের প্রয়োজন হয়। স্থায়ী নিবাসে হোক বা প্রবাসে হোক, নিম্নোক্ত কারণসমূহের যে কোনো একটি পাওয়া গেলেই তাইয়াম্মুম বৈধ :

ক. পানি পাওয়া না গেলে, অথবা পবিত্রতা অর্জনে যথেষ্ট পরিমাণে পানি পাওয়া না গেলে। ইমরান বিন হুসাইন রা. বলেছেন :

"আমরা একটি সফরে রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে ছিলাম। তিনি উপস্থিত জনগণকে সাথে নিয়ে নামায পড়লেন। দেখলেন, এক ব্যক্তি জামাত থেকে আলাদা হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে বললেন : তুমি নামাযে যোগ দাওনি কেন? সে বললো : আমি তো জানাবতে (বৃহত্তর অপবিত্রাবস্থায়) আছি, অথচ পানি নেই। তিনি বললেন : তুমি মাটি ব্যবহার করো। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।" -বুখারি ও মুসলিম। আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "যে পানি পায়না, তার জন্য মাটিই পবিত্রকারী- চাই দশ বছর ধরেই হোক না কেন।" -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযি একে সহীহ ও উত্তম বলেছেন। তবে এ ধরনের ব্যক্তির জন্য তাইয়াম্মুমের পূর্বে তার কাফেলা অর্থাৎ সফর সংগিদের কাছে পানি আছে কিনা খোঁজা ও চেয়ে নেয়ার চেষ্টা করা কর্তব্য। সফর সংগিদের কাছে না পাওয়া গেলে আশপাশে কোথাও পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। যখন কোথাও নেই বলে নিশ্চিত হবে অথবা অনেক দূরে আছে বলে জানা যাবে, তখন আর খোঁজার প্রয়োজন হবেনা।

খ. যখন তার দেহে কোনো যখম বা রোগ থাকে, আর পানি ব্যবহারে রোগ বেড়ে যাওয়া বা আরোগ্য লাভ বিলম্বিত হবার আশংকা থাকে- চাই এটা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যাক কিংবা নির্ভরযোগ্য চিকিৎসকের কাছ থেকে জানা যাক। জাবির রা. বলেন : "আমরা একটা সফরে গেলাম। আমাদের জনৈক সংগি পাথরের আঘাতে আহত হলো। তার মাথা ফেটে গেলো। ঐ অবস্থায় পরে তার স্বপ্নদোষ হলো। সে তার সাথিদেরকে জিজ্ঞাসা করলো : তোমরা কি মনে করো, আমার জন্য তাইয়াম্মুম করা বৈধ? তারা বললো : আমরা মনে করিনা তোমার জন্য এটা বৈধ। তুমি তো পানি ব্যবহারে সক্ষম। এরপর সে গোসল করলো এবং মারা গেলো। পরে যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এলাম, তাঁকে ব্যাপারটা জানানো হলো। তিনি বললেন : ওরা তাকে হত্যা করেছে। তারা যখন জানেনা, তখন জিজ্ঞাসা করলোনা কেন? অজ্ঞতার প্রতিকার তো জিজ্ঞাসা দ্বারাই সম্ভব। তার জন্য তো তাইয়াম্মুম করা, ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে নিংড়ে ফেলা, কিংবা ক্ষতস্থানের উপর একটা ন্যাকড়া দিয়ে পট্টি বেঁধে তার উপর মাসেহ করা এবং অবশিষ্ট শরীর ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট ছিলো।" -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দার কুতনি।

গ. যখন পানি অত্যধিক ঠাণ্ডা থাকে এবং সে পানি ব্যবহারে ক্ষতি হবে বলে প্রবল আশংকা থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে কাউকে পারিশ্রমিক দিয়েও যদি পানি গরম করার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, কিংবা গোসলখানায় প্রবেশ করা সম্ভব না হয়। তাহলে তাইয়াম্মুম করা বৈধ হবে। আমর ইবনুল আস রা. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : তাকে যখন যাতুস সালাসিল অভিযানে পাঠানো হলো, তখনকার সম্পর্কে তিনি বলেছেন : একদিন প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। গোসল করলে মরে যেতে পারি বলে আশংকা হলো। তাই আমি তাইয়াম্মুম করলাম এবং সাথিদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লাম। পরে যখন রসূল সা. এর কাছে এলাম, তখন সাথিরা রসূল সা. কে ঘটনাটা জানালো। রসূল সা. বললেন : হে আমর, তুমি অপবিত্রাবস্থায় তোমার সাথিদের নামায পড়িয়েছ? আমি বললাম : আল্লাহর এই উক্তিটা আমার মনে পড়েছিল : "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়।" (সূরা ৪, আননিসা : আয়াত ২৯) তাই তাইয়াম্মুম করে নামায পড়িয়েছি। তখন রসূল সা. হেসে দিলেন। আর কিছুই বললেন না। -আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম, দার কুতনি, ইবনে হিব্বান, বুখারি।

ঘ. পানি নিকটে থাকলেও তা সংগ্রহ করতে গেলে জীবনহানি, সম্ভ্রমহানি, সম্পদহানি বা সংগিদের হারানোর আশংকা, অথবা পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে এমন শত্রুর অবস্থান, যা দ্বারা ক্ষতির আশংকা রয়েছে, চাই তা মানুষ হোক অথবা অন্য কিছু, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

কারাবন্দী হওয়ার দরুন পানি ব্যবহারে অক্ষম অথবা পানি হস্তগত করার সরঞ্জাম যথা বালতি ও রশির অভাবে পানি যোগাড়ে অক্ষম- এসব ক্ষেত্রে পানির বিদ্যমানতা অবিদ্যমানতারই সমার্থক। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির গোসল করলে কোনো মিথ্যা অপবাদের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে, তার পক্ষেও তাইয়াম্মুম বৈধ।[১০]

ঙ. যখন নিজের বা সফর সংগির বর্তমানে বা ভবিষ্যতে পান করার জন্য পানি সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এমনকি সেই সফর সংগি যদি দংশনে অভ্যস্ত নয় এমন কুকুরও হয় অথবা আটার খামির করা, রান্না করা বা অমোছনীয় নাপাকি দূর করার প্রয়োজনে পানি সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দেয়, তাহলে তাইয়াম্মুম করবে ও সংগে বিদ্যমান পানিকে সংরক্ষণ করবে। ইমাম আহমদ রা. বলেছেন : বহু সাহাবি শুধুমাত্র নিজেদের পান করার জন্য পানি সংরক্ষণ ও তাইয়াম্মুম করেছেন। আর আলী রা. বলেছেন : কোনো প্রবাসী বৃহত্তর অপবিত্রতায় (জানাবত) আক্রান্ত হলে, তার কাছে স্বল্প পরিমাণ পানি থাকলে এবং পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকলে সে তাইয়াম্মুম করবে, গোসল করবেনা। -দার কুতনি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : যে ব্যক্তি পানির অভাবে পেশাব বা পায়খানা চেপে রাখে, তার জন্য পেশাব পায়খানা চেপে রেখে অযু রক্ষা করার চেয়ে চেপে না রেখে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়া উত্তম।

চ. পানি ব্যবহারের ক্ষমতা থাকলেও পানি দ্বারা অযু বা গোসল করতে গেলে নামাযের সময় পেরিয়ে যাওয়ার আশংকা আছে- এরূপ অবস্থায় তাইয়াম্মুম করে নামায পড়বে। এ নামায আর দোহরাতে হবেনা।

৬. কোন্ মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করতে হয়?

পবিত্র মাটি এবং মাটি থেকে উদ্ভূত যে কোনো জিনিস, যেমন বালু, পাথর ও চুন দ্বারা তাইয়াম্মুম বৈধ। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন : "তোমরা পবিত্র 'সঈদ' দিয়ে তাইয়াম্মুম করো।" আর আরবি অভিধান বিশেষজ্ঞরা একমত, 'সঈদ' পৃথিবীর উপরি ভাগকে বলা হয়, চাই তা মাটি হোক বা অন্য কিছু হোক।

৭. তাইয়াম্মুমের পদ্ধতি

তাইয়াম্মুমকারীর উচিত, সর্বপ্রথমে নিয়ত করা (তাইয়াম্মুমে নিয়ত করা ফরয। এ ব্যাপারে অযুর অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। অতপর আল্লাহ্র নাম নেবে। পবিত্র মাটির উপর দু'হাত মারবে। আর সেই দু'হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও হাতের কনুই পর্যন্ত মুছে নেবে। এ ব্যাপারে আম্মার রা. এর হাদিসের চেয়ে বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট আর কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি। আম্মার বলেন :

"আমি জানাবত তথা বড় নাপাকিতে আক্রান্ত হলাম। এরপর পানি পেলামনা। অগত্যা মাটিতে গড়াগড়ি খেলাম এবং নামায পড়লাম। অতপর এ ঘটনা রসূল সা. কে জানালাম। তিনি বললেন : (গড়াগড়ি না খেয়ে) তোমরা শুধু এ রকম করলেই চলতো : এই বলে রসূল সা. তাঁর দু'হাতের তালু মাটিতে মারলেন, হাত দুখানিতে ফুঁ দিলেন (ধুলো ঝেড়ে ফেললেন) তারপর সেই দু'হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নিলেন। -বুখারি ও মুসলিম। অপর

---

১০. অপবাদের শিকার হবার আশংকার একটি উদাহরণ হলো, কোনো অবিবাহিত বন্ধু তার বিবাহিত বন্ধু যে বাড়িতে সপরিবারে বসবাস করে সেখানে অতিথি হয়ে রাত কাটালো এবং বীর্যস্খলনজনিত অপবিত্রতায় আক্রান্ত হলো। এমতাবস্থায় গোসল করলে তাকে কেন্দ্র করে সন্দেহ সৃষ্টি বা অপবাদ আরোপিত হতে পারে।

বর্ণনার ভাষা হলো : তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তোমার দু'হাতের তালু মাটিতে মারবে, তারপর হাতের তালুতে ফুঁ দেবে, অতপর সেই হাতের তালু দুখানা দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ও হাতের তালু কনুই পর্যন্ত মুছে নেবে বা মাসেহ করবে। -দার কুতনি। এ হাদিস থেকে জানা গেলো, একবার হাত মারাই যথেষ্ট এবং দু'হাত মাসেহ করার সময় হাতের তালু মাসেহ করাই যথেষ্ট। আর মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করার সময় ফুঁ দিয়ে হাত থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলা এবং মুখে ধুলো না মাখা সুন্নত।

৮. তাইয়াম্মুম দ্বারা কী কী কাজ করা বৈধ হয়?

তাইয়াম্মুম হচ্ছে পানির অবর্তমানে অযু ও গোসলের বিকল্প। কাজেই অযু ও গোসল দ্বারা যে যে কাজ বৈধ হয়, তাইয়াম্মুম দ্বারাও সেই সকল কাজ বৈধ, যেমন- নামায পড়া ও কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি। এর বিশুদ্ধতার জন্য নামাযের ওয়াক্ত হওয়া শর্ত নয়। তাইয়াম্মুমকারী এক তাইয়াম্মুম দ্বারা যতো ইচ্ছা ফরয ও নফল নামায পড়তে পারবে। তাইয়াম্মুমের বিধি হুবহু অযুর বিধির মতোই এবং সম্পূর্ণ সমান। আবু যর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মাটি হচ্ছে মুসলমানের পবিত্রকারী- এমনকি যদি দশ বছর ধরেও পানি না পায়। তারপর যখনই পানি পাবে, তৎক্ষণাত তা নিজের শরীরের চামড়ায় স্পর্শ করাবে। কেননা সেটাই উত্তম।" -আহমদ ও তিরমিযি।

৯. তাইয়াম্মুম ভংগের কারণসমূহ

যেসব কারণে অযু ভংগ হয়, অবিকল সেসব কারণেই তাইয়াম্মুম ভংগ হয়। কেননা তাইয়াম্মুম হলো অযুর স্থলাভিষিক্ত। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি পানি না পেয়ে তাইয়াম্মুম করেছিল, তার তাইয়াম্মুম পানি পাওয়া মাত্রই ভেংগে যাবে। আর যে ব্যক্তি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম ছিলোনা, সে সক্ষম হওয়া মাত্রই তার তাইয়াম্মুম ভেংগে যাবে। কিন্তু তাইয়াম্মুম করে নামায পড়ার পর যদি পানি পাওয়া যায়, অথবা নামায পড়ার পর পানি ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জিত হয়, তাহলে নামায দোহরাতে হবেনা- যদিও নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত : "দুই ব্যক্তি সফরে বেরুল। সহসা নামাযের সময় সমাগত হলো। কিন্তু তাদের কাছে পানি ছিলোনা। তাই তারা পবিত্র মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়লো। তারপর ওয়াক্তের ভেতরেই পানি পেলো। তাই একজন অযু ও নামায দোহরালো। অপরজন দোহরালোনা। তারপর উভয়ে রসূলুল্লাহ সা. কাছে এলে তাদের ঘটনা বর্ণনা করলো। রসূল সা. যে ব্যক্তি অযু ও নামায দোহরায়নি তাকে বললেন : তুমি সুন্নত সঠিকভাবে আদায় করেছো এবং তোমার নামায তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে জন নামায দোহরিয়েছে ও অযু করেছে, তাকে বললো : তুমি দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। -আবু দাউদ ও নাসায়ী। তবে যদি পানি পায় এবং নামায শুরু করার পর ও শেষ করার আগে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার অযু ভেংগে যাবে এবং তাকে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এর প্রমাণ আবু যর বর্ণিত উপরোক্ত হাদিস। আর যখন জানাবত তথা বড় নাপাকিতে আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা ঋতুবতী মহিলা তাইয়াম্মুম বৈধকারী কারণগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি কারণে তাইয়াম্মুম করে ও নামায পড়ে, তখন তার নামায দোহরাতে হবেনা। তবে যখন পানি ব্যবহারে সক্ষম হবে, তখন তার গোসল করা ওয়াজিব হবে। কেননা ইমরান রা. বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে : "রসূলুল্লাহ সা. ইমামতি করে নামায পড়ালেন। যখন নামায শেষ করলেন, দেখলেন এক ব্যক্তি জামাতের সাথে নামায না পড়ে আলাদা এক জায়গায় বসে আছে। তিনি তাকে বললেন : ওহে অমুক, জামাতের সাথে নামায পড়লেনা কেন? সে বললো : আমাকে বড় নাপাকিতে পেয়ে বসেছে, অথচ পানি পাইনি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার মাটি ব্যবহার করা উচিত। ওটাই তোমার

জন্য যথেষ্ট। এরপর ইমরান রা. বলেন : যখন পানি পাওয়া গেলো, রসূল সা. জানাবতধারীকে এক পাত্রভর্তি পানি দিয়ে বললেন : "যাও, ওটা তোমার শরীরে ঢেলে নাও"। -বুখারি।

৮. পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ

১. পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহের বৈধতা

পট্টি বা ব্যাণ্ডেজ বা অনুরূপ যে সকল জিনিস অসুস্থ অংগের উপর বাঁধা হয় তার উপর মাসেহ করা বৈধ। এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস রয়েছে। এ সকল হাদিস দুর্বল হলেও এগুলোর একটি অপরটিকে জোরদার ও সবল করে এবং এগুলোকে বৈধতা প্রমাণের যোগ্য বানায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাবির রা. এর বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন :

"জনৈক ব্যক্তি পাথরের আঘাতে আহত হলো। তার মাথা ফেটে গেলো। তারপর তার স্বপ্ন দোষ হলো। সে তার সাথিদের জিজ্ঞাসা করলো : তোমরা কি মনে করো আমার তাইয়াম্মুম করার অনুমতি আছে? তারা বললো : আমরা তোমার জন্য তাইয়াম্মুমের অনুমতির অবকাশ দেখিনা। তুমি তো পানি ব্যবহারে সক্ষম। এরপর লোকটি গোসল করলো এবং পরক্ষণেই মারা গেলো। পরে যখন আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট পৌঁছলাম এবং তাঁকে উক্ত ঘটনা জানানো হলো, তখন তিনি বললেন : ওরা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ ওদের হত্যা করুন! তারা যখন জানেনা তখন কেন জিজ্ঞাসা করলোনা? অজ্ঞতার প্রতিকার তো জিজ্ঞাসা দ্বারাই করা যায়। তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিলো যে, তাইয়াম্মুম করে নিতো, ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতো অথবা ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে তার উপর মাসেহ করতো। তার পর অবশিষ্ট শরীর ধুয়ে ফেলতো। -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দার কুতনি। ইবনে উমর থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত। তিনি পট্টি ও ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করেছেন।

২. মাসেহ্‌র বিধি

পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করার বিধি হলো অযু ও গোসলে রুগ্ন অংগ ধোয়া বা মাসেহ করার পরিবর্তে পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করা ওয়াজিব।

৩. মাসেহ করা কখন ওয়াজিব

যার শরীরের কোনো অংগে ক্ষত বা ভাংগা বিদ্যমান এবং সে অযু বা গোসল করতে ইচ্ছুক, তার উপর তার অংগগুলো ধোয়া ওয়াজিব। সেজন্য পানি গরম করার প্রয়োজন হলে গরম করে নিতে হবে। কিন্তু অসুস্থ অংগটি ধোয়ায় যদি ক্ষতির আশংকা থাকে, যেমন- ধুলে কোনো রোগ দেখা দিতে পারে, অথবা বিদ্যমান ব্যথা বেড়ে যেতে পারে অথবা বিদ্যমান রোগের নিরাময় বিলম্বিত হতে পারে, তাহলে এই ধৌতকরণের ফরযটি রুগ্ন অংগের জন্যে মাসেহ্ রূপান্তরিত হবে। মাসেহ করাতেও যদি ক্ষতির ভয় থাকে, তাহলে তার ক্ষতের উপর একটি পট্টি বা ভাংগার উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ওয়াজিব। এই পট্টি বা ব্যাণ্ডেজ এমনভাবে বাঁধতে হবে, তা যেনো বাঁধার প্রয়োজন ব্যতিত অসুস্থ অংগের সীমা অতিক্রম না করে। তারপর সমগ্র পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের উপর এমনভাবে মাসেহ করবে যেনো, একটু জায়গাও বাদ না যায়। এই পট্টি বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধার আগে শরীর পবিত্র থাকতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই এবং এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমাও নেই। যতক্ষণ ওযর থাকবে ততোক্ষণ অব্যাহতভাবে অযু ও গোসলে পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করতে হবে।

৪. যেসব কারণে মাসেহ বাতিল হয়

পট্টি বা ব্যাণ্ডেজ সংশ্লিষ্ট স্থানের রোগ সেরে যাওয়ার কারণে খুলে ফেলা বা আপনা থেকে পড়ে যাওয়া অথবা ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলা না হলেও শুধু রোগ সেরে যাওয়ার কারণে মাসেহ বাতিল হবে।

৯. যে পবিত্র হবার জন্যে পানি বা মাটি পায়না সে কিভাবে নামায পড়বে?

পানি ও মাটি উভয়টিই যখন আয়ত্তের ও নাগালের বাইরে, তখন অযু ও তাইয়াম্মুম ছাড়াই নামায পড়ে নেবে। এ নামায আর কখানো দোহরানো লাগাবেনা। মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আসমার নিকট থেকে একটা হার ধার নিয়েছিলেন এবং তা হারিয়ে গেলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. হারটির অনুসন্ধানে কতিপয় সাহাবিকে পাঠালেন। এই সময় নামাযের সময় সমাগত হলে তারা বিনা অযুতে নামায পড়লেন। পরে তারা রসূল সা. এর নিকট উপস্থিত হলে তাঁর নিকট বিষয়টি পেশ করলো। পরক্ষণেই তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। উমাইদ বিন হুযাইর বললেন : (হে আয়েশা!) আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আপনার উপর যখনই কোনো মুসিবত এসেছে, আল্লাহ আপনাকে তা থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেছেন এবং তা থেকে মুসলমানদের জন্য কল্যাণ সাধন করেছেন।" এ সকল সাহাবি পবিত্রতা অর্জনের সকল উপকরণ থেকে যখন বঞ্চিত, তখনও নামায পড়েছেন এবং বিষয়টি যখন রসূল সা. এর নিকট উত্থাপন করেছেন তখন তিনি কোনো ক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেননি এবং তাদেরকে পুনরায় নামায পড়তেও বলেননি। ইমাম নববী বলেছেন : এটাই এ বিষয়ে সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ।

১০. হায়েয (ঋতুস্রাব)

১. হায়েযের সংজ্ঞা

আরবিতে হায়েযের শাব্দিক অর্থ প্রবাহ বা স্রাব। নারীর যোনি দ্বার দিয়ে সুস্থ অবস্থায় সন্তান প্রসব বা আঘাত ব্যতিত যে রক্ত নির্গত হয়- সেটাই হায়েয।

২. হায়েযের জন্যে বয়সকাল

অধিকাংশ আলেমের মতে মেয়েদের নয় বছর বয়স হওয়ার আগে হায়েয শুরু হয়না।[১১] এই বয়সে উপনীত হওয়ার আগে রক্ত নির্গত হলে তা ঋতুস্রাব নয়, বরং রোগজনিত ও ব্যতিক্রমী স্রাব। এটি জীবনের শেষ সময় পর্যন্তও প্রলম্বিত হতে পারে। এর কোনো শেষ সময় নির্দিষ্ট আছে- এমন কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই বৃদ্ধা নারী যখন রক্ত দেখতে পাবে, তখন তা ঋতুস্রাবই গণ্য হবে।

৩. হায়েযের রক্তের বর্ণ

হায়েয বা ঋতুস্রাবের বর্ণ নিম্নলিখিতগুলোর যে কোনো একটি হওয়া চাই :

ক. কালো : কেননা ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : "ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশের ইসতিহাজা (রোগজনিত স্রাব) হতো। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : ঋতুস্রাবের রক্ত হয়ে থাকলে তা কালো হবে এবং তা মেয়েদের নিকট পরিচিত হবে।[১২] এ রকম যখন হবে, তখন তুমি নামায বন্ধ রেখো, কিন্তু অন্য রকম হলে অযু ও নামায যথারীতি অব্যাহত রেখো। কেননা, ওটা রোগজনিত। -আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, দারু কুতনি।

খ. লাল : কেননা এটাই রক্তের আসল বর্ণ।

গ. হলুদ : এটা এক ধরনের পানি, যা পুঁজের মতো দেখা যায়। উপরে হলুদ রং থাকে।

ঘ. ধুসর : সাদা ও কালোর মধ্যবর্তী বর্ণ। ময়লা পানির মতো। কেননা আয়েশা রা. এর মুক্ত

---

১১. অর্থাৎ চন্দ্র বছর, যা ৩৫৪ দিনে হয়ে থাকে।

১২. এর আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ হলো, তার একটা বিশেষ গন্ধ থাকবে।

বাদী মারজানা বলেন : "মহিলারা আয়েশা রা. এর নিকট হলুদ রং মাখা সেই তুলো পাঠাতো, যা তারা ঋতুস্রাবের লক্ষণ অবশিষ্ট আছে কিনা, দেখার জন্য যৌনাংগে ঢুকিয়ে রাখতো। আয়েশা রা. বলতেন, হলুদ রংমুক্ত পরিষ্কার সাদা তুলো না দেখা পর্যন্ত (নামায পড়ার জন্য) তাড়াহুড়ো করোনা। -মালেক, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, বুখারি।

হলুদ ও ধুসর বর্ণ যদি ঋতুস্রাবের মেয়াদের মধ্যে দৃশ্যমান হয়, তবে তাকে ঋতুস্রাব ধরা হয়। নচেত ঋতুস্রাব গণ্য হয়না। কেননা উম্মে আতিয়া রা. বলেন : "পবিত্রতা অর্জনের পর হলুদ বা ধুসর বর্ণের কোনো কিছুকে আমরা ধর্তব্য মনে করতাম না।" -আবু দাউদ, বুখারি। বুখারির বর্ণনায় 'পবিত্রতা অর্জনের পর' কথাটা নেই।

৪. হায়েযের মুদ্দত[১৩]

ঋতুস্রাবের কোনো সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মেয়াদ নেই। মেয়াদ নির্ধারণের কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই। তবে কারো কোনো নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকলে সে অনুযায়ী কাজ করা যাবে। উম্মে সালামা রা.-এর হাদিসে বলা হয়েছে : তিনি জনৈক মহিলা সম্পর্কে রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করেন, যার সব সময় রক্ত নির্গত হয়। রসূল সা. বললেন : সে যে কয়দিন ঋতুবতী থাকে, তা মাসের কয়দিন, সেটা যেনো সে লক্ষ্য করে। সেই কয়দিন সে নামায বাদ দেবে, তারপর গোসল করবে ও গুপ্তাংগে একটা ন্যাকড়া বাঁধবে। তারপর নামায পড়বে। -তিরিমিযি ব্যতিত অবশিষ্ট পাচঁটি হাদিস গ্রন্থ।

আর যদি কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকে, তবে রক্তের লক্ষণাদি দ্বারা তার আদি অন্ত নির্ধারণ করা হবে। ইতিপূর্বে ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশের হাদিস এর প্রমাণ। ঐ হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "হায়েযের রক্ত হলে তা হবে সুপরিচিত কালো বর্ণের।" এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, হায়েয বা ঋতুস্রাবের রক্ত অন্য রক্ত থেকে ভিন্ন এবং মহিলাদের নিকট তা পরিচিত।

৫. দুই হায়েযের মাঝে পবিত্রাবস্থার মেয়াদ

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত, দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী পবিত্রাবস্থার সুনির্দিষ্ট সীমা নেই। এর সর্বনিম্ন মেয়াদ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ অনুমান করেছেন পনের দিন। কারো কারো মতে তেরো দিন। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সর্বনিম্ন মেয়াদ নির্ধারণের জন্য কোনো অকাট্য দলিল নেই, যা দ্বারা প্রমাণ দর্শানো যায়।

১১. নিফাস (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব)

১. নিফাসের সংজ্ঞা

নিফাস হলো, নারীর যৌনাংগ দিয়ে সন্তান প্রসবের পর নির্গত রক্ত, চাই তা গর্ভপাতের কারণেই হোকনা কেন?

২. নিফাসের মেয়াদ

নিফাসের কোনো সর্বনিম্ন মেয়াদ নেই। এমনকি তা এক মুহূর্তও হতে পারে। সন্তান প্রসবের পর যদি কারো রক্তস্রাব হয়ে কিছুক্ষণ পরেই বন্ধ হয়ে যায়, অথবা মোটেই রক্তস্রাব ছাড়া সন্তান প্রসব হয় এবং নিফাস শেষ হয়ে যায়, তাহলে পবিত্রতা অর্জনকারিণীদের যেমন নামায রোযা

---

১৩. ঋতুস্রাবের মেয়াদ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কেউ বলেন : সর্বনিম্ন কোনো মেয়াদ নেই। কেউ বলেন : সর্বনিম্ন মেয়াদ এক দিন ও এক রাত। অন্যরা বলেন : তিন দিন। সর্বোচ্চ মেয়াদ কারো মতে দশ দিন, কারো মতে পনের দিন।

ইত্যাদি আদায় করতে হয়, তেমনি তারও আদায় করতে হবে। নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন। উম্মে সালামা রা. বর্ণিত হাদিসে এ কথাই জানা যায় :

উম্মে সালামা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে নিফাসগ্রস্ত মহিলারা চল্লিশ দিন বসে বসে কাটিয়ে দিতো। (অর্থাৎ নামায রোযা ইত্যাদি আদায় করতোনা)। -নাসায়ী ব্যতিত অন্য সব কটি হাদিস গ্রন্থ। এ হাদিস উদ্ধৃত করার পর তিরমিযি বলেছেন : সাহাবি, তাবেয়ী ও তাদের পরবর্তীদের মধ্য হতে সকল আলেম একমত নিফাসগ্রস্তরা চল্লিশ দিন নামায বর্জন করবে। অবশ্য তার আগে পবিত্রতা অর্জন করলে গোসলান্তে নামায রোযা আদায় করবে। আর চল্লিশ দিন পর রক্ত দেখা গেলে অধিকাংশ আলেমের মতে নামায বর্জন করা চলবেনা।

১২. ঋতুবতী ও নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের জন্য যা যা নিষিদ্ধ

জুনুবির (বীর্যপাতজনিত অপবিত্র ব্যক্তি উপর ইতিপূর্বে যা যা হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ঋতুবতী ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার উপরও সেসব কাজ হারাম। তাছাড়া এই তিনজনকেই 'বড় অপবিত্রতায় লিপ্ত' আখ্যায়িত করা হয়। ঋতুবতী ও নিফাসগ্রস্ত নারীর জন্য ইতিপূর্বে যা যা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, তা ছাড়া নিম্নোক্ত কাজগুলোও নিষিদ্ধ :

১. রোযা

ঋতুবতী ও নিফাসগ্রস্ত নারীর জন্য রোযা রাখা বৈধ নয়। যদি রোযা রাখে তবে তা বাতিল বলে গণ হবে। ঋতু ও প্রসবোত্তর রক্তস্রাবের জন্য রমযানে যেসব রোযা বাদ যাবে, তা রমযানের পর কাযা করতে হবে। কিন্তু নামায কাযা করতে হবেনা। মহিলাদের উপর থেকে মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে। কেননা নামায ঘন ঘন পড়তে হয়। রোযা অতোটা ঘন ঘন করতে হয়না। আবু সাঈদ খুদরীর হাদিস থেকে এ তথ্যটি জানা যায় :

আবু সাঈদ খুদরীর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার জন্য ঈদগাহে যাওয়ার সময় কিছু সংখ্যক মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বললেন : হে মহিলাগণ, তোমরা সদকা করো। কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশকে দোযখবাসী দেখেছি। তারা বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. এর কারণ কী? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমরা অত্যধিক অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং আত্মীয়-স্বজনকে অবজ্ঞা করে থাকো। বুদ্ধিমত্তায় ও ধর্মীয় তৎপরতায় অসম্পূর্ণ হয়েও তোমরা যেভাবে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা পুরুষের মনও কেড়ে নিতে পারো, তেমন আমি আর কাউকে দেখিনি। মহিলারা বললো : আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মীয় তৎপরতায় অসম্পূর্ণতা কোথায়? তিনি বললেন : একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নয়? তারা বললো : জ্বী। তিনি বললেন : এটাই বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা। নারী যখন ঋতুবতী হয়; তখন সে কি নামায রোযা বর্জন করেনা? তারা বললো : জ্বী। রসূল সা. বললেন : এটাই তাদের ধর্মীয় তৎপরতায় অসম্পূর্ণতা। -বুখারি ও মুসলিম।

মুয়াযা রা. বলেছেন : আমি আয়েশা রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুবতীকে রোযা কাযা করতে হয়, অথচ নামায কাযা করতে হয়না- এর কারণ কী? আয়েশা রা. বললেন : রসূল সা. এর আমলে আমরা যখন ঋতুবতী হতাম তখন আমাদেরকে রোযা কাযা করার আদেশ দেয়া হতো, নামায কাযা করার আদেশ দেয়া হতোনা। -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

২. হায়েয-নিফাস অবস্থায় সহবাস

কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য নির্দেশনা বলে মুসলামনদের সর্বসম্মতিক্রমে এটি হারাম। তাই ঋতুবতীর ও প্রসবোত্তর রক্তস্রাবতা মহিলার সাথে সহবাস হালাল নয়- যতোক্ষণ না সে পবিত্র

হয়। আনাস রা. এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : ইহুদীরা তাদের স্ত্রী ঋতুবতী হলে তার সাথে খানাপিনাও করতোনা, সহবাসও করতোনা। সাহাবিগণ রসূল সা.কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ সূরা বাকারার ২২২ নং আয়াতটি নাযিল করলেন : "তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তুমি বলো, ওটা বিব্রতকর অবস্থা। কাজেই ঋতুকালে নারীকে তোমরা এড়িয়ে চলো। যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়, ততোক্ষণ তাদের কাছে যেওনা। যখন পবিত্র হয়, তখন আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেন, সেভাবে তাদের কাছে এসো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং পবিত্রদেরকে ভালোবাসেন। রসূলুল্লাহ সা. অতপর বললেন : সহবাস ছাড়া সব কিছুই করতে পারো। -বুখারি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

ইমাম নববী বলেছেন : কোনো মুসলমান যদি বিশ্বাস করে, ঋতুবতী মহিলার সাথে তার যৌনাংগে সহবাস করা বৈধ, তাহলে সে কাফির ও ইসলামত্যাগী হয়ে যাবে। আর যদি বৈধ বলে বিশ্বাস না করেও ভুলক্রমে, কিংবা হারাম হওয়ার কথা না জেনে, কিংবা ঋতুবতী হওয়ার কথা না জেনে সহবাস করে, তাহলে গুনাহ হবেনা। কাফফারাও দিতে হবেনা। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে, ঋতুবতী জানা সত্ত্বেও এবং হারাম বলে জানা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় সহবাস করে, তবে সে কবীরা গুনাহকারী গণ্য হবে এবং তার উপর তওবা করা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা সে ব্যাপারে দুটো মত রয়েছে। কাফফারা ওয়াজিব হবেনা- এই মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। তিনি আরো বলেছেন, দ্বিতীয় প্রকার হলো : নাভির উপরে ও হাটুর নিচে সহবাস করবে। এটা সর্বসম্মতভাবে বৈধ। তৃতীয় প্রকার হলো নাভি ও হাঁটুর মাঝখানে যৌনাংগ ও মলদ্বার ব্যতিত আর সেখানে ইচ্ছা সহবাস করবে। তবে অধিকাংশ আলেম এটি হারাম মনে করেন। তবে নববীর মতে মাকরূহ কিন্তু হালাল। কেননা প্রমাণের দিক দিয়ে এটাই অধিকর জোরদার।

এর যে প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেছেন, তা হলো রসূল সা. এর স্ত্রীদের বর্ণনা : রসূল সা. যখন কোনো ঋতুবতী স্ত্রীর নিকট কিছু কামনা করতেন, তখন প্রথমে তার যৌনাংগের উপর কোনো জিনিস রেখে নিতেন। -আবু দাউদ। আর মাসরূক বিন আজদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলাম : স্ত্রী যখন ঋতুবতী হয়, তখন স্বামী তার কাছ থেকে কতটুকু আশা করতে পারে? তিনি বললেন : যৌনাংগ ছাড়া সব কিছু। -বুখারি রচিত ইতিহাস গ্রন্থ।

১৩. এস্তেহাযা (রোগজনিত রক্তস্রাব)

১. সংজ্ঞা : অসময়ে ও অনিয়মিত অব্যাহত রক্তস্রাবকে এস্তেহাযা বলা হয়।

২. মুস্তাহাযার (রোগজনিত রক্তস্রাবগ্রস্ত মহিলার) অবস্থা

মুস্তাহাযার তিন রকমের অবস্থা হতে পারে :

ক. এস্তেহাযার পূর্বে ঋতুস্রাবের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ তার জানা ছিলো। এমতাবস্থায় সেই পরিচিত মেয়াদটাই তার ঋতুস্রাবের মেয়াদ গণ্য হবে। বাদবাকি সময়টা গণ্য হবে এস্তেহাযা হিসেবে। কেননা উম্মে সালামার হাদিসে উল্লেখ রয়েছে : তিনি অনিয়মিত রক্তস্রাবগ্রস্ত জনৈক মহিলা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি জবাব দেন : মহিলা কতদিন ঋতুবতী থাকতো, তা গুণে দেখবে এবং তা মাসের কতদিন তা হিসাব করবে, তারপর গোসল করবে। যৌনাংগে ন্যাকড়া বাঁধবে, অতপর নামায পড়বে। -মালেক, শাফেয়ী ও তিরমিযি ব্যতিত পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত। খাত্তাবী বলেছেন : এটা সেই মহিলার বিধি, যার সুস্থাবস্থায় ঋতুবতী হওয়ার দিনের সংখ্যা জানা ছিলো রোগ হওয়ার পূর্বে। এরপর রোগ দেখা দিলো এবং

অব্যাহত রক্তস্রাব হতে থাকলো। তাই রসূল সা. তাকে আদেশ করলেন, যতদিন সুস্থাবস্থায় ঋতুবতী থাকতো ততদিন নামায বর্জন করবে। সেই দিনগুলো শেষে একবার গোসল করবে, তখন সে পবিত্র বলে গণ্য হবে।

খ. ক্রমাগত রক্তস্রাব হয়, অথচ ইতিপূর্বেকার ঋতুর দিনের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিলোনা। এর কারণ, সে তার অভ্যাসের কথা ভুলে গেছে। অথবা যৌবনে পদার্পণই করেছে মুস্তাহাযা অবস্থায়। ফলে সে ঋতুর রক্ত ও এস্তেহাযার রক্তের পার্থক্য করতে পারেনা। এ পরিস্থিতিতে তার ঋতু ছয় দিন বা সাত দিন ধরতে হবে, যা অধিকাংশ মহিলার অভ্যাস। কেননা হামনা বিনতে জাহাশের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : তিনি বলেছেন : আমার খুব বেশি এস্তেহাযা হতো। তাই রসূলুল্লাহর কাছে এলাম তাঁর কাছ থেকে জেনে নেয়া ও তাঁকে আমার অবস্থা অবহিত করার জন্য। তাঁকে পেলাম আমার বোন যয়নব বিনতে জাহাশের বাড়িতে। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ সা., আমার অত্যধিক এস্তেহাযা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার মত কী? এর কারণে আমার তো নামায রোযা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : আমি তোমাকে তুলা ব্যবহারের ব্যবস্থা দিচ্ছি। এতে তোমার রক্ত বন্ধ হবে। হামনা বললেন : রক্তের প্রবাহ তার চেয়েও বেশি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে রক্তের স্থানে এক টুকরো ন্যাকড়া বেঁধে নাও লাগামের মতো করে। হামনা বললো : রক্তের প্রবাহ এর চেয়েও বেশি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আমি তোমাকে দুটো কাজের আদেশ দেবো। এর যে কোনো একটা করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি দুটো করতে সক্ষম হও তাহলে সেটা তুমিই ভালো জানো। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : এটা শয়তানের একটা ধাক্কা। কাজেই তুমি ছয় থেকে সাতদিন ঋতু হিসাবে ধরে নাও, প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহর জ্ঞানের উপরই সোপর্দ করো। তারপর গোসল করো। যখন দেখবে, তুমি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছো, তখন তেইশ দিন বা চব্বিশ দিন নামায ও রোযা করো। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এভাবে তুমি প্রতি মাসে করো, যেমন মহিলারা তাদের ঋতু ও পবিত্রতার মেয়াদ অনুসারে ঋতুবতী ও পবিত্র হয়ে থাকে। আর যদি যোহর বিলম্বিত ও আসর ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হও, তাহলে গোসল করে যোহর ও আসর এক সাথে পড়ো। পুনরায় মাগরিবকে বিলম্বিত ও এশা ত্বরান্বিত করো এবং গোসল করে মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়ো, আর ফজরের সাথে গোসল করো ও নামায পড়ো। এভাবে তুমি চালিয়ে যাও, নামায পড়ো ও রোযা করো, যদি তা করতে সক্ষম হও। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : উক্ত দুই কাজের মধ্যে এটাই আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।" -আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি। তিরিমিযি এটিকে উত্তম ও সহীহ বলেছেন। বুখারিও একে উত্তম বলেছেন। আহমদ ইবনে হাম্বলও একে উত্তম ও সহীহ হাদিস বলেছেন। খাত্তাবী এই হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন : এই মহিলা প্রথম ঋতুবতী ছিলেন, ইতিপূর্বে তার কোনো ঋতুর দিন অতিবাহিত হয়নি এবং তিনি ঋতুর রক্ত চিনতেও সক্ষম ছিলেননা। তার রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকায় অধিকাংশ সময়ই তার স্রাব চলতো। এজন্য রসূলুল্লাহ সা. তার ব্যাপারটাকে প্রচলিত রীতি এবং মহিলাদের অধিকাংশ সময় যে অবস্থা থাকে তার আলোকে বিচার বিবেচনা করেন। অনুরূপ তিনি মহিলাদের প্রচলিত রীতি অনুসারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে রকম হয়ে থাকে, তার প্রতি মাসে একবার ঋতুবতী হওয়াকে সেই আলোকে নির্ধারণ করে দিলেন। রসূলুল্লাহ সা. এর উক্তি : "যেমন মহিলারা তাদের ঋতু ও পবিত্রতার মেয়াদে ঋতুবতী ও পবিত্র হয়ে থাকে" দ্বারা সে কথাই প্রতিষ্ঠিত হয়। খাত্তাবী বলেন : ঋতুস্রাব, সন্তান ধারণ, বয়োপ্রাপ্ত হওয়া ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে মহিলাদের একজনের অবস্থা আর একজনের অবস্থার আলোকে বিচার বিবেচনার জন্য এটাই মূল সূত্র।

৩. এস্তেহাযার বিধান

এস্তেহাযা আক্রান্ত মহিলার জন্য নির্দিষ্ট শরিয়তের বিধানসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

ক. কোনো নামাযের জন্য এবং কোনো নামাযের ওয়াক্তের জন্য তাকে গোসল করতে হবেনা। তাকে শুধু একবার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করতে হবে। প্রাচীন ও পরবর্তীকালের অধিকাংশ আলেম এই মত পোষণ করেন।

খ. তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে অযু করতে হবে। কেননা বুখারির বর্ণনা অনুসারে রসূল সা. বলেছেন : "প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করো।" ইমাম মালেকের মতে, তার জন্য প্রত্যেক নামাযে অযু করা মুস্তাহাব। নতুন করে অযু ভংগের কারণ ঘটলেই শুধু অযু করা ওয়াজিব।

গ. অযুর পূর্বে যৌনাংগ ধুয়ে ফেলতে হবে। নাপাকির নির্গমন ঠেকাতে ও কমাতে যৌনাংগে এক টুকরা তুলা বা ন্যাকড়া ঢুকিয়ে রাখতে হবে। তাতেও যদি বন্ধ না হয়, তাহলে সেই সাথে তা বেঁধেও রাখতে হবে যৌনাংগের উপর লাগামের মতো করে এবং একটা ন্যাকড়ার পট্টি বেঁধে দেবে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। এগুলো মুস্তাহাব।

ঘ. অধিকাংশ আলেমের মতে নামাযের ওয়াক্ত সমাগত হবার আগে তার অযু করা চলবেনা। কেননা তার পবিত্রতা অর্জন একটা জরুরি কাজ। তাই প্রয়োজনের সময় হওয়ার আগে তা করা জায়েয নয়।

ঙ. এস্তেহাযার রক্তস্রাবের সময় তার স্বামীর পক্ষে তার সাথে সহবাস করা অধিকাংশের মতে বৈধ। কেননা এটি অবৈধ- এই মর্মে কোনো প্রমাণ নেই। ইবনে আব্বাস বলেছেন : এস্তেহাযায় আক্রান্ত নারী যখন নামায পড়ে, তখন তার কাছে তার স্বামীও আসতে পারবে। কেননা নামায তো আরো গুরুত্বপূর্ণ। এ হাদিস বুখারি কর্তৃক বর্ণিত। অর্থাৎ রক্তস্রাব চলাকালে যদি সে নামায পড়তে পারে, যার জন্য পবিত্রতার শর্তের কড়াকড়ি সবচেয়ে বেশি, তখন সহবাসও বৈধ হবে।

ইকরামা বিন হামনা থেকে বর্ণিত হয়েছে : "তিনি মুস্তাহাযা থাকতেন। সেই অবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতো।" -আবু দাউদ ও বায়হাকি। নববী বলেছেন : এ হাদিসের সনদ ভালো।

চ. মুস্তাহাযা সাধারণভাবে পবিত্র নারীর বিধানের আওতাধীন। সে নামায, রোযা, ইতিকাফ, কুরআন পাঠ, কুরআন স্পর্শ, বহন এবং যাবতীয় ইবাদত করতে পারবে। এ বিষয়ে মুসলমানদের ইজমা বা মতৈক্য রয়েছে।[১৪]

১৪. হায়েয বা ঋতুস্রাবের রক্ত খারাপ রক্ত। কিন্তু এস্তেহাযার রক্ত স্বাভাবিক রক্ত। তাই প্রথমটিতে নারীর ইবাদত নিষিদ্ধ, দ্বিতীয়টিতে নিষিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সালাত (নামায)

সালাত একটি ইবাদত। এটি সম্পাদিত হয় নির্দিষ্ট কিছু কথা ও বাণী উচ্চারণ এবং কিছু নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে। এ ইবাদত আরম্ভ করতে হয় 'আল্লাহু আকবর' বলে এবং সমাপ্ত করতে হয় 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ' বলে।

১. ইসলামে সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

অন্য সকল ইবাদতের তুলনায় ইসলামে সালাতের গুরুত্ব সর্বাধিক। এর মর্যাদা সর্বোচ্চে। সালাত দীন ইসলামের খুঁটি। এ খুঁটি ছাড়া দীন দণ্ডায়মান থাকেনা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ : 'সমগ্র বিষয়ের মূল হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের স্তম্ভ হলো সালাত আর এর চূড়া হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।' -আহমদ, তিরমিযি।

সকল (আনুষ্ঠানিক) ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম ফরয করেছেন সালাত। মিরাজের রাতে আল্লাহ তায়ালা কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তাঁর রসূলকে সম্বোধন করেন এবং সালাত ফরয করে দেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : লাইলাতুল মিরাজে নবী সা.-এর প্রতি (প্রথমে) পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। অতপর তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দেয়া হয় এবং বলা হয় : হে মুহাম্মদ! আমার কথার কোনো পরিবর্তন হয়না, তোমার জন্যে এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই পঞ্চাশ ওয়াক্ত বরাবর।' হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, নাসায়ী। তিরমিযি বলেছেন, এটি সহীহ্ হাদিস। কিয়ামতের দিন পয়লা হিসাব নেয়া হবে সালাতের। আবদুল্লাহ ইবনে কুরত বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'কিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব নেয়া হবে সালাতের। যদি তার সালাতের বিষয়টি সঠিক ও শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তার সকল আমলই সঠিক ও শুদ্ধ পাওয়া যাবে। আর যদি তার সালাতেই বিপর্যয় ঘটে থাকে, তবে তার সমস্ত আমলই অশুদ্ধ ও বিনষ্ট হিসেবেই পাওয়া যাবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাবারানি।

দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্বে রসূলুল্লাহ সা.-এর সর্বশেষ অসিয়ত ছিলো সালাত সম্পর্কে। শেষ নি:শ্বাস ত্যাগের মুহূর্তে তিনি বার বার বলছিলেন : 'সালাত সালাত এবং যারা তোমাদের অধীনস্থ...।'

পৃথিবী থেকে ইসলামের সর্বশেষ যে বিষয়টি বিলীন হবে তা হলো সালাত। সালাত যখন বিলীন হবে, তখন ইসলাম পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। ইবনে হিব্বান থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'তোমরা ইসলামের বন্ধনসমূহ একটি একটি খুলতে থাকবে। যখনই একটি বন্ধন খোলা হবে, তখন তার পরেরটি খুলবে। প্রথম খোলা হবে ইসলামের রাষ্ট্র বিধান এবং সবশেষে সালাত।'

কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা বার বার সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। কখনো সালাতের সাথে যিকরকে যুক্ত করেছেন : إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ،

অর্থ : নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আর আল্লাহর যিকরই

(সালাত) সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা আল আনকাবূত : আয়াত ৪৫)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.

অর্থ : সফল হলো সে ব্যক্তি, যে পরিশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়ন করেছে, তার প্রভুকে যিকর করেছে এবং সালাত আদায় করেছে। (সূরা আল আ'লা : আয়াত ১৪-১৫)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

অর্থ : আমাকে যিকর (স্মরণ) করার উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম করো। (সূরা তোয়াহা : আয়াত ১৪)

কখনো আল্লাহ্ সালাতের সাথে যাকাতকে যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

অর্থ : সালাত কায়েম করো, যাকাত পরিশোধ করো। (সূরা ২, আল বাকারা : আয়াত ১১০)

কখনো সালাতের সাথে যুক্ত করেছেন সবরকে। বলেছেন : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.

অর্থ : এবং সাহায্য প্রার্থনা করো সবর এবং সালাতের সাথে। (আল বাকারা : আয়াত ৪৫)

কখনো তিনি সালাতের সাথে উল্লেখ করেছেন ত্যাগ ও কুরবানিকে। বলেছেন :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

অর্থ : তাই তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কুরবানি করো। (সূরা আল কাউছার : আয়াত ২)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

অর্থ : বলো, আমার সালাত আমার ত্যাগ ও কুরবানি এবং আমার জীবন ও মৃত্যু শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমিই (তাঁর প্রতি) সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করলাম। (সূরা ৬, আল আন'আম : আয়াত ১৬৩)

কখনো আল্লাহ্ পাক মানব জীবনের কল্যাণ ও সাফল্যের উপকরণসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে শুরুতেও সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং শেষেও। যেমন সূরা আল মুমিনুনে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বলছেন : 'সফল হলো সেসব মুমিন, যারা তাদের সালাতে বিনয় অবলম্বন করে।' মাঝখানে তাদের আরো কিছু গুণাবলি উল্লেখ করার পর ৯ থেকে ১১ আয়াতে গিয়ে এ সংক্রান্ত বক্তব্য শেষ করেন এভাবে : 'এবং যারা তাদের সালাতসমূহের হিফাযত করে। মূলত এরাই হবে ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী এবং সেখানে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে।'

মুকিম (আবাসে) থাকুন কিংবা ভ্রমণে থাকুন, শান্তির সময় হোক কিংবা শংকার সময়, সর্বাবস্থায় সালাতের হিফাযত করতে এবং সালাতের প্রতি যত্নবান হতে ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ق وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ○ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ج فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ○

অর্থ : 'তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি এবং বিনীতভাবে (সালাতে) দাঁড়াও আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যদি তোমরা কোনো আশংকা করো, তবে সালাত আদায় করো পদনির্ভর কিংবা আরোহী অবস্থায়। তবে যখন নিরাপদ বোধ করবে, তখন

আল্লাহকে স্মরণ করবে (অর্থাৎ- সালাত আদায় করবে) সেভাবে, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি শিক্ষা দেয়ার পূর্বে তোমরা যে পদ্ধতিটা জানতেনা।' (সূরা ২, আল বাকারা : আয়াত ২৩৮-২৩৯)

সফর, যুদ্ধাবস্থা এবং নিরাপদ অবস্থায় কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে, তাও আল কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○ وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ قف فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ص وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ج وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

অর্থ : 'তোমরা যখন দেশে-বিদেশে সফরে থাকো, তখন যদি আশংকা করো যে, কাফিররা তোমাদের জন্যে ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে, তবে সালাত কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। কাফিররা তো স্পষ্টতই তোমাদের শত্রু। আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে এবং তাদের সাথে সালাত কায়েম করবে, তখন তাদের একটি গ্রুপ যেনো তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেনো সশস্ত্র থাকে। তাদের সাজদা করা সম্পন্ন হলে তারা যেনো তোমাদের পেছনে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং যারা প্রথমে তোমার সাথে সালাতে শরিক হয়নি- তারা এসে যেনো সালাতে শরিক হয়ে যায়। আর তারাও যেনো সতর্ক এবং সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে, তোমরা যেনো তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং মালসামান সম্পর্কে অসতর্ক হয়ে পড়ো, যাতে করে তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও কিংবা পীড়িত থাকো, সে অবস্থায় অস্ত্র রেখে দিলে কোনো দোষ হবেনা, তবে অবশ্যি সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্যে অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অতপর যখন তোমরা শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে। যখন তোমরা নিরাপদ বোধ করবে, তখন যথানিয়মে সালাত কায়েম করবে। নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য।' (সূরা ৪, আন নিসা : আয়াত ১০১-১০৩)

যারা সালাতে অনিয়মিত, সালাতের হিফাযত করেনা এবং সালাত নষ্ট করে, মহান আল্লাহ তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন এবং তাদের মন্দ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ○

অর্থ : 'তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সালাত নষ্ট করলো এবং লালসা ও কামনা বাসনার বশবর্তী হলো। অচিরেই তারা নিজেদের কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।' (সূরা ১৯, মরিয়ম : আয়াত ৫৯)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ .

অর্থ : 'সুতরাং দুর্ভোগ রয়েছে সেসব মুসল্লীদের জন্যে, যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।' (সূরা ১০৭, আল মাউন : আয়াত ৪-৫)

সালাত ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্তরভুক্ত। এর জন্যে প্রয়োজন খাস্ হিদায়াত। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর নিজেকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে সালাত কায়েমকারী বানাবার জন্যে :

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ○

অর্থ : প্রভু! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও। প্রভু! আমার দোয়া কবুল করো। (সূরা ১৪, ইবরাহিম : আয়াত ৪০)

২. সালাত ত্যাগকারী সম্পর্কে ফায়সালা কী?

মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা (ঐকমত্য) হলো, সালাত ত্যাগ করা মানে সালাত অস্বীকার করা। আর সালাত অস্বীকার করা হলো কুফরি এবং ইসলামী মিল্লাত থেকে বরে হয়ে যাওয়া। তবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তি সালাত ফরয হবার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও যদি 'ওযর'-এর কারণে বাধ্য হয়ে সালাত ত্যাগ করে, তার কথা ভিন্ন।

কিন্তু কেউ যদি অলসতা বশত, কিংবা ব্যস্ততার অযুহাতে সালাত ত্যাগ করে, শরিয়তে সেটা 'ওযর' হিসেবে গণ্য হবেনা। এমন ব্যক্তির কুফরি সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিসেই সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। যেমন-

১. জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

অর্থ : বান্দার ও কুফুরির মধ্যে (মিল বা সেতু) হলো সালাত ত্যাগ করা। -মুসনাদে আহমদ, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ।

২. বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"আমাদের এবং তাদের মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে, তাহলো 'সালাত'। সুতরাং যে-ই সালাত ত্যাগ করলো, সে-ই কুফরি করলো।" -মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ রা. সালাতের বিষয়ে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : "যে কেউ সালাতের হিফাযত করবে, কিয়ামতের দিন সালাত হবে তার জন্যে আলো, প্রমাণ এবং মুক্তি সনদ। আর যে কেউ সালাতের হিফাযত করবেনা, কিয়ামতের দিন তার জন্যে কোনো আলো, প্রমাণ এবং মুক্তি সনদ থাকবেনা। শুধু তাই নয়, বরং সেদিন সে কারূণ, ফেরাউন, হামান এবং উবাই ইবনে খলফের সঙ্গী হবে।" -মুসনাদে আহমদ, তাবারানি, ইবনে হিব্বান।

হাদিসটির সনদ উত্তম। সালাত ত্যাগকারী কিয়ামতের দিন কাফির নেতাদের সঙ্গী হওয়া দ্বারা তার কুফরি প্রমাণ হয়ে যায়।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করেনা অর্থাৎ সালাত ত্যাগ করে, এর পেছনে থাকে তার অর্থ-সম্পদের ব্যস্ততা, রাজত্বের ব্যস্ততা, সরকারি কাজের ব্যস্ততা কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততা। সুতরাং যে তার অর্থ-সম্পদ (উপার্জন ও রক্ষার) ব্যস্ততায় সালাত

ত্যাগ করে, সে কারূণের সাথি হবে। যে ব্যক্তি দেশ ও রাজত্ব পরিচালনার ব্যস্ততায় সালাত ত্যাগ করে, সে হবে ফেরাউনের সাথি। যে ব্যক্তি সরকারি কাজের ব্যস্ততায় সালাত ত্যাগ করে, সে হবে হামানের সাথি। আর যে ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য (এবং চাকরি বাকরির) ব্যস্ততায় সালাত ত্যাগ করে, সে হবে উবাই ইবনে খলফের সাথি।

৪. আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক আল উকাইলি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "মুহাম্মদ সা.-এর সাহাবিগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরি বলে গণ্য করতেননা।" -তিরমিযি, হাকিম। হাকিম বলেছেন, ইমাম বুখারি ও মুসলিমের দেয়া শর্তানুযায়ী এটি সহীহ হাদিস।

৫. মুহাম্মদ ইবনে নসর আল মারূযী বলেছেন, আমি ইসহাককে বলতে শুনেছি : "নবী করিম সা. থেকে একথা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে যে, সালাত ত্যাগকারী কাফির।"

একই মুহাম্মদ সা.-এর নিকট থেকে ইল্‌ম অর্জনকারীগণের অভিমতও এটাই ছিলো যে : "বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগকারী এবং বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃত সালাতের সময় অতিবাহিতকারী কাফির।"

৬. ইবনে হাযম বলেছেন : "উমর, আবদুর রহমান বিন আওফ, মুয়ায বিন জাবাল ও আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ সাহাবি থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত ফরয নামায ত্যাগ করে, শেষ পর্যন্ত নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়, সে কাফির ও ইসলাম ত্যাগী মুরতাদ।" এ সকল সাহাবির মতের কেউ বিরোধী ছিলো বলে আমাদের জানা নেই। ইমাম মুনযিরী তারগীব ও তারহীবে এটি উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি বলেন : সাহাবি ও তাদের পরবর্তীদের একটি দলের মত হলো, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে নামাযের পুরো সময়টা পার করে দেয়, সে কাফির। এই দলের মধ্যে রয়েছেন উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুযায় বিন জাবাল, জাবির বিন আবদুল্লাহ ও আবুদ দারদা (রা)। আর সাহাবিদের বাইরে যারা এ মত পোষণ করেছেন তারা হলেন আহমদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়াই, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, নাখয়ী, হাকাম বিন উতাইবা, আবু আইয়ূব সাখতিয়ানী, আবু দাউদ তায়ালিসী, আবু বকর বিন আবু শায়বা, যুহাইর বিন হারব প্রমুখ (রহ)।

যে সকল হাদিসে নামায তরককারীকে হত্যাযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো হলো :

১. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইসলামের হাতল ও দীনের ভিত্তি হলো তিনটে জিনিস। এ তিনটের উপর ইসলামের ভিত প্রতিষ্ঠিত। এর একটিও যে ব্যক্তি ত্যাগ করবে সে এর প্রতি অবিশ্বাসী এবং তার রক্ত হালাল : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়া, ফরয নামায ও রমযানের রোযা। -আবু ইয়ালা।

অপর বর্ণনায় রয়েছে : এর একটিও যে ব্যক্তি ত্যাগ করে সে কাফির। তার ফরয ও নফল গৃহীত হবেনা এবং তার জান ও মাল হালাল হয়ে যাবে।

২. ইবনে উমর রা. থকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসূল, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। তারা এ কাজগুলো সম্পন্ন করলেই তাদের জান ও মাল আমার দিক থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। কেবল ইসলামের অধিকারের জন্য ব্যতিত। আর তাদের হিসাব গ্রহণ আল্লাহর দায়িত্বে। -বুখারি ও মুসলিম।

৩. উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমাদের উপর নানা রকমের শাসক নিযুক্ত হবে, কাউকে তোমরা পছন্দ করবে, কাউকে অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে অপছন্দ করবে সে নির্দোষ। আর, যে ব্যক্তি তাদেরকে অস্বীকার করবে সে নিরাপদ। কিন্তু যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে ও অনুসরণ করবে তার কথা স্বতন্ত্র। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ্, এ ধরনের শাসকের বিরুদ্ধে কি আমরা যুদ্ধ করবো? তিনি বললেন : না, যতক্ষণ তারা নামায পড়ে।" -মুসলিম। অর্থাৎ অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একমাত্র অন্তরায় বানানো হয়েছে নামাযকে।

৪. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, আলী রা. যখন ইয়ামানে ছিলেন তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট ছোট এক টুকরো স্বর্ণ পাঠালেন। রসূলুল্লাহ্ সা. সেটি চার ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো : হে রসূলুল্লাহ্, আল্লাহকে ভয় করুন। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : ধিক তোমাকে! আমি কি সমস্ত বিশ্ববাসীর মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার সর্বাধিক যোগ্য নই? এরপর লোকটি চলে গেলো। খালেদ ইবনুল ওলীদ বললেন : হে রসূলুল্লাহ্, আমি কি ওর গর্দান মেরে দেবনা? রসূল সা. বললেন : গর্দান মেরনা। হয়তো সে নামায পড়ে।" খালেদ বললেন : এমন অনেক লোক আছে, যে মুখে যা বলে, তার মনে তা থাকেনা। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : মানুষের মনের কথা অনুসন্ধানের জন্য বা তাদের পেট চিরে দেখার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। -বুখারি ও মুসলিমের হাদিস থেকে সংক্ষেপিত। এ হাদিসেও নামাযকে হত্যার অন্তরায় বানানো হয়েছে। অর্থাৎ নামায তরক করলে হত্যা অবধারিত।

অপর কিছু আলেমের মত হলো : উপরোক্ত হাদিসগুলো স্পষ্টতই নামায তরককারীকে কাফির আখ্যায়িত করেছে এবং তার হত্যা বৈধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক প্রাচীন ও পরবর্তীকালের আলেমের মত হলো, তাকে কাফির ঘোষণা করা যাবেনা। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী। তাদের মতে, সে ফাসিক এবং তাকে তওবা করতে বাধ্য করতে হবে। তওবা না করলে ইমাম মালেক, শাফেয়ী প্রমুখের মতে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে। আবু হানিফা বলেন : হত্যা করা হবেনা। অন্য কোনো শাস্তি দেয়া হবে এবং নামায না পড়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে। যে সকল হাদিসে তাকে কাফির বলা হয়েছে, তারা মনে করেন, সেসব হাদিস দ্বারা যারা নামাযকে অস্বীকার করে ও তরক করাকে বৈধ বলে মনে করে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা কুরআন ও হাদিসের কয়েকটি বাণীর বরাত দিয়ে এ মতের বিরোধিতা করেন। যেমন সূরা নিসার ১১৬ নং আয়াত : "নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেননা, এর চেয়ে কম যে কোনো গুনাহ্ ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য।" আর আহমদ ও মুসলিমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া কবুল হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক নবী তাড়াহুড়া করে দোয়া করেছেন। কিন্তু আমি আমার দোয়া স্থগিত রেখেছি যাতে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে পারি। আল্লাহ্ চাহে তো যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মারা গেছে, সে আমার সুপারিশ পাবে।" আবু হুরায়রা রা. থেকে বুখারি শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : আমার সুপারিশ লাভকারী সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি হলো সে, যে একনিষ্ঠ মনে বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো হুকুমকর্তা ও ত্রাণকর্তা নেই।"

নামায তরককারীকে নিয়ে একটি বিতর্ক : তাবাকাতে শাফেইয়া গ্রন্থে সুবকী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ একবার নামায তরককারীকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। শাফেয়ী বললেন : হে আহমদ! আপনি বলছেন সে কাফির।
আহমদ : হাঁ।

শাফেয়ী : সে যখন কাফির, তখন কিভাবে মুসলমান হবে?

আহমদ : বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

শাফেয়ী : লোকটি তো এই কলেমার উপরই বহাল রয়েছে। সে তো এটি ত্যাগ করেনি।

আহমদ : নামায পড়ে মুসলমান হবে।

শাফেয়ী : কাফিরের নামায তো শুদ্ধ হয়না। আর তাকে নামায দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করার হুকুম দেয়া হয়না।

ইমাম আহমদ আর কোনো জবাব দিতে পারলেননা।

শওকানির বক্তব্য : শওকানি বলেন, প্রকৃত সত্য হলো, বেনামাযী কাফির। ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে হত্যা করা হবে। কাফির এ জন্য যে, একদিকে সহীহ হাদিসে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর একমাত্র নামাযকেই তাকে কাফির আখ্যায়িত করার অন্তরায় বলা হয়েছে। কাজেই নামায তরক করলে তাকে কাফির বলতে আর বাধা থাকেনা। বিরোধিরা যে সকল প্রমাণ দিয়েছেন, তা আমরা মানতে বাধ্য নই। কেননা আমাদের কথা হলো, কোনো কোনো কুফর এমন থাকতে পারে যার ক্ষমা সম্ভব এবং যা রসূল সা. এর শাফায়াতের অন্তরায় নয়। যেমন কিবলা মান্যকারী হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় গুনাহকারীকে শরিয়তে কাফির আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং সেসব সংকীর্ণ যুক্তিতর্কের আশ্রয় নেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

৩. নামায কার উপর ফরয ?

নামায প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক মুসলমানের উপর ফরয। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করা হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি যতোক্ষণ না জাগ্রত হয়। বালক, যতোক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং পাগল যতোক্ষণ না বুদ্ধিমান হয়। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

৪. শিশুর নামায

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের উপর যদিও নামায ফরয নয়, তথাপি তার অভিভাবকের কর্তব্য সাত বছর বয়স হলে তাকে নামায পড়ার আদেশ দেয়া। আর দশ বছর হলে নামায না পড়ার জন্য প্রহার করতে হবে। যাতে তার অভ্যাস ও প্রশিক্ষণ হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নামায পড়ে। আমর ইবনে শুয়াইব থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন দশ বছর হয় তখন এর জন্য প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" -আহমদ, আবু দাউদ ও হাকেম।

৫. ফরয নামায কয় ওয়াক্ত?

আল্লাহ তায়ালা দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। ইবনে মুহাইরিজ থেকে বর্ণিত : বনু কানানার মুখদাজী নামক এক ব্যক্তি শুনতে পেলো, সিরিয়ায় আবু মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি বলেছে বিতর নামায ওয়াজিব। সে বললো : আমি উবাদা ইবনুস সামেতের নিকট গেলাম এবং তাকে বিষয়টা জানালাম। উবাদা বললেন : আবু মুহাম্মদ মিথ্যা বলেছে। আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এ নামাযগুলো পড়বে এবং এর একটিও অবজ্ঞাবশত: বাদ দেবেনা, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা করেছেন। আর যে এগুলো ঠিক মতো পড়বেনা, আল্লাহ তাকে কোনো ওয়াদা প্রদান করেননি। ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণিত : জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এলো এলোমেলো চুল নিয়ে। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ! আমার উপর আল্লাহ কী কী নামায ফরয করেছেন বলুন। তিনি বললেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় কিছু নফল পড় তবে পড়তে পারো। সে বললো : কয়টি রোযা ফরয করেছেন? তিনি বললেন : রমযান মাসের রোযা। এছাড়া কোনো নফল রোযা রাখতে চাইলে রাখতে পারো। সে বললো : যাকাত কতোটুকু ফরয করেছেন? রসূলুল্লাহ সা. তাকে ইসলামের সকল বিধান জানিয়ে দিলেন। সে বললো : আল্লাহর কসম, আমি এই ফরযগুলোর কিছুই বাদ দেবনা, আর কোনো বাড়তি নফলও আদায় করবোনা। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : সে যদি তার ওয়াদা পালন করে তবে সফলকাম। অন্য বর্ণনায় : সে জান্নাতে যাবে। -বুখারি ও মুসলিম।

৬. নামাযের সময়

নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময় বা ওয়াক্ত রয়েছে। সেই সময়ের মধ্যেই নামায আদায় করা জরুরি। আল্লাহ বলেন : إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

নিশ্চয় মুমিনদের জন্য নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া ফরয।" অর্থাৎ সুনিশ্চিত ও কিতাব দ্বারা প্রমাণিত ফরয।

কুরআনে এই সকল ওয়াক্তের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ.

"দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের দুই অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয় সৎ কাজগুলো মন্দ কাজগুলোকে বিলুপ্ত করে। স্মরণকারীদের জন্য এ হচ্ছে স্মারক।" (সূরা হূদ : আয়াত ১১৪)

হাসান বলেছেন : দিনের দুই প্রান্তের নামায ফজর, আসর, আর রাতের দুই অংশের নামায মাগরিব, এশা।

আর সূরা ইসরাতে রয়েছে :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ، وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

"সূর্য ঢলে পড়া থেকে রাতের অন্ধকার শুরু হওয়া পর্যন্ত নামায ও ফজরের কুরআন কায়েম করো। ফজরের কুরআনে সাক্ষী উপস্থিত থাকে।"

অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়ার পর প্রথম ওয়াক্তেই যোহরের নামায পড়ো। এই সময়টা রাতের অন্ধকার শুরু হওয়া পর্যন্ত থাকে। এই সময়ের ভেতর আসর, মাগরিব ও এশা অন্তর্ভুক্ত। আর ফজরের কুরআন অর্থ ফজরের নামায। সাক্ষী উপস্থিত থাকে অর্থ হলো, রাতের ফেরেশতারা ও দিনের ফেরেশতারা সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকে।

আর সূরা তোয়াহায় রয়েছে :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ اٰنَاءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى○

"তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করো সূর্য উঠা ও ডুবার আগে। আর রাতের বিভিন্ন সময়ে ও দিনের প্রান্তভাগে পবিত্রতা ঘোষণা করো। হয়তো তুমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।" সূর্য উঠার আগে পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ ফজরের নামায। আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে

পবিত্রতা ঘোষণা বা তাসবীহ্ পাঠের অর্থ আসরের নামায। বুখারি মুসলিমে জারির থেকে বর্ণিত, জারির রা. বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট বসেছিলাম। সহসা পূর্ণিমার রাতে তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন : "নিশ্চয় তোমরা এখন যেভাবে এই চাঁদকে দেখছ, ঠিক এভাবেই তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার ব্যাপারে তোমাদের কোনো জড়তা থাকবেনা। সুতরাং তোমরা যদি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে কোনো নামায শেষ করতে পারো তবে করো।" তারপর এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। এ ছিলো পবিত্র কুরআনে নামাযের ওয়াক্তের প্রতি ইঙ্গিত। তবে হাদিসে এসব ওয়াক্ত নির্ধারিত ও এগুলোর নিদর্শনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। হাদিসগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়বে এবং মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হবে তখন যোহরের ওয়াক্ত হবে এবং তা আসরের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। আর সূর্য যতক্ষণ হলুদ না হবে ততক্ষণ আসর থাকবে। সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে যতক্ষণ লালিমা থাকবে ততক্ষণ মাগরিব থাকবে। আর এশার নামাযের ওয়াক্ত থাকবে মধ্যরাতের মাঝামাঝি পর্যন্ত। আর ফজরের নামাযের ওয়াক্ত ভোর হওয়া থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। সূর্য যখন উঠে যাবে তখন নামায পড়া বন্ধ রাখো। কেননা সূর্য উঠে শয়তানের দুই শিং এর মাঝখান দিয়ে। - মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

২. জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত : জিবরীল (আ.) রসূল সা.-এর নিকট এলেন এবং তাঁকে বললেন : উঠুন, নামায পড়ুন। তখন তিনি নামায পড়লেন সূর্য ঢলে পড়ার পর। তারপর পুনরায় আসরের সময় তাঁর কাছে জিবরীল (আ.) এলেন। জিবরীল তাঁকে বললেন : উঠুন, নামায পড়ুন। তখন তিনি আসরের নামায পড়লেন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার পর। পুনরায় মাগরিবের সময় তাঁর কাছে জিবরীল এলেন এবং বললেন : উঠুন, নামায পড়ুন। তখন তিনি নামায পড়লেন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর। পুনরায় এশার সময় তাঁর নিকট জিবরীল এলেন এবং বললেন উঠুন, নামায পড়ুন। তখন তিনি এশার নামায পড়লেন পশ্চিম আকাশের লালিমা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর। পুনরায় যখন ভোর হলো তখন জিবরীল তার কাছে এলেন। পুনরায় পরের দিন যোহরের সময় তার কাছে এলেন জিবরীল এবং বললেন : উঠুন, নামায পড়ুন। তখন তিনি প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার সমান হলে যোহরের নামায পড়লেন। পুনরায় আসরের সময় তিনি তার কাছে এলেন এবং বললেন : উঠুন, নামায পড়ুন। তখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হলো এবং তিনি আসরের নামায পড়লেন। আবার মাগরিবে একই সময়ে তিনি তাঁর কাছে এলেন আগের মতোই। তারপর এশার সময় যখন অর্ধেক রাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে গেছে। তখন এলেন এবং এশার নামায পড়লেন। তারপর যখন ভোর খুব ফর্সা হলো তখন তার কাছে এলেন এবং বললেন : উঠুন, নামায পড়ুন। তখন তিনি ফজরের নামায পড়লেন। তারপর বললেন : এই দুই ওয়াক্তের মাঝে আরও একটা ওয়াক্ত আছে।" আহমদ, নাসায়ী ও তিরমিযি। বুখারি বলেছেন: নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস। অর্থাৎ জিবরীলের ইমামতি সম্পর্কে।

● যোহর নামাযের ওয়াক্ত

উপরোক্ত দুটি হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো। যোহরের ওয়াক্ত মধ্য আকাশ থেকে সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকেই শুরু হয় এবং ঢলে পড়ার সময় কোনো জিনিসের ছায়া যতটুকু থাকে। সেটুকু বাদে সমপরিমাণ ছায়া যখন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। তবে প্রচণ্ড গরমের সময় যোহরের নামায প্রথম ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করা মুস্তাহাব, যাতে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়। প্রচণ্ড গরম ছাড়া অন্য সময় নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়াই মুস্তাহাব। আনাস রা.

বর্ণনা করেছেন : যখন শীত বেশি হতো তখন রসূল সা. নামায ত্বরান্বিত করতেন, আর যখন গরম বেশি পড়তো, তখন নামায বিলম্বিত করতেন। -বুখারি। আবু যর রা. বলেছেন : আমরা রসূল সা.-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন মুয়াযযিন যোহরের আযান দিতে ইচ্ছা করলো। রসূল সা. বললেন : ঠাণ্ডা করো। অর্থাৎ বিলম্বিত করো। পুনরায় মুয়াযযিন আযান দিতে চাইলো। তিনি বললেন : ঠাণ্ডা করো। এভাবে দু'বার বা তিনবার বললেন। এক সময় আমরা ছোট টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। তিনি বললেন : গরমের তীব্রতা জাহান্নামের টগবগানির অংশ। কাজেই যখন গরম তীব্র হয়, তখন নামায ঠাণ্ডা করে পড়ো। -বুখারি ও মুসলিম।

ঠাণ্ডা করার সীমা : হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : ঠাণ্ডা করার সীমা কতদূর তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কেউ বলেছেন : সূর্য ঢলার অব্যবহিত পরের ছায়ার পর ছায়া আরও এক হাত লম্বা হওয়া পর্যন্ত। কেউ বলেন : মানুষের আকৃতির চার ভাগের এক ভাগ, কেউ বলেন : তিন ভাগের এক ভাগ, কেউ বলেন : অর্ধেক। এছাড়া আরও বহু রকমের মতামত রয়েছে। তবে প্রচলিত নীতি হলো, এটি অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে শর্ত হলো, কোনোক্রমেই নামাযের শেষ ওয়াক্ত অতিক্রম করতে পারবেনা।

● আসর নামাযের ওয়াক্ত

সূর্য ঢলার পরবর্তী ছায়ার পর যখন কোনো জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হয়, তখন থেকেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত থাকে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের আগে আসরের এক রাকাত নামায ধরতে পারলো, সে যেনো পুরো আসরের ওয়াক্তই ধরতে পারলো।

বায়হাকির ভাষা হলো : যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাত পড়লো, তারপর অবশিষ্ট নামায সূর্যাস্তের পর পড়লো, তার আসর হাতছাড়া হলোনা।

মুস্তাহাব ওয়াক্ত ও মাকরূহ ওয়াক্ত : সূর্য হলুদ হওয়া মাত্রই মুস্তাহাব ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। ইতিপূর্বে ও আবদুল্লাহ ইবনে আমরের যে দুটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে। সূর্য হলুদ হওয়ার পর পর্যন্তও নামায বিলম্বিত করা যায়। তবে সেটা বিনা ওযরে হলে মাকরূহ হবে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : এটা মোনাফেকের নামায, সে বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। যখন সূর্য শয়তানের শিংদ্বয়ের মাঝখানে চলে আসে, তখন উঠে দাঁড়ায় এবং চারটা ঠোকর দেয়। এতে সে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। -বুখারি ও ইবনু মাজাহ ব্যতিত সব গ্রন্থ।

নববী মুসলিমের টীকায় বলেছেন : আমাদের ইমামগণ বলেছেন, আসরের ওয়াক্ত পাঁচ প্রকারের : ১. উত্তম ওয়াক্ত; ২. মুস্তাহাব ওয়াক্ত; ৩. জায়েয ওয়াক্ত, মাকরূহ নয়; ৪. জায়েয কিন্তু মাকরূহ ওয়াক্ত; ৫. ওযরের ওয়াক্ত।

উত্তম ওয়াক্ত হলো প্রথম ওয়াক্ত। মুস্তাহাব ওয়াক্ত হলো, ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। সূর্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত বৈধ, মাকরূহ নয়। হলুদ হওয়া থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বৈধ তবে মাকরূহ। আর সফর কিংবা বৃষ্টির কারণে যে ব্যক্তি যোহর ও আসরকে যোহরের সময়ে একত্রিত করে, তার জন্য যোহরের ওয়াক্তটা ওযরের ওয়াক্ত। এই পাঁচ ওয়াক্তেই আসরের নামায আদায় করা যাবে এবং এর কোনোটাই কাযা গণ্য হবেনা। কিন্তু সূর্য অস্ত গেলে তখন কাযা গণ্য হবে।

মেঘলা দিনে নামায ত্বরান্বিত করা জরুরি : বুরাইদা আসলামী রা. বলেন : আমরা এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন : মেঘলা দিনে নামায ত্বরান্বিত করো। কেননা

যার আসরের নামায তরক হয়ে যায়, তার সমস্ত নেক আমল বাতিল হয়ে যায়। -আহমদ ইবনে মাজাহ। ইবনুল কাইয়েম বলেন : তরক করা দুই রকম : পুরোপুরি তরক করা এবং কখনো তরককৃত নামায না পড়া। এতে সকল নেক আমল বাতিল হয়ে যায়। আর শুধু নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্টভাবে তরক করলে ঐ দিনের নেক আমল বাতিল হয়।

আসরের নামাযই মধ্যবর্তী নামায : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "তোমরা সকল নামায সংরক্ষণ করো এবং মধ্যবর্তী নামায সংরক্ষণ করো।" একাধিক সহীহ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আসরের নামাযই মধ্যবর্তী নামায।

১. আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছেন : আল্লাহ কাফিরদের কবর ও বাড়িগুলোকে আগুন দিয়ে ভরে দিন। কারণ তারা আমাদেরকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধে আটকে রেখে মধ্যবর্তী নামায পড়তে দেয়নি। -বুখারি, মুসলিম।

২. ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত : "মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সা.কে আসরের নামায পড়তে দেয়নি সূর্য লাল হওয়া ও হলুদ হওয়া পর্যন্ত। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ওরা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায আসরের নামায পড়তে দিলনা। আল্লাহ ওদের পেট ও কবর আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন। -আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ।

● **মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত**

সূর্য যখন 'অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ডুবে যায়, তখন মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় আর তা পশ্চিম আকাশ থেকে লালিমা বিলীন হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় থেকে এবং লালিমা না যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।"- মুসলিম। অনুরূপ আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক প্রশ্নকারী রসূলুল্লাহ সা.কে প্রশ্ন করলো নামাযের ওয়াক্ত কী কী? অতপর পুরো হাদিস উল্লেখ করলেন। এতে আরও রয়েছে! অতপর জিবরীল তাকে আদেশ করলেন এবং তিনি সূর্য অস্তমিত হলে মাগরিবের নামায পড়লেন। অতপর যখন দ্বিতীয় দিন এলো। তিনি বললেন : অতপর তিনি বিলম্বিত করলেন লালিমা দূর হওয়া পর্যন্ত। তারপর বললেন : এই দুয়ের মাঝখানেই মাগরিবের ওয়াক্ত।

মুসলিমের টীকায় নববী বলেছেন : আমাদের ইমামদের মধ্যে যারা সুদক্ষ, তারা লালিমা বিলীন না হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করার বৈধতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার পক্ষপাতি। আর এই সময়ের প্রত্যেক অংশেই নামায শুরু করা বৈধ। প্রথম ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করলে গুনাহ হবেনা। এটাই সঠিক ও নির্ভুল। এছাড়া অন্য কিছু বৈধ নয়। আর ইতিপূর্বে জিবরীলের ইমামতি সংক্রান্ত হাদিসে যে বলা হয়েছে তিনি দুই দিন একই সময়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের নামায পড়েছেন। তা দ্বারা মাগরিবের নামায ত্বরান্বিত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে একাধিক হাদিসে সুষ্ঠুভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন :

১. সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার উম্মত যতদিন নক্ষত্র উদিত হওয়ার আগে মাগরিবের নামায পড়বে। ততদিন ইসলামের উপর বহাল থাকবে।

২. মুসনাদে আবু আইয়ূব আনসারী থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রোযাদারের ইফতারের সময় মাগরিবের নামায পড়ো এবং নক্ষত্র উদয়ের আগে নামাযকে ত্বরান্বিত করো।

৩. সহীহ মুসলিমে রাফে বিন খাদীজ থেকে বর্ণিত : আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়ছিলাম। তারপর আমাদের প্রত্যেকে ফিরে যাওয়ার সময় নিজ নিজ তীর রাখার জায়গা দেখতে পাচ্ছিল।

৪. সহীহ মুসলিমে সালামা বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. সূর্য অস্ত যাওয়া ও অদৃশ্য হওয়ার অব্যবহিত পর মাগরিবের নামায পড়তেন।

● এশার নামাযের ওয়াক্ত

পশ্চিমাকাশের লালিমা বিলীন হওয়ার পর থেকে এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং তা মধ্যরাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : লোকেরা পশ্চিমাকাশের লালিমা বিলীন হওয়া থেকে আরম্ভ করে রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামায পড়তো। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে আদেশ দিতাম যেনো তারা এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করে। আর আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত : এক রাতে এশার নামাযে আমরা রসূল সা.-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ফলে রাতের প্রায় অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তিনি এলেন এবং আমাদেরকে নামায পড়ালেন। তারপর বললেন : "তোমরা বসো। এতোক্ষণে অন্য লোকেরা শুয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করেছো, ততক্ষণ নামাযের মধ্যে ছিলে বলে গণ্য হবে। দুর্বলের দুর্বলতা, রোগীর রোগ ও বিপন্নের বিপদ যদি না থাকতো, তবে আমি রাত দুপুর পর্যন্ত এই নামায বিলম্বিত করতাম। এ হলো মুস্তাহাব ওয়াক্ত। বৈধতা ও অনিবার্য প্রয়োজনের ওয়াক্ত ফজর পর্যন্ত বিস্তৃত। কাতাদাহ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : শুনে রাখো, ঘুমের কারণে নামায ছুটে যাওয়া অবহেলা নয়। শুধু যে ব্যক্তি পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত চলে আসার আগে নামায পড়েনা সে-ই অবহেলার দায়ে দোষী।

ওয়াক্তের বিবরণ সম্বলিত পূর্ববর্তী হাদিস প্রমাণ করে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্ত পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত আশা পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে ফজরের নামাযের কথা ভিন্ন। এ নামায যোহর পর্যন্ত অব্যাহত থাকেনা। আলেমগণ একমত, এর ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের সাথেই শেষ হয়ে যায়। এশার নামাযকে প্রথম ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করাই মুস্তাহাব। এশার নামাযকে তার মুস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ রাত দুপুর পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম। কেননা আয়েশার রা. হাদিসে এ কথা রয়েছে : "রসূলুল্লাহ সা. এক রাতে রাতের বিরাট অংশ চলে গেলে এবং মসজিদের লোকেরা ঘুমিয়ে গেলে তারপর বের হলেন এবং এশার নামায পড়ালেন। তিনি বললেন : উম্মতকে যদি কষ্ট দিতে না চাইতাম, তবে এটাই এশার সময়।* -মুসলিম, নাসায়ী।

ইতিপূর্বে আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত উভয় হাদিস আয়েশার হাদিসের সমর্থক। এর প্রত্যেকটিই প্রমাণ করে বিলম্বিত করা উত্তম ও মুস্তাহাব। তবে বিলম্বে পড়ার নীতিকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করার নীতি তিনি বর্জন করেছেন। কারণ এতে নামাযীদের কষ্ট হয়। রসূল সা. জামাতে নামায পড়া মুসল্লদির সুবিধার দিকে খেয়াল রাখতেন, কখনো ত্বরান্বিত কখনো বিলম্বিত করতেন। জাবির রা. থকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. দুপুরে সূর্য ঢলে পড়ার পর যে প্রচণ্ড খরতাপ হয়, তখন যোহর, সূর্য পরিষ্কার থাকতে (অর্থাৎ হলুদ হওয়ার আগে) আসর, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মাগরিব এবং এশা কখনো বিলম্বিত ও কখনো ত্বরান্বিত করে পড়তেন। যখন দেখতেন মুসল্লিরা হাজির হয়ে গেছে, তখন ত্বরান্বিত করতেন। আর যখন দেখতেন তারা বিলম্ব করছে, তখন নামায বিলম্বিত করতেন। আর ফজরের নামায তিনি বা তারা শেষ রাতের অন্ধকার থাকতে পড়তেন।

---

* নববী বলেছেন : এ দ্বারা রাত দুপুরের পর পর্যন্ত বুঝায়না। কেননা রাত দুপুরের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম এ কথা কোনো আলেমই বলেননি।

এশার নামাযের আগে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা : এশার নামাযের আগে ঘুমানো ও পরে কথা বলা মাকরূহ। কেননা আবু বারযা আসলামী বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. এশার নামায, যাকে তোমরা আতামা বলে থাকো। বিলম্বিত করা ভালোবাসতেন এবং তার আগে ঘুমানো ও তার পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। আর ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. এশার পর গল্পগুজব করতে আমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো ও পরে গল্পগুজব মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, ঘুমানোর কারণে মুস্তহাব ওয়াক্তে বা জামাতের সাথে নামায পড়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আর এশার পর গল্পগুজব করলে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত জেগে থাকা অনিবার্য হয়ে পড়তে পারে। আর রাত জাগরণ প্রচুর ক্ষতির কারণ। তবে কেউ যদি এশার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে চায় এবং তাকে জাগিয়ে দেয়ার মতো কেউ থাকে অথবা এশার পরে উপকারী কথাবার্তা বলে তাহলে সেটা মাকরূহ হবেনা। কেননা ইবনে উমর রা. বলেছেন। রসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আবু বকরের সাথে গভীর রাতে কথা বলতেন। আমিও তার সাথে থাকতাম। আর ইবনে আব্বাস রা. বলেন : একদিন রাতে যখন রসূলুল্লাহ সা. মাইমুনার বাড়িতে ছিলেন, আমিও সেদিন সেখানে শুয়েছিলাম, যাতে দেখতে পারি রসূলুল্লাহ সা. রাতে কেমন নামায পড়েন। দেখলাম রসূলুল্লাহ সা. তার পরিবারের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেন, তারপর ঘুমিয়ে গেলেন।

● ফজর নামাযের সময়

সুবহে সাদেক হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত বিস্তৃত। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হাদিসে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ফজরের নামায ত্বরান্বিত করা মুস্তাহাব : ফজরের নামায ত্বরান্বিত করা ও প্রথম ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব। আবু মাসউদ আনসারী বলেন : রসূলুল্লাহ সা. একবার অন্ধকারে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর আরেকবার পড়লেন ভোর ফর্সা হওয়ার পর। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অন্ধকারে নামায পড়েছেন। আর কখনো ফর্সা হওয়ার পর পড়েননি।" -আবু দাউদ, বায়হাকি - সনদ সহীহ। আয়েশা রা. বলেন : মুমিনদের স্ত্রীরা রসূল সা.-এর সাথে ফজরের নামায পড়তেন পোশাক পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে। তারপর নামায শেষে তারা যখন বাড়ি ফিরে যেতেন, তখনও এতো অন্ধকার থাকতো যে, কেউ তাদের চিনতে পারতোনা। -ছয়টি সহীহ গ্রন্থ।

তবে রাফে ইবনে খাদিজ বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ফজরকে স্বচ্ছ করে নাও, তাতে তোমাদের সওয়াব বেশি হবে।' -পাঁচটি সহীহ গ্রন্থ। এ হাদিস দ্বারা ফজরের নামায শেষ করে ফেরার সময়টাকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে, শুরু করার সময় নয়। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সা. নামাযে দীর্ঘ কিরাত পড়তে আদেশ দিয়েছেন যাতে পড়ে বের হবার সময় ফর্সা সকাল হয়ে যায়। এমনটি রসূলুল্লাহ সা. নিজেও করতেন। তিনি তো নামাযে ষাট থেকে একশো আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। এ হাদিসের ব্যাখ্যা এ রকমও হতে পারে যে, সুবহে সাদেক হয়েছে কিনা, তা ভালোভাবে নিশ্চিত হয়ে নাও। কেবল ধারণার ভিত্তিতে নামায পড়োনা।

এক রাকাত পড়ার পর ওয়াক্ত ফুরিয়ে গেলে : যে ব্যক্তি ওয়াক্ত ফুরানোর আগে মাত্র এক রাকাত নামায সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, তার পুরো নামায ওয়াক্তের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা হবে। কেননা আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি ওয়াক্তের মধ্যে এক রাকাত নামায পড়তে পেরেছে, সে যেনো পুরো নামাযই পড়েছে।" -সবগুলো সহীহ গ্রন্থ। এটা সকল নামাযের বেলায়ই প্রযোজ্য। বুখারির বর্ণনার ভাষা হলো : তোমাদের কেউ যখন

সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের একটি মাত্র সাজদা করতে সক্ষম হয় সে যেনো তার নামায সম্পূর্ণ করে। আর যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের একটি সাজদা করতে সক্ষম হয়। তখন সে যেনো তার নামায সম্পূর্ণ করে।" এখানে সাজদার অর্থ রাকাত। হাদিসের প্রকাশ্য মর্ম হলো, যে ব্যক্তি ফজর বা আসরের নামাযের এক রাকাত ওয়াক্তের মধ্যে সম্পন্ন করে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় তার নামায মাকরূহ হবেনা যদিও ঐ সময় দুটি মাকরূহ সময়। ওয়াক্তের ভেতরে পুরো এক রাকাত পড়তে পারায় তার নামায চলতি ওয়াক্তে সম্পন্ন নামায বলে গণ্য হবে। কাযা করার দরকার হবেনা। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযকে এরূপ শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ নয়।

● **নামাযের সময় ঘুমে থাকলে বা ভুলে গেলে**

যে ব্যক্তি কোনো নামাযের ওয়াক্তে ঘুমে থাকে বা নামাযের কথা ভুলে যায়, সে যখনই জাগবে বা যখনই তার মনে পড়বে তখনই তার নামাযের ওয়াক্ত। কারণ আবু কাতাদাহ বর্ণনা করেন : লোকেরা রসূল সা.কে জানালো, মাঝে মাঝে ঘুমের কারণে তাদের নামায ছুটে যায়। রসূল সা. বললেন : ঘুমের কারণে নামায ছুটে গেলে তা অবহেলা গণ্য হয়না। অবহেলা গণ্য হয় জাগ্রত অবস্থায় ছুটে গেলে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমের কারণে নামায পড়তে সক্ষম না হয়। তখন সে যেনো মনে পড়া মাত্রই নামায পড়ে নেয়।" -নাসায়ী, তিরমিযি বলেছেন এটি সহীহ হাদিস। আর আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায়। সে যেনো মনে পড়া মাত্রই নামায পড়ে নেয়। তার জন্য এটাই একমাত্র কাফফারা।" -বুখারি ও মুসলিম। ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন : আমরা একবার রসূল সা.-এর সাথে সফর করলাম। অবশেষে শেষ রাতে যাত্রা বিরতি ও বিশ্রাম করলাম। আমাদের এতো গাঢ় ঘুম হলো যে, শুধু সূর্যের উত্তাপই আমাদেরকে জাগাতে পেরেছে। তখন আমাদের বেশামাল অবস্থা যে, আমাদের কেউ কেউ হতবুদ্ধি হয়ে পবিত্র হওয়ার উপকরণ খুঁজতে ছুটোছুটি শুরু করে দিলো। রসূল সা. তাদের সকলকে শান্ত হবার আদেশ দিলেন। তারপর আমরা রওনা হলাম এবং চলতে লাগলাম। অবশেষে যখন সূর্য উপরে উঠলো, তখন রসূল সা. অযু করলেন, তারপর বিলালকে আদেশ দিলেন আযান দিতে। বিলাল আযান দিলো। তারপর ফজরের আগের দু'রাকাত পড়লেন। তারপর তিনি নামায পড়ালেন। আমরা নামায পড়লাম। তারপর সবাই বললো : হে রসূলুল্লাহ, আগামীকাল কি এ নামায আমরা নির্ধারিত সময়ে পুনরায় পড়বোনা? অর্থাৎ ফজরের সময়। রসূল সা. বললেন : তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে সুদ নিষিদ্ধ করার পর তিনি নিজেই কি সুদ গ্রহণ করবেন? অর্থাৎ ফজরের নামায আগামীকাল নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় পড়লে তা সুদের মতোই অতিরিক্ত হবে।

● **নামাযের নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ**

ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত, সূর্যোদয় থেকে সূর্য বর্শা পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত। ঠিক দুপুরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়া পর্যন্ত, আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। যে কোনো নামায পড়া নিষিদ্ধ। কেননা আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামায নেই। আর ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো নামায নেই। -বুখারি ও মুসলিম। আমর বিন আবাসা রা. বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর নবী! আমাকে নামায সম্পর্কে অবহিত করান। তিনি বললেন : ফজরের নামায পড়ো। তারপর সূর্য

উঠা পর্যন্ত নামায বন্ধ রাখো। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝখান দিয়ে উঠে।* সেই সময় কাফিররা সূর্যকে সাজদা করে। তারপর নামায পড়ো। কারণ এই নামাযে ফেরেশতারা উপস্থিত হয় ও সাক্ষী হয়। অতপর ছায়া যখন বর্শার সমান হয় (অর্থাৎ ছায়াটা তার গায়েই থাকে মাটিতে পড়েনা, যা ঠিক দুপুরে হয়) তখন নামায পড়ো। তারপর নামায পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা তখন (অর্থাৎ) ঠিক দুপুরে) জাহান্নাম দাউ দাউ করে জ্বলে। ছায়া যখন কিছুটা অগ্রসর হয়, তখন নামায পড়ো। কেননা তখন ফেরেশতারা উপস্থিত হয় ও সাক্ষী হয়। এভাবে আসরের নামায পড়া পর্যন্ত সব রকমের নামায পড়া যাবে। তারপর আসরের নামাযের পর পুনরায় নামায বন্ধ রাখো যতক্ষণ না সূর্য ডুবে। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝে ডুবে এবং তখন কাফিররা তাকে সাজদা করে। -আহমদ ও মুসলিম।

উকবা বিন আমের থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে তিনটে সময়ে নামায পড়তে ও মৃতকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে দাফন করতে। (অনিচ্ছাকৃতভাবে দাফনের কাজ সংঘটিত হলে তা নিষিদ্ধ নয়।) সূর্যোদয়ের সময় যতক্ষণ সূর্য উপরে না উঠে যায়। ঠিক দুপুরে এবং সূর্যাস্তের সময়। -বুখারি ব্যতিত সবকটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

● ফজর ও আসরের পরে নামায পড়া সম্পর্কে ফকীহদের অভিমত

অধিকাংশ আলেমের মতে ফজর ও আসরের নামাযের পর ইতিপূর্বে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা পড়া বৈধ। কারণ রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তির ভুলক্রমে কোনো নামায ছুটে গেছে, সে যেনো মনে পড়া মাত্রই তা পড়ে নেয়। –বুখারি ও মুসলিম। তবে ফজর ও আসরের পরে কোনো নফল নামায পড়াকে সাহাবিদের মধ্য থেকে আলী, ইবনে মাসউদ, যায়দ বিন সাবেত, আবু হুরায়রা ও ইবনে উমর রা., তাবেয়ীদের মধ্য থেকে হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব এবং মযহাবী ইমামদের মধ্য থেকে আবু হানিফা ও মালেক অপছন্দ করেছেন। আসরের পর দু'রাকাত পড়ার কারণে উমর রা. একাধিক সাহাবির সামনে পিটিয়েছেন, অথচ কেউ সেটা অপছন্দ করেনি। খালেদ ইবনে ওলীদও পিটাতেন। শাফেয়ীর মতে, যে নামাযের কোনো কারণ থাকে, তা বৈধ– যেমন তাহিয়াতুল মসজিদ ও সুন্নাতুল অযু। এ দুই ধরনের নামায ফজর ও আসরের অব্যবহিত পরে পড়া যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. আসরের নামাযের পর যোহরের সুন্নত পড়েছেন। হাম্বলীদের মতে, যতো কারণই থাকুক, তওয়াফের দু'রাকাত ছাড়া আর সমস্ত নফল নামায আসর ও ফজরের পরে হারাম। জুবাইর ইবনে মুতয়াম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "হে আবদ মানাফের বংশধর, দিনে বা রাতের যে কোনো সময় যে কোনো ব্যক্তি এই ঘরের তওয়াফ করুক বা এতে নামায পড়ুক, তাকে বাধা দিওনা।" -সুনানে আরবায়া, ইব।

● সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দুপুরের সময় নামায পড়া সম্পর্কে মতামত

উল্লিখিত তিন সময় নামায পড়াকে হানাফিগণ সাধারণভাবে বৈধ মনে করেননা, চাই তা ফরয, ওয়াজিব, নফল, কাযা বা চলতি– যে নামাযই হোক না কেন। তবে চলতি আসর ও জানাযার নামায এর ব্যতিক্রম। (এই তিন সমযের যে কোনো সময় মৃতদেহ আসুক, জানাযার নামায পড়া মাকরূহ হবেনা।) এই তিন সময়ে সাজদার আয়াত পঠিত হলে তিলাওয়াতের সাজদাও

---

* নববী বলেছেন : শয়তান এই সময়গুলোতে নিজের মাথা সূর্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়। যাতে সূর্যের পূজাকারী কাফিররা শয়তানের উপাসক হয়। ফলে তার ও তার দলবলের খানিকটা প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা জন্মে। যাতে নামাযীদের কাছে তাদের নামাযকে সন্দেহভাজন বানাতে পারে। এ জন্যই নামাযকে শয়তানের সৃষ্ট এই সন্দেহ থেকে রক্ষা করার জন্য এ সময়ে নামায পড়া মাকরূহ করা হয়েছে। যেমন শয়তানের আশ্রয়স্থলগুলোতে নামায মাকরূহ করা হয়েছে।

বৈধ। আবু ইউসুফের মতে, জুমার দিন দুপুরের সময় নফল নামায পড়াও মাকরূহ নয়। শাফেয়ী মাযহাবে বিনা কারণে এই তিন সময়ে নফল নামায পড়া মাকরূহ। তবে ফরয, যে নফলের কোনো কারণ আছে তা, জুমার দিনে দুপুরে নফল এবং মক্কার হারাম শরিফে নফল– এসবই বৈধ, মাকরূহ নয়। মালেকীদের মতে, সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় যতো কারণই থাকুক, নফল, মানতের নামায, তিলাওয়াতের সাজদা ও জানাযার নামায হারাম। তবে মৃতদেহের বিকৃতির আশংকা থাকলে জানাযা বৈধ। তবে এই দুই সময় কাযা ও চলতি–উভয় ফরয নামায এবং দুপুরে ফরয ও নফল– সব নামাযই বৈধ। মুয়াত্তার টীকায় বাজী এবং আল-মাবছুতে ইবনে ওহাব থেকে বর্ণিত : মালেক (রহ.)-কে দুপুরে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন : ঠিক দুপুরে জুমার নামায পড়ছিল এমন এক দলের সাথে আমিও জুমা পড়েছি। কোনো কোনো হাদিসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে যে নামায আমি লোকদের সাথে পড়েছি তা পড়তে আমি নিষেধ করিনা। আবার নিষেধাজ্ঞা থাকায় তা আমি পছন্দও করিনা। হাম্বলীরা মনে করেন, এ তিন সময়ে নফল নামায কোনো অবস্থায়ই শুদ্ধ হবেনা, চাই তার কোনো কারণ থাকুক বা না থাকুক, মক্কার হারাম শরিফে হোক বা অন্য কোথাও এবং জুমার দিনে হোক বা অন্য কোনো দিনে। কিন্তু জুমার দিনের তাহিয়াতুল মসজিদকে তারা দুপুরে ও খুতবার সময়ে বৈধ মনে করেন। তাদের মতে, এ তিন সময়েই জানাযা হারাম। তবে বিকৃতির আশংকা থাকলে তা বৈধ। ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা, মান্নতের নামায এবং তওয়াফের দু'রাকাত নামায নফল হলেও এ তিন সময়ে তাদের মতে বৈধ। (ইমামদের বিভিন্ন মতামত এখানে উল্লেখ করার কারণ হলো, এর সবকটির পক্ষেই শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে)।

● **ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর এবং ফজরের নামাযের আগে নফল পড়া**

ইবনে আম্মারের মুক্ত গোলাম ইয়াসার বলেন, ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আমাকে নফল পড়তে দেখে ইবনে উমর বললেন : আমরা এই সময়ে নামায পড়তে থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ সা. আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন : তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত তারা যেনো অনুপস্থিতদেরকে জানিয়ে দেয়, ফজর হওয়ার পর ফজরের নামায ছাড়া আর কোনো নামায নেই।" –আহমদ, আবু দাউদ। হাদিসটি দুর্বল হলেও এর একাধিক সূত্র রয়েছে, যার একটি অপরটির পরিপূরক। ফলে এটিকে এই মর্মে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা যায় যে, ফজরের দু'রাকাত ছাড়া আর যে কোনো নফল নামায ফজরের ওয়াক্তে মাকরূহ। এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন শওকানি। হাসান, শাফেয়ী, ইবনে হাযমের মতে যে কোনো নফল বিনা শর্তে পড়া যাবে, মাকরূহ হবেনা। মালেকের মতে, যে ব্যক্তির ঐ রাতের নফল নামায কোনো যুক্তিসংগত কারণে ছুটে গেছে, একমাত্র তার জন্যই এই সময়ে নফল পড়া বৈধ। ইবনে আব্বাস, কাসেম, ইবনে আমের ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর বেতের পড়েছেন বলে উল্লেখ আছে। আর ইবনে মাসউদ বলেছেন : আমার বেতের পড়া অবস্থায় যদি ফজরের নামাযের জামাত শুরু হয়ে যায়, তবে আমি পরোয়া করিনা। ইয়াহিয়া বলেছেন : উবাদা এক দল লোকের ইমামতি করতেন। একদিন প্রত্যুষে বের হলেন। মুয়াযযিন তখন ফজরের আযান দেয়া শুরু করতেই উবাদা তাকে থামিয়ে দিয়ে বেতের পড়ে নিলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে ফজর পড়লেন। সাঈদ বলেন : ইবনে আব্বাস ঘুমালেন। তারপর জেগে তার খাদেমকে বললেন : দেখতো, লোকেরা কি করছে। তখন ইবনে আব্বাস দৃষ্টিশক্তিহীন। খাদেম বাইরে গেলো। আবার ফিরে এলো। সে জানালো : লোকেরা ফজরের নামায পড়ে ফিরে এসেছে। তখন ইবনে আব্বাস উঠলেন, বেতের পড়লেন, তারপর ফজরের নামায পড়লেন।

ইকামতের সময় নফল নামায পড়া

জামাত শুরু হয়ে গেলে নফল নামায পড়া মাকরূহ। কেননা আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যখন জামাত শুরু হয়ে যায়, তখন ফরয নামায ছাড়া আর কোনো নামায নেই।" অন্য রেওয়ায়াতে : যে নামায শুরু হয়েছে, তা ছাড়া আর কোনো নামায নেই। -আহমদ, মুসলিম, সুনানে আরবায়া। আর আবদুল্লাহ বলেন : এক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকলো। রসূলুল্লাহ সা. তখন ফজরের নামায পড়ছেন। সে মসজিদের এক পাশে দু'রাকাত সুন্নত পড়ে নিলো। তারপর রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে জামাতে শরিক হলো। তারপর যখন রসূলুল্লাহ সা. সালাম ফেরালেন, তাকে বললেন : হে অমুক, তুমি দুই নামাযের কোন্‌টির প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ? তোমার একাকী নামাযের জন্য, নাকি আমাদের সাথের নামাযের জন্য? –মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী। একাকী পড়া নামাযে রসূলুল্লাহ সা. অসন্তোষও প্রকাশ করলেন, আবার তা পুনরায় পড়তেও আদেশ করলেননা –এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, ঐ নামায মাকরূহ হলেও বৈধ।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি নামায পড়ছিলাম। এই সময় মুয়াযযিন ইকামত দেয়া শুরু করলো। তখন আল্লাহর নবী সা. আমাকে টান দিয়ে বললেন : তুমি কি ফজরের নামায চার রাকাত পড়ছ? –বায়হাকি। আর আবু মূসা থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে ফজরের দু'রাকাত পড়তে দেখলেন। তখন মুয়াযযিন আযান দিতে শুরু করলো। তখন তার ঘাড় টিপে বললেন : এটা ছিলো এটার আগে। (অর্থাৎ এ নামাযটা আযানের আগে পড়া উচিত ছিলো।)

৭. আযান

১. আযান কি?

নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে এ কথা নির্দিষ্ট শব্দাবলি দ্বারা মানুষকে জানানোর নাম আযান। এ দ্বারা জামাতে নামায পড়তে আসার জন্য আহ্বান জানানো এবং ইসলামের বিধান ও নিদর্শন প্রচার করার কাজও সম্পন্ন হয়। এটা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব। কুরতুবী প্রমুখ বলেছেন : আযান যতো অল্প শব্দ সম্বলিতই হোক, এতে আকিদা সংক্রান্ত বিধিসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেননা এটা শুরু হয়েছে আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও সর্বশ্রেষ্ঠ এই মূলমন্ত্র দিয়ে। আল্লাহর সুমহান অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এর আওতাধীন। তারপর তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই বলে প্রশংসা করা হয়েছে। তারপর মুহাম্মদ সা.-এর রিসালত ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর নির্দিষ্ট ইবাদতের দিকে ডাকা হয়েছে রিসালতের সাক্ষ্য দানের অব্যবহিত পর। কারণ রসূলের মাধ্যমেই ইবাদতের পরিচয় জানা সম্ভব। তারপর কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এই কল্যাণ হলো চিরস্থায়ী জীবন। এখানে আখিরাতের অনন্ত জীবনের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। তারপর একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে তার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

২. আযানের ফযিলত

আযান ও মুয়াযযিনের মর্যাদা সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উদ্ধৃত করছি :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মানুষ যদি জানতো আযানে ও প্রথম কাতারে কি রয়েছে (অর্থাৎ কতো সওয়াব ও মর্যাদা রয়েছে) এবং লটারী করা ছাড়া যদি তার সুযোগ না পেতো, তাহলে অবশ্যই লটারী করতো। তারা যদি জানতো দুপুরে যোহরে মসজিদে যাওয়ায় কি আছে, তবে সেজন্য অবশ্যই প্রতিযোগিতা করতো। যদি তারা জানতো

এশা ও ফজরে কি আছে, তাহলে এই দুই সময়ের জামাতে অবশ্যই হাজির হতো হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। –বুখারি প্রমুখ।

২. মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মুয়াযযিনরা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট হবে। -আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ।

৩. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : সামনের কাতারের উপর আল্লাহ রহমত নাযিল করেন এবং তার ফেরেশতারা দোয়া করে। আর মুয়াযযিনের আওয়ায যতো দূর যায়, তাকে ক্ষমা করা হয় এবং যারা তার আযান শোনে, চাই আর্দ্র কিংবা শুষ্ক যা-ই হোক না কেন, তারা তার প্রতি সমর্থন জানায়, আর যতো লোক তার সাথে নামায পড়ে, সে তাদের সকলের সমান সওয়াব পায়। –আহমদ, নাসায়ী।

৪. আবুদ দারদা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : তিনজন মানুষ যদি এক জায়গায় অবস্থান করে এবং আযান না দেয় ও জামাতে নামায না পড়ে, তবে তাদের উপর শয়তান প্রবল হবে। –আহমদ।

৫. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইমাম হচ্ছে জিম্মাদার, আর মুয়াযযিন আমানতদার। হে আল্লাহ, ইমামদের সঠিক পথ দেখাও, আর মুয়াযযিনদের ক্ষমা করো।

৬. উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : পাহাড়ের এক খণ্ডিত অংশে মেষ চারণে নিয়োজিত রাখাল যখন নামাযের জন্য আযান দেয় এবং নামায পড়ে, তখন আল্লাহ তার প্রতি মুগ্ধ হন। তখন আল্লাহ বলেন : আমার এই বান্দার দিকে তাকাও, আমার ভয়ে সে আযান দেয় এবং নামায পড়ে। আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং বেহেশতে প্রবেশ করালাম। –আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী।

৩. শরিয়তে আযান প্রচলনের কারণ

হিজরি প্রথম সনে আযান প্রবর্তিত হয়। এর প্রবর্তনের কারণ নিম্নোক্ত হাদিসগুলোতে রয়েছে:

১. নাফে' থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর বলতেন : মুসলমানরা এক জায়গায় সমবেত হতো এবং নামাযের সময় অনুমান করে কখনো কখনো জামাতে আসতো। তাদেরকে ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট লোক ছিলনা। এ নিয়ে একদিন তারা আলোচনা করলো। একজন বললো : খৃষ্টানদের ঘণ্টার মতো ঘণ্টার ব্যবস্থা করা হোক। আরেকজন বললো : বরঞ্চ ইহুদীদের শিংগার মতো শিংগার ব্যবস্থা করা হোক। উমর বললেন : তোমরা একজন লোক পাঠাতে পারনা যে, নামাযের জন্য ডাকবে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে বিলাল, উঠো, নামাযের জন্য ডাকো। –আহমদ, বুখারি।

২. আবদুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আবদে রাব্বিহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. মানুষকে নামাযের দিকে ডাকার জন্য ঘণ্টা বাজানোর আদেশ দিলেন, অথচ খৃষ্টানদের প্রথার সাথে মিল থাকার কারণে এটা তার মনোপুত: ছিলনা। এই সময় আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি ঘণ্টা হাতে নিয়ে আমার পাশ দিয়ে ঘুরছে। আমি বললাম : ওহে আল্লাহর বান্দা, এ ঘণ্টা তুমি বিক্রি করবে নাকি? সে বললো : তুমি এ দ্বারা কি করবে? আমি বললাম : নামাযের জন্য মানুষকে ডাকবো। সে বললো : এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আমি তোমাকে শেখাবো? আমি বললাম : শেখাও। সে বললো : তুমি বলবে : "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হাইয়া

আলাস্ সালাহ, হাইয়া আলাস্ সালাহ। হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এরপর সামান্য একটু বিরতি দিয়ে লোকটি বললো : আর যখন জামাত শুরু করা হবে, তখন বলবে : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ। হাইয়া আলাল ফালাহ। কাদ কমাতিস্ সালাতু, কাদ কমাতিস্ সালাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" যখন সকাল হলো, রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে গেলাম এবং আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন : ইনশাআল্লাহ এ স্বপ্ন সত্য। তুমি বিলালের কাছে যাও এবং তাকে তুমি যা দেখেছ তা জানাও। সে এগুলো দিয়ে আযান দিক। কেননা সে তোমার চেয়ে উচ্চ ও মিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী।* তখন আমি বিলালের কাছে গেলাম, তাকে আযান শেখাতে লাগলাম এবং সে আযান দিতে লাগলো। উমর রা. তাঁর বাড়িতে বসে আযান শুনলেন। তৎক্ষণাত তিনি তার চাদর টানতে টানতে চলে এলেন এবং বললেন : হে রসূল, আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আবদুল্লাহকে যা দেখানো হয়েছে, আমাকেও অবিকল তাই দেখানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। –আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, তিরিমিযি।

৪. আযানের পদ্ধতি

বিভিন্ন হাদিস থেকে আযানের নিম্ন লিখিত তিনটে পদ্ধতি জানা যায় :

১. প্রথম আল্লাহু আকবার চারবার। আর আযানের অবশিষ্ট সব কটি কথা দু'বার করে। তাওহীদের বাণী ছাড়া তারজী করবেনা। এভাবে আযানের শব্দ সংখ্যা উপরোক্ত আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী হবে পনেরোটি।

২. চারবার তাকবীর এবং উভয় শাহাদাতের বাণী তারজী সহকারে বলবে। তারজী অর্থ হলো, প্রথমে দু'বার করে আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অনুচ্চ কণ্ঠে বলবে, তার পর পুনরায় উচ্চ কণ্ঠে বলবে। আবু মাহযূরা বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. তাকে আযান এভাবেই শিখিয়েছেন এবং এতে উনিশটি শব্দ হয়। পাঁচটি হাদিস গ্রন্থ। তিরমিযি বলেছেন, এটি হাসান সহীহ।

৩. প্রথম তাকবীর দু'বার বলবে এবং উভয় শাহাদাতকে তারজী সহকারে বলবে। এভাবে আযানের শব্দ সংখ্যা হবে সতেরোটি। মুসলিমে আবু মাহযূরা থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তাকে আযান শিখিয়েছেন এভাবে : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এরপর পুনরায় বলবে : আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দু'বার। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দু'বার। হাইয়া আলাস সালাহ দু'বার। হাইয়া 'আলাল ফালাহ দু'বার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

৫. ফজরের আযানে "আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম" বলা

ফজরের আযানে হাইয়া আলাল সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহর পর "আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম" বলা মুয়াযযিনের জন্য জরুরি। আবু মাহযূরা বলেন : হে রসূলুল্লাহ, আমাকে আযানের নিয়ম শেখান। তিনি শেখালেন এবং বললেন : ফজরের নামায হলে বলবে : আস

---

* এ হাদিস থেকে জানা যায়, মুয়াযযিনের অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও মিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী হওয়া মুস্তাহাব। আবু মাহযূর জানান, বিলালের কণ্ঠ শুনে রসূলুল্লাহ সা. অভিভূত হয়ে তাকে আযান শিখিয়ে দেন। –ইবনে খুযায়মা।

সালাতু খাইরুম মিনান নাওম, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। –আহমদ, আবু দাউদ।

৬. ইকামতের পদ্ধতি

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে ইকামতের তিনটি পদ্ধতি জানা গেছে। প্রথমত : বারবার আল্লাহ আকবার দিয়ে শুরু করা, তারপর আযানের যাবতীয় কথা দু'বার করে তারজী ছাড়া বলা, কেবল সবার শেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার বলা। কেননা আবু মাহযূরা রা. এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাকে সতেরো কথা সম্বলিত ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন : চারবার আল্লাহ আকবার, দুইবার আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দুইবার আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, দুইবার হাইয়া আলাস সালাহ, দুইবার হাইয়া আলাল ফালাহ, দুইবার কদ কামাতিস সালাহ, দুইবার আল্লাহু আকবার ও একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

তৃতীয়ত: এই পদ্ধতিটা পূর্ববর্তী পদ্ধতির মতোই। কেবল 'কদ কামাতিস সালাহ' কথাটা একবার বলতে হবে। এ পদ্ধতিতে ইকামত হবে দশটি কথা সম্বলিত। ইমাম মালেক এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন : কেননা এটা মদিনাবাসীর অনুসৃত পদ্ধতি। তবে ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : রসূল সা.-এর পক্ষ থেকে 'কদ কমাতিস সালাহ' কথাটা কখনোই একবার বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়নি। আর ইবনে আবদুল বার বলেছেন : সর্বাবস্থায় এটা দু'বার বলা হয়।

৭. আযানের সময় শ্রোতাদের যা বলা উচিত

১. শ্রোতা মুয়াযযিনের উচ্চারিত প্রতিটা কথা হুবহু উচ্চারণ করবে, কেবল 'হাইয়া আলাস্ সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' ব্যতিত। এ দুটি কথার পর সে বলবে : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বলবে। –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত। উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন মুয়াযযিন বলবে : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, তখন তোমরাও বলবে, আল্লাহু আকবার আল্লাহ আকবার। যখন মুয়াযযিন বলবে : আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন তোমরাও বলবে আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যখন মুয়াযযিন বলবে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, তখন তোমরাও বলবে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। যখন মুয়াযযিন বলবে, হাইয়া আলাস সালাহ, তখন তোমরা বলবে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তারপর যখন মুয়াযযিন বলবে, হাইয়া আলাল ফালাহ, তখন তোমরা বলবে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তারপর যখন মুয়াযযিন বলবে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, তখন তোমরাও বলবে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। তারপর যখন মুয়াযযিন বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন তোমরাও বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের সাথে এ কথাগুলো আন্তরিকভাবে বলবে, সে বেহেশতে যাবে।" –মুসলিম, আবু দাউদ।

ইমাম নববী বলেন, আমাদের ইমামগণ বলেছেন : হাইয়া আলাস্ সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ ব্যতিত মুয়াযযিন যা বলে শ্রোতাদেরও তাই বলা মুস্তাহাব। কারণ এ দ্বারা মুয়াযযিনের কথার প্রতি শ্রোতার সমর্থন ও সম্মতি প্রকাশ পায়। কিন্তু হাইয়া আলাস্ সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ (নামাযের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো) হচ্ছে নামাযের জন্য আহ্বান। এই আহ্বান কেবল মুয়াযযিনের পক্ষেই শোভা পায়। তাই শ্রোতার জন্য এ সময় অন্য কোনো দোয়াই মুস্তাহাব। এ জন্যই লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর

কোনো শক্তির উৎস নেই- এ কথাটা প্রচলিত হয়েছে। কারণ এ হচ্ছে- আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের অভিব্যক্তি। বুখারি ও মুসলিমে আবু মূসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বেহেশতের রত্নভাণ্ডারসমূহের মধ্য থেকে একটি রত্ন ভাণ্ডার।

আমাদের ইমামগণ বলেছেন : মুয়াযযিনের কথাগুলো উচ্চারণ করা প্রত্যেক শ্রোতার জন্য মুস্তাহাব, চাই সে পবিত্র হোক অথবা অপবিত্র হোক, ঋতুবর্তী হোক কিংবা বীর্যপাতজনিত অপবিত্র হোক, বড় হোক অথবা ছোট হোক। কারণ এটা একটা যিকর বা দোয়া বিশেষ। আর উক্ত সব শ্রেণীর মানুষ যিকর করার যোগ্য। একমাত্র নামাযরত ব্যক্তি পায়খানা বা পেশাবখানায় অবস্থানরত ব্যক্তি এবং সংগমরত ব্যক্তির কোনো দোয়া বা যিকর করা বৈধ নয়। যখন পেশাব বা পায়খানা সম্পন্ন হবে, তখন আযানের কথা পুনরাবৃত্তি করে নেবে। আর কোনো কিছু পড়া, যিকর করা বা জ্ঞানার্জন ইত্যাকার কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আপনি শুনলে ঐ কাজটি বন্ধ রেখে মুয়াযযিনের কথার পুনরাবৃত্তি করবেন, তারপর যে কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ইচ্ছা হলে সে কাজে ফিরে যাবেন। আর যদি কোনো ফরয বা নফল নামাযে ব্যস্ত থাকাকালে কেউ আযান শোনে, তাহলে ইমাম শাফেয়ী ও তার শিষ্যদের মতানুসারে আযানের কথার পুনরাবৃত্তি করবেনা। নামায শেষে পুনরাবৃত্তি করবে। আল-মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে আযান শুনতে পায়, তার পক্ষে আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ও মুয়াযযিনের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করা মুস্তাহাব, যাতে মর্যাদাপূর্ণ দুটো কাজই সে সম্পন্ন করতে পারে। আর যদি মুয়াযযিনের কথার পুনরাবৃত্তি না করেই নামায আরম্ভ করে দেয়, তবে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। ইমাম আহমদের মতও তদ্রূপ।

২. আযানের অব্যবহিত পর বিভিন্ন হাদিস থেকে প্রাপ্ত ভাষ্যের যে কোনো একটির অনুকরণে রসূলুল্লাহ সা. এর জন্যে সালাত (দোয়া) করবে। তারপর রসূলুল্লাহ সা. এর জন্য আল্লাহর কাছে অছিলা চাইবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াযযিনের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করবে, তারপর আমার উপর সালাত পাঠাবে। কারণ, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠায়, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার উপর দশবার সালাত পাঠান। তারপর আল্লাহর কাছে, আমার জন্য অছিলা চাইবে। এই অছিলা হলো বেহেশতের মধ্যে একটি বাড়ি, যা কেবল আল্লাহর একজন বিশেষ বান্দার জন্যই নির্দিষ্ট। আমি আশা করি, সেই বান্দা আমিই হবো। যে ব্যক্তি আমার জন্য অছিলা চাইবে, তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। -মুসলিম। আর জাবের থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে : "হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও আসন্ন নামাযের মালিক, মুহাম্মদ সা. কে দান করুন অছিলা ও উচ্চ মর্যাদা আর তাকে প্রতিষ্ঠিত করুন আপনার প্রতিশ্রুতি সেই প্রশংসিত স্থানে" তার জন্য কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ করা বৈধ হবে। -বুখারি।

৮. আযানের পরে দোয়া করা

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়টি দোয়া কবুল হওয়ার প্রত্যাশিত একটি সময়। তাই এ সময়ে বেশি করে দোয়া করা মুস্তাহাব। আনাস থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আযান ও ইকামতের মাঝখানের দোয়া ফেরত দেয়া হয়না।" আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি। তিরমিযি বলেছেন, হাদিসটি হাসান-সহীহ। তিরমিযিতে আরো রয়েছে : লোকেরা বললো, হে রসূলুল্লাহ সা. আমরা দোয়ায় কী বলবো? তিনি বললেন : "আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাও

এবং দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাও।" আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., মুয়াযযিনরা আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা লাভ করছে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "তারা যা যা বলে, তুমিও তা বলো। আর যখন আযান শেষ করো, তখন দোয়া করো, আল্লাহ তোমাকে দেবেন।" –আহমদ, আবু দাউদ। সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : দুটো দোয়া ফেরত যায়না, একটা হলো আযানের সময়ের দোয়া, অপরটি হলো, জেহাদের সময়ের দোয়া, যখন একে অপরকে হত্যা করে। –আবু দাউদ সহীহ সূত্রে। আর উম্মে সালামা বলেছেন : রসূল সা. আমাকে মাগরিবের আযানের সময় এই দোয়া শিখিয়েছেন : "হে আল্লাহ, তোমার রাত এগিয়ে আসছে, তোমার দিন চলে যাচ্ছে এবং তোমার দিকে আহ্বায়কদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সুতরাং আমার গুনাহ মাফ করে দাও।"

৯. ইকামতের সময়ে যিকর

যে ব্যক্তি ইকামত শুনবে, ইকামত ঘোষণাকারী যা যা বলে তার পুনরাবৃত্তি করা তার জন্য মুস্তাহাব। কেবল "কদ কামাতিস্ সালাহ" কথাটা শুনে বলবে : "আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা" অর্থাৎ আল্লাহ নামাযকে কায়েম করুন ও টিকিয়ে রাখুন। কেননা কোনো কোনো সাহাবি থেকে বর্ণিত : বিলাল ইকামত দিতে শুরু করলেন। অতপর যখনি "কদ কামাতিস্ সালাহ" বললেন, তখন রসূল সা. বলতেন : "আল্লাহ নামাযকে কায়েম করুন ও টিকিয়ে রাখুন।" কিন্তু হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় বলতে হবে : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"।

১০. মুয়াযযিনের করণীয়

১. আযান দ্বারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। এ জন্য কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না। কেননা উসমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আমাকে আমার গোত্রের ইমাম বানিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি তাদের ইমাম। তবে তাদের জন্য নামায এতোটা হালকা করে পড়াবে, যতোটা তাদের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির জন্য উপযোগী। আর এমন একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করবে, যে তার আযানের জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেবেনা। -আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। এটি তিরমিযির বর্ণনা যে : 'রসূল সা. আমাকে সর্বশেষ যে আদেশ দিলেন তা হলো, এমন একজন মুয়াযযিন নাও যে আযানের জন্য কোনো পারিশ্রমকি গ্রহণ করবেনা।' এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো, ভালো কাজে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া বৈধ। অধিকাংশ মুয়াযযিন তার আযান দ্বারা পারিশ্রমিক না নিয়ে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে– এটা মুস্তাহাব।

২. ছোট ও বড় উভয় নাপাকি থেকে মুয়াযযিনের মুক্ত থাকা চাই। কেননা মুহাজির ইবনে কুনফুয রা. বলেন, রসূল সা. তাকে বলেছেন : আমি তার সালামের জবাব দেইনি তার একমাত্র কারণ হলো, আমি পবিত্র ছিলামনা এবং অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করাটা আমি পছন্দ করিনি। –আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। তবে অপবিত্র অবস্থায় আযান দিলে তা বৈধ কিন্তু মাকরূহ হবে। এটা শাফেয়ীদের মত। হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবে মাকরূহ নয়।

৩. কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আযান দেবে। ইবনুল মুনযির বলেছেন : আযান দাঁড়িয়ে দেয়া যে সুন্নত, এটা সর্বসম্মত মত। এতে আযান শুনানোর কাজটা অধিকতর কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়। আর আযানে কিবলামুখী হওয়া সুন্নত। রসূলুল্লাহ সা. এর নিযুক্ত মুয়াযযিনরা সবাই কিবলামুখী হয়ে আযান দিতেন। যদি কোনো বাধাবিপত্তির কারণে কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও আযান বৈধ হবে।

৪. হাইয়া আলাস্ সালাহ, হাইয়া আলাস্ সালাহ বলার সময় মাথা, ঘাড় ও বুকসহ ডান দিকে এবং হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় বাম দিকে তাকাবে। ইমাম নববী বলেছেন, এটাই আযানের বিশুদ্ধ পদ্ধতি। বুখারি, মুসলিম ও আহমদে বর্ণিত হয়েছে, বেলাল এভাবেই আযান দিতেন। বায়হাকি বলেন : মুয়াযযিনের ঘোরার বিষয়টি কোনো সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়নি। আল মুগনীতে ইমাম আহমদের মত উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল মিনারের ওপরে উঠে আযান দিলেই ঘুরতে হবে, যাতে ডান বাম উভয় দিকের লোকেরা শুনতে পায়।

৫. দুই কানে আংগুল ঢুকিয়ে আযান দেবে। বিলাল বলেছেন : আমি আমার আংগুল কানে ঢুকালাম ও আযান দিলাম। -আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান। তিরমিযির মতে, কানে আংগুল ঢুকিয়ে আযান দেয়া মুস্তাহাব।

৬. আযান উচ্চস্বরে দেবে, এমনকি মরুভূমিতে একাকি থাকা অবস্থাও। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরি বলেছেন : আমি দেখেতে পাচ্ছি, তুমি মরুভূমি ও ছাগল ভেড়া পছন্দ করো। কাজেই তুমি যখন মরুভূমিতে বা মেষপালের মধ্যে থাকবে, তখন উচ্চস্বরে আযান দেবে। কেননা যে কোনো মানুষ, জিন বা অন্য কোনো সৃষ্টি আযান শুনবে, সে কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেই। আবু সাঈদ বললেন : একথা আমি রসূল সা. এর কাছ থেকে শুনেছি। -আহমদ, বুখারি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

৭. আযানে প্রত্যেক দুটি কথার পর সামান্য বিরতি দেবে। আর ইকামত দ্রুত বলবে। এটি মুস্তাহাব বলে বিভিন্ন সূত্রের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

৮. ইকামতের মধ্যে কথা বলবেনা। আযানের মধ্যে কথা বলা অনেকেই মাকরূহ বলেছেন, তবে হাসান, আতা ও কাতাদার মতে মাকরূহ নয়। আবু দাউদ বলেন : ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করলাম : আযানে কি কথা বলা যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। বললাম : ইকামতেও কি কথা বলা যাবে? তিনি বললেন : না। কেননা ইকামতে দ্রুততা মুস্তাহাব।

১১. প্রথম ওয়াক্তে এবং ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেয়া

আযান প্রথম ওয়াক্তে দিতে হয়। ওয়াক্তের আগেও নয়, পরেও নয়। কেবল ফজরের সময় প্রথম ওয়াক্তের আগেও আযান দেয়া যায়, যখন প্রথম আযান ও দ্বিতীয় আযানে পার্থক্য করা সম্ভব হয়, যাতে কোনো সংশয় ও অসচ্ছতা না থাকে।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বিলাল রাতে আযান দেয়। সুতরাং ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার করো। –বুখারি, মুসলিম। ফজরের আযান ওয়াক্ত হওয়ার আগে দেয়া জায়েয হওয়ার প্রমাণ ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, যা আহমদ বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমাদের কেউ যেনো বিলালের আযান শুনে সাহরী খাওয়া বন্ধ না করে। কারণ সে আযান দেয় রাতের নামাযে নিয়োজিত ব্যক্তিকে খাওয়া দাওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো ও ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানোর জন্য।" বিলাল আযানের নির্ধারিত শব্দগুলো দ্বারাই আযান দিতেন। তাহাবী ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন বিলালের আযান ও ইবনে উম্মে মাকতুমের আযানে শুধু এতোটুকুই পার্থক্য ছিলো যে, একটি উচ্চতর কণ্ঠে আর অপরটি মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হতো।

১২. আযান ও ইকামতের মাঝে ব্যবধান থাকা

আযান ও ইকামতের মাঝে এতোখানি সময়ের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন, যাতে নামাযের জন্য প্রস্তুতি নেয়া ও জামাতে হাজির হওয়া সম্ভব হয়। কেননা আযানের উদ্দেশ্যই জামাতে নামায

অনুষ্ঠান। সময়ের ব্যবধান না হলে এই উদ্দেশ্য সফল হবেনা। বুখারিতে একটি শিরোনাম দেয়া হয়েছে : "আযান ও ইকামতের মাঝে কতোটুকু ব্যবধান?" কিন্তু সুনির্দিষ্ট সময় প্রমাণিত হয়নি। ইবনে বাত্তাল বলেছেন : এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। কেবল সময় ও মুসল্লীদের সমবেত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। জাবের বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. এর মুয়াযযিন আযান দেয়ার পর ইকামতের আগে কিছু বিরতি দিতেন। যখন দেখতেন রসূলুল্লাহ সা. বের হয়েছেন, তখন তাকে দেখেই ইকামত দিতেন। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযি।

১৩. যিনি আযান দেন, তিনিই ইকামত দেবেন

আলেমদের সর্বসম্মত মত অনুসারে ইকামত মুয়াযযিন ব্যতিত অন্য কেউ দিলেও তা বৈধ হবে। তবে মুয়াযযিনেরই ইকামত দেয়া উত্তম। শাফেয়ী বলেন : আমি পছন্দ করি, যে ব্যক্তি আযান দেয় সে-ই ইকামত দেয়ার দায়িত্বে থাকুক। তিরমিযি বলেছেন : অধিকাংশ আলেমের নিকট যিনি আযান দেন তিনিই ইকামত দেবেন এটাই অনুসৃত নীতি।

১৪. মুক্তাদিরা কখন দাঁড়াবে ?

মুয়াত্তা গ্রন্থে ইমাম মালেক বলেছেন : ইকামত শুরু হলে মুক্তাদিরা কখন দাঁড়াবে তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় আছে বলে আমি শুনিনি। আমি মনে করি, এটা মানুষের সামর্থের ভিত্তিতে নির্ণিত হবে। তাদের মধ্যে কেউ আছে দ্রুত গতিসম্পন্ন আবার কেউ আছে ধীর গতিসম্পন্ন। ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন : মুয়াযযিন যখন "কাদ কামাতিস্ সালাহ" বলতো, তখনই আনাস দাঁড়াতেন।

১৫. আযান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া

মুয়াযযিনের আযানের জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকা ও আযানের পর মসজিদে থেকে বের হওয়ার উপর হাদিসে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে। তবে কোনো ওযর থাকলে অথবা দ্রুত ফিরে এসে জামাত ধরার দৃঢ় সংকল্প থাকলে আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া দূষণীয় নয়। আবু হুরায়রা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, যখন তোমরা মসজিদে থাকতেই আযান হয়ে যায়, তখন তোমাদের কেউ যেনো নামায না পড়ে বের না হয়। -আহমদ। আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত : এক ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান দেয়ার পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন : এই লোকটি আবুল কাসেম মুহাম্মদ সা. এর অবাধ্য হলো। -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্হ। আর মুয়ায জুহানী থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : অন্যায়, ভীষণ অন্যায়, কুফরী ও মুনাফিকী করলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আহ্বায়ককে কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে শুনেও তার জবাব দিলনা। -আহমদ, তাবরানি।

তিরমিযি বলেছেন, একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে : যে ব্যক্তি আযান শুনেও তার জবাব দিলনা, তার নামায নেই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন : এ কথাগুলো জামাতের ব্যাপারে ও আযানের জবাব দেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। মূলকথা হলো, বিনা ওযরে জামাত ছাড়ার অনুমতি নেই।

১৬. কাযা নামাযের জন্য আযান ও ইকামত

যে ব্যক্তির ঘুমিয়ে পড়া কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে নামায ছুটে গেছে, সে যখন ঐ নামায পড়তে চাইবে তখন তার জন্য আযান ও ইকামত দেয়া শরিয়ত সম্মত। আবু দাউদের যে

বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ সা. ও তার সাহাবিগণের সূর্য উঠে যাওয়ার পর ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, তিনি বিলালকে আদেশ দিলেন আযান ও ইকামত দিতে এবং নামায পড়লেন। যদি একাধিক নামায ছুটে গিয়ে থাকে, তাহলে প্রথমটির জন্য এমনভাবে আযান দিতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়, আর ইকামত দিতে হবে প্রত্যেক নামাযের জন্য। আছরাম বলেছেন : এক ব্যক্তি তার কাযা নামায আদায় করতে গিয়ে কিভাবে আযান দিতে হবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আবু আব্দুল্লাহ্ একটি হাদিসের উল্লেখ করেন যাতে বলা হয়েছে : খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ সা. কে চার ওয়াক্তের নামায পড়তে দেয়নি। রাতের একটা অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ সা. বিলালকে আযান ও ইকামত দেয়ার আদেশ দিয়ে প্রথমে যোহরের নামায, তারপর শুধু ইকামত দ্বারা আসরের নামায, তারপর শুধু ইকামত দ্বারা মাগরিবের নামায এবং সব শেষে শুধু ইকামত দ্বারা এশার নামায পড়লেন।

১৭. মহিলাদের আযান ও ইকামত

ইবনে উমর রা. বলেছেন : মহিলাদের কোনো আযান ও ইকামত নেই। –বায়হাকি। এটা আনাস, হাসান, ইবনে সিরীন, নাসায়ী, ছাওরী, মালেক, আবু ছাওর ও আসহাবুর রায় (ইজতিহাদভিত্তিক মুক্ত চিন্তাবিদগণ)-এর অভিমত। শাফেয়ী ও ইসহাক বলেন : তারা যদি আযান ও ইকামত দেয় তাতেও দোষের কিছু নেই। আহমদ বলেন : আযান ও ইকামত দেয়া ও না দেয়া উভয়ই বৈধ। আয়েশা রা. আযান ও ইকামত দিতেন, মহিলাদের ইমামতি করতেন ও মাঝখানে দাঁড়াতেন। –বায়হাকি।

১৮. জামাতে নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করা

আল-মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি জামাতে নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করে, সে ইচ্ছে করলে আযান ও ইকামত-দুটোই দিতে পারে। এটা বলেছেন ইমাম আহমদ। আছরাম আনাস রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন : আনাস এক মসজিদে প্রবেশ করলেন। প্রবেশের পূর্বে সেখানে জামাতে নামায অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি একজনকে আযান দিতে বললেন। আযান ও ইকামত হলো এবং তিনি জামাতে নামায পড়ালেন।' আবার ইচ্ছে করলে আযান ও ইকামত দুটোই বাদ দিয়ে নামায পড়তে পারে। উরওয়া বলেছেন : তুমি যখন এমন কোনো মসজিদে পৌঁছবে, যেখানে একদল লোক ইতিপূর্বে আযান ও ইকামত দিয়ে নামায পড়েছে, তখন তাদের আযান ও ইকামত তার পরবর্তীদের জন্য যথেষ্ট হবে। এটা হাসান বসরি, শা'বী ও নাসায়ীর অভিমত। তবে হাসান বসরি বলেছেন, ইকামত দেয়াই সবাই পছন্দ করতেন। আর আযান দিলে অনুচ্চ কণ্ঠে দিতে হবে, যাতে লোকেরা অসময়ে আযান শুনে ভুল না বুঝে।

১৯. ইকামত ও নামাযের মাঝে ব্যবধান

ইকামত ও নামাযের মাঝখানে কথাবার্তা ও অন্য কিছু দ্বারা খানিকটা ব্যবধান ঘটলে তা বৈধ। এই ব্যবধান দীর্ঘায়িত হলেও ইকামত পুনরায় দেয়া লাগবেনা। আনাস থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. মসজিদের এক কিনারে গিয়ে যখন এক ব্যক্তির সাথে চুপি চুপি কথা বলছিলেন, তখন ইকামত দেয়া হলো। এরপর লোকদের চোখে ঘুম এলে তিনি নামাযে আসেন। –বুখারি।

আর একদিন নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ সা. এর মনে পড়লো তাঁর উপর গোসল ফরয। তৎক্ষণাত তিনি ঘরে ফিরে গেলেন, গোসল করলেন, তারপর ফিরে এলেন এবং সাহাবিদেরকে নিয়ে পুন: ইকামত ছাড়া নামায পড়লেন।

২০. নির্ধারিত মুয়াযযিন ব্যতিত আযান দেয়া

নির্ধারিত মুয়াযযিনের অনুমতি ব্যতিত অন্য কারো আযান দেয়া বৈধ নয়। তবে মুয়াযযিন যদি সময় মতো না আসে এবং আযানের সময় পার হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে অন্য কেউ আযান দিতে পারে।

২১. আযানের অংশ নয় এমন জিনিসকে আযানের সাথে যুক্ত করা

আযান একটা ইবাদত। আর যাবতীয় ইবাদত হুবহু সুন্নতের অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। আমাদের ধর্মে কোনো জিনিস বাড়ানো কমানো আমাদের জন্য বৈধ নয়। সহীহ হাদিসে রয়েছে : কেউ যদি আমাদের ধর্মে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, যা এর অংশ নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ বাতিল ও বৃথা। আমরা এখানে এমন কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করছি, যা সমাজে চালু হয়ে গেছে, ফলে অনেকের কাছে এগুলো ইসলামের অংশ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অথচ এগুলো কোনোভাবেই ইসলামের অংশ নয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. আযান বা ইকামতের সময় মুয়াযযিনের এরূপ বলা : "আশহাদু আন্না সাইয়েদানা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ"। হাফেয ইবনে হাজার মনে করেন, ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত ও প্রচলিত হয়ে আসা সুন্নতের মধ্যে এভাবে কোনো কিছু বাড়ানো জায়েয নেই। সুন্নত ব্যতিত অন্যত্র বাড়ালে দোষ নেই।

২. শায়খ ইসমাঈল আল আজলুনী তাঁর কাশফুল খাফা নামক গ্রন্থে বলেছেন : মুয়াযযিন যখন বলবে, "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" তখন শ্রোতা দু'হাতের তর্জনী আংগুলীদ্বয়ের মধ্যস্থলে চুমু দিয়ে চোখ মর্দন করবে ও সেই সাথে বলবে : "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাযীতু বিল্লাহি রব্বান ওয়া বিল ইসলামি দীনান, ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবীয়ান, (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর দাস ও রসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মদ সা. কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।)" দায়লামী আবু বকর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর যখন মুয়াযযিনকে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলতে শুনলেন, তখন তিনিও তা বললেন এবং তার দুই তর্জনী আংগুলের মধ্যখানে চুমু দিয়ে তা দিয়ে দুই চোখ মর্দন করলেন। রসূলুল্লাহ সা. তখন বললেন : আমার বন্ধু যা করেছে, তা যে ব্যক্তি করবে, তার জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করা আমার বৈধ হয়ে যাবে।" কিন্তু আল-মাকাসিদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, দায়লামীর এই বর্ণনা শুদ্ধ নয়। অনুরূপ আবুল আব্বাসের গ্রন্থ : "মুজিবাতুর রহমা ও আযায়িমাল মাগফিরাহ"-এর এ বর্ণনাও শুদ্ধ নয় যে, খিজির (আ.) বলেছেন : যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলা শুনে বলবে : "মারহাবান বিহাবিবী ওয়া কুররাতু আইনী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" (আমার বন্ধু ও চোখের মণি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ সা. কে স্বাগতম) অতপর তার দুটো বুড়ো আংগুলে চুমু খেয়ে তা দ্বারা তার দু'চোখ মর্দন করবে, সে কখনো অন্ধ হবেনা এবং তার কখনো চোখ উঠবেনা।" এ ধরনের আরো অনেক কথা চালু আছে। শাইখ ইসমাঈল বলেন : সহীহ হাদিসে এসব কথার কোনোই ভিত্তি নেই।

৩. আযানে কোনো অক্ষর, জের, জবর, পেশ বা মদ যুক্ত করে সুর সংযোজন করা মাকরূহ। আর এরূপ সুর আরোপের কারণে যদি অর্থের বিকৃতি ঘটে বা কোনো দুর্বোধ্য অর্থের সৃষ্টি হয়, তবে তা হবে হারাম। ইয়াহিয়া আল বাক্কা বলেছেন, ইবনে উমরকে দেখেছি, এক ব্যক্তিকে বলছেন : আমি আল্লাহর কারণে তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ। তারপর তার সাথিদেরকে বললেন, এই ব্যক্তি আযানে সুর আরোপ করে ও তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

৪. ফজরের পূর্বের তাসবীহ : আল-ইকনা ও তার টিকায় যা হাম্বলীদের অন্যতম গ্রন্থ, বলা হয়েছে : ফজরের পূর্বে আযান ব্যতিত আর তাসবীহ, গান, উচ্চস্বরে দোয়া ইত্যাদি আযানের জায়গা থেকে ঘোষণা করা সুন্নত নয়। কোনো আলেমই একে মুস্তাহাব বলেননি। বরঞ্চ এসব অবাঞ্ছিত। কেননা এগুলো রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবিদের যুগে ছিলোনা। এমনকি তাদের যুগে যা কিছু প্রচলিত ছিলো, তার ভেতরে এর কোনো ভিত্তিও নেই। এসব করতে আদেশ দেয়া, যে করেনা তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং এর উপর কোনো জীবিকা লাভের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা নির্ভরশীল করার অধিকার কারো নাই। এটা বিদয়াতে সাহায্য করার শামিল। এ ধরনের কোনো কাজে কাউকে বাধ্য করাও বৈধ নয়- যদি মসজিদের ওয়াক্ফকারী তাকে শর্ত হিসেবেও আরোপ করে। কারণ তা সুন্নাহর বিরোধী। ইবনুল জাওযী তাঁর গ্রন্থ তালবীসুল ইবলীসে বলেছেন : আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে দেখেছি, গভীর রাতে মিনারের উপর ওঠে ওয়ায নছিহত করে, যিকির করে এবং উচ্চস্বরে কুরআনের বিভিন্ন সূরা পাঠ করে। এভাবে মানুষের ঘুমে ও তাহাজ্জুদে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এসবই অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ। হাফেয ইবনে হাজার তাঁর ফাতহুল বারীতে বলেছেন : ফজরের আগে, জুমার আগে দুরূদের নামে ও তাসবীহর নামে যেসব নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা হয়েছে, তা আদৌ আযান নয়- আভিধানিকভাবেও নয়, পারিভাষিকভাবেও নয়।

৫. আযানের পর রসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি সশব্দে দরূদ ও সালাম পাঠ করার কোনো বিধান শরিয়তে নেই। এটা বিদয়াত ও মাকরূহ। ইবনে হাজার ফাতওয়া কুবরাতে বলেছেন : ইদানিং মুয়াযযিন যে পদ্ধতিতে আযানের পর রসূলুল্লাহ ((সা.)) এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠাচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের ইমামগণ ও অন্যান্যদের ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। জবাবে তাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন যে, দরূদ ও সালাম সুন্নত বটে, কিন্তু পদ্ধতিটা বিদয়াত। মিশর অঞ্চলের মুফতি শেখ মুহাম্মদ আবদুহুকে আযানের পর রসূলুল্লাহ সা. এর উপর দরূদ পাঠানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিলেন : ফাতাওয়া খানিয়া গ্রন্থে এসেছে, ফরয নামায ছাড়া অন্য কোনো উপলক্ষে আযান প্রবর্তিত হয়নি। আযান পনেরোটি কথা, যার শেষটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর আগে ও পরে যা কিছুই যুক্ত করা হোক, তা বিদয়াত। কেবলমাত্র সুর লহরি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তা উদ্ভাবিত হয়েছে। এই সুর লহরি সৃষ্টিকে কেউ বৈধ বলেনি। এর কোনো কোনোটিকে যারা বিদয়াত হাসানা (উত্তম বিদয়াত) বলে আখ্যায়িত করেন, তাদের কথার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কোনোো ইবাদতের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রত্যেক বিদয়াতই খারাপ ও অন্যায়। যে দাবি করে, এতে কোনো সুর সৃষ্টির চেষ্টা নেই সে মিথ্যুক।

৮. নামাযের শর্তসমূহ

শর্ত বলা হয় সেই জিনিসকে, যা না থাকলে তার উপর নির্ভরশীল বস্তুও থাকবেনা, আর থাকলে তার সাথে সম্পৃক্ত বস্তু থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। যেমন অযু। এর অনুপস্থিতিতে নামাযের অনুপস্থিতি অনিবার্য। কিন্তু এর উপস্থিতিতে নামাযের উপস্থিতি অনিবার্য ও বাধ্যতামূলক নয়। কারণ অযু করলেই নামায পড়া বাধ্যতামূলক নয়। যে সমস্ত শর্ত নামাযের আগে পূরণ করা জরুরি এবং নামাযী এর কোনোটি বাদ দিলে তার নামায বাতিল হবে, তা হচ্ছে :

১. নামাযের ওয়াক্ত জানা

নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে বলে ধারণা প্রবল হলেই যথেষ্ট। নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে- এ কথা যে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে জেনেছে বা এ ব্যাপারে যার ধারণা প্রবল হয়েছে, তার জন্য নামায পড়া

বৈধ। এ নিশ্চয়তা বা ধারণার প্রবলতা কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির তথ্য সরবরাহ, দায়িত্বে নিয়োজিত মুয়াযযিনের আযান, নিজের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ তথা চিন্তাগবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান অথবা জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবহৃত অন্য কোনো সূত্র বা পদ্ধতির দ্বারা অর্জিত হতে পারে।

২. ছোট নাপাকি ও বড় নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا.

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াতে চাইবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নাও, কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও, তোমাদের মাথা মসেহ কর। গিরে পর্যন্ত পা ধুয়ে নাও। আর যদি তোমরা বীর্যপাতজনিত কারণে অপবিত্র থাকো। তবে সর্বতোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো।"

ইবনে উমর রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ পবিত্রতা অর্জন ব্যতিত নামায এবং আত্মসাৎকৃত সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করেননা। −বুখারি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

৩. শরীর, কাপড় ও নামায পড়ার জায়গা পবিত্র হওয়া

এ শর্ত পূরণ করা যখন সম্ভব তখন পূরণ করবে, নচেত নাপাকি নিয়েই নামায পড়বে এবং এই নামায আর দুহরানোর দরকার হবেনা। শারীরিক পবিত্রতার বিষয়টি আনাস রা. এর হাদিস থেকে প্রমাণিত।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করো। কেননা কবরের আযাব সাধারণত: এ ব্যাপারে অসাবধানতা থেকেই হয়। −দার কুতনী। আর আলী রা. বলেছেন : আমার খুব ঘন ঘন মযী বের হতো। তাই এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করলাম রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করতে। সে জিজ্ঞাসা করলো। রসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন : পুরুষাংগ ধুয়ে ফেলতে ও অযু করতে হবে। −বুখারি এবং অন্যান্য গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে আয়েশা থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. রক্তস্রাবের মেয়াদের পরও যে নারীর স্রাব চলতে থাকে, তাকে বলেছেন- তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলো ও নামায পড়ো।" কাপড়ের পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. "তোমার কাপড় পবিত্র করো।" (সূরা আল-মুদ্দাসসির : আয়াত ৪)

জাবির বিন সামুরা রা. বলেছেন : আমি শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো : আমি যে পোশাকে আমার স্ত্রীর কাছে যাই তা দিয়েই নামায পড়বো কি? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হ্যাঁ, তবে তাতে কিছু দেখলে ধুয়ে নিও। −আহমদ, ইবনে মাজাহ। আর মুয়াবিয়া বলেন : আমি উম্মে হাবিবাকে জিজ্ঞাসা করলাম : রসূলুল্লাহ সা. যে পোশাকে স্ত্রী সহবাস করতেন, সেই পোশাকেই কি নামায পড়তেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যখন তাতে কোনো নাপাকি না থাকতো তখন। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. একবার নামাযে তাঁর পাদুকা খুললেন। তাঁর দেখা দেখি উপস্থিত লোকেরাও তাদের পাদুকা খুললো। রসূলুল্লাহ সা. যখন তাদের দিকে ফিরলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা পাদুকা খুলেছো কেন? তারা বললো: আপনাকে খুলতে দেখলাম, তাই খুললাম। তিনি বললেন : জিবরীল আমার কাছে এসে জানিয়েছে যে, পাদুকায় নাপাকি আছে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসবে, তখন সে যেনো তার পাদুকা উল্টে

দেখে নেয়। যদি তাতে কোনো নাপাকি দেখতে পায় তবে তা মাটিতে ডলে নিয়ে যেনো নামায পড়ে। -আহমদ, আবু দাউদ।

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, নিজের অজান্তে অথবা ভুলক্রমে নাপাকি সাথে নিয়ে নামায শুরু করার পর কেউ যদি নামাযের মধ্যে তা জানতে পারে, তবে তা তৎক্ষণাত পরিষ্কার করে নামায অব্যাহত রাখা যাবে এবং এর আগে নামায যেটুকু হয়েছিল সেখান থেকেই বাকিটুকু পড়তে হবে। নামায দুহরাতে হবেনা। নামাযের জায়গার পবিত্রতার শর্তটি আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিস থেকে প্রমাণিত। একজন বেদুঈন মসজিদে গিয়ে পেশাব করে দিলো। লোকেরা তার দিকে ছুটে গেলো তাকে শায়েস্তা করতে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ওকে কিছু বলোনা। ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদেরকে উদারতা প্রদর্শন করতে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা প্রদর্শন করতে নয়। –মুসলিম ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

পোশাকের পবিত্রতার শর্ত আরোপের প্রবক্তাগণের যুক্তি প্রমাণ পর্যালোচনার পর শওকানী বলেন : যে সকল যুক্তি প্রমাণ তার অন্তর্নিহিত বিষয়গুলোসহ তুলে ধরেছি, তা যখন যথার্থ প্রমাণিত হলো, তখন জেনে নাও যে, এ দ্বারা পোশাক পবিত্র করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কাপড়ে অপবিত্রতা নিয়ে নামায পড়ে সে একটা ওয়াজিব তরক করে। তবে নামাযের বিশুদ্ধতার শর্ত অপূর্ণ থাকলে যেমন নামায বাতিল হয়ে থাকে, পোশাকের অপবিত্রতার জন্য সেভাবে নামায বাতিল হবেনা। রওযা নাদিয়া গ্রন্থে রয়েছে : অধিকাংশ আলেমের মতে, শরীর, পোশাক ও স্থানের পবিত্রতা নামাযের জন্য ওয়াজিব। এক দল একে নামাযের বিশুদ্ধতার শর্ত গণ্য করেন। অন্যরা বলেন, এটা সুন্নত। তবে প্রকৃত সত্য হলো, এটা ওয়াজিব। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নাপাকি নিয়ে নামায পড়লে ওয়াজিব তরক হবে, কিন্তু নামায শুদ্ধ হবে।

৪. ছতর (গোপন অঙ্গসমূহ) ঢাকা

আল্লাহ বলেছেন : يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ .

"হে আদম সন্তানেরা, প্রত্যেক সাজদার জায়গায় (প্রত্যেক নামাযে) তোমাদের বসন ভূষণ নিয়ে যাও।"

বসন ভূষণ দ্বারা এমন পোশাক বুঝানো হয়েছে, যা ছতর ঢাকে। আর সাজদার জায়গা হলো নামায। অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেক নামাযে তোমাদের ছতর ঢেকে নাও। সালামা বিন আকওয়া রা. বলেছেন, আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ সা. আমি কি শুধু জামা পরেই নামায পড়বো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, জামায় বোতাম লাগিয়ে নাও, এমনকি যদি একটা কাঁটা দিয়েও হয় তবুও।" –বুখারি ইত্যাদি।

পুরুষের ছতরের সীমা : নামাযের সময় পুরুষের জন্য যে ছতর ঢাকা ওয়াজিব তা হলো, সামনের ও পেছনের গোপন অঙ্গসমূহ। এ ছাড়া উরু, নাভি ও হাঁটু নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এগুলোও ছতর, কেউ বলেন, ছতর নয়। যারা বলেন এগুলো ছতর নয় তাদের প্রমাণ হলো, উরু, নাভি ও হাঁটু ছতর নয়– এ মতের প্রবক্তাগণ নিম্নোক্ত হাদিসগুলো দ্বারা তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ দেন :

১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তার উরু খুলে বসেছিলেন। এ সময় আবু বকর সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং যেভাবে বসেছিলেন সেভাবেই বসে থাকলেন। এরপর উমর অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকেও অনুমতি দিলেন এবং তখনও আগের মতোই বসে রইলেন। এরপর উসমান অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি উরু ঢেকে নিলেন। এরা তিনজন চলে গেলে আমি বললাম। হে রসূলুল্লাহ! আবু বকর ও উমর অনুমতি

চাইলেন, আপনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন এবং যেমন বসেছিলেন তেমনই রইলেন। এর কারণ কী? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে আয়েশা, যে ব্যক্তির কাছ থেকে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা পায়, আমি কি তার কাছ থেকে লজ্জা না পেয়ে পারি? –আহমদ, বুখারি।

২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. খয়বরের দিন তার উরুর উপর থেকে লুংগি সরিয়ে ফেলেছিলেন। এমনকি আমি তার হাঁটুর সাদা রং পর্যন্ত দেখেছি। –আহমদ, বুখারি। ইবনে হাযম বলেছেন : এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উরু ছতর নয়। যদি ছতর হতো, তাহলে আল্লাহ তাঁর পূত পবিত্র নিষ্পাপ রসূলের উরু নবী হওয়ার পর উন্মোচিত করতেন না এবং আনাস প্রমুখকে দেখতে দিতেন না, অথচ আল্লাহ নবুয়্যতের অনেক আগে শিশুকালে পর্যন্ত তাকে ছতর উন্মোচন থেকে রক্ষা করেছেন। বুখারি ও মুসলিম জাবির রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন তাদের সাথে কা'বা শরীফ মেরামতের জন্য পাথর সরাচ্ছিলেন, তখনও তার পরিধানে লুংগি ছিলো। তার চাচা আব্বাস তাকে বললেন : হে ভাতিজা, তুমি লুংগিটা খুলে ঘাড়ের উপর রেখে তার উপর পাথর রেখে বহন করোনা কেন'। তখন তিনি লুংগি খুলে ঘাড়ে রাখা মাত্রই বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর থেকে তাঁকে কখনো উলংগ দেখা যায়নি।

৩. বারা থেকে বর্ণিত : আব্দুল্লাহ আমার উরুতে হাত দিয়ে থাপড়ালেন এবং বললেন : আমি আবু যরকে জিজ্ঞাস করেছিলাম। তিনি আমার উরুতে থাপড়ালেন যেমন আমি তোমার উরুতে থাপড়ালাম। তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো। তখন তিনি আমার উরুতে থাপড়ালেন যেমন আমি তোমার উরুতে থাপড়িয়েছি আর বললেন : যথা সময়ে নামায পড়ো।

ইবনে হাযম বলেছেন : উরু যদি ছতর হতো তাহলে রসূলুল্লাহ সা. আবু যরের উরু নিজের পবিত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করতেননা। আর আবু যরের নিকট যদি উরু ছতর হতো, তাহলে হাত দিয়ে তা স্পর্শ করতেন না। আব্দুল্লাহ এবং বারার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। আর কাপড়ের উপর দিয়ে হলেও কোনো মানুষের যৌনাঙ্গে, নিতম্বে এবং কোনো কোনো নারীর শরীরে হাত রাখা কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয় কোনো অবস্থাতেই।

৪. পুনরায় ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন যে, আবু বকরের উন্মুক্ত উরুর দিকে জুবায়ের ইবনে হুয়াইরেস তাকিয়েছিলেন এবং উরু অনাবৃত থাকা অবস্থায় কাস্সা বিন শাম্মাসের কাছে আনাস এসেছিলেন।

যারা উরুকে ছতর মনে করেন তাদের প্রমাণ :

১. মুহাম্মদ বিন জাহাশ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. মুয়াম্মারের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মুয়াম্মারের উরু তখন অনাবৃত ছিলো। তখন তিনি বললেন : হে মুয়াম্মার, তোমার উরু ঢাক। কারণ উরু ছতর। –আহমদ, হাকেম, বুখারি।

২. জারহাদ বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমার গায়ে চাঁদর ছিলো। কিন্তু আমার উরু ছিলো অনাবৃত। তিনি বললেন : তোমার উরু ঢেকে দাও। কারণ উরু গোপন অঙ্গ। –মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি। বুখারি তাঁর ইতিহাসে এটি উল্লেখ করেছেন।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি তুলে ধরা হলো। প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার রয়েছে এই দুই মতের যে কোনো একটি গ্রহণ করার। অবশ্য নাসায়ীর পক্ষে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত যতদূর সম্ভব আবৃত রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে অধিকতর সতর্কতামূলক। বুখারি বলেছেন : আনাসের হাদিস অধিকতর প্রমাণ্য। আর জারহাদের হাদিস অধিকতর সতর্কতামূলক।

নারীর ছতরের সীমা : নারীর সমস্ত শরীর ছতর। মুখমণ্ডল ও হাত ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখা তার উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "মহিলারা যেনো তাদের শরীরের স্বত: প্রকাশিত অংশ ব্যতিত কোনো সাজসজ্জা প্রকাশ না করে।" অর্থাৎ তারা যেনো মুখমণ্ডল ও হাত ব্যতিত আর কোনো শোভামণ্ডিত অংগ প্রদর্শন না করে। ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও আয়েশা থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদিসে একথা জানা গেছে। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা কোনো যৌবনপ্রাপ্তা মেয়ের মাথা ঢাকা ব্যতিত নামায কবুল করেন না। –নাসায়ী ব্যতিত সব ক'টা সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ। আর উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত : তিনি রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন : ঘাঘরা (পেটিকোট জাতীয়) ব্যতিত একটা জামা ও ওড়না পরে কি মহিলা নামায পড়তে পারবে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "জামাটা যখন এতো লম্বা হবে যে, পায়ের পিঠ ঢেকে দেয়, তখন পারবে।"- আবু দাউদ। আর আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কয়টা কাপড় পরে মহিলারা নামায পড়বে? আয়েশা (রা) প্রশ্নকর্তাকে বললেন, আলীকে জিজ্ঞাসা করো। অতপর আমার কাছে ফিরে এসো এবং আমাকে জানাও। তারপর তিনি আলীর কাছে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আলী জবাব দিলেন : মাথার ওড়না ও লম্বা জামা। এরপর লোকটি আয়েশার নিকট ফিরে গিয়ে তাকে জানালো। আয়েশা বললেন : আলী সঠিক বলেছে।

নামাযের জন্য কতোটুকু পোশাক ওয়াজিব এবং কতোটুকু মুস্তাহাব : যতোটুকু কাপড় ছতর ঢাকে, ততোটুকুই ওয়াজিব, যদিও তা এতো সংকীর্ণ ও চাপা হয় যে, ছতরের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়। তবে পোশাক যদি এততো পাতলা হয় যে, চামড়ার রং প্রকাশ করে এবং তা সাদা না লাল জানা যায় তাহলে সে পোশাক পরে নামায বৈধ হবেনা। এক কাপড়ের নামায বৈধ। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি জবাব দিলেন : তোমাদের সবার কি দুটো করে কাপড় রয়েছে? –মুসলিম, মালেক ইত্যাদি।

দুটো বা তার বেশি কাপড় ব্যবহার করা এবং সাজসজ্জা করা মুস্তাহাব। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন সে যেনো দুটো কাপড় পরে। কেননা অন্যদের চেয়ে আল্লাহর জন্য সাজসজ্জা করা অধিকতর অগ্রগণ্য। আর যদি তার দুটো কাপড় না থাকে, তাহলে নামাযের সময় লুংগি পরে নেবে। আর তোমাদের কেউ যেনো নামাযে ইহুদীদের মতো কাপড় ঘুরিয়ে সমস্ত শরীর পেচিয়ে না নেয়। -তাবারানি, বায়হাকি।

আর আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, উবাই বিন কা'ব ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ পরস্পরের বিরোধী মত প্রকাশ করলেন। উবাই বললেন, এক কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ নয়। ইবনে মাসউদ বলেন, যখন কাপড়ের অভাব ছিলো তখনই এক কাপড়ের নামায পড়া যেতো। তৎক্ষণাত উমর রা. মিম্বরে আরোহন করলেন এবং বললেন : উবাই যা বলেছে, ওটাই সঠিক কথা। তবে ইবনে মাসউদও ভুল বলেনি। আল্লাহ্ যখন প্রশস্ততা দেন, তখন তোমরাও প্রশস্ততা আনয়ন করো। এক ব্যক্তি তার অনেক কাপড় যোগাড় করলো। কেউবা একটা লুংগি ও চাদর পরেই নামায পড়লো। কেউবা শুধু লুংগি ও জামা পরে, কেউবা লুংগি ও লম্বা জামা পরে, কেউবা পাজামা ও চাদর পরে, কেউবা পাজামা ও জামা পরে, কেউবা পাজামা ও লম্বা জামা পরে, কেউবা চামড়ার তৈরি পা বিহীন পাজামা ও লম্বা জামা পরে, কেউবা চামড়ার তৈরি পা বিহীন পাজামা ও জামা পরে নামায পড়লেন। এসবই আমি যথেষ্ট মনে করি। আবার বললেন, চামড়ার তৈরি পা বিহীন পাজামা ও চাদর পরেও নামায পড়তে পারে। বুখারিতে এর উল্লেখ

রয়েছে কারণের উল্লেখ ছাড়াই। বুরাইদা বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কোমরবন্দবিহীন একটিমাত্র মুড়ি দেয়ার কাপড় পরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। চাদর ছাড়া পাজামা পরেও নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। –আবু দাউদ, বায়হাকি। আর আলীর পুত্র হাসান থেকে বর্ণিত : তিনি যখন নামায পড়তে চাইতেন, তখন তার সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরতেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন : 'আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। আমি আমার প্রতিপালকের জন্য সুন্দর পোশাক পরছি। আল্লাহ বলেছেন : তোমরা প্রত্যেক নামাযে তোমাদের সুন্দর পোশাক পরিধান করো।'

নামাযে মাথা খোলা

ইবেনে আসাকির ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : কখনো কখনো রসূলুল্লাহ সা. তাঁর 'কুলনসুয়া' (মাথা ঢেকে রাখার টুপি জাতীয় জিনিস) খুলে তা তাঁর নামাযের সামনে আঁড়াল হিসেবে রেখে দিতেন। হানাফীদের মতে খালি মাথায় নামায পড়ায় দোষের কিছু নেই। তবে এটা যদি কেউ নামাযে একাগ্রতার জন্য পরে তবে পছন্দনীয়। কিন্তু নামাযে মাথা ঢাকা উত্তম– এ মর্মে কোনো প্রমাণ নেই।

৫. কিবলামুখি হওয়া

এটা আলেমদের সর্বসম্মত মত যে, নামাযে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করা ফরয। আল্লাহ বলেছেন : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .

"অতএব তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাকো, সেদিকেই মুখ ফেরাবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৪)। বারা রা. থেকে বর্ণিত : আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে ষোল মাস বা সতেরো মাস বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছি। তারপর আমাদেরকে কা'বার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। – সহীহ মুসলিম

কা'বা শরিফের প্রত্যক্ষদর্শী ও অপ্রত্যক্ষদর্শীর বিধান : যে ব্যক্তি কা'বা শরিফের প্রত্যক্ষদর্শী, তার জন্য সরাসরি কা'বা ঘরের মুখোমুখি হওয়া ফরয। আর যে ব্যক্তি কা'বা শরিফকে সচোক্ষে দেখার মতো অবস্থানে নেই, তার জন্য কা'বার দিক বা অভিমুখে মুখ করা ফরয। কেননা তার পক্ষে এর চেয়ে বেশি সম্ভব নয়। আল্লাহ মানুষকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনো কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করেননা। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা রয়েছে। –ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। তিরমিযি বলেছেন, হাদিসটি হাসান সহীহ। এ কথাটা মদিনা, সিরিয়া, আরব উপদ্বীপ ও ইরাকের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু মিশরবাসীর জন্য কিবলা হচ্ছে পূর্ব ও দক্ষিণের মাঝখানে। ইয়ামানে পূর্ব নামাযীর ডান দিকে এবং পশ্চিম বাম দিকে। আর ভারত উপমহাদেশে পূর্ব থাকে পেছনে ও পশ্চিম সামনে।

কিবলা চেনার উপায় : প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য কিবলা চেনার স্বতন্ত্র নিদর্শন থাকে। মুসলমানরা মসজিদগুলোতে যে মেহরাব নির্মাণ করে, তা একটি অন্যতম নিদর্শন। অনুরূপ কম্পাস দ্বারাও কিবলা চেনা যায়।

কিবলা চিনতে অক্ষম হলে করনীয় : কেউ মেঘ কিংবা অন্ধকার ইত্যাদির কারণে কিবলা চিনতে অক্ষম হলে স্থানীয় কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে কিবলার সন্ধান করবে। তেমন কাউকে না পেলে চিন্তা ভাবনা করবে। চিন্তাভাবনার ফলে যে দিকটি কিবলার দিক বলে মনে হবে সেদিকে নামায পড়বে। এই নামায শুদ্ধ হবে। কখনো এ নামায দুহরাতে হবেনা। এমনকি নামায শেষে যদি জানতে পেরে যে দিকটি ভুল ছিলো তবুও নয়। নামাযের ভেতরে জানতে পারলে নামায না ভেংগেই ঘুরে দাঁড়াবে।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, কুবাতে যখন লোকেরা ফজরের নামায পড়ছিল, তখন জনৈক দূত এসে ঘোষনা করলেন, আজ রাতে রসূলুল্লাহ সা. এর উপর কুরআনের একটা অংশ নাযিল হয়েছে। এই অংশে আদেশ দেয়া হয়েছে কাবার দিকে মুখ করার জন্য। কাজেই তোমরা কাবার দিকে মুখ করো। নামাযীরা সিরিয়ার (বাইতুল মাকদাস) দিকে মুখ করে নামায পড়ছিল। তারা তৎক্ষণাত কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। -বুখারি ও মুসলিম।

কেউ যখন চিন্তা ভাবনার ভিত্তিতে একটি দিকে মুখ করে নামায পড়ে, তাকে অন্য নামাযের সময় পুনরায় চিন্তাভাবনা করতে হবে। এবারের চিন্তাভাবনার ফল যদি অন্য রকম হয়, তবে দ্বিতীয় চিন্তাভাবনা অনুযায়ীই নামায পড়বে। তবে প্রথমবারে যে নামায পড়েছে, তা দুহরাতে হবেনা।

কখন কিবলামুখি হওয়ার প্রয়োজন থাকবেনা : কিবলামুখি হওয়া ফরয। নিম্নোক্ত কয়েকটি অবস্থা ব্যতিত এ ফরয রহিত হয়না :

১. বাহনে আরোহনকারীর জন্য বাহনে নফল নামায পড়া বৈধ। সে রুকু ও সাজদা ইশারায় করবে। রুকুর চেয়ে একটু বেশি নিচু হয়ে সাজদা করবে। তার কিবলা সেদিকেই হবে যেদিকে বাহন যাবে।

আমের ইবনে রবিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. কে তাঁর বাহক জন্তুর পিঠে নামায পড়তে দেখেছি, জন্তু যেদিকে যাচ্ছিল তিনি সেদিকে মুখ করেই নামায পড়ছিলেন। -বুখারি, মুসলিম। বুখারির সংযোজন : তিনি মাথা দিয়ে ইংগিত করে পড়ছিলেন। ফরয নামাযে এ রকম ইংগিত করতেন না। আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযির বর্ণনায় রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে তাঁর বাহক উটের পিঠের উপর নামায পড়ছিলেন, যেদিকে সে যাচ্ছিল সেদিকেই মুখ করছিলেন। এ ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে : "তোমরা যেদিকেই মুখ করো, সেখানে আল্লাহ রয়েছেন।" ইবরাহিম নাখয়ী বলেছেন : সাহাবিগণ তাদের জন্তুর পিঠে জন্তু যেদিকে যেতো সেদিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। ইবনে হাযম বলেন : সাহাবি ও তাবেয়ীগণ স্বদেশে বা প্রবাসে সাধারণভাবে এভাবেই নামায পড়তেন।

২. বিপদের আশংকাকারী, রুগী ও স্বাধীনভাবে কিছু করতে অক্ষম ব্যক্তি যখন কিবলামুখি হতে অসমর্থ হয়, তখন যেদিকে সম্ভব সেদিকেই নামায পড়বে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমাদেরকে কোনো আদেশ দেই, তখন যতোটা সম্ভব হয় তা পালন করো। আল্লাহ বলেছেন : তোমরা যদি ভীতিকর অবস্থায় থাকো, তাহলে হেটে চলা অবস্থায় ও আরোহী অবস্থায়- যেভাবেই পারো নামায পড়ো। ইবনে উমর রা. এর ব্যাখ্যায় বলেন : অর্থাৎ কিবলামুখি হয়ে বা না হয়ে। -বুখারি

৯. নামাযের নিয়ম

নামায পড়ার নিয়ম পদ্ধতির বিবরণ সম্বলিত বেশ কিছু সংখ্যক হাদিস রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা দুটো হাদিস উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত থাকছি। প্রথমটি রসূলুল্লাহ সা. এর কাজ আর দ্বিতীয়টি তাঁর কথা সম্বলিত :

১. আব্দুল্লাহ ইবনে গানাম থেকে বর্ণিত : "আবু মালেক আশয়ারী তাঁর গোত্রের লোকদেরকে সমবেত করে বললেন : হে আশয়ারী গোত্র তোমরা জমায়েত হও, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকেও জমায়েত করো। রসূলুল্লাহ সা. মদিনায় আমাদেরকে যেভাবে নামায পড়াতেন, তা তোমাদেরকে শেখাবো। তাঁর কথামত সবাই জমায়েত হলো, তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকেও

জমায়েত করলো। তারপর আবু মালেক আশয়ারী অযু করলেন এবং তাদেরকে দেখালেন কিভাবে অযু করতে হয়। অযুর নির্ধারিত সবকটা অংগ ধৌত করলেন। তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়লো ও ছায়া বিস্তৃত হলো তখন তিনি দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। তারপর পুরুষদেরকে সামনের কাতারে তাদের পেছনে বালকদেরকে ও বালকদের পেছনে মহিলাদেরকে কাতারবন্দি করলেন। তারপর নামাযের ইকামত দিলেন। তারপর সামনে এগিয়ে গেলেন। (ইমাম হলেন) তারপর নিজের দু'হাত তুললেন। আল্লাহু আকবার বললেন। সূরা ফাতেহা পড়লেন এবং সহজ মতো একটা সূরা পড়লেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে গেলেন এবং তিনবার সুবহান্নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বললেন। তারপর সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় উপুড় হলেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে মাথা তুললেন। আবার আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় গেলেন। আবার আল্লাহু আকবার বলে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এভাবে প্রথম রাকাতে তার ছয়টা তাকবীর অর্থাৎ ছয়বার আল্লাহু আকবার বলা হলো। দ্বিতীয় রাকাতে যখন উঠলেন তখন আল্লাহু আকবার বললেন। যখন নামায শেষ করলেন, তখন তার গোত্রের লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন : আমার এই তাকবীর মনে রাখো এবং আমার রুকু ও সাজদা শিখে নাও। কেননা এ হচ্ছে রসূলুল্লাহ সা. এর নামায। এভাবেই তিনি আমাদের নামায পড়াতেন। একদিন এভাবে যখন রসূলুল্লাহ সা. নামায শেষ করলেন তখন জনতার দিকে মুখ ফেরালেন এবং বললেন : হে জনতা! শোন এবং বুঝে নাও, আর জেনে নাও, আল্লাহর কিছু বান্দা এমন রয়েছে, যারা নবীও নয়, শহীদও নয়। অথচ আল্লাহর সাথে তদের ঘনিষ্ঠ অবস্থান ও নৈকট্য দেখে নবীগণ ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের মতো ঘনিষ্ঠ অবস্থান ও নৈকট্য নিজেদের জন্য কামনা করবেন। সহসা সমবেত জনতার শেষ প্রান্ত থেকে জনৈক বেদুঈন এগিয়ে এলো এবং আল্লাহর নবীর প্রতি তার হাত দুলিয়ে বললো : হে আল্লাহর নবী, মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ মানুষ, যারা নবীও নয়, শহীদও নয় অথচ নবীগণ ও শহীদগণ আল্লাহর সাথে তাদের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠ অবস্থান দেখে নিজেদের জন্য অনুরূপ নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠ অবস্থান কামনা করবে, এদের কিছু নিদর্শন আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তারা হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই একদল মানুষ এবং গোত্রসমূহের মধ্যে থেকে একদল আগন্তুক। তাদেরকে কোনো ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তার বন্ধন আবদ্ধ করেনি। তারা কেবল আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবেসেছে এবং পরস্পর কাতারবন্দি হয়েছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের জন্য জ্যোতির্ময় মিম্বরসমূহ স্থাপন করবেন এবং তার উপর তাদেরকে বসাবেন। তারপর তাদের মুখমণ্ডলকে জ্যোতির্ময় করবেন এবং তাদের পোশাককে জ্যোতির্ময় করবেন। কেয়ামতের দিন যখন অন্যসব মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হবে, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হবেনা। তারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। –আহমদ, আবু ইয়ালা হাসান সনদে। হাকেম বলেছেন - এ হাদিসের নসদ সহীহ।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো ও নামায পড়লো। তারপর রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে সালাম করলো। তিনি তাকে সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন : ফিরে যাও এবং নামায পড়ো, তুমি নামায পড়নি। সে ফিরে গেলো এবং তিনবার অনুরূপ করলো। তারপর সে বললো : আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন আমি এর চেয়ে ভালো নামায পড়তে পারিনা। আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন : যখন নামাযে দাঁড়াও, তখন তাকবীর বলো। তারপর কুরআন থেকে যেটুকু পার পড়ো। তারপর রুকুতে যাও এবং শান্ত হয়ে রুকুতে থাকো। তারপর ওঠো এবং সোজা হয়ে

দাঁড়াও। তারপর সাজদা করো যতোক্ষণ না শান্ত হয়ে সিজদায় থাকো। তারপর ওঠো এবং শান্ত হয়ে বসো। তারপর সাজদা দাও এবং শান্ত হয়ে সিজদায় থাকো। এভাবে তোমার পুরো নামাযে করো। -আহমদ, বুখারি ও মুসলিম।

রসূলুল্লাহ্ সা.-এর কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে নামায আদায়ের যে নিয়ম পাওয়া গেছে এ হচ্ছে তার মোটামুটি বিবরণ। আমরা ফরয ও সুন্নতের পার্থক্য সহকারে এগুলো সম্পন্ন করে থাকি।

১০. নামাযের ফরযসমূহ

নামাযের কতকগুলো ফরয ও রুকন রয়েছে, যা দ্বারা নামায গঠিত। এর কোনো একটি ফরযও বাদ পড়লে শরিয়তের দৃষ্টিতে নামায গ্রহণযোগ্য হয়না। ফরযের বিবরণ নিম্নে দেয়া যাচ্ছে :

১. নিয়ত

(কেউ কেউ একে রুকন নয়, শর্ত মনে করেন) কেননা আল্লাহ্ বলেছেন : "তাদেরকে আল্লাহর ইবাদত করতে বলা হয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নিষ্ঠা ও আনুগত্যকে নির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্য।" (সূরা বাইয়েনা : আয়াত ৫)

আর রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কাজগুলো কেবল নিয়ত দ্বারা নির্ণিত হয়। প্রত্যেক মানুষ যা নিয়ত করে, তাই পায়। যার হিজরত আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের জন্য হবে। তার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের জন্যই (গণ্য) হবে। আর যার হিজরত দুনিয়ার কোনো স্বার্থ লাভ কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্য হবে, তার হিজরত যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে সেই উদ্দেশ্যেই (গণ্য) হবে। বুখারি। অর্থাৎ : তার হিজরত হবে নিকৃষ্ট ধরনের হিজরত। ইতিপূর্বে অযুর বিবরণে এর নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

মুখে নিয়ত বলা : ইবনুল কাইয়েম তার 'ইগাছাতুল লাহফান' নামক গ্রন্থে বলেছেন : নিয়ত হলো কোনো কাজের ইচ্ছা ও সংকল্প করা। এর স্থান হলো মন। জিহ্বার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এজন্যই রসূলুল্লাহ সা. কিংবা সাহাবিদের পক্ষ থেকে আদৌ কোনো মৌখিক নিয়ত বর্ণিত হয়নি। আজকাল যে সকল মৌখিক নিয়ত অযু গোসল ও নামাযের শুরুতে বলার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে, তা কু-প্ররোচনাধারিদের জন্য, শয়তানের বানানো যুদ্ধের ময়দান বিশেষ। এর ভেতরে সে তাদেরকে আটকে রাখে, নির্যাতন করে এবং এগুলোর সংশোধনে তাদেরকে নিয়োজিত রাখে। তাই তাদের এক একজনকে দেখবে বারবার উচ্চারণ করছে এবং এগুলোর উচ্চারণে কঠোর সাধনা করছে। অথচ নামাযের সাথে এগুলোর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

২. তাকবিরে তাহরিমা

আলী রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : নামাযের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা, আর যাবতীয় হালাল কাজকে নামাযে হারাম করে তাকবীর, আর সালাম সব কাজ হালাল করে দেয়। -শাফেয়ী, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। তিরমিযি বলেছেন, এই প্রসঙ্গে এটাই সবচেয়ে সহীহ হাদিস। তাছাড়া ইতিপূর্বে উদ্ধৃত দুটি হাদিসে রসূল সা. এর কথা ও কাজ থেকে প্রমাণিত ইহরাম বা তাহরীমের তাকবীরের জন্য আল্লাহু আকবার কথাটাই নির্ধারিত হয়ে গেছে। কেননা ইবনে মাজায় আবু হোমায়েদ থেকে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ সা. যখনই নামায পড়তে যেতেন, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহু আকবার বলতেন।

৩. কিয়াম (দাঁড়ানো)

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে যার দাঁড়ানোর সামর্থ আছে, তার জন্য ফরয নামাযে দাঁড়ানো ফরয। আল্লাহ বলেন : "তোমরা সকল নামাযকে সংরক্ষণ করো, (বিশেষত) মধ্যবর্তী নামাযকে সংরক্ষণ করো। আর আল্লাহর সামনে (বিনীতভাবে দাঁড়াও)।"

ইমরান বিন হোসাইন রা. থেকে বর্ণিত, "তিনি বলেন : আমার অর্শ রোগ ছিলো। তাই আমি রসূলুল্লাহ সা. কে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। তা না পারলে বসে পড়ো, তা না পারলে শুয়ে পড়ো।"–বুখারি। এই মতের উপর সকল আলেম একমত। তাঁরা এ ব্যাপারেও একমত যে, দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা রাখা উত্তম।

নফল নামাযে কিয়াম : নফল নামাযে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে নামায পড়া বৈধ। তবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াব বসে নামায পড়ার চেয়ে বেশি। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বসে যে নামায পড়া হয় তা অর্ধেক নামায।" -বুখারি, মুসলিম।

ফরয নামাযে দাঁড়াতে অক্ষম হলে : যে ব্যক্তি ফরয নামাযে দাঁড়াতে অক্ষম, সে যেভাবে পারে সেভাবে পড়বে। কেননা আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করেননা। এতে সে পূর্ণ সওয়াব পাবে, কিছুই কম হবেনা। আবু মূসা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কোনো বান্দা রোগাক্রান্ত হয়, কিংবা মুসাফির হয়, তখন সুস্থ থাকা অবস্থায় ও নিজ বাসস্থানে থাকা অবস্থায় কাজ করলে যে সওয়াব পেতো, সেই সওয়াবই পাবে। –বুখারি।

৪ নফল ও ফরযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ

প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া বহু সংখ্যক সহীহ হাদিস দ্বারা ফরয প্রমাণিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো দ্ব্যর্থহীন ও সহীহ হওয়ায় এ বিষয়ে মতভেদের কোনো সুযোগ নেই। আমরা সেই হাদিসগুলো নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনা, তার নামায হয়না। -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নামায পড়লো, অথচ নামাযে উম্মুল কিতাব (অর্থাৎ কুরআনের মা বা সূরা ফাতিহা) পড়লোনা, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সূরা ফাতিহা পড়লোনা, তার সে নামায অসম্পূর্ণ, বাতিল। -আহমদ বুখারি, মুসলিম।

৩. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া হয়না, সে নামায যথেষ্ট নয়। -ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান, আবু হাতেম।

৪. দারু কুতনী বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন : সূরা ফাতিহা ছাড়া যে ব্যক্তি নামায পড়ে তার নামায তার জন্য যথেষ্ট নয়।

৫. আবু সাঈদ বলেন : আমরা সূরা ফাতিহা ও অন্য যেটুকু পড়তে পারি তা সহকারে নামায পড়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। -আবু দাউদ।

৬. যে ব্যক্তি ভ্রান্তভাবে নামায পড়েছিল, তার সংক্রান্ত হাদিসটি একটি ভিন্ন সূত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে রয়েছে : তার পর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়ো। সর্বশেষে রসূল সা. বলেছেন : তারপর প্রত্যেক রাকাতে এভাবে করো।

৭. বাস্তব ঘটনা হিসেবে প্রমাণিত, রসূলুল্লাহ সা. নফল ও ফরয নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তেন। এর বিপরীত কিছু প্রমাণিত হয়নি। ইবাদতে সব কাজই বিনা বাক্যব্যয়ে অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায পড়ো।" –বুখারি।

সূরা ফাতিহার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা : 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরা আন নামলের

একটি আয়াতের অংশ। কিন্তু সূরাগুলোর শুরুতে যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' রয়েছে, সে সম্পর্কে তিন রকমের মত রয়েছে :

প্রথম মত : এটি সূরা ফাতিহাও প্রত্যেক সূরার একটি আয়াত। সুতরাং ফাতিহাতে এটি পড়া ওয়াজিব। যে নামাযে সূরা ফাতিহা নি:শব্দে পড়তে হয় সে নামাযে বিসমিল্লাহ নি:শব্দে আর যে নামাযে সূরা ফাতিহা সশব্দে পড়তে হয় সে নামাযে বিসমিল্লাহ সশব্দে পড়তে হবে। এই মতের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ নুয়াইম মুজাম্মারের হাদিস। তিনি বলেন : আমি আবু হুরায়রার পেছনে নামায পড়েছি। তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়লেন, তারপর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়লেন। ...শেষে বললেন : আল্লাহর কসম, আমি রসূলুল্লাহ সা. এর নামাযের সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণভাবে নামায পড়িয়েছি। - নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতলুল বারীতে বলেছেন : সশব্দে পড়া ও বিসমিল্লাহ ... পড়া সম্পর্কে এটি সবচেয়ে সহীহ হাদিস।

দ্বিতীয় মত : 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' একটা স্বতন্ত্র আয়াত, যা বরকতের জন্য ও সূরাগুলোর মাঝে পার্থক্য করার সুবিধার্থে নাযিল হয়েছে। সূরা ফাতিহায় এটি পড়া শুধু ঠিক নয়, বরং মুস্তাহাব। এটি সশব্দে পড়া সুন্নত নয়। কেননা আনাস রা. বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর পেছনে এবং আবু বকর, উমর ও উসমানের পেছনে নামায পড়েছি। তারা কেউ সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন না। -নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, ত্বহাবী।

তৃতীয় মত : এটি সূরা ফাতিহারও আয়াত নয়, অন্য কোনো সূরারও নয়। নফল ব্যতিত ফরয নামাযে সশব্দে বা নি:শব্দে এটি পড়া মাকরূহ। এ মতটি তেমন শক্তিশালী নয়।

ইবনুল কাইয়িম প্রথম ও দ্বিতীয় মতের সমন্বয় ঘটিয়েছেন এই বলে : রসূল সা. কখনো কখনো সশব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন, তবে তার চেয়ে বেশি নি:শব্দে পড়তেন। এ কথা সুনিশ্চিত যে, তিনি প্রতিদিন দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সব সময় সফরে ও বাড়িতে সশব্দে পড়তেন না। তাঁর পরে খলিফাগণ, অধিকাংশ সাহাবি ও শহরবাসীও নি:শব্দে পড়তেন।

যে ব্যক্তি ফরয কিরাত শুদ্ধভাবে পড়তে পারেনা : খাত্তাবী বলেছেন : মূলনীতি হলো, সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায শুদ্ধ হয়না। আবার এ কথাও যুক্তিযুক্ত, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা শুদ্ধভাবে পড়তে পারে তার উপরই এটা পড়া জরুরি। যে তা পারেনা তার উপর নয়। কোনো নামাযী যদি সূরা ফাতিহা শুদ্ধভাবে পড়তে না পারে। কিন্তু কুরআনের অন্য কোনো জায়গা থেকে পড়তে পারে, তার কর্তব্য, সেই জায়গা থেকে সাত আয়াত পরিমাণ পড়া। কেননা সূরা ফাতিহার পর সর্বোত্তম পাঠ্য জিনিস হলো সূরা ফাতিহার সমপরিমাণ কুরআনের অংশ। আর যদি কুরআনের কোনো অংশই সে শিখতে সক্ষম না হয়, চাই তা তার জন্মগত অক্ষমতার কারণে হোক স্মৃতি শক্তির অপ্রতুলতার কারণে হোক অথবা তার উচ্চারণের অসুবিধার কারণে হোক, কিংবা কোনো বিকলাঙ্গতা বা প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার কারণে হোক– তাহলে তার জন্য কুরআনের পর সবচেয়ে উত্তম পাঠ্য জিনিস হলো রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক শেখানো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : আল্লাহর বাণীর পর সর্বোত্তম যিকর হলো, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহ আকবার। রিফায়া বিন রাফে কর্তৃক বর্ণিত হাদিস খাত্তাবীর বক্তব্য সমর্থন করে : "রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে নামায শেখালেন। তারপর বললেন : তোমার যদি কুরআনের কোনো অংশ মুখস্থ থাকে, তবে সেটুকু পড়ো, নচেত আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো। -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী বায়হাকি।

৫. রুকু করা

রুকুর ফরয হওয়া সর্বসম্মত। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا .....

"হে মুমিনগণ, রুকু করো, সাজদা করো.....।" (সূরা আল-হজ্জ : আয়াত ৭৭)

রুকুর নিয়ম : শরীর বাঁকা করে দু'হাত হাটুর উপর রাখলেই রুকু হয়না, রুকুতে গিয়ে কিছুক্ষণ শান্ত হয়ে অবস্থান করা জরুরি। কেননা ইতিপূর্বে এক হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন "তারপর রুকু দাও এবং শান্তভাবে রুকুতে অবস্থান করো।" আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নামায চুরি করে সে সবচেয়ে বড় চোর। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, কোনো ব্যক্তি কিভাবে নামায চুরি করে, তিনি বললেন : রুকুও সম্পূর্ণ করেনা, সাজদাও সম্পূর্ণ করেনা।' অন্য বর্ণনায় : রুকু ও সাজদার সময় পিঠ সোজা করেনা। -আহমদ, তাবারানি, ইবনে খুয়াযমা, হাকেম। আর আবু মূসা বদরী বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যে নামাযে রুকু ও সাজদায় পিঠ সোজা করেনা, তার নামায শুদ্ধ হয়না। -পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ, ইবনে খুয়াযমা, ইবনে হাব্বান, তাবারানি, বায়হাকি। তিরমিযি বলেছেন : হাদিসটি উত্তম, সহীহ। এবং রসূল সা. এর সাহাবিগণ ও পরবর্তী আলেমগণ এ হাদিসই অনুসরণ করে থাকেন। তারা মনে করেন : রুকু ও সাজদায় ও রুকু সাজদার মাঝখানে পিঠ সোজা করতেই হবে।

হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত : তিনি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন পূর্ণাঙ্গভাবে রুকু ও সাজদা করছেনা। হুযায়ফা তাকে বললেন : তুমি নামায পড়নি। এ অবস্থায় যদি মারা যাও তবে মুহাম্মদ সা. কে আল্লাহ যে দীন দিয়েছেন তুমি তা থেকে বিচ্যুত অবস্থায় মারা যাবে। -বুখারি।

৬. রুকু থেকে ওঠা, সোজা স্থির হয়ে শান্তভাবে দাঁড়ানো

রসূলুল্লাহ সা. এর নামাযের পদ্ধতির বর্ণনা দিতে গিয়ে আবু হুমাইদ বলেন : "যখন তিনি মাথা তুললেন, এমন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন যে, পিঠের সমস্ত হাড় নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো।" –বুখারি, মুসলিম। আর আয়েশা রা. বলেন : "তিনি যখন রুকু থেকে উঠতেন, তখন সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদায় যেতেননা।" -মুসলিম। রসূল সা. আরো বলেছেন : "তারপর মাথা ওঠাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও।" –বুখারি, মুসলিম। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : যে ব্যক্তি তার রুকু ও সাজদার মাঝে পিঠ টান করে দাঁড়ায়না, আল্লাহ তার নামাযের দিকে তাকাননা।" -আহমদ।

৭. সাজদা করা

কুরআন থেকে সাজদার অপরিহার্যতা প্রমাণকারী আয়াত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "অতপর সাজদায় যাও এবং শান্তভাবে সাজদায় থাকো। তারপর ওঠে বসো এবং শান্তভাবে বসে থাকো। তারপর আবার সাজদায় যাও এবং সাজদায় স্থির হয়ে থাকো।" সুতরাং প্রথম সাজদা, প্রথম সাজদা থেকে ওঠা, পুনরায় দ্বিতীয় সাজদায় যাওয়া এবং স্থির ও শান্তভাবে এসব কিছু করা ফরয ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে ফরয।

স্থির ও শান্তভাবে অবস্থানের সময় সীমা : শান্তভাবে অবস্থান দ্বারা বুঝায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থিতিশীল হওয়ার পর কিছুক্ষণ অবস্থান করা। আলেমগণ এর সর্বনিম্ন পরিমাণ স্থির করেছেন একবার সুবহানাল্লাহ বলার সমান।

সাজদার অংগসমূহ : সাজদার অংগগুলো হচ্ছে মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা। আব্বাস

রা. থেকে বর্ণিত : তিনি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছেন : বান্দা যখন সাজদা করে, তখন তার সাথে সাতটা অংগ সাজদা করে। তার মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা। - বুখারি ব্যতিত সব কটা সহীহ হাদিস গ্রন্থ। ইবনে আব্বাস বলেন : রসূলুল্লাহ সা. কে সাতটি অংগের উপর সাজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং নামাযের সাজদায় যাওয়ার সময় চুল ও কাপড় ওঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। অংগ সাতটি হলো : কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা। রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন : সাতটি হাড়ের উপর সাজদা করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে : কপাল-হাত দিয়ে ইংগিত করে নাক দেখান -দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা। -বুখারি ও মুসলিম। অন্য বর্ণনায় : আমাকে সাতটি অংগের উপর সাজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সাজদায় যাওয়ার সময় কাপড় বা চুল ওঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সাতটি অংগ হলো : কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা। -মুসলিম, নাসায়ী। আবু হুমাইদ থেকে বর্ণিত : রসূল সা. যখন সাজদায় যেতেন তখন তার নাক ও কপালকে মাটির সাথে ঠেকাতেন। -আবু দাউদ, তিরমিযি। তিরমিযি বলেন : আলেমদের অনুসৃত নীতি হলো, কপাল ও নাকের উপর সাজদা করা। শুধু কপাল মাটিতে ঠেকালে ও নাক না ঠেকালে একদল আলেম বলেন নামায হবে, আরেক দল বলেন নামায হবেনা যতক্ষণ কপাল ও নাক উভয়টিই মাটিতে না ঠেকানো হয়।

৮. শেষ বৈঠক এবং তাতে তাশাহহুদ পাঠ

এটা সুপ্রমাণিত, রসূলুল্লাহ সা. নামাযে শেষ বৈঠক করতেন এবং তাতে তাশাহহুদ পড়তেন। তিনি ভুলভাবে নামায পড়া এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন : যখন তুমি শেষ সাজদা থেকে ওঠবে এবং তাশাহহুদ পরিমাণ বসবে, তখন তোমার নামায শেষ হয়ে যাবে। ইবনে কুদামা বলেছেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন : আমাদের উপর তাশাহহুদ ফরয হবার আগে আমরা বলতাম : "আসসালামু আলাল্লাহি কাবলা ইবাদিহী, আসসালামু আলা জিবরীল, আসসালামু আলা মিকাইল"। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আসসালামু আলাল্লাহ না বলে বলো : আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি .... " এ থেকে প্রমাণিত হলো, আত্তাহিয়াতু পড়া আগে ফরয ছিলনা, পরে ফরয হয়েছে।

তাশাহহুদের বিশুদ্ধতম ভাষ্য : তাশাহহুদের বিশুদ্ধতম ভাষ্য হলো, ইবনে মাসউদের তাশাহহুদ। ইবনে মাসউদ বলেন : আমরা যখন রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামাযে বসতাম, তখন বলতাম : আসসালামু আলাল্লাহি কাবলা ইবাদিহী, আসসালামু আলা ফুলান, ওয়া ফুলান।" রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "আসসালামু আলাল্লাহি" (আল্লাহর উপর শান্তি বলনা, কেননা আল্লাহ নিজেই তো শান্তি। বরঞ্চ তোমরা যখন নামাযের বৈঠকে বসবে, তখন বলবে : "আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত তাইয়িবাতু, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়ু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।" এরপর যে দোয়া তোমাদের কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে তা পড়ে দোয়া করবে।" সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। মুসলিম বলেছেন : মুসলমানরা ইবনে মাসউদের তাশাহহুদে একমত হয়েছে। কারণ ইবনে মাসউদের শিষ্যরা এ তাশাহ্হুদ বর্ণনায় পরস্পরের বিরোধিতা করেননি। অন্যদের শিষ্যরা পরস্পরের বিরোধিতা করেছেন। তিরমিযি। খাত্তাবী, ইবনে আব্দুল বার ও ইবনুল মুনযির ইবনে মাসউদের হাদিসকে তাশাহহুদের ব্যাপারে বিশুদ্ধতম হাদিস বলেছেন। ইবনে মাসউদের তাশাহহুদের পরই সবচেয়ে বিশুদ্ধ তাশাহহুদ হলো ইবনে আব্বাসের তাশাহহুদ। ইবনে আব্বাস বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কুরআন শিখানোর মতো তাশাহহুদও আমাদেরকে শিখাতেন। তিনি বলতেন : " আততাহিয়াতুল মুবারাকাতু, আসসালাওয়াতুত

তাইয়িবাতু লিল্লাহ, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিউ ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।" -মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, শাফেয়ী। শাফেয়ী বলেছেন : তাশাহহুদ সম্পর্কে বিবিধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে আমার কাছে এটাই সবচেয়ে প্রিয়। কারণ এটা অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ। হাফেজ বলেন : শাফেয়ীকে ইবনে আব্বাসের তাশাহহুদ গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : কারণ আমি এটাকে প্রশস্ত ও ব্যাপক পেয়েছি এবং ইবনে আব্বাস থেকে এটি বিশুদ্ধ সনদে পেয়েছি। এটি আমার নিকট শাব্দিক দিক দিয়েও অন্যান্যগুলোর চেয়ে বড় ও ব্যাপকতর। তবে এটিকে আমি গ্রহণ করলেও যারা অন্য সহীহ তাশাহহুদ গ্রহণ করেছেন তাদেরকে ভর্ৎসনা করিনা। আরো একটা তাশাহহুদ রয়েছে, যা ইমাম মালেক গ্রহণ করেছেন ও মুয়াত্তায় উদ্ধৃত করেছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব মসজিদের মিম্বরে বসে এই তাশাহহুদটি জনগণকে শিখাচ্ছিলেন। সেটি হচ্ছে : "আত্তাহিয়াতু লিল্লাহ, আয-যাকিয়াতু লিল্লাহ ওয়াসসালাওয়াতু লিল্লাহ, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু, ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন, আশহাদু আললাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।" নববী বলেছেন, তাশাহহুদ সংক্রান্ত এসব কটা হাদিসই বেশি সহীহ। মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি অনুযায়ী সবচেয়ে সহীহ ইবনে মাসউদের অতপর ইবনে আব্বাসের হাদিস। শাফেয়ী বলেন : এসব তাশাহহুদের যে কোনো একটি পড়লেই যথেষ্ট হবে। এর প্রত্যেকটির বৈধতা সম্পর্কে আলেমগণ একমত।

৯. সালাম ফেরানো

রসূলুল্লাহ সা. এর কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে নামাযের শেষে সালাম ফরয। আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : নামাযের চাবি পবিত্রতা, তাকবীর (প্রথম তাকবীর) নামাযীর জন্য বহু হালাল কাজ হারাম করে, আর সালাম সেগুলোকে হালাল করে। -আহমদ, শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। তিরমিযির মতে, এ বিষয়ে এ হাদিসটি সবচেয়ে সহীহ ও ভালো। আর আমের বিন সাঈদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি রসূল সা. কে ডানে ও বামে এমনভাবে সালাম ফেরাতে দেখতাম যে, তাঁর গালের সাদা অংশ দেখা যেতো। আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। ওয়ায়েল বিন হাজার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি রসূল সা. এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি ডান দিকে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" এবং বাম দিকে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলতেন। -আবু দাউদ।

প্রথম সালাম ফরয ও দ্বিতীয় সালাম মুস্তাহাব : অধিকাংশ আলেমের মতে, প্রথম সালাম ফরয, আর দ্বিতীয় সালাম মুস্তাহাব। ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলেমগণ একমত, কেউ একবার মাত্র সালাম ফেরালে তার নামায শেষ হয়ে যাবে। আল মুগনীতে ইবনে কুদামা বলেছেন : দুই সালাম সম্পর্কে আহমদের ভাষ্য দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে সাব্যস্ত হয়না দুই সালাম ওয়াজিব। আহমদ শুধু বলেছেন : দুই সালাম রসূলুল্লাহ সা. থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। এ দ্বারা তিনি একথাও বুঝিয়ে থাকতে পারেন, দুই সালাম শরিয়ত সম্মত, ওয়াজিব নয়। অন্যরাও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। এক রেওয়ায়েতে আহমদের বক্তব্য এভাবে এসেছে : আমার নিকট দুই সালামই সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এ দ্বারাও ওটা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়না। (প্রিয় হওয়া প্রমাণিত হয়)। তাছাড়া, যেহেতু আয়েশা, সালামা বিন আকওয়া ও সহল বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. একবার সালাম ফেরাতেন, আর মুহাজিররাও একবার সালাম ফেরাতেন।

আমরা উপরে যা কিছু উল্লেখ করেছি, তাতে হাদিস ও সাহাবিদের উক্তির সমন্বয় করে দুই সালামকে শরিয়ত সম্মত ও সুন্নত, আর এক সালামকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইবনুল মুনযির বর্ণিত ইজমা এই মতকে সঠিক প্রমাণ করে। কাজেই এ মত অকাট্য। নববী বলেছেন : শাফেয়ী, প্রাচীন মনীষীদের অধিকাংশ এবং পরবর্তীকালের মনীষীদের অধিকাংশ দুই সালাকে সুন্নত মনে করেন। মালেক এবং একদল আলেম বলেছেন : "একটা সালামই সুন্নত, যারা একথা বলেন তারা কিছু সংখ্যক দুর্বল হাদিসের উপর নির্ভর করে একথা বলেছেন। উপরোক্ত সহীহ হাদিসগুলোর মোকাবেলায় এগুলো ধোপেই টেকেনা। তবু একটিও যদি সহীহ হতো, তবে তা থেকে একথাই বুঝা যেতো, রসূলুল্লাহ সা. এক সালামের মধ্যে সীমিত থাকাকে বৈধ সাব্যস্ত করার জন্যই একবার সালাম করেছেন। আলেমদের মধ্যে যাদের মতামত খুবই গুরুত্ববহ, তারা একবারের বেশি সালাম ফেরানো ওয়াজিব নয়– এ ব্যাপারে একমত। যদি কেউ একবার সালাম ফেরায়, তবে তা তার সামনের দিকে ফেরানোই মুস্তাহাব। আর দু'বার সালাম ফেরালে প্রথমে ডান দিকে ও দ্বিতীয়বার বাম দিকে ফেরাবে। আর প্রত্যেক সালামে মুখ এতোটা ফেরাবে যেনো পাশ থেকে তার গাল দেখা যায়।" এটাই বিশুদ্ধ মত।

১১. নামাযের সুন্নতসমূহ

নামাযের কিছু সুন্নত রয়েছে, যথাযথ সওয়াব পেতে চাইলে সেগুলো মেনে চলা নামাযীর জন্য মুস্তাহাব। সুন্নতগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. রফে ইয়াদাইন (হাত উঠানো)

চারটি স্থানে হাত তোলা মুস্তাহাব। প্রথমত: তাকবীরে তাহরীমার সময়। ইবনুল মুনযির বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যে নামাযের শুরুতে হাত তুলতেন, সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে কোনোই মতভেদ নেই। হাফেজ ইবনে হাজর বলেছেন, নামাযের শুরুতে হাত তোলার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন পঞ্চাশ জন সাহাবি। তাদের মধ্যে জীবিতাবস্থায় বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন 'আশারা মুবাশশারা' সাহাবা রয়েছেন। আর বায়হাকি হাকেম থেকে বর্ণনা করেছেন : "এই সুন্নতটি ছাড়া আমরা এমন আর কোনো সুন্নত সম্পর্কে অবহিত নই, যা রসূল সা. থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে চার খলিফা, অতপর বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবি এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া পরবর্তী সাহাবিগণ একমত হয়েছেন।

হাত তোলার পদ্ধতি : হাত তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ আলেম যে পদ্ধতির ব্যাপারে একমত তা হলো, দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত উঁচু করতে হবে এবং আংগুলের মাথা কানের উপরিভাগ পর্যন্ত, দুই হাতের বুড়ো আংগুল কানের লতি পর্যন্ত, আর দু'হাতের তালু ঘাড় পর্যন্ত তুলতে হবে। ইমাম নববী বলেন : এভাবেই শাফেয়ী এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। জনগণও সমন্বয়কে পছন্দ করেছে। হাত তোলার সময় আংগুলগুলো প্রসারিত করা মুস্তাহাব। ইবনে মাজাহ ব্যতিত অবশিষ্ট পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখনই নামাযে দাঁড়াতেন, তাঁর দু'হাত প্রসারিত করে উঁচু করতেন।

হাত তোলার সময় : হাত তোলা তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে অথবা তার আগে হওয়া চাই। ইবনে উমর রা. যখনই নামাযে প্রবেশ করতেন, তাকবীর বলতেন এবং হাত তুলতেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. এরকমই করতেন বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। –বুখারি, নাসায়ী, আবু দাউদ। ইবনে উমর থেকে আরো বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তাকবীর বলার সময়েই হাত তুলতেন। হাত দু'খানা ঘাড় বরাবর অথবা তার কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাতেন। –আহমদ প্রমুখ।

তাকবীরে তাহরীমার আগেই হাত তোলা সম্পর্কেও ইবনে উমর থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন, ঘাড় বরাবর হাত তুলতেন, তারপর তাকবীর বলতেন। -বুখারি ও মুসলিম। মালেক ইবনুল হুয়াইরিসের হাদিসের ভাষা এ রকম : তিনি তাকবীর বলতেন, তারপর হাত তুলতেন। -মুসলিম। এ হাদিসে তাকবীরে তাহরীমাকে হাত তোলার আগে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। তবে হাফেজ বলেন : আগে তাকবীর তারপর হাত তোলার কথা কেউ বলেছেন বলে আমি দেখিনি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার হাত তোলা : রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে ওঠার সময়ও হাত তোলা মুস্তাহাব। বাইশ জন সাহাবি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. এটা করতেন। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত :

"রসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন হাত দু'খানা ঘাড় বরাবর উত্তোলন করতেন, তারপর তাকবীর বলতেন, তারপর যখন রুকু দিতে চাইতেন, তখন আবার হাত তুলতেন আগের মতো, তারপর রুকু থেকে ওঠার সময়ও তদ্রূপ হাত তুলতেন এবং বলতেন : "সামিয়াল্লাহু লিমান হামীদাহ, রব্বানা লাকাল হামদ।" -বুখারি, মুসলিম বায়হাকি। বুখারিতে আরো রয়েছে : সাজদায় যাওয়ার সময় এবং সাজদা থেকে ওঠার সময় এটা করতেননা। মুসলিমে আরো আছে : সাজদা থেকে ওঠার সময় এবং দুই সাজদার মাঝে এটা করতেননা। বায়হাকিতে আরো আছে : তাঁর নামায তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই অব্যাহত ছিলো। ইবনুল মাদায়েনী বলেছেন, এই হাদিস সারা বিশ্বের সামনে প্রমাণ, এটা যে শুনবে, তার মান্য করা কর্তব্য। কেননা এর সনদে কোনো ক্রটি নেই। এই মাসায়ালা সম্পর্কে বুখারি একটা আলাদা পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন এবং তাতে হাসান ও হোমায়েদ ইবনে হেলাল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবিগণ এরূপ করতেন। অর্থাৎ তাঁরা উক্ত তিন জায়গায় হাত উত্তোলন করতেন। হাসান তিনটির একটিও বাদ দেননি। হানাফী মযহাবে হলো তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত আর কোনো স্থানে হাত তোলা শরিয়ত সম্মত নয়। তাদের প্রমাণ ইবনে মাসউদের হাদিস। তিনি বলেছেন : তোমাদেরকে আমি রসূলুল্লাহর নামায পড়াবো। তারপর নামায পড়ালেন এবং একবার ব্যতিত হাত তুললেননা। হানাফীদের এই মত দুর্বল। কেননা এই হাদিসের সমালোচনা করেছেন বহুসংখ্যক হাদিস বিশারদ। অবশ্য ইবনে হিব্বান এটাকে উত্তম খবর বলেছেন। রুকুর সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় হাত উত্তোলন না করার পক্ষে কুফাবাসী যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে ওটা দুর্বলতম হাদিস। কেননা ঐ হাদিসে অনেক ক্রটি রয়েছে, যা তাকে বাতিল বলে গণ্য করে। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, হাদিসটি সহীহ, যেমন তিরমিযি বলেছেন, তথাপি এটি বিখ্যাত সহীহ হাদিসগুলোকে খণ্ডন করেনা। আত্-তানকীহ গ্রন্থের লেখক মনে করেন, ইবনে মাসউদ অন্য কয়েকটি জিনিস যেমন ভুলে গেছেন, তেমনি হাত তোলার কথাও ভুলে গিয়ে থাকতে পারেন। যায়লায়ী তাঁর গ্রন্থ 'নাসবির রায়া'তে আত্তানকীহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন : ইবনে মাসউদের ভুলে যাওয়াতে অবাক হবার কিছু নেই। সারা দুনিয়ার মুসলমানরা কুরআনের সূরা নাস ও সূরা ফালাককে ভুললোনা, অথচ ইবনে মাসউদ ভুলে গেলেন! সকল আলেম যে ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তা তিনি ভুলে গেলেন। ইমামের পেছনে দু'জন কিভাবে দাঁড়াবে, তাও তিনি ভুলে গেলেন। এভাবে তিনি যখন একাধিক জিনিস ভুলে গেছেন, তখন নামাযে হাত উত্তোলনের ব্যাপারটি তিনি ভুলে যাবেন, এটা আর অসম্ভব কি? কারণ, ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

চতুর্থবার হাত তোলা : ইবনে উমর থেকে নাফে বর্ণনা করেছেন : তিনি যখন দ্বিতীয় রাকাত শেষে বসা থেকে উঠে দাঁড়াতেন তখন হাত উত্তোলন করতেন। আর এটা ইবনে উমর রা.

রসূল সা. থেকেই পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। -বুখারি, আবু দাউদ ও নাসায়ী। রসূলুল্লাহ সা. এর নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে আলী রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন দুই সাজদা দিয়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠতেন, তখন ঘাড় পর্যন্ত হাত তুলতেন ও তাকবীর দিতেন। -আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিযি।

এই সুন্নতে নারী ও পুরুষের সমতা : শওকানী বলেছেন : জেনে রাখুন, এই সুন্নতটিতে নারী ও পুরুষ সমান। এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষে পার্থক্যের কোনো প্রমাণ নেই। হাত কতটুকু ওপরে তুলতে হবে সে ব্যাপারেও নারী ও পুরুষে কোনো পার্থক্যের প্রমাণ নেই।

২. বাম হাতের উপরে ডান হাত বাঁধা

নামাযে বাম হাতের উপরে ডান হাত বাঁধা মুস্তাহাব। এ সম্পর্কে বিশটি হাদিস রয়েছে, যা আটাশজন সাহাবি ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত। সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : জনগণকে আদেশ দেয়া হতো যেনো পুরুষেরা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখে। আবু হাযেম বলেছেন : এ হাদিস রসূল সা. থেকে বর্ণিত বলেই আমি জানি। -বুখারি, আহমদ ও মালেক। হাফেয বলেন : এ হাদিস রসূল সা. থেকে বর্ণিত বলেই ধরে নেয়া উচিত। কেননা এ হাদিসে উল্লিখিত আদেশ দাতা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. বলেই ধরে নেয়া হয়েছে। রসূল সা. আরো বলেছেন : 'আমরা নবীরা এই মর্মে আদিষ্ট যেনো ইফতার তরান্বিত ও সাহরী বিলম্বিত করি। আর নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখি।'

জাবের রা. থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল। রসূলুল্লাহ সা. তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে নামায পড়ছিল। রসূলুল্লাহ সা. তার হাত সরিয়ে দিলেন এবং বাম হাতের উপর ডান হাত রাখলেন। -আহমদ প্রমুখ। নববী বলেন : এ হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন : এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সা. এর পক্ষ থেকে বিপরীত কিছু আসেনি। অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ী এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম মালেক (রহ.) মুয়াত্তায়ও এটি উল্লেখ করেছেন। মালেক বাস্তবেও আজীবন এরূপ করে গেছেন।

হাত রাখার স্থান : ইবনুল হুমাম বলেছেন, হাত রাখার জায়গাটা বুকের নিচে না নাভির নিচে সে বিষয়টি কোনো সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। হানাফীদের নিকট নাভির নিচে আর শাফেয়ীদের নিকট বুকের নিচে হওয়া উচিত। আহমদ থেকে দুটো মত বর্ণিত আছে এবং দুইটি এই দুই মাযহাবের মতো। তবে প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই দুয়ের মাঝে সমতা বিধান করা উচিত। তিরমিযি বলেছেন : সাহাবি, তাবেয়ী ও তার পরবর্তীদের মধ্যে যারা সুদক্ষ আলেম, তারা মনে করেন : পুরুষরা বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে। আর তাঁদের কেউ কেউ নাভির নিচে অপর কেউ কেউ বুকের নিচে রাখার পক্ষপাতি। এর প্রত্যেকটাই তাদের নিকট বৈধ। তবে কিছু কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়। রসূলুল্লাহ সা. তার হাত দু'খানা বুকের নিচে রাখতেন। -আহমদ বর্ণিত হাদিসে হুলবিত্ তায়ী বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে দেখেছি বাম হাতের উপর ডান হাত রেখেছেন এবং বুকের উপর দুই হাড়ের সংযোগ স্থলের উপর রেখেছেন। আর ওয়ায়েল বিন হাজার বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি বাম হাতের উপর ডান হাত রেখেছেন এবং বুকের উপর রেখেছেন। -ইবনে খুযায়মা, আবু দাউদ, নাসায়ী। আবু দাউদ ও নাসায়ীর বর্ণনায় আরো নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে : তিনি তার ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠের উপর এবং কবজি ও বাহুর উপর রেখেছেন।

৩. নামায শুরুর দোয়া

তাকবীরে তাহরীমার পর ও কিরাতের পূর্বে যেসব দোয়া দ্বারা রসূলুল্লাহ্ সা. দোয়া করতেন ও নামায শুরু করতেন, তার কোনো একটা পড়া নামাযীর জন্য মুস্তাহাব। তার কয়েকটি আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ্ সা. যখন নামাযে তাকবীর বলতেন, তখন তাকবীরের পর কিরাতের আগে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, আমার পিতা মাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক, আপনি যে তাকবীর ও কিরাতের মাঝে চুপ থাকেন, এ সময় আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, আমি বলি :

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .

হে আল্লাহ্, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যতো ব্যবধান, আমার মধ্যে ও আমার গুনাহ্গুলোর মধ্যে ততোখানি ব্যবধান সৃষ্টি করো। হে আল্লাহ্, সাদা কাপড় থেকে যেভাবে ময়লা পরিষ্কার করা হয়, সেভাবে আমাকে আমার গুনাহ্ থেকে পবিত্র করে দাও। হে আল্লাহ্, আমাকে আমার গুনাহ্গুলো থেকে বরফ দিয়ে ও পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।" –বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্।

২. আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন :

وَجَّهْتُ وَجْهِى لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِي جَمِيْعًا، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِى لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَيَهْدِيْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَيَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَأَنَابِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ .

যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আমি একনিষ্ঠভাবে ও আত্মসমর্পণকারী হিসেবে তার দিকে মুখ ফেরালাম, আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আত্মসমর্পণকারী। হে আল্লাহ্, আপনিই একমাত্র বাদশাহ্। আপনি ছাড়া আর কোনো ত্রাণকর্তা নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। আমি আমার গুনাহ্ স্বীকার করছি। কাজেই আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিন। আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ্ মাফ করতে পারেনা। আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করুন। আপনি ব্যতিত আর কেউ সর্বোত্তম চরিত্রের পথে চালাতে পারেনা। খারাপ চরিত্র আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন। আমার থেকে খারাপ চরিত্র দূরে সরানোর ক্ষমতা আপনার ব্যতিত্ আর কারো নেই। আপনার আহ্বানে পুন: পুন: সাড়া

দিচ্ছি। আপনার দীনের পুন: পুন: আনুগত্য ও পুন: পুন: সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত। যা কিছু ভালো তার সবই আপনার হাতে। যা কিছু মন্দ, তা থেকে আপনি মুক্ত। আমি শুধু আপনার সাথে রয়েছি এবং শুধু আপনার নিকটই ফিরে আসবো। আপনি কল্যাণময় ও মহান। আপনার নিকট ক্ষমা চাই ও তওবা করি।" -আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ প্রমুখ।

৩. উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি তাকবীরে তাহরীমার পরে বলতেন : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।" (হে আল্লাহ, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি ও প্রশংসা করি। আপনার নাম কল্যাণময়, আপনার মহত্ত্ব সর্বোচ্চ এবং আপনি ব্যতিত আর কোনো ইলাহ নেই।) -মুসলিম, দারু কুতনী। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন : উমর থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি এই দোয়া দ্বারা রসূলুল্লাহ সা. এর দাঁড়ানোর স্থান থেকে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করতেন। উচ্চস্বরে এটি পড়তেন ও মানুষকে শেখাতেন। ইমাম আহমদ বলেছেন : আমি উমর রা. থেকে বর্ণিত এ দোয়াই অনুসরণ করি।

৪. আসেম রা. বলেন : আমি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী দিয়ে রসূল সা. রাতের নামায শুরু করতেন। তিনি জবাব দিলেন, তোমার আগে আর কেউ আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেনি। তিনি রাতে যখনই নামাযে দাঁড়াতেন তাকবীরে তাহরীমার পরে দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ, দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তেন ও দশবার আস্‌তাগফিরুল্লাহ বলতেন। আর বলতেন : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى وَعَافِنِىْ -

হে আল্লাহ ক্ষমা করো, হিদায়েত করো জীবিকা দাও, নিরাপত্তা দাও" অতপর কিয়ামতের দিনে জায়গার সংকীর্ণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। -আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

৫. আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রসূলুল্লাহ সা. কী দিয়ে রাতের নামায শুরু করতেন? আয়েশা রা. বললেন, রাতের নামায এই দোয়া দিয়ে শুরু করতেন : হে আল্লাহ, জিবরীল, মিকাইল ও ইসরাফীলের প্রভু, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত। আপনিই তো আপনার বান্দারা যেসব জিনিস নিয়ে বিপদে লিপ্ত থাকে, তার ফায়সালা করেন। যে সত্য বিষয়ের ব্যাপারে আপনার অনুমতিক্রমে মতভেদ করা হয়েছে, সেই সত্যের সন্ধান আমাকে দিন। আপনিই তো যাকে চান, সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দেন। -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

৬. নাফে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে নফল নামাযে পড়তে শুনেছি : আল্লাহু আকবার কাবীরান, তিনবার। আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান, তিনবার। সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসিলা, তিনবার। হে আল্লাহ, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে, শয়তান কর্তৃক মানুষকে দেয়া যুদ্ধ বিগ্রহের প্ররোচনা থেকে, তার প্ররোচিত খারাপ কার্য ও যাদুমন্ত্র থেকে এবং তার প্ররোচিত অহংকার থেকে আপনার আশ্রয় চাই।" -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান।

৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াতেন তখন বলতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ

الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْ لَاإِلٰهَ غَيْرُكَ، وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ○

হে আল্লাহ, আপনার জন্য সকল প্রশংসা আপনি আকাশ, পৃথিবী এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতিষ্ঠাতা, আপনার জন্য সকল প্রশংসা, আপনি আকাশ, পৃথিবী এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, তার আলো। আপনার জন্য সকল প্রশংসা আপনি আকাশ, পৃথিবী এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার মালিক, আপনার জন্য সকল প্রশংসা, আপনি সত্য, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আপনার সাথে সাক্ষাৎ সত্য, আপনার কথা সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার উপরই নির্ভর করেছি, আপনার কাছেই এসেছি, আপনার নিকটই সকল ফরিয়াদ পেশ করছি, আপনার নিকটই বিচার সোপর্দ করছি, কাজেই আমার পূর্বের, পরের, গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করুন। আপনিই সামনে এগিয়ে নেন এবং আপনিই পিছে ঠেলে দেন, আপনি ব্যতিত আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ ব্যতিত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস আর কেউ নেই।" –বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মালেক। আবু দাউদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তাহাজ্জুদে উল্লিখিত দোয়া পড়তেন আল্লাহু আকবার বলার পর।

৪. আউযু বিল্লাহ পাঠ করা

নামায শুরুর দোয়া পড়ার পর ও কিরাতের পূর্বে শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা মুস্তাহাব (অর্থাৎ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রাজীম বলা)। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "যখন কুরআন পড়তে চাইবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও।" ইতিপূর্বে নাফে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. তাহাজ্জুদে বলতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাশ শয়তানির রজীম।" ইবনুল মুনযির বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কিরাতের পূর্বে বলতেন : "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজীম।"

গোপনে আশ্রয় প্রার্থনা করা সুন্নত। আল-মুগনীতে বলা হয়েছে : শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা গোপনে হওয়া চাই, প্রকাশ্যে নয়। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত আমার জানা নেই। তবে শাফেয়ীর মতে, সশব্দে যেসব নামায পড়া হয়, তাতে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজীম প্রকাশ্যেও পড়া যায়, গোপনেও পড়া হয়। আবু হুরায়রা থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদিসে প্রকাশ্যে পড়তে বলা হয়েছে।

"আউযু বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজীম" কেবল প্রথম রাকাতেই পড়া নিয়ম। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াতেন, কিরাত শুরু করতেন আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন দিয়ে কোনো বিরতি ছাড়াই। -মুসলিম। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন : দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে ইসতিয়াযা (আউযু বিল্লাহ...) পড়া হবে কি হবেনা, তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে এ সময়ে নামায শুরুর দোয়া যে পড়তে হবেনা– সে ব্যাপারে তারা একমত। এ ব্যাপারে দুটো মত রয়েছে এবং দুটোই ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত। আহমদের কোনো কোনো শিষ্য বলেছেন, এই দুটি মতের ভিত্তি হলো, নামাযের সকল

রাকাতের কিরাতকে একই কিরাত বিবেচনা করা হবে, না প্রত্যেক রাকাতের কিরাত স্বতন্ত্র? যদি সকল রাকাতের কিরাত একই কিরাত হয়, তাহলে গোটা নামাযে একবার ইসতিয়াযাই যথেষ্ট হবে। অবশ্য নামায শুরুর দোয়া যে গোটা নামাযের জন্য, সে ব্যাপারে, কোনো দ্বিমত নেই। আর সহীহ হাদিসের প্রকাশ্য ভাষ্য অনুযায়ী একবার ইসতিয়াযাই যথেষ্ট। এরপর ইবনুল কাইয়িম আবু হুরায়রার হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন : নামায শুরুর দোয়া একবার পড়া যথেষ্ট এজন্য যে, এক রাকাতের কিরাত ও অন্য রাকাতের কিরাতের মাঝে নীরবতা ও বিরতি পালন করা হয়নি, বরং এর মাঝে কিছু দোয়া ও যিকর পাঠ করা হয়েছে। সুতরাং সকল রাকাতের কিরাত এক কিরাতের মতোই। কিরাতগুলোর মাঝে যা পড়া হয়েছে তা আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, রসূল সা. এর উপর দরূদ ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু নয়। শওকানী বলেছেন : হাদিসে যা বলা হয়েছে, তদনুসারে কেবলমাত্র প্রথম রাকাতের কিরাতের পূর্বে আউযু বিল্লাহ.... পড়াই অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

৫. সূরা ফাতিহার শেষে আমীন বলা

প্রত্যেক নামাযীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া শেষে আমীন বলা সুন্নত, চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক বা একাকী হোক। যে নামাযে কিরাত নি:শব্দে পড়া নিয়ম, সে নামাযে আমীন নি:শব্দে আর যে নামাযে কিরাত সশব্দে পড়া নিয়ম, সে নামাযে আমীন সশব্দে বলবে। নোয়াইম মুজাম্মার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি আবু হুরায়রার পেছনে নামায পড়লাম। তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন। তারপর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়লেন। যখন 'ওয়ালাদ দল্লীন পর্যন্ত পড়ছিলেন, তখন আমীন বললেন, লোকেরাও আমীন বললো। নামাযের পর আবু হুরায়রা বললেন : আমার এ নামায রসূলুল্লাহ সা. এর নামাযের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। -বুখারি, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান, ইবনে সিরাজ। বুখারিতে আরো বলা হয়েছে : ইবনে শিহাব বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমীন বলতেন। আতা বলেছেন : আমীন একটি দোয়া। ইবনুয্ যুবাইর আমীন বলেছিলেন, আর তার পেছন থেকে জামাতের লোকেরাও আমীন বলেছিল। ফলে মসজিদে একটা বিরাট শব্দ হয়। নাফে বলেন : ইবনে উমর আমীন বলা বাদ দিতেননা। উপরন্তু জনগণকে আমীন বলতে উৎসাহিত করতেন। এ সম্পর্কে আমি তার কাছ থেকে একটা হাদিস শুনেছি। আর আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন বলতেন "গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দল্লীন" অমনি বলতেন : আমীন। প্রথম কাতারে দাঁড়ানো তাঁর পাশের লোকও এটা শুনতে পেতো। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। ইবনে মাজায় আরো রয়েছে : প্রথম কাতারের লোকেরাও শুনতো এবং গোটা মসজিদ কেঁপে উঠতো। -হাকেম, বায়হাকি, দারু কুতনী।

ওয়ায়েল বিন হিজর থেকে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ সা.কে পড়তে শুনলাম : "গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দল্লীন" তারপরই তিনি উচ্চশব্দে বললেন : আমীন। -আহমদ, আবু দাউদ। তিরমিযি এ হাদিসকে ভালো বলেছেন এবং বলেছেন : সাহাবি, তাবেয়ী ও তাদের পরবর্তী মনীষীগণের মধ্য থেকে অনেকে এই মতের প্রবক্তা। তারা মনে করেন : আমীন উচ্চ কণ্ঠে বলতে হবে, গোপনে নয়। হাফেয বলেছেন : এ হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ। আতা বলেছেন : এই মসজিদে আমি দুইশত সাহাবিকে পেয়েছি। ইমাম যখন ওয়ালাদ দল্লীন বলতেন, তাদের গগনবিদারী শব্দে 'আমীন' বলা শুনতাম।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এখন তোমাদের সালাম করা ও ইমামের পেছনে আমীন বলার জন্য ইহুদীরা তোমাদের যতোটা হিংসা করে, ততোটা হিংসা তারা তোমাদেরকে আর কোনো জিনিসের জন্য করেনি। -আহমদ, ইবনে মাজাহ।

ইমামের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমীন বলা মুস্তাহাব : মুক্তাদীর জন্য ইমামের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমীন বলা মুস্তাহাব। ইমামের আগেও বলবেনা পরেও নয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইমাম যখন বলবে : 'গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দল্লীন' তোমরা তখন 'আমীন' বলো। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলিত হবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" -বুখারি। অপর হাদিসে রসূল সা. বলেছেন : ইমাম যখন গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দল্লীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা ফেরেশতারাও তখন আমীন বলে, ইমামও আমীন বলে। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে হয়, তার অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। -বুখারি। অপর হাদিসে রসূল সা. বলেছেন : ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে হবে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।*

আমীন শব্দের ব্যাখ্যা : "আমীন" শব্দটি সূরা ফাতিহার অংশ নয়। এটা একটা স্বতন্ত্র দোয়া। এর অর্থ "হে আল্লাহ, কবুল করো।"

৬. সূরা ফাতিহার পরবর্তী কিরাত

সূরা ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা বা কুরআনের কোনো অংশ পড়া সুন্নত। ফজর ও জুমার উভয় রাকাতে, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকাতে এবং নফলের সকল রাকাতে ফাতিহার পর কুরআনের অন্য কোনো অংশ পড়তে হবে। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত :

"রসূলুল্লাহ সা. যোহরের প্রথম দু'রাকাত সূরা ফাতিহা ও অন্য দুটো সূরা দ্বারা এবং শেষ দু'রাকাত সূরা ফাতিহা দ্বারা পড়তেন। কখনো কখনো আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। আর প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে লম্বা সূরা বা কিরাত পড়তেন। আসরেও তদ্রূপ ফজরেও তদ্রূপ।" -বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ। আবু দাউদের রেওয়ায়েত আরো রয়েছে : আমরা ভাবতাম, প্রথম রাকাত যাতে লোকেরা ধরতে পারে সে উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথম রাকাতকে দীর্ঘায়িত করতেন। জাবের বিন সামুরা বলেছেন : কুফাবাসী উমর রা. এর নিকট সা'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। ফলে উমর রা. সা'দকে (সাময়িক) বরখাস্ত করে আম্মারকে তাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। তারা (সাদের) অভিযোগ করলো। এমনকি তারা জানালো তিনি (সা'দ) ভালোভাবে নামায পড়াননা। উমর রা. সাদকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মদিনায় এলে তাঁকে বললেন : হে আবু ইসহাক, ওরা বলে, তুমি নাকি ভালোভাবে নামায পড়াওনা? আবু ইসহাক বললেন : আল্লাহর কসম, আমি তাদেরকে রসূলুল্লাহ সা. এর নামায পড়াতাম। তার চাইতে কিছুমাত্র কম করতামনা। এশার নামায যখন পড়াতাম তখন প্রথম দু'রাকাত লম্বা ও শেষের দু'রাকাত হালকা করে পড়াতাম। তিনি বললেন : হে আবু ইসহাক, তোমার সম্পর্কে এটা তাদের ধারণা। তারপর তিনি তাঁর সাথে কুফায় একজন বা একাধিক লোক পাঠালেন। তারা কুফাবাসীর নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। কুফার একটি মসজিদেও তারা জিজ্ঞাসা করতে বাদ দিলেন না। সবাই সাদের প্রশংসা করছিল। অবশেষে

---

* খাত্তাবী বলেন : যখন ইমাম ওয়ালাদ দল্লীন বলবে, তখন তোমরা আমীন বলবে, এর অর্থ হলো, ইমামের সাথে সাথেই বলবে, যাতে তোমাদের ও ইমামের আমীন একই সাথে উচ্চারিত হয়। আর "যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরা আমীন বলো" এ উক্তি পূর্বোক্ত হাদিসের বিরোধী নয় এবং ইমামের আমীন বলা থেকে বিলম্বে বললেও চলবে বুঝায়না, বরং এটা "যখন সেনাপতি রওনা হয় তখন তোমরাও রওনা হও" বলার মতোই। অর্থাৎ তোমাদের রওনা হওয়া ও সেনাপতির রওনা হওয়া একই সাথে হওয়া চাই।

তারা বনু আবদের মসজিদে গেলেন। সেখানে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : যখন আমাদের নিকট আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, তখন বলছি শুনুন : সা'দ কোনো সেনাদলের সাথেও যেতেননা, সমভাবে সম্পদও বণ্টন করতেননা, বিশেষ মীমাংসায় সুবিচারও করতেননা। সা'দ বললেন : শুনে রাখুন, আমি তিনটে দোয়া করবো : হে আল্লাহ, আপনার এই বান্দা যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে এবং লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তাকে দীর্ঘ জীবন ও দীর্ঘ দারিদ্র্য দান করো এবং তাকে ফিতনায় লিপ্ত করো।' আর ঐ ব্যক্তি পরে বলতো : আমি একজন বিপদগ্রস্ত বৃদ্ধ, আমি সাদের বদদোয়ার শিকার। আব্দুল মালেক বলেছেন : আমি তাকে পরে দেখেছি, বার্ধক্যের আতিশয্যে তার ভ্রু চোখের উপর এসে পড়েছিল। আর সে রাস্তায় শহুরে মহিলাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপতো। -বুখারি। আবু হুরায়রা বলেছেন : প্রত্যেক নামাযে কিরাত পড়া হবে। তবে রসূল সা. যেটুকু আমাদের শোনাতেন, আমরাও সেটুকু তোমাদের শোনাবো। আর যেটুকু তিনি আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতেন, আমরাও সেটুকু তোমাদের কাছ থেকে লুকাবো। সূরা ফাতিহার চেয়ে বেশি যদি না পড়ো তবে তাতেও চলবে। আর যদি তার চেয়ে বেশি পড়ো, তবে সেটা ভালো। -বুখারি।

৭. ফাতিহার পরে কিরাত কিভাবে পড়তে হবে

ফাতিহার পরে কিরাত পড়ার জন্য যে কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। হুসাইন বলেছেন : আমরা তিনশত সাহাবিকে সাথে নিয়ে খুরাসান অভিযানে গিয়েছিলাম। তখন কেউ কেউ ইমামতি করে আমাদের নামায পড়াতেন এবং সূরা থেকে অনেকগুলো আয়াত পড়ে রুকু দিতেন। ইবনে আব্বাস সূরা ফাতিহা ও প্রত্যেক রাকাতে সূরা বাকারার একটি আয়াত পড়তেন বলে বর্ণিত হয়েছে। -দারু কুতনী। বুখারি তাঁর সহীহ বুখারিতে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন : "একই রাকাতে দুই সূরা পড়া, কুরআনের শেষাংশের সূরাগুলো পড়া এবং একটি সূরার পূর্বে আরেকটি সূরা পড়া।" অতপর আব্দুল্লাহ বিন সায়েব সম্পর্কে উল্লেখ করেন, রসূলুল্লাহ সা. ফজরের নামাযে সূরা মুমিনুন পড়ছিলেন, যখন মূসা ও হারুনের বিবরণ এলো, অথবা ঈসা (আ.) সংক্রান্ত আলোচনা এলো তখন তাঁর কাশী পেলে তিনি রুকুতে গেলেন। আর উমর প্রথম রাকাতে বাকারা থেকে একশো বিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকাতে বারবার যে সূরাগুলো পড়া হয়, তার যে কোনো একটি পড়তেন.। আহনাফ প্রথম রাকাতে সূরা কাহফ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইউনুস বা ইউসুফ পড়েছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি উমরের পেছনে এই উভয় সূরা দ্বারা নামায পড়েছেন। আর ইবনে মাসউদ প্রথম রাকাতে আনফালের চল্লিশ আয়াত দ্বারা নামায পড়িয়েছেন। আর দ্বিতীয় রাকাতে পড়িয়েছেন কোনো একটা ছোট সূরা দ্বারা। যে ব্যক্তি দুই রাকাতে একটি সূরা পড়ে অথবা উভয় রাকাতে একই সূরার পুনরাবৃত্তি করে, তার সম্পর্কে কাতাদা বলেছেন : সবই আল্লাহর কিতাবের অংশ।

উবায়দুল্লাহ বিন সাবিত আনাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, আনসারদের একজন মসজিদে কোবায় তাদের ইমামতি করতো। সে যখনই কোনো সূরা পড়তো, তার পূর্বে সূরা ইখলাস পড়ে নিতো, ইখলাস শেষ হলে তার সাথে আরেকটা সূরা পড়তো। এভাবে প্রত্যেক রাকাতে করতো। এ সম্পর্কে তার সাথিরা তার সাথে কথা বললো। তারা বললো! তুমি এই সূরা দিয়ে নামায শুরু করো, তারপর এটাকে তুমি যথেষ্ট মনে করোনা, বরং অন্য একটি সূরা পড়ো। তুমি হয় শুধু এই সূরা (ইখলাস) দিয়েই নামায পড়াও, নচেৎ এটা বাদ দিয়ে অন্যটা দিয়ে পড়াও। সে বললো : আমি সূরা ইখলাস ছাড়তে পারবোনা। তোমরা যদি পছন্দ করো আমি এভাবেই তোমাদের ইমামতি করবো, আর যদি অপছন্দ করো, তাহলে তোমাদের ইমামতি

পরিত্যাগ করবো। লোকেরা মনে করতো, সে তাদের মধ্যে উত্তম এবং অন্য কেউ ইমামতি করুক তা তাদের পছন্দ হতোনা। তাদের ওখানে যখন রসূল সা. এলেন, তখন তারা তাঁকে বিষয়টি জানালো। তিনি ঐ লোকটিকে বললেন, হে অমুক, তোমার সাথিরা যা বলছে তা করতে তোমার অসুবিধা কোথায়? এই সূরাটা প্রত্যেক রাকাতে পড়া তুমি জরুরি মনে করছো কেন? সে বললো : আমি এ সূরাটা ভালবাসি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার এই সূরাকে ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.কে ফজরের উভয় রাকাতে সূরা যিলযাল পড়তে শুনেছি। আমি জানিনা রসূলুল্লাহ সা. ভুলক্রমে এ রকম পড়েছেন, না ইচ্ছাকৃতভাবে। -আবু দাউদ।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করতেন, তখন অন্য একটি সূরা শুরু করতেন, কখনো সেটা লম্বা করতেন, আবার সফর বা অন্য কোনো কারণে সংক্ষিপ্ত করতেন। বেশির ভাগ সময় মধ্যম আকৃতির সূরা পড়তেন।

● ফজরের কিরাত

ফজরের নামাযে প্রায় ষাট থেকে একশো আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। তিনি সূরা "কাফ" সূরা "রূম" সূরা "ইযাশ শামছু কুব্বিরাত" কখনো উভয় রাকাতে "ইযা যুলযিলাত", সফরে সূরা নাস ও ফালাক, সূরা মুমিনুনের শুরু থেকে মূসা ও হারুনের কাহিনী পর্যন্ত প্রথম রাকাতে পড়েছেন এবং কাশী আসার কারণে রুকুতে গিয়েছেন। শুক্রবারে সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা ও সূরা দাহর সম্পূর্ণ পড়তেন। আজকাল অনেকে যেমন এক সূরা থেকে খানিকটা এবং অপর সূরা থেকে খানিকটা পড়েন, রসূল সা. সেরূপ করতেননা। কিছু অজ্ঞ লোক ধারণা করে, জুমার দিনের ফজরের নামাযকে একটা বাড়তি সাজদা দ্বারা বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে, এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। কোনো কোনো ইমাম এই ভুল ধারণার কারণে সূরা সাজদা পড়া মাকরূহ অভিহিত করেছেন। রসূলুল্লাহ সা. সূরা সাজদা ও দাহর পড়তেন শুধু এজন্য যে, এ সূরা দুটোতে মানব সৃষ্টির সূচনা, ইহকাল, পরকাল, বেহেশত, দোযখ, ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে। তাই তিনি জুমার দিনের ফজরে এই দিনে যা যা ঘটেছে ও ঘটবে, তা মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পড়তেন। যেমন বড় বড় উৎসবের দিনে, যথা ঈদে ও জুমায় সূরা কাফ, কামার, সাবিবহিসমা ও গাশিয়া পড়তেন।

● যোহরের কিরাত

যোহরের নামাযে রসূলুল্লাহ সা. কখনো এতো লম্বা কিরাত পড়তেন যে, আবু সাঈদ বলেছেন, যোহরের নামায শুরু হওয়ার পর কেউ কেউ জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে বাড়িতে এসে অযু করতো ও তারপর প্রথম রাকাতে গিয়ে নামায ধরতো। -মুসলিম। কখনো সূরা সাজদা, কখনো সূরা আ'লা, কখনো সূরা লাইল, কখনো সূরা বুরুজ, কখনো সূরা তারেক পড়তেন।

● আসরের নামাযের কিরাত

যোহরের নামাযে যখন লম্বা কিরাত পড়া হয় তখন আসরের নামাযে তার অর্ধেক আর যোহরে ছোট কিরাত পড়া হলে আসরে তার সমান কিরাত পড়া হবে।

● মাগরিবের কিরাত

মাগরিবে রসূলুল্লাহ সা. এর নীতি ছিলো আজকালকার নীতির বিপরীত। তিনি একবার মাগরিবের দু'রাকাতে সূরা আরাফ, আরেকবার সূরা তুর, আরেকবার সূরা মুরসালাত পড়েছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলেছেন : বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সা. মাগরিবে সূরা আ'রাফ, সূরা সাফফাত, দুখান, আ'লা, তীন, নাস ও ফালাক, মুরসালাত এবং কিসারে মুফাসসাল (আমপারার শেষ দিকের ক্ষুদ্রতম সূরাগুলো) পড়তেন। এগুলোর সবই প্রসিদ্ধ ও সহীহ হাদিস। তবে সব সময় মাগরিবে ক্ষুদ্রতম সূরাগুলো পড়ার রীতি চালু করেছেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। এ জন্য যায়দ বিন সাবেত এটা অপছন্দ করেছেন। তিনি তাকে বলেছেন : আপনার ব্যাপার কী? মাগরিবে ক্ষুদ্রতম সূরাগুলো পড়েন, অথচ আমি রসূলুল্লাহ সা. কে দীর্ঘতম দুটি সূরার একটি পড়তে দেখেছি। আমি বললাম : দীর্ঘতম দুটো সূরার একটি কী? তিনি বললেন : আ'রাফ। -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। নাসায়ী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. মাগরিবে সূরা আ'রাফ দু'রাকাতে ভাগ করে পড়েছেন। তাই সব সময় ক্ষুদ্রতম আয়াত ও সূরা পড়া সুন্নতের খেলাফ। এটা মারওয়ান বিন হাকামের কাজ।

● এশার কিরাত

এশার নামাযে রসূলুল্লাহ সা. সূরা তীন পড়েছেন এবং মুয়াযকে সূরা শামস, আ'লা, লাইল ইত্যাদি পড়তে বলেছেন। বাকারা পড়া অপছন্দ করেছেন।

● জুমার কিরাত

জুমার নামাযে রসূলুল্লাহ সা. সূরা জুমা, মুনাফিকুন, গাশিয়া, আ'লা ও গাশিয়া সম্পূর্ণ পড়তেন। বিভিন্ন সূরার শেষাংশ রসূল সা. কখনো পড়তেননা। এটা তার অনুসৃত নিয়মের বিপরীত ছিলো।

● ঈদের নামাযের কিরাত

ঈদের নামাযে রসূলুল্লাহ সা. কখনো সূরা কাফ ও সূরা কামার সম্পূর্ণ, কখনো সূরা আ'লা ও গাশিয়া পড়তেন।

আমৃত্যু রসূল সা. নামাযের কিরাতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে গেছেন। পরে কোনোভাবে এর পরিবর্তন বা বিলোপ সাধন করা হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীনও এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আবু বকর রা. ফজরে সূরা বাকারা পড়লেন ফলে সূর্য ওঠার কাছাকাছি সময়ে সালাম ফেরালেন। লোকেরা বললো : হে খলিফাতু রসূলুল্লাহ! সূর্যতো ওঠার উপক্রম হয়ে গেছে। তিনি বললেন : সূর্য যদি ওঠতো, তবে আমাদেরকে উদাসীন পেতোনা। উমর রা. ফজরের নামাযে সূরা ইউসুফ, নাহল, হুদ, বনী ইসরাঈল প্রভৃতি সূরা পড়তেন। রসূলুল্লাহ সা. এর কিরাত দীর্ঘায়িত করা যদি রহিত হতো, তাহলে তা খোলাফায়ে রাশেদীন এর অজানা থাকতোনা। সমালোচকরাও অবহিত থাকতো, জাবের থেকে যে হাদিসটি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. ফজরে সূরা কাফ পড়তেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি সংক্ষিপ্ত কিরাত পড়তেন, তার অর্থ হলো : তিনি ফজরে অন্যান্য নামাযের চেয়ে লম্বা কিরাত পড়তেন এবং ফজরের পরবর্তী নামাযগুলোতে সংক্ষিপ্ত কিরাত পড়তেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় উম্মুল ফজলের বর্ণনায়। তিনি তাঁর ছেলে ইবনে আব্বাসকে নামাযে সূরা মুরসালাত পড়তে শুনে বললেন : বাবা, তুমি এই সূরা পড়ে আমাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। এ সূরাটি আমি সর্বশেষ রসূল সা.কে মাগরিবে পড়তে শুনেছি। এটা ছিলো সর্বশেষ ঘটনা। আবার রসূল সা. এ কথাও বলেছেন : তোমাদের কেউ জামাতের ইমামতি করলে সে যেনো হালকা ও সংক্ষিপ্ত করে। আনাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জামাতে নামায পড়ার সময় সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও হালকা নামায পড়তেন। বস্তুত, এই হালকা ও সংক্ষিপ্তকরণের বিষয়টি আপেক্ষিক বিষয়। এর ভিত্তি ছিলো রসূলুল্লাহ সা.-এর সার্বক্ষণিক কাজ। মুক্তাদিদের খেয়ালখুশি নয়। তিনি একটা

আদেশ দিয়ে পরে তার বিরোধিতা করতেন না। তিনি জানতেন, তার পেছনে অনেক প্রবীণ, দুর্বল ও সমস্যাপীড়িত লোক রয়েছে। সুতরাং যা করেছেন, সেটাই ছিলো সেই হালকা ও সংক্ষিপ্ত নামায, যা পড়াতে তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। তাঁর নামায যেভাবে পড়িয়েছেন, তার চেয়ে বহুগুণ লম্বা হতে পারতো। কাজেই আরো লম্বা নামাযের তুলনায় ঐ নামায ছিলো সংক্ষিপ্ত ও হালকা। তিনি যে পদ্ধতি সব সময় অনুসরণ করতেন, সেটা দেখেই সকল তর্কের অবসান ঘটাতে হবে। নাসায়ী কর্তৃক ইবনে উমর থেকে বর্ণিত এই হাদিস থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত ও হালকা নামায পড়ার আদেশ দিতেন, আর নিজে সূরা সাফফাত দ্বারা নামায পড়াতেন। কাজেই সাফফাত দ্বারা ইমামতি করাই সেই সংক্ষিপ্ত ও হালকা নামায, যার জন্য তিনি আদেশ করতেন।

● নির্দিষ্ট সূরা পড়া

জুমা ও দুই ঈদ ছাড়া কোনো নামাযে রসূলুল্লাহ সা. কোনো বিশেষ সূরাকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে নিতেন না যে, ঐ সূরা দিয়ে ছাড়া নামায পড়াবেন না। অন্যান্য নামায সম্পর্কে আবু দাউদ বর্ণনা করেন : আমর বিন শুয়াইবের দাদা বলেন : ফরয নামাযে ছোট বড় সব রকমের সূরাই আমি রসূলুল্লাহ সা. কে নামাযের ইমামতির সময় পড়তে শুনেছি। তবে তাঁর নিয়ম ছিলো, পূর্ণাঙ্গ সূরা পড়া। কখনো একটি সূরাকে দুই রাকাতে ভাগ করে পড়তেন, কখনো সূরার প্রথমাংশ পড়তেন। তবে সূরার মাঝখান থেকে বা শেষের দিক থেকে কখনো পড়তেন বলে মনে পড়েনা। এক রাকাতে দুই সূরা নফলে পড়তেন, বহু দৃষ্টান্ত জানা রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. এক রাকাতে সূরা রহমান ও নাজ্ম, আরেক রাকাতে সূরা কামার ও হাক্কা, আরেক রাকাতে তূর ও যারিয়াত এবং আরেক রাকাতে ওয়াকেয়া ও কালাম এরূপ জোড়া জোড়া সূরা পড়েছেন। তবে এটা ফরয নামাযে না নফল নামাযে পড়তেন, তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। দুটোরই সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একই সূরা একই নামাযের উভয় রাকাতে রসূলুল্লাহ সা. খুব কমই পড়তেন। আবু দাউদ জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সা. কে ফজরের উভয় রাকাত সূরা যিলযাল পড়তে শুনেছেন। কিন্তু বলেছেন : আমি জানিনা, রসূলুল্লাহ সা. ভুলক্রমে পড়েছেন, না ইচ্ছাকৃতভাবে।

● ফজরের প্রথম রাকাত লম্বা করে পড়া

ফজর ও অন্য সকল নামাযে প্রথম রাকাতকে রসূলুল্লাহ সা. দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা লম্বা করতেন। কখনো কখনো এতো লম্বা করতেন যে, কারো কোনো পায়ের আওয়াজ শোনা যেতোনা। ফজরের নামাযকে অন্যান্য নামায অপেক্ষা বেশি লম্বা করতেন। এর কারণ হলো, ফজরের কুরআন পাঠে আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ সাক্ষী হন। কেউ কেউ বলেন, রাতের ফেরেশতারা ও দিনের ফেরেশতারা শরিক হন। উক্ত দুটো উক্তির ভিত্তি হলো, আল্লাহর প্রথম আকাশে অবতরণ ফজরের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, না ফজরের শুরু পর্যন্ত? উভয় মতের সপক্ষে হাদিস রয়েছে। এর কারণ এটাও হতে পারে যে, যেহেতু ফজরের নামাযের রাকাতের সংখ্যা কম রাখা হয়েছে। তাই নামাযকে দীর্ঘায়িত করে রাকাতের কমতি পূরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এর কারণ এটাও হতে পারে যে, এ নামায মানুষের দীর্ঘ ঘুম ও বিশ্রামের পরে সংঘটিত হয়। তাছাড়া এ নামায যখন পড়া হয় তখনো মানুষের আয় রোজগার ও পার্থিব জীবনের উপকরণ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়না। উপরন্তু এ নামায এমন সময় সংঘটিত হয় যখন মানুষের কান, জিহ্বা ও মন পূর্ণ অবসরে থাকার কারণে নামাযে সর্বাত্মক একাগ্রতা জন্মে, তাই তার পক্ষে কুরআন বুঝা ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা সম্ভব হয়। তাছাড়া এ নামায দিনের প্রথম কাজ ও সব কাজের ভিত্তি, তাই একে দীর্ঘায়িত করে গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

যারা শরিয়তের বিধিসমূহের রহস্য, যৌক্তিকতা ও নিগূঢ় উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেন, তারাই এগুলো বুঝতে পারেন।

● রসূলুল্লাহ সা. এর কিরাতের পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ সা. ধীরে ধীরে টেনে টেনে প্রতি আয়াত শেষে থেমে ও আওয়ায দীর্ঘায়িত করে কিরাত পড়তেন।

● কিরাতের মুস্তাহাব

কিরাত পড়ার সময় সুললিত কণ্ঠে ও সুরেলা স্বরে পড়া মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমরা কুরআনের জন্য তোমাদের স্বরকে সুরেলা ও সুললিত করো।" তিনি আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়েনা, সে আমাদের কেউ নয়।" তিনি আরো বলেছেন : যার কুরআন পাঠ শুনলে তোমাদের ধারণা জন্মে যে, সে আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই সর্বোত্তম কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে।" তিনি আরো বলেছেন : একজন সুরেলা কণ্ঠধারী নবী, যিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়েন, তার কুরআন পড়াকে আল্লাহ যেরূপ (আগ্রহ সহকারে) শ্রবণ করেন, আর কোনো জিনিস সেরূপ শ্রবণ করেননা। নববী বলেছেন : যে ব্যক্তি নামাযে বা অন্য কিছুতে কুরআন পাঠ করে, তার জন্য সুন্নত হলো, যখন রহমত সংক্রান্ত আয়াত পড়বে, তখন আল্লাহর নিকট তার করুণা ও অনুগ্রহ চাইবে। যখন আযাব সংক্রান্ত আয়াত পড়বে তখন আযাব থেকে, আগুন থেকে, অকল্যাণ থেকে ও অবাঞ্ছিত জিনিস থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। অথবা বলবে : হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা কামনা করি, ইত্যাদি। আর যখন আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা সংক্রান্ত আয়াত পড়বে, তখন বলবে, "সুবহানাল্লাহ ওয়া তায়ালা" (আল্লাহ পবিত্র ও মহান) অথবা "বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়", অথবা "আমাদের প্রতিপালক শ্রেষ্ঠ মহিমামন্বিত" ইত্যাদি। হুযায়ফা বলেন : "আমি একদা রাত্রে রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করলেন। আমি ভাবলাম, একশ আয়াতের পর উনি রুকু করবেন। কিন্তু একশ আয়াত অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, সূরাটা দিয়ে উনি রাকাত শেষ করবেন। তিনি আরো এগিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, এবার রুকু করবেন। তারপর সূরা আল ইমরান শুরু করলেন। সেটি পড়ে ফেললেন। তারপর সূরা নিসা শুরু করলেন। এটা খুব ধীর গতিতে পড়লেন। যখনই তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা ও গুণকীর্তন) সংক্রান্ত আয়াত পড়েন, অমনি 'সুবহানাল্লাহ' বলেন, যখনই কোনো দোয়ার আয়াত পড়েন, অমনি দোয়া করেন, যখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া সংক্রান্ত আয়াত পড়েন, অমনি আশ্রয় চেয়ে দোয়া করেন।" -মুসলিম।

আমাদের ইমামগণ বলেছেন : নামাযে বা নামাযের বাইরে যেখানেই কুরআন পড়া হোক, এরূপ করা এবং তাসবীহ পড়া, চাওয়া ও আশ্রয় কামনা করা পাঠকের জন্য আর নামাযে ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য মুস্তাহাব। কেননা এসব তো দোয়া, কাজেই সবাই এতে সমান, যেমন আমীন বলার ব্যাপারে সকল নামাযী সমান। আর যে ব্যক্তি পড়বে "আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী নন?" (সূরা তীনের শেষ আয়াত)। তখন "হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে সাক্ষী" বলা মুস্তাহাব। আর যখন সূরা কিয়ামার শেষ আয়াত : "আল্লাহ কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন? তখন বলবে : "হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি," আর যখন সূরা মুরসালাতের শেষ আয়াত : "এরপর তারা কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে?" পড়বে, তখন বলবে : "আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি" বলবে। আর যখন বলবে : "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা (তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর নামে তাসবীহ পাঠ করো" তখন বলবে : সুবহানা

রব্বিয়াল আ'লা (আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর গুণকীর্তন করছি। এভাবে নামাযে ও নামাযের বাইরে বলবে।

● নামাযের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে কিরাত পড়ার স্থানসমূহ

ফজর ও জুমার উভয় রাকাতে মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকাতে, উভয় ঈদ, সূর্যগ্রহণ ও ইসতিসকার নামাযের উভয় রাকাতে প্রকাশ্যে ও সশব্দে কিরাত পড়া সুন্নত। আর যোহর, আসর ও মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে এবং এশার শেষ দু'রাকাতে গোপনে পড়া সুন্নত। অন্যান্য নফলের বিধান হলো : দিনের বেলার নামাযে গোপনে পড়তে হবে। আর রাতের নামাযে গোপনে বা প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে পড়া যাবে। তবে মধ্যম পন্থাটিই উত্তম।

"একদিন রাতে রসূলুল্লাহ সা. আবু বকরের কাছে গেলেন। দেখলেন, তিনি খুবই অনুচ্চ শব্দে নামায পড়ছেন। উমরের কাছে গেলেন, দেখলেন তিনি উচ্চ শব্দে নামায পড়ছেন। পরে যখন উভয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে একত্রিত হলেন, তখন বললেন : হে আবু বকর, তোমার কাছে গিয়ে দেখলাম, তুমি খুবই মৃদু শব্দে নামায পড়ছো। আবু বকর বললো : হে রসূল সা. আমি যার সাথে গোপন সংলাপ করেছি, তাঁকে শুনাতে পেরেছি। উমরকে বললেন : হে উমর তোমার কাছে গেলাম, দেখলাম তুমি উচ্চ কণ্ঠে নামায পড়ছো। তিনি বললেন : হে রসূল, আমি ঘুমন্ত লোকদের জাগাচ্ছিলাম এবং শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম। তিনি বললেন : হে আবু বকর, তোমার শব্দ কিছুটা বাড়াও। আর উমরকে বললেন : তোমার শব্দ কিছুটা কমাও।" -আহমদ, আবু দাউদ।

আর যদি ভুলক্রমে গোপনের জায়গায় প্রকাশ্যে এবং প্রকাশ্যের জায়গায় গোপনে পড়ে, তবে কোনোই ক্ষতি হবেনা। আর পড়ার মাঝখানে মনে পড়লে পরবর্তীটুকু বিধি মোতাবেক পড়বে।

● ইমামের পেছনে কিরাত পড়া

মূল বিধি হলো, সূরা ফাতিহা ছাড়া কোনো নামাযই শুদ্ধ হয়না। ইতিপূর্বে নামাযের ফরযের বিবরণে উল্লেখ করেছি যে, ফরয ও নফলের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। তবে প্রকাশ্য নামাযে মুক্তাদিদেরকে কিরাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তার শুধু চুপচাপ শোনা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তা শোনো ও চুপ থাকো। আশা করা যায়, তোমরা আল্লাহর রহমত লাভ করবে।" আর রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যখন ইমাম তকবীর দেয়, তোমরা তকবীর দিবে। আর যখন ইমাম কিরাত পড়বে তোমরা চুপ থাকবে। -মুসলিম। "যার ইমাম রয়েছে, ইমামের কিরাতই তার জন্য কিরাত" এ হাদিসটির বক্তব্যও একই। অর্থাৎ প্রকাশ্য নামাযে ইমামের কিরাতই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু গোপন নামাযে মুক্তাদির উপর কিরাত পড়া ওয়াজিব। অনুরূপ প্রকাশ্য নামাযে যদি ইমামের পড়া শুনতে না পায় তাহলেও তার কিরাত পড়া ওয়াজিব। আবু বকর ইবনুল আরাবীর মতে, গোপন নামাযে কিরাত পড়া ওয়াজিব এই মতটিই আমাদের নিকট অগ্রগণ্য। কেননা কিরাত ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত হাদিসগুলো সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে প্রকাশ্য নামাযে তিন কারণে কিরাত পড়া ঠিক নয় :

এক. এটা মদিনাবাসীর অনুসৃত নীতি।

দুই. কুরআনের হুকুম, "চুপ থাকো ও শোনো।

তিন. অগ্রগণ্যতা। ইমামের সাথে থেকে কিরাত পড়া অসম্ভব। কখন পড়বে? যদি, বলা হয়, ইমামের বিরতির সময়ে পড়বে, তবে বলবো : নিরবতা ইমামের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কাজেই সে কিভাবে যা ফরয নয় তাকে ফরয করবে? বিশেষত: যখন আমরা প্রকাশ্যে নামাযের

কিরাত পড়ার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি। সেটা হলো চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে মনে মনে পড়া। এটা কুরআন, হাদিস ও ইবাদতের পদ্ধতি, সুন্নতের অনুকরণ ও অগ্রগণ্যতাকে বাস্তব রূপদান। যুহরী, ইবনুল মুবারক মালেক, আহমদ, ইসহাক ও ইবনে তাইমিয়ার অভিমত এটাই।

৮. উঠা বসা তাকবীর

নামাযে প্রতিবার উঁচু ও নিচু হওয়া, দাঁড়ানো ও বসার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কেবল রুকু থেকে উঠার সময় বলবে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা'। ইবনে মাসউদ বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.কে প্রতিবার উঁচু নিচু হওয়া এবং দাঁড়ানো ও বসার সময় আল্লাহু আকবার বলতে শুনেছি। -আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযি। আবু বকর, উমর, উসমান, আলী প্রমুখসহ রসূল সা. এর সাহাবিগণ, তাদের পরবর্তী তাবেয়ীগণ, ফকীহগণ ও আলেমগণ এই মতেরই অনুসারী। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন নামায পড়তে ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, পুনরায় রুকুতে যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, তারপর রুকু থেকে পিঠ উত্তোলনের সময় বলতেন : 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তারপর সাজদায় যাওয়ার সময় আবার বলতেন, আল্লাহু আকবার, পুনরায় সাজদা থেকে মাথা তোলার সময় বলতেন : আল্লাহু আকবার, পুনরায় দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়ানোর সময় বলতেন আল্লাহু আকবার, এভাবে নামায শেষ হওয়া অবধি প্রত্যেক রাকাতে করতেন। দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ রকমই ছিলো রসূলুল্লাহ সা. এর নামায। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ। ইকরামা বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম : আমি উপত্যকায় জনৈক নির্বোধ বুড়োর পেছনে যোহরের নামায পড়লাম। তিনি নামাযে বাইশটি তাকবীর দিলেন। সাজদায় যাওয়ার সময় ও সাজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর দিলেন। ইবনে আব্বাস বললেন : ওটা তো আবুল কাসেম রসূলুল্লাহ সা. এর নামায। -আহমদ, বুখারি। এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যাওয়া শুরু করার সময় তাকবীর শুরু করা মুস্তাহাব।

৯. রুকুর পদ্ধতি

রুকুতে হাঁটুতে হাত দিয়ে ধরা যায় এতোটুকু নিচ হওয়া ওয়াজিব। তবে সুন্নত হলো, মাথা ও শরীরের পশ্চাৎ ভাগকে সমান্তরাল করা। দু'হাতকে দুই পাঁজর থেকে দূরে রেখে দু'হাত দিয়ে হাঁটুর উপর ভর দেয়া। হাঁটু ও পায়ের নলির উপর হাতের আংগুল ছড়িয়ে দেয়া এবং পিঠকে বিস্তৃত করা। উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত :

তিনি নিজের হাত দু'খানা পাঁজর থেকে দূরে রেখে তা হাঁটুর উপর স্থাপন করে এবং হাঁটুর উপর আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে রুকু দিলেন। তারপর তিনি বললেন : আমি রসূল সা.কে এভাবেই নামায পড়তে দেখেছি। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী। আর আবু হামিদ বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখনই রুকু দিতেন, শরীরকে সমান্তরাল রাখতেন, মাথাকে নিচের দিকে ও ঝুঁকাতেন না, উপরের দিকেও তুলতেন না, আর হাত দু'খানা হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখতেন, যেনো হাঁটুকে জাপটে ধরেছেন। -নাসায়ী। সহীহ মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন রুকু দিতেন, মাথা উঁচুও করতে না নিচুও করতেন না। বরং এর মাঝামাঝি থাকতেন। আর আলী রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন রুকু দিতেন, তখন তাঁর পিঠের উপর যদি এক পেয়ালা পানি রেখে দেয়া হতো, তবে তা পড়তোনা। (পিঠ এতোটি সোজা থাকতো)। -আহমদ, আবু দাউদ, মুসয়াব বিন সা'দ বলেছেন : আমি আমার পিতার পাশে নামায পড়লাম। রুকুতে আমি আমার দু'হাত দুই উরুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

তারপর বললেন : আমরা এ রকম করতাম এবং আমাদেরকে আদেশ দেয়া হলো যেনো আমাদের হাত হাঁটুর উপর রাখি। -সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ।

১০. রুকুর যিক্‌র

রুকুতে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" পড়া মুস্তাহাব। উকবা বিন আমের বলেন : যখন নাযিল হলো : "ফাসাব্বিহ বিস্‌মি রব্বিকাল আযীম" (সূরা ওয়াকেয়ার শেষ আয়াত) (অর্থাৎ তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো) তখন রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : তোমরা এই তস্‌বিহ্‌টি তোমাদের রুকুতে চালু করো।" -আহমদ, আবু দাউদ। হুযায়ফা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি রুকুতে পড়তেন : সুবহানা রব্বিয়াল আযীম। -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। কতিপয় দুর্বল সূত্র থেকে এই দোয়াটিও জানা যায় : "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম ওয়া বিহামদিহী।" শওকানী বলেন : এ হাদিসের সূত্রগুলো দুর্বল হলেও পরস্পরকে শক্তি যোগায়। নামাযী রুকুতে উক্ত দোয়াটি পড়েই শেষ করতে পারেন, অথবা নিম্নোক্ত দোয়াগুলোর কোনো একটিও তার সাথে যুক্ত করতে পারেন :

১. আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. যখন রুকুতে যেতেন বলতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমি তোমার জন্য রুকু করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, তুমি আমার প্রতিপালক, আমার কান, চোখ, মগজ, হাড়, শিরা, স্নায়ু ও পেশি সবই তোমার অনুগত। আর আমার পা যেটুকুই চলে, তা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ।

২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. রুকু ও সাজদায় গিয়ে বলতেন :

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

অর্থ : তুমি তোমার জন্য যা কিছু অনুপযোগী ও অশোভন তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তুমি সকল ফেরেশতা ও রূহের (জিবরাঈলের) প্রভু।"

৩. আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী থেকে বর্ণিত : আমি এক রাতে রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারা পড়লেন। রুকুতে তিনি বললেন :

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

অর্থ : সকল শক্তি, প্রতাপ, রাজত্ব, বড়ত্ব ও মহত্ত্বের মালিক, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী।

৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. রুকু ও সাজদায় প্রায়ই পড়তেন :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ্, তোমার পবিত্রতা ঘোষণ করছি, তোমার প্রশংসা করছি, হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করো।" আল্লাহর বাণী, "তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করো ও ক্ষমা প্রার্থনা করো" অনুসারেই তিনি এটা পড়তেন। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম ইত্যাদি।

১১. রুকুতে উঠা ও সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময়ের যিক্‌র

নামাযী- চাই সে ইমাম হোক, মুক্তাদি হোক, কিংবা একাকী হোক, রুকু থেকে উঠার সময় বলবে, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শ্রবণ করেন)। তারপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তখন বলবে :

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "রাব্বানা লাকাল হামদ" (হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা) অথবা, اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ"। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. রুকু থেকে উঠার সময় বলতেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ", তারপর দাঁড়ানো অবস্থায়ই পুনরায় বলতেন : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ"। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম। বুখারিতে আনাসের রা. হাদিসে রয়েছে : ইমাম যখন বলে : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ", তখন তোমরা বলো : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।" এ জন্য অনেক আলেম মনে করেন : মুক্তাদি সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবেনা। বরং ইমামকে যখন এটা বলতে শুনবে, তখন বলবে, اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।" আর আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদিস মুসনাদ আহমদ ইত্যাদিতে রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইমাম যখন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, বলবে, তখন তোমরা বলো : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" কেননা যার একথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলিত হবে, তার অতিতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ সা. এর কথা "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো, সেভাবে নামায পড়ো" থেকে বুঝা যায়, "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" ও "রাব্বানা লাকাল হামদ" দুটোই প্রত্যেক নামাযীকে বলতে হবে যদিও সে মুক্তাদি হয়। যারা বলেন, মুক্তাদি উভয়টা বলবেনা, শুধু রব্বানা লাকাল হামদ বলবে, তাদের পক্ষ থেকে ইমাম নববীর জবাব এরূপ : "আমাদের ইমামগণ বলেছেন : হাদিস "ইমাম যখন বলে, সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, তখন তোমরা বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ" এর অর্থ হলো : তোমরা রব্বানা লাকাল হামদ বলো, সেই সাথে তোমাদের জানা কথা সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাও বলো। শুধু আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ এর উল্লেখ করার কারণ হলো, মুক্তাদিগণ রসূল সা. এর প্রকাশ্যে বলা কথা 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' শুনতে পেতো। কারণ, ওটা প্রকাশ্যে বলাই সুন্নত। তারা তাঁর বলা "রাব্বানা লাকাল হামদ" শুনতোনা। কারণ তিনি ওটা গোপনে বলতেন। লোকেরা রসূল সা. এর "আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো, সেভাবে নামায পড়ো" একথা জানতো এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের নীতিও তাদের জানা ছিলো এবং তা করতে তারা অভ্যস্ত ছিলো। সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা কথাটা তো তারা সাথে সাথেই উচ্চারণ করতো। কাজেই তার জন্য আদেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিলনা। তারা রাব্বানা লাকাল হামদ জানতোনা। তাই এটির জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় কমের পক্ষে যেটুকু বলা দরকার, সেটুকু হলো রব্বানা লাকাল হামদ বা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। এর উপর নিম্নোক্ত হাদিসগুলো অনুযায়ী আরো একটু বাড়িয়ে বলা মুস্তাহাব :

১. রিফায়া বিন রাফে বলেছেন : "একদিন আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বললেন, তখন পেছনের এক ব্যক্তি বললো : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

অর্থ : হে আমাদের প্রভু, তোমার জন্য সকল প্রশংসা, প্রচুর পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা।

নামায শেষ হলে যখন রসূলুল্লাহ সা. মুখ ফিরালেন, তখন বললেন : এই মাত্র নামাযে কে এই এই কথা বলেছিল? লোকটি বললো : হে রসূল, আমি। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আমি দেখলাম, ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন ফেরেশতা প্রতিযোগিতা করছে কে আগে এটি লিখবে। -আহমদ, বুখারি, মালেক, আবু দাউদ।

২. আলী রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. রুকু থেকে মাথা তুলে বলতেন :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তা শোনেন, হে আমাদের প্রভু, তোমার জন্য সকল প্রশংসা, আকাশ, পৃথিবী ও তার মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর সমান প্রশংসা এবং তোমার ইচ্ছামত পরবর্তী যে কোনো জিনিসের সমান প্রশংসা। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি।

৩. আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. রুকু থেকে মাথা তুলে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَنَقِّنِيْ مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আকাশ সমান পৃথিবী সমান এবং এরপর আর যে জিনিস তুমি চাও তা জিনিস সমান প্রশংসা তোমার জন্য। হে আল্লাহ, আমাকে বরফ দিয়ে, তুষার দিয়ে ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পবিত্র করো। হে আল্লাহ, সাদা কাপড় যেভাবে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়, আমাকে গুনাহ থেকে সেভাবে পবিত্র ও পরিষ্কার করো।" -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। এ দোয়ার তাৎপর্য হলো, পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রার্থনা।

৪. আবু সাঈদ খুদরী বলেন, রসূলুল্লাহ সা. যখনই বলতেন, সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, তখনই বলতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ، مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, তোমার জন্য সমস্ত আকাশ জোড়া, পৃথিবী জোড়া এবং এরপর যে জিনিস তুমি চাও সে নিজিস জোড়া প্রশংসা। হে প্রশংসা ও মহিমার মালিক, বান্দা যা বলে তার সর্বাধিক যোগ্য তুমিই, আমরা সবাই তোমার বান্দা। যা তুমি দাও তা কেউ রুখতে পারেনা। যা তুমি দাওনা, তা কেউ দিতে পারেনা। কোনো ভাগ্যবান, মর্যাদাবান ও ধনবানকে তার ভাগ্য, মর্যাদা ও ধনসম্পদ কোনো উপকার করতে পারেনা, (কেবল সৎকর্মই তার উপকার করতে পারে)। -মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ।

৫. বিশুদ্ধ সনদে এও বর্ণিত আছে : তিনি "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ"র পর সোজা দাঁড়িয়ে বলতেন : لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ "লি রব্বিল হাম্‌দ, লি রব্বিল হামদ"। তাঁর রুকু যতো দীর্ঘ হতো, ততোটাই দীর্ঘ হতো তার সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

১২. সাজদায় অবনত হওয়া

অধিকাংশ আলেমের মতে, হাতের আগে হাঁটু মাটিতে রাখা মুস্তাহাব। ইবনুল মুনযির বলেছেন : এটি উমর নাখয়ী, মুসলিম বিন ইয়াসার, সুফিয়ান সাওরী, আহমদ, ইসহাক ও আসহাবুর রায়

অর্থাৎ স্বাধীন মতাবলম্বী মুজতাহিদদের অভিমত। ইবনুল মুনযির নিজেও এই মত পোষণ করেন। আবুত তাইয়্যিব বলেন : এটা অধিকাংশ ফকীহর অভিমত। ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. হাতের আগে হাঁটু রাখতেন, তারপর দু'হাত রাখতেন, তারপর কপাল ও নাক রাখতেন। এটাই সঠিক। ওয়ায়েল বিন হাজার বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. কে দেখেছি, সাজদা দিতে গিয়ে প্রথমে হাঁটু ও পরে হাত রাখতেন। আর উঠার সময় প্রথমে হাত ও পরে হাঁটু উঠাতেন। এর বিপরীত কিছু তাঁর কাজে কেউ দেখেনি। মালেক, আওযায়ী ও ইবনে হাযম হাঁটুর আগে হাত রাখা মুস্তাহাব মনে করেন। আহমদ থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনাও অদ্রূপ। আওযায়ী বলেছেন : আমি দেখেছি, লোকেরা প্রথমে হাত ও পরে হাঁটু রাখতো। ইবনে আবি দাউদ বলেছেন : এটাই হাদিস বিশারদদের অভিমত। সাজদা থেকে দ্বিতীয় রাকাতে উঠে দাঁড়ানোর পদ্ধতিও অদ্রূপ বিপরীত। অধিকাংশের মতে, প্রথমে হাত ও তারপর হাঁটু তুলতে হবে। অন্যদের মতে, প্রথমে হাঁটু ও পরে হাত তুলবে।

১৩. সাজদার নিয়ম

সাজদাকারীর উচিত নিম্নোক্ত নিয়মাবলী মেনে সাজদা করা :

১. নাক, কপাল ও দু'হাত মাটিতে রাখা চাই এবং দু'হাতকে পাঁজর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা চাই। ওয়ায়েল বিন হাজার বলেছেন : "রসূল সা. যখন সাজদা করতেন, দুই হাতের তালুর মাঝখানে কপাল রাখতেন। আর বোগলকে উন্মুক্ত রাখতেন। -আবু দাউদ। আর আবু হোমায়েদ বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন সাজদা করতেন, নাক ও কপাল মাটিতে রাখতেন, হাত দু'খানা পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন এবং হাতের তালু রাখতেন কাঁধ বরাবর।" -ইবনে খুযায়মা, তিরমিযি।

২. দু'হাতের তালু দুই কান অথবা ঘাড় বরাবর রাখতে হবে। কোনো কোনো আলেম এই উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন বুড়ো আংগুলের প্রান্তভাগ কান বরাবর ও হাতের তালুকে ঘাড় বরাবর রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করার মাধ্যমে।

৩. আংগুলগুলোকে মিলিত রেখে ছড়িয়ে রাখবে। হাকেম ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন রুকু দিতেন, আংগুলগুলোর মাঝে ফাঁকা রাখতেন, আর যখন সাজদা দিতেন, তখন আংগুলগুলো মিলিয়ে রাখতেন।

৪. আংগুলগুলোর মাথা কিবলামুখি রাখবে। বুখারি আবু হোমায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন সাজদা দিতেন, তখন হাত দুটো মাটিতে বিছিয়েও দিতেননা, গুটিয়েও রাখতেননা, আর পায়ের আংগুলগুলোর প্রান্তভাগকে কিবলামুখি রাখতেন।

১৪. সাজদার অবস্থানকাল ও যিক্‌র

সাজদাকারীর জন্য সাজদায় গিয়ে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (আমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের গুণকীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি) পড়া মুস্তাহাব। উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেন, যখন নাযিল হলো : "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" (তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করো) তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমরা এটিকে তোমাদের সাজদায় স্থাপন করো।" -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম। হুযায়ফা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. সাজদায় বলতেন : "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা।" -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। আর রুকু সাজদার তাসবীহ তিনবারের চেয়ে কম পড়া অনুচিত। তিরমিযি বলেন : আলেমদের নিকট এই মতটিই অনুসরণীয়। তারা কমের পক্ষে তিনবার তাসবীহ পড়া

মুস্তাহাব মনে করেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, ন্যূনতম একবার তাসবীহ্ পড়া রুকূ ও সাজদার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট। আগেই বলেছি, সাজদায় ধীর স্থির ও শান্তভাবে অবস্থান গ্রহণ ফরয। কমপক্ষে একবার তাসবীহ্ পড়লে তা হওয়া সম্ভব বলে ধরে নেয়া হয়।

তবে পূর্ণাংগ তাসবীহ্ কোনো কোনো আলেমের মতে দশ তাসবীহ্ পাঠে সম্পন্ন হয়। কেননা আনাস রা. বলেন : রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে এই যুবকের চাইতে অর্থাৎ উমর বিন আবদুল আযীযের চাইতে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়তে কাউকে দেখিনি। আমাদের অনুমান, সে রুকুতে দশবার ও সাজদায় দশবার তাসবীহ্ পড়ে। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী। শওকানী বলেছেন : যারা বলেছেন, দশবার পড়লে পূর্ণাংগ তাসবীহ্ হয়, তাদের জন্য এ হাদিসে প্রমাণ রয়েছে। তবে সবচেয়ে নির্ভুল কথা হলো, যে ব্যক্তি একাকী নামায পড়ে, সে যতোবার ইচ্ছা তাসবীহ্ পড়তে পারে এবং যতো বেশি পড়ে, ততোই ভালো। বহু সহীহ্ হাদিসে এ ধরনের নামাযীর নামায দীর্ঘয়িত করার পক্ষে বলা হয়েছে। যদি মুক্তাদিদের কষ্ট না হয়, তবে ইমামও তা করতে পারে। ইবনে আবদুল বার বলেন : প্রত্যেক ইমামেরই নামায সংক্ষিপ্ত করা উচিত, কেননা রসূল সা.-এর এ ব্যাপারে আদেশ রয়েছে। এমনকি মুক্তাদিরা যথেষ্ট সতেজ ও সবল হলেও সংক্ষিপ্ত করা উচিত। কেননা কখন কার কি সমস্যা দেখা দেয়, তা কেউ জানেনা। দীর্ঘায়িত নামাযে কারো পেশাব পায়খানার প্রয়োজন বা অন্য কোনো ধরনের আকস্মিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইবনুল মুবারক বলেছেন : ইমামের জন্য পাঁচবার তাসবীহ্ পড়া মুস্তাহাব, যাতে পেছনের লোকেরা অন্তত: তিনবার পড়বার সুযোগ পায়। নামায আদায়কারীর জন্য শুধু তাসবীহ্ পড়ে ক্ষান্ত না থেকে সাধ্যমত অন্যান্য দোয়াও পড়া মুস্তাহাব। সহীহ্ হাদিসে রয়েছে :

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "তোমরা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে থাকো সাজদায় থাকা অবস্থায়। কাজেই সাজদায় বেশি করে দোয়া করো"। তিনি আরো বলেছেন : জেনে রাখো, আমাকে রুকু ও সাজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। রুকুতে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো। আর সাজদায় বেশি করে দোয়া করো। আশা করা যায়, তা কবুল হবে। -আহমদ, মুসলিম। এ বিষয়ে বহু হাদিস রয়েছে, যার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

১. আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. যখন সাজদায় যেয়ে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ، فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

অর্থ : হে আল্লাহ্, তোমার জন্য সাজদা করলাম, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, আমার মুখমণ্ডল সাজদা করেছে তার সৃষ্টিকর্তার সামনে, যিনি তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন এবং তার কান ও চোখ সৃষ্টি করেছেন। সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ্ মহা কল্যাণময়।" -আহমদ, মুসলিম।

২. ইবনে আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ্ সা. এর তাহাজ্জুদের নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তিনি নামায পড়তে গেলেন। নামায পড়লেন এবং নামাযে বা সাজদায় বলতে লাগলেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَتَحْتِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا.

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমার হৃদয়ে নূর (আলো) দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার ডানে নূর দাও, নিচে নূর দাও এবং আমার জন্যে নূর বানিয়ে দাও। -মুসলিম, আহমদ। নববী বলেন : তিনি তাঁর সকল অংগে ও সর্বদিকে নূর চেয়েছেন, যার অর্থ সত্য ও

সঠিক পথ প্রদর্শন। তিনি তাঁর সকল অংগে, দেহে, সকল কাজে ও আচরণে, সকল অবস্থায় ও সকল দিকে আলো চেয়েছেন, যাতে কোনো জিনিসই দৃষ্টির আড়ালে না যেতে পারে।

৩. আয়েশা রা. বলেছেন : একদিন তিনি দেখলেন, রসূল সা. বিছানায় শায়িত নেই। হাত দিয়ে তাকে খুঁজে দেখলেন তিনি সাজদায়। সাজদায় তিনি বলছেন :

رَبِّ أَعْطِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সংযম দাও, আমাকে পবিত্র করো, তুমিই সর্বোত্তম পবিত্রকারী, তুমি আমার অভিভাবক ও মনিব।" -আহমদ

৪. আবু হুরায়রা বলেছেন, রসূল সা. সাজদায় বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার ছোট ও বড়, পূর্বের ও পরের, গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করো। -মুসলিম, আবু দাউদ, হাকেম।

৫. আয়েশা রা. বলেছেন : একদিন রাতে রসূল সা.কে হারিয়ে ফেলেছিলাম, পরে তাঁকে মসজিদে পেলাম। দেখলাম, তিনি সাজদায় আছেন, আর বলছেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার রুষ্টতা থেকে সন্তুষ্টির নিকট, তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার নিকট এবং তোমার কাছ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারিনা। তুমি নিজের যে রকম প্রশংসা করেছো, তুমি সে রকমই। -মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : একদিন রাতে তিনি রসূল সা.কে হারিয়ে ফেললেন : ভাবলেন, তিনি তার অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গেছেন। পরে তাঁকে খুঁজে পেলেন। দেখলেন, তিনি রুকুতে বা সাজদায় রয়েছেন। তিনি বলছেন : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ،

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি ও প্রশংসা করি। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।" তখন তিনি রসূল সা.কে বললেন : আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি এক অবস্থায়, আর আমি আর এক অবস্থায়। (অর্থাৎ আপনি কী করছিলেন, আর আমি কী ভাবছিলাম)। -আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী।

৭. সাজদায় তিনি বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ، وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ، وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ. أَنْتَ إِلٰهِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার ভুল ত্রুটি ও অজ্ঞতা ক্ষমা করো। আমার অবিবেচনা প্রসূত কাজ ক্ষমা করো। আর তুমি যা আমার চেয়েও বেশি জানো তাও ক্ষমা করো। হে আল্লাহ, আমার স্বাভাবিক অবস্থায় বা তামাসাচ্ছলেকৃত গুনাহ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গুনাহ ক্ষমা করো। সবই আমার রয়েছে। হে আল্লাহ! আমি যে গুনাহ আগে বা পরে, গোপনে বা প্রকাশ্যে করেছি, তা ক্ষমা করো। তুমি আমার ইলাহ। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

১৫. দুই সাজদার মাঝে বৈঠক ও দোয়া

দুই সাজদার মাঝের বৈঠকের সুন্নত হলো, বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে, আর ডান পা খাড়া করে রাখবে এবং ডান পা'র আংগুলগুলোর মাথা কিবলার দিকে রাখবে। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ্ সা. তার বাম পা বিছিয়ে রাখতেন, আর ডান পা খাড়া রাখতেন। -বুখারি, মুসলিম। আর ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : নামাযের সুন্নত হলো, ডান পা খাড়া করে তার আংগুলগুলো কিবলামুখি রাখতে হবে। আর বাম পা'র উপর বসতে হবে। -নাসায়ী। নাফে বলেন : ইবনে উমর যখন নামায পড়তেন, তখন তার সবকিছু কিবলামুখি থাকতো, এমনকি তার পাদুকাদ্বয়ও। আবু হোমায়েদ বলেন : রসূল সা. তার বাম পা'কে বিছিয়ে তার উপর বসতেন অতপর সকল অংগকে সমন্বিত করতেন। ফলে প্রতিটি হাড় যথাস্থানে চলে যেতো। অতপর তিনি সাজদায় যেতেন। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি।

কোনো কোনো হাদিসে 'ইক্'য়া'কেও মুস্তাহাব বলা হয়েছে। ইক্'য়া' (إقعاء) হচ্ছে দুই পা মাটিতে বিছিয়ে দু'পায়ের গোড়ালির উপর বসা। আবু উবায়দা বলেন : এটা আহলুল হাদিস (হাদিস বিশারদদের) অভিমত। আবুয্ যুবাইর বলেন : তিনি তাউসকে বলতে শুনেছেন : আমরা ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম দু'পা বিছিয়ে তার উপর বসা সম্পর্কে। তিনি বললেন : এটা সুন্নত। আমরা বললাম : আমরা তো এটাকে পায়ের উপর কষ্ট দেয়া হিসেবে দেখছি। ইবনে আব্বাস বললেন : এটা তোমার নবীর সা. সুন্নত। -মুসলিম।

আর ইবনে উমর থেকে বর্ণিত : তিনি যখন প্রথম সাজদা থেকে মাথা তুলতেন, তাঁর দুপায়ের আংগুলের মাথার উপর বসতেন এবং বলতেন : এটা সুন্নত। তাউস বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে ইক্'য়া' করতে দেখেছি। -বায়হাকি। এক ধরনের ইক্'য়া আছে- নিতম্বদ্বয় মাটিতে রেখে উরুদ্বয়কে খাড়া করে রাখা। এটা সর্বসম্মতভাবেই মাকরূহ। আবু হুরায়রা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে তিনটে কাজ করতে নিষেধ করেছেন : (সাজদা করতে গিয়ে) মোরগের ঠোকরের মতো ঠোকর দেয়া। কুকুরের মতো পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা, আর শেয়ালের মতো এদিক ওদিক তাকানো। -আহমদ, বায়হাকি, তাবারানি, আবু ইয়ালা। দুই সাজদার মাঝখানে বসার মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো, ডান উরুর উপর ডান হাত ও বাম উরুর উপর বাম হাত রাখা, আংগুলগুলোকে পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে দেয়া, মাঝখানে সামান্য ফাঁকা রাখা ও হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত করা।

নিম্নোক্ত দুটি দোয়ার যে কোনো একটি যতোবার ইচ্ছা দুই সাজদার মাঝখানে পড়া মুস্তাহাব : নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. দুই সাজদার মাঝে বলতেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো। ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. দুই সাজদার মাঝে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার উপর দয়া করো, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে জীবিকা দাও।

১৬. বিশ্রামের বৈঠক

এটি প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সাজদার শেষে ও দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে এবং

তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সাজদা শেষে ও চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠক। সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোর বিভিন্নতার কারণে এ সম্পর্কে আলেমদেরও মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়িম যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তা এখানে তুলে ধরছি : "এটা নামাযের একটা সুন্নত কিনা এবং প্রত্যেকেরই এটা করা মুস্তাহাব কিনা, অথবা শুধু প্রয়োজন হলেই করা যায় কিনা, এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ থেকে দুটো মত বর্ণিত হয়েছে। খাল্লাল বলেছেন, বিশ্রামের বৈঠক সম্পর্কে আহমদ মালেক ইবনুল হুয়াইরিসের বর্ণিত হাদিসের দিকে ফিরে এসেছেন এবং বলেছেন, ইউসুফ বিন মূসা জানিয়েছেন, আবু উমামাকে ওটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : দু'পায়ের বুকের উপর বসার কথা রিফায়ার হাদিসে রয়েছে। ইবনে আজলানের হাদিসে রয়েছে : তিনি তার দুই পায়ের বুকের উপর বসতেন। একাধিক সাহাবি এবং আর যারা রসূলুল্লাহর সা. নামাযের বিবরণ দিয়েছেন, তারা এ বৈঠকের উল্লেখ করেননি। এর উল্লেখ রয়েছে শুধু আবি হুমাইদ ও মালেক ইবনুল হুয়াইরিসের হাদিসে। এটা যদি রসূলুল্লাহর সা. রীতি হতো, তাহলে এটা তিনি সব সময় করতেন এবং তাঁর নামাযের বর্ণনাদানকারীরা এর উল্লেখ করতেন। শুধু রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক এ কাজ করার উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয়না যে, এটা নামাযের একটা সুন্নত। শুধু তখনই কোনো কাজ সুন্নত বলে গণ্য ও অনুকরণীয় হবে যখন জানা যাবে যে, তিনি নিজেও এটা করতেন এবং সাহাবীগণও এটি সুন্নত জেনে করতেন। তবে যখন অনুমিত হয় যে, তিনি এটা প্রয়োজন মনে করে করেছেন তখন এটির সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হয়না।

১৭. তাশাহহুদের জন্য বসার পদ্ধতি

তাশাহহুদের জন্য যখন বসা হবে, তখন তাতে নিম্নোক্ত সুন্নতগুলো মেনে চলতে হবে :
নিম্নোক্ত হাদিসগুলোতে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে হাত রাখতে হবে :

১. ইবনে উমর রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রেখে মুষ্টিবদ্ধ করতেন এবং তর্জনী আংগুল দিয়ে ইশারা করতেন। -মুসলিম। (হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বুড়ো আংগুলকে তর্জনীর নিচে দিয়ে মধ্যবর্তী সংযোগস্থলে রাখতেন।)

২. ওয়ায়েল বিন হাজার বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তাঁর বাম হাতের তালু তাঁর বাম হাঁটু ও উরুর উপর রাখতেন। ডান কনুই এর শেষপ্রান্ত ডান উরুর রেখে আংগুলগুলোকে গুটিয়ে একটা বৃত্ত বানাতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : বুড়ো ও মধ্যমা আংগুল দিয়ে বৃত্ত বানাতেন এবং তর্জনী আংগুল দিয়ে ইশারা করতেন। তারপর তার আংগুল উঁচু করতেন। আমি দেখেছি আংগুল নাড়িয়ে তা দিয়ে আহ্বান করতেন। -আহমদ, বায়হাকি বলেছেন : আংগুল নাড়ানোর অর্থ তা দ্বারা ইশারা করাও বুঝানো হতে পারে। বার বার নাড়ানো নয়, যাতে ইবনুয যুবায়েরের বর্ণনার অনুরূপ হয়। ইবনুয যুবাইর বর্ণনা করেন : রসূল সা. যখন দোয়া করতেন, আংগুল দিয়ে ইশারা করতেন। কিন্তু আংগুল নাড়াতেন না। -আবু দাউদ।

৩. যুবাইর রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন তাশাহহুদে বসতেন, তখন তার ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন। বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ইশারা করতেন এবং তার চোখ তার ইশারাকে অতিক্রম করতোনা। -আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী। এ হাদিস থেকে জানা যায়, ডান হাত শুধু উরুর উপর রাখলেই চলবে। গুটিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। আর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ইশারা করতে হবে। এও সুন্নত যেনো নামাযীর দৃষ্টি তর্জনীর ইশারা ছাড়িয়ে না যায়। এ হচ্ছে তিনটে বিশুদ্ধ পদ্ধতি। এর যে কোনো একটি অনুসরণ করা বৈধ।

ডান তর্জনী দিয়ে সামান্য ঝুকিয়ে ইশারা করবে সালাম ফেরানো পর্যন্ত। নুমাইর খিযায়ী বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.কে নামাযে বসা অবস্থায় দেখেছি, ডান হাত ডান উরুর উপর রেখেছেন। তর্জনী আংগুল উঁচু করে রেখেছেন। সেটি সামান্য ঝুঁকিয়ে দোয়া পড়তেন। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা। আর আনাস রা. বলেছেন : রসূল সা. সা'দকে দেখলেন, দু'আংগুল দিয়ে দোয়া পড়ছেন। তখন তিনি বললেন : ওহে সাদ! এক আংগুল দিয়ে। (অর্থাৎ এক আংগুল দিয়ে ইশারা করো) -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম।

ইবনে আব্বাসকে আংগুল উঁচিয়ে ইশারা করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এটা হলো আল্লাহর একত্ব ঘোষণা। আনাস বলেছেন : ওটা হচ্ছে বিনয় প্রকাশ। মুজাহিদ বলেছেন : এ দ্বারা শয়তানকে ধিক্কার দেয়া হয়। শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে তর্জনী দিয়ে 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় একবার ইশারা করা হবে। আর হানাফীদের মতে, 'আশহাদু আন লা ইলাহা' বলার সময় তর্জনী উঁচু করতে হবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নামাতে হবে। আর মালেকীদের মতে, নামাযের শেষ পর্যন্ত তর্জনীকে ডানে বামে দোলাতে থাকতে হবে। হাম্বলী মাযহাব মতে, যখনই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হবে তখনি তর্জনী উঁচু করে আল্লাহর একত্বের দিকে ইশারা করা হবে। দোলানো বা নাড়ানো হবেনা।

প্রথম তাশাহহুদে দু'পা বিছিয়ে ও শেষ তাশাহহুদে বাম পা বিছিয়ে ও ডান পা খাড়া করে কিবলার দিকে আংগুলের মাথা রেখে এবং বাম পায়ের উপর নিতম্ব রেখে বসবে। আবু হুমাইদ বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন দু'রাকাতের শেষে বসতেন, বাম পার উপর বসতেন ও ডান পা খাড়া করে রাখতেন। শেষ রাকাতে যখন বসতেন, তখন তাঁর বাম পা বিছিয়ে ডান পার ভেতর দিয়ে বের করে দিতেন। ডান পা খাড়া করতেন ও নিতম্বের উপর বসতেন। -বুখারি।

১৮. প্রথম তাশাহহুদ

অধিকাংশ আলেমের মতে প্রথম তাশাহহুদ সুন্নত। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যুহরের নামাযে দাঁড়ালেন। একটা বৈঠকের দায়িত্ব তাঁর উপর ছিলো। (অর্থাৎ ছুটে গিয়েছিল) যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন দুটো সাজদা (সহু সাজদা) দিলেন। প্রত্যেক সাজদায় আল্লাহু আকবার বললেন। প্রতিবার তিনি বসে বসেই সাজদা দিলেন সালাম ফেরানোর পূর্বক্ষণে। তার সাথে জামাতের লোকেরাও সাজদা দিলো। তার সাজদা দুটি ছিলো ভুলে যাওয়া বৈঠকের বদলায়। -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। সুবুলুস সালাম গ্রন্থে বলা হয়েছে : এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, ভুলক্রমে প্রথম তাশাহহুদ ত্যাগ করলে সহু সাজদা দিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ করা যায়। রসূল সা. এর উক্তি "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো সেভাবে পড়ো" -এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম তাশাহহুদ ওয়াজিব। সেটা তরক করার ক্ষতিপূরণ দ্বারা এখানে প্রমাণিত হয়, ওটা ওয়াজিব হলেও সহু সাজদা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। এ দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায়না যে, এটা ওয়াজিব নয়, যতোক্ষণ এটা প্রমাণিত না হবে যে, ভুলক্রমে যে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলেই সহু সাজদা তার ক্ষতিপূরণে যথেষ্ট হয়।

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : ইবনুল বাত্তাল বলেছেন : সহু সাজদা যে ওয়াজিবের স্থলাভিষিক্ত নয় তার প্রমাণ হলো, কেউ তাকবীরে তাহরীমা ভুলে গেলে সহু সাজদা তার ক্ষতিপূরণ করেনা। তাশাহহুদও তদ্রূপ। তাছাড়া যেহেতু এটা একটা দোয়া, যা কোনো অবস্থায় প্রকাশ্যে করা হয়না, তাই এটা ওয়াজিব নয়। সূরা ফাতিহার পূর্বে যে প্রারম্ভিক দোয়া পড়া হয়; এটা তারই মতো। অন্যরা প্রমাণ দর্শান যে, জনগণ ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করেছিল

জেনেও রসূল সা. এর অব্যাহত অনুকরণকে সমর্থন করেছেন। তবে এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রথম তাশাহহুদকে যারা ওয়াজিব বলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন লাইছ বিন সা'দ, ইসহাক ও প্রসিদ্ধ মতানুসারে আহমদ। শাফেয়ীর মতও তাই। এক বর্ণনা অনুসারে হানাফীদের মতও তদ্রূপ। এর ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসেবে তাবারী বলেন, নামায প্রথমে দু'রাকাত হিসেবে ফরয হয়েছে। সেই নামাযে তাশাহহুদ ওয়াজিব ছিলো। পরে যখন নামায বাড়ানো হয়েছে, তখন বাড়ানোর কারণে ওয়াজিব রহিত হয়নি।

প্রথম বৈঠক দ্রুত শেষ করা মুস্তাহাব। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন প্রথম দুই রাকাত শেষে বসতেন, তখন মনে হতো, তিনি কোনো উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন। (অর্থাৎ অতি দ্রুত শেষ করতেন।) -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। তিরমিযি বলেন : আলেমগণ এই মত অনুসারেই কাজ করেন। তারা দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠককে দীর্ঘায়িত না করা এবং তাশাহহুদ ব্যতিত আর কিছু না পড়া পছন্দ করেন। ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, তিনি প্রথম তাশাহহুদে দরূদ পড়েছেন বলে কোনো সূত্রে বর্ণিত হয়নি। এমনও জানা যায়নি যে, তিনি এ বৈঠকে কবরের আযাব, দোযখের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চেখেছেন। যারা এগুলোকে মুস্তাহাব মনে করেছে, তারা এগুলোর সাধারণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি থেকেই করেছেন। নতুবা এগুলো পড়ার সুনির্দিষ্ট স্থান যে শেষ বৈঠক, তা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত রয়েছে।

১৯. রসূল সা. এর প্রতি সালাত পাঠ

শেষ তাশাহহুদের বৈঠকে রসূলুল্লাহ সা. এর উপর সালাত (দরূদ) পড়া মুস্তাহাব। দরূদ হিসেবে নিম্নের যে কোনো একটি পড়া যেতে পারে :

১. আবু মাসউদ বাদরী বলেছেন, বশীর বিন সা'দ বললো : হে রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তো আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পাঠানোর হুকুম দিয়েছেন। আমরা কিভাবে দরূদ পাঠাবো? রসূল সা. চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, তোমরা বলবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ, মুহাম্মদের উপর এবং মুহাম্মদের অনুসারী পরিবার পরিজনের উপর রহমত প্রেরণ করো। যেমন রহমত প্রেরণ করেছ ইবরাহীমের পরিবার পরিজনের উপর। আর বরকত পাঠাও মুহাম্মদের উপর এবং মুহাম্মদের অনুসারী পরিবার পরিজনের উপর। যেমন জগতের মধ্যে ইবরাহীমের পরিবার পরিজনের উপর বরকত পাঠিয়েছ। তুমিতো চির প্রশংসিত মহিমান্বিত।' আর সালাম বলবে তোমাদের যেমন জানা আছে। – মুসলিম, আহমদ।

২. কা'ব বিন উজরা বলেছেন, আমরা বললাম : হে রসূলুল্লাহ আপনাকে কিভাবে সালাম করতে হয়, তাতো জানি। আপনার উপর দরূদ পাঠাবো কিভাবে? তিনি বললেন, তোমরা বলবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। রসূলুল্লাহ সা. এর উপর দরূদ পাঠানো যে ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব, তা তিরমিযি, আহমদ ও আবু দাউদে ফুযালা থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রমাণিত।

রসূলুল্লাহ সা. শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি নামাযে দোয়া করছে। কিন্তু সে রসূলুল্লাহ সা. এর উপর দরূদ পাঠায়নি। রসূলুল্লাহ সা. মন্তব্য করলেন : এই ব্যক্তি খুব দ্রুত নামায শেষ করে ফেলেছে। তারপর তাকে ডাকলেন। তারপর তাকে বা অন্য কাউকে বললেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা তারপর নবীর উপর দরূদ অতপর যা ইচ্ছা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।' আল-মুনতাকার গ্রন্থকার বলেছেন : এ হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দরূদ ফরয নয়। কেননা রসূল সা. দরূদ ত্যাগকারীকে নামায পুনরায় পড়তে হুকুম দেননি। এটা আরো সমর্থিত হয় ইবনে মাসউদের হাদিস দ্বারা। যাতে তাশাহহুদের বিবরণ দেয়ার পর বলা হয়েছে : "এরপর যা ইচ্ছা আল্লাহর কাছে চাইতে পারো" শওকানী বলেছেন : দরূদকে যারা ওয়াজিব বলে, তাদের পক্ষে আমি কোনো প্রমাণ পাইনি।*

২০. শেষ তাশাহহুদের পরের ও সালামের পূর্বের দোয়া

তাশাহহুদের পরে এবং সালামের পূর্বে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ চেয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিলেন। তারপর তাশাহহুদের শেষে বললেন, এরপর আমরা যা ইচ্ছা চাইতে পারি। -মুসলিম।

সালামের পূর্বে দোয়া করা শর্তহীনভাবে মুস্তাহাব। হাদিস থেকে পাওয়া দোয়া বা স্বতন্ত্র কোনো দোয়া পড়লেও মুস্তাহাব আদায় হবে। তবে হাদিস থেকে পাওয়া দোয়া পড়া উত্তম। হাদিস থেকে যেসব দোয়া পাওয়া গেছে, তার কয়েকটি উল্লেখ করছি :

১. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা শেষ তাশাহহুদ পড়ার পর চারটে জিনিস থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে বলবে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার আশ্রয় চাইছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। –মুসলিম।

২. আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. নামাযে এভাবে দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে, জীবন ও মৃত্যুর সকল ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, আমি গুনাহ থেকে ও ঋণ থেকে তোমার আশ্রয় চাই। –বুখারি, মুসলিম।

৩. আলী রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন নামায পড়তেন, তাশাহহুদ ও সালাম ফেরানোর মাঝে তাঁর সর্বশেষ দোয়া ছিলো :

---

* দরূদের আরবি 'সালাত'। আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি সালাত পাঠানোর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সা.কে প্রশংসা করা, সম্মান দেয়া, আর ফেরেশতাদের সালাত পাঠানোর অর্থ তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত পাঠানোর দোয়া করা। মূল 'আল' (آل) শব্দের অর্থ পরিবার পরিজন। কেউ বলেন : এ দ্বারা বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব বুঝায়, যাদের উপর যাকাত সদকা গ্রহণ হারাম। কারো মতে, এর অর্থ তার বংশধর। কারো মতে, কিয়ামত পর্যন্ত তার উম্মত ও অনুসারী। অনেকের মতে, উম্মতের সৎ লোকেরা। তবে সমগ্র উম্মত– এই অর্থটাই অগ্রগণ্য।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ، وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার আগের ও পরের, গোপন ও প্রকাশ্য, সীমালংঘনজনিত এবং আমার চেয়েও তুমি বেশি জানো এমন সকল গুনাহ মাফ করে দাও। তুমি এগিয়ে দাও এবং তুমি পিছিয়ে দাও। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। –মুসলিম।

৪. আব্দুল্লাহ বিন উমর বলেন, আবু বকর রসূলুল্লাহ সা. কে বললেন, নামাযে পড়াবো এমন একটি দোয়া আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, বলো :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। (অর্থাৎ অনেক গুনাহ করেছি) আর তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারেনা। সুতরাং তুমি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর করুণা করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়। –বুখারি, মুসলিম।

৫. হানযালা বিন আলী থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন এক ব্যক্তি নামাযের শেষ পর্যায়ে এসে তাশাহহুদের পরে বলছে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ يَا اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ، اَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ, হে এক ও অদ্বিতীয়, অভাবশূন্য, যার কোনো সন্তান নেই। যিনি কারো পিতা নন এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই। তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করছি আমার গুনাহগুলো মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়।" রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "তাকে ক্ষমা করা হয়েছে।" কথাটা তিনি তিনবার বললেন। –আহমদ, আবু দাউদ।

৬. শাদ্দাদ বিন আউস রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তাঁর নামাযে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْاَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَاَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দীনের উপর অবিচল থাকা, সততার উপর অটল থাকা, তোমার নিয়ামতের শোকর আদায় করা এবং উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করার তওফিক চাই। আর তোমার কাছে চাই একটা পবিত্র মন ও সত্যবাদী জবান। তুমি যা ভালো বলে জানো তোমার কাছে তা চাই, আর তুমি যা খারাপ বলে জানো, তা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আর আমার গুনাহর কথা তুমি জানো, তা তোমার নিকট ক্ষমা চাই। –নাসায়ী

৭. আবু মিজলায বলেন : আম্মার বিন ইয়াসার আমাদেরকে নামায পড়ালেন, কিন্তু খুব সংক্ষিপ্তভাবে পড়ালেন। লোকেরা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করলো। তিনি বললেন : আমি কি পূর্ণাংগভাবে রুকু ও সাজদা করিনি? লোকেরা বললো : হা, করেছেন। তিনি বললেন : দেখো, আমি নামাযে এমন একটি দোয়া পড়েছি, যা রসূলুল্লাহ সা. পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ. أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلٰى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ، وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

অর্থ : হে আল্লাহ, তোমার অদৃশ্য জ্ঞান ও সৃষ্টির ক্ষমতার শপথ, আমাকে ততোদিন জীবিত রাখো, যতোদিন বেঁচে থাকা তুমি আমার জন্য ভালো বলে জানো। আর আমাকে তখনই মৃত্যু দিও, যখন মৃত্যু আমার জন্য ভালো হবে বলে জানো। আমাকে তওফীক দাও যেনো গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমাকে ভয় করি, ক্রোধ ও সন্তোষ– উভয় অবস্থায় যেনো ন্যায় কথা বলি, অভাব ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থায় যেনো মধ্যম ব্যয়ের পথ অবলম্বন করি, আর তোমার চেহারার দিকে তাকানোর আনন্দ এবং তোমার সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা যেনো আমার পূর্ণ হয়। আমি তোমার আশ্রয় চাই ক্ষতিকর বিপদ মুসিবত থেকে এবং বিপথগামী করে দেয় এমন কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ঈমান দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করো এবং আমাদেরকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানাও। –আহমদ, নাসায়ী

৮. আবু সালেহ থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে বললেন : নামাযে কী কী পড়ো? সে বললো : তাশাহহুদ পড়ি, তারপর বলি : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট জান্নাত চাই, দোযখ থেকে আশ্রয় চাই।" অতপর লোকটি বললো, আপনি ও মুযায় আর যেসব দুর্বোধ্য দোয়া পড়েন, আমি তা ভালো পড়তে পারিনা। রসূল সা. বললেন : এই দুটোই তুমি পড়তে থাকো। –আহমদ, আবু দাউদ।

৯. ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. তাকে এই দোয়া শিখিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا، وَأَصْلِحْ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ. وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِيْنَ بِهَا وَقَابِلِيْهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা দাও, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন করে দাও, আমাদেরকে শান্তির পথ দেখাও। আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর দিকে নিয়ে যাও। গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করো। আমাদের চোখে, কানে, হৃদয়ে আমাদের স্বামী স্ত্রীতে ও সন্তানাদিতে কল্যাণ দাও। আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও, তুমি তো ক্ষমাশীল দয়ালু। আমাদেরকে তোমার নিয়ামতের শোকর আদায়কারী বানাও, প্রশংসাকারী বানাও, নিয়ামতের যোগ্য বানাও এবং আমাদের উপর নিয়ামতগুলো পূর্ণ করে দাও।" –আহমদ, আবু দাউদ।

১০. আনাস রা. বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল। যখন রুকু দিল ও তাশাহহুদ সম্পন্ন করলো, তখন সে দোয়া করলো :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ, তোমার জন্য সকল প্রশংসা– এই অসিলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করি। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তুমি দানশীল, হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হে মহত্ত্ব ও মর্যাদার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, তোমার কাছে প্রার্থনা করি।" রসূলুল্লাহ সা. সাহাবিদেরকে বললেন : তোমরা জানো, সে কিসের ওসলিায় দোয়া করলো? তারা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন : যার হাতে, মুহাম্মদের প্রাণ তার শপথ, সে আল্লাহর মহান নামের ওসিলায় দোয়া করেছে যে নামের ওসিলায় দোয়া করা হলে তিনি কবুল করেন, আর যে নামের ওসিলায় প্রার্থনা করা হলে দান করেন। –নাসায়ী।

১১. উমাইর বিন সা'দ বলেছেন : ইবনে মাসউদ আমাদেরকে নামাযের তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন : তাশাহহুদের পরে এই দোয়া করা উচিত :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ، رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট যাবতীয় কল্যাণ চাই, যা জানি এবং যা না জানি। আর যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই, যা জানি এবং যা না জানি। হে আল্লাহ, তোমার সালেহ বান্দারা তোমার কাছে যা চেয়েছে, তার মধ্য থেকে উত্তম জিনিস তোমার নিকট চাই। আর তোমার সালেহ বান্দারা যেসব জিনিস থেকে আশ্রয় চেয়েছে, সেগুলোর অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও, আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং দোযখের আযাব থেকে আমাদেরক রক্ষা করো"। তিনি বললেন : কোনো নবী বা সৎ লোক যে জিনিসের জন্যই দোয়া করে থাকুন, তা এ দোয়ার আওতায় এসে গেছে। -ইবেনে আবি শাইবা, সায়ীদ ইবনে মনসুর।

২১. সালামের পরের যিক্‌র ও দোয়া

সালামের পরে বেশ কিছু যিক্‌র ও দোয়া রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত আছে। নামাযীগণের জন্য তা পড়া সুন্নত। এই দোয়াগুলো নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন নামায শেষে ঘুরে বসতেন তখন তখন তিনবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেন এবং বলতেন :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

অর্থ : হে আল্লাহ, তুমি শান্তি, তোমার কাছ থেকেই শান্তি আসে, হে মহত্ত্ব ও মর্যাদার মালিক তুমি কল্যাণময়।" –বুখারি ব্যতিত সব কটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

অলিদ বলেন, আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম : কিভাবে ক্ষমা চাওয়া হয়? তিনি বললেন, বলতে হবে : আস্তাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই)।

২. মুয়ায বিন জাবাল রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন : হে মুযায় প্রত্যেক নামাযের পরে এই দোয়াটি পড়তে ভুলোনা : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে তোমার স্মরণ, তোমার শোকর আদায় ও তোমার ইবাদত সুষ্ঠুভাবে করতে সাহায্য করো। – আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী।

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন নামায শেষে সালাম ফেরাতেন, তখন বলতেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ وَالْحَسَنِ، لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। সকল রাজত্ব-ক্ষমতা তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ব্যতিত আর কারো কাছে কোনো শক্তি নেই। তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত করিনা। তিনিই সকল নিয়ামত, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা ও সৌন্দর্যের উপযুক্ত। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, একমাত্র তার জন্যই আনুগত্য, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।" –আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী

৪. মুগীরা ইবনে শু'বা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক ফরয নামাযের শেষে বলতেন :

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِيْ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর জন্যই সমস্ত ক্ষমতা ও রাজত্ব। তাঁর জন্যই প্রশংসা। তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ, তুমি যা দাও, তা কেউ ঠেকাতে পারেনা। আর তুমি যা দাওনা, তা কেউ দিতে পারেনা। তোমার পক্ষ থেকে যার ভাগ্যের ফায়সালা হয়ে গেছে, কোনো বেটা তাকে লাভবান করতে পারেনা। –আহমদ, বুখারি, মুসলিম।

৫. উকবা বিন আমের রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেনো প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সূরা নাস ও ফালাক পড়ি। – আহমদ, বুখারি, মুসলিম।

৬. আবু উমামা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের শেষে আয়াতুল কুরছি পড়ে, তার বেহেশতে যাওয়ার পথে শুধু তার মৃত্যু না হওয়াই অন্তরায়।" –নাসায়ী, তাবারানি। আর আলী রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের শেষে আয়াতুল কুরছী পড়বে, সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহর হিফাজতে থাকবে। – তাবারানি।

৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ ও তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার –এই তিনটি নিরানব্বই বার পড়বে। তারপর এই দোয়া দ্বারা একশো সমাপ্ত করবে :

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এমনকি তা যদি সমুদ্রের ফেনার সমানও হয়। (অর্থাৎ ছোট খাট গুনাহ। কোনো বড় গুনাহ তওবা ব্যতিত মাফ হয়না।) –আহমদ, বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ।

৮. কা'ব বিন উজরা বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : নামাযের পরের কিছু দোয়া রয়েছে, যার পাঠক কখনো ব্যর্থ হয়না। তা হচ্ছে : সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার। –মুসলিম।

৯. সুমাইয়্যি আবু সালেহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : দরিদ্র মুহাজিররা রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বললো : সম্পদশালীরা জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : কিভাবে? তারা বললো : নামায ও রোযায় তারা আমাদের সমান। কিন্তু দান সদকা ও দানমুক্ত করার কাজে তারা আমাদের চেয়ে অগ্রগামি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তবে কি আমি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দেবেনা যা দ্বারা যারা তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে, তোমরা তাদের সমান থাকতে পারো এবং যারা তোমাদের পরে আসবে, তোমরা তাদেরকে পেছনে ফেলে দিতে পারো। তোমরা যেমন করবে, তেমনি যে করবে, সে ছাড়া কেউ তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেনা। তারা বললো, হ্যাঁ, শিখিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : প্রত্যেক ফরয নামায শেষে সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার পড়বে। দরিদ্র মুহাজিরগণ পুনরায় রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে গেলো এবং বললো : আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা আমরা যা করি তা শুনেছে, তাই আমরা যা করি, তা তারাও করছে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ওটা তো আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকে দেন। -বুখারি ও মুসলিম।

১০. সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে, পঁচিশবার সুবহানাল্লাহ, পঁচিশবার আলহামদু লিল্লাহ ও পঁচিশবার আল্লাহু আকবার বলতে। তারপর পঁচিশবার বলবে :

لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

১১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দুটো কাজ যে ব্যক্তি করবে, তা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। কাজ দুটি সহজ কিন্তু খুব কম লোকই তা করে। লোকেরা বললো, হে রসূলুল্লাহ, কাজ দুটি কী কী? তিনি বললেন : প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলবে। আর শোয়ার সময় সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার একশবার বলবে। এভাবে সারা দিনে দুশো পঞ্চাশবার পড়া হবে। কিন্তু দাড়িপাল্লায় দু'হাজার পাঁচশত হবে। (কারণ, প্রত্যেক সৎকাজের দশগুণ ছওয়াব পাওয়া যায়।) তোমাদের মধ্যে কে প্রতিদিন আড়াই হাজার গুনাহ করে? লোকেরা বললো : তবে কেন, বললেন, খুব কম লোকই তা করে? তিনি বললেন : তোমাদের কাছে শয়তান নামাযের সময় আসে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ফলে নামাযের পর এটা পড়া হয়না। শোয়ার সময়ও সে আসে, ফলে মানুষ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। বর্ণনাকারী বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে আংগুল গুনে গুনে এটা পড়তে দেখেছি। - আবু দাউদ, তিরমিযি।

১২. আলী রা. ও ফাতিমা রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে একজন খাদেম চাইতে এসেছিলেন, যাতে তাদের কাজকর্ম সম্পাদন করা সহজ হয়। রসূলুল্লাহ সা. খাদেম দিতে অস্বীকার করে বললেন : আমি তোমরা যা চেয়েছো তার চেয়ে ভালো জিনিস দেবো? তারা বললেন : জ্বি, দিন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তা হচ্ছে কয়েকটি শব্দ, যা আমাকে জিবরীল শিখিয়েছে। প্রত্যেক নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার বলবে। আর ঘুমানোর পূর্বে সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার বলবে। আলী রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. শিখিয়ে দেয়ার পর থেকে আমি এগুলো পড়া আর ত্যাগ করিনি।

১৩. আব্দুর রহমান ইবনে গনম বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর বাড়ি ফেরার আগে দশবার পড়বে :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

তার জন্য প্রত্যেকটির বিনিময়ে দশটি ছওয়াব লেখা হবে। তার দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে, তার জন্য দশটি উচ্চ মর্যাদা উন্নীত করা হবে। এটা তার জন্য সকল গুনাহ থেকে রক্ষার উপায় হবে। বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হবে এবং শিরক ব্যতিত আর কোনো গুনাহ তার এই রক্ষাবুহ ধ্বংস করতে পারবেনা। ফলে আমলের দিক দিয়ে সে সর্বোত্তম মানুষ বলে পরিগণিত হবে। একমাত্র যে ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম কিছু দোয়া পড়ে সে তার চেয়ে ভালো হবে। –আহমদ, তিরমিযি।

১৪. মুসলিম ইবনুল হারিস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন : তুমি ফজরের নামায শেষে কারো সাথে কথা বলার আগে সাতবার : اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ (হে আল্লাহ আমাকে দোযখ থেকে রক্ষা করো) পড়বে। এরপর তুমি যদি সেই দিনে মারা যাও, তবে আল্লাহ তোমার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেবেন। আর মাগরিবের নামায শেষে কারো সাথে কথা বলার আগে সাতবার বলবে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ.

(হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট বেহেশত চাই এবং দোযখ থেকে পানাহ চাই।) এরপর তুমি এই রাতের মধ্যে মারা গেলে আল্লাহ তোমার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেবেন। –আহমদ, আবু দাউদ।

১৫. আবু হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. নামায শেষে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِىْ دِيْنِى الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ دُنْيَايَ الَّتِيْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِي، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ، مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার জন্য আমার দীনকে শুধরে দাও, যা আমার সকল কাজকে পাপমুক্ত রাখে, আর আমার দুনিয়াকে শুধরে দাও, যা আমার জীবিকা উপার্জনের স্থান। হে আল্লাহ, আমি তোমার সন্তুষ্টির নিকট তোমার অসন্তুষ্টি থেকে, তোমার ক্ষমার নিকট তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার নিকট তোমার (আযাব থেকে) আশ্রয় চাই। তুমি যা দাও তা কেউ রোধ করতে পারেনা। তুমি যা দাওনা, তা কেউ দিতে পারেনা। আর তোমার পক্ষ থেকে যার ভাগ্যের ফায়সালা হয়ে গেছে, কোনো বেটা তাকে লাভবান করতে পারেনা। - আবু হাতেম।

১৬. বুখারি ও তিরমিযি বর্ণনা করেছেন : সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তার সন্তানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিখাতেন এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ সা. এ দোয়া দ্বারা নামাযের পর আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا. وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট কার্পণ্য থেকে আশ্রয় চাই, কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই, আর অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া বয়স থেকে, দুনিয়ার ফিতনা (পরীক্ষা) থেকে,এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।"

১৭. আবু দাউদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক নামাযের পর বলতেন :

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِي بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِي، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার শরীরে সুস্থতা দাও, আমার কানে সুস্থতা দাও, আমার চোখে সুস্থতা দাও। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট কুফরী ও দারিদ্র থেকে আশ্রয় চাই, কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"

১৮. ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. নামাযের অব্যবহিত পরে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّكَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ. اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ. اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيْدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ. اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু এবং সকল জিনিসের প্রভু, আমি সাক্ষী, আপনিই একমাত্র প্রভু, আপনার কোনো শরীক নেই। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল জিনিসের প্রভু, আমি সাক্ষী মুহাম্মদ আপনার বান্দা ও রসূল। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল জিনিসের প্রভু, আমি সাক্ষী সকল বান্দা পরস্পরের ভাই, হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল জিনিসের প্রভু, আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে তোমার জন্য একনিষ্ঠ করে দাও। দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি মুহূর্তে, হে সম্মান ও মর্যাদার মালিক, শ্রবণ করো ও কবুল করো, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ; আকাশ ও পৃথিবীর আলো আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট ও কতো ভালো অভিভাবক, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

১৯. আহমদ ইবনে আবি শায়বা ও ইবনে মাজাহ উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. ফজরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত জীবিকা ও কবুল হওয়া আমল চাই।

১২. সুন্নত বা নফল নামায

১. শরয়ী গুরুত্ব

সুন্নত ও নফল নামায শরিয়তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এজন্য যে, তা দ্বারা ফরয নামাযে সংঘটিত অসম্পূর্ণতা ও ভুলত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে এবং নামাযের সমান মর্যাদা আর কোনো ইবাদতের নেই। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত :

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের যে কাজের হিসাব নেয়া হবে, তা হলো নামায। আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলবেন যদিও তিনি সবার চেয়ে ভাল জানেন : আমার বান্দার নামায পরখ করে দেখো। সে সম্পূর্ণ করেছে না অসম্পূর্ণ রেখেছে? যদি সম্পূর্ণ করে থাকে তবে সম্পূর্ণ লেখা হয়, আর যদি কিছু ভুলত্রুটি বা অসম্পূর্ণ রেখে থাকে, তবে আল্লাহ, বলেন : দেখো, আমার বান্দার কোনো নফল ইবাদত আছে কিনা? যদি তার কোনো নফল ইবাদত থেকে থাকে, তবে আমার বান্দার নফল দ্বারা তার ফরযকে পূর্ণ করে দাও। তারপর সেভাবে আমলগুলো নেয়া হবে। – আবু দাউদ। আর আবু উমামা বলেছেন : রসূল সা. বলেছেন : আল্লাহ কোনো বান্দাকে দু'রাকাত নামাযের চেয়ে উত্তম কোনো কাজের জন্য অনুমতি দেননি। বান্দা যতোক্ষণ নামাযে থাকে, ততোক্ষণ তার মাথার উপর সওয়াব ছড়ানো হতে থাকে। –আহমদ, তিরমিযি। ইমাম মালেক মুয়াত্তায় বলেছেন, আমি জেনেছি, রসূল সা. বলেছেন : অবিচল থাকো। কখনো গণনা করে শেষ করতে পারবেনা। আর জেনে রাখো, তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে নামায। মুমিন ব্যতিত আর কেউ সঠিকভাবে অযু করেনা। আর মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. রবীয়াকে বললেন : তুমি কি চাও? তিনি বললেন : আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। তিনি বললেন : আর কিছু? তিনি বললেন : শুধু এটুকুই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে বেশি বেশি সাজদা (অর্থাৎ নামায) দ্বারা তোমার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।

২. ফরয ছাড়া বাকি নামায বাড়িতে পড়া মুস্তাহাব

১. আহমদ ও মুসলিম জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে নামায পড়ে, তখন সে যেনো তার বাড়িকে তার নামায থেকে একটি অংশ দেয়। কারণ, আল্লাহ তার নামায দ্বারা তার বাড়ির কল্যাণ সাধন করেন।

২. আহমদ ও আবু দাউদ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের নামাযের কিছু অংশ তোমাদের বাড়িতে পড়ো। বাড়িকে কবর বানিয়ে রেখোনা।

৩. আহমদ উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বাড়িতে যে নফল ও সুন্নত নামায পড়া হয়, তা আলো স্বরূপ। কেউ চাইলে নিজের বাড়িকে আলোকিত করে নিক।

৪. আবু দাউদ যায়দ বিন সাবেত থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ফরয নামায ব্যতিত অন্য যে কোনো নামায আমার এই মসজিদে (মসজিদ নববী) পড়ার চেয়ে বাড়িতে পড়া উত্তম। এ সকল হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, নফল ও সুন্নত নামায বাড়িতে পড়া মুস্তাহাব এবং এসব নামায মসজিদ অপেক্ষা বাড়িতে পড়া উত্তম। নববী বলেছেন : নফল ও সুন্নত বাড়িতে পড়তে উৎসাহিত করার কারণ হলো, এ নামায অপেক্ষাকৃত গোপন ও রিয়া থেকে মুক্ত থাকে। ফলে ইবাদতের সওয়াব নষ্ট হয় যেসব কারণে, তা থেকে এ নামায অনেক বেশি সংরক্ষিত হয়। তাছাড়া এ দ্বারা বাড়িতে বরকত ও রহমত হয়, ফেরেশতার আগমন ঘটে এবং শয়তান পলায়ন করে।

৩. নফল ও সুন্নত নামাযে লম্বা কিরাত এবং কম সাজদা করা

আবু দাউদ ব্যতিত সব কটা সহীহ হাদিস মুগীরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হতো: 'হে রসূলুল্লাহ, আপনার তো আগের ও পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।' তিনি জবাব

দিতেন : 'তবে কি আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবোনা?' আবু দাউদ আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ ইবাদত উত্তম? বললেন, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়া। জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন্ সদকা উত্তম? বললেন : দরিদ্র ব্যক্তির শ্রম। (অর্থাৎ টাকার পরিবর্তে শ্রম দেয়া) পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন্ হিজরত উত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে হিজরত করা। (অর্থাৎ তা বর্জন করা) জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন্ জেহাদ– উত্তম? তিনি বললেন : নিজের জান ও মাল দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন্ শাহাদত উত্তম ? জবাব দিলেন : যে ব্যক্তি নিজেও নিহত হয়েছে এবং তার ঘোড়াও মারা গেছে তার শাহাদাত।

৪. নফল ও সুন্নত নামায বসে বসে পড়া বৈধ

নফল ও সুন্নত নামায দাঁড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে পড়া বৈধ। অনুরূপ একই রাকাতে হলেও কিছু অংশ দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়াও বৈধ। চাই দাঁড়ানোটা আগে হোক বা পরে হোক। এটা মাকরূহও হবেনা। যেভাবে ইচ্ছা বসতে পারে। তবে আসন করে বসা উত্তম। মুসলিম আলকামা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আলকামা বলেন : আমি আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম : রসূল সা. যখন দু'রাকাত বসে পড়তেন তখন কিভাবে পড়তেন? তিনি বললেন : উভয় রাকাতে কিরাত পড়তেন। রুকু দিতে চাইলে দাঁড়িয়ে রুকু দিতেন। আর আহমদ, আবু দাউদ, তিরিমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমি রসূল সা. কে রাতের কোনো নামাযে বসে কিরাত পড়তে দেখিনি। পরে যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন। বসে বসে কিরাত পড়তেন। তারপর ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে উঠে দাঁড়িয়ে বাকি আয়াতগুলো পড়ে সাজদায় যেতেন।

৫. নফলের প্রকারভেদ

নফল দু'রকমের : সাধারণ নফল ও বিশেষ নফল। সাধারণ নফলে শুধু নামাযের নিয়ত করাই যথেষ্ট। ইমাম নববী বলেছেন : যখন কোনো নফল শুরু করা হবে এবং কতো রাকাত পড়া হবে তা স্থির করা হবেনা, তখন এক রাকাত শেষেও সালাম ফেরানো যাবে, আবার দু'রাকাত, তিন রাকাত, একশো রাকাত, হাজার রাকাতও পড়া যাবে। আর যদি কত রাকাত পড়া হয়েছে তা মনে না থাকে এবং সালাম ফেরায়, তাহলেও শুদ্ধ হবে। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

বায়হাকিতে বর্ণিত : আবু যর অনেক রাকাত নামায পড়লেন। তিনি যখন সালাম ফেরালেন তখন আহনাফ বিন কায়স রা. তাকে বললেন : আপনি কি জানেন, বেজোড় সংখ্যক নামায পড়েছেন না জোড় সংখ্যক? তিনি বললেন : আমি না জানলেও আল্লাহতো জানেন। আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদ সা.কে বলতে শুনেছি : (বলেই কেঁদে ফেললেন।) কোনো বান্দা আল্লাহর সামনে একটা সাজদা করলেই আল্লাহ তার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দেয় এবং তার একটা গুনাহ মাফ করে দেন। –দারমি।

আর বিশেষ নফল হলো, নিয়মিত সুন্নত যা ফরয নামাযগুলোর সাথে পড়া হয়। এর ভেতরে রয়েছে ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সুন্নত। আর একটা হলো, অনিয়মিত সুন্নত। নিম্নে উভয় প্রকারের সুন্নতের বিবরণ দেয়া হলো :

৬. ফজরের সুন্নত

ক. এর ফযীলত :

ফজরের সুন্নত নিয়মতিভাবে পড়ার ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদিস রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি :

১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ফজর নামাযের পূর্বের দু'রাকাত নামায আমার কাছে সারা পৃথিবীর চেয়ে প্রিয়। –আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : শত্রুদের ঘোড় সওয়ার বাহিনী যদি তোমাদেরকে তাড়া করে, তবুও ফজরের দু'রাকাত সুন্নত ত্যাগ করোনা। –আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকি, তাহাবি। অর্থাৎ যতো কঠিন ওযরই থাকুক না কেন, এ দু'রাকাত সুন্নত তরক করা উচিত নয়।

৩. আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ফজরের নামাযের পূর্বের দু'রাকাত সুন্নত যতোটা নিয়মিতভাবে আদায় করতেন, ততোটা আর কোনো নামায নিয়মিতভাবে আদায় করতেন। -বুখারি, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ।

৪. আয়েশা রা. আরো বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ফজরের দু'রাকাত সুন্নত পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। – আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী।

৫. আহমদ ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : সব ভালো কাজের মধ্যে ফজরের পূর্বের দু'রাকাত সুন্নত পড়ার প্রতি রসূলুল্লাহ সা.কে সর্বাধিক দ্রুত ধাবিত হতে দেখেছি।

খ. ফজরের পূর্বের দু'রাকাত সুন্নত সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়

রসূলুল্লাহ সা. এর অনুসৃত নীতি ছিলো, ফজরের সুন্নতে সংক্ষিপ্ত কিরাত পড়তেন।

১. হাফসা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ফজরের নামাযের পূর্বে দু'রাকাত আমার ঘরে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন। নাফে' বলেছেন : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.ও এ দু'রাকাত সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন।

২. আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ফজরের পূর্বের দু'রাকাত এতো সংক্ষিপ্ত করতেন যে, আমার সন্দেহ হতো, তিনি সূরা ফাতেহা পড়তেন কিনা। –আহমদ প্রমুখ।

৩. আয়েশা রা. আরো বলেছেন : ফজরের পূর্বের দু'রাকাত নামায রসূলুল্লাহ সা. সূরা ফাতেহার সমান লম্বা করতেন। – আহমদ, নাসায়ী, বায়হাকি, মালেক, তাহাবি।

গ. দু'রাকাত সুন্নতে কি কি পড়া উচিত ?

ফজরের দু'রাকাত সুন্নত রসূলুল্লাহ সা. থেকে যে যে সূরা বর্ণিত আছে, তা দিয়ে পড়া মুস্তাহাব। সেই সূরাগুলো নিম্নের হাদিসগুলোতে লক্ষণীয় :

১. আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকাত সুন্নতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস নি:শব্দে পড়তেন। – আহমদ, তাহাবি। স্বভাবতই এ সূরা দুটো সূরা ফাতিহার পরেই পড়তেন। কেনোনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয়না।

২. আয়েশা রা. থেকে আরো বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. ফজরের পূর্বের দু'রাকাত সুন্নতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন এবং বলতেন, এ সূরা দুটো কতো সুন্দর! – আহমদ ও ইবনে মাজাহ।

৩. জাবের থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি ফজরের দু'রাকাত সুন্নতে পড়লো। প্রথম রাকাতে সে সূরা কাফিরূন পড়লো। পড়া শেষ হলে রসূলুল্লাহ সা. বললেন, এই বান্দা তার প্রভুকে চিনেছে। তারপর সে দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়লো। পড়া শেষ হলে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এই বান্দা তার প্রভুর উপর ঈমান এনেছে। তালহা রা. বলেছেন : এ কারণে আমি এই দুটি সূরা দিয়ে এই দু'রাকাত পড়তে ভালোবাসি। –ইবনে হিব্বান, তাহাবি।

৪. ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকাত সুন্নতে সূরা বাকারার ১৩৬ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল ইমরান-এর ৬৪ নং আয়াত পড়তেন। –মুসলিম।

৫. ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১৩৬ নং এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে ইমরান-এর ৫২ নং এই আয়াত পড়তেন। –মুসলিম।

৬. শুধু সূরা ফাহিতা পড়লেও নামায শুদ্ধ হবে। কেনোনা ইতিপূর্বে আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে যে, এই নামাযে রসূলুল্লাহ সা. সূরা ফাতিহার সমান কিয়াম করতেন।

ঘ. সুন্নত শেষে যেসব দোয়া পড়া উচিত

ইমাম নববী বলেছেন : আবু মুলাইহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রসূল সা. ফজরের সুন্নত সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত পড়লেন তারপর বসা অবস্থায় বললেন : "হে আল্লাহ, জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফীল ও মুহাম্মদ সা.-এর প্রতিপালক, তোমার নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় চাই। (তিরমিযি) আর আনাস থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি শুক্রবারে ফজরের নামাযের পূর্বে তিনবার বলবে : সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই ও তওবা করি, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই।" আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন : – এমনকি যদি তা সমুদ্রের ফেনারাশির সমানও হয়।

ঙ. সুন্নতের পর কিছুক্ষণ শয়ন করা

আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ফজরের দু'রাকাত সুন্নত পড়ার পর ডান পাজরের উপর কাত হয়ে শুতেন। –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আয়েশা থেকে সব কটা সহীহ হাদিস গ্রন্থ আরো বর্ণনা করেছে : রসূল সা. ফজরের সুন্নত দু'রাকাত পড়ার পর আমি ঘুমিয়ে থাকলে শুতেন, আর আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। শোয়ার বিধান নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হলো, যে ব্যক্তি মসজিদের পরিবর্তে বাড়িতে সুন্নত পড়বে, তার জন্য এটা মুস্তাহাব। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন : প্রাচীন মনীষীদের কারো কারো মত এই যে, এটা বাড়িতে মুস্তাহাব, মসজিদে নয়। ইবনে উমর থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। আমাদের ইমামদের কেউ কেউ বলেছেন যে, রসূল সা. এ কাজটি মসজিদে করেছেন বলে জানা যায়নি। আর বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি মসজিদে এটা করতো, ইবনে উমর তাকে এড়িয়ে যেতেন। ইমাম আহমদকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : আমি এটা করিনা। তবে কেউ যদি করে তবে সে ভালোই করে।"

চ. ফজরের সুন্নতের কাযা সম্পর্কে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের দু'রাকাত সুন্নত পড়েনি, সে যেনো পরে এটা পড়ে নেয়। –বায়হাকি। কায়স বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত : তিনি ফজরের নামাযের জন্য বের হলেন। দেখলেন রসূল সা. ফজরের নামায পড়ছেন। তখন তিনি ফজরের সুন্নত না পড়ে রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে জামাতে শামিল হয়ে ফরয পড়ে নিলেন। ফরয শেষে দাঁড়িয়ে সুন্নত পড়লেন। রসূল সা. দেখে বললেন : এটা কোন্ নামায? কায়েস তাকে জানালেন। রসূল সা. চুপ করে রইলেন। কিছুই বললেননা। –আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ। আর আহমদ, বুখারি ও মুসলিম ইমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. এক সফরে ছিলেন। ফজরের সময় তারা ঘুম থেকে উঠতে পারেননি। রোদের তাপে তাদের ঘুম ভাংলো। তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সূর্য আরো একটু উপরে উঠলো মুয়াযযিনকে আযান দিতে আদেশ দিলেন। আযানের পর দু'রাকাত সুন্নত পড়লেন। তারপর ফজর পড়লেন। এ হাদিসগুলো থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সূর্যোদয়ের আগেই হোক বা পরেই হোক, ফজরের সুন্নত কাযা করতে হবে–

চাই তা কোনো ওযরের কারণে কিংবা বিনা ওযরে এবং ফজরের ফরযসহ অথবা শুধু সুন্নত ছুটে যাক।

৭. যোহরের সুন্নত

যোহরের সুন্নত সম্পর্কে হাদিস থেকে জানা যায়, তা চার, ছয় অথবা আট রাকাত। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

চার রাকাত সংক্রান্ত হাদিস

১. ইবনে উমর রা. বলেন : আমি রসূল সা. এর কাছ থেকে সুন্নত নামায দশ রাকাত স্মরণ রেখেছি : যোহরের পূর্বে দু'রাকাত, যোহরের পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পর দু'রাকাত বাড়িতে। এশার পর দু'রাকাত বাড়িতে। ফজরের পূর্বে দু'রাকাত। –বুখারি।

২. মুগীরা বিন সুলায়মান বলেন, আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি : রসূলুল্লাহ সা. যোহরের পূর্বে দু'রাকাত যোহরের পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পরে দু'রাকাত, এশার পরে দু'রাকাত ও ফজরের পূর্বে দু'রাকাত ছাড়তেন না। –আহমদ।

ছয় রাকাত সংক্রান্ত হাদিস

১. আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেছেন : আয়েশা রা. কে রসূল সা. এর নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তিনি যোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত পড়তেন। –আহমদ, মুসলিম প্রভৃতি।

২. উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবিবা থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাকাত পড়বে, তার জন্য বেহেশতে একখানা ঘর বানানো হবে। যোহরের পূর্বে চার রাকাত, যোহরের পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পরে দু'রাকাত, এশার পর দু'রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকাত। –তিরমিযি, মুসলিম।

আট রাকাত সংক্রান্ত হাদিস

উম্মে হাবিবা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত পড়বে, আল্লাহ তার গোশতকে দোযখের উপর হারাম করে দেবেন। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

যোহরের পূর্বের চার রাকাতের ফযীলত

১. আবু আইয়ূব আনসারী যোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। তাকে বলা হলো : আপনি কি সব সময় এ নামায পড়েন? তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে এটা পড়তে দেখেছি। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এটা এমন একটা মুহূর্ত যখন আকাশের দরজাগুলো খোলা হয়। তাই আমি পছন্দ করলাম এই সময়ে আমার কিছু সৎকাজ উপরে উঠে যাক। –আহমদ।

২. আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যোহরের পূর্বের চার রাকাত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকাত ছাড়তেন না। –আহমদ, বুখারি। আয়েশা রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে : রসূলুল্লাহ সা. যোহরের পূর্বে যে চার রাকাত পড়তেন, তা লম্বা কিয়াম করতেন এবং রুকু ও সাজদা ভালোভাবে করতেন।

ইবনে উমরের যে হাদিসে যোহরের পূর্বে দু'রাকাত পড়ার উল্লেখ রয়েছে, সে হাদিসে এবং অন্যান্য যেসব হাদিসে চার রাকাত পড়ার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম পড়তেন

বলে ধরে নেয়া উত্তম। কখনো দু'রাকাত কখনো চার রাকাত পড়তেন। কেউ কেউ বলেন : তিনি মসজিদে দু'রাকাত এবং বাড়িতে চার রাকাত পড়তেন। অথবা বাড়িতে দু'রাকাত পরে মসজিদে গিয়ে আবার দু'রাকাত পড়তেন। ইবনে উমর মসজিদের দু'রাকাত দেখেছেন বাড়ির দু'রাকাত দেখেননি। আর আয়েশা রা. দুটোই জানতেন। আবু জাফর তাবারি বলেছেন : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি চার রাকাত এবং খুব কম দু'রাকাত পড়তেন। যখন কেউ যোহরের পূর্বে বা পরে চার রাকাত পড়ে, তখন দু' দু রাকাত পড়ে সালাম ফেরানো ভালো। আবার এক সালামেও পড়া বৈধ। রসূলুল্লাহ সা: বলেছেন : দিন বা রাতের নামায জোড়া জোড়া। –আবু দাউদ।

যোহরের উভয় সুন্নতের কাযা প্রসঙ্গে

আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন যোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়তে পারতেন না, তখন সেটা পরে পড়তেন। –তিরমিযি। আর ইবনে মাজাহ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এর যোহরের পূর্বের চার রাকাত যখন ছুটে যেতো, তখন যোহরের পরের দু'রাকাতের পর তা কাযা করতেন। (পূর্ববর্তী সুন্নতের সময় ফরয নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত বিস্তৃত।)

এতো গেলো ফরয নামাযের পূর্বেকার নিয়মিত সুন্নতের কাযার বিধান। নামাযের পরের সুন্নতের কাযা প্রসঙ্গে উম্মে সালামা রা. থেকে আহমদ বর্ণনা করেন : "রসূলুল্লাহ সা. যোহর পড়লেন। এই সময় তাঁর নিকট কিছু মাল এলো। তিনি তা বণ্টনে আত্মনিয়োগ করলেন। বণ্টন করতে করতে আসরের আযান হলো। তিনি আসর পড়লেন। তারপর আমার ঘরে এলেন। কারণ ঐ দিনটা ছিলো আমার। তিনি খুব সংক্ষেপে দু'রাকাত নামায পড়লেন। আমরা বললাম : হে রসূলুল্লাহ সা. এ দু'রাকাত কিসের নামায? এর জন্য কি আপনাকে আদেশ দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন : না, ... এ হচ্ছে যোহরের পরের দু'রাকাত, যা আমি পড়ে থাকি। কিন্তু আজ মাল বণ্টনের কারণে পড়তে পারিনি। এই অবস্থায় আসরের আযান হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় যোহরের পরের সুন্নতটি ত্যাগ করা পছন্দ করিনি। –বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ। (একটি বর্ণনায় রয়েছে উম্মে সালামা বলেছেন : "আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ, এ নামায ছুটে গেলে কাযা করবো কি? তিনি বললেন : না" তবে বায়হাকি বলেছেন : এ বর্ণনাটি দুর্বল।)

৮. মাগরিবের সুন্নত

মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকাত নামায পড়া সুন্নত। ইতিপূর্বে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে জানা গেছে যে, এটি সেসব নামাযের অন্তর্ভুক্ত, যা রসূলুল্লাহ সা. ছাড়তেন না।

যা পড়া মুস্তাহাব : মাগরিবের সুন্নতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কে মাগরিবের দু'রাকাত সুন্নতে ও ফজরের দু'রাকাত সুন্নতে সূরা কাফিরূন ও সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' কতবার পড়তে শুনেছি, তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। –ইবনে মাজাহ, তিরমিযি।

এ নামায বাড়িতে পড়া মুস্তাহাব। মাহমুদ বিন নাবীদ রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. একবার বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের পল্লীতে এলেন এবং তাদেরকে মাগরিবের নামায পড়ালেন। সালাম ফেরানোর পর বললেন : বাকি দু'রাকাত তোমরা তোমাদের বাড়িতে গিয়ে পড়ো। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ী। আর আগেই উল্লেখ করেছি যে, রসূলুল্লাহ সা. এ দু'রাকাত বাড়িতে পড়তেন।

৯. এশার সুন্নত

এশার নামাযের পরে দু'রাকাত নামায যে সুন্নত, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে একাধিক হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. গায়রে মুয়াক্কাদা সুন্নতসমূহ

ইতিপূর্বে যে নিয়মিত সুন্নত নামাযগুলোর বিবরণ দেয়া হলো, সেগুলো আদায়ের ব্যাপারে তাকিদ করা হয়েছে। আরো কিছু সুন্নত নামাযের বিবরণ নিম্নে দেয়া যাচ্ছে, যা নিয়মিত ও প্রাত্যহিক, তবে বাধ্যতামূলক নয়, বরং এগুলোও মুস্তাহাবের পর্যায়ভুক্ত।

১. আসরের পূর্বে দু'রাকাত বা চার রাকাত : এ সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও বহু সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে একটি অপরটির সমর্থক ও পরিপূরক। তন্মধ্যে ইবনে উমর বলেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়ে নেয়। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা। ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মা বলেছেন : এটি সহীহ হাদিস।

অনুরূপ, আলী রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আসরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন, এর প্রত্যেক দু'রাকাতের মাঝে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের উপর, নবীদের উপর এবং তাদের অনুসারী মুমিন ও মুসলমানদের প্রতি সালাম পাঠিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করতেন। –আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। শুধু দু'রাকাত পড়ার পক্ষে একটি সাধারণ হাদিস রয়েছে, যা সকল ওয়াক্তের বেলায় প্রযোজ্য : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝখানে একটি নামায রয়েছে।

২. মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত নামায : বুখারি আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মাগরিবের পূর্বে নামায পড়ো, মাগরিবের পূর্বে নামায পড়ো, তারপর তৃতীয়বারে বললেন : যদি ইচ্ছা হয়। এ দ্বারা তিনি বুঝালেন, লোকেরা এটিকে নিয়মিত সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করুক – তা তিনি পছন্দ করেননা। ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়েছেন। মুসলিমে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত : আমরা সূর্যাস্ত যাওয়ার প্রাক্কালে দু'রাকাত নামায পড়তাম। রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে দেখতেন। আদেশও করতেননা, নিষেধও করতেননা। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : সামগ্রিকভাবে সকল প্রমাণাদি থেকে মনে হয়, ফজরের সুন্নতের মতো এটিও খুব সংক্ষিপ্তভাবে পড়া মুস্তাহাব।

এশার পূর্বে দু'রাকাত : সবকটা সহীহ হাদিস গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায রয়েছে, প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায রয়েছে। এরপর তৃতীয়বারে বলেছেন : যার ইচ্ছা হয় তার জন্য। আর ইবনে হিব্বান ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক ফরয নামাযের পূর্বে দু'রাকাত নামায রয়েছে।

ফরয ও নফলের মাঝে একটা বিরতি দেয়া উত্তম, যাতে ফরযের পরিপূর্ণ সমাপ্তি হয়।

রসূলুল্লাহর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. একদিন আসরের নামায পড়লেন। তৎক্ষণাত এক ব্যক্তি নামায পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো। উমর রা. তাকে দেখে বললেন : বসো। আহলে কিতাব এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের নামাযে কোনো বিরতি থাকতোনা। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : উমর উত্তম কথা বলেছে। –আহমদ।

১১. বিতির নামায

১. ফযীলত ও বিধান : বিতির নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা অর্থাৎ তাকিদ করা হয়েছে এমন সুন্নত। রসূলুল্লাহ সা. এটি পড়তে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছেন। আলী রা. বলেছেন : "বিতির তোমাদের ফরয নামাযের মতো অপরিহার্য নয়, তবে রসূলুল্লাহ সা. বিতির পড়েছেন। তার পর বলেছেন : হে কুরআনের অনুসারীগণ, তোমরা বিতির পড়ো। আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড় (বিতির নামায) পছন্দ করেন। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম।*

ইমাম আবু হানিফার মতে বিতির ওয়াজিব কিন্তু তার এ মত দুর্বল। ইবনুল মুনযির বলেছেন : এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফার সাথে একমত হয়েছে এমন কাউকে আমি জানিনা। আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যে, বনু কিনানার মিখদাজী নামক এক ব্যক্তিকে আবু মুহাম্মদ নামক জনৈক আনসার জানালেন যে, বিতির ওয়াজিব। মিখদাজী সংগে সংগে উবাদা ইবনুস সামিতের কাছে গিয়ে জানালেন, আবু মুহাম্মদ বলেছেন : বিতির ওয়াজিব। উবাদা তৎক্ষণাত বললো : আবু মুহাম্মদ ভুল বলেছে। আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তার বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এ নামাযগুলো আদায় করবে, এর কোনো অংশ বাদ রাখবেনা এবং এর প্রতি কোনো অবজ্ঞা প্রদর্শন করবেনা, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি এ নামাযগুলো আদায় করেনা, আল্লাহর কাছে তার জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা হলে তাকে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে তাকে ক্ষমা করবেন। আর বুখারি ও মুসলিমে তালহা থেকে বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দিনে ও রাতে আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। জনৈক বেদুঈন বললো : এছাড়া আর কিছু কি আমার করতে হবে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : না। তবে অতিরিক্ত নামায (নফল নামায) পড়তে পারো।

২. বিতিরের সময় : সকল আলেম একমত যে, বিতিরের নামাযের সময় এশার নামাযের পরই শুরু হয় এবং তা ফজর পর্যন্ত থাকে। আবু তামীম জায়শানী রা. বলেন : আমর ইবনুল আস জুমার দিন জনগণের সামনে প্রদত্ত ভাষণে বললেন : আবু বাসরা আমাকে জানিয়েছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে একটা অতিরিক্ত নামায দিয়েছেন এবং তা হচ্ছে বিতির। তোমরা এশা থেকে ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এটা পড়ে নাও। আবু তামীম বলেছেন : সংগে সংগে আবু যর আমার হাত ধরে মসজিদে আবু বাসরার কাছে নিয়ে গেলেন। তাকে বললেন : আমর যা বলেছে, তা কি আপনি (সত্যিই) রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছেন? আবু বাসরা বললেন হ্যাঁ, আমি এ কথা রসূলুল্লাহ সা. এর কাছ থেকেই শুনেছি। -আহমদ।

আবু মাসউদ আনসারী রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বিতির কখনো প্রথম রাতে কখনো মধ্যরাতে কখনো শেষ রাতে পড়তেন। -আহমদ। আব্দুল্লাহ ইবনে আবি কায়স বলেন : আমি আয়েশা রা. কে রসূলুল্লাহ সা. এর বিতির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তিনি কখনো প্রথম রাতে, কখনো শেষ রাতে বিতির পড়তেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তাঁর কিরাত কেমন ছিলো? প্রকাশ্য না গোপন? আয়েশা রা. বললেন : দু'রকমই করতেন। কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে। তিনি কখনো গোসল করে কখনো অযু করে (অর্থাৎ বীর্যপাতজনিত কারণে) ঘুমাতেন। -আবু দাউদ, আহমদ, মুসলিম, তিরিমিযি।

---

* অর্থাৎ আল্লাহ এক। তিনি বেজোড় সংখ্যক নামায বিতিরকে ভালোবাসেন এবং এজন্য সওয়াব দেন। ইবনে উমর যে কাজই করতেন, বেজোড় সংখ্যক করতেন।

৩. শেষ রাতে উঠতে পারার ভরসা না থাকলে প্রথম রাতে আর ভরসা থাকলে, শেষ রাতে পড়া মুস্তাহাব : যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবেনা বলে আশংকা বোধ করে তার জন্য বিতির নামায প্রথম রাতে এবং যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে বলে আস্থাবান, তার জন্য শেষ রাতে বিতির পড়া মুস্তাহাব। জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মনে করে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবেনা, সে যেনো প্রথম রাতেই বিতির পড়ে নেয়। আর যে মনে করে সে শেষ রাতে উঠতে পারবে, সে যেনো শেষ রাতে পড়ে। শেষ রাতের বিতিরে ফেরেশতারা উপস্থিত থাকে এবং সেটাই উত্তম। –আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ। জাবের রা. থেকে আরো বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. আবু বকর রা. কে বললেন : তুমি কখন বিতির পড়ো? আবু বকর রা. বললেন : প্রথম রাতে এশার পর। রসূল সা. বললেন : আর হে উমর, তুমি কখন পড়ো? তিনি বললেন : শেষ রাতে। রসূল সা. বললেন : হে আবু বকর, তুমি সতর্কতার নীতি অবলম্বন করেছো। আর হে উমর, তুমি অবলম্বন করেছো দৃঢ়তার নীতি। অর্থাৎ শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পের নীতি। –আহমদ, আবু দাউদ ও হাকেম।

রসূলুল্লাহ সা. রাতের সর্বশেষ কাজ যা করতেন তা হলো, শেষ রাতে বিতির পড়তেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, সেটাই উত্তম। আয়েশা রা. বলেছেন : সাধারণভাবে রসূলুল্লাহ সা. প্রথম রাতে, মধ্য রাতে ও শেষ রাতে বিতির পড়তেন। তবে তাঁর সর্বশেষ বিতির শেষ রাতেই ছিলো। – সব কটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ। এসব সত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবি সতর্কতাবশত: বিতির পড়েই ঘুমানোর উপদেশ দিয়েছেন। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এশার নামায রসূল সা. এর মসজিদে পড়তেন। তারপর এক রাকাত বিতির পড়তেন। এর চেয়ে বেশি পড়তেননা। তাকে বলা হলো, হে আবু ইসহাক, আপনি মাত্র এক রাকাত বিতির পড়লেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ... আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি বিতির পড়া ব্যতিত ঘুমায়না, সে বিচক্ষণ ব্যক্তি। –আহমদ।

৪. বিতির কয় রাকাত ? তিরমিযি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. থেকে বিতির তেরো, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন ও এক রাকাত বলে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইসহাক বিন ইবরাহীম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. তেরো রাকাত বিতির পড়তেন মর্মে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ হলো : তিনি বিতিরসহ তেরো রাকাত রাতের নামায পড়তেন। অর্থাৎ মোট নামাযের অংশ ছিলো বিতির। রাতের নামাযকে বিতিরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। বিতিরের নামায দুই দুই রাকাত করে পড়ে সালাম ফিরিয়ে অতপর এক তাশাহহুদ ও সালাম দ্বারা এক রাকাত পড়েও আদায় করা যায়। আবার দুই তাশাহহুদ ও এক সালাম দ্বারাও সব নামায পড়া যায়। এভাবে রাকাতগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করা যায় এবং শুধু শেষ রাকাতের আগের রাকাতে তাশাহহুদ পড়ার পর শেষ রাকাত পড়ে তাশাহহুদ ও সালাম দ্বারা নামায শেষ করা যায়। আবার সমস্ত নামায শুধু শেষ রাকাতেই তাশাহহুদ ও সালাম দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। এসব পন্থাই বৈধ এবং রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : এক সালামে পাঁচ রাকাত ও সাত রাকাত বিতির বিশুদ্ধ হাদিসে অকাট্য ও সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন উম্মে সালামার হাদিসে রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. সাত রাকাত ও পাঁচ রাকাত বিতির এমনভাবে পড়তেন যে এর মাঝে কোনো সালাম বা কথাবার্তা দ্বারা বিভাজন করতেন না। –আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। অনুরূপ আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. রাতে নয় রাকাত নামায পড়তেন, তার অষ্টম রাকাতে ছাড়া বসতেন না। অষ্টম রাকাতের শেষে বসে আল্লাহর যিকর ও প্রশংসা করতেন এবং তাঁর কাছে দোয়া করতেন। তারপর সালাম না করেই উঠে দাঁড়িয়ে নবম রাকাত পড়তেন, তারপর বসতেন, তাশাহহুদ পড়তেন। তারপর আমাদের

শুনিয়ে সালাম ফেরাতেন। তারপর সালাম ফেরানোর পর বসে বসে, আরো দু'রাকাত নামায পড়তেন। এভাবে এগারো রাকাত হতো। পরে যখন রসূলুল্লাহ সা. এর বয়স বেড়ে গেলো এবং তাঁর শরীর স্থূলকায় হলো, তখন সাত রাকাত বিতির পড়তেন এবং আগের মতোই দু'রাকাত পড়তেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে : যখন তাঁর বয়স আরো বেড়ে গেল এবং শরীর স্থূলকায় হলো, তখন সাত রাকাত বিতির পড়তেন এবং কেবল ৬ষ্ঠ ও ৭ম রাকাতে বসতেন এবং শুধু ৭ম রাকাতে সালাম ফেরাতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : সাত রাকাত পড়তেন এবং কেবল এর শেষেই বসতেন। –সব কটা সহীহ হাদিস।

আয়েশা রা. বর্ণিত অপর হাদিসে রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. রাতে তেরো রাকাত নামায পড়তেন, তন্মধ্যে বিতির হিসেবে পড়তেন পাঁচ রাকাত, যার শেষে বসতেন। –বুখারি, মুসলিম। এগুলোর সবই সহীহ ও দ্ব্যর্থহীন হাদিস এবং এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেবল একটি হাদিসে বৈপরিত্য রয়েছে। সেটি হলো : রসূল সা. বলেছেন : "রাতের নামায দু'রাকাত দু'রাকাত করে।" এ হাদিসটিও সহীহ। কিন্তু সাত ও পাঁচ রাকাত সংক্রান্ত হাদিসগুলোও সত্য এবং একে অপরকে সত্যায়ন করে। "রাতের নামায দু'রাকাত করে" এ হাদিসে রসূল সা. প্রশ্ন কর্তাকে রাতের নামায সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, এ নামায দুই দুই রাকাত করে পড়তে হয়। ঐ ব্যক্তি তাঁকে বিতির সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি। সাত, পাঁচ, নয় ও এক রাকাত সম্বলিত নামাযগুলো বিতিরেরই নামায। বিতির হচ্ছে সেই এক রাকাতের নাম, যা তার পূর্ববর্তী নামায থেকে বিচ্ছিন্ন। আর পাঁচ, সাত ও নয় রাকাত যখন যুক্তভাবে আদায় করা হয়, তখন মাগরিবের ন্যায় সংযুক্ত তিন রাকাতের নাম বিতির। পাঁচ ও সাত রাকাত যদি এগারো রাকাতের মতো দুই সালাম দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে বিতির নাম হবে শুধু বিচ্ছিন্ন রাকাতের। যেমন রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "রাতের নামায দুই দুই রাকাত। যখন ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেবে, তখন এক রাকাত দ্বারা বিতির পড়তে নেবে।" যে নামায সে ইতিমধ্যে পড়েছে তার মধ্য থেকেই তার জন্য বিতির হয়ে যাবে। সুতরাং রসূল সা.-এর কথা ও কাজ পুরো সংগতিপূর্ণ এবং একে অপরের সমর্থক।

৫. বিতিরের কিরাত : বিতিরে ফাতিহার পর কুরআনের যে কোনো জায়গা থেকে পড়া জায়েয। আলী রা. বলেছেন : "কুরআনের কোনো অংশই পরিত্যক্ত নয়। সুতরাং তুমি যে কোনো অংশ দ্বারা বিতির পড়ো।" কিন্তু যখন তিন রাকাত দ্বারা বিতির পড়বে, তখন প্রথম, রাকাতে ফাতিহার পর সূরা 'সাব্বিহিসমা' দ্বিতীয় রাকাতে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'কুল হুয়াল্লাহু' ও সূরা নাস এবং ফালাক পড়া মুস্তাহাব। কারণ আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযিতে আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. প্রথম রাকাতে 'সাব্বিহিসমা', দ্বিতীয় রাকাতে 'কাফিরূন' ও তৃতীয় রাকাতে 'কুল হুয়াল্লাহ' এবং নাস, ফালাক পড়তেন।

৬. বিতিরে দোয়া কুনুত : বিতিরে দোয়া কুনুত সারা বছরই পড়া শরিয়তের বিধান। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় হাসান বিন আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বিতিরে এই দোয়া পড়তে শিখিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ .

অর্থ : হে আল্লাহ, তুমি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছো, আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো! যাদেরকে তুমি ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছো, আমাকেও ক্ষমা ও সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছো, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করো! তুমি যা কিছু প্রদান করেছো, আমার জন্যে তাতে বরকত (প্রাচুর্য) দান করো। তোমার মন্দ ফায়সালা থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই প্রকৃত ফায়সালাকারী আর তোমার উপর কারো ফায়সালা চলেনা। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। যে তোমার শত্রু হয়েছে, তাকে ইয্যত দান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের প্রভু, বিরাট প্রাচুর্যশীল তুমি, অতিশয় মহান তুমি।"

তিরমিযি বলেছেন : এর চেয়ে ভালো কোনো দোয়া কুনুত রসূল সা. এর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। ইবনে হাম্বল, ইবনে মাসউদ, আবু মূসা, ইবনে আব্বাস, বারা, আনাস, হাসান বসরী, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, ছাওরী, ইবনুল মুবারক ও হানাফী মাযহাব এই মতের সমর্থক।

শাফেয়ী প্রমুখের মতে, রমযানের শেষার্ধেই শুধু বিতিরে দোয়া কুনুত পড়তে হয়। কেনোনা আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে : "উমর রা. উবাই বিন কা'ব এর নিকট জনতাকে সমবেত করলেন। তিনি তাদেরকে বিশ রাত নামায পড়াতেন। রমযানের শেষ অর্ধেকে ব্যতিত দোয়া কুনুত পড়তেননা। আর মুহাম্মদ বিন নাসর সাঈদ বিন জুবাইরকে বিতিরের সূচনা কিভাবে হলো জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : উমর রা. একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। সেই বাহিনী একটা গুরুতর সংকটে পড়লো। ফলে তিনি বাহিনীর অস্তিত্ব নিয়ে শংকিত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় রমযানের শেষ দশ দিন সমাগত হলে তিনি তাদের বিপদ মুক্তির জন্য দোয়া কুনুত পড়লেন।

৭. কুনুত পড়ার সময় : কিরাত শেষে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অথবা রুকু থেকে উঠার পর দোয়া কুনুত পড়া যায়। হোমায়েদ বলেন : আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করলাম কুনুত কি রুকুর পরে না আগে পড়া উচিত? আনাস বললেন : আমরা আগেও পড়তাম, পরেও পড়তাম। -ইবনে মাজাহ।

রুকুর পূর্বে কুনুত পড়লে কিরাত শেষে হাত তুলে আল্লাহু আকবার বলবে, আবার কুনুতের শেষেও আল্লাহু আকবার বলবে। এটা কোনো কোনো সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম কুনুতের সময় হাত তোলা মুস্তাহাব মনে করেন, আর কেউ কেউ করেননা।

দু'হাত দিয়ে মুখ মসেহ করা হবে কিনা, সে সম্পর্কে বায়হাকি বলেন, প্রয়োজন নেই। প্রাচীন মনীষীগণ শুধু হাত তুলতেন। তাই শুধু হাত তোলাই যথেষ্ট মনে করা উচিত।

৮. বিতিরের পর দোয়া : বিতিরের সালাম ফেরানোর পর তিনবার "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস" এভাবে পড়া মুস্তাহাব যে, তৃতীয়বার এটি উচ্চস্বরে বলবে, তারপর বলবে, "রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ"। উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বিতিরে সাব্বিহিসমা রাব্বিকা ....." কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এই তিনটি সূরা পড়তেন। আর সালাম ফেরানোর পর তিনবার বলতেন : "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস" তন্মধ্যে তৃতীয়বার পড়তেন উচ্চস্বরে ও লম্বা করে। -নাসায়ী। দারকুতনী আরো সংযোগ করেছেন, তিনি আরো বলতেন : রব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. নিম্নোক্ত দোয়া বিতিরের শেষে পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَاأُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

৯. এক রাতে দু'বার বিতির পড়া যাবেনা : যে ব্যক্তি বিতির পড়ে ফেলেছে, তারপর তার মনে চাইল আরো নামায পড়বে, তার জন্য নামায পড়া বৈধ। বিতির পুনরায় পড়তে হবেনা। আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযি আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আলী রা. বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : "এক রাতে দু'বার বিতির নয়।" আর আয়েশা রা. বলেছেন রসূল সা. আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফেরাতেন। ছালাম ফেরানোর পর বসে বসে আরো দু'রাকাত নামায পড়তেন। উম্মে সালমা রা. বলেছেন : রসূল সা. বিতিরের পর বসে বসে দু'রাকাত নামায পড়তেন। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি প্রমুখ।

১০. বিতিরের কাযা : অধিকাংশ আলেমের মতে, বিতিরের কাযা করা শরিয়তের বিধি। বায়হাকি ও হাকেম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বিতির পড়া ছাড়াই কারো ভোর হয়ে গেলে বিতিরটা পড়ে নেয়া উচিত। আর আবু দাউদ আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বিতির পড়তে কেউ যদি ভুলে যায় অথবা বিতির না পড়েই ঘুমিয়ে যায়, তবে সে যেনো মনে পড়া মাত্রই বিতির পড়ে নেয়। আহমদ ও তাবারানি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. সকাল হওয়ার পরও বিতির পড়তেন।

বিতির কাযা করার সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাব অনুসারে যেসব সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ, সেসব সময় বাদ দিয়ে কাযা করতে হবে। শাফেয়ী মাযহাবে দিন বা রাতের যে কোনো সময় কাযা করা যাবে। মালেক ও আহমদের মতে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর ফজরের নামায পড়ার আগে কাযা করতে হবে।

১২. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়া

কঠিন বিপদ মুসিবতের সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সশব্দে কুনুতে নাযেলা পড়ার বিধান রয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. এক নাগাড়ে এক মাস যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরে কুনুত পড়েছেন। দ্বিতীয় রাকাতে সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার অব্যবহিত পর বনু সুলাইম গোত্রের রাল, যাকওযান ও উসাইয়া শাখার উপর বদ দোয়া করতেন এবং জামাতের লোকেরা আমীন বলতো। – আবু দাউদ ও আহমদ। আহমদ যোগ করেছেন : রসূল সা.এই তিন শাখা গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ঐ দূতদের হত্যা করেছিল। (রাল, যাকওয়ান ও উসাইয়া–বনু সুলাইম গোত্রের এই তিনটি শাখা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রসূল সা. এর নিকট বার্তা পাঠায় যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাই আমাদেরকে ইসলামের বিধান শেখানোর জন্য কিছু লোক পাঠান। তিনি তাদের কাছে সত্তর জন সুশিক্ষিত সাহাবিকে পাঠালে তারা তাদের সবাইকে হত্যা করে। ইতিহাসে এই ঘটনাকে বীরে মাউনার হত্যাকাণ্ড বলা হয়। এটি ছিলো কুনুতের সূচনা। ইকরামা বলেছেন : এটা ছিলো কুনুতের শুরু।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন কারো জন্য দোয়া বা বদদোয়া করতে চাইতেন, রুকুর পর কুনুত পড়তেন। তিনি সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা ও রাব্বানা লাকাল হামদ বলার পর বলতেন : হে আল্লাহ, ওলীদ বিন ওলীদকে, সালামা বিন হিশামকে, আইয়াশকে ও দুর্বল মুসলমানদেরকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ, মুদার গোত্রের উপর তোমার শাস্তিকে কঠোরতর করো এবং ইউসুফ আ. এর দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ তাদের উপর চাপিয়ে দাও।" তিনি এগুলো সশব্দে বলতেন। তার বিভিন্ন নামাযে বিশেষত: ফজরের নামাযে বলতেন : "হে আল্লাহ অমুক ও অমুকের উপর অভিসম্পাত করো।" আরবের দুটো গোত্রের নামোল্লেখ করে বলতেন। অবশেষে আল্লাহ নাযিল করলেন : "এ ব্যাপারে তোমার কোনোই হাত নেই।

আল্লাহ হয় তাদেরকে ক্ষমা করবেন, অথবা শাস্তি দেবেন। কেনোনা তারা অত্যাচারী-যালিম।" –আহমদ, বুখারি।

১৩. ফজরের নামাযে কুনুত পড়া

একমাত্র কঠিন দুর্যোগ ও বিপদ মুসিবত ব্যতিত ফজরের নামাযে কুনুত পড়ার নিয়ম নেই। দুর্যোগে ও বিপদ মুসিবতে ফজরে ও অন্য সকল নামাযে কুনুত পড়ার বিধান রয়েছে যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি বর্ণনা করেছেন : আবু মালেক আল-আশয়ারী বলেছেন : আমার অব্বা ষোল বছর বয়স থেকে রসূল সা. এর পেছনে এবং আবু বকর ও উমর রা. এর পেছনে নামায পড়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : তারা কি কুনুত পড়তেন? তিনি বললেন : হে আমার কচি ছেলে, না।

ইবনে হিব্বান, খতীব ও ইবনে খুযায়মা আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য দোয়া বা বদদোয়া করা ব্যতিত ফজরের নামাযে কুনুত পড়তেননা। যুবাইর ও তিন খলিফা বর্ণনা করেন যে, তারা ফজরের নামাযে কুনুত পড়তেননা। এটাই হানাফী, হাম্বলী, ইবনুল মুবারক, ছাওরী ও ইসহাকের অভিমত। শাফেয়ী মাযহাবের মতে ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পর কুনুত পড়া সুন্নত। তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে সিরীন বলেছেন : আনাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো : রসূলুল্লাহ সা. কি ফজরের নামাযে কুনুত পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন : হাঁ। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো : রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন : রুকুর পরে। আর আহমদ, বাযযার, দারকুতনী, বায়হাকি ও হাকেম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় পর্যন্ত ফজরে কুনুত পড়তেন।

তবে এই প্রমাণ প্রদর্শন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যে কুনুত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, তা হলো কুনুত নাযেলা অর্থাৎ দুর্যোগকালীন কুনুত। বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় এ কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। এটা যুক্তিগ্রাহ্য নয় যে, রসূল সা. সারা জীবন ফজরে কুনুত পড়বেন, অথচ তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ তা বর্জন করবেন। এমনকি আনাস নিজেও যে ফজরে কুনুত পড়তেননা, তা প্রমাণিত হয়েছে। আর যদি হাদিসটির বিশুদ্ধতা মেনেও নেয়া হয়, তবে তাকে এই অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, তিনি যতোদিন বেঁচে ছিলেন, রুকুর পরে দোয়া পড়ার জন্য দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। এটাও কুনুতের একটা অর্থ এবং এখানে এই অর্থটাই অধিকতর মানানসই। তবে প্রকৃত ব্যাপার যাই হোক, এটা সম্পূর্ণ বৈধ মতভেদ, যেখানে কাজ করা ও না করা সমান হয়ে যায় এবং রসূল সা.-এর উপস্থাপিত আদর্শই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

১৪. কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ নামায

ফযীলত : ১. আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সা.কে কিয়ামুল লাইলের আদেশ দিয়ে বলেছেন : "রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো তোমার জন্য অতিরিক্ত (নফল) হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (সূরা মুয্যাম্মিল)

এ আদেশটি যদিও রসূল সা.-এর জন্য নির্দিষ্ট তথাপি সাধারণ মুসলমানরা যেহেতু রসূল সা. এর অনুকরণের আদেশপ্রাপ্ত, তাই তারাও এ আদেশের আওতাভুক্ত।

২. অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, যারা নিয়মিত রাতের নামায বা তাহাজ্জুদ পড়ে, তারাই সৎকর্মশীল এবং আল্লাহর রহমত ও কল্যাণের অধিকারী। আল্লাহ বলেন : "যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা বাগানসমূহে ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যে

নিয়ামত দান করবেন তারা তা গ্রহণ করবে। নিশ্চয় তারা তার আগে (অর্থাৎ দুনিয়ায়) সৎকর্মশীল ছিলো। তারা রাতে খুব কমই ঘুমাতো। তারা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।"

৩. যারা রাতে নামায পড়ে তাদের তিনি প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর সৎ ও পুণ্যবান বান্দাদের দলভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন : "দয়াময়ের বান্দারা ভূ-পৃষ্ঠে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে, আর মূর্খরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে : সালাম। আর তারা রাত কাটায় সাজদার মধ্য দিয়ে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

৪. যারা তাহাজ্জুদ পড়ে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে বলে আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "আমার আয়াতসমূহের প্রতি কেবল তারাই ঈমান রাখে, যাদেরকে আয়াতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা সাজদায় পতিত হয়। তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা অহংকারে মত্ত হয়না। তাদের পিঠ বিছানা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তারা আশা ও ভয় সহকারে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে দান করে। কোনো ব্যক্তি জানেনা তাদের জন্য কি কি চোখ জুড়ানো জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃত সৎকর্মের প্রতিদান হিসেবে।"

৫. তারা যেসব গুণাবলি দ্বারা সজ্জিত, তা যাদের মধ্যে নেই, তাদের সাথে যে তাদের তুলনা হতে পারেনা সে কথা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন : "রাতের মুহূর্তগুলোতে যারা দাঁড়িয়ে ও সাজদার মধ্য দিয়ে দোয়ায় নিয়োজিত থাকে, আখেরাতকে ভয় পায় এবং তাদের প্রতিপালকের দয়া কামনা করে, তুমি বলো : সেসব বিজ্ঞ ব্যক্তি কি অজ্ঞদের সমান হতে পারে। শিক্ষা তো গ্রহণ করে কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই।" এতো গেলো আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু উদ্ধৃতি। এবার রসূলুল্লাহ সা. এর হাদিস থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করবো :

১. আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. সর্বপ্রথম যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন জনগণ দলে দলে তার কাছে সমবেত হতে লাগলো। আমিও তাঁর কাছে আগমনকারীদের একজন ছিলাম। আমি যখন গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম, তখন স্পষ্ট বুঝলাম যে, তার চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। সর্ব প্রথম তাঁর যে বাণী শুনলাম তা ছিল : হে জনতা, তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক বিস্তার ঘটাও, মানুষকে খানা খাওয়াও, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সংরক্ষণ করো এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামায পড়। তাহলে তোমরা শান্তির সাথে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। –হাকেম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। তিরমিযি বলেছেন, এটি হাসান সহীহ হাদিস।

২. সালমান ফারসী রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা রাতে নামায পড়ো। কারণ এটা তোমাদের পূর্ববর্তী মহৎ লোকদের রীতি। কারণ, রাতের নামায তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকটবর্তী করে, গুনাহগুলো মোচন করে, পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং শরীর থেকে রোগ বিতাড়িত করে।"

৩. সাহল বিন সা'দ বলেছেন : জিবরীল রসূল সা.-এর নিকট এসে বললেন : "হে মুহাম্মদ, আপনি যতো দিন ইচ্ছা বেঁচে থাকুন। কিন্তু একদিন আপনাকে মরতেই হবে। আর যা ইচ্ছা করুন। তবে তার কর্মফল আপনাকে ভোগ করতেই হবে। আর আপনি যাকে ইচ্ছা ভালোবাসুন। কিন্তু মনে রাখবেন, তাকে একদিন আপনার ত্যাগ করতে হবেই। আর জেনে রাখুন, মুমিনের মর্যাদা তার রাতের নামাযে। আর তার মানুষের নিকট মুখাপেক্ষাহীন থাকার মধ্যেই তার সম্মান নিহিত।"

৪. আবুদ দারদার মাধ্যমে রসূল সা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে

ভালোবাসেন, তাদের দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং তাদেরকে সুসংবাদ দেন : যার সামনে কোনো বাহিনী আত্মপ্রকাশ করে এবং সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে বাজি রেখে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে। এরপর হয় সে শহীদ হবে, নচেত আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন ও তাকে রক্ষায় যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং বলবেন : আমার এই বান্দাকে দেখো, কিভাবে আমার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে। যার সুন্দরী স্ত্রী ও নরম বিছানা থাকা সত্ত্বেও রাতে নামাযে দাঁড়ায় তাকে দেখে আল্লাহ বলেন : সে আমাকে স্মরণ করে তার কামবাসনা সংযত করে। ইচ্ছা করলে সে শুয়ে থাকতে পারতো। আর যে ব্যক্তি সফরে কাফেলার সাথে থাকে, কাফেলা কিছু রাত জাগে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু সে সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় শেষ রাতে উঠে নামাযে দাঁড়ায়।

কিয়ামুল লাইলের নিয়মাবলী

যে ব্যক্তি রাতে নামায পড়তে ইচ্ছুক, তার জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো সুন্নত :

১. ঘুমাবার সময় রাতে ঘুম থেকে উঠে নামায পড়বে বলে নিয়ত করা। আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "রাতে ঘুম থেকে, উঠে নামায পড়বো– এরূপ নিয়ত করে যে ব্যক্তি বিছানায় যায়, কিন্তু তার ঘুম তার উপর প্রবল হয়ে পড়ে এবং ভোর হয়ে যায়, তার জন্য সে যা নিয়ত করেছে, সেটাই লেখা হবে এবং তার ঘুম তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাকে দেয়া সদকায় পরিণত হবে।" নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

২. ঘুম থেকে যখন জাগবে, তখন চেহারা থেকে ঘুমের জড়তা মুছে ফেলবে, দাঁত পরিষ্কার করবে, তারপর আকাশের দিকে তাকাবে এবং রসূল সা. থেকে যে দোয়া বর্ণিত হয়েছে, তা পড়বে। বলবে :

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللّٰهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

"তুমি ব্যতিত আর কোনো ইলাহ নেই, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি, আমার গুনাহর জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার রহমত চাই। হে আল্লাহ, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, আমাকে হিদায়েত করার পর আর বিপথগামী করোনা এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে রহমত দান করো। তুমিই প্রকৃত দাতা। মহান আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাকে মৃত্যু দেয়ার পর জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকট পুনরুত্থিত হতে হবে।" এরপর সূরা আল ইমরানের ইন্না ফী খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ থেকে শেষ দশ আয়াত পড়বে। তারপর বলবে :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

"হে আল্লাহ, তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি আকাশ পৃথিবী ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার আলো, তোমার জন্য প্রশংসা, তুমি আকাশ ও পৃথিবীর রক্ষক, তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য,

নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার উপর নির্ভর করেছি, তোমার প্রতি অনুগত হয়েছি, তোমার নিকটই বিচার চাই, তুমি আমার আগের পেছনের গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দাও, তুমি আল্লাহ্, তুমি ব্যতিত আর কোনো ইলাহ্ নেই।"

৩. প্রথম দু'রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায দ্বারা শুরু করবে, তারপর যতো ইচ্ছা নামায পড়বে, আয়েশা রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. যখন রাতের নামায শুরু করতেন, তখন সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত দিয়ে শুরু করতেন। আবু হুরায়রা বলেন, রসূল সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন রাতে নামায পড়তে ইচ্ছা করবে, তখন হালকা দু'রাকাত দিয়ে শুরু করো।" –মুসলিম।

৪. পরিবারকে জাগানো। আবু হুরায়রা বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে রাতে জেগে নামায পড়লো এবং স্বীয় স্ত্রীকে জাগালো। স্ত্রী যদি উঠতে না চায়, তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। রসূল সা. আরো বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যখন রাতে তার স্ত্রীকে জাগায়, অতপর উভয়ে নামায পড়ে অথবা উভয়ে একসাথে দু'রাকাত নামায পড়ে, তাদেরকে যিকিরকারী পুরুষদের ও যিকিরকারী নারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে লেখা হবে। –আবু দাউদ। উম্মে সালামা রা. বলেছেন : একদিন রাতে রসূল সা. ঘুম থেকে জাগলেন এবং বললেন : সুবহানাল্লাহ্, আজকের রাতে কী মনোমুগ্ধকর জিনিস নাযিল হয়েছে! কী রত্নভাণ্ডার নাযিল হয়েছে! গৃহ বাসিণীদের কে জাগাবে? পৃথিবীতে পোশাকাবৃত অনেকেই কিয়ামতের দিন নগ্ন থাকবে। –বুখারি। আলী রা. বলেছেন : রসূল সা. তার ও ফাতিমার দরজায় করাঘাত করলেন এবং বললেন : তোমরা কি নামায পড়োনা? আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ্ আমাদের মন আল্লাহর হাতে। তিনি যদি আমাদেরকে জাগাতে চান জাগাবেন। আমি এ কথা বলামাত্র তিনি চলে গেলেন। তারপর শুনলাম, তিনি নিজের উরুর উপর চপেটাঘাত করতে করতে চলে যাচ্ছেন এবং বলছেন : "মানুষ সবচেয়ে ঝগড়াটে প্রাণী।" –বুখারি, মুসলিম।

৫. নামায পড়তে পড়তে ঘুম প্রবল হয়ে উঠলে নামায ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়বে, যতোক্ষণ না ঘুম ছেড়ে যায়। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : "রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন রাতে নামায পড়তে উঠে, অতপর কুরআন যখন তার মুখে ভুলভাবে উচ্চারিত হতে থাকে এবং কি পড়ছে তা বুঝতে পারেনা, তখন তার শুয়ে পড়া উচিত। –মুসলিম। আর আনাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, দুটো খুঁটিতে রশি বাঁধা রয়েছে। তিনি বললেন : এটা কি? লোকেরা বললো : যয়নব ওটা টানিয়েছে। যখন তার ভেতরে জড়তা ও ক্লান্তি আসে, তখন ওটা ধরে। রসূল সা. বললেন : ওটা খুলে ফেলো। তোমাদের উচিত যতোক্ষণ স্বতস্ফূর্তভাবে নামায পড়তে পারো ততোক্ষণ পড়বে। যখন ক্লান্তি ও জড়তা আসবে তখন শুয়ে পড়বে। –বুখারি ও মুসলিম।

৬. মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করবেনা, শারীরিক শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী রাত জেগে নামায পড়বে এবং সব সময় অব্যাহত রাখবে। অনিবার্য কারণ ব্যতিত কখনো বাদ দেবেনা। আয়েশা রা. বলেছেন : "তোমরা যে আমল চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখ, সেই আমলকেই নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম, তোমরা যতোক্ষণ ক্লান্ত না হও, ততোক্ষণ আল্লাহ্ ক্লান্ত হননা। (অর্থাৎ তোমরা যতোক্ষণ ইবাদত বন্ধ না করো ততোক্ষণ আল্লাহ্ সওয়াব দেয়া বন্ধ করেননা।) –বুখারি, মুসলিম। আয়েশা রা. থেকে বুখারি ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন্ আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তিনি বললেন : যে আমল নিয়মিত করা হয় যদিও তা পরিমাণে কম হয়। মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে :

রসূল সা. যে কাজই করতেন নিয়মিতভাবে ও স্থায়ীভাবে করতেন। বুখারি ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. বললেন : হে আব্দুল্লাহ, অমুকের মতো হয়োনা। যা রাতে উঠে নামায পড়তো। কিন্তু পরে তা ত্যাগ করে। বুখারি ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. এর সামনে এক ব্যক্তির কথা আলোচিত হলো; সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল। রসূল সা. বললেন : ঐ ব্যক্তির কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। বুখারি ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আব্দুল্লাহ খুবই ভালো লোক- যদি রাতে নামায পড়তো। সালেম বলেন : এরপর থেকে আব্দুল্লাহ রাতে খুব কমই ঘুমাতেন।

কিয়ামুল লাইলের সময় : রাতের নামায রাতের প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে বা শেষ ভাগে পড়া যায় -যদি তা এশার নামাযের পরে হয়। আনাস রা. রসূল সা. এর নামাযের বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেছেন : আমরা যখনই রাতে রসূল সা. কে নামাযরত দেখতে চাইতাম নামাযরত দেখতাম, আর যখনই তাকে ঘুমন্ত দেখতে চাইতাম ঘুমন্ত দেখতাম। আর সারা মাস রোযা রেখেই যেতেন, যতোক্ষণ না আমরা বলতাম, রসূল সা. রোযা ভাংগেননা। যেই বলতাম অমনি ভাংতেন। আর রোযা ভাংতেই থাকতেন, যতোক্ষণ না আমরা বলতাম, তিনি রোযা রাখেননা। -আহমদ, বুখারি, নাসায়ি। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন : রসূল সা.-এর তাহাজ্জুদের কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিলোনা, বরং যখনই সম্ভব হতো তাহাজ্জুদ পড়তেন।

তাহাজ্জুদের সর্বোত্তম সময় কোনটি?

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আমাদের প্রতিপালক সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন : কে আমার কাছে দোয়া করবে, কে আমার কাছে গুনাহ মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করবো। -সব কটা সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

২. আমর বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : তিনি বলেছেন, আমি রসূল সা. কে বলতে শুনেছি : রাতের শেষ অর্ধাংশে বান্দা প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে। এই সময়টাতে যদি আল্লাহর স্মরণকারী হতে পার তবে হও।" হাকেম, তিরমিযি, নাসায়ী।

৩. আবু মুসলিম আবু যরকে জিজ্ঞাসা করলেন : রাতের কোন্ অংশে নামায পড়া ভালো? তিনি বললেন : তোমার মতো আমিও একথা রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন : শেষ রাত বা মধ্যরাত। তবে খুব কম লোকই তা করে। -আহমদ।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা দাউদ (আ.) এর রোযা, আর সবচেয়ে প্রিয় নামায দাউদ (আ.) এর নামায। তিনি রাতের অর্ধেক ঘুমাতেন। এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন এবং এক ষষ্ঠমাংশ ঘুমাতেন। আর একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন খানাপিনা করতেন। -তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

রাতের নামায কত রাকাত : রাতের নামাযের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যাও নেই, নির্দিষ্ট সীমাও নেই। এশার পর বিতির পড়া দ্বারা রাতের নামায আদায় হয়ে যায়।

১. সামুরা বিন জুনদুব রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন রাতে কম বা বেশি নামায পড়তে এবং সব নামাযের শেষে বিতির পড়তে। -তাবারানি, বাযযার।

২. আনাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার মসজিদের নামায দশ হাজার নামাযের সমান। আর মসজিদুল হারামের নামায এক লক্ষ নামাযের সমান। আর জিহাদের

ময়দানের নামায দুই লক্ষ নামাযের সমান। আর এই সমস্ত নামাযের চেয়ে বেশি মর্যাদা মধ্য রাতের নামাযের। –আবুশ শায়খ, ইবনে হিব্বান, আত্‌তারগীব ওয়াততারহীব ।

৩. ইয়াস রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রাতে কিছু নামায পড়তেই হবে– চাই তা ছাগলের দুধ দোহনে যতোটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের জন্যই হোক। এশার নামাযের পরেই রাতের নামাযের সময়। –তাবারানি।

৪. ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : আমি একবার রাতের নামাযের বিষয় আলোচনা করলাম। তখন কেউ কেউ বললো, রসূল সা. বলেছেন : রাতের অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ, এমনকি উটনী দোহনের সমপরিমাণ সময় কিংবা ছাগল দোহনের সমপরিমাণ সময়।

৫. ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে রাতের নামাযের জন্য আদেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। এমনকি এ কথাও বলেছেন : তোমরা এক রাকাত হলেও রাতের নামায পড়ো। –তাবারানি।

সব সময় এগারো বা তেরো রাকাত (বিতিরসহ) পড়া উত্তম। এই নামায একটানাও পড়া যায়, মাঝে বিরতি দিয়েও পড়া যায়। আশেয়া রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. রমযানে বা অন্য কোনো সময়, এগারো রাকাতের বেশি পড়তেননা। চার রাকাত পড়তেন, সেটা কেমন সুন্দর বা কতো লম্বা জিজ্ঞাস করোনা। তারপর আবার চার রাকাত পড়তেন। সেটা কতো সুন্দর ও কতো লম্বা জিজ্ঞাসা করোনা। তারপর তিন রাকাত পড়তেন। আমি বললাম। : হে রসূলুল্লাহ্ সা. বিতির পড়ার আগে কি আপনি ঘুমান ? তিনি বললেন : হে আয়েশা আমার চোখ দুটো ঘুমায়। কিন্তু আমার মন ঘুমায়না। –বুখারি, মুসলিম। কাসেম বিন মুহাম্মদ থেকে বুখারি ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেন, আয়েশা রা. কে বলতে শুনেছি: রসূল সা. -এর রাতের নামায ছিলো দশ রাকাত দশ রাকাত আর বিতির পড়তেন একটা সাজদার মাধ্যমে।

৬. রাতের নামাযের কাযা : মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. কোনো ধরনের অসুস্থতাবশত রাতের নামায ছুটে গেলে দিনের বেলায় বারো রাকাত পড়তেন। আর বুখারি ব্যতিত সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি তার যিকির বা দোয়া অর্থাৎ রাতের নামায যা সে নিয়মিত পড়তে অভ্যস্ত, তা বা তার অংশ বিশেষ রাতে পড়তে পারেনি, অতপর ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়ে নেয়, তার সম্পর্কে লেখা হবে সে যেনো রাতেই পড়েছে।

১৫. রমযানের রাতে নামায পড়া

১. এ সংক্রান্ত শরিয়তের বিধি : রমযানের রাতের নামায বা তারাবীহ্র নামায* নারী ও পুরুষ সকলের জন্য সুন্নত।** এশার পর ও বিতিরের পূর্বে দুই দুই রাকাত করে এ নামায পড়তে হয়। বিতিরের পরেও পড়া বৈধ। তবে সেটা উত্তম নয়। তারাবীর ওয়াক্ত শেষ রাত পর্যন্ত থাকে। সমস্ত সহীহ্ হাদিস গ্রন্থে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত :

রসূলুল্লাহ্ সা. রমযান মাসে রাতের নামায (তারাবীহ্) পড়তে উৎসাহ দিতেন, তবে জোর তাকিদ করতেননা। তিনি বলতেন : যে ব্যক্তি রমযান মাসের রাতে ঈমান সহকারে ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নামায পড়বে, তার অতীতের গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. মসজিদে রাতের নামায পড়লেন। তার সাথে অনেক লোক নামায পড়লো। পরের রাতেও পড়লেন এবং এবার লোক

---

* তারাবীহ تراويح শব্দটি তারবীহা ترويحة এর বহুবচন। এর অর্থ বিশ্রাম। প্রতি চার রাকাত পর সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম নেয়া হয় বলে এ নামাযের নামকরণ হয়েছে তারাবীহ।

** আরফাজা রা. বলেন : আলী রা. তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক পৃথক ইমাম নিয়োগ করতেন। আমি ছিলাম মহিলাদের ইমাম।

সংখ্যা আরো বেশি হলো। তারপর তৃতীয় রাতে লোকেরা জমায়েত হলো। কিন্তু রসূল সা. তাদের দিকে বের হলেননা। পরদিন সকালে বললেন ; তোমরা যা করেছো (অর্থাৎ জমায়েত হয়েছো) তা দেখেছি। কিন্তু তোমাদের উপর এই নামায ফরয হয়ে যাবে এই আশংকায় আমি বের হইনি। এটা ছিলো রমযান মাসের ঘটনা।

২. রাকাত সংখ্যা : সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. রমযানে বা অন্য সময়ে এগারো রাকাতের বেশি পড়তেননা। ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "রসূল সা. জামাতের ইমাম হয়ে আট রাকাত ও বিতির পড়ালেন। পরবর্তী রাতেও লোকেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করলো। কিন্তু তিনি তাদের কাছে এলেননা। আবু ইয়ালা ও তাবারানি জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : উবাই বিন কা'ব রসূল সা. এর কাছে এলেন এবং বললেন : হে রসূল, গত রাতে আমি একটা কাজ করে ফেলেছি। অর্থাৎ রমযানে। রসূল সা. বললেন : সেটি কী, হে উবাই? উবাই বললেন : আমার বাড়ির কিছু মহিলা বললো : আমরা তো কুরআন পড়তে পারিনা। তাই আপনার সাথে নামায পড়বো। অতপর আমি তাদেরকে নিয়ে আট রাকাত ও বিতির পড়েছি। রসূল সা. কিছু বললেননা। এটা তাঁর সম্মতির সুন্নত ছিলো। এটুকুই হলো রসূল সা. থেকে প্রাপ্ত সুন্নত। এছাড়া বিশুদ্ধ সনদে আর কিছু জানা যায়নি। একথাও সহীহ হাদিস থেকে জানা যায় যে, উমর, উসমান ও আলীর রা. আমলে লোকেরা বিশ রাকাত তারাবীহ পড়তো। এটাই হানাফী, হাম্বলী ও দাউদের অনুসারী অধিকাংশ ফকীহর মত। তিরমিযি বলেছেন : অধিকাংশ আলেম উমর ও আলী প্রমুখ সাহাবির মতানুসারে বিশ রাকাতই পড়ার পক্ষপাতি। ছাওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফেয়ীর মতও তদ্রূপ। শাফেয়ী বলেছেন : আমি মক্কাবাসীকে এভাবে বিশ রাকাতই পড়তে দেখেছি।*

কিছু আলেমের মতে, বিতিরসহ এগারো রাকাত সুন্নত এবং অতিরিক্ত মুস্তাহাব। ইবনে হুমাম বলেছেন : প্রমাণাদি থেকে দেখা যায়; বিশ রাকাতের মধ্যে রসূল সা. যতো রাকাত পড়েছেন এবং আমাদের উপর ফরয হবার ভয়ে যা বাদ দিয়েছেন সেটাই সুন্নত। আর অবশিষ্ট মুস্তাহাব। বুখারি ও মুসলিম থেকে জানা যায়, এটা ছিলো বিতিরসহ এগারো রাকাত। সুতরাং আমাদের ইমামদের মতানুযায়ী বিশ রাকাতের মধ্যে আট রাকাত সুন্নত ও বারো রাকাত মুস্তাহাব।

৩. তারাবীহর জামাত : রমযানের রাতের নামায জামাতেও পড়া যায়, একা একাও পড়া যায়। তবে জামাতে ও মসজিদে পড়া অধিকাংশের মতে উত্তম। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদেরকে নিয়ে জামাতে পড়েছেন। কিন্তু ফরয হওয়ার আশংকায় নিয়মিত উপস্থিত হননি। এরপর উমর জামাতে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। আবদুর রহমান বলেছেন : রমযানের এক রাতে উমরের রা. সাথে মসজিদে গেলাম। দেখলাম, লোকেরা বিভিন্ন পন্থায় নামায পড়ছে। কেউ বা একাকী পড়ছে। আবার কারো পেছনে এক দল জামাতবদ্ধ হয়ে পড়ছে। উমর রা. বললেন : আমার মনে হয়, এই লোকদেরকে যদি একজন কুরআন অভিজ্ঞ লোকের ইমামতিতে জামাতবদ্ধ করি, তাহলে সেটাই উত্তম হবে। তারপর তিনি এই মতে দৃঢ় থাকলেন এবং উবাই বিন কাব'কে ইমাম নিযুক্ত করে জনগণকে জামাতবদ্ধ করলেন। পরে আরেক রাতে তার সাথে বের হলাম। দেখলাম লোকেরা ইমামের পেছনে নামায পড়ছে। তা দেখে উমর বললেন : 'এটা একটা চমৎকার নতুন ব্যবস্থা। তবে শেষ রাতে পড়ার উদ্দেশ্যে

* ইমাম মালেকের মতে বিতির ছাড়া তারাবী ছত্রিশ রাকাত। যারকানী বলেন : ইবনে হিব্বানের বর্ণনা অনুযায়ী তারাবী শুরুতে এগারো রাকাত ছিলো। কিন্তু লম্বা কিরাত পড়ার কারণে নামাযীদের কষ্ট হচ্ছিলো। তাই কিরাতের পরিমাণ কমিয়ে রাকাতের সংখ্যা বাড়িয়ে বিতিরের তিন রাকাত ছাড়া বিশ রাকাত করা হয়েছে। কিরাত পড়া হতো মধ্যম আকারের। এরপর পুনরায় কিরাতের পরিমাণ কমিয়ে বিতির বাদে ছত্রিশ রাকাত করা হলো এবং সেই নিয়ম চালু হয়ে গেলো।

এখন যারা ঘুমাচ্ছে তারাই উত্তম।" কিন্তু লোকেরা প্রথম রাতে পড়তো। –বুখারি, ইবনে খুযায়মা, বায়হাকি।

৪. তারাবীহর কিরাত : রমযানের রাতের নামাযে বা তারাবীতে কোনো নির্দিষ্ট কিরাত পড়া সুন্নত নয়। প্রাচীন মনীষীগণ থেকে বর্ণিত যে, তারা দুশো আয়াত বিশিষ্ট সূরা পড়তেন। অথচ কিরাত লম্বা পড়ার কারণে লাঠিতে ভর দিতে বাধ্য হতেন। তারা ফজরের অভ্যুদয়ের আগে ছাড়া বাড়ি যেতেননা। তারপর ভৃত্যদেরকে দ্রুত খাবার দিতে বলতেন, যাতে সূর্য উঠে না যায়। তারা আট রাকাতে সূরা বাকারা পড়তেন। বারো রাকাতে এই সূরা পড়লে অনেক সহজ করা হলো মনে করতেন। ইবনে কুদামা বলেছেন : ইমাম আহমদের মতে, রমযানে এমন কিরাত পড়া উচিত, যাতে লোকেরা কষ্ট না পায় বরং সহজ বোধ করে। বিশেষত: বছরের ছোট রাতগুলোতে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে। কাজী বলেছেন : রমযান মাসে এক খতম কুরআনের চেয়ে কম পড়া মুস্তাহব মনে করা হয়না, যাতে লোকেরা পুরো কুরআন শুনার সুযোগ পায়। তবে এক খতমের চেয়ে বেশি পড়া উচিত নয় যেনো মুক্তাদিদের কষ্ট না হয়। মানুষের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই ভালো। কোনো জামাত যদি লম্বা পড়া পছন্দ করে এবং একমত হয়, তাহলে সেটা করাই উত্তম হবে। যেমন আবু যর বলেন : আমরা রসূল সা. এর পেছনে রমযানের রাতের নামায পড়েছি। সেটা এতো দীর্ঘ হতো যে, সাহরী বাদ পড়ে যাবে বলে আশংকা হতো। ইমাম দুশো আয়াত বিশিষ্ট সূরা পড়তেন।

১৬. সালাতুদ্দোহা (পূর্বাহ্নের নামায)

ফযীলত : পূর্বাহ্নের নামাযের ফযীলত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদিস রয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমাদের দেহের প্রতিটি হাড়ে ও গ্রন্থিতে সদকা প্রাপ্য রয়েছে। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা সদকা। প্রতিবার আলহামদু লিল্লাহ বলা সদকা, প্রতিটি সৎকাজের আদেশ দান সদকা। প্রতিটি মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সদকা, তবে কেউ যদি পূর্বাহ্নে দু'রাকাত নামায পড়ে, তবে তা এই সমস্ত সদকার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। –আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ।

২. বুরাইদা রা. থেকে আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে, তার প্রত্যেকটি বাবদ সদকা করা তার কর্তব্য। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, এতো সদকা দেয়ার সাধ্য কার আছে? তিনি বললেন : মসজিদে পড়ে থাকা ময়লা পুতে ফেলা উচিত এবং রাস্তায় পড়ে থাকা আবর্জনা সাফ করা উচিত। তাও যদি না পারো তবে পূর্বাহ্নে দু'রাকাত নামায পড়া যথেষ্ট হবে।"

শওকানী বলেছেন : উল্লিখিত হাদিস দুটি পূর্বাহ্নের নামাযের বিরাট ফযীলত এবং এটি যে নিশ্চিতভাবে শরিয়তসম্মত তার প্রমাণ বহন করে। হাদিস থেকে জানা যাচ্ছে যে. তিনশো ষাটটি সদকার বিনিময় হিসেবে দু'রাকাত পূর্বাহ্নের নামায যথেষ্ট। তাই এ নামায সব সময় নিয়মিতভাবে আদায় করার উপযুক্ত। হাদিস দুটি আরো প্রমাণ করে, যতো বেশি পারা যায়, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া, সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, ময়লা আবর্জনা মাটিতে পুতে ফেলা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে নিক্ষেপ করা এবং অন্য যতো রকমের ইবাদত রয়েছে তা করা শরিয়তের দাবি ও নির্দেশ। এ দ্বারা মানুষের উপর প্রতিনিয়ত যেসব সদকা দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে, তা পালিত হবে।

৩. নাওয়াস বিন সাময়ান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : হে আদম সন্তান, দিনের প্রথম প্রহরে চার রাকাত নামায পড়তে শৈথিল্য দেখিওনা আমি তোমার দিনের শেষ ভাগের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। –হাকেম, তাবারানি, আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী।

৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. একটা সেনাদল পাঠালেন। তারা জয়ী হয়ে কিছু সম্পদ হস্তগত করলো এবং ফিরে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করতে লাগলো। এই সময় তাদের অভিযানের দ্রুত পরিসমাপ্তি, লব্ধ গনিমতের আধিক্য ও দ্রুত প্রত্যাবর্তনের বিষয় নিয়ে জনগণের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগলো। তা শুনতে পেয়ে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : কিসে তাদের অভিযান আরো লাভজনকভাবে সমাপ্ত হবে, কিসে তাদের আরো বেশি গনিমত অর্জিত হবে এবং কিসে তাদের প্রত্যাবর্তন দ্রুততর হবে, তা কি আমি তোমাদের বলবোনা? যে ব্যক্তি অযু করবে ও পূর্বাহ্নের তাসবীহর (নামাযের) জন্য মসজিদে যাবে, তার অভিযান অধিকতর লাভজনকভাবে সমাপ্ত হবে। সে আরো বেশি গনিমতের অধিকারী হবে এবং আরো দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী হবে। –আহমদ, তাবারানি, আবু ইয়ালা।

৫. আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : আমার বন্ধু মুহাম্মদ সা. আমাকে তিনটে উপদেশ দিয়েছেন : প্রতি মাসে তিনটে রোযা রাখা, পূর্বাহ্নে দু'রাকাত নামায পড়া এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতিরের নামায পড়া। –বুখারি ও মুসলিম।

৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত : এক সফরে রসূলুল্লাহ সা. কে আট রাকাত পূর্বাহ্নের নামায পড়তে দেখেছি, নামায শেষে বললেন : আমি এমন একটি নামায পড়লাম যা সুসংবাদ ও দুঃসংবাদে মিশ্রিত। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটে জিনিস চেয়েছি, তন্মধ্যে তিনি আমাকে দুটো দিয়েছেন, একটা দিতে অস্বীকার করেছেন। আমি চেয়েছি যেনো আমার উম্মতকে দীর্ঘ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত না করেন। এটা তিনি গ্রহণ করেছেন। আমি চেয়েছি যেনো তাদের উপর তাদের শত্রুকে বিজয়ী না করেন। এটাও তিনি মেনে নিয়েছেন। আমি চেয়েছি যেনো আমার উম্মতকে দলে ও উপদলে বিভক্ত না করেন। কিন্তু আমার এ দোয়া তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। –আহমদ, নাসায়ী, হাকেম, ইবনে খুযায়মা।

পূর্বাহ্নের নামাযের বিধান : পূর্বাহ্নের নামায একটি মুস্তাহাব ইবাদত। যে ব্যক্তি এর ছওয়াব লাভের ইচ্ছুক, তার এটা পড়া উচিত। আর না পড়লে কোনো গুনাহ হবেনা। আবু সাঈদ রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. পূর্বাহ্নের নামায পড়া ততোদিন অব্যাহত রাখতেন, যতোদিন আমরা না বলতাম, রসূলুল্লাহ সা. এ নামায পরিত্যাগ করতেননা। আর যতোদিন আমরা না বলতাম, রসূল সা. পূর্বাহ্নের নামায পড়েননা, ততোদিন বিরত থাকতেন। (অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। যখনই লোকেরা বলাবলি করতো যে, রসূল সা. এ নামায অব্যাহত রেখেছেন, তখনই তিনি বন্ধ করতেন। নচেত আশংকা ছিলো, জনগণ একে ফরয বা ওয়াজিব মনে করে বসতে পারে। আবার এ নামায দীর্ঘদিন বন্ধ রাখায় যখন লোকে বলাবলি করতো যে, তিনি আর এ নামায পড়ছেননা, তখনই পড়তেন। অন্যথায় তারা মনে করতে পারতো যে, এ নামায রহিত হয়ে গেছে। –অনুবাদক।)

সময় : সূর্য একটা বর্শা পরিমাণ উপরে উঠলে এ নামাযের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিমে ঢলে পড়ার সাথে সাথেই এর সময় শেষ হয়ে যায়। তবে সূর্য উপরে উঠা ও উত্তাপ বেড়ে যাওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। যায়দ বিন আরকাম রা. বলেছেন : "কুবাবাসী যখন পূর্বাহ্নের নামায পড়ছিল, তখন রসূলুল্লাহ সা. তাদের কাছে গেলেন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের নামায তখনই হবে, যখন শিশু উটগুলো প্রচণ্ড গরম অনুভব করবে। এ সময়টা হলো পূর্বাহ্ন অর্থাৎ দুপুরের পূর্বাহ্ন। -আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি।

কতো রাকাত : ইতিপূর্বে আবু যরের রা. হাদিসটিতে যেমন বলা হয়েছে, এর ন্যূনতম পরিমাণ হলো দু'রাকাত। আর রসূল সা. এর বাস্তব কাজ থেকে প্রমাণিত, এর সর্বোচ্চ পরিমাণ আট রাকাত। তবে রসূল সা. এর কথা থেকে জানা যায়, সর্বোচ্চ বারো রাকাত। আবু জাফর তাবারিসহ একটি গোষ্ঠির মত হলো, এর কোনো সর্বোচ্চ রাকাত সংখ্যা নেই। তিরমিযির টিকায় ইরাকি বলেছেন : আমি কোনো সাহাবি বা তাবেয়ী থেকে এমন একটি হাদিসও পাইনি,

যাতে এ নামাযকে বারো রাকাতে সীমিত করেছেন। সুয়ূতীর বক্তব্য তদ্রূপ। সাঈদ বলেছেন, হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হলো : রসূল সা. এর সাহাবিগণ কি এ নামায পড়তেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কেউ দু'রাকাত কেউ চার রাকাত, আবার কেউবা দুপুর পর্যন্ত এক নাগাড়ে পড়তেন। ইব্রাহীম বলেছেন : এক ব্যক্তি আসওয়াদকে জিজ্ঞাসা করলো : পূর্বাহ্নের নামায কতো রাকাত পড়বো? তিনি বললেন : যতো ইচ্ছা। উম্মে হানী রা. বলেছেন : রসূল সা. পূর্বাহ্নের নামায আট রাকাত পড়েছেন, প্রত্যেক দু'রাকাতের সালাম ফিরিয়েছেন। –আবু দাউদ। আর আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. পূর্বাহ্নে চার রাকাত পড়তেন, আর যতো ইচ্ছা বাড়াতেন। -আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ।

১৭. ইসতিখারার নামায

যে ব্যক্তি কোনো মুবাহ (শরিয়তে যা বৈধ) কাজ করতে চায় কিন্তু তার ফল ভালো হবে কিনা বুঝতে পারেনা, তার জন্য দু'রাকাত নামায পড়া সুন্নত। এই নামায অবশ্যই ফরয নামায ব্যতিত অন্য নামায হতে হবে। দিনের বা রাতের যে কোনো সময়ের নিয়মিত সুন্নত নামায বা তাহিয়াতুল মসজিদের নামায থেকে যে কোনো দু'রাকাত ইসতিখারার নিয়তে পড়লেও চলবে। সূরা ফাতিহার পর যে কোনো সূরা বা আয়াত পড়বে। নামায শেষে আল্লাহর প্রশংসা করবে ও রসূল সা. এর উপর দরূদ পড়বে। তারপর বুখারি জাবের রা. থেকে যে দোয়াটি বর্ণনা করেছেন তা পড়বে। জাবের রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে 'সকল কাজে' ইসতিখারা করার শিক্ষা দিতেন, ঠিক যেভাবে কুরআনের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার ফরয ব্যতিত অন্য কোনো নামায থেকে দু'রাকাত পড়া উচিত। তারপর দোয়া করা উচিত :

اَللّٰهُمَّ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ، اَوْ قَالَ : عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِىْ فِىْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ، أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهِ.

"হে আল্লাহ, আমি তোমার জ্ঞানের কাছ থেকে কিসে ভালো ও কল্যাণ হবে তা জানতে চাই, তোমার অসীম শক্তি থেকে শক্তি চাই এবং তোমার বিপুল অনুগ্রহের ভাণ্ডার থেকে অনুগ্রহ চাই। তুমি তো সব ক্ষমতার অধিকারী। আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তুমি সবকিছু জানো, আমি কিছুই জানিনা। তুমি সকল অদৃশ্য বিষয়েও প্রখর জ্ঞানী। হে আল্লাহ, তুমি যদি জানো যে, এই কাজটি আমার জন্য আমার দীনদারি, আমার জীবন ও জীবিকা এবং আমার কাজের শেষ পরিণামের দিক দিয়ে ভালো ও কল্যাণকর হবে, অন্য বর্ণনা মতে, আমার ইহকালের ও পরকালের দিক দিয়ে কল্যাণকর হবে, তাহলে এটিকে আমার জন্যে নির্ধারণ করে দাও এবং আমার জন্য সহজ করে দাও। অতপর তাতে আমার জন্য সমৃদ্ধি ও কল্যাণ নিহিত রাখ। আর যদি তুমি জানো, এ কাজ আমার জন্য আমার দীনদারি ও জীবন জীবিকার দিক দিয়ে, ও শেষ ফলের দিক দিয়ে, অন্য বর্ণনা মতে, আমার ইহকাল ও পরকালের দিক দিয়ে খারাপ হবে, তাহলে এ কাজকে আমা থেকে ও আমাকে এ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে নাও এবং আমার জন্য যেখানে কল্যাণ রয়েছে সেখানে কল্যাণকে আমার জন্যে নির্ধারণ করে দাও, অতপর তার

উপর আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও।" "এই কাজ" যখন বলবে, তখন নিজের অভিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করবে।

(শওকানী বলেছেন : জাবেরের উক্তি 'সকল কাজে' ইসতিখারা শিক্ষা দিতেন' দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো কাজকে ছোট ও গুরুত্বহীন মনে করে ইসতিখারা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। অনেক কাজ এমন রয়েছে, যাকে গুরুত্বহীন মনে করা সত্ত্বেও তা করা বা বর্জন করা বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। এ জন্য রসূল সা. বলেছেন : তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সব কিছু চাওয়া উচিত। এমনকি তা জুতো ফিতা হলেও। - টিকা)

এ নামাযে কোনো নির্দিষ্ট আয়াত বা সূরা পড়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস নেই। অদ্রূপ কোনো আয়াত বা সূরা বারবার পড়তে হবে বলেও কোনো হাদিসে উল্লেখ নেই। নববী বলেছেন : ইসতিখারার পরে মন যে দিকে ধাবিত হবে, সেটাই করা উচিত। ইসতিখারার পূর্বে যে দিকে মনের আকর্ষণ ছিলো, তার উপর নির্ভরশীল থাকা উচিত নয় বরং ইসতিখারাকারীর উচিত, নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা। নচেত সে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম পথ কামনাকারী হতে পারবেনা। বরং সে আল্লাহর কাজ থেকে কল্যাণ ও উত্তম কামনায় এবং নিজের জ্ঞান ও শক্তি নেই বলে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তাতে সত্যবাদী গণ্য হবেনা। সত্যবাদী গণ্য হবেনা আল্লাহকেই সকল জ্ঞান ও শক্তির মালিক বলে প্রদত্ত ঘোষণায়ও। এতে যদি সে সত্যবাদী হতো, তাহলে নিজের শক্তি, জ্ঞান ও পূর্ববর্তী ইচ্ছাকে অস্বীকার করতো এবং ইসতিখারার পরে তার পূর্বেকার ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য পোষণ করতোনা।

১৮. সালাতুস তাসবীহ

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রা. কে বললেন : হে আমার চাচা আব্বাস, আমি কি আপনাকে একটা জিনিস দেবোনা? আমি কি আপনাকে এমন একটা বিশেষ জিনিস দেবোনা ? .... যা করলে আল্লাহ আপনার আগের গুনাহ, পেছনের গুনাহ, নতুন গুনাহ, পুরান গুনাহ, ইচ্ছাকৃত গুনাহ, অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, গোপন গুনাহ, প্রকাশ্য গুনাহ, সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। চার রাকাত নামায পড়বেন, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোনো একটি সূরা পড়বেন। প্রথম রাকাতে যখন কিরাত শেষ করবেন তখন "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" ১৫ বার, তারপর রুকুতে গিয়ে উক্ত দোয়া দশবার, রুকু থেকে উঠে দশবার, তারপর সাজদায় গিয়ে দশবার, সাজদা থেকে বসে দশবার, দ্বিতীয় সাজদায় গিয়ে দশবার, দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে দশবার পড়বেন। এভাবে প্রতি রাকাতে পচাত্তর বার পড়া হবে। এভাবে প্রতি রাকাত পড়বেন। এ নামায যদি পারেন প্রতিদিন একবার, নচেত প্রতি শুক্রবার একবার, নচেত প্রতি বছরে একবার, নচেত সারা জীবনে একবার পড়বেন। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, তাবারানি। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন : এ হাদিস বহু সংখ্যক সূত্রে এবং বহু সংখ্যক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল মুবারক বলেছেন : সালাতুত্ তাসবীহ পড়ার প্রতি সকলের আগ্রহী হওয়া উচিত, এটি ঘন ঘন পড়ার অভ্যস্ত হওয়া উচিত এবং শৈথিল্য দেখানো উচিত নয়।

১৯. সালাতুল হাজত

আহমদ আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : যে ব্যক্তি পূর্ণাংগভাবে অযু করবে, অতপর দু'রাকাত নামায পূর্ণাংগভাবে পড়বে, সে যা চাইবে তা আল্লাহ তাকে দেবেন– চাই তাৎক্ষণিকভাবে হোক বা বিলম্বিতভাবে হোক।

২০. সালাতুত্ তাওবা

আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গুনাহর কাজ করে বসে, অতপর সে পাক সাফ হয়ে (ইবনে হিব্বান, বায়হাকি ও ইবনে খুযায়মার বর্ণনা অনুযায়ী দু'রাকাত) নামায পড়ে অতপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এরপর রসূল সা. এ আয়াত পড়েন : "এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে বা নিজেদের উপর যুলুম (অর্থাৎ অপরাধ ও গুনাহ) করে ফেলার পর আল্লাহকে স্মরণ করে, নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা চায়, বস্তুত: আল্লাহ ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কে আছে? –অতপর জেনে বুঝে নিজেদের কৃত গুনাহর পুনরাবৃত্তি আর করেনা, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বাগানসমূহ, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৩৫-১৩৬) – আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহহ, বায়হাকি, তিরমিযি। তাবারানি আবুদ্ দারদা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে অযু করে দু'রাকাত বা চার রাকাত নামায ভালোভাবে রুকু সাজদা সহকারে পড়বে, –চাই তা ফরয নামায হোক বা অন্য নামায হোক– তারপর আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।

২১. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামায

আলেমগণ একমত যে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামায সুন্নত মুয়াক্কাদা। জামাতে পড়া উত্তম। তবে জামাত শর্ত নয়। এ জন্য "জামাতে নামায অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে" বলে উচ্চস্বরে আহ্বান জানাতে হবে। অধিকাংশ আলেম মনে করেন : এটা দু'রাকাত। প্রত্যেক রাকাতে দুটো করে রুকু দিতে হয়।

আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এর জীবদ্দশায় সূর্য গ্রহণ হলো। রসূলুল্লাহ সা. মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহ্ আকবার বলে নামায শুরু করলেন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। তিনি দীর্ঘ কিরাত পড়লেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে গেলেন এবং এতোটা লম্বা রুকু দিলেন যা প্রথম কিরাতের প্রায় সমান লম্বা। তারপর মাথা তুলে বললেন : 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ'। তারপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রথম রাকাতের চেয়ে কিছুটা ছোট কিরাত পড়লেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে রুকু দিলেন এবং প্রথম রুকুর চেয়ে কিছুটা ছোট রুকু দিলেন। তারপর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলে রুকু থেকে উঠলেন। তারপর সাজদা দিলেন। অতপর পরবর্তী রুকু আগের মতোই করলেন এবং চার রুকু ও চার সাজদা পূর্ণ করলেন। তিনি পেছনের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর আগে সূর্য রাহুমুক্ত হলো। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং জনগণের সামনে ভাষণ দিলেন। প্রথমে আল্লাহর যথোচিত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দুটো নিদর্শন। কারো জীবন বা মৃত্যুর জন্য চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়না। তোমরা যখন এটা প্রত্যক্ষ করবে, তখন দ্রুত নামায পড়তে ধাবিত হও। –বুখারি, মুসলিম। বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকে আরো একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন : সূর্য গ্রহণ হলো। অতপর রসূল সা. দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। প্রায় সূরা বাকারার সমপরিমাণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দীর্ঘস্থায়ী রুকু করলেন। তারপর রুকু থেকে উঠে দীর্ঘসময় দাঁড়ালেন, যা প্রথমবারের চেয়ে কিছুটা কম ছিলো। তারপর সাজদা দিলেন। তারপর আবার দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন। এটা প্রথমবারের চেয়ে কিছুটা কম ছিলো। তারপর লম্বা রুকু করলেন, তবে প্রথম রুকুর চেয়ে ছোট রুকু দিলেন। তারপর রুকু থেকে উঠে লম্বা সময় দাঁড়ালেন, এটা প্রথমবারের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী ছিলো। তারপর

আবার লম্বা কিন্তু প্রথম রুকুর চেয়ে ছোট রুকু দিলেন। তারপর সাজদা দিলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। ততোক্ষণে সূর্য রাহুমুক্ত হয়ে গেলো। রসূল সা. বললেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন।' এর গ্রহণ কারো জীবন বা মৃত্যুর কারণে হয়না। তোমরা যখন গ্রহণ দেখবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে।" (এ হাদিস দ্বারা ইমাম শাফেয়ী প্রমাণ দর্শিয়েছেন যে, খুতবা দেয়া এ নামাযের শর্ত। আবু হানিফা ও মালেক বলেছেন : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযে খুতবা নেই। রসূল সা. খুতবা দিয়েছিলেন শুধু লোকদের এই ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য যে, তাঁর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ হয়েছে।)

ইবনে আবদুল বার বলেছেন : এ হাদিস দুটো এ অধ্যায়ের সবচেয়ে সহীহ হাদিস। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযে যে সুন্নতটি সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত তা হলো, প্রতি রাকাতে দু'বার রুকু দেয়া। আয়েশা, ইবনে আব্বাস, জাবের, উবাই বিন কা'ব, আবদুল্লাহ বিন আমর ও আবু মূসার হাদিসে এটা পাওয়া যায়- তারা সকলে রসূল সা. থেকে দুটো করে রুকুর উল্লেখ করেছেন। যে সকল মনীষী একাধিক রুকুর উল্লেখ করেছেন, তাদের সংখ্যা যারা একাধিক রুকুর উল্লেখ করেননি, তাদের চেয়ে সংখ্যায়ও বেশি, মর্যাদায়ও বড় এবং রসূল সা.-এর কাছে অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

এটা হচ্ছে মালেক, আহমদ ও শাফেয়ীর মাযহাব। আর আবু হানিফার মাযহাব হলো, ঈদ ও জুমার নামাযের মতোই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামায। নুমান বিন বশীর বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে তোমাদের নামাযের মতোই রুকু ও সাজদা করে দু' দু' রাকাত করে নামায পড়িয়েছেন এবং সূর্য রাহুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দোয়া করেছেন। কুব্সা হিলালীর হাদিসে রসূল সা. বলেছেন : যখন গ্রহণ দেখবে, তখন সর্বশেষ যে ফরয নামায পড়েছো, সে রকম নামায পড়বে। -আহমদ, নাসায়ী।

সূরা ফাতিহা পড়া উভয় রাকাতে ওয়াজিব। ফাতিহার পর যে কোনো সূরা বা আয়াত পড়া যাবে। কিরাত গোপনেও পড়া যাবে, প্রকাশ্যেও পড়া যাবে। তবে বুখারি বলেন : প্রকাশ্যে পড়াই বিশুদ্ধতর।

এ নামাযের সময় গ্রহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। চন্দ্র গ্রহণের নামায সূর্য গ্রহণের নামাযের মতোই। হাসান বসরী বলেছেন : ইবনে আব্বাস যখন বসরার শাসক, তখন চন্দ্র গ্রহণ সংঘটিত হলো। তিনি আমাদেরকে দু'রাকাত নামায পড়ালেন। প্রত্যেক রাকাতে দুটো করে রুকু দিলেন। তারপর জন্তুর পিঠে উঠে বললেন : রসূল সা. কে যেভাবে গ্রহণের নামায পড়তে দেখেছি, সেভাবেই পড়ালাম। -মুসনাদে শাফেয়ী।

গ্রহণের সময় আল্লাহু আকবার বলা, দোয়া করা, সদকা করা ও গুনাহ মাফ চাওয়া মুস্তাহাব। বুখারি ও মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন বিশেষ। কারো জন্ম ও মৃত্যুর কারণে এটা সংঘটিত হয়না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে, তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করো, আল্লাহু আকবার বলো, সদকা দাও ও নামায পড়ো। আর আবু মূসা বর্ণনা করেছেন : একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তখন, রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়লেন এবং বললেন : এ ধরনের (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) দেখলে তোমরা আল্লাহর যিকির, দোয়া ও ইসতিগফার করার দিকে ধাবিত হও।"

২২. ইসতিসকার নামায

ইসতিসকার শাব্দিক অর্থ হলো : পানি প্রার্থনা করা। এর পারিভাষিক অর্থ হলো, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহের যে কোনো একটি অনুসরণপূর্বক আল্লাহর কাছে পানি প্রার্থনা করা :

১. ইমাম মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া যে কোনো সময়ে মুক্তাদিদের নিয়ে আযান ও ইকামত ছাড়া দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সাব্বিহিসমা (সূরা আ'লা) ও দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহার পর গাশিয়া প্রকাশ্যে পড়বে। তারপর নামাযের আগে বা পরে খুতবা দেবে। খুতবা শেষ হলে সকল মুসল্লী নিজ নিজ চাদর উঠিয়ে পরবে। যে পাশ ডান কাঁধে, তা বাম কাঁধে এবং যে পাশ বাম কাঁধে তা ডান কাঁধে রাখবে। তারপর কিবলার দিকে মুখ করে হাত বেশি করে উঁচু করে দোয়া করবে। ইবনে আব্বাস বলেছেন :

রসূলুল্লাহ সা. বিনয়ের সাথে, সাধারণ কাজ করার পোশাক পরে ধীর গতিতে ও কাতর বেশে ময়দানে বের হলেন, ঈদের নামাযের মতো দু'রাকাত নামায পড়লেন। তবে এ ধরনের খুতবা দেননি। পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ। তিরমিযি, আবু উযানা, ইবনে হিব্বান এটিকে সহীহ হাদিস বলেছেন। আর আয়েশা রা. বলেছেন : লোকেরা রসূল সা. এর নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ পেশ করলো। তিনি একটা মিম্বর আনতে বললেন। অতপর তা তাঁর জন্য ঈদের নামাযের ময়দানে রাখা হলো। তারপর জনগণকে একটা দিন ধার্য করে সেই দিন জমায়েত হবার আদেশ দিলেন। সূর্যের কিরণ যখন প্রখর হলো, তখন তিনি বের হলেন। মিম্বরে বসলেন, আল্লাহু আকবার বললেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন : তোমরা তোমাদের এলাকায় অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছো। আল্লাহ তোমাদেরকে তার কাছে দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন এবং দোয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারপর বললেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ.

"মহাজগতের প্রভু আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। পরম দাতা ও অতিশয় দয়ালু, বিচারের দিনের মালিক, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি যা চান তাই দেবেন। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তুমি অভাবহীন, আমরা তোমার মুখাপেক্ষী, আমাদের উপর বৃষ্টি অবতীর্ণ করো। আর আমাদের উপর তুমি যা নাযিল করবে, তা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমাদের জন্য শক্তি ও গতিতে রূপান্তরিত করো।" তারপর হাত এতো উঁচু করে দোয়া করতে লাগলেন যে, তার বোগলের সাদা জায়গা দেখা যেতে লাগলো। তারপর জনতার দিকে পিঠ ফেরালেন এবং নিজের চাদর উল্টালেন। তখনো তিনি হাত উঁচু করে রেখেছেন। তারপর জনগণের দিকে মুখ ফেরালেন ও মিম্বর থেকে নামলেন। তারপর দু'রাকাত নামায পড়লেন। তৎক্ষণাত আল্লাহ এক খণ্ড মেঘ সৃষ্টি করলেন। মেঘখণ্ডে বিদ্যুৎ চমকালো, গর্জন হলো, তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় বৃষ্টি হলো। তিনি মসজিদে আসতে না আসতে পানির স্রোত বয়ে গেলো। এ সময় জনগণকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে দেখে রসূল সা. এর এতো হাসি পেলো যে, তার মাড়ির দাঁত বেরিয়ে পড়লো। তিনি বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান এবং আমি তাঁর বান্দা ও রসূল। –হাকেম, আবু দাউদ।

উব্বাদ বিন তামীম তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল সা. জনগণকে সাথে নিয়ে ইসতিসকার নামায পড়তে বের হলেন, অতপর তাদেরকে দু'রাকাত নামায পড়ালেন, উভয় রাকাতে সশব্দে কিরাত পড়লেন। –সব ক'টা সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

আবু হুরায়রা বলেছেন : আল্লাহর নবী একদিন ইসতিসকার নামায পড়তে বেরুলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন আযান ও ইকামত ছাড়াই। তারপর আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাত

তুলে দোয়া করলেন, তারপর চাদরের ডান পাশ বাম কাঁধে ও বাম পাশ ডান কাঁধে রাখলেন। –আহমদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকি।

২. শুধু জুমার খুতবায়ও ইমাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে পারেন। মুসল্লীরা তাঁর দোয়ার সাথে আমিন আমিন বলবে। বুখারি ও মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি জুমার দিন মসজিদে প্রবেশ করলো। রসূল সা. তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ আমাদের সকল পণ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে গেছে। বাজারে নেয়ার কোনো উপায় নেই। কাজেই আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেনো আমাদেরকে তিনি সাহায্য করেন। রসূলুল্লাহ সা. তাঁর দু'হাত তুললেন এবং বললেন : হে আল্লাহ, আমাদেরকে সাহায্য করো। আনাস রা. বলেন : আল্লাহর কসম আমরা আকাশে একখণ্ড মেঘও দেখতে পেলামনা। আর আমাদের ও সালা পাহাড়ের মাঝে কোনো বাড়ি ঘরও দেখতে পেলামনা। সহসা একটা ঢালের মতো ছোট এক টুকরো মেঘ এলো। মেঘটুকু আকাশের মাঝখানে পৌঁছামাত্র তা ছড়িয়ে গেলো ও বৃষ্টি নামলো। আল্লাহর কসম, আমরা এক সপ্তাহ যাবত সূর্য দেখতে পাইনি। পুনরায় পরবর্তী জুমায় ঐ (বৃষ্টির জন্যে আবেদনকারী) ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। রসূল সা. দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে রসূল সা. এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো : হে রসূল সা. আমাদের সহায় সম্পদ ধ্বংস হতে চলেছে এবং সকল পথ রুদ্ধ হয়ে আসছে। কাজেই আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেনো বৃষ্টি থেমে যায়। রসূল সা. তৎক্ষণাত তাঁর হাত উঁচু করলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ, এখন আমাদের উপর নয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের উপর বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ, পাহাড় পর্বত ও অসমতল জায়গায় বৃষ্টি নামান। অনুরূপ, সমতল ভূমিতে ও গাছের গোঁড়ায় বৃষ্টি দিন।" তৎক্ষণাত বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো। আমরা রোদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

৩. শুক্রবার ব্যতিত অন্য যে কোনো দিন মসজিদে বা অন্য কোথাও কোনো নামায ছাড়াই শুধু দোয়া করলেও চলে। ইবনে মাজাহ ও আবু উয়াইনা বর্ণনা করেছেন : ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এলো। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. আমি এমন একটি গোত্রের কাছ থেকে এসেছি, যাদের পশুর রাখাল রসদের অভাবে মাঠে পশু চরাতে যেতে পারেনা এবং যাদের ষাড় পশুরাও দুর্বলতার দরুণ লেজ নাড়াতে পারেনা (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ জর্জরিত গোত্র)। রসূলুল্লাহ সা. তৎক্ষণাত মিম্বরে আরোহন করলেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন : হে আল্লাহ, আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দাও, যা আমাদের দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দেয়, যার ফল প্রশংসনীয় হয়, যা মাটিকে উর্বরা শক্তি দেয়, যা ব্যাপকভাবে ও মুষলধারে বর্ষে এবং যা অচিরেই বর্ষে, বিলম্বিত হয়না। এরপর এতো বৃষ্টি হলো যে, যেখান থেকেই যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে আসছিল, বলছিল আমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে।"

শুরাহবিল একবার কা'ব বিন মুররাকে বললেন : হে কা'ব আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সা. এর একটা হাদিস শুনান। তিনি বললেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, যখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো : মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। রসূল সা. বললেন : "তোমার সাহস তো কম নয়। শুধু মুযারের জন্য?" সে বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. আপনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেই তিনি আপনাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছে দোয়া করতেই তিনি দোয়া কবুল করেছেন। রসূল সা. তৎক্ষণাত তাঁর দু'হাত তুললেন এবং বললেন : হে আল্লাহ আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দাও, যা দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দেয়, যার ফল প্রশংসনীয় হয়, যা উর্বরা শক্তি প্রদানকারী হয়, যা সর্বব্যাপী হয়, যা অবিলম্বে বর্ষে, বিলম্বিত হয়না এবং যা উপকারী হয়, ক্ষতিকর হয়না।" তৎক্ষণাত দোয়া কবুল করা হলো, প্রবল বৃষ্টি হলো। তারপর লোকেরা অতিবর্ষণের অভিযোগ নিয়ে এলো। তারা জানালো যে, অনেকের ঘরবাড়ি অতিবৃষ্টির

কারণে ধ্বসে গেছে। তৎক্ষণাত রসূলুল্লাহ সা. দু'হাত তুলে বললেন : হে আল্লাহ, আমাদের উপর আর নয়, এবার আমাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের উপর বর্ষণ করো।" তৎক্ষণাত মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ডান দিকে ও বাম দিকে সরে গেলো।" –আহমদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকি, ইবনে আবি শায়বা ও হাকেম।

আর শা'বী রা. বলেছেন : উমর রা. ইসতিসকার (বৃষ্টি প্রার্থনার) উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি কেবল ইসতিগফার অর্থাৎ গুনাহ মাফ চেয়েই ক্ষান্ত থাকলেন। লোকেরা বললো : আপনাকে তো ইসতিসকা করতে (বৃষ্টি প্রার্থনা করতে) দেখলামনা। তিনি বললেন : আমি আকাশের সেই তারাগুলোর নামে বৃষ্টির প্রার্থনা করেছি, যাদের নামে বৃষ্টি চাওয়া হয় (অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাওয়া)। তারপর তিনি সূরা নূহের এ দুটি আয়াত পড়লেন : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও। তিনি ক্ষমাশীল। তাহলে তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর সূরা হুদের এ আয়াতও পড়লেন : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও ও তওবা করো .....।" বায়হাকি ও ইবনে শায়বা।

বিভিন্ন হাদিস থেকে পাওয়া কয়েকটি ইসতিসকার দোয়া নিম্নে দেয়া গেলো :

১. শাফেয়ী বলেন : সালেম তার পিতা আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. যখনই বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন, বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا، مُغِيْثًا، مَرِيْعًا، غَدَقًا، مُجَلِّلًا، عَامًّا، طَبْقًا، سَحًّا، دَائِمًا اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا الْغَيْثَ، وَلَاتَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ، وَالْخَلْقِ مِنَ الْاَوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَالَا نَشْكُوْهُ إِلَّا إِلَيْكَ. اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَاَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَاَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ، اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ، وَالْجُوْعَ وَالْعُرْىَ وَاَكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَايَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَاَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দাও, যা দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করবে, যা উর্বরা শক্তি দেয়, যা সর্বব্যাপী হয়, যা মুষলধারে বর্ষে, যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। হে আল্লাহ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করো, হতাশ করোনা। হে আল্লাহ! বান্দাদের, দেশের জীবজন্তুর ও সকল সৃষ্টির এতো কষ্ট ও ক্ষতি হচ্ছে, যা তোমার নিকট ব্যতিত আর কারো কাছে আমরা ব্যক্ত করিনা। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য ফসল জন্মাও, ওলানে দুধ দাও, আকাশের বরকত আমাদের উপরে বর্ষণ করো, পৃথিবীর বরকত আমাদের জন্য অংকুরিত করো। হে আল্লাহ, আমাদের কষ্ট দূর করে দাও, বস্ত্রের অভাব ও খাদ্যের অভাব দূর করে দাও, আমাদের সেসব মুসিবত দূর করে দাও, যা তুমি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারেনা। হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল। সুতরাং তুমি আমাদেরকে অবারিত ধারায় বৃষ্টি দাও।" শাফেয়ী বলেন : ইমাম সাহেবরা এই দোয়া দ্বারা দোয়া করুন। এটাই আমি পছন্দ করি।

২. সা'দ বলেন, রসূল সা. ইসতিসকায় এভাবে দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ সেই ঘন মেঘ থেকে আমাদেরকে ব্যাপক বৃষ্টি দাও, যে মেঘে বিদ্যুৎ চমকে এবং যে মেঘ থেকে হালকা বৃষ্টি হয়। হে মহিমান গরিয়ান।" –আবু উয়ানা।

৩. আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. ইসতিসকায় বলতেন : হে আল্লাহ, তোমার বান্দাদেরকে ও তোমার জীবজন্তুকে পানি দাও, তোমার রহমতের প্রসার ঘটাও এবং তোমার মৃত জনপদ পুনরুজ্জীবিত করো। –আবু দাউদ।

ইসতিসকার দোয়ায় হাতের পিঠ তুলে ধরা মুস্তাহাব। মুসলিম আনাস থেকে বর্ণনা করেন : রসূল সা. বৃষ্টি প্রার্থনা করার সময় তাঁর দু'হাতের পিঠ দিয়ে আকাশের দিকে ইংগিত করলেন।*

আর যখন বৃষ্টি হতে দেখবে, তখন এরূপ দোয়া করা মুস্তাহাব : 'হে আল্লাহ, উপকারী বৃষ্টি দাও।' আর শরীরের কিছু অংশ খোলা রেখে বৃষ্টি লাগতে দেবে। আর অতি বর্ষণ হলে বলবে : "হে আল্লাহ, রহমতের বৃষ্টি চাই। আযাবের, মুসিবতের, ধ্বংসের ও ডুবিয়ে দেয়ার বৃষ্টি চাইনা। হে আল্লাহ, টিলার উপর ও গাছের চারা জন্মানোর জায়গায় বর্ষণ করো। হে আল্লাহ, আমাদের যথেষ্ট হয়েছে, এখন আমাদের উপরে নয়, আমাদের আশপাশে বৃষ্টি দাও।" এসবই রসূল সা. থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত।

১৩. তিলাওয়াতের সাজদা

যে ব্যক্তি কোনো সাজদার আয়াত পড়ে বা শোনে, তার জন্য 'আল্লাহু আকবার' বলে একটি সাজদা দেয়া অতপর পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে মাথা তোলা মুস্তাহাব। একে তিলাওয়াতের সাজদা বলা হয়। এতে কোনো তাশাহহুদও নেই, সালামও নেই। ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদের সামনে কুরআন পড়তেন। যখন সাজদার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলে সাজদা দিতেন এবং আমরাও সাজদা দিতাম। –আবু দাউদ, বায়হাকি, হাকেম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন : যখন তুমি কোনো সাজদার আয়াত পড়ো তখন আল্লাহু আকবার বলো ও সাজদা দাও। আর যখন মাথা তোলে। তখন আল্লাহু আকবার বলো।

১. ফযীলত : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কোনো আদম সন্তান সাজদার আয়াত পড়ে ও সাজদা দেয়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে পালায়। সে বলে : "হায় আমার পোড়া কপাল, আদম সন্তানকে সাজদার হুকুম দেয়ামাত্র সে সাজদা করলো এবং জান্নাতের অধিকারী হলো। আর আমাকে সাজদার হুকুম দেয়া হলে আমি তা অমান্য করলাম। ফলে আমি জাহান্নামের অধিবাসী হলাম।"

২. বিধান : অধিকাংশ আলেমের মতে তিলাওয়াতের সাজদা পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের জন্য সুন্নত। বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর রা. মিম্বরের উপর জুমার দিন সূরা নাহল পড়লেন। এক পর্যায়ে সাজদার আয়াত এলো। তিনি তৎক্ষণাত নামলেন ও সাজদা করলেন। তাঁর সাথে সাথে জনগণও সাজদা করলো। পরবর্তী জুমায় পুনরায় একই সূরা পড়লেন এবং সাজদার আয়াত এলে বললেন : হে জনতা, আমাদের সাজদা দিতে আদেশ দেয়া হয়নি। তবু যে ব্যক্তি সাজদা করে সে ঠিকই করে। আর যে করেনা, তার কোনো গুনাহ হবেনা। অন্য বর্ণনা মতে তিনি বললেন : আল্লাহ আমাদেরকে সাজদার আদেশ দেননি। তবে আমরা চাইলে দিতে পারি। – দার কুতনী। আর ইবনে মাজাহ ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত : যায়দ বিন সাবেত বলেন : আমি রসূল সা. এর সামনে সূরা আন নাজম পড়লাম। কিন্তু তিনি সাজদা করলেননা। ফলে আর কোনো ব্যক্তিও সাজদা করলোনা। – দার কুতনী। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : সাজদা বর্জন করার উদ্দেশ্য ছিলো বর্জন করার বৈধতা সাব্যস্ত করা। ইমাম শাফেয়ীর মতও অদ্রূপ। এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় বাযযারও দারকুতনীতে উদ্ধৃত আবু

---

* এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দোয়া করতে হলে হাতের পিঠ আকাশের দিকে তুলে ধরতে হবে। আর কোনো কিছু পাওয়ার জন্য দোয়া করলে হাতের পেট আকাশের দিকে মেলে ধরতে হবে।

হুরায়রার এই রেওয়ায়াতে : রসূলুল্লাহ সা. সূরা আন নাজমে সাজদা করলেন। আমরাও তাঁর সাথে সাজদা করলাম। ইবনে মাসউদ বলেন : রসূল সা. সূরা আননাজম পড়লেন, তাতে সাজদা করলেন, তাঁর সাথে যারা ছিলো তারাও সাজদা করলো। তবে কুরাইশের এক প্রবীণ ব্যক্তি এক মুষ্টি মাটি বা পাথরের টুকরো তুলে তার কপালে ঠেকালো এবং বললো : আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ বলেন : পরবর্তীতে আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। −বুখারি, মুসলিম।

৩. সাজদার স্থানসমূহ : কুরআনে সাজদার স্থান পনেরোটি। আমর ইবনুল আ'স বলেন : রসূল সা. আমাকে কুরআনে পনেরোটি সাজদার আয়াত পড়িয়েছেন। তন্মধ্যে তিনটে রয়েছে ছোট সূরাগুলোতে, আর দুটো সূরা হজ্জে। −আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, দারকুতনী।

১৫টি সাজদার স্থান হলো :

১. নিশ্চয় যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থাকে, তারা তার ইবাদত করা থেকে অহংকারবশত: বিরত থাকেনা, বরং তারা তার তাসবীহ করে ও তারই জন্য সাজদা করে। (সূরা ৭ আরাফ : আয়াত ২০৬)

২. একমাত্র আল্লাহরই জন্য সাজদা করে আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু এবং সে সবের ছায়া সকালে ও বিকালে, চাই ইচ্ছায় করুক বা অনিচ্ছায়। (সূরা রা'দ : আয়াত ১৫)

৩. আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান জীবজন্তু ও ফেরেশতাসহ সবকিছু কেবল আল্লাহকেই সাজদা করে। তারা অহংকার করেনা। (সূরা নাহল : আয়াত ৪৯)

৪. তুমি বলো : তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনো, না আনো, নিশ্চয় যারা ইতিপূর্বে আসমানী কিতাবের জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে, তাদের সামনে যখন আয়াত পড়া হয়, তখন সাজদায় পতিত হয়।" (সূরা ১৭ বনী ইসরাইল : আয়াত ১০৭)

৫. যখন তাদের সামনে দয়াময়ের আয়াতসমূহ পড়া হয়, তারা কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় পড়ে যায়। (সূরা মরিয়ম : আয়াত ৫৮)

৬. তুমি কি দেখোনি, আকাশ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজি, জীবজন্তু, বহু মানুষ এবং আযাব অবধারিত হয়ে গেছে যাদের জন্য তাদেরও অনেকে আল্লাহর জন্য সাজদা করে ? যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন, তাকে আর কেউ সম্মান দিতে পারেনা। আল্লাহ যা চান সেটাই করেন। (সূরা হজ্জ : আয়াত ১৮)

৭. হে মুমিনগণ : রুকু দাও, সাজদা দাও, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং ভালো কাজ করো। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৭৭)

৮. যখন তাদেরকে বলা হয় দয়াময়ের জন্য সাজদা করো, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি যার জন্য সাজদা করতে আদেশ করছো, তাকেই সাজদা করবো নাকি? এতে তাদের পলায়নী মনোভাব আরো বেড়ে যা। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৬০)

৯. (শয়তানের প্ররোচনায়) তারা আল্লাহকে সাজদা করেনা, যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নামান ও পৃথিবী থেকে গাছ জন্মান এবং তোমরা যা কিছু গোপন করো ও প্রকাশ করো তা জানেন। (সূরা নামল : আয়াত ২৫)

১০. আমার আয়াতগুলোতে বিশ্বাস রাখে কেবল তারাই, যাদেরকে আয়াতগুলো স্মরণ করিয়ে দিলেই তারা সাজদায় পড়ে, তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। (সূরা সাজদা : আযাত ১৫)

১১. দাউদ মনে করলো আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। তাই সে তার প্রতিপালকের নিকটও ক্ষমা চাইল, রুকুতে পতিত হলো ও বিনীত হলো। (সূরা সায়াদ : আয়াত ২৪)*

১২. আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সাজদা করোনা। যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে সাজদা করো, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাকো। (সূরা হামীম সাজদা : আয়াত ৩৭)

১৩. অতএব আল্লাহর জন্য সাজদা করো ও ইবাদত করো। (সূরা আন নাজম : আয়াত ৬২)

১৪. আর যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয় তখন তারা সাজদা করেনা। (সূরা ৮৪ আল ইনশিকাক : আয়াত ২১)

১৫. সাজদা করো ও নৈকট্য লাভ করো। (সূরা ৯৬ আলাক : আয়াত ১৯)

৪. **শর্তাবলি :** অধিকাংশ ফকীহের মতে, তিলাওয়াতের সাজদার জন্যও শর্ত পূরণ করা জরুরি, ঠিক সেসব শর্ত নামাযের জন্য জরুরি। যেমন পবিত্রতা, কিবলামুখি হওয়া ও ছতর ঢাকা। শওকানী বলেছেন : তিলাওয়াতের সাজদা সংক্রান্ত হাদিসগুলোতে এমন কিছু নেই, যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, সাজদাকারীকে অযু করেই সাজদা করতে হবে। রসূলুল্লাহ সা. এর তিলাওয়াতের সময় যারা উপস্থিত থাকতো, তারা তো তাঁর সাথে সাজদা করতো। কিন্তু তিনি তাদের কাউকে অযু করার আদেশ দিয়েছেন এমন কোনো কথা বর্ণিত হয়নি। আবার সবার অযু ছিলো, তাও বলা কঠিন। তাছাড়া কখনো কখনো তাঁর সাথে মুশরিকরাও সিজাদ করতো। অথচ তারা তো নাপাক। তাদের অযু হয়না। বুখারি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিনা অযুতেও সাজদা করতেন। তবে বায়হাকির এই বর্ণনাকেও ইবনে হাজর বিশুদ্ধ বলেছেন যে, ইবনে উমর রা. বলেছেন : বিনা অযুতে সাজদা করা যাবেনা। হাফেজ ইবনে হাজর এই বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে তিলাওয়াতের সাজদার জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতাকে বৃহত্তর পবিত্রতা বলে অভিহিত করেছেন। অথবা পবিত্রতা ইচ্ছাধীন –এই অর্থে গ্রহণ করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। অনুরূপ, পোশাক ও স্থানের পবিত্রতা জরুরি– এমন কোনো বক্তব্যও এ হাদিসে নেই। ছতর ঢাকা ও কিবলামুখি হওয়া–এই দুটো কাজ সর্বসম্মতভাবে সম্ভব হলে করা জরুরি। ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে : শাবী ব্যতিত আর কেউ ইবনে উমরের এই মত সমর্থন করেনি যে, বিনা অযুতে তিলাওয়াতের সাজদা করা না জায়েয। ইবনে আবি শায়বা বলেন : ইবনে আবি আবদুর রহমান সিলমী সাজদার আয়াত পড়তেন এবং বিনা অযুতে ও কিবলামুখি না হয়েও সাজদা দিতেন। এমনকি হেটে বলার সময় ইশরায়ও সাজদা দিতেন। আহলুল বাইত থেকে আবু তালেব ও মানসূর বিল্লাহ ইবনে উমরকে সমর্থন করতেন।

৫. **তিলাওয়াতের সাজদায় দোয়া :** তিলাওয়াতের সাজদাকারী যে কোনো দোয়া করতে পারে। এ ব্যাপারে আয়েশার নিম্নোক্ত হাদিস ব্যতিত আর কোনো সহীহ হাদিসে নেই। "রসূলুল্লাহ সা. কুরআনের সাজদার সময় বলতেন :

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

---

* আবু সাঈদ বলেন : রসূলুল্লাহ সা. মিম্বরে আরোহন করে সূরা সোয়াদ পড়লেন। সাজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে নামলেন। সাজদা করলেন এবং উপস্থিত জনতাও তার সাথে সাজদা করলো। আরেকদিন তিনি একই সূরা পড়লেন। সাজদার আয়াত যেই এসে গেলো অমনি সবাই সাজদার জন্য প্রস্তুত হলো। রসূল সা. তখন বললেন : এতো একজন নবীর তওবার বিবরণ। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা সাজদা দিতে প্রস্তুত হয়েছো। এই বলে তিনি নামলেন, সাজদা দিলেন এবং সবাই সাজদা দিলো। –আবু দাউদ।

"আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তার জন্য সাজদা করছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তার চোখ ও কান ছিদ্র করেছেন। একমাত্র তারই দেয়া শক্তি ও প্রেরণাক্রমেই সাজদা করছি। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ পরম কল্যাণময়।" –ইবনে মাজাহ্ ব্যতিত সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ।

উল্লেখ্য যে, তিলাওয়াতের সাজদা নামাযে হলে সাজদায় সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা বলতে হবে।

৬. নামাযের মধ্যে তিলাওয়াতের সাজদা : ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর নামাযের মধ্যে সাজদার আয়াত পড়া ও পড়ার সাথে সাথে সাজদা দেয়া জায়েয– চাই উক্ত নামায গোপনীয় হোক বা প্রকাশ্য হোক। বুখারি ও মুসলিম আবু রাফে রা. থেকে বর্ণনা করেছেন :

আবু রাফে বলেন : আমি আবু হুরায়রার সাথে এশার নামায পড়লাম। তিনি নামাযে সূরা ইনশিকাক পড়লেন এবং সাজদা করলেন। আমি বললাম : হে আবু হুরায়রা, এটা কিসের সাজদা ? তিনি বললেন : আমি এ সূরায় রসূল সা. এর পেছনে নামায পড়ার সময় সাজদা করেছি। কাজেই আমি সাজদা করতেই থাকবো। আর হাকেম ইবনে উমর রা, থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. যোহরের প্রথম রাকাতে সাজদা করলেন। আর হাকেম ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. যোহরের প্রথম রাকাতে সাজদা করলেন। তাঁর সাহাবিগণ ধারণা করলেন, তিনি নামাযে সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা পড়েছেন। নববী বলেছেন : নামায গোপনীয় বা প্রকাশ্য যে রকমই হোক, ইমাম ও এককী নামায আদায়কারীর জন্য নামাযে সাজদার আয়াত পড়া মাকরূহ নয় এবং পড়লে তাকে তৎক্ষণাত সাজদা করতে হবে। মালেক বলেছেন : সর্বাবস্থায় এটা মাকরূহ। আবু হানিফার মতে প্রকাশ্য নামাযে মাকরূহ নয়, গোপন নামাযে মাকরূহ। আল-বাহর গ্রন্থের লেখক বলেছেন : আমাদের মতে সাজদাকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত বিলম্বিত করা উচিত, যাতে নামাযীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।*

৭. একই নামাযে একাধিক সাজদার আয়াত পড়া ও সাজদা দেয়া বৈধ : কেউ যদি একই সাজদার আয়াত বারবার পড়ে, আথবা একই মসজিদে তা একাধিকবার শোনে, তবে একবারই সাজদা দেবে। তবে এ জন্য শর্ত হলো, সর্বশেষ বার তিলাওয়াতের পর সাজদা দিতে হবে। প্রথমবার তিলাওয়াত করার পর সাজদা করে ফেললে হানাফী মাযহাব অনুসারে পরবর্তী তিলাওয়াতের জন্য পুনরায় সাজদা করা লাগবেনা। কিন্তু আহমদ, মালেক ও শাফেয়ীর মতে লাগবে। কারণ সাজদার কারণ নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে।

৮. তিলাওয়াতের সাজদা কাযা করা : অধিকাংশ আলেমের মতে, সাজদার আয়াত পড়া বা শোনার সাথে সাথেই সাজদা করা মুস্তাহাব। সাজদা দিতে বিলম্বিত করলে অনেক দীর্ঘ বিরতি ব্যতিত এর দায়িত্ব রহিত হয়না। দীর্ঘ বিরতি ঘটলে দায়িত্ব পালনের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে কাযা করতে হয়না।

১৪. শোকরানা সাজদা

অধিকাংশ আলেমের মতে শোকরানা বা কৃতজ্ঞতার সাজদা আদায় করা মুস্তাহাব– যখন নতুন কোনো আনন্দদায়ক কিছু হস্তগত হয় অথবা কোনো সম্ভাব্য বিপদ বা দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তখন মহান আল্লাহর শোকর, আদায়ের জন্যে এই সাজদা করা হয়।

---

* মুক্তাদির কর্তব্য হলো, ইমামের সাজদার আয়াত পাঠ শুনতে না পেলেও ইমাম যখন সাজদায় যাবে, তখন তার সাথে সাথে সাজদায় যাবে। ইমাম যদি সাজদার আয়াত পাঠ করেও সাজদা না দেয় তবে মুক্তাদি সাজদা দেবেনা বরং তার ইমামের অনুসরণ করা উচিত। অনুরূপ, মুক্তাদি নিজে কোনো সাজদার আয়াত পড়লে বা নামায বহির্ভূত কোনো ব্যক্তিকে তা পড়তে শুনলে নামাযের মধ্যে সাজদা করবেনা। নামাযের পরে সাজদা করে নেবে।

আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত : যখনই কোনো আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটতো বা সুসংবাদ পাওয়া যেতো, তখনই রসূলুল্লাহ সা. সাজদা দিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করতেন। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। আর বায়হাকি বর্ণনা করেছেন : আলী রা. যখন রসূল সা. এর নিকট হামাদানবাসীর ইসলাম গ্রহণের খবর লিখে জানালেন, তখন তিনি সাজদা দিলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন : হামাদানের উপর সালাম। হামাদানের উপর সালাম। আবদুর রহমান বিন আওফ বলেন : একদিন রসূলুল্লাহ সা. বাইরে বের হলে আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি একটা খেজুরের বাগানে প্রবেশ করলেন এবং দীর্ঘ সাজদায় পড়ে রইলেন। উঠতে বিলম্ব দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, আল্লাহ তাঁকে তুলে নিলেন কিনা! আমি তাঁর কাছে এসে তাকে দেখতে লাগলাম। তখন রসূল সা. মাথা তুললেন এবং বললেন : হে আবদুর রহমান! তোমার কী হয়েছে? আমি তাকে মনের অবস্থা জানালাম। তিনি বললেন : জিবরীল আমাকে বললেন : আপনাকে কি সুসংবাদ দেবোনা ? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ পাঠায়, আমি তার উপর রহমত বর্ষণ করি। যে ব্যক্তি আপনার উপর সালাম পাঠায়, আমি তার উপর সালাম পাঠাই। তৎক্ষণাত আমি শোকর আদায়ের জন্য সাজদা করলাম। –আহমদ। আর বুখারি বর্ণনা করেছেন : কা'ব বিন মালেক যখন সুসংবাদ পেলেন, আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেছেন, তখন সাজদা দিলেন। আহমদ বর্ণনা করেছেন, আলী রা. খারেজী বিদ্রোহীদের নিহতদের মধ্যে যুস্ ছুদাইয়া নামক বিদ্রোহীর লাশ দেখতে পেয়ে সাজদা দিয়েছিরেন। আর সাঈদ উল্লেখ করেছেন যে, আবু বকর রা. মুসাইলামার নিহত হওয়ার খবর শুনে সাজদা দিয়েছিলেন। শোকরের সাজদার জন্য নামাযের সাজদার প্রয়োজন বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। অন্যরা বলেছেন : নামাযের সাজদা এজন্য কোনো শর্ত নয়। কেননা এটা নামায নয়।' ফাতহুল আল্লামের গ্রন্থকার এই মতকে অগ্রগণ্য বলেছেন। শওকানী বলেছেন : এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোতে এমন কোনো কথা নেই, যা প্রমাণ করে যে, শোকরের সাজদার জন্য অযু, কাপড়ের পবিত্রতা ও স্থানের পবিত্রতা শর্ত। অনুরূপ, শোকরের সাজদায় আল্লাহু আকবার বলা জরুরি– এ কথাও কোনো হাদিস থেকে জানা যায়না। তবে আল বাহর গ্রন্থে রয়েছে : আল্লাহু আকবার বলতে হবে। ইমাম ইয়াহিয়া বলেছেন : নামাযের মধ্যে শোকরের সাজদা দেয়া যাবেনা। কেননা এটা নামাযের অংশ নয়।

১৫. সাহু সাজদা

প্রমাণ রয়েছে যে, নামাযে রসূল সা. এর ভুল হতো। তিনি বলতেন : আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। আমি ভুল করি যেমন তোমরা করো। কাজেই আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দিও।" এ বিষয়ে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য কিছু বিধি রেখে গেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে এই বিধিগুলো উল্লেখ করছি :

১. সাহু সাজদার পদ্ধতি : সাহু সাজদা হলো দুটো সাজদা। নামাযীর সালাম ফেরানোর আগে বা পরে এই সাজদা দিতে হয়। রসূল সা. থেকে উভয় পদ্ধতিই বিশুদ্ধভাবে জানা যায়। বুখারিতে আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কারো যখন নামায নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয় এবং সে কতো রাকাত পড়েছে– তিন রাকাত না চার রাকাত– তা নিশ্চিত হতে পারেনা। তখন তার কর্তব্য সন্দেহকে দূরে নিক্ষেপ করা এবং যেটি নিশ্চিত, সেটির উপর ভিত্তি করে নামায সম্পন্ন করা। তারপর সালামের পূর্বে দুটো সাজদা দেবে। সহীহ বুখারি ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় যুল ইয়াদাইনের ঘটনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. সালামের পর সাজদা দিয়েছেন।

তবে উত্তম পন্থা হলো এ ব্যাপারে হাদিসের অনুসরণ। যে ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সাজদা দেয়ার কথা হাদিসে বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সাজদা দেবে। আর যে ক্ষেত্রে সালামের পরে সাজদা দেয়ার উল্লেখ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে সালামের পরে সাজদা দেবে। শওকানী বলেন : এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হলো, রসূল সা. এর কথা ও কাজ যেখানে সালামের পূর্বে সাজদার দাবি জানায় সেখানে সালামের পূর্বে আর যেখানে সালামের পরে সাজদার দাবি জানায় সেখানে সালামের পরে সাজদা দিতে হবে। সাহু সাজদার যে কারণ সালামের পূর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সে কারণ দেখা দিলে সালামের পূর্বে সাজদা দেবে। আর যে কারণ সালামের পরের সাথে সংশ্লিষ্ট সে কারণ দেখা দিলে সালামের পরে সাজদা দেবে। আর যেখানে এর কোনো একটির সাথেও সাজদার কারণ সংশ্লিষ্ট নয় সেখানে নামাযীর স্বাধীনতা থাকবে সালামের আগে বা পরে সাজদা দিতে। এতে নামাযে কম বা বেশি যেটাই করা হোক, তাতে কোনো পার্থক্য হবেনা। ইমাম মুসলিম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যখন নামাযে কিছু বাদ দেয় বা অতিরিক্ত কিছু করে, তখন তার দুটো সাজদা দেয়া কর্তব্য।

২. যে যে পরিস্থিতিতে সাহু সাজদা দেয়া শরিয়তের বিধান : নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহে শরিয়তে সাহু সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

১. নামায সমাপ্ত হওয়ার আগে সালাম ফেরালে। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে যোহর বা আসরের নামায পড়ালেন। তিনি দু'রাকাত শেষে সালাম ফেরালেন। তারপর মসজিদে রক্ষিত একখানা কাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার উপর হেলান দিলেন যেনো তিনি রাগান্বিত। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন, আংগুলগুলো দিয়ে জালের মতো বুনলেন এবং নিজের গাল রাখলেন বাম হাতের পিঠের উপর। যারা মসজিদ থেকে সবার আগে বের হয়, তারা বেরিয়ে গেলো। লোকেরা বললো : নামায কি কসর (সংক্ষিপ্ত) করা হয়েছে ? জামাতে আবু বকর রা. এবং উমরও রা. ছিলেন। তারা রসূল সা. এর সাথে কথা বলতে সাহস করলেননা। জামাতে যুল ইয়াদাইন নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গিয়ে বললেন : হে রসূলুল্লাহ! আপনি কি নামায সংক্ষিপ্ত করেছেন, না ভুল করেছেন? রসূল সা. বললেন : আমি ভুলিওনি এবং সংক্ষিপ্তও করা হয়নি। তারপর বললেন : যুল ইয়াদাইন যা বলেছে, তোমরাও কি তাই বলতে চাও ? লোকেরা বললো : হ্যাঁ। তৎক্ষণাত রসূলুল্লাহ সা. ফিরে এলেন এবং নামাযের যেটুকু বাদ পড়েছিল সেটুকু পড়লেন, তারপর সালাম ফেরালেন।* তারপর আল্লাহু আকবার বললেন এবং নিজের নিয়মিত সাজদার মতো বা তার চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী সাজদা দিলেন। তারপর মাথা তুললেন। –বুখারি ও মুসলিম।

আহমদ, বাযযার ও তাবারানি বর্ণনা করেছেন, ইবনুয যুবাইর মাগরিবের নামায পড়ালেন এবং দু'রাকাত শেষে সালাম ফেরালেন। তারপর হাজরে আসওয়াদ ধরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। জামাতের লোকেরা বিস্ময়ে সুবহানাল্লাহ বলে উঠলো এবং বললো : আপনার কি হয়েছে ? এরপর তিনি অবশিষ্ট নামায পড়ালেন এবং দুটো সাজদা দিলেন। এই ঘটনা ইবনে আব্বাসকে জানানো হলে তিনি বললেন : ইবনে যুবাইর রসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নত থেকে একটুও সরেনি।

২. নামাযে অতিরিক্ত কিছু করলে : সব কটা সহীহ হাদিস গ্রন্থ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা

* এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কেউ ভুলক্রমে নামায শেষ না করে সালাম ফেরালে নামাযের শুধু অবশিষ্ট অংশ পড়লেই যথেষ্ট হবে, চাই সে দু'রাকাত পড়ার পরে সালাম ফেরাক কিংবা তার আগে ফেরাক।

করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. পাঁচ রাকাত নামায পড়ালেন। তাকে বলা হলো : নামাযে কি কিছু বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন : সে আবার কী? লোকেরা বললো : আপনি তো পাঁচ রাকাত পড়েছেন। তৎক্ষণাত রসূলুল্লাহ সা. দুটো সাজদা দিলেন সালাম ফেরানোর পর।

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি ভুলক্রমে চতুর্থ রাকাতে না বসে এক রাকাত বেশি পড়ে, সাহু সাজদা করলে তার নামায বৈধ হবে।

৩. প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক ভুলে গেলে অথবা নামাযের কোনো সুন্নত ছুটে গেলে : সব কটা সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : রসূল সা. নামায পড়ালেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে না বসে উঠে দাঁড়ালেন। লোকেরা সুবহানাল্লাহ বলে তাঁকে স্মরণ করালো। কিন্তু তিনি সামনেই এগিয়ে গেলেন। নামায শেষে দুটো সাজদা দিলেন। তারপর সালাম ফেরালেন।*

হাদিসে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি ভুলক্রমে প্রথম বৈঠক বাদ দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সময় পুরোপুরি দাঁড়ানোর আগেই তার মনে পড়লো, সে বৈঠকে ফিরে আসবে। তবে যদি পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর মনে পড়ে তবে বৈঠকে ফিরবেনা। এর সমর্থন পাওয়া যায় আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক মুগীরা থেকে বর্ণিত এই হাদিস থেকে :

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন দ্বিতীয় রাকাতে উঠে দাঁড়ায় এবং পুরোপুরিভাবে দাঁড়ায়নি, সে যেনো বসে পড়ে। পুরোপুরি দাঁড়িয়ে গেলে বসতে হবেনা, তবে দুটো সাহু সাজদা করতে হবে।"

৪. নামাযে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হলে : আবদুর রহমান বিন আওফ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কারো যখন নামায নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং বুঝতে পারেনা এক রাকাত পড়েছে, না দু'রাকাত, তখন সে ব্যক্তি যেনো তার নামাযকে এক রাকাত ধরে নেয়। আর যখন সংশয়ে পড়ে যায় যে, দু'রাকাত পড়েছে, না তিন রাকাত, তখন সে যেনো ধরে নেয় দু'রাকাত পড়েছে। আর যখন স্থির করতে পারেনা তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত, তখন সে যেনো ধরে নেয় সে তিন রাকাত পড়েছে। তারপর নামায শেষে সালাম ফেরানোর পূর্বে দুটো সাজদা দেবে। -আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। আবদুর রহমানের অন্য বর্ণনায় আছে : আমি রসূল সা. কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নামায পড়ার সময় কম পড়া নিয়ে সন্দেহে পড়ে যায়, তার ততোক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তে থাকা উচিত, যখন তার বেশি পড়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দেবে।" আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার নামায নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাবে এবং বুঝতে পারবেনা সে কতো রাকাত পড়েছে, তিন রাকাত না চার রাকাত, সে যেনো সন্দেহ দূরে ছুড়ে মারে এবং যে কয় রাকাত সম্পর্কে সে নিশ্চিত, তার উপর ভিত্তি করে নামায সমাপ্ত করে। তারপর সালাম ফেরানোর আগে সে যেনো দুটো সাজদা দেয়। সে যদি পাঁচ রাকাত পড়ে থাকে, তবে সেই নামায তার জন্য সুপারিশ করবে। আর যদি সে চার রাকাতকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য পড়ে থাকে, তাহলে সাহু সাজদা দুটো হবে শয়তানকে শাস্তি দেয়ার মাধ্যম। –আহমদ ও মুসলিম। এই দুটো হাদিসে অধিকাংশ আলেমদের এই মতের সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে যে, নামায আদায়কারী যখন নামাযের রাকাতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড়বে, তখন সুনিশ্চিত কম সংখ্যককে ভিত্তি ধরে নেবে এবং সাহু সাজদা করবে।

---

* হাদিসে এসেছে, ইমামের ভুল হওয়ার কারণে ইমাম যখন সাহু সাজদা করবে তখন মুক্তাদিও সাহু সাজদা করবে। হানাফী ও শাফেয়ীদের অভিমত, মুক্তাদি ইমামের ভুলের জন্য সাহু সাজদা করবে। নিজের ভুলের জন্য সাহু সাজদা করবেনা।

১৬. জামাতে নামায

১. জামাতে নামাযের গুরুত্ব ও মর্যাদা

জামাতে নামায পড়া সুন্নত মুয়াক্কাদা।* এর ফযীলত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদিস রয়েছে। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি :

১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জামাতে নামায পড়ার সওয়াব একাকি পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি। -বুখারি ও মুসলিম।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জামাতের সাথে যে নামায পড়া হয়, তার সওয়াব বাড়িতে বা বাজারে পড়া নামাযের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। সে যখন সুষ্ঠুভাবে অযু করে, তারপর শুধুমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বাড়বে এবং একটি করে গুনাহ মাফ হবে। তারপর যখন সে নামায পড়বে, তখন যতোক্ষণ সে তার নামাযের জায়গায় থাকবে, ততোক্ষণ ফেরেশতারা তার উপর রহমত কামনা করে দোয়া করতে থাকে- যতোক্ষণ না সে নাপাক হয়। তারা বলতে থাকে : হে আল্লাহ! ওর উপর রহমত করো। ওকে কল্যাণ দাও। আর যতোক্ষণ সে পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকবে, ততোক্ষণ সে নামাযেই থাকবে। - বুখারি, মুসলিম।

৩. আবু হুরায়রা রা. আরো বর্ণনা করেন : জনৈক অন্ধ রসূল সা. এর নিকট এলো। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. আমাকে পথ দেখিয়ে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ নেই। অতপর সে রসূল সা. এর নিকট বাড়িতে নামায পাড়র অনুমতি চাইল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তারপর যখন সে চলে যেতে উদ্যত হলো, তখন বললেন : তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে সাড়া দাও। -মুসলিম।

৪. আবু হুরায়রা রা. আরো বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা হয়, কাউকে কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করার আদেশ দেই এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করার পর একজনকে মসজিদে ইমামতি করার আদেশ দেই। তারপর কিছু লোকের বাড়িতে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেই। (অর্থাৎ যারা বিনা ওযরে জামাতে আসেনি তাদের বাড়িতে) -বুখারি, মুসলিম।

৫. ইবনে মাসউদ রা. বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আগামী দিন মুসলমান অবস্থায় দেখা করতে আনন্দ পায়, সে যেনো যেখানে আযান হয় সেখানে এই নামাযগুলো সংরক্ষণ করে। আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের সুন্নত (চিরন্তন নিয়ম) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই নামাযগুলো আযানের জায়গায় সংরক্ষণ করা হিদায়াতের চিরন্তন নিয়মগুলো অন্যতম। তোমরা যদি নিজ নিজ বাড়িতে নামায পড়তে, যেমন জামাত থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তি পড়ে, তাহলে তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করতে। আর যদি তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করতে, তবে তোমরা বিপথগামী হয়ে যেতে। আমরা আমাদের সময়ে দেখেছি, মুনাফিক হিসেবে সুপরিচিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ জামাত থেকে অনুপস্থিত থাকতোনা। আবার কেউ কেউ দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে এসে কাতারে দাঁড়াতো। -মুসলিম। ইবনে মাসউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে : রসূল সা. আমাদেরকে হিদায়াতের সুন্নত শিখিয়েছেন : তা হচ্ছে, যে মসজিদে আযান দেয়া হয় সেই মসজিদে নামায পড়া।

---

* এটা ফরয নামাযের বিধান। নফল নামাযে জামাত মুবাহ, চাই জামাত ছোট হোক বা বড় হোক। হাদিসে আছে, রসূলুল্লাহ সা. দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন। আর তাঁর ডান পাশে আনাস এবং পেছনে উম্মে সুলাইম ও উম্মে হারাম দাঁড়ালেন। এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

৬. আবুদ দারদা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : কোনো গ্রামে বা যাযাবর জনপদে যদি নামায কায়েম না করা হয় (অর্থাৎ জামাত বদ্ধভাবে), তাহলে তাদের উপর শয়তান প্রবল হবে। সুতরাং তোমরা অবশ্যই জামাত কায়েম করবে। কেননা দল বিচ্ছিন্ন ছাগলকেই বাঘে খায়। -আবু দাউদ।

২. মহিলাদের মসজিদের জামাতে যোগদান ও বাড়িতে নামায পড়ার ফযিলত

মহিলাদের মসজিদে যাওয়া ও জামাতে নামায পড়া জায়েয, যদি তারা পুরুষের কামনা উসকে দেয়ার মতো কিছু না করে এবং মানুষকে বিপথে ধাবিত করতে পারে এমন কিছু ব্যবহার না করে যেমন সাজসজ্জা করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। ইবনে উমর রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিওনা। তবে তাদের বাড়িই তাদের জন্যে উত্তম। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহর বান্দীদের আল্লাহর মসজিদে যাওয়া তেকে নিষেধ করোনা। তবে তারা যেনো সুগন্ধি ব্যবহার ছাড়াই মসজিদে যায়। -আহমদ, আবু দাউদ। আবু হুরায়রা রা. আরো বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মহিলা যেনো সুগন্ধি লাগিয়ে আমাদের সাথে এশার নামায পড়তে না আসে। -মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী।

তবে মহিলাদের জন্য তাদের বাড়িতে নামায পড়াই উত্তম। আহমদ ও তাবারানি বর্ণনা করেছেন, উম্মে হুমাইদ সায়েদিয়া রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বললেন : হে রসূলুল্লাহ সা., আমি আপনার সাথে নামায পড়তে চাই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আমি জেনেছি। তবে তোমার নিজের ঘরে নামায পড়া তোমার পাড়ার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর তোমার পাড়ার মসজিদে নামায পড়া তোমার এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

৩. অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী মসজিদে ও বৃহত্তর জামাতে নামায পড়া

যে মসজিদ অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত কিন্তু অধিক সংখ্যক মুসল্লী সমবেত হয়, সেই মসজিদে নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা মুসলিম আবু মসূা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি যতো দূরে গিয়ে নামায পড়বে, সে ততোবেশি সওয়াব পাবে। আর জাবের বলেন : মসজিদের আশপাশের জায়গা খালি হওয়ায় বনু সালামা মসজিদের কাছাকাছি স্থানান্তরিত হবার ইচ্ছা করলো। রসূলুল্লাহ সা. এটা জানতে পেরে বললেন : হে বনু সালামা, আমি খবর পেয়েছি, তোমরা মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হতে চাও। তারা বললো : হ্যাঁ, হে রসূলুল্লাহ! আমরা সেটাই চাই। রসূল সা. বললেন : তোমরা বরং তোমাদের বাসস্থানকে আঁকড়ে থাকো। তোমাদের পায়ের চিহ্ন লেখা হয়।" তাছাড়া ইতিপূর্বে আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিস বুখারি ও মুসলিমে একই বিষয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। আর উবাই বিন কা'ব বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো এক ব্যক্তির আর এক ব্যক্তির সাথে নামায পড়া তার একাকী নামায পড়ার চেয়ে, আর কোনো ব্যক্তির দুই ব্যক্তির সাথে নামায পড়া তার এক ব্যক্তির সাথের নামায পড়ার চেয়ে অধিকতর সওয়াবের কাজ এবং তাকে গুনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে অধিকতর কার্যকর। যে জামাতে আরো বেশি লোক সমাগম হয়, তা আল্লাহর কাছে আরো বেশি প্রিয়।" -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান।

৪. মসজিদে শান্তভাবে গমন করা মুস্তাহাব

শান্তভাবে ও গাম্ভীর্য সহকারে মসজিদে যাওয়া মুস্তাহাব। দ্রুত গতিতে যাওয়া ও দৌড়ে যাওয়া মাকরূহ। মানুষ যে মুহূর্তে নামাযের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা হয় সেই মুহূর্তেই তাকে

নামাযী গণ্য করা হয়। আবু কাতাদা বলেছেন : আমরা একদিন রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়ছিলাম। সহসা তিনি কিছু লোকের শোরগোল শুনতে পেলেন। নামায শেষে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের ব্যাপার কি? তারা বললো : আমরা নামায ধরতে দ্রুত ছুটে এসেছি। রসূল সা. বললেন : এ রকম করোনা। তোমরা যখন নামাযে আসবে, তখন ধীর ও শান্তভাবে আসবে। নামায যতোটুকু জামাতের সাথে ধরতে পারো তা পড়ো। আর যা ছুটে যায় তা পরে পড়ে নিও। –বুখারি, মুসলিম।*

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন : ইকামত শুনে মসজিদে চলে যাও। তবে ধীর ও শান্তভাবে যাও। তাড়াহুড়ো করোনা। যেটুকু ধরতে পারো পড়ো। আর যেটুকু ছুটে যায় পরে পড়বে। –তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।**

৫. নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা ইমামের জন্য মুস্তাহাব

জামাতের নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা ইমামের জন্য মুস্তাহাব। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জামাতের ইমামতি করে তখন তার সংক্ষিপ্ত করা উচিত। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ ও দুর্বল লোক থাকে। একা একা সে পড়লে যতো খুশি লম্বা করতে পারে। –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমি যখন নামাযে প্রবেশ করি, তখন তা দীর্ঘ করতে আমার ইচ্ছা করে। সহসা শিশুর কান্না শুনতে পাই। ফলে আমি নামায দ্রুত শেষ করি। আমি জানি, শিশুর কান্নায় তার মা কতো বেশি কষ্ট পায়। বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আনাস বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাংগ নামায কখনো আর কোনো ইমামের পেছনে পড়িনি। আবু উমর বিন আবদুল বার বলেছেন : আলেমদের নিকট যে কোনো ইমাম কর্তৃক নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা সর্বসম্মতভাবে মুস্তাহাব। তবে নামাযের প্রতিটি কাজ কর্মের পক্ষে তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার সমান দীর্ঘ হতে হবে। তবে কোনো কাজ বাদ দেয়া ও কম করা যাবেনা। কোনো! রসূলুল্লাহ সা. কাকের মতো ঠোকর মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি এক ব্যক্তিকে পূর্ণাংগভাবে রুকু না করে নামায সমাপ্ত করতে দেখে বলেছিলেন : তুমি যাও, আবার নামায পড়ো। তুমি নামায পড়োনি।" তিনি আরো বলেন : যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদা থেকে পিঠ সোজা করেনা, আল্লাহ তার দিকে নযর দেবেননা। তারপর আবু উমর বলেন : যে ব্যক্তি ইমাম হবে, তার জন্য নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা মুস্তাহাব– এ বিষয়ে কোনো মতভেদ থাকার কথা আমার জানা নেই। অবশ্য প্রত্যেকটি কাজ (রুকু, সাজদা ইত্যাদি) পূর্ণাংগভাবে করার শর্ত প্রযোজ্য। এক বর্ণনা অনুসারে উমর রা. বলেছেন : "তোমরা আল্লাহর বান্দাদের নিকট আল্লাহকে বিরাগভাজন বানিওনা। তোমাদের কেউ কেউ ইমাম হয়ে নামাযকে দীর্ঘায়িত করে। ফলে পেছনের লোকেরা কষ্ট পায়।

৬. ইমাম কর্তৃক প্রথম রাকাতের দীর্ঘায়িত করা

ইমামের জন্য এটা শরিয়তে অনুমোদিত যে, জামাতের ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি জামাতের নামাযে যোগদানের চেষ্টা করছে. তার অপেক্ষায় প্রথম রাকাতকে দীর্ঘায়িত করা

* ধীর ও শান্ত একই অর্থবোধক। ইমাম নববী দুটোতে কিছু পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, ধীর বলতে চলার সময় শ্লথ গতিতে চলা ও নিরর্থক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা বুঝায়। আর শান্ত বলতে গাম্ভীর্য বুঝায় : যেমন চোখ নিচু রাখা, অনুচ্চ শব্দে কথা বলা ও এদিক ওদিক না তাকানো।

** এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, ইমামের সাথে, নামাযের যেটুকু পাওয়া যায়, তাকে নামাযের প্রথমাংশ ধরা হবে এবং অবশিষ্ট নামাযকে পরবর্তী অংশ ধরা হবে।

যেতে পারে। অনুরূপভাবে, রুকু অবস্থায়ও জামাতে শরীক হতে চায় এমন লোকের জন্য অপেক্ষা করা যায়। অপেক্ষা করা যায় শেষ বৈঠকেও। আবু কাতাদার হাদিসে রয়েছে : রসূল সা. প্রথম রাকাতকে দীর্ঘায়িত করতেন। আবু সাঈদ বলেছেন নামায শুরু হওয়ার পর কেউ কেউ জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করে যখন অযু করে আসতো, তখনো রসূল সা. প্রথম রাকাতে থাকতেন। তিনি প্রথম রাকাতকে লম্বা করতেন। –আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী।

৭. ইমামের অনুকরণ ওয়াজিব, তাকে অতিক্রম করা হারাম

ইমামের অনুকরণ ওয়াজিব এবং তাকে অতিক্রম করা হারাম।* আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইমামকে ইমাম বানানো হয়েছেই এ উদ্দেশ্যে যে, তার আনুগত্য করা হবে। কাজেই তোমরা তাকে অতিক্রম করোনা। সে যখন তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো। আর সে যখন "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে, তখন তোমরা বলবে : আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ। আর যখন সাজদা দেবে, তখন তোমরাই সাজদা দেবে। আর যখন বসে দরূদ পড়ে, তখন তোমরাও সবাই বসে দরূদ পড়ো। –বুখারি, মুসলিম। আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইমাম তো এজন্যই যে, তার অনুকরণ করা হবে। কাজেই যখন সে তাকবীর বলে, তখন তোমরা তাকবীর বলো, ইমাম তাকবীর না বলা পর্যন্ত তোমরা তাকবীর বলবেনা। আর যখন সে রুকু দেবে, তখন তোমরাও রুকু দিও এবং সে রুকু না দেয়া পর্যন্ত তোমরা রুকু দিওনা। আর যখন ইমাম সাজদা দেবে, তখন সাজদা দিও। ইমাম সাজদা না দেয়া পর্যন্ত তোমরা সাজদা দিওনা। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমাদের কোনো ব্যক্তি যখন ইমামের আগে মাথা তোলে, তখন তার কি ভয় হয়না যে, আল্লাহ, তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিতে পারেন। অথবা তার মুখকে গাধার মুখে পরিবর্তিত করে দিতে পারেন? –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: হে জনতা, আমি তোমাদের ইমাম। কাজেই তোমরা রুকুতে, সাজদায়, দাঁড়ানোয়, বৈঠকে ও সালাম ফেরানোয় আমার আগে আগে যেয়োনা।" -আহমদ ও মুসলিম। বারা বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়ছিলাম। রসূলুল্লাহ সা. যখন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বললেন। তখন আমাদের কউ পিঠ বাকা করেনি– যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ সা. তাঁর মুখমণ্ডল মাটির উপর রেখেছেন। –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

৮. ইমামের সাথে একজন যুক্ত হলেই জামাত হয়ে যাবে

ইমামের সাথে একজন যুক্ত হলেই জামাত হয়ে যাবে– চাই সে বালক হোক কিংবা মহিলা। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : আমার খালা মায়মুনার বাড়িতে রাত কাটালাম। রাতে রসূল সা. নামাযে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথা ধরে আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করালেন। –সকল সহীহ হাদিস।**

---

* তাকবীর তাহরীমা বা সালাম ফেরানোর ব্যাপারে ইমামের আগে আগে চললে নামায বাতিল হয়ে যাবে– এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। অন্যান্য কাজে ইমামের আগে চললে আহমদের মতে নামায বাতিল হবে। আর ইমামের সাথে সাথে চললে মাকরূহ হবে। ইমামকে অনুসরণ করতে হবে।

** এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, কেউ যদি ইমাম হবার নিয়ত না করে এবং একা একা নামাযে দাঁড়ায়, তবে তার পেছনে মুক্তাদি হয়ে নামায পড়া এবং তার ইমামে রূপান্তরিত হওয়া বৈধ। এটা ফরয বা নফল উভয় নামাযেই প্রযোজ্য। বুখারিতে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তাঁর কক্ষে নামায পড়ছিলেন। সেই কক্ষের দেয়াল খুব নিচু ছিলো। লোকেরা রসূলুল্লাহ সা. কে দেখতে পেলো। দেখতে পেয়ে একদল তার সাথে নামাযে দাঁড়ালো। পরদিন সকালে লোকেরা এ বিষয়ে আলোচনা করলো। পরের দিন রাতে পুনরায় রসূলুল্লাহ সা. নামাযে দাঁড়ালেন। এদিনও কিছু লোক রসূল সা.-এর ইমামতিতে নামায পড়লো।

আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে, তারপর তার স্ত্রীকে জাগায় এবং দু'জনে একত্রে দু'রাকাত নামায পড়ে, তাদেরকে আল্লাহর স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের দলভুক্ত বলে লেখা হবে। –আবু দাউদ। আবু সাঈদ বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। তার আগেই রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সাথীদের নিয়ে নামায পড়েছেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এই ব্যক্তির সাথে নামায পড়ে কে তাকে সদকা দিতে রাজি আছে? উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়ালো এবং তার সাথে নামায পড়লো। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি। ইবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন, আবু বকর সিদ্দীক রা. সেই ব্যক্তির সাথে নামায পড়েছিলেন। এ হাদিস থেকে তিরমিযি প্রমাণ করেছেন, যে মসজিদে একবার জামাতে নামায অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে সেখানে পুনরায় জামাতে নামায পড়া বৈধ। আহমদ ও ইসহাকের মত এটাই। অন্যান্য আলেমের মতে, একাকী নামায পড়তে হবে। এ মত সুফিয়ান, মালেক, শাফেয়ী ও ইবনুল মুবারকের।

তবে এক জায়গায় এক সাথে একাধিক জামাত অনুষ্ঠান সর্বসম্মতভাবে অবৈধ। কেননা যে উদ্দেশ্যে ইসলাম জামাতের বিধান দিয়েছে, এটা তার পরিপন্থী। এটা শরিয়তের বিধানের পরিপন্থী।

৯. ইমামের মুক্তাদিতে পরিণত হওয়ার বৈধতা

যখন কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারিত ইমামের অনুপস্থিতিতে ইমাম বানানো হয়, তখন নির্ধারিত ইমাম উপস্থিত হলে উক্ত ব্যক্তির মুক্তাদিতে পরিণত হওয়া বৈধ। বুখারি ও মুসলিম সাহল বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বনু আমর গোত্রের বিরোধ মিমাংসার জন্য সেখানে গেলে নামাযের সময় হলে মুয়াযযিন আবু বকরের কাছে এসে বললো : আপনি কি নামায পড়াবেন? তাহলে আমি ইকামত দেই ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। অতপর আবু বকর নামাযে ইমামতি শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর রসূলুল্লাহ সা. এলেন। লোকেরা তখন নামায পড়ছে। রসূলুল্লাহ সা. কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা হাতে তালি দিলো। আবু বকর নামাযে থাকা অবস্থায় অন্য কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেননা। কিন্তু লোকেরা যখন বেশি করে তালি দিতে লাগলো, তখন পাশের দিকে তাকালেন এবং রসূলুল্লাহ সা. কে দেখলেন। রসূলুল্লাহ সা. তাকে ইশারায় বললেন : তুমি তোমার জায়গায় থাকো ও ইমামতি অব্যাহত রাখো। আবু বকর তার দু'হাত, উঁচু করলেন এবং রসূলুল্লাহ সা. ইমামতির ব্যাপারে তাকে যে আদেশ দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আবু বকর পিছিয়ে এসে কাতারে দাঁড়ালেন, রসূলুল্লাহ সা. সামনে গেলেন, নামায পড়ালেন এবং তারপর ঘুরে বসলেন। তারপর বললেন : হে আবু বকর, আমি তোমাকে আদেশ দেয়ার পর তুমি ইমামতি অব্যাহত রাখলেনা কেন? আবু বকর রা. বললেন : আবু কুহাফার ছেলের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা যে রসূলুল্লাহ সা. এর উপস্থিতিতে ইমামতি করে। জনসাধারণকে রসূলুল্লাহ সা. জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? তোমাদেরকে অতো বেশি হাতে তালি দিতে দেখলাম কেন ? নামাযের মধ্যে কারো যদি কোনো আকস্মিক ঘটনা ঘটে তবে তার উচিত সুবহানাল্লাহ বলা। হাতে তালি দেয়া শুধু মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট।"

শওকানি বলেছেন এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে এক কাতার থেকে পার্শ্ববর্তী কাতারে হেটে গেলে নামায বাতিল হয়না। তাছাড়া কোনো ঘটনার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা ও সুবহানাল্লাহ বলা দ্বারা সতর্ক করা বৈধ। আর কোনো ওযরবশত ইমামের অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা জায়েয। দু'জন ইমামের দ্বারা নামায অনুষ্ঠিত হওয়া দূষণীয় কিছু নয়। এতে এক ব্যক্তির নামাযের একাংশে ইমাম হওয়া ও অপর অংশে মুক্তাদি হওয়ার বৈধতার

প্রমান পাওয়া যায়। তাছাড়া নামাযের মধ্যে দোয়া ও আল্লাহর প্রশংসার সময় হাত উঁচু করার বৈধতারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রয়োজনে এদিক ওদিক তাকানোও জায়েয প্রমাণিত। আর প্রয়োজনে ইশারার মাধ্যমে নামাযীকে কিছু বলাও জায়েয প্রমাণিত। দীনের ব্যাপারে সম্মানিত হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায় করা, অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তির অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির ইমাম হওয়া এবং নামাযের ভেতরে সামান্য কিছু কাজকর্ম করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

১০. জামাতে আংশিক অংশগ্রহণ

যে ব্যক্তি নামাযের মাঝখানে জামাতে প্রবেশ করে, সে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলবে এবং ইমাম যে অবস্থায়ই থাকবে, সেই অবস্থায়ই তার সাথে অংশগ্রহণ করবে। (ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীরা তাহরীমা বলে জামাতে যোগদান করলে পুরো জামাতের ছওয়াব পাওয়া যাবে। কোনো রাকাতের রুকু না পাওয়া পর্যন্ত ঐ রাকাত জামাতে পাওয়া গেল বলে গণ্য হবেনা। ইমামের সাথে পুরো রুকু না পেলেও অথবা ইমামের মাথা তোলার আগে মাথা ঝুকিয়ে হাঁটুতে হাত স্পর্শ করলেও রাকাত ধর্তব্য হবে।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমরা নামাযে হাজির হও, তখন আমরা সাজদায় থাকলে তোমরাও সাজদায় যেয়ো। তবে সেটিকে রাকাত গণ্য করোনা। আর যে ব্যক্তি রুকু পাবে সে নামাযের রাকাত পেয়েছে বলে ধরা হবে। -আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা, হাকেম।

মাসবুক (যে ব্যক্তি আংশিক জামাত পেয়েছে) ইমাম যা যা করে, হুবহু তা তা করবে। সে তার সাথে শেষ বৈঠক করবে। ইমাম সালাম না ফিরানো পর্যন্ত সে দাঁড়াবেনা। যখন দাঁড়াবে, তখন বাকি নামায সম্পূর্ণ করতে আল্লাহু আকবর বলে দাঁড়াবে।

১১. যেসব ওযরে জামাত ত্যাগ করা যায়

নিম্নবর্ণিত যে কোনো একটি অবস্থার উদ্ভব ঘটলে জামাত ত্যাগ করার অনুমতি রয়েছে :

১ ও ২. বৃষ্টিপাত অথবা তুষারপাত : ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. ঘোষককে আদেশ দিতেন যেনো নামাযের জন্য আহ্বান জানায় এবং বলে : অন্ধকার বর্ষণমুখর রাতে তোমরা নিজ নিজ বাসস্থানে নামায পড়ো। -বুখারি, মুসলিম। জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে এক সফরে বের হলাম। আমাদের সেই সফরকালে বৃষ্টি হলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমাদের যার যার ইচ্ছা নিজ নিজ থাকার জায়গায় নামায পড়ে নাও। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি। ইবনে আব্বাস একবার বৃষ্টির দিনে তার মুয়াযযিনকে বললেন : 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' বলার পর 'হাইয়া আলাস সালাহ' "নামাযের জন্য এসো" বলোনা। তার পরিবর্তে বলো : "সাল্লু ফী বুয়ুতিকুম" (তোমাদের নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ো)। লোকেরা এটা অপছন্দ করলো বলে মনে হলো। তাই ইবনে আব্বাস বললেন : তোমরা কি এতে অবাক হচ্ছো? যিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই রসূল সা.ই এটা করেছিলেন। জামাত অবশ্য করণীয় কাজ। তবে কাদাপানি ও পিছলা পথে চলার জন্য তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করা আমার পছন্দ হয়নি। -বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনা এ রকম : ইবনে আব্বাস এক বর্ষণমুখর জুমার দিনে তাঁর মুয়াযযিনকে আদেশ দিলেন। তুষারপাতের মতো প্রচণ্ড গরম, গাঢ় অন্ধকার ও অত্যাচারির ভয়েও জামাত ত্যাগ করার অনুমতি রয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেছেন : এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা অর্থাৎ

ঐকমত্য রয়েছে। তিনি মুষলধারে বৃষ্টিপাত, ঝড় ও অনুরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৩. খাদ্য উপস্থিত হওয়া : ইবনে উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ খাওয়ার অবস্থায় থাকলে তার তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়- যতোক্ষণ না প্রয়োজন পরিমাণ খাওয়া হয়। এমনকি জামাত শুরু হয়ে গেলেও নয়। -বুখারি।

৪. পেশাব ও পায়খানার চাপের মধ্যে থাকলে : আয়েশা রা. বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি : খাদ্য উপস্থিত হওয়া ও পেশাব ও পায়খানার চাপ থাকা অবস্থায় নামায পড়া যাবেনা। -আহমদ, মুসলিম ও আবু দাউদ।

৫. আবু দারদা রা. বলেছেন, আগে নিজের প্রয়োজন পূরণ করা বুদ্ধিমত্তার কাজ, যাতে নিরুদ্বেগ মনে নামায পড়া যায়। -বুখারি।

১২. ইমামতির জন্য কে বেশি যোগ্য

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব বেশি জানে, সে ইমামতির বেশি যোগ্য। কুরআন পাঠের যোগ্যতায় যদি অনেকেই সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে, সে ইমামতির বেশি যোগ্য। এতেও যদি একাধিক ব্যক্তি সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি হিজরতে জ্যেষ্ঠতম, সে ইমামতির বেশি যোগ্য। এতেও যদি একাধিক ব্যক্তি সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি বয়সে প্রবীণতম, সে ইমামতির বেশি যোগ্য।

১. আবু সাঈদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তিনজন লোক সমবেত হবে, তখন তাদের একজনের ইমামতি করা উচিত। যে ব্যক্তি অধিক কুরআন জানে, সে ইমামতির অধিক যোগ্য। -আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী। "অধিক কুরআন জানে" অর্থ কুরআনের জ্ঞানে এবং স্মৃতিতে ধারণে অধিক। কেননা আমর বিন সালমার বর্ণনায় রয়েছে : "তোমাদের মধ্যে যার কাছে বেশি পরিমাণে কুরআন রয়েছে, তার ইমামতি করা উচিত।"

২. ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি জামাতের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুরআন জানে, সে জামাতের ইমামতি করবে। কুরআন জানার যোগ্যতায় যদি সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী, সে হবে ইমামতির অধিকতর যোগ্য। সুন্নাহর জ্ঞানেও যদি সবাই সমান হয়, তাহলে যে হিজরতে জ্যেষ্ঠতর সে ইমামতির অধিকতর যোগ্য। হিজরতেও যদি সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ সে ইমামতির অধিকতর যোগ্য। কোনোক্রমেই যেনো কেউ অন্যের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় তার অনুমতি ছাড়া ইমামতি না করে। আর কেউ যেনো গৃহকর্তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে তার অনুমতি ছাড়া না বসে। -আহমদ, মুসলিম।

এর অর্থ হলো, শাসনকর্তা, গৃহকর্তা ও অধিবেশনের সভাপতি অন্যদের চেয়ে ইমামতির অধিকতর যোগ্য, যতোক্ষণ এই কর্তা ব্যক্তিদের কেউ অন্য কাউকে অনুমতি না দেয়।

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো সমাজ বা দলের অনুমতি ব্যতিত তাদের ইমাম বা নেতা হওয়া বৈধ নয়। আর অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু নিজেকে কোনো দাওয়াতের মেহমানরূপে নির্দিষ্ট করবেনা। করলে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার শামিল হবে। -আবু দাউদ।

১৩. যাদের ইমামতি বৈধ

যে বালক হালাল হারামের পার্থক্য বোঝে তার ইমামতি বৈধ। অন্ধের ইমামতি, বসে নামায আদায়কারীর সাথে দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর ইমামতি, দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর সাথে

বসে নামায আদায়কারীর ইমামতি, নফল আদায়কারীর সাথে ফরয আদায়কারীর ইমামতি, ফরয আদায়কারীর সাথে নফল আদায়কারীর ইমামতি, তাইয়াম্মুমকারীর সাথে অযুকারীর ইমামতি, অযুকারীর সাথে তাইয়াম্মুমকারীর ইমামতি, স্থায়ী অধিবাসীর সাথে প্রবাসীর, প্রবাসীর সাথে স্থায়ী অধিবাসীর এবং অসাধারণ ব্যক্তির সাথে সাধারণ মানুষের ইমামতি শুদ্ধ ও বৈধ। আমর বিন সালামা মাত্র ছয় বা সাত বছর বয়সে তার গোত্রের লোকদের ইমামতি করেছিলেন। রসূল সা. ইবনে উম্মে মাকতুমকে দুইবার মদিনার ভারপ্রাপ্ত শাসক ও ইমাম নিযুক্ত করেন। অথচ তিনি অন্ধ ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালীন রোগগ্রস্ত অবস্থায় আবু বকর নিজের বাড়িতে বসে বসে নামায পড়েছিলেন এবং তার পেছনে একদল লোক দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিল। তখন তিনি তাদেরকে বসে নামায পড়তে ইংগিতে আদেশ দিয়েছিলেন। নামায শেষে যখন মুখ ফেরালেন, তখন তিনি বলেন : ইমামকে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তার আনুগত্য করার জন্যই। তাই সে রুকুতে গেলে তোমরাও রুকুতে যাও। সে রুকু থেকে উঠলে তোমরা ওঠো। আর ইমাম বসে নামায পড়লে তোমরাও তার পেছনে বসে নামায পড়ো।* মুয়ায রসূল সা. এর সাথে এশার নামায পড়তেন। তারপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের সাথে পুনরায় ঐ নামায পড়তেন। এতে তার নামায নফল হয়ে যেতো, আর তার গোত্রের জন্য এশার ফরয আদায় হতো। মিহজান বিন আদরা বলেন : আমি রসূল সা. এর কাছে গেলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হলো। তিনি নামায পড়লেন। কিন্তু আমি পড়লামনা। তিনি আমাকে বললেন : তুমি নামায পড়লেনা কেন? আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আমি নিজের ঘরে নামায পড়েছি। তারপর আপনার কাছে এসেছি। তিনি বললেন : এসেছ যখন, তখন এদের সাথে নামায পড়ো এবং নফল হিসেবে পড়ো। রসূল সা. এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়তে দেখে বললেন : এমন কেউ কি নেই, যে এই ব্যক্তিকে সদকা দেয় অর্থাৎ তার সাথে নামায পড়ে? আমর ইবনুল আস ইমাম হিসেবে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়ালেন। রসূল সা. তার নামায বহাল রাখলেন। রসূল সা. মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় মাগরিব ব্যতিত সকল নামায দুই দুই রাকাত করে পড়ালেন। তিনি বলেছিলেন : হে মক্কাবাসী, তোমরা ওঠো এবং আরো দু'রাকাত পড়ো। কেননা আমরা মুসাফির।

আর মুসাফির যখন স্থায়ী অধিবাসীর পেছনে নামায পড়ে, তখন সে চার রাকাতই পড়বে। এমনকি তার সাথে এক রাকাতের চেয়ে কম ধরতে পারলেও চার রাকাতই পড়বে।

ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো : মুসাফির একাকী নামায পড়লে দু'রাকাত পড়ে, আর কোনো স্থায়ী অধিবাসীর পেছনে পড়লে চার রাকাত পড়ে। এর কারণ কী? তিনি বললেন : এটা সুন্নত। -আহমদ

১৪. যাদের ইমামতি শুদ্ধ নয়

কোনো রুগ্ন ব্যক্তির ইমামতি সুস্থ ব্যক্তির জন্য কিংবা অন্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। (যেমন যার অসাড়ে পেশাব, পায়খানা বা বায়ু নি:সরণ হয়) এটা অধিকাংশ আলেমের অভিমত। মালেকী মাযহাবে এই ইমামতি বৈধ। তবে মাকরূহ।

১৫. মহিলাদের জন্য মহিলার ইমামতি মুস্তাহাব

আয়েশা রা. মহিলাদের ইমামতি করতেন এবং তাদের সাথে কাতারের মধ্যে দাঁড়াতেন। উম্মে

* ইসহাক আওযায়ী ইবনুল মুনযির ও যাহেরীগণের মতে, যে ব্যক্তি ওযরবশত বসে নামায পড়ে, তার পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির নামায পড়া অবৈধ। তার উচিত ইমামের অনুকরণে বসে নামায পড়া। কেউ কেউ অবশ্য এ হাদিসকে রহিত মনে করেন।

সালামাও তদ্রূপ করতেন। উম্মে ওয়ারাকার জন্য রসূল সা. একজন মুয়াযযিন নিযুক্ত করেছিলেন। উম্মে ওয়ারাকাকে তিনি তার বাড়ির মহিলাদের জন্য ফরয নামাযের ইমামতি করার আদেশ দিয়েছিলেন।

১৬. পুরুষ কর্তৃক শুধু মহিলাদের ইমামতি

আবু ইয়ালা ও তাবারানি বর্ণনা করেছেন : উবাই বিন কাব রসূল সা. এর কাছে এসে বললেন : হে রসূল, গত রাতে আমি একটা কাজ করেছি। তিনি বললেন : কী কাজ? উবাই বললেন : আমার বাড়িতে কতিপয় মহিলা রয়েছে। তারা আমাকে বললো : তুমি তো কুরআন পড়তে পারো। আমরা পারিনা। আমাদের নামায পড়াও। তাই আমি আট রাকাত ও বিতির পড়িয়েছি। শুনে রসূল সা. চুপ থাকলেন। আমরা তার চুপ থাকাকে সম্মতি মনে করেছি।

১৭. ফাসেক ও বিদয়াতির ইমামতি মাকরূহ

বুখারি বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর হাজ্জাজের পেছনে নামায পড়তেন। মুসলিম বর্ণনা করেছেন : আবু সাঈদ খুদরী মারওয়ানের পেছনে ঈদের নামায পড়েছেন। ইবনে মাসউদ ওলীদ বিন উকবার পেছনে নামায পড়েছেন। অথচ সে মদ খেতো। একদিন সে ফজরের নামায চার রাকাত পড়িয়েছিলো। উসমান এ জন্য তাকে বেত্রাঘাত করেছেন। সাহাবি ও তাবেয়ীগণ ইবনে আবু উবাইদের পেছনে নামায পড়তেন। সে নাস্তিক ও গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারী ছিলো বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে আলেমগণ যে মূলনীতি অনুসরণ করতেন তা হলো, যার নামায নিজের জন্য শুদ্ধ, তার নামায অন্যের জন্যও শুদ্ধ। তবে তারা এতদসত্ত্বেও ফাসেক ও বিদয়াতির পেছনে নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। কেননা আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি একদল লোকের ইমামতি করলো। তারপর সে কিবলার দিকে থুথু ফেললো। রসূল সা. তা দেখছিলেন। তারপর রসূল সা. বললেন : এই লোক যেনো আর তোমাদের নামায না পড়ায়। এরপর সে তাদের নামায পড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু লোকেরা তাকে বাধা দেয় এবং রসূল সা. যা বলেছেন তা তাকে জানিয়ে দেয়। সে এ বিষয়টি রসূল সা. এর নিকট উল্লেখ করলো। রসূল সা. বললেন : হ্যাঁ, তুমি আল্লাহ ও তার রসূলকে কষ্ট দিয়েছো।

১৮. কোনো সংগত কারণে ইমাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বৈধতা

ইমামের সাথে নামাযে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তি ইমাম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নিয়তেই নামায থেকে বেরিয়ে গিয়ে একাকী বাকি নামায সম্পন্ন করতে পারে- যদি ইমাম নামায দীর্ঘায়িত করেন এবং এ রকম অবস্থায় সে কোনো অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়। কিংবা কোনো সম্পদ বিনষ্ট হবার আশংকা বোধ করে। কিংবা তার সফর সংগিদের আশংকা দেখা দেয় কিংবা তার উপর ঘুম প্রবল হয়, ইত্যাদি।

কেননা সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন : মুয়ায রসূল সা. এর সাথে এশার নামায পড়তেন, তারপর তার গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের নামায পড়াতেন। একদিন রসূল সা. এশার নামায বিলম্বিত করলেন। মুয়ায তাঁর সাথে এশার নামায পড়লেন। তারপর তার গোত্রে ফিরে গেলেন এবং সূরা বাকারা পড়লেন। এতে এক ব্যক্তি আলাদাভাবে নামায পড়লো। তাকে বলা হলো : হে অমুক, তুমি মুনাফিকী করেছো। সে বললো : আমি মুনাফিকী করিনি। তবে আমি রসূল সা. এর কাছে যাবোই এবং তাঁকে বিষয়টি জানাবোই। পরে সে রসূল সা. কে সমস্ত ঘটনা জানালো। রসূল সা. বললেন : "হে মুয়ায, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? হে মুয়ায, তুমি কি মানুষকে বিপথগামী করবে? অমুক অমুক সূরা পড়ো।"

১৯. জামাতের সাথে পুনরায় নামায পড়া

ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ রা. বলেছেন : মিনায় আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে ফজরের নামায পড়লাম। এই সময় দুই ব্যক্তি এলো। তারা তাদের উটের উপর থাকা অবস্থায় যাত্রা বিরতি করলো। রসূল সা. এর আদেশে তাদেরকে তাঁর কাছে আনা হলো। ভয়ে তাদের শরীর কাঁপছিল। রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের কী হয়েছিল যে, জামাতের সাথে নামায পড়লেনা? তোমরা দু'জন কি মুসলমান নও? তারা বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমরা অবশ্যই মুসলমান। আমরা আগেই আমাদের থাকার জায়গায় নামায পড়ে ফেলেছিলাম। রসূল সা. তাদেরকে বললেন : তোমরা যখন তোমাদের থাকার জায়গায় নামায পড়ো, তারপর জামাতের সালাত পাও, তখন জামাতের সাথে পুনরায় নামায পড়ে নাও। এ নামায তোমাদের জন্য নফল হবে।" আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ী।

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি জামাতে বা একাকী কোনো নামায পড়ে নিয়েছে, সে যদি পরে ঐ নামাযের আরেকটি জামাত মসজিদে অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তার জন্য নফলের নিয়তে পরবর্তী জামাতে যোগ দিয়ে পুনরায় এ নামায পড়া শরিয়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। হুযায়ফা রা. যুহর, আসর ও মাগরিব একবার জামাতে পড়ার পর পুনরায় পড়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আরো জানা গেছে, আনাস খোরমা ও অন্যান্য খাদ্য শস্য শুকানোর চত্বরে আবু মূসার সাথে ফজরের নামায পড়ার পর পুনরায় জামে মসজিদে পৌঁছে নামায অনুষ্ঠিত হতে দেখে তারা দু'জনে পুনরায় মুগীরার ইমামতিতে ঐ নামায পড়েন। তবে সহীহ হাদিসে যে রসূল সা. বলেছেন : "তোমরা একদিনে একই নামায দু'বার পড়োনা।" সে সম্পর্কে ইবনে আবদুল বার বলেছেন : আহমদ ও ইসহাক একমত যে, এর অর্থ ফরয নামায আদায় করার পর পুনরায় ফরয হিসেবেই ঐ নামাযের পুনরাবৃত্তি করা। কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার জামাত পেয়ে রসূল সা. এর আদেশ অনুসারে নফলের নিয়তে একই নামাযের পুনরাবৃত্তি করে, তার জন্য একই দিনে একই নামাযের পুনরাবৃত্তি করা হয়না। কেননা প্রথম নামায ফরয এবং দ্বিতীয় নামায নফল। সুতরাং একই নামাযের পুনরাবৃত্তি এখানে হয়না।

২০. সালাম ফেরানোর পর ইমামের ডানে বা বামে ঘুরে বসা

কুবাইসা বিন হালব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদের ইমামতি করে নামায পড়াতেন, তারপর তার ডান ও বাম দু'দিকেই ঘুরে বসতেন। -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। আলেমগণ যে কোনো দিকেই ঘুরে বসার নীতি অনুসরণ করে থাকেন। রসূলুল্লাহ সা. থেকে উভয় পন্থাই বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. সালাম ফেরানোর পর কেবল এই দোয়াটা পড়া পর্যন্তই বসতেন : "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালাল ওয়াল ইকরাম।" -আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ।*

আর আহমদ ও বুখারি উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন সালাম ফেরাতেন, তখন তাঁর সালাম ফেরানোর সাথে সাথেই মহিলারা উঠে চলে যেতো। আর তিনি

* মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর রসূল সা. এই দোয়া দশবার না পড়ে জায়গা থেকে সরতেননা : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।" কেননা এ দোয়া পড়ার সওয়াব তখনই পাওয়া যায়, যখন দুই পা পেতে বসার আগে তা পড়া হয়।

ওঠার আগে নিজের জায়গায় সামান্য কিছুক্ষণ থাকতেন। উম্মে সালামা বলেন, আসল ব্যাপার তো আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আমাদের মনে হয়, পুরুষরা যাতে মহিলাদের মুখোমুখি না হতে পারে, সে জন্যই মহিলারা আগে ভাগেই চলে যেতো।

২১. ইমাম বা মুক্তাদিদের উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো

মুক্তাদিদের চেয়ে উঁচু জায়গায় ইমামের নামায পড়া মাকরূহ।

আবু মাসউদ আনসারী রা. বলেছেন : ইমাম কোনো জিনিসের ওপরে অবস্থান করবে আর তার পেছনে মুক্তাদিরা থাকবে- অর্থাৎ তাঁর চেয়ে নিচে অবস্থান করবে- এরূপ করতে রসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন। -দার কুতনী। আর হুমাম বলেছেন : হুযায়ফা রা. ইরাকের প্রাচীন নগরী মাদায়েনে একটা উঁচু জায়গায় অবস্থান নিয়ে জামাতের ইমামতি করলেন। এরপর আবু মাসউদ তার জামা ধরলেন এবং প্রবলভাবে টানলেন। নামায শেষে আবু মাসউদ তাকে বললেন : তুমি কি জানতেনা যে, উঁচু জায়গা থেকে ইমামতি করতে সাহাবিগণ নিষেধ করতেন? হুযায়ফা বললেন : হ্যাঁ, জানতাম। তবে আপনি জামা ধরে টান দেয়ার পর বিষয়টি মনে পড়েছে। -আবু দাউদ, শাফেয়ী, বায়হাকি।

তবে মুক্তাদির চেয়ে উঁচু জায়গায় অবস্থান গ্রহণ দ্বারা ইমামের যদি বিশেষ কোনো কারণ থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে এটা মাকরূহ হবেনা।

সাহল বিন সা'দ সায়েদী বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.কে দেখেছি, সর্বপ্রথম যেদিন মিম্বর স্থাপন করা হলো, সেদিন তিনি তার উপর বসলেন, তার উপর থেকেই আল্লাহু আকবর বললেন, তারপর রুকু করলেন, তারপর পেছনের দিকে এলেন, মিম্বরের গোড়ায় সাজদা করলেন। তারপর আবার মিম্বরে ফিরে গেলেন। নামায শেষে জনগণের দিকে মুখ করে বললেন : হে জনগণ, আমি এসব করলাম যাতে তোমরা আমার অনুকরণে নামায পড়তে পারো এবং আমার নামায শিখে নিতে পারো।" -আহমদ, বুখারি-ও মুসলিম।

তবে ইমামের চেয়ে উচ্চতর স্থানে মুক্তাদির নামায পড়া বৈধ। কেননা বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা রা. মসজিদের ছাদের উপর ইমামের পেছনে নামায পড়েছেন। আর আনাস রা. থেকে বর্ণিত : তিনি বসরায় মসজিদের ডান দিকে অবস্থিত আবু নাফের বাড়িতে এমন একটা কক্ষে জামাতে শরিক হতেন, যা মসজিদের চেয়ে মানুষের মাথা সমান উচ্চতায় অবস্থিত। আনাস সেখানে জামাতে শরিক হয়ে ইমামের পেছনে নামায পড়তেন। এ ব্যাপারে সাহাবিগণ চুপচাপ ছিলেন। -সুনান সাঈদ বিন মানসূর।

শওকানি বলেছেন : মুক্তাদি যদি ইমামের চেয়ে এতো বেশি উঁচুতে অবস্থান করে, যে তিনশো হাতের চেয়ে বেশি উঁচু হয় এবং সে কারণে ইমামের কার্যকলাপ মুক্তাদি সঠিকভাবে জানতে পারেনা। তাহলে সেটা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ হবে। চাই তা মসজিদ হোক বা অন্য কোনো জায়গা হোক। এর চেয়ে নিচু হলে মূলত: বৈধ হবে যতক্ষণ না নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু হুরায়রার উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকেই এ বিধিটি প্রমাণিত হয় এবং এর উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।

২২. ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে আড়াল থাকা অবস্থায় ইমামের অনুসরণ

দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা ইমামের গতিবিধি জানতে পারলে ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে আঁড়াল থাকা সত্ত্বেও ইমামের পেছনে নামায বৈধ। বুখারি বলেছেন, হাসান বলেছেন : তাকবীরে তাহরীমা শুনতে পেলে ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে প্রাচীর বা রাস্তা থাকলেও ইমামের অনুসরণে নামায বৈধ

হবে। ইতিপূর্বে এই মর্মে হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসূল সা. এর পেছনে লোকেরা ঘরের আড়াল থেকেও নামায পড়তো।

২৩. যে ব্যক্তি ফরয তরক করে তার পেছনে নামায পড়া

ইমাম যদি নামাযের কোনো শর্ত বা রুকন ত্যাগ করে তবে মুক্তাদি সমস্ত রুকন ও শর্ত পূরণ করলে এবং ইমামের ত্যাগ করার খবর না জানলে উক্ত ইমামের পেছনে মুক্তাদির নামায বৈধ হবে। কেননা আবু হুরায়রা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "ইমামগণ তোমাদের নামায পড়াবে। যদি নির্ভুলভাবে পড়ায়, তবে তোমাদেরও লাভ, ইমামেরও লাভ। আর তারা যদি ভুল করে, তবে তোমাদের লাভ এবং তাদের ক্ষতি।" -আহমদ, বুখারি। সাহল বলেন : আমি রসূল সা.কে বলতে শুনেছি : ইমাম দায়িত্বশীল। সে যদি সুষ্ঠুভাবে তার কাজ করে, তাহলে তারও লাভ, জামাতেরও লাভ। আর যদি সুষ্ঠুভাবে না করে তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত, জামাত নয়। -ইবনে মাজাহ। বিশুদ্ধ হাদিস থেকে আরো জানা গেছে, উমর রা. জুনুব (বৃহত্তর অপবিত্রতাযুক্ত) অবস্থায় নিজের অজান্তে নামায পড়ালেন। পরে তিনি নিজে নামায দুহরিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা দুহরায়নি।

২৪. ইমাম কর্তৃক প্রতিনিধি নিয়োগ

ইমাম নামাযে থাকা অবস্থায় যদি এমন কিছু ঘটে, যার জন্য তার ইমামতি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, যেমন তার মনে পড়লো, সে অপবিত্র, অথবা তার অযু ছুটে গেলো, তবে সে অবস্থায় ইমাম নিজের স্থলে অন্য কাউকে ইমাম নিয়োগ করতে পারে, যে মুক্তাদিদের নিয়ে অবশিষ্ট নামায সম্পন্ন করবে। আমর বিন মাইমুন রা. বলেছেন : যেদিন ফজরের সময় উমর রা. আহত হলেন, সেদিন আমি নামাযে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার ও উমরের মাঝে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ব্যতিত আর কেউ ছিলনা। সহসা শুনেত পেলাম : তিনি আল্লাহু আকবার বললেন। তারপর বললেন : আমাকে কুকুরে হত্যা করলো বা খেলো। যখন ঘাতক তাকে আঘাত করলো, তখন এটা বললেন এবং আবদুর রহমান বিন আওফের হাত ধরলেন এবং সামনে এগিয়ে দিলেন। তারপর তিনি সংক্ষিপ্তভাবে নামায পড়ালেন। -বুখারি। আবু রযীন বলেছেন : একদিন আলী নামায পড়ালেন। সহসা তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরলো। তিনি এক ব্যক্তির হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন এবং নিজে বেরিয়ে গেলেন। -সাঈদ বিন মানসূর। আহমদ বলেছেন : ইমাম কর্তৃক প্রতিনিধি নিয়োগের কাজটি উমর ও আলী করেছেন। আর মুক্তাদিদের একাকী নামায শেষ করার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল মুয়াবিয়া রা. যখন আহত হলেন। ফলে আহত হওয়ার পরবর্তী নামায লোকেরা একাকী সম্পূর্ণ করলো।

২৫. যাকে লোকেরা পছন্দ করেনা তার ইমামতি

বহু হাদিসে জামাতের নিকট পছন্দনীয় নয় এমন ব্যক্তির ইমামতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে অপছন্দ করা ধর্তব্য হবে তখনই, যখন তা শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয় এবং তার পেছনে কোনো শরিয়ত সম্মত কারণ থাকে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয়না। যে ব্যক্তি কোনো জামাতের ইমামতি করে অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করেনা, যে স্ত্রী স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে রাত কাটিয়ে দেয় এবং যে দুই ভাই পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন করে। -ইবনে মাজাহ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলতেন : তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ গ্রহণ করেননা : যে কোনো জামাতের ইমাম হয় অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করেনা,

যে ব্যক্তি ওয়াক্তের পর নামায পড়ে এবং যে ব্যক্তি মুক্ত মানুষকে দাসে রূপান্তরিত করে। -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। তিরমিযি বলেন : জনগণের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও কারো ইমাম হওয়া মাকরূহ। ইমাম যদি অপরাধী না হয়, তাহলে যে বা যারা তাকে অপছন্দ করেছে তারা গুনাহগার হবে।

২৬. ইমাম মুক্তাদিদের কর্তব্য

১. মুক্তাদি একজন হলে ইমামের ডান পাশে এবং দু'জন বা তার বেশি হলে পেছনে থাকবে : কেননা জাবের রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. নামাযে দাঁড়ালেন। তারপর আমি এলাম এবং তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, তারপর আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। এরপর জাবের বিন সাখর এলো এবং রসূল সা. এর বাম দিকে দাঁড়ালো। তখন রসূল সা. আমাদের সকলের হাত ধরলেন এবং আমাদের সবাইকে ঠেলে তাঁর পেছনে দাঁড় করলেন। -মুসলিম, আবু দাউদ।

আর যখন কোনো মহিলা জামাতে উপস্থিত হবে, তখন পুরুষদের পেছনে একা দাঁড়াবে এবং পুরুষদের সাথে এক কাতারে দাঁড়াবেনা। এর ব্যতিক্রম করলেও অধিকাংশের মতে তার নামায শুদ্ধ হবে।

আনাস রা. বলেছেন : আমাদের বাড়িতে আমি ও জনৈক এতিম রসূল সা. এর পেছনে নামায পড়লাম। আমার মা আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। আমাকে ও এতিমকে হাত ধরে তাঁর পেছনে ও বৃদ্ধাকে আমাদের পেছনে রাখা হলো। -বুখারি, মুসলিম।

২. ইমামের জন্যে কাতারের মাঝ বরাবর ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছাকাছি দাঁড়ানো মুস্তাহাব : কেনোনা আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইমামকে মাঝখানে রাখো ও ফাঁকা বন্ধ করো। -আবু দাউদ।

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : তোমাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত বয়স্করা আমার কাছে থাকবে, তারপর তাদের পরবর্তীগণ, তারপর তাদের পরবর্তীগণ। আর সাবধান, বাজারের মতো হৈ চৈ যেনো জামাতে না হয়। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি। আনাস থেকে বর্ণিত : রসূল সা. পছন্দ করতেন যেনো মুহাজির ও আনসারগণ তার কাছে থাকে, যাতে তাদের মধ্য থেকে লোক নিতে পারেন। -আহমদ, আবু দাউদ। এদেরকে সামনে রাখার উদ্দেশ্য হলো, তারা যাতে ইমামের ভুল শুধরে দিতে পারে। তাকে সতর্ক করতে পারে এবং ইমাম কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করতে চাইলে করতে পারে।

৩. মহিলা ও বালকদের অবস্থান : রসূলুল্লাহ সা. পুরুষদেরকে বালকদের সামনে ও বালকদেরকে তাদের পেছনে ও নারীদেরকে বালকদের পেছনে রাখতেন। (আর একজন বালক থাকলে সে পুরুষদের কাতারে দাঁড়াবে।) -আহমদ, আবু দাউদ। আর বুখারি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার আর নিকৃষ্টতম কাতার শেষ কাতার। আর মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার শেষ কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার প্রথম কাতার।

মহিলাদের সর্বশেষ কাতার সর্বোত্তম কাতার এজন্য যে, সেটি পুরুষদের থেকে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে। পক্ষান্তরে প্রথম কাতারের সাথে পুরুষদের মেলামেশার সম্ভাবনা থাকে।

৪. কাতারের পেছনে একাকী নামায : যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী নামাযের জন্য

তাকবীর তাহরীমা বলে, অতপর, কাতারে প্রবেশ করে, ইমামের সাথে রুকুতে যায়, তার নামায শুদ্ধ।

আবু বাকরা রা. রসূলুল্লাহ সা. এর রুকুতে থাকা অবস্থায় জামাতের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, কিন্তু কাতারে পৌঁছার আগেই রুকু দিলেন। পরে এ ঘটনা রসূলুল্লাহ সা. কে জানালেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহ তোমার জামাত ধরার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন। তবে এমন আর কখনো করোনা। (অর্থাৎ এতো বিলম্বে মসজিদে রওনা দিওনা, অথবা, রুকু দিয়ে এভাবে আর কাতারে প্রবেশ করোনা, অথবা, জামাত ধরতে আর কখনো এতো দ্রুত বেগে ছুটোনো।) –আহমদ, বুখারি, আবু দাউদ, নাসায়ী। তবে যে ব্যক্তি কাতার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পুরো নামায সম্পন্ন করে, অধিকাংশ আলেমের মতে, তার নামায হয়ে যায়, কিন্তু মাকরূহ হয়। আহমদ, ইসহাক, হাম্মাদ, ইবনে আবি লায়লা, ওকী, হাসান বিন সালেহ, নাসায়ী ও ইবনুল মুনযিরের মতে, পুরো এক রাকাতও কাতারে পেছনে একাকী পড়লে নামায বাতিল হবে।

ওয়ারিসা বলেন : রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী নামায পড়তে দেখে তাকে নামায পুনরায় পড়ার আদেশ দিলেন। –নাসায়ী ব্যতিত পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আহমদের ভাষা এরকম : কাতারের পেছনে একাকী নামায পড়েছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন : নামায পুনরায় পড়বে। আলী ইবনে শায়বান বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী নামায পড়তে দেখে দাঁড়ালেন। লোকটি নামায শেষ করে চলে যেতে উদ্যত হলে তাকে বললেন : তুমি নামাযের দিকে মনোযোগী হও। কেননা কাতারের পেছনে একাকী নামায হয়না। –আহমদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকি।

তবে অধিকাংশ আলেম আবু বকরার হাদিসের অনুসরণ করেন। কেননা তিনি কাতারের পেছনে নামাযের কিছু অংশ সম্পন্ন করলেও রসূলুল্লাহ সা. তাকে পুনরায় নামায পড়ার আদেশ দেননি। সুতরাং অন্যান্য হাদিসে পুনরায় নামায পড়ার যে আদেশ রয়েছে, তার ব্যাখ্যা হবে এ রকম : ওটা মুস্তাহাব হিসেবে করতে বলা হয়েছে এবং উত্তম কাজটি করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। কামাল ইবনুল হুমাম বলেন : আমাদের ইমামগণ ওয়ারিসার হাদিস দ্বারা পুনরায় পড়া মুস্তাহাব এবং আলী বিন শায়বানের হাদিস দ্বারা পুনরায় না পড়লে নামাযে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে বলে স্থির করেছেন- যাতে এই দুটো হাদিস আবু বাকরার হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কেননা আবু বাকরার হাদিস থেকে বাহ্যত: পুনরায় নামায পড়ার বাধ্যবাধকতা নেই বলে প্রতীয়মান হয়। রসূলুল্লাহ সা. তাকে পুন পড়তে আদেশ দেননি। আর যে ব্যক্তি জামাতে উপস্থিত হয়ে দেখে, কাতারে জায়গা নেই, এমনকি কোথাও ফাঁক ফোকরও নেই। তাঁর ব্যাপার দু'রকমের অভিমত রয়েছে : কেউ বলেন : একাকীই দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নেবে এবং কাউকে কাতার থেকে টেনে আনা তার জন্য মাকরূহ হবে। আবার কেউ বলেন : তাকবীর তাহরীমা বলার পর কাতার থেকে এমন কাউকে টেনে আনবে যার এই বিধিটি জানা আছে। আর যাকে টেনে আনা হবে, তার ঐ ব্যক্তির আহ্বানে সম্মতি জানানো মুস্তাহাব।

৫. কাতার সোজা করা ও ফাঁক বন্ধ করা : নামায শুরু করার আগে মুসলিমগণকে কাতার সোজা করতে ও কাতারের ভেতরের ফাঁক বন্ধ করতে আদেশ দেয়া ইমামের জন্য মুস্তাহাব।

আনাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. তাকবীর তাহরীমা বলার আগে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেন এবং বলতেন : "পরস্পরের গায়ে লেগে দাঁড়াও এবং সুবিন্যস্ত হও।" –বুখারি ও মুসলিম। বুখারি ও মুসলিমেরই অপর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা কাতার সোজা

করো। কারণ কাতার সোজা করলে নামায পূর্ণতা লাভ করে।" নুমান বিন বশীর বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে কাতারের মধ্যে সোজা করে দাঁড় করাতেন, যেভাবে পানপাত্রকে গায়ে গায়ে মিলিয়ে সোজা করে রাখা হয়। অবশেষে যখন তাঁর ধারণা জন্মালো যে, আমরা কাতার সোজা করার বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে বুঝে নিয়েছি ও আয়ত্ত করে নিয়েছি, তখন একদিন মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। দেখলেন, এক ব্যক্তি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন বললেন : তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতার সোজা করবে। নতুবা আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেবেন। –তিরমিযি ব্যতিত অবশিষ্ট পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আহমদ ও তাবারানি বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "তোমাদের কাতার সোজা করো এবং কাঁধের সাথে কাঁধ সমান্তরাল করে দাঁড়াও, তোমাদের ভাইদের জন্যে বাহু কোমল করো এবং ফাঁক বন্ধ করো। কেননা শয়তান তোমাদের ভেতরে ছাগলের বাচ্চার মতো ঢুকে পড়ে। আবু দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকি বর্ণনা করেন : আনাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা প্রথমে সামনের কাতার পূর্ণ করো, তারপর পরবর্তী কাতার। যেটুকু কমতি থাকবে, তা যেনো শেষ কাতারে থাকে। বাযযার ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন : "কোনো ব্যক্তি কাতারে ফাঁক বন্ধ করতে যাওয়ার সময় যেটুকু হাঁটে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে অন্য যে কোনো পদক্ষেপের চেয়ে বেশি সওয়াব হয়।" নাসায়ী, হাকেম ও ইবনে খুযায়মা একই বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি কাতারকে যুক্ত করে আল্লাহ তাকে যুক্ত করেন, আর যে ব্যক্তি একটি কাতারকে ছিন্ন করে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করেন। বুখারি ও তিরমিযি ব্যতিত অবশিষ্ট সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থে জাবের বিন সামুরা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. একবার আমাদের কাছে এসে বললেন : ফেরেশতারা যেভাবে তাদের প্রতিপালকের নিকট কাতারবদ্ধ হয়, তোমরা সেভাবে কাতারবদ্ধ হতে পারোনা? আমরা বললাম : হে রসূলুল্লাহ সা. ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের নিকট কিভাবে কাতারবদ্ধ হয়? তিনি বললেন : তারা আগে প্রথম কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ায়।"

৬. কাতারের ডান দিকে দাঁড়াতে উৎসাহ প্রদান : ইতিপূর্বে রসূলুল্লাহ্ সা. এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে : "মানুষ যদি জানতো, আযান দেয়ায় ও প্রথম কাতারে কী সওয়াব রয়েছে, আর তার সুযোগ লাভে যদি লটারী করা ছাড়া আর কোনো উপায় না থাকতো, তবে তারা অবশ্যই লটারী করতো।

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তার সাহাবিদের মধ্যে প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করলেন। তাই তিনি তাদেরকে বললেন : সামনে এসো, আর আমার পেছনে নামায পড়ো। আর যারা তোমাদের পরে আসবে, তারা যেনো তোমাদের পেছনে নামায পড়ে। আর যারা সব সময় পেছনেই পড়ে থাকবে, আল্লাহ তাদেরকে পেছনেই ফেলে রাখবেন। –মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহর আরেক বর্ণনায় আয়েশা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যারা কাতারের ডান দিকে নামায পড়ে, আল্লাহ্ তাদের উপর রহমত পাঠান এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., প্রথম কাতারের উপরও? তিনি বললেন : আল্লাহ রহমত পাঠান এবং ফেরেশতারা দোয়া করেন প্রথম কাতারের জন্য। লোকেরা আবার বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. আর দ্বিতীয় কাতার? তিনি এবার বললেন : হ্যাঁ, দ্বিতীয় কাতারের উপরও।"

৭. ইমামের আওয়ায পৌঁছে দেয়া : ইমামের পেছনের সকল মুসল্লীর নিকট ইমামের আওয়ায পৌঁছানের ব্যবস্থা করা সেই ক্ষেত্রে মুস্তাহাব, যখন আওয়ায পৌঁছেনা এবং পৌঁছানোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইমামের আওয়ায যখন সমগ্র জামাতের কানে পৌঁছে যায়, তখন নতুন করে আওয়ায পৌঁছানোর চেষ্টা করা ঘোরতর অবাঞ্ছিত বিদয়াত। এটি সকল ইমামের সর্বসম্মত মত।

১৭. মসজিদের বিবরণ

১. যমিন এই উম্মতের মসজিদ

উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ্ তার জন্য সমগ্র পৃথিবীর মাটিকে পবিত্র ও মসজিদ বানিয়েছেন। সুতরাং কোনো মুসলমান যেখানেই থাকা অবস্থায় তার নিকট নামাযের সময় উপস্থিত হোক, সে যেনো সেখানেই নামায পড়ে। আবু যর বলেন, আমরা বললাম : হে রসূল, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়? তিনি বললেন : মসজিদুল হারাম। আমি বললাম : তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : মসজিদুল আকসা। আমি বললাম : এই দুই মসজিদের প্রতিষ্ঠায় ব্যবধান কতখানি? তিনি বললেন : চল্লিশ বছরের। তারপর বললেন : যেখানেই তোমার কাছে নামায উপস্থিত হয়, সেখানেই নামায পড়ে নিও। কেননা সেই স্থানটাই মসজিদ। -সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ।

২. মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

১. উসমান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তাঁর জন্য বেহেশতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেবেন। -বুখারি, মুসলিম।

২. আহমদ, ইবনে হিব্বান ও বাযযার ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, তা যদি একটি পাখির ডিম পাড়ার জায়গার মতো ক্ষুদ্রও হয়, তবে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেবেন।

৩. মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করার দোয়া

১. উম্মে সালামা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, বলতেন :

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. رواه اصحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيْ .

"আল্লাহর নামে রওয়ানা করলাম, আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম, হে আল্লাহ, তোমার কাছে আশ্রয় চাই যেনো আমি গোমরাহ না হই এবং কেউ আমাকে গোমরাহ করতে না পারে, আমার যেনো পদস্খলন না হয় এবং কেউ আমার পদস্খলন ঘটাতে না পারে, আমি যেনো কারো উপর যুলুম না করি এবং কেউ আমার উপর যুলুম না করে, আর আমি যেনো মূর্খসুলভ আচরণ না করি এবং আমার সাথে কেউ মূর্খসুলভ আচরণ না করে। -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

২. আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে :

بِاسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

তাকে বলা হবে : এটা তোমার যথেষ্ট। তোমাকে হেদায়াত করা হলো, তোমাকে রক্ষা করা হলো এবং শয়তান তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়।

৩. বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. মসজিদের দিকে রওনা হয়ে বলতে লাগলেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَخَلْفِيْ نُوْرًا، وَفِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ دَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَشْرِيْ نُوْرًا.

সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে তিনি এভাবে বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার অন্তরে আলো দাও, আমার চোখে আলো দাও, আমার কানে আলো দাও, আমার ডান দিকে আলো দাও। আমার পেছন দিকে আলো দাও। আমার স্নায়ুতে আলো দাও, আমার মাংসে আলো দাও, আমার অশ্রুতে আলো দাও, আমার চুলে আলো দাও, আমার চামড়ায় আলো দাও। মুসলিমের বর্ণনায় সংযোজন : আমার জিহ্বায় আলো দাও, আমার সামনে আলো দাও, উপরে আলো দাও, নিচে আলো দাও, হে আল্লাহ! আমাকে আলো দাও।"

৪. আহমদ, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে মাজাহ আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কেউ নামাযের জন্য বাড়ি থেকে বের হয় এবং বলে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ.وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا فَإِنِّيْ لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَارِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِيْ مِنْ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

"হে আল্লাহ, যারা তোমার নিকট প্রার্থনা করে, তাদের অধিকারের জন্যে এবং আমার এই যাত্রার অধিকারে তোমার নিকট প্রার্থনা করি। কেননা আমি তোমার নিয়ামত অস্বীকার ও তার না শোকর করিনা, মানুষকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করিনা। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তোমার নিকট প্রার্থনা করি আমাকে দোযখ থেকে রক্ষা করো, আমার গুনাহ মাফ কর, তুমি ব্যতিত কেউ গুনাহ মাফ করতে পারেনা।" আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতাকে নিয়োগ করেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন।

৪. মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া

যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, তার জন্য সুন্নত হচ্ছে, ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে, এবং বলবে :

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوْبِى وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

"মহান আল্লাহর আশ্রয় চাই, তাঁর মহান সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই, তার শাশ্বত কর্তৃত্বের আশ্রয় চাই, বিতাড়িত শয়তান থেকে। আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ, মুহাম্মদের প্রতি রহমত পাঠাও। হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করো এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দুয়ার খুলে দাও।" আর যখন বের হবে, বাম পা দিয়ে বের হবে এবং বলবে :

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ، اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

"আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ মুহাম্মদের উপর রহমত পাঠাও। হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দাও। হে আল্লাহ, আমাকে শয়তান থেকে রক্ষা করো।"

৫. মসজিদে যাওয়া ভেতরে বসার ফযীলত

১. আহমদ, বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে, আল্লাহ তার মেহমানদারীর জন্য বেহেশত প্রস্তুত করে রাখবেন প্রতিবার সকাল ও সন্ধ্যার গমনাগমনের জন্য।

২. আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান ও তিরমিযি, আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যখন তোমরা কোনো ব্যক্তিকে দেখবে মসজিদে যেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তখন তার ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দাও। কেননা আল্লাহ বলেছেন : মসজিদকে সেই ব্যক্তিই আবাদ করে যে আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে।"

৩. মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করে, তারপর আল্লাহর কোনো ফরয আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর অভিমুখে রওনা হয়, তার একটি পদক্ষেপ দ্বারা তার গুনাহ মোচন হয়, আর অপর পদক্ষেপ দ্বারা তার মর্যাদা উন্নীত হয়।

৪. তাবারানি ও বাযযার আবু দারদা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মসজিদ হচ্ছে প্রত্যেক আল্লাহভীরুর বসত ঘর। আর মসজিদ যার বসত ঘর, আল্লাহ তাকে রহমত ও শান্তির নিশ্চয়তা দেন এবং জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা পার করিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার নিশ্চয়তা দেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির গন্তব্যস্থল হচ্ছে বেহেশত।

৬. তাহিয়াতুল মসজিদ

সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে উপস্থিত হবে, তখন বসার আগে সে যেনো দুটি সাজদা করে দু'রাকাত নামায পড়ে।

৭. শ্রেষ্ঠ মসজিদ

১. বায়হাকি জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মসজিদুল হারামের এক রাকাত নামায এক লক্ষ রাকাতের সমান, আমার মসজিদের এক রাকাত এক হাজার রাকাতের সমান এবং বাইতুল মাকদাসের এক রাকাত পাঁচশো রাকাতের সমান।

২. আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার এ মসজিদে একটি নামায মসজিদুল হারাম ব্যতিত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার রাকাতের চেয়ে উত্তম। আর মসজিদুল হারামে একটি নামায আমার এই মসজিদের নামাযের চেয়ে একশো গুণ বেশি উত্তম।

৩. সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ বর্ণনা করেছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনটি মসজিদ ব্যতিত আর কোনো স্থান অভিমুখে সফর করা নিষিদ্ধ : মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।

৮. মসজিদকে সুসজ্জিত করা

১. আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মানুষ যতোক্ষণ মসজিদ নিয়ে গর্ব না করবে, ততোক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবেনা। ইবনে খুযায়মার বর্ণনার ভাষা এ রকম : মানুষের নিকট এমন একটা যুগ আসবে যখন তারা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে। অথচ তারপর তারা মসজিদকে খুব কমই আবাদ করবে অর্থাৎ কমই মসজিদমুখী হবে।

২. আবু দাউদ ও ইবনে হিববান ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমি মসজিদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উঁচু করতে আদিষ্ট হইনি। আবু দাউদের সংযোজন : ইবনে আব্বাস বলেছেন : ইহুদী ও খৃস্টানরা যেভাবে তাদের ইবাদতখানাকে সুসজ্জিত করতো, তোমরা মসজিদগুলোকে সেভাবে সুসজ্জিত করবে।

৩. ইবনে খুযায়মা বর্ণনা করেছেন : উমর রা. মসজিদগুলোকে নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন : আমি মুসল্লীদেরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছি। তুমি মসজিদকে লাল বা হলুদ রং এ রঞ্জিত করবেনা। তাহলে এই রং মানুষকে ইবাদত থেকে উদাসীন করে দেবে। -বুখারি।

৯. মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও সুগন্ধিযুক্ত করা

১. আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিববান আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জনপদগুলোতে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সুগন্ধিযুক্ত করতে আদেশ দিয়েছেন। আবু দাউদের ভাষা এ রকম : রসূল সা. আমাদেরকে আদেশ দিতেন যেনো আমাদের আবাসিক এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করি, তার মেরামত করি ও পবিত্র করি। আর আবদুল্লাহ যখন মিম্বরে বসতেন, তখন মসজিদকে সুগন্ধিযুক্ত করতেন।

২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার উম্মত যে পুরস্কার পাবে তা আমাকে দেখানো হয়েছে। এমনকি মসজিদ থেকে আবর্জনা দূর করার জন্যও। -আবু দাউদ ও তিরমিযি।

১০. মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ

মসজিদ ইবাদতের ঘর। একে সব ধরনের ময়লা, আবর্জনা ও দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা জরুরি।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "মসজিদ ময়লা আবর্জনা ও পেশাবের উপযুক্ত স্থান নয়। এটা শুধু আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন অধ্যয়নের জন্য।" আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কাশে বা নাক ঝাড়ে, তখন তার কফ বা শিকনি যেনো উধাও করে দেয়, যাতে তা কোনো মুমিনের দেহে বা কাপড়ে লেগে তাকে কষ্ট না দেয়। আহমদ ও বুখারি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে যেনো সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে।

কেননা সে যতোক্ষণ নামাযে থাকে, ততোক্ষণ আল্লাহর সাথে কথোপকথনে নিয়োজিত থাকে, আর ডান দিকেও নয়, কেননা ডান দিকে ফেরেশতা থাকে। সে যেনো বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে অথবা পায়ের নিচে মাটিতে পুতে ফেলে। জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : পিঁয়াজ, রসুন ও কুরাছ (দুর্গন্ধযুক্ত তরকারি বিশেষ) খেয়ে কেউ যেনো আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা মানুষ যাতে কষ্ট পায়, তাতে ফেরেশতারাও কষ্ট পায়।" উমর রা. একদিন জুমার খুতবায় বললেন : হে জনগণ, তোমরা দু'টো গাছের ফল খেয়ে থাকো, যাকে আমি গর্হিত মনে করি। তা হলো পিঁয়াজ ও রসুন। আমি রসূল সা.কে দেখেছি, যখন কারো কাছ থেকে এ দুটো জিনিসের গন্ধ পেতেন, তখন তাকে বাকির দিকে বের করে দিতেন। তোমাদের কেউ এটা খেলে রান্না করে এর দুর্গন্ধ দূর করে যেনো খায়। -আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী।*

১১. হারানো জিনিসের ঘোষণা, বেচাকেনা ও কবিতা পাঠ মাকরূহ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি শুনতে পায় যে, কোনো ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিসের কথা ঘোষণা করছে, সে যেনো বলে : আল্লাহ যেনো ওটা তোমাকে ফিরিয়ে না দেন। কেননা মসজিদ এ জন্য নির্মিত হয়নি। -মুসলিম। আর আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন দেখবে কেউ মসজিদে বেচাকেনা করছে, তখন তাকে বলো : আল্লাহ যেনো তোমার বাণিজ্যকে লাভজনক না করেন। -নাসায়ী, তিরমিযি। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করতে, কবিতা আবৃত্তি করতে ও হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে নিষেধ করেছেন এবং জুমার দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসতে (অর্থাৎ সভা, সমাবেশ করতে) নিষেধ করেছেন। -পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ

মসজিদে যে কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা হলো, কোনো মুসলমানের নিন্দা ও কুৎসা, কোনো যালেমের প্রশংসা, অশ্লীল কথা ইত্যাদি সম্বলিত কবিতা। যেসব কবিতায় জ্ঞানের কথা থাকে, ইসলামের প্রশংসা থাকে বা সৎ কাজের উৎসাহ দেয়া হয়, তা নিষিদ্ধ নয়।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : উমর রা. দেখলেন, হাসসান মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছে। তিনি সেদিকে দৃষ্টি দিলেন। তারপর বললেন : আমিও মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতাম। ওখানে তোমার চেয়েও ভালো লোক রয়েছে। তারপর আবু হুরায়রার দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি তুমি কি রসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছো : আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও, হে আল্লাহ, ওকে (হাসসানকে) জিবরীল দ্বারা শক্তি যোগাও? আবু হুরায়রা রা. বললেন : হ্যাঁ, শুনেছি। -বুখারি, মুসলিম।

১২. মসজিদে ভিক্ষা করা

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, মসজিদে হোক বা অন্য কোথাও ভিক্ষাবৃত্তি আসলেই হারাম। তবে অনিবার্য কারণবশত: বৈধ। একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে এবং কাউকে কষ্ট দেয়া, যথা মুসল্লিদের ঘাড় টপকানো ব্যতিত, মিথ্যা বিবরণ দেয়া ব্যতিত এবং মানুষের জন্য বিব্রতকর উচ্চস্বরে কথা বলা ব্যতিত সম্ভব হলে মসজিদের ভেতরে ভিক্ষা করতে পারে। যেমন- খতীব ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন এবং মুসল্লীরা তা শুনে জ্ঞান অর্জন করছে, এতে তার ভিক্ষা চাওয়ায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছেনা। এ রকম হলে ভিক্ষা চাওয়া বৈধ।

---

* পিঁয়াজ, রসুন কাঁচা খাওয়া মুবাহ। তবে খেয়ে মসজিদে ও জনসমাগমের জায়গায় ততোক্ষণ যাওয়া চলবেনা, যতোক্ষণ তার দুর্গন্ধ দূর না হয়। অন্যান্য দুর্গন্ধও এর আওতাভুক্ত যেমন ধূমপান, ঢেকুর তোলা ও মুখের দুর্গন্ধ।

১৩. মসজিদে উচ্চস্বরে আওয়ায তোলা

মসজিদে জোরে আওয়ায তোলা নিষেধ, এমনকি জোরে কুরআন পড়াও নিষেধ, যা মুসল্লীদের জন্য বিব্রতকর। তবে ইসলামী জ্ঞান চর্চা এর ব্যতিক্রম।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, একদিন রসূলুল্লাহ সা. জনসমক্ষে বের হলেন। তখন তারা উচ্চস্বরে কুরআন পাঠসহ নামায পড়ছিল। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : নামাযী তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলে। কাজেই তার ভেবে দেখা উচিত সে কি কথা বলছে। তোমাদের কারো একজনের উপর অপর জনের উচ্চ কণ্ঠে কিছু উচ্চারণ করা উচিত নয়। -আহমদ। আবু সাঈদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. মসজিদে ইতিকাফ করলেন। মুসল্লীদেরকে উচ্চস্বরে কুরআন পড়তে শুনে পর্দা খুলে বললেন : শোনো, তোমরা সবাই তোমাদের প্রতিপালকের সাথে কথা বলছো। কাজেই একজন আরেকজনকে কষ্ট দিওনা এবং কেউ উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করে অন্যের বিঘ্ন সৃষ্টি করোনা। -আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকি ও হাকেম।

১৪. মসজিদে কথা বলা

ইমাম নববী বলেছেন : মসজিদে বৈধ কথাবার্তা, দুনিয়াবি বিষয়ক বা অন্য কোনো বৈধ বিষয় সংক্রান্ত কথাবার্তা বলা বৈধ। এমনকি তা যদি হাসির উদ্রেক করে, বা কোনো ধরনের বিনোদনমূলক হয় তবুও যতোক্ষণ তা বৈধ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ততোক্ষণ বৈধ। কেননা জাবের বিন সামুরা বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. তার ফজরের নামায পড়ার স্থান থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সরতেননা। সূর্য উঠলে সরে যেতেন। এ সময় লোকেরা নানা ধরনের কথাবার্তা বলতো। এমনকি জাহেলী যুগের কথাবার্তাও এসে পড়তো। তখন তারা হাসতো এবং রসূল সা. মুচকি হাসতেন। -মুসলিম।

১৫. মসজিদে পানাহার ও ঘুমানো বৈধ

ইবনে উমর রা. বলেন : আমরা রসূল সা. এর আমলে মসজিদে ঘুমাতাম, কখনো বা শুধু শুয়ে শুয়ে গড়াগড়ি খেতাম। অথচ আমরা তখন যুবক। ইমাম নববী বলেন, প্রমাণিত রয়েছে, সুফফাবাসী, উরনা গোত্রের লোকেরা, আলী সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং সাহাবিদের অনেকেই মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছুমামা মসজিদে রাত কাটাতেন। এসবই ছিলো রসূল সা. এর জীবিতকালের ব্যাপার। ইমাম শাফেয়ী "আল-উম্" গ্রন্থে বলেছেন : মুশরিক যখন মসজিদে ঘুমাতে পেরেছে, তখন মুসলমানও পারবে। মুখতাছার নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'মসজিদুল হারাম' ছাড়া যে কোনো মসজিদে মুশরিক রাত কাটাতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনুল হারেছ বলেছেন : আমরা রসূল সা. জীবিতকালে মসজিদে বসে গোশত রুটি খেতাম। -ইবনে মাজাহ।

১৬. এক হাতের আংগুল আরেক হাতের আংগুলের ফাঁকে ঢুকানো

মসজিদে নামায পড়তে যাওয়ার সময় ও মসজিদে বসে নামাযের অপেক্ষারত থাকার সময় আংগুল দিয়ে জাল বোনা মাকরূহ। এছাড়া অন্য সময় তা মাকরূহ নয়- এমনকি মসজিদের মধ্যে হলেও নয়। কা'ব থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সুষ্ঠুভাবে অযু করে, তারপর নামায পড়ার নিয়তে মসজিদে যায়, তখন সে যেনো আংগুলগুলো দিয়ে জাল না বোনে। কেননা এ সময় সে নামাযে আছে বলেই গণ্য হয়। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি। আবু সাঈদ বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম মসজিদের মাঝখানে এক ব্যক্তি বসে আছে। তার হাতের আংগুলগুলো পরস্পরের

মধ্যে ঢুকানো এবং তার দেহ কাপড় দিয়ে ঢাকা। রসূল সা. লোকটির দিকে ইংগিত করলেন। কিন্তু সে তাঁর ইংগিত বুঝতে পারলোনা। তখন রসূলুল্লাহ সা. তার দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে থাকে, তখন সে যেনো আংগুলের মধ্যে আংগুল না ঢুকায়। কারণ ওটা শয়তানের কাজ। আর তোমাদের কেউ যতোক্ষণ মসজিদে থাকে, ততোক্ষণ সে নামাযেই থাকে- যতোক্ষণ সে বের হয়ে না আসে। -আহমদ।

১৭. স্তম্ভসমূহের মাঝে নামায পড়া

স্তম্ভসমূহের মাঝে নামায পড়া ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য বৈধ। বুখারি ও মুসলিম ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন দুই স্তম্ভের মাঝে নামায পড়লেন। সাঈদ বিন জুবাইর, ইবরাহীম তাইমী ও সুয়াইদ বিন গুফলা নিজ নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন স্তম্ভসমূহের মাঝখানে। তবে মুক্তাদীদের জন্য স্তম্ভের মাঝখানে নামায পড়া ভীড়ের চাপ কম থাকলে মাকরূহ- চাপ বেশি থাকলে মাকরূহ নয়। আনাস রা. বলেন : স্তম্ভসমূহের মাঝখানে নামায পড়তে আমাদেরকে নিষেধ করা হতো এবং আমাদেরকে তা থেকে সরিয়ে দেয়া হতো। -হাকেম। মুয়াবিয়া বলেন : রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে আমাদেরকে স্তম্ভসমূহের মাঝে কাতারবদ্ধ হতে নিষেধ করা হতো এবং আমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হতো। -ইবনে মাজাহ। সাঈদ বিন মানসূর বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও হুযায়ফা এরূপ করতে নিষেধ করতেন। ইবনে সাইয়েদুন নাস বলেছেন : কোনো সাহাবি এর বিরোধী ছিলেন বলে জানা যায়না।

১৮. যেসব জায়গায় নামায পড়া নিষেধ

১. কবর এবং কবরস্থানে নামায পড়া নিষেধ*

বুখারি, মুসলিম, আহমদ ও নাসায়ীতে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ ইহুদী ও খৃস্টানদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। আহমদ ও মুসলিম আবু মুরছাদ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কবরমুখী হয়ে নামায পড়োনা এবং তার উপর বসোনা। জুনদুব রা. বলেছেন : রসূল সা.কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে বলতে শুনেছি : তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবীদের ও পুণ্যবানদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। সাবধান, তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিওনা। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : উম্মে সালামা রসূলুল্লাহ সা.কে জানালেন, তিনি হাবশায় থাকাকালে মারিয়া নামক একটা খৃস্টান ইবাদতখানা দেখেছেন। তাতে যেসব ছবি দেখেছেন তার উল্লেখ করলেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তারা এমন একটা জাতি, যখন তাদের মধ্যে কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি মারা যেতো, তখন তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং ঐসব ছবি তৈরি করে তার মধ্যে রাখতো। ওরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। -বুখারি, মুসলিম, নাসায়ী।** রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন : যে সকল মহিলা কবর যিয়ারত করে এবং যারা কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করে এবং তাতে প্রদীপ জ্বালায়, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। বহু সংখ্যক আলেম এই নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহ বুঝানোর অর্থে গ্রহণ করেছেন। চাই কবরস্থান সামনে রেখে

---

* কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তির মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করা ও গোমরাহীতে লিপ্ত হবার আশংকা।

* কবরের নিকট নামায পড়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণে 'বহু অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন হাদিস রয়েছে। চাই কবর একটাই হোক বা একাধিক। সুতরাং এ নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য, যার লংঘন কোনোক্রমেই কাম্য নয়।

বা পেছনে রেখে নামায পড়া হোক। তবে যাহেরী মাযহাবের মতে, এ নিষেধাজ্ঞার অর্থ হারাম এবং কবরস্থানে নামায বাতিল। কবরের সংখ্যা তিনটে বা তার বেশি হলে হাম্বলী মাযহাবের মতও তদ্রূপ। একটা বা দুটো কবর হলে নামায বৈধ। তবে কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়লে মাকরূহ হবে। নচেত মাকরূহ হবেনা।

২. ইহুদী ও খৃস্টানদের উপাসনালয়ে নামায পড়া নিষেধ

আবু মূসা আশয়ারী ও উমর ইবনে আবদুল আযীয খৃস্টানদের উপাসনালয়ে নামায পড়েছেন। শায়াবী, আতা ও ইবনে সিরীনের মতে এতে দোষের কিছু নেই। বুখারি বলেছেন : ইবনে আব্বাস ইহুদীদের উপাসনালয়ে নামায পড়তেন। তবে তাদের একটা উপাসনালয়ে মূর্তি ছিলো বলে নামায পড়েননি। নাজরান থেকে উমর রা.কে জানানো হলো, সেখানে ইহুদীদের উপাসনালয় সবচেয়ে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন স্থান। উমর রা. জবাব দিলেন, বরইর পাতাসহ পানি দিয়ে তা ধৌত করো, তারপর সেখানে নামায পড়ো। হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে, সর্বাবস্থায় ইহুদী ও খৃস্টানদের উপাসনালয়ে নামায পড়া মাকরূহ।

৩. আস্তাকুঁড়ে, কসাইখানায়, সড়কের ভিড় সংকুল জায়গায়, গোয়াল ঘরে, স্নানাগারে ও কা'বা শরীফের ছাদের উপর নামায নিষেধ

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. সাত জায়গায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন : আস্তাকুঁড়ে, কসাইখানায়, কবরস্থানে, সড়কের ভিড় সংকুল জায়গায়, স্নানাগারে, উটের থাকার ঘরে ও কা'বা শরীফের ছাদের উপর। -ইবনে মাজাহ, আবদ বিন হোমায়েদ ও তিরমিযি।

আস্তাকুঁড় ও কসাইখানায় নামায নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, ঐ দুই জায়গা সাধারণত: নোংরা হয়ে থাকে। তাই কোনো আড়ালে আবৃত না করে নামায পড়া নিষিদ্ধ। আর আবৃত করে নিলে নামায অধিকাংশের মতে মাকরূহ এবং আহমদ ও যাহেরীদের মতে হারাম। উটের থাকার ঘরে নামায নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, ওরা জ্বিন থেকে সৃষ্ট। আবার কেউ কেউ অন্য কারণ উল্লেখ করে থাকেন। উটের থাকার ঘরে নামাযের বিধান আস্তাকুঁড় ও কসাইখানার বিধানের মতো। আর সড়কের ভিড়ের জায়গায় নামায নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সড়কে সাধারণত: জনসমাগম ও চলাচল বেশি থাকা ও মনোযোগ বিনাশী শোরগোল বেশি হওয়া। আর কা'বা শরীফের ছাদের উপর নামায নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, ছাদের উপর যে ব্যক্তি নামায পড়ে সে কা'বার উপরে নামায পড়ে- কা'বার দিকে নয়, যা কাংক্ষিতের বিপরীত। এজন্য অনেকেই কা'বার ছাদে নামাযকে অশুদ্ধ মনে করেন। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবে এটা বৈধ। তবে কা'বা শরীফের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করা হয়না বিধায় এটা মাকরূহ। স্নানাগারে নামায নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, ওটা অপবিত্রতার স্থান। তবে যখন অপবিত্রতা থাকে না, তখন অধিকাংশ আলেমের মতে, বৈধ কিন্তু মাকরূহ। ইমাম আহমদ ও যাহেরী মাযহাবের মতে, স্নানাগারে নামায একেবারেই অবৈধ।

১৯. কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে নামায

ফরয ও নফল নির্বিশেষে কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে নামায শুদ্ধ ও বৈধ।

ইবনে উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. উসামা, বিলাল ও উসমান বিন তালহা কা'বার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। যখন তারা দরজা খুললেন, তখন আমি সর্বপ্রথম প্রবেশ করলাম। বিলালকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : রসূলুল্লাহ সা. কি ভেতরে নামায পড়েছেন? বিলাল বললেন : হ্যাঁ, ইয়ামানী স্তম্ভ দুটোর মাঝখানে। -আহমদ, বুখারি ও মুসলিম।

২০. সুতরা বা নামাযীর সামনে আড়াল

১. আড়াল রাখার বিধান

নামাযীর নিজের সামনে এমন কোনো আড়াল স্থাপন করা মুস্তাহাব, যা তার সামনে দিয়ে কারো চলাচলে বাধা দিতে পারে এবং তার অপর পাশে অবস্থিত বস্তু থেকে তার দৃষ্টি ঠেকাতে পারে। কেননা আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন সে যেনো তার সামনে কোনো আড়াল স্থাপন করে এবং তার কাছাকাছি দাঁড়ায়। -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। আর ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন ঈদের দিন নামাযের জন্য বের হতেন, তখন তার সামনে নিজের বর্শাটা রাখার আদেশ দিতেন। তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। লোকেরা তার পেছনে থাকতো, তিনি সফরেও এরূপ করতেন এবং সেনাপতিরাও শাসকরাও তার অনুসরণ করেন। -বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ। হানাফী ও মালেকীদের মতে, সামনে দিয়ে লোকের চলাচলের সম্ভাবনা থাকলেই আড়াল রাখা মুস্তাহাব। নচেত মুস্তাহাব নয়। কেননা ইবনে আব্বাস বলেছেন : রসূল সা. খোলা জায়গায় নামায পড়েছেন। তখন তার সামনে কিছুই ছিলোনা। -আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকি।

২. কিসের দ্বারা সুতরা কার্যকর হবে

নামাযী তার সামনে যা কিছুই আড়ালরূপে স্থাপন করুক, তাতেই সুতরা হবে, এমনকি তা তার বিছানার শেষ প্রান্ত হলেও।

সাবরা ইবনে মাবাদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন তার নামাযে একটা তীর দিয়ে হলেও আড়াল করা উচিত। -আহমদ, হাকেম। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন তার সামনে কোনো জিনিস রাখা উচিত। কিছু না পেলে একটা লাঠি স্থাপন করা উচিত। তার কাছে লাঠি না থাকলে একটা রেখা এঁকে নেয়া উচিত। এরপর তার সামনে দিয়ে কারো চলাচলে কোনো ক্ষতি হবেনা। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান। আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. তাঁর মসজিদের খুঁটির আড়ালে নামায পড়েছেন। একটা গাছের আড়ালে নামায পড়েছেন। আয়েশা রা. যে খাটের উপর শুয়ে আছেন সেই খাট সামনে রেখেও নামায পড়েছেন। (এ দ্বারা জানা যায়, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে নামায পড়া বৈধ। (কেউ কেউ ঘুমন্ত ও কথা বলছে এমন লোককে সামনে রেখে নামায পড়া নিষিদ্ধ বলেছেন। কিন্তু এ মত শুদ্ধ নয়)। রসূল সা. নিজের উটনীকে এবং উটনীর পশ্চাদ ভাগের কাষ্ঠকে সামনে রেখেও নামায পড়েছেন। তালহা রা. বলেন : আমরা নামায পড়তাম, আর আমাদের সামনে দিয়ে জীবজন্তু চলাচল করতো। রসূলুল্লাহ সা.কে এটা জানানো হলে তিনি বললেন : উটের পশ্চাদ ভাগে যে কাষ্ঠখণ্ড থাকে, সেটা নামায আদায়কারীর সামনে থাকলে সামনে দিয়ে যা কিছুই চলাচল করুক, কোনো ক্ষতি হবেনা। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি।

৩. ইমামের সুতরাই মুক্তাদির সুতরা

ইমামের সামনে যে আড়াল থাকবে, তা মুক্তাদিদের জন্যও যথেষ্ট। আমর বিন শুয়াইবের দাদা বলেন : আমরা মক্কার উপকণ্ঠস্থ আযাখিরের পার্বত্য সড়ক থেকে রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে যখন নামলাম, তখন নামাযের সময় সমাগত হলো। তিনি একটা প্রাচীরকে সামনে রেখে নামায পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে নামাযে দাঁড়ালাম। সহসা একটা ছাগলের বাচ্চা এলো এবং তাঁর সামনে দিয়ে চলতে লাগলো। রসূলুল্লাহ সা. বাচ্চাটিকে ঠেকাতে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে

তাঁর পেটে প্রাচীর ঠেকে গেলো এবং বাচ্চাটি তার পেছন দিক দিয়ে চলে গেলো। -আহমদ, আবু দাউদ। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : আমি একটা মাদী গাধার পিঠে করে মিনায় গেলাম। তখন আমি যৌবনপ্রাপ্তির কাছাকাছি। রসূলুল্লাহ্ সা. মিনায় নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি কাতারের কিছু অংশের সামনে দিয়ে গেলাম। তারপর গাধীটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিলাম এবং কাতারে প্রবেশ করলাম। এটা কেউ অপছন্দ করেনি। -সবকটা সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ। এসব হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, মুক্তাদিদের নামাযের সামনে দিয়ে চলা বৈধ। কেবলমাত্র ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্যই আড়ালের প্রয়োজন।

৪. আড়ালের কাছাকাছি অবস্থান করা উচিত

বগভী বলেছেন, আলেমগণ আড়ালের এতো কাছাকাছি অবস্থান করাকে মুস্তাহাব মনে করেন, যাতে সাজদা দেয়ার স্থান থাকে। অনুরূপ, কাতারগুলোর মাঝেও সাজদার পরিমাণ স্থান থাকা উচিত। বিলাল রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. প্রাচীর ও তাঁর মাঝে তিন হাত পরিমাণ জায়গা রেখে নামায পড়েছেন। -আহমদ, নাসায়ী, বুখারি। সাহল বলেছেন : রসূল সা. এর নামাযের জায়গার মাঝখানে একটা ছাগলের চলাচলের মতো জায়গা ছিলো। -বুখারি, মুসলিম।

৫. নামাযী ও তার সুতরার মাঝখান দিয়ে চলাচল হারাম

আলোচিত হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত, নামাযী ও তার আড়ালের মাঝ দিয়ে চলাচল হারাম ও কবীরা গুনাহ। তাছাড়া বুছর বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত, যায়দ বিন খালেদ আবু জুহাইমের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছ থেকে কী শুনেছেন? আবু জুহাইম জানালেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : অতিক্রমকারী যদি জানতো তার কী শাস্তি, তাহলে তার অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ দাঁড়িয়ে থাকা ভালো হতো। -সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ।

(বুছর থেকে বর্ণনাকারী আবুন নাস্‌র বলেন : আমার মনে নেই, চল্লিশ দিন, মাস, না বছর বলেছেন। ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে : হাদিসের বাহ্যিক বক্তব্য প্রমাণ করে, নামাযের সামনে দিয়ে চলাচল করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি যাওয়ার পথ না থাকলেও মুসল্লীর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। হাদিসটির অর্থ হলো, নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়াতে কতো গুনাহ, তা যদি অতিক্রমকারী জানতো, তবে সেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য উল্লেখিত মেয়াদ ব্যাপী দাঁড়িয়েই থাকতো)।

যায়িদ বিন খালেদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : নামাযের সামনে দিয়ে চলাচলকারী যদি জানতো এই চলাচলে তার কতো বড় গুনাহ হবে, তাহলে সামনে দিয়ে চলার পরিবর্তে চল্লিশটি শরৎকাল (অর্থাৎ চল্লিশ বছর) দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য ভালো হতো। -বাযযার। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : হাদিসে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা তখনই প্রযোজ্য, যখন নামাযী নিজের সামনে কোনো আড়াল রেখে নামায পড়ে। কোনো আড়াল না রেখে নামায পড়লে সামনে দিয়ে চলাচল নিষিদ্ধ নয়। ইবনে হিববান তার এই বক্তব্যের সমর্থন করে মুত্তালিব বিন আবি ওয়াদায়া থেকে বর্ণনা করেছেন, মুত্তালিব বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে দেখেছি, তওয়াফ শেষ করে মাতাফের (তওয়াফের চত্বর) পার্শ্বে এসে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তখন তার ও তওয়াফকারীদের মাঝে কেউ ছিলোনা। আবু হাতেম বলেছেন : এ হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসল্লীর যখন সামনে কোনো আড়াল না রেখেই নামায পড়ে, তখন তার সামনে দিয়ে চলাচল করা বৈধ। এ হাদিসে এই মর্মে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, মুসল্লীর সামনে চলাচলকারী সম্পর্কে যে কঠোর শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়েছে, তা শুধু নিজের সামনে আড়াল রেখে নামায আদায়কারীর সামনে দিয়ে চলাচলকারীর বেলাই প্রযোজ্য। যে নামাযী আড়াল না রেখে নামায

পড়ে, তার সামনে চলাচলকারীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। আবু হাতেম বলেছেন : বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই নামাযের সময় রসূল সা. ও তওয়াফকারীদের মধ্যে কোনো আড়াল ছিলোনা। তারপর মুত্তালিবের হাদিস থেকে উদ্ধৃত করেছেন : আমি রসূল সা.কে দেখেছি, রুকনে আসওয়াদ বরাবর নামায পড়ছেন, আর তখন পুরুষরা ও নারীরা তার সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে, অথচ তাদের ও রসূল সা. এর মাঝে কোনো আড়াল নেই। রওযাতে বলা হয়েছে : কেউ যদি সামনে কোনো 'সুতরা' বা আড়াল না রেখে নামায পড়ে, অথবা আড়াল আছে, কিন্তু নামাযী তা থেকে দূরে সরে গেছে, তাহলে বিশুদ্ধ মত এটাই যে, নামাযী যে কমতি রেখেছে, তার প্রতিহত করার কোনো ব্যবস্থা সে করেনি এবং সে ক্ষেত্রে তার সামনে দিয়ে চলাচল নিষিদ্ধ হবেনা। তথাপি চলাচল বর্জন করাই উত্তম।

৬. নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারীকে প্রতিহত করার বৈধতা

নামাযী যখন তার সামনে কোনো আড়াল রাখে তখন তার সামনে দিয়ে মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী যেতে উদ্যত হলে তাকে প্রতিহত করা তার জন্য বৈধ। তবে চলাচল যদি আড়ালের বাইরে দিয়ে করা হয়, তাহলে প্রতিহত করা বৈধ হবেনা এবং চলাচলে কারো কোনো ক্ষতিও হবেনা।

হোমায়েদ বিন হেলাল বলেন : আমি ও আমার এক সংগি যখন একটি হাদিস নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন আবু সালেহ আস্সাম্মান বললেন : আমি আবু সাঈদের নিকট যা শুনেছি ও তাকে যা করতে দেখেছি, তা তোমাকে বলছি। আমি যখন আবু সাঈদ খুদরীর সাথে একটা আড়াল সামনে রেখে জুমার নামায পড়ছিলাম। তখন বনু আবু মুয়াইত গোত্রের এক যুবক মসজিদে প্রবেশ করলো এবং আবু সাঈদের সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলো। তখন তিনি তার বুকে হাত রেখে তাকে প্রতিহত করলেন। এরপর সে তাকিয়ে দেখলো যাওয়ার আর কোনো পথ নেই আবু সাঈদের সামনে দিয়ে ছাড়া। তাই সে পুনরায় সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলো। আবু সাঈদ তাকে আগের চেয়ে জোরে বুক ধরে প্রতিহত করলেন। তখন সে দাঁড়িয়ে রইলো এবং আবু সাঈদকে তিরস্কার করলো। এরপর সেখানে বিপুল জনসমাগম হলো। অতপর যুবকটি মারওয়ানের নিকট গিয়ে যা ঘটেছে, তা নিয়ে অভিযোগ দায়ের করলো। আবু সাঈদও মারওয়ানের কাছে গেলেন। মারওয়ান বললেন : তোমার আর তোমার ভাতিজার কী হয়েছে? সে তো তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে। আবু সাঈদ বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কেউ সামনে কোনো আড়াল রেখে নামাযে দাঁড়ায়, অতপর কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তখন তার উচিত তাকে প্রতিহত করা। কেননা সে একটা শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়। -বুখারি ও মুসলিম।

৭. কোনো কিছুতে নামায নষ্ট হয়না

আলী, উসমান, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব, শা'বী, মালেক, শাফেয়ী, সুফিয়ান সাওরী ও হানাফীগণ বলেছেন : কোনো কিছুতেই নামায নষ্ট হয়না। কেননা আবু দাউদে আবুল ওয়াছাক থেকে বর্ণিত : কুরাইশের এক যুবক নামাযরত আবু সাঈদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তিনি তাকে প্রতিহত করলেন। সে আবার অতিক্রম করতে উদ্যত হলো। তিনি পুনরায় তাকে প্রতিহত করলেন। আবার অতিক্রম করতে উদ্যত হলো, আবার তিনি তাকে প্রতিহত করলেন। তিনবার এরকম করার পর সে যখন চলে গেলো, তখন তিনি বললেন : কোনো কিছুই নামাযকে নষ্ট করেনা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যতোদূর পারো, নামাযের সামনে দিয়ে চলাচলকারীকে প্রতিহত করো। কেননা সে একটা শয়তান।

২১. নামায অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ

নামাযের মধ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো করার অনুমতি রয়েছে :

১. কাঁদা, ফুপিয়ে কাঁদা, উহ্ আহ্ করা, কাতরানো

নামাযে এগুলো বৈধ, চাই তা আল্লাহর ভয়ে হোক বা অন্য কোনো কারণে, যেমন বিভিন্ন বিপদ মুসবিত বা শারীরিক বেদনা ও যন্ত্রণার জন্য। তবে এটা ততোক্ষণই অনুমোদনযোগ্য, যতোক্ষণ তা মানুষকে অস্থির করে রাখে এবং তার দমন করার ক্ষমতা থাকেনা। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।" এ আয়াত নামাযরত ও নামায বহির্ভূত উভয় ধরনের মানুষকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে শুখাইর বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা.কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তার বুকের ভেতরে ডেগচিতে পানি ফোটার টগবগানি শব্দের মতো আল্লাহর ভয়জনিত কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি। আলী রা. বলেছেন : বদরের দিন মিকদাদ বিন আসওয়াদ ছাড়া আমাদের মধ্যে একজনও অশ্বারোহী সৈনিক ছিলোনা। আমাদের অবস্থা দেখলাম। রসূল সা. ব্যতিত আমাদের মধ্যে কেউ রাত জেগে নামায পড়ছিলনা। একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি সারারাত নামায পড়ছিলেন আর কাঁন্নাকাটি করছিলেন। এরূপ করতে করতে সকাল হয়ে গেলো। -ইবনে হিববান। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : যে রোগে রসূলুল্লাহ সা. ইন্তিকাল করেন, সেই রোগের সময় তিনি বললেন : আবু বকর রা.কে নামায পড়াতে বলো। আয়েশা রা. বললেন : হে রসূলুল্লাহ সা., আবু বকর কোমলমনা মানুষ, নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারেননা এবং কুরআন পড়তে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। আয়েশা রা. বলেন : আমি এ কথা শুধু এজন্য বলেছিলাম যে, জনগণ আবু বকর রা.কে অশুভ মনে করে ভবিষ্যতে এমনভাবে এড়িয়ে না চলে যেভাবে পাপকে এড়িয়ে চলে। ইমামতি দ্বারা তিনি সর্বপ্রথম রসূল সা. এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে তার প্রতি জনগণের এরূপ অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। রসূল সা. বললেন : আবু বকরকে বলো নামায পড়াতে। তোমরা মহিলারা ইউসুফ (আ.) এর সহচরী।* -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে হিববান, তিরমিযি। কুরআন পড়তে গেলেই আবু বকরের রা. কান্না আসে জেনেও রসূল সা. যে তাকে ইমামতি করার আদেশ দেয়ার ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন, এটা প্রমাণ করে যে, এরূপ ব্যক্তির ইমামতি করা ও এ ধরনের কান্নাকাটিসহ নামায পড়া বৈধ।

উমর রা. ফজরের নামাযে সূরা ইউসুফ পড়ছিলেন। যখন এ আয়াতে উপনীত হলেন : "আমি আমার উদ্বেগ ও মনোকষ্ট শুধু আল্লাহকে জানাই" তখন তাঁর কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল। -বুখারি। উমর রা. এর কান্না থেকে সেসব লোকের বক্তব্য অসার প্রতিপন্ন হয় যারা বলেন : আল্লাহর ভয়ের কারণে হোক বা অন্য কারণে হোক, নামাযে কাঁদলে নামায বাতিল হয়ে যায়- যদি কান্না সহকারে দুটোও শব্দ উচ্চারিত হয়। তাদের এ যুক্তি মেনে নেয়া সম্ভব নয় যে, কান্না

* অর্থাৎ যে বাড়িতে ইউসুফ আ. লালিত পালিত হয়েছিলেন, তার গৃহকর্ত্রী যেমন তার মনে যা ছিলো তার বিপরীত ভাব প্রকাশ করেছিল, আয়েশাও তদ্রূপ করেছে। ঐ মহিলা অন্যান্য মহিলাদেরকে প্রীতিভোজের আয়োজন দেখিয়ে আমন্ত্রণ করলেও আসলে তার উদ্দেশ্য ছিলো তাদেরকে ইউসুফের সৌন্দর্য দেখানো, যাতে তারা ইউসুফের প্রতি তার দুর্বলতাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে। তদ্রূপ আয়েশা তাঁর পিতাকে ইমামতি থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য কারণ দেখাচ্ছিলেন তিনি কোমল হৃদয়, তাঁর কাঁদার কারণে মুক্তাদিরা তার কিরাত শুনতে পাবেনা। কিন্তু আসল কারণ ছিলো : লোকেরা যেনো তাঁকে অপয়া বা অশুভ মনে না করে।

সহকারে দুটো শব্দ উচ্চারিত হলেও একটা বাক্য হয়ে যায়। কেননা কান্না এক জিনিস, আর বাক্য অন্য জিনিস।

২. প্রয়োজনে ঘাড় সোজা রেখে এদিক ওদিক তাকানো

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. নামাযের মধ্যে ডানে বামে তাকাতেন। কিন্তু তাঁর ঘাড় পেছনের দিকে বাঁকাতেননা। -আহমদ। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়ার সময় পাহাড়ের রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। -আবু দাউদ বলেছেন : একজন ঘোড় সওয়ারকে তিনি রাত্রিকালে পাহাড়ী রাস্তা পাহারা দিতে পাঠিয়েছিলেন। আনাস ইবনে সিরীন বলেছেন : আমি আনাস বিন মালেককে নামাযের মধ্যে কোনো জিনিসের জন্য তার দিকে তাকাতে দেখেছি। -আহমদ। তবে বিনা প্রয়োজনে এদিক ওদিক তাকানো মাকরূহ তানযিহী। কেননা এতে আল্লাহর প্রতি মনোযোগ ও একাগ্রতা ব্যাহত হয়।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নামাযের ভেতরে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি জবাব দিয়েছেন : ওটা হচ্ছে বান্দার নামায থেকে কিছু অংশ কেড়ে নেয়ার শয়তানী চক্রান্ত। -আহমদ, বুখারি, নাসায়ী, আবু দাউদ। আবুদ দারদা রসূল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন : হে জনমণ্ডলী, তোমরা নামাযে এদিক ওদিক তাকানো থেকে বিরত থাকো। কেননা এদিক ওদিক তাকানো মানুষের নামায হয়না। নফলে যদি নিজেকে সংযত রাখতে না পারো, তবে ফরয নামাযে কিছুতেই অসংযত হয়োনা। -আহমদ। আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন : "সাবধান, নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকিওনা। কেননা, এদিক ওদিক তাকানো ধ্বংসাত্মক কাজ। একান্ত অনিবার্য হলে নফলে চলতে পারে- ফরযে নয়।" -তিরমিযি। হারেস আশয়ারী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা যাকারিয়া আ.-এর ছেলে ইয়াহিয়া (আ.)কে পাঁচটি আদেশ দিয়েছিলেন, যেনো নিজেও তা কার্যকরী করে এবং বনী ইসরাইলকেও তা কার্যকর করার আদেশ দেয়। তন্মধ্যে একটি হলো : আল্লাহ তোমাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। যখন তোমরা নামায পড়বে, তখন এদিক ওদিক তাকিওনা। কেননা বান্দা যতোক্ষণ এদিক সেদিক না তাকায়, ততোক্ষণ আল্লাহ নিজের দৃষ্টি বান্দার মুখের দিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখেন। -আহমদ, নাসায়ী। আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বান্দা যতোক্ষণ নামাযের মধ্যে অন্যদিকে না তাকায়, ততোক্ষণ আল্লাহ বান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকেন। যখনই বান্দা অন্যদিকে তাকায়, অমনি তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। -আহমদ, আবু দাউদ।

এসব শুধুমাত্র মুখ ঘোরানো সংক্রান্ত। কিন্তু সমস্ত শরীর ঘোরানো এবং শরীরকে কিবলা থেকে সরিয়ে নেয়া সর্বসম্মতভাবে নামায বাতিল করে দেয়। কেননা কিবলামুখী হওয়ার ফরয এতে লংঘিত হয়।

৩. সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক প্রাণী মারা

এসব বৈধ যদিও এতে 'আমল কাছীর' অর্থাৎ অত্যধিক কাজ জড়িত। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "সাপ ও বিচ্ছুকে নামাযের ভেতরে পেলেও হত্যা করো।" -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

৪. প্রয়োজনের খাতিরে সামান্য হাঁটা

আয়েশা রা. বলেছেন : একদিন রসূলুল্লাহ সা. ঘরে নামায পড়ছিলেন এবং দরজা বন্ধ ছিলো। এ সময় আমি এলাম এবং দরজা খুলতে অনুরোধ করলাম। রসূলুল্লাহ সা. কিছুটা হেঁটে গিয়ে

আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন, তারপর নিজের নামাযের জায়গায় ফিরে গেলেন। এ সময় তাঁর মুখ কিবলা থেকে ঘোরেনি। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি।

অর্থাৎ রসূল সা. দরজা খুলতে গিয়ে এবং খোলার পর ফিরে আসতে গিয়ে কিবলা থেকে মুখ ঘুরতে দেননি। দারু কুতনীর একটি হাদিস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। সেটি হলো, রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়ার সময় কেউ যদি দরজা খুলতে বলতো, তবে দরজা যদি কিবলার দিকে অথবা ডান বা বাম দিকে থাকতো, তবে খুলে দিতেন এবং কিবলা থেকে মুখ ঘোরাতেননা। আযরক বিন কায়েস বলেছেন : আবু বারযা আসলামী ইরাকের আহওয়ায নগরীতে একটি নদীর কিনারে ছিলেন। নিজের হাতে লাগাম রেখে নামায পড়তে শুরু করলেন। বাহক জন্তুটি ফিরে যেতে লাগলো এবং তিনি তার সাথে সাথে নামাযকে বিলম্বিত করতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে খারেজী গোষ্ঠীভুক্ত এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহ, এই বুড়োকে লাঞ্ছিত করো। সে কিভাবে নামায পড়ছে? নামায শেষে আবু বারযা বললেন : আমি তোমার কথা শুনেছি, আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে ছয়, সাত বা আটটা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তখন দেখেছি, তিনি কিভাবে সব কাজ পরিচালনা করতেন এবং কতোটা সহজ করতেন। আমার জন্তুর চলা তাকে ত্যাগ করার চেয়ে আমার জন্য সহজতর ছিলো। তাকে ত্যাগ করলে সে তার পরিচিত স্থানে ফিরে যেতো। তাহলে আমার কষ্ট হতো। আবু বারযা সফরে ছিলেন বিধায় আসরের নামায দু'রাকাত পড়লেন। -আহমদ, বুখারি ও বায়হাকি। তবে বেশি পথ হাঁটা সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : ফকীহগণ একমত যে, ফরয নামাযে বেশি পথ চললে নামায বাতিল হয়। সুতরাং আবু বারযার হাদিসটির ব্যাখ্যা সম্ভবত এই হবে যে, তিনি অল্প পথ গিয়েছিলেন।

৫. শিশু বহন

আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তাঁর মেয়ে যয়নবের শিশু কন্যা উমামাকে ঘাড়ের উপর রেখে নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকু দিতেন, তখন শিশুকে নামিয়ে রাখতেন, তারপর তিনি যখন সাজদা থেকে উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকে পুনরায় ঘাড়ে তুলতেন। আমি কিছু জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও আমের বললেন : ওটা কোন্ নামায ছিলো? ইবনে জুয়াইজ বলেছেন : আমি জেনেছি যে, ওটা ছিলো ফজরের নামায। -আহমদ, নাসায়ী। আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, এটা ভালো হাদিস। ফাকিহানী বলেছেন : রসূল সা. কর্তৃক উমামাকে ঘাড়ে করে নামায পড়ার রহস্য সম্ভবত এই যে, এ দ্বারা তিনি আরবদের চিরাচরিত নারী বিদ্বেষী মনোভাব প্রতিহত করতে চেয়েছেন। এ জন্য তিনি নামাযের সময়ও মেয়ে শিশুকে ঘাড়ে তুলে, তাদের প্রচলিত রীতিপ্রথাকে একটু জোরদারভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু কথার চেয়ে কাজের শক্তি বেশি, তাই তিনি কাজের দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন ইসলাম নারীর প্রতি কতো সহানুভূতিশীল।

আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বলেছেন : একদিন রসূলুল্লাহ সা. আমাদের সামনে যোহর কিংবা আসরের নামাযের জন্য বেরিয়ে এলেন। তখন তিনি হাসান অথবা হুসাইনকে বহন করছিলেন। রসূলুল্লাহ সা. সামনে গিয়ে ইমামতি শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে শিশুটিকে নামিয়ে রাখলেন। তারপর নামাযের জন্য আল্লাহু আকবার বললেন। নামাযের মাঝে খুব লম্বা সাজদা দিলেন। আবদুল্লাহ বলেন : আমি সাজদা থেকে মাথা তুলে দেখি, শিশুটি রসূলুল্লাহ সা. এর পিঠের উপর চড়ে বসে আছে। অথচ তিনি আছেন সাজদায়। আমি এ দৃশ্য দেখে আবার সাজদায় ফিরে গেলাম। নামায শেষে লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, আপনি নামাযের মাঝে যে

সাজদা দিয়েছেন, তা আপনি এতো লম্বা করেছেন যে, আমরা ভাবলাম আপনার একটা কিছু হয়েছে। অথবা আপনার উপর অহি এসেছে। তিনি বললেন : এর একটাও হয়নি। আসলে ছেলেটা (অর্থাৎ নাতিটা) আমার উপর চড়ে বসেছিল। আমি তাকে নামতে তাড়া দেয়া পছন্দ করিনি যতোক্ষণ না তার সখ পূর্ণ হয়। -আহমদ, নাসায়ী, হাকেম।

ইমাম নববী বলেছেন : শাফেয়ী মাযহাব ও তার সমর্থকদের জন্য এই হাদিস প্রমাণ দর্শায় যে, ফরয ও নফল নামাযে পুরুষ বা মেয়ে শিশু অথবা অন্য কোনো পবিত্র প্রাণী বহন করা বৈধ এবং এটা ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ের জন্যই অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু ইমাম মালেক ও তার শিষ্যরা এটিকে শুধু নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও ফরযে নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে হাদিসটির এ ব্যাখ্যা অচল। কেননা এ হাদিসে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রসূল সা. ইমামতি করছিলেন এবং ঘটনাটা ফরয নামাযেই ঘটেছিল। আর পূর্ববর্তী একটি বর্ণনা থেকে জানা গেছে যে, এটি ফজরের নামাযে ঘটেছিল। নববী বলেন : মালেকীদের কেউ কেউ দাবি করেন যে, এটা রহিত বা মানসূখ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা শুধু রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নির্দিষ্ট। আবার কারো কারো মতে, এটা একটা অনিবার্য প্রয়োজনে ঘটেছিল। এ সমস্ত দাবিই ভ্রান্ত ও প্রত্যাখ্যাত। কেননা এসব দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণও নেই এবং এগুলোকে মেনে নেয়ার কোনো প্রয়োজনও নেই। বরং হাদিসটি বিশুদ্ধ এবং এ কাজটির বৈধতা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করছে, এতে শরিয়তের নীতিমালার পরিপন্থী কিছু নেই। কেননা মানুষ পবিত্র। আর তার পেটের ভেতরে যা কিছু থাকুক, তা মার্জনীয়। কেননা সেসব জিনিস তার পাকস্থলিতে রয়েছে। আর শিশুর পোশাক পবিত্র বলেই বিবেচ্য। আর শরিয়তের দলীলসমূহ এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন যে, নামাযের ভেতরকার কার্যকলাপ স্বল্প পরিমাণের হলে কিংবা বিচ্ছিন্ন হলে তা নামাযকে বাতিল করেনা। আর রসূলুল্লাহ সা. এ কাজ করেছেন এটির বৈধতা প্রমাণ করার জন্যই। এ হাদিস দ্বারা ইমাম খাত্তাবীর এ দাবিও প্রত্যাখ্যাত হয় যে, রসূলুল্লাহ সা. এর এ কাজটি তাঁর অনিচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা শিশুটি তার সাথে লেগে ছিলো বলেই নামাযের মধ্যে তাকে বহন করেছিলেন। তিনি তাকে তোলেননি। তিনি যখন নামাযে দাঁড়ালেন, তখন সে তাঁর সাথে অবস্থান করছিল। খাত্তাবী বলেছেন : এরূপ ধারণা করা যায়না যে, রসূল সা. উমামাকে দ্বিতীয়বার স্বেচ্ছায় বহন করেছেন। কেননা সেটা একটা মনোযোগ নষ্টকারী বাড়তি কাজ। এ হচ্ছে খাত্তাবীর বক্তব্য, যা অগ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিহীন দাবি। সহীহ মুসলিমের উক্তি : "তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন উমামাকে বহন করলেন", "সাজদা থেকে উঠে পুনরায় উমামাকে বহন করলেন" এবং মুসলিম ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা "তিনি আমাদের কাছে এলেন উমামাকে বহন করে এবং নামায পড়ালেন" - এ সকল উক্তি খাত্তাবীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে। আর এ যুক্তি আমরা জানিনা যে, উমামাকে বহন করা নামাযে মনোযোগ নষ্টকারী কাজ। আর যদি বা কিছুটা মনোযোগ কেড়ে নেয়, তবু এর বহু উপকারিতাও রয়েছে এবং শরিয়তের কিছু নীতিমালাও এর মাধ্যমে পাওয়া গেছে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাই বলা যায়, এ সকল উপকারিতার জন্যই উক্ত মনোযোগ বিচ্ছিন্নতা।* সুতরাং অভ্রান্তভাবে ও অখণ্ডনীয়ভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, উক্ত কাজের বৈধতা প্রমাণ করার জন্যই এবং এসব উপকারিতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই হাদিসটি যথার্থ ও সার্থক। তাই এ কাজ আমাদের জন্য বৈধ এবং মুসলমানদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর বিধান।

* শিশুকে বহন না করলে কিংবা পুনরায় ঘাড়ে উঠিয়ে না দিলে সে কান্নাকাটি বা হৈ চৈ করতে পারতো এবং তাতে নামাযে মনোযোগ আরো অধিক বিচ্ছিন্ন হতো।

৬. মুসল্লীকে অন্য কারো পক্ষ থেকে সালাম দেয়া বা কিছু বলা এবং সালামকারী ও সম্বোধনকারীকে ইংগিতে জবাব দেয়া

জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন বনুল মুসতালিক অভিযানে যাচ্ছিলেন, তখন আমাকে বার্তা পাঠালেন। আমি তার কাছে এলাম। তখন তিনি তার উটের উপর নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি হাতের ইশারায় জবাব দিলেন। আবার কথা বললাম। আবার হাতের ইশরায় জবাব দিলেন। আমি তাঁর কুরআন পাঠ শুনছিলাম এবং তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করছিলেন। নামায শেষ হলে বললেন : যে জন্য তোমাকে বার্তা পাঠিয়েছিলাম তার কী করেছ? আমি নামাযে ছিলাম বলেই তোমার কথার জবাব দিতে পারিনি। -আহমদ ও মুসলিম। সুহায়েব রা. বলেছেন। রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি ইশারায় জবাব দিলেন। তিনি বলেছেন : তিনি কেবল আংগুল দিয়ে ইশারা করে কথা বলেছিলেন। -আহমদ, তিরমিযি। সুহায়েব আরো বলেছেন : বিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেরা যখন রসূল সা. কে তার নামায পড়ার অবস্থায় সালাম করতো, তখন তিনি কিভাবে জবাব দিতেন? বিলাল বললেন : হাত দিয়ে ইশারা করতেন। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। আনাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. নামাযে ইশারা করতেন। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা। এ ক্ষেত্রে আংগুল দিয়ে ইশারা, পুরো হাত দিয়ে ইশারা অথবা মাথা দিয়ে ইশারা- সবই সমান এবং প্রত্যেকটাই রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত।

৭. সুবহানাল্লাহ বলা ও হাতে তালি দেয়া

নামাযের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে বা ইমাম কোনো ভুল করলে তাকে সাবধান করা, কোনো অন্ধকে সঠিক পথ দেখানো, প্রবেশকারীকে অনুমতি দান ইত্যাদির প্রয়োজনে পুরুষের সুবহানাল্লাহ বলা ও মহিলাদের হাতে তালি দেয়া বৈধ। সাহল বিন সা'দ সায়েদী থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "নামাযের মধ্যে যার কোনো অঘটন ঘটে, সে যেনো সুবহানাল্লাহ বলে। হাতে তালি দেয়া শুধু মহিলাদের এবং সুবহানাল্লাহ বলা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট।" -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী।

৮. ইমামকে ভুল ধরিয়ে দেয়া

ইমাম যখন কোনো আয়াত ভুলে যায়, তখন মুক্তাদি তাকে শুধরে দেবে, তাকে ভুলে যাওয়া আয়াত স্মরণ করিয়ে দেবে- চাই সে অত্যাবশ্যক পরিমাণ কিরাত পাঠ করে থাকুক বা না করে থাকুক। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. একদিন নামাযের কিরাতে সন্দেহে পড়ে গেলেন। নামাযের পর আমার পিতাকে বললেন : তুমি আমাদের জামাতে শরিক ছিলে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে আমাকে ধরিয়ে দিলেনা কেন? -আবু দাউদ প্রভৃতি।

৯. হাঁচি বা নিয়ামত লাভে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা*

রিফায়া বিন রাফে রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর পেছনে নামায পড়লাম, সহসা হাঁচি দিলাম এবং বললাম : 'আলহামদু লিল্লাহ হামদান কাছীরান, তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারদা"। নামায শেষ হলে রসূলুল্লাহ সা.

* হাই তোলাকে দমন করা মুস্তাহাব। বুখারিতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কারো যখন নামাযের মধ্যে হাই উঠে, তখন যতোদূর সম্ভব তা যেনো দমন করে এবং "আ" না বলে। কেননা ওটা শয়তানের কাজ। সে এটা দেখে হাসে।

বললেন : নামাযে কে কথা বলেছে? কেউ জবাব দিলনা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন। তখনো কেউ জবাব দিলোনা। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে রিফায়া বললো : "হে রসূলুল্লাহ! আমি।" তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, ত্রিশজনেরও বেশি ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে, কে এই দোয়া নিয়ে উপরে যাবে। -নাসায়ী, তিরমিযি, বুখারি।

১০. ওযরবশত নিজের পাগড়ী বা পোশাকের উপর সাজদা করা

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. একটি মাত্র কাপড়ে নামায পড়েছেন এবং তার বাড়তি অংশ দ্বারা মাটির ঠাণ্ডা ও গরম থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। -আহমদ। তবে বিনা ওযরে এরূপ করা মাকরূহ।

১১. নামাযে বৈধ অন্যান্য কাজ

ইবনুল কাইয়েম কিছু মুবাহ কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, যা রসূলুল্লাহ সা. নামাযের মধ্যে করতেন। তিনি বলেছেন, রসূল সা. এমন অবস্থায় নামায পড়তেন যে, তাঁর ও কিবলার মাঝে আয়েশা আড়াআড়িভাবে পা মেলে শুয়ে থাকতেন। তারপর রসূল সা. যখন সাজদায় যেতেন, তাকে হাত দিয়ে টিপে দিতেন, ফলে আয়েশা পা সরিয়ে নিতেন। আবার যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আয়েশা পা ছড়িয়ে দিতেন। কখনো কখনো তাঁর নামায পড়ার সময় শয়তান এসে তার নামায ভেংগে দেয়ার চেষ্টা করতো। তখন রসূল সা. তাকে ধরতেন এবং তার গলা টিপে দিতেন। ফলে তাঁর হাতে শয়তানের লালা লেগে যেতো। তিনি মিম্বরের উপর নামায পড়তেন। (তাঁর মিম্বরে তিনটে ধাপ ছিলো। তিনি মিম্বরে নামায পড়তেন। যাতে লোকরা পেছন থেকে দেখে তাঁর কাছ থেকে নামায শিখতে পারে।) মিম্বরের উপরে রুকুও দিতেন। যখন সাজদার সময় হতো, তখন নেমে পেছনে সরে গিয়ে মেঝের উপর সাজদা দিতেন। তারপর পুনরায় মিম্বরে উঠে যেতেন। তিনি একটা দেয়ালকে সামনে রেখে নামায পড়তেন। নামাযের মধ্যে কোনো পশু সামনে দিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলে তিনি দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতেন। এক সময় তার পেট দেয়ালে ঠেকে যেতো এবং পশুটি তার পেছন দিয়ে চলে যেতো। একদিন তিনি নামায পড়ছিলেন। এ সময় তার কাছে বনু আবদুল মুত্তালিবের দুটো দাসী মারামারি করতে করতে এলো। তিনি দুজনকেই হাত দিয়ে ধরলেন এবং একজনকে অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। অথচ তখনো তিনি নামায অব্যাহত রেখেছেন। আহমদের বর্ণনার ভাষা এরূপ : দাসীদ্বয় রসূল সা. এর হাঁটু ধরে বসলো। তিনি তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। কিন্তু নিজে ঘুরলেননা। (অর্থাৎ কিবলা থেকে শরীর ঘুরালেননা।) আর একদিন তিনি নামায পড়ছিলেন। এ সময় জনৈক কিশোর তার সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলো। তিনি হাতের ইশারায় তাকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। সে ফিরে গেলো। আর একদিন তাঁর নামাযের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল জনৈক দাসী। তিনি তাকে হাতে ইশারা দিয়ে ফিরে যেতে বললেন। তবুও সে সামনে দিয়ে গেল। নামায শেষে রসূল সা. বললেন : "মহিলারা অধিকতর উদ্ধত স্বভাবের।" - আহমদ। তিনি নামাযের মধ্যে ফুঁক দিতেন। অবশ্য এ হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই। সাঈদ তার সুনানে ইবনে আব্বাস থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন : তিনি নামাযে কাঁদতেন এবং কাশি দিতেন।

আলী রা. বলেছেন : আমার জন্য রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে আসার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিলো। যখন আসতাম তাঁর কাছ থেকে প্রবেশের অনুমতি চাইতাম। তিনি নামাযে থাকলে গলা খাকারি দিতেন এবং আমি প্রবেশ করতাম। আর যদি তাঁকে অবসরে পেতাম তাহলে আমাকে

অনুমতি দিতেন। -নাসায়ী, আহমদ। আহমদের বর্ণনার ভাষা হলো : দিনে ও রাতে রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট আমার আগমনের একটা সময় থাকতো। আমি যখন আসতাম, তিনি যদি নামাযে থাকতেন তবে গলা খাকারি দিতেন। ইমাম আহমদ এ হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং এ অনুসারে কাজও করতেন। তিনি নামাযে গলা খাকারি দিতেন এবং তাকে নামায ভংগকারী মনে করতেননা। রসূলুল্লাহ সা. কখনো খালি পায়ে, কখনো পাদুকা পায়ে নামায পড়তেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন : ইহুদীদের বিরোধিতা করার জন্য তিনি পাদুকাসহ নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি কখনো এক কাপড়ে আবার কখনো দুই কাপড়ে নামায পড়তেন। বেশির ভাগ সময় দুই কাপড়েই পড়তেন।

১২. কুরআন শরীফ দেখে দেখে পড়া

মালেক বর্ণনা করেছেন : আয়েশার মুক্ত গোলাম যাকওয়ান রমযানে কুরআন শরীফ দেখে দেখে পড়ে ইমামতি করতেন। এটা শাফেয়ী মাযহাবের মত। ইমাম নববী বলেছেন : সময় সময় নামাযের মধ্যে কুরআন শরীফের পাতা উল্টালেও নামায বাতিল হবেনা। আর কুরআন ছাড়া অন্য কোনো লেখার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তা মনে মনে আওড়ালে নামায বাতিল হবেনা। চাই তা যতোই লম্বা হোক। তবে মাকরূহ হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী তার ইমলা গ্রন্থে বলেছেন।

১৩. নামায ব্যতিত অন্য কাজে মনযোগ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন নামাযের জন্য আযান হয়, তখন শয়তান বায়ু নি:সরণ করতে করতে পালিয়ে যায়। যাতে আযান না শুনতে হয়। আযান শেষ হলে আবার আসে। নামাযের ইকামত হলে আবার পালায়। ইকামত শেষ হলে আবার আসে এবং মানুষের মনের একাগ্রতা নষ্ট করে। তাকে বলে : অমুক ব্যাপারটা মনে করো। মানুষটি যখন সেই ব্যাপারটা মনে করেনা, তখন সে কয় রাকাত পড়েছে তা ভুলিয়ে দেয়। তোমাদের কারো যদি তিন রাকাত পড়েছো না চার রাকাত পড়েছো তা মনে না থাকে, তাহলে সে যেনো বসা অবস্থায় দুটো সাজদা করে। -বুখারি ও মুসলিম। বুখারি বলেছেন : উমর রা. বলেন : আমি নামাযে থাকা অবস্থায় আমার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করি।

যদিও এ অবস্থায় নামায শুদ্ধ হয়, তথাপি নামাযীর মনকে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট রাখা উচিত। আয়াতসমূহের অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং নামাযের প্রতিটি কাজের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার চেষ্টা চালানোর মাধ্যমে মন থেকে যাবতীয় পার্থিব চিন্তা দূর করা উচিত। কেননা নামাযের যতোটুকু বুঝে বুঝে পড়া হয়, ততোটুকুই আমল নামায় লেখা হয়।

আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বানে আম্মার বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : মানুষ নামায পড়ে চলে যায় অথচ কারো নামাযের দশ ভাগের এক ভাগ, কারো বা নয় ভাগের এক ভাগ, কারো বা আট ভাগের এক ভাগ, কারো বা সাত ভাগের এক ভাগ, কারো বা ছয় ভাগের এক ভাগ, কারো বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ, কারো বা চার ভাগের এক ভাগ, কারো তিন ভাগের এক ভাগ, কারো অর্ধেক মাত্র লেখা হয়। বাযযার ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ বলেন : আমি শুধু সেই ব্যক্তির নামায় কবুল করি, যে নামাযের মধ্য দিয়ে আমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের নিকট বিনীত হয়। এ দ্বারা সৃষ্টির উপর দাপট ও ঔদ্ধত্য দেখায়না। আমার অবাধ্যতার জন্যে জিদ ধরেনা। আমার স্মরণে দিন কাটিয়ে দেয়। দরিদ্র, প্রবাসী, বিধবা ও বিপন্ন মানুষের প্রতি করুণা করে। এরূপ বান্দার জ্যোতি সূর্যের কিরণের মতো। আমি তাকে আমার পরাক্রম দ্বারা রক্ষা করি। তাকে রক্ষা করার জন্য আমার ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেই। তার জন্য অন্ধকারে আলো ও অজ্ঞতায় ধৈর্য সরবরাহ

করি। বেহেশতগুলোর মধ্যে ফেরদাউস যেমন, আমার সৃষ্টির মধ্যে সে তেমন। আর আবু দাউদ যায়দ বিন খালেদ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে দু'রাকাত নামায নির্ভুলভাবে পড়ে, তার অতিতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। মুসলিম উসমান বিন আবিল আস থেকে বর্ণনা করেন : আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! শয়তান আমার নামাযে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং আমার কুরআন পাঠে বিভ্রম ঘটায়। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এ হচ্ছে খোনযাব নামক শয়তান। এর উপস্থিতি যখন অনুভব করো তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করো। উসমান বলেন : আমি তাই করলাম। ফলে আল্লাহ আমার কাছ থেকে শয়তানকে দূর করে দিলেন। আর আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ বলেন : আমি নামাযকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি। আমার বান্দা যা চায় তা পাবে। সে যখন বলে : আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন তখন আল্লাহ বলে : আমার বান্দা আমার প্রশংসা জানিয়েছে। যখন বলে : আর রহমানির রহীম, তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন। যখন বলে : মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা আমার মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে এবং আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। যখন বলে : ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, তখন আল্লাহ বলেন : এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বণ্টিত। আমার বান্দার জন্য আরো রইল যা সে চায়। যখন সে বলে, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আনয়ামতা আলাইহিম, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লীন, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য নির্দিষ্ট রইল। আমার বান্দা এর অতিরিক্ত যা চাইবে তাও পাবে।

২২. নামাযে যেসব কাজ মাকরূহ

ইতিপূর্বে যে সুন্নতগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, তার যে কোনোটি তরক করা মাকরূহ। তদুপরি নিম্নোক্ত কাজগুলো করা মাকরূহ।

১. বিনা প্রয়োজনে নিজের পোশাক নিয়ে বা শরীর নিয়ে খেলা করা

মুয়াইকিব রা. বলেন আমি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম : নামাযের মধ্যে পাথরের টুকরো হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে কিনা? তিনি বললেন : নামায পড়ার সময়ে পাথরের টুকরোগুলো স্পর্শ করোনা। একান্ত যদি করতেই চাও তাহলে একটা স্পর্শ করতে পারো টুকরোগুলোকে সমান করার জন্য। - সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আবু যর রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর রহমত তার উপর নাযিল হয়। কাজেই তার পাথরের টুকরোগুলো ধরা অনুচিত। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. তার ইয়াসার নামক এক ভৃত্য নামাযে ফুঁক দিয়েছিল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ তোমার মুখমণ্ডলকে ঠাণ্ডা করুন। -আহমদ।

২. নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা

আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। - আবু দাউদ।

৩. আকাশের দিকে তাকানো

আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : যারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায়, তাদের অবশ্য অবশ্য

তা থেকে বিরত থাকা উচিত, নচেত আল্লাহ তাদের চোখ কেড়ে নিবেন। - আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী।

৪. নামায থেকে উদাসীন করে দেয় এমন জিনিসের দিকে তাকানো

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. নকশী করা একটা কম্বলে নামায পড়লেন। পরক্ষণে বললেন এই কম্বলের নকশী আমার একাগ্রতা নষ্ট করেছে। এটা আবু জুহামের কাছে নিয়ে যাও। তার কাছে নকশীবিহীন যে মোটা কম্বল রয়েছে, তা নিয়ে এসো। মুসলিম বুখারি। (আবু জুহাম এই নকশী করা কম্বলটা রসূল সা. কে উপহার দিয়েছিল। তিনি সেটি ফেরত দিয়ে তার নকশীবিহীন কম্বল চেয়ে নিয়েছিলেন, যাতে আবু জুহাম মনে কষ্ট না পায়) বুখারি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : তোমার পাতলা পর্দা সরাও। কেননা এর ছবিগুলো সব সময় নামাযের ভেতরে আমার সামনে পড়ে। এ হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নামাযে অংকিত রেখার উপর দৃষ্টি পড়লে নামায নষ্ট হয়না।

৫. অকারণে চোখ বন্ধ রাখা

কারো কারো মতে এটা মাকরূহ। আবার অন্যদের মতে মাকরূহ নয়। যে হাদিসে মাকরূহ বলা হয়েছে, সেটি সহীহ নয়। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, সঠিক কথা হলো, চোখ মেলে রাখলে যদি একাগ্রতা ব্যাহত না হয়, তাহলে মেলে রাখাই উত্তম। আর যদি সামনের দিকে নকশী, কারুকর্জ ইত্যাদি থাকার কারণে মনোযোগ নষ্ট হয়, তাহলে কোনোক্রমেই চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ হবেনা। এরূপ অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখাকে মাকরূহ বলার চেয়ে মুস্তাহাব বলা শরিয়তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্তী।

৬. সালামের সময় দু'হাত দিয়ে ইশারা করা

জাবের বিন সামুরা রা. বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর পেছনে নামায পড়তাম। তিনি বললেন : এদের কী হয়েছে, হাত দিয়ে এমনভাবে সালাম করে, যে তা ছুটন্ত ঘোড়ার লেজ বলে মনে হয়। উরুর উপর হাত রেখে আসসালামু আলাইকুম বলাই তো যথেষ্ট। -নাসায়ী।

৭. মুখ বন্ধ রাখা ও কাপড় ঝুলিয়ে রাখা

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. নামাযের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে ও মুখ বুজে থাকতে নিষেধ করেছেন। পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ ও হাকেম।

খাত্তাবী বলেছেন : কাপড় ঝুলানো অর্থ হলো মাটি স্পর্শ করে এমনভাবে ঝুলানো। ইবনে হুমাম বলেছেন : জামা গায়ে দিয়ে জামার হাতার মধ্যে হাত না ঢুকানো এরই আওতাভুক্ত।

৮. খাবার সামনে রেখে নামায পড়া

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন রাতের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং নামাযের জামাত প্রস্তুত হয়, তখন আগে খাবার খেয়ে নাও। আহমদ ও মুসলিম। অধিকাংশ আলেমের মতে, নামাযের (ইকামতের) ওয়াক্ত আসন্ন হলে আগে খেয়ে নেয়া মুস্তাহাব। অন্যথায় আগে নামায পড়তে হবে। ইবনে হাযম ও কতক শাফেয়ী আলেমের মতে, সময় সংকীর্ণ হলেও আগে আহার সেরে নিতে হবে।

নাফে বলেন : ইবনে উমরের জন্য খাবার পরিবেশন করা হতো, একই সাথে নামাযও শুরু হয়ে যেতো। তিনি আহার শেষ না করে নামাযে শরিক হতেন না। এমনকি তিনি খেতে বসে ইমামের কিরাত পড়াও শুনতে পেতেন। বুখারি।

খাত্তাবী বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক আগে খেতে বলার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ তার খাবারের

প্রয়োজন মিটিয়ে নিক, তারপর পরিতৃপ্ত মনে নামায শুরু করুক। তাহলে তার মনে ক্ষুধার যাতনা থাকবেনা এবং রুকু ও সাজদা আদায়ে তাড়াহুড়ো ও সুষ্ঠুভাবে নামায আদায়ে শৈথিল্য করবেনা।

৯. পেশাব ও পায়খানা চেপে রেখে নামায পড়া

আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি ছাওবান রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনটে কাজ করা কারো জন্য বৈধ নয় (১) কোনো ব্যক্তি একটি জামাতের ইমামতি করবে, অথচ জামাতের লোকদের বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দোয়া করবে। এরূপ করলে সেটা হবে তাদের সাথে তার বিশ্বাসঘাতকতা। (২) বিনা অনুমতিতে কোনো বাড়ির ভেতরের দিকে দৃষ্টি দেয়া। এরূপ করলে সেটা হবে বিনা অনুমতিতে সেই বাড়িতে প্রবেশের শামিল। (৩) পেশাব আটকে রেখে নামায পড়া, যতোক্ষণ তা থেকে অব্যাহতি লাভ না করে। [প্রকাশ্য দোয়ায় মুক্তাদিদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দোয়া করা ইমামের জন্য মাকরূহ। গোপন দোয়ায় মাকরূহ নয়।] আহমদ, মুসলিম ও আবু দাউদ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, খাবারের উপস্থিতিতে ও পেশাব পায়খানা চেপে রেখে কারো নামায পড়া উচিত নয়।

১০. অদম্য ঘুম নিয়ে নামায পড়া

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কারো যখন তন্দ্রা আসে, তখন তার শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। যাতে সে ঘুম থেকে রেহাই পায়। কেননা তন্দ্রাসহ নামায পড়লে এমনও হতে পারে যে, সে ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালাগালি করবে। সব কটা সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কেউ রাতে নামায পড়তে উঠে এবং ঘুমের তীব্রতার কারণে মুখে কোনো কিছু সুষ্ঠুভাবে উচ্চারণ করতে পারেনা এবং সে মুখে কী বলছে তা নিজেই জানেনা, তখন তার শুয়ে পড়া উচিত। আহমদ, মুসলিম।

১১. ইমাম ব্যতিত অন্য কারো জন্য মসজিদে জায়গা নির্দিষ্ট করা

আবদুর রহমান বিন শিবল বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কাকের মতো ঠোকর দেয়া, দ্রুত বেগে রুকু সাজদা করা, হিংস্র পশুর মতো পা ছড়িয়ে বসা, উট যেমন নিজের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা করে নেয়, তেমনি মসজিদে কোনো মুসল্লীর জায়গা নির্দিষ্ট করা নিষিদ্ধ করেছেন। -আহমদ ইবনে খুযায়মা, হাকেম।

২৩. যেসব কারণে নামায বাতিল হয়ে যায়

নিম্নোক্ত কাজগুলোর দ্বারা নামায বাতিল হয়ে যায় এবং নামাযের উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যায় :

১. স্বেচ্ছায় কিছু খাওয়া বা পান করা

ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলেমগণ একমত, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে খায় বা পান করে, তার নামায পুনরায় পড়তে হবে। নফল নামাযেও অধিকাংশের মতে তদ্রূপ। কেননা যেসব কারণে ফরয নামায বাতিল হয়, সেসব কারণে নফল নামায বাতিল হয়। (শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত খেলে বা পান করলে এবং দাঁতের ফাঁকে একটা জবের সমান আটকে থাকা খাদ্যকে নামাযের মধ্যে গিলে ফেললে নামায বাতিল হয়না। তাউস ও ইসহাক বলেন : পানি পান ক্ষতি নেই। কেননা এটা একটা ছোট কাজ। সাঈদ ও ইবনে যুবাইর নফল নামাযে পান করতেন বলে বর্ণিত আছে।

২. নামাযের প্রয়োজন ব্যতিত ইচ্ছাকৃত কথা বলা

যায়েদ বিন আরকাম থেকে বর্ণিত : আমরা নামাযের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের একজন

আরেক জনের সাথে নামাযের মধ্যে কথা বলতো। অবশেষে নাযিল হলো : তোমরা নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহর জন্য নামায পড়ো। এ আয়াত দ্বারা আমরা নীরব থাকার আদেশ পেলাম এবং কথা বলা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হলো। -সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ। ইবনে মাসউদ রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. নামাযে থাকা অবস্থায় আমরা তাকে সালাম করতাম এবং তিনি জবাবও দিতেন। যখন নাজ্জাশীর কাছ থেকে ফিরে এলাম, তাঁকে নামাযের মধ্যে সালাম করলাম। কিন্তু তিনি জবাব দিলেননা। তখন আমরা বললাম, হে রসূলুল্লাহ আগে তো আপনাকে সালাম করতাম, আর আপনি তার জবাব দিতেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : নামাযে এতো কাজ রয়েছে, যা কথা বলার অবকাশ দেয়না। বুখারি, মুসলিম। অবশ্য বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কিংবা ভুলবশত যদি কেউ কথা বলে, তবে নামায শুদ্ধ হবে।

মুয়াবিয়া বিন হাকাম রা. বলেছেন : আমি যখন রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নামায পড়ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি হাঁচি দিলো। আমি বললাম আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। জামাতের লোকেরা আমার প্রতি কটমট করে তাকালো। আমি বললাম : তোমাদের কী হয়েছে, আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো? এর জবাবে তারা উরুর উপর হাত দিয়ে থাপড়াতে লাগলো। যখন দেখলাম, তারা আমাকে নীরব করতে চাইছে তখন আমি চুপ থাকলাম। যখন রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়লেন। তখন তার আগে বা পরে তার চেয়ে ভাল কোনো শিক্ষক আমি দেখিনি। তিনি আমাকে ধমকও দিলেননা, তিরস্কারও করলেননা, মারলেনওনা। তিনি বললেন, মানুষ সচরাচর পরস্পর যেসব কথাবার্তা বলে নামাযে তা বলা যায়না। নামাযে কেবল সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলবে এবং কুরআন পাঠ করবে। -আহমদ, মুসলিম আবু দাউদ, নাসায়ী।

এখানে দেখা গেলো, মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম শরিয়তের বিধান না জানার কারণে কথা বলেছেন। তাই রসূলুল্লাহ সা. তাকে নামায পুনরায় পড়ার আদেশ দিলেননা। তবে মানুষ পরস্পর যেসব কথাবার্তা বলে, নামাযের মধ্যে তা বললে যে নামায বাতিল হয়না, আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত এ হাদিসটি তার প্রমাণ। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে যোহর কিংবা আসরের নামায পড়ালেন এবং সালাম ফেরালেন। সালাম ফেরানোর সংগে সংগে যুল ইয়াদাইন (দুই হাতওয়ালা, এই খ্যাত হওয়ার কারণ হলো, তার হাত অত্যধিক লম্বা ছিলো) নামক সাহাবি বললেন, হে রসূলুল্লাহ, নামায কি কসর পড়লেন, না ভুল করেছেন? রসূলুল্লাহ সা. বললেন কসরও করিনি, ভুলেও যাইনি। যুল ইয়াদাইন বললেন, হে রসূলুল্লাহ আপনি বরং ভুল করেছেন। রসূলুল্লাহ সা. জামাতের লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, যুল ইয়াদাইন যা বলছে তা কি সত্য? লোকেরা বললো, হাঁ। তখন রসূলুল্লাহ সা. আরো দু'রাকাত পড়লেন। তারপর দুটো (সাহু) সাজদা করলেন। -বুখারি মুসলিম। মালেকী মাযহাব নামাযের ভুল শুধরানো জন্য কথা বলাকে বৈধ বলে রায় দিয়েছে। তবে দুটো শর্তে, প্রথমত প্রচলিত রীতি অনুসারে তা অতিরিক্ত প্রতীয়মান না হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত সুবহানাল্লাহ বলে টুকে দিলে উদ্দেশ্য বোধগম্য হতোনা- এমন হওয়া চাই। ইমাম আওযায়ী বলেছেন : যে ব্যক্তি নামাযের ভুল শুধরানোর লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলে তার নামায বাতিল হবেনা। এক ব্যক্তি আসরের নামাযে প্রকাশ্যে কিরাত পড়লে পেছন থেকে একজন বললো : এটা আসরের নামায, তার সম্পর্কে আওযায়ী বললেন, তার নামায নষ্ট হয়নি।

৩. ইচ্ছাকৃত আমলে কাছির

কোনটা অতিরিক্ত কাজ (আমলে কাছির) আর কোন্টা অতিরিক্ত নয়, তা নির্ণয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কারো কারো মতে, দূর থেকে কাজটি দেখে কেউ যদি নিশ্চিত হয় যে, এ ব্যক্তি নামায পড়ছেনা, তাহলে সেটা অতিরিক্ত কাজ, নচেত অতিরিক্ত কাজ নয়। কারো

মতে, যে কাজ দেখলে দর্শকের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, এ কাজের কর্তা নামায পড়ছেনা, সে কাজ অতিরিক্ত কাজ (নিশ্চিত হওয়া জরুরি নয়)। নববী বলেছেন : যে কাজ নামাযের কাজের শ্রেণীভুক্ত নয়, তা যদি অতিরিক্ত হয়, তবে তাতে সর্বসম্মতভাবে নামায বাতিল হবে, আর অতিরিক্ত না হলে সর্বসম্মতভাবে বাতিল হবেনা। এটাই বিধি। তারপর পুনরায় তাদের মধ্যে অতিরিক্ত কাজ ও অনতিরিক্ত কাজ নির্ণয়ে চার ধরনের মতভেদ হয়েছে। অবশেষে চতুর্থ ধরনটি গৃহিত হয়েছে। নববী বলেছেন : এটাই বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ মত। এই গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ আলেম এর উপরই স্থির থেকেছেন যে, এ ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণাকেই মাপকাঠি ধরা হবে। সুতরাং জনগণ যে কাজকে নগণ্য ও অনতিরিক্ত মনে করে তাতে নামাযের ক্ষতি হবেনা। যেমন : ইশারায় সালামের জবাব দেয়া, জুতা খোলা, পাগড়ী খোলা বা পরা, হালকা কোনো কাপড় পরা বা খোলা, কোনো ছোট শিশুকে কোলে বা কাধে তোলা ও নামানো, সামনে দিয়ে চলাচল ঠেকানো, কাপড় দিয়ে থুথু মোছা ইত্যাদি। নামাযের মধ্যে সাপ বিচ্ছু মেরে ফেলার মতো কাজ যে রসূল সা. করেছেন ও করতে আদেশ দিয়েছেন, তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।) তবে জনসাধারণ যে কাজকে মাত্রাতিরিক্ত মনে করে, যেমন ক্রমাগত অনেকখানি পথ হাটা এবং এক নাগাড়ে অনেকগুলো কাজ করা, তাতে অবশ্যই নামায বাতিল হবে। আলেমগণ এ ব্যাপারেও একমত যে, অতিরিক্ত কাজ বিরতিহীনভাবে করলে তাতে নামায বাতিল হবে। বিরতিসহকারে যদি করে, যেমন এক পা এগিয়ে কিছুক্ষণ বিরত থাকলো, তারপর আবার আর এক'পা বা দু'পা এগুলো, অথবা প্রত্যেক দু'পা অগ্রসর হবার পর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার দু'পা অগ্রসর হলো, তবে এভাবে একশো পা তার বেশি পা চললেও সর্বসম্মতভাবে নামাযের ক্ষতি হবেনা। অতিশয় হালকা কাজ যেমন হাত দিয়ে তাসবীহের দানা নাড়ানো বা চুলকানো বা কোনো গিরে লাগানো বা গিরে খোলা- এসব কাজ এক নাগাড়ে ও যতো বেশি করা হোক, নামায বাতিল করেনা। এটাই সঠিক ও সুপ্রসিদ্ধ মত। শাফেয়ী রহ. বলেছেন : দানাদার কোনো মালায় হাত দিয়ে আয়াত গণনা করলে নামায বাতিল হবেনা। তবে এভাবে গণনা না করাই ভালো।

৪. বিনা ওযরে ও ইচ্ছাকৃত নামাযের কোনো শর্ত ত্যাগ করলে

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জনৈক বেদুঈন সুষ্ঠুভাবে নামায না পড়ায় তাকে বললেন : "ফিরে যাও, আবার নামায পড়ো, কেননা তুমি নামায পড়োনি।" এ হাদিস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে রুশদ বলেছেন : ফকীহগণের সর্বসম্মত মত, পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকে নামায পড়লে সে নামায দোহরাতে হবে, চাই ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে। অনুরূপ কিবলামুখি না হয়ে নামায পড়লেও নামায দোহরাতে হবে চাই ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে। মোটকথা, নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির যে কোনো একটি অসম্পূর্ণ থাকলেই নামায দোহরাতে হবে।*

৫. নামাযের মধ্যে হাসা হাসি করলে

ইবনুল মুনযির উল্লেখ করেছেন, হাসলে নামায বাতিল হয় এটা সর্বসম্মত মত। নববী বলেন : এটা সেই ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যার মুখের দুই প্রান্ত বের হয়ে যায়। অধিকাংশ আলেম

---

* বি:দ্র: নামায নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ বিনা ওযরে করা নামাযীর উপর হারাম। অনিবার্য কোনো কারণ ঘটলে, যেমন কোনো অসহায় বিপন্নকে সাহায্য করা, ডুবন্তকে উদ্ধার করা ইত্যাদি কারণে নামায ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে, নামাযীর নিজের বা অন্যের কম বা বেশি সম্পদের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে কিংবা শিশু সন্তানের কান্না শুনে নামাযরত মা তার ব্যথা পাওয়ার আশংকা করলে কিংবা উনুনে রান্না চড়ানো হাড়ি বা ডেগচি উপচে পড়লে বা পশু পালালে ইত্যাদি ক্ষেত্রে নামায ছেড়ে দেয়া বৈধ।

বলেছেন : মুচকি হাসলে ক্ষতি নেই। আর যদি হাসি প্রবল হয়ে উঠে এবং দমন করা সম্ভব না হয়, তাহলে অল্প হলে নামায বাতিল হবেনা। কিন্তু বেশি হলে বাতিল হবে। আর কম বা বেশি নির্ণিত হবে প্রচলিত রীতির আলোকে।

২৪. নামাযের কাযা

আলেমগণ একমত, ভুলক্রমেই হোক কিংবা ঘুমের কারণেই হোক, কেউ ওয়াক্তের মধ্যে নামায পড়তে ব্যর্থ হলে তার উপর নামায কাযা করা ওয়াজিব। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "ঘুমের মধ্যে কোনো উদাসীনতা (ধর্তব্য) নয়। উদাসীনতা শুধু জাগ্রত অবস্থায় (ধর্তব্য), সুতরাং কেউ যদি কোনো নামায ভুলে যায় বা ঘুমের কারণে তা ফউত হয়, তবে মনে পড়া মাত্রই তা পড়ে নেয়া উচিত।" সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির উপর কোনো কাযা নেই, তবে যখন সে এমন সময়ে সংজ্ঞা ফিরে পায় যে, পবিত্রতা অর্জন ও নামায শুরু করা সম্ভব, তখন তাকে কাযা পড়তে হবে। নাফে' থেকে বর্ণিত : একবার ইবনে উমরের মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে এবং এর ফলে তিনি নামায ত্যাগ করেন। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আর ছুটে যাওয়া নামায আদায় করেননি। ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত : রোগীর সংজ্ঞা লোপ পাওয়ার পর যখন আবার সংজ্ঞা ফিরে পাবে, তখন তার আর নামায দোহরাতে হবেনা। যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হলো : সংজ্ঞাহীন কী করবে? তিনি বললেন তাকে কাযা করতে হবেনা। হাসান বসরী ও মুহম্মদ বিন সিরীন সংজ্ঞাহীন সম্পর্কে বলেছেন, যে নামাযের সময় অজ্ঞান হয়েছে, সে নামাযের ওয়াক্তে হুঁশ ফিরে পেলে নামায দোহরাবেনা।

পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃভাবে নামায তরককারী সম্পর্কে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, তার গুনাহ্ হবে এবং তার উপর কাযা ওয়াজিব। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে, তার জন্য তরককৃত নামাযের কাযা করার অনুমতি নেই এবং তার কাযা বৈধ হবেনা। বরং তাকে বেশি করে নফল পড়তে হবে। ইবনে হাযম এ মাসয়ালাটি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তার আলোচনার সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করছি :

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে এবং এই অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়। সে কখনো তার কাযা করতে সক্ষম হবেনা। তার বেশি করে নেক কাজ ও নফল নামায আদায় করা উচিত, যাতে কিয়ামতের দিন তার দাড়িপাল্লা ভারি হয়। আর আল্লাহ্র কাছে তার তওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া উচিত। আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন : ওয়াক্তের পরে তাকে কাযা করতে হবে। এমনকি মালেক ও আবু হানিফা বলেছেন : যে ব্যক্তি এক বা একাধিক নামায ছেড়ে দেয়, সে আগত ওয়াজিব নামায পড়ার আগেই সেটা কাযা করে নেবে যদি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়া নামাযের সংখ্যা পাঁচ বা তার কম হয়, চাই পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত থাকুক বা চলে যাক। পাঁচ ওয়াক্তের বেশি হলে আগত ওয়াক্তের নামায আগে পড়বে। এ বক্তব্যের প্রমাণ আল্লাহ্ বলেছেন, "সেই নামাযীদের জন্য আক্ষেপ, যারা নিজেদের নামাযকে ভুলে যায়।" আল্লাহ্ আরো বলেছেন : "তাদের পরে এমন লোকেরা জন্ম নিয়েছে, যারা নামায ত্যাগ করেছে এবং খেয়াল খুশি মতো কাজ করেছে। তারা অবশ্যই গোমরাহীতে লিপ্ত হবে।" সুতরাং স্বেচ্ছায় নামায তরককারী ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর কাযা আদায় করলে যদি নামায পড়েছে বলে ধরা হতো, তাহলে তার জন্য আক্ষেপও করা হতোনা এবং সে গোমরাহীতে লিপ্ত এ কথাও বলা হতোনা, যেমন নামাযের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করলে কোনো আক্ষেপ বা গোমরাহীর কথা বলা হয়নি। তাছাড়া, আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য সময় নির্দিষ্ট করেছেন, যার শুরু ও শেষ চিহ্নিত ও সুপরিচিত। যা একটা নির্দিষ্ট সময়ে শুরু ও নির্দিষ্ট

সময়ে শেষ হয়। কাজেই যে ব্যক্তি ওয়াক্ত আসার আগে নামায পড়ে আর যে ব্যক্তি ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরে নামায পড়ে- তাদের উভয়ের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। কেননা উভয়েই নির্দিষ্ট ওয়াক্তের বাইরে নামায পড়েছে এবং তারা উভয়ে আল্লাহর সীমালংঘনের জন্য সমভাবে দায়ী। আল্লাহ বলেছেন : "যে ব্যক্তির আল্লাহর সীমালংঘন করে সে নিজের উপর যুলুম করে।" উপরন্তু নামাযের কাযা এমন একটা কাজ, যার হুকুম শরিয়তের পক্ষ থেকেই আসতে হবে। শরিয়তের হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল সা. এর মুখ দিয়েই আসা চাই। এর ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আমাদের প্রশ্ন হলো, স্বেচ্ছায় নামায তরককারীকে তরককৃত নামায কাযা করতে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের পরে পড়তে কে আদেশ দিয়েছে? যদি বলা হয়, আল্লাহ দিয়েছেন তাহলে আমরা পুনরায় প্রশ্ন করবো : নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি নামায তরক করার ইচ্ছা করলো, সে কি নেক কাজ করলো, না গুনাহর কাজ করলো? যদি তারা বলেন : নেক কাজ, তাহলে বলবো, এটা সমগ্র মুসলিম জাতির সুনিশ্চিত ঐকমত্য এবং কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। আর যদি বলেন, গুনাহর কাজ তাহলে বলবো সত্য বলেছেন। তবে সেই সাথে একথাও বলবো যে গুনাহর কাজ নেক কাজের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনা। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা তার রসূলের মুখ দিয়ে প্রত্যেক নামাযের সময় চিহ্নিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য একটা সূচনা প্রান্ত রেখেছেন এবং একটা শেষ প্রান্ত রেখেছেন। সূচনা প্রান্তের পূর্বে ঐ নামায পড়ার কোনো সুযোগ রাখেননি এবং শেষ প্রান্তের পরে ঐ নামায পড়ার কোনো সুযোগ রাখেননি। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কোনো এক ব্যক্তিও দ্বিমত প্রকাশ করেনি। সেই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যদি উক্ত নামায পড়া জায়েয থাকতো, তাহলে নামাযের ওয়াক্তের শেষ প্রান্তসীমা নির্ধারণটা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যেতো। আর আল্লাহ এমন নিরর্থক কাজ করতেই পারেননা। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য প্রত্যেক কাজের জন্য একটা সময় নির্ধারিত থাকে। সেই সময়ে ছাড়া উক্ত কাজ করলে তা শুদ্ধ হয়না। যদি হতো, তাহলে ঐ সময়টা ঐ কাজের সময় বলে নির্ধারিত হতোনা। এটা একটা অকাট্য কথা। এরপর দীর্ঘ আলোচনার পর ইবনে হাযম বলেন : ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নামায পরিত্যাগকারীর উপর যদি তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব হতো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সে বিষয়ে আদেশ দিতে অবহেলা করতেননা, ভুলেও যেতেননা এবং তা উল্লেখ থেকে বিরত থেকে আমাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্টের মধ্যে ফেলতেননা। তিনি তো নিজেই বলেছেন : তোমার প্রভু ভুলে যায়না।' আর শরিয়তের যে বিধি কুরআন ও সুন্নাহতে থাকবেনা তা বাতিল। সহীহ হাদিসে রসূল সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেলো তার যেন যাবতীয় সহায় সম্পদ ও পরিবার পরিজন হাতছাড়া হয়ে গেলো। সুতরাং একথা যথার্থ যে, যে জিনিস ইচ্ছাকৃতভাবে ছুটে যায়, তা হস্তগত করার কোনো উপায় নেই। আর যদি হস্তগত করার অবকাশ ও সম্ভাবনা থাকতো তাহলে তা হাতছাড়া হতোনা যেমন ভুলক্রমে ছুটে যাওয়া নামায হাতছাড়া হয়না। এ ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা নেই। আর গোটা উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলে নামায ছুটে যায়। এই ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত ঐকমত্য রয়েছে। ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় করা যদি সম্ভব হতো, তাহলে বলার অবকাশ থাকতো যে, উক্ত নামায ছুটে গেছে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বাতিল। সুতরাং সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে তরককৃত নামাযের কাযা আদায় করা কখনো সম্ভব নয়। এই মতের সমর্থনে আমাদের পক্ষে রয়েছেন : উমর ও তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ, সাদ, সালমান ফারসী, ইবনে মাসউদ, কাসেম, বুদাইল উকাইলি, ইবনে সিরীন, মুতাররফ ও উমর ইবনে আবদুল আযীয। যার উপর নামায ফরয করা হয়েছে, তার জন্য নামাযের নির্ধারিত সময়

থেকে নামাযকে বিলম্বিত করার কোনো সুযোগ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ রাখেননি। এমনকি মারামারি, যুদ্ধ ভয়, কঠিন রোগ ব্যাধি বা সফরের কারণেও নয়। আল্লাহ তায়ালা ভীতির নামায বা সালাতুল খওফের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

"যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে এবং নামায শুরু করবে তখন মুমিনদের একটি দল তোমার সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে যাক।" তিনি আরো বলেছেন : যদি তোমারা ভীতির মধ্যে থাকো তাহলে আরোহী ও পদব্রজে চলা অবস্থায়ই নামায পড়বে। আল্লাহ তায়ালা নামাযকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করার অনুমতি এমনকি সংকটাপন্ন ও মুমূর্ষ রোগীকেও দেননি। বরং কেউ দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে, বসে পড়তে না পারলে শুয়ে, পানি না পেলে তাইয়াম্মুম করে এবং মাটি না পেলে তাইয়াম্মুম ছাড়াই নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। তাহলে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযকে তার ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত তরক করার অনুমতি দিয়েছেন তারা কোথা থেকে অনুমতি দিলেন? তারপর ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর তা পড়ার আদেশ দিয়ে বললেন, এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। অথচ এটা কুরআনে নেই, কোনো সহীহ বা দুর্বল হাদিসেও নেই, কোনো সাহাবির উক্তিতেও নেই, কিয়াসেও নেই। কিন্তু আমরা যে বলেছি, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে এবং ওয়াক্ত থাকতে আদায় করেনা, তাকে তওবা করতে, ক্ষমা চাইতে ও বেশি করে নফল আদায় করতে হবে, সেটা বলেছি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে :

"তাদের পরে এমন লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা নামাযকে ত্যাগ করলো এবং প্রবৃত্তির খেয়াল খুশির অনুসরণ করলো। ফলে অচিরেই তারা গোমরাহীতে লিপ্ত হবে। কিন্তু তারা নয়, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের উপর বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবেনা।" এছাড়া "যারা কোনো অশালীন কাজ করা বা নিজেদের উপর যুলুম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহর জন্য মাফ চায়।" এবং "যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও মন্দ কাজ করবে সেও তা পাবে।" "আমি সেদিন ইনসাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কারো উপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করবোনা।"

সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য ও বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদিস দ্বারা জানা যায়, নফলের খুবই চমৎকার অবদান রয়েছে। যার পরিমান আল্লাহই ভালো জানেন। আর ফরযেরও খুবই চমৎকার অবদান রয়েছে যার পরিমাণ আল্লাহই ভালো জানেন। সুতরাং ফরযের যখন ঘাটতি পড়বে, তখন নফলের পরিমাণ বেশি থাকলে তা থেকে নিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে। আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "আল্লাহ কোনো সৎকর্মশীলের সৎকর্ম নষ্ট করেননা এবং ভালো কাজগুলো মন্দ কাজগুলোকে দূর করে দেয়।"

২৫. রোগীর নামায

রোগ ব্যাধি বা অনুরূপ অন্য কোনো ওযর ও অক্ষমতায় আক্রান্ত হওয়ায় ফরয নামাযে দাঁড়াতে না পারলে বসে বসে নামায পড়া যাবে। বসতে না পারলে শুয়ে শুয়ে ইশারায় রুকু ও সাজদা করে নামায পড়তে হবে এবং সাজদা করবে রুকুর চেয়ে নিচু হয়ে। আল্লাহ বলেছেন : "তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে।" ইমরান বিন হোসাইন বলেন : আমার অর্শ রোগ ছিলো। রসূলুল্লাহ সা. কে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে বললেন : দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। তা না পারলে বসে পড়ো। তা না পারলে কাত হয়ে শুয়ে পড়ো। -মুসলিম ব্যতিত সব কটা সহীহ হাদিস গ্রন্থ। নাসায়ী আরো যোগ করেছে : তা না

পারলে চিত হয়ে শুয়ে পড়ো। আল্লাহ কারো উপর তার ক্ষমতা বহির্ভূত দায়িত্ব অর্পণ করেননা। জাবের রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এক রোগীকে দেখতে গেলেন। দেখলেন সে একটা বালিশের উপর নামায পড়ছে। তিনি বালিশটি ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন যদি পার মাটির উপর নামায পড়ো। না পারলে ইশারায় নামায পড়ো এবং তোমার সাজদাকে তোমার রুকুর চেয়ে নিচু করো। -বায়হাকি। অক্ষমতা নির্ণয়ে বিবেচ্য বিষয় হলো অত্যধিক কষ্ট হওয়া, রোগ বৃদ্ধির আশংকা, রোগ নিরাময়ে বিলম্ব কিংবা মাথা ঘোরার আশংকা। দাঁড়ানোর পরিবর্তে যখন বসে নামায পড়া হবে, তখন সেই বসাটা হবে আসন করে বসা।

আয়েশা রা. বললেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে আসন দিয়ে বসে নামায পড়তে দেখেছি। -নাসায়ী। আবার তাশাহহুদের মতো করেও বসা যায়। যে ব্যক্তি দাঁড়াতেও অক্ষম বসতেও অক্ষম সে কীভাবে নামায পড়বে? কেউ বলেন কাত হয়ে শুয়ে পড়বে, আর তা না পারলে চিত হয়ে শুয়ে কেবলার দিকে যথাসাধ্য পা ছড়িয়ে দিয়ে নামায পড়বে।

আলী রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রোগী যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে তবে দাঁড়িয়ে পড়বে। নচেত বসে পড়বে। সাজদা দিতে না পারলে মাথা দিয়ে ইশারা করবে এবং রুকুর চেয়ে নিচু হয়ে সাজদা করবে। বসে নামায পড়তে অক্ষম হলে কেবলামুখি হয়ে ডান পাঁজরের উপর শুয়ে নামায পড়বে, তা না পারলে চিত হয়ে শুয়ে ও কিবলার দিকে পা দিয়ে নামায পড়বে। -দার কুতনি। আর একটি দল বলেছে, যেভাবে পারে সেভাবেই নামায পড়বে। এসব হাদিস থেকে স্পষ্টত বুঝা যায়, চিত হয়ে শুয়ে যদি ইশারা করতে অক্ষম হয় তাহলে এরপর আর তার কিছুই করণীয় নেই।

২৬. সালাতুল খাওফ বা যুদ্ধ, ভয় ও সন্ত্রাসকালীন নামায

সালাতুল খাওফ তথা ভয়ের নামায শরিয়ত সম্মত এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত।* কারণ আল্লাহ বলেছেন : "আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করো এবং তাদের নামায পড়াতে ইচ্ছুক হও, তখন তাদের একটা দল যেনো তোমার সাথে দাড়ায় এবং তারা যেনো নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখে। তারপর যখন তারা সাজদা সম্পন্ন করবে তখন যেনো তারা তোমাদের পেছনে অবস্থান নেয়। আর অন্য দল যারা নামায পড়েনি, তারা যেনো তোমার সাথে নামায পড়ে নেয় এবং তারা যেনো সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা চায় যেনো তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব সম্পর্কে উদাসীন হও। যাতে তারা একযোগে তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও অথবা তোমরা যদি অসুস্থ হও তাহলে তোমরা অস্ত্র পরিত্যাগ করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু তোমরা সে ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য অবশ্যই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"**

ইমাম আহমদ বলেছেন : ভয়ের নামায সম্পর্কে ছয়টা বা সাতটা হাদিস রয়েছে এর যে কোনো একটি অনুসরণ করা বৈধ। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : ভয়ের নামাযের পদ্ধতি মূলত: ছয়টি। কিন্তু কেউ কেউ আরো বেশি বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীর বর্ণনাভেদে এসব পদ্ধতি সতেরোটায় গিয়ে ঠেকেছে। তবে এমনও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সা. এর কাজগুলোর একটা আর একটির সাথে মিলে গেছে। কিন্তু বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় সে ব্যাপারে বিভিন্নতা রয়েছে।

---

* এই ভয় যে কোনো ধরনের হতে পারে, যথা : শত্রুর আক্রমণের ভয়, আগুন লাগার ভয় ইত্যাদি। আবাসে বা প্রবাসে সর্বত্রই এটা ঘটতে পারে।

** অধিকাংশ আলেমের মতে ভয়ের সময় নামাযে অস্ত্র বহন করা মুস্তাহাব। কারো কারো মতে ওয়াজিব।

সালাতুল খাওফের ছয়টি পদ্ধতি এখানে তুলে ধরা হলো :

১. শত্রু কিবলার দিক ব্যতিত অন্য কোনো দিকে থাকলে ইমাম দু'রাকাত বিশিষ্ট নামায এভাবে পড়াবেন : একটি দলকে সাথে নিয়ে ইমাম এক রাকাত পড়বেন। তারপর অপেক্ষায় থাকবেন যেন তারা নিজেরা আলাদাভাবে আর এক রাকাত পড়ে নেয়, তারপর গিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নেয়, তারপর অপর দলটি আসে এবং তাদেরকে নিয়ে ইমাম দ্বিতীয় রাকাত পড়বে এবং তারা তাদের অবশিষ্ট এক রাকাত পৃথকভাবে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাম ফেরাবে।

সাহল বিন খায়ছামা বর্ণনা করেছেন : একটি দল রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে কাতারবদ্ধ হয়ে নামাযে দাঁড়ালো এবং অপর দলটি শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নিলো। তিনি তাঁর সাথের দলটিকে নিয়ে এক রাকাত নামায পড়লেন। তারপরে দাঁড়িয়ে থাকলেন, দলটি আলাদাভাবে নামাযের বাকি রাকাতটি পড়ে নিলো। তারপর তারা শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নিতে চলে গেলো। তারপর অপর দলটি এলো, তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে অবশিষ্ট রাকাতটি পড়লেন। তারপর বসে রইলেন। তারা তাদের অবশিষ্ট এক রাকাত নামায একাকী পড়ে নিলো। তারপর তিনি তাদের সাথে সালাম ফেরালেন। -ইবনে মাজাহ ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

২. শত্রু কিবলার দিক ব্যতিত অন্যদিকে থাকলে ইমাম একটি বাহিনীকে নিয়ে এক রাকাত পড়বেন এবং অপর বাহিনী শত্রুর মোকাবিলায় থাকবে। তারপর যে দলটি ইমামের সাথে এক রাকাত পড়েছে তারা চলে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নেবে এবং অপর বাহিনীটি এসে এক রাকাত পড়বে। তারপর উভয় বাহিনী নিজ অবশিষ্ট এক রাকাত সম্পূর্ণ করবে।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. একটি দলকে সাথে নিয়ে এক রাকাত পড়লেন এবং অপর দলটি শত্রুর মোকাবিলা থাকলো। তারপর তারা চলে গেলো এবং তাদের সাথিদের জায়গায় গিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নিলো। তারপর অপর দলটি এলো। তাদেরকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ সা. এক রাকাত পড়লেন। তারপর সালাম ফেরালেন। এরপর উভয় দল পৃথকভাবে এক রাকাত এক রাকাত করে পড়লেন। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম।

স্পষ্টতই দ্বিতীয় দল তাদের নামায ইমামের সালাম ফেরানোর পর সম্পন্ন করবে। ফলে মাঝখানে প্রহরার কারণে তাদের নামায বিচ্ছিন্ন হবেনা। তাদের দু'রাকাত নামায এক সাথেই সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে প্রথম দল তাদের দ্বিতীয় রাকাত ততোক্ষণ পড়তে পারবেনা। যতোক্ষণ দ্বিতীয় দল নামায পড়ে শত্রুর মোকাবিলায় না ফিরবে। ইবনে মাসউদ রা. বলেন : এরপর তিনি সালাম ফেরালেন এবং এই দলটি উঠে নিজেদের বাকি এক রাকাত পড়ে সালাম ফেরালো।*

৩. ইমাম প্রত্যেক দলকে নিয়ে দু'রাকাত করে নামায পড়বে। প্রথম দু'রাকাত ইমামের জন্য ফরয হবে। আর দ্বিতীয় দু'রাকাত তার জন্য নফল হবে। এতে মুক্তাদিদের ফরয বাতিল হবেনা। কেননা ফরয আদায়কারী মুক্তাদির জন্য নফল আদায়কারী ইমামের পেছনে ফরয নামায পড়া বৈধ।

জাবের রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সাহাবিদের একটি দলকে সাথে নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর অন্যদেরকে নিয়ে দু'রাকাত পড়লেন। তারপর সালাম ফেরালেন। -

---

* ফাতহুল বারীতে রয়েছে : এই দল দ্বারা ছোট বড় উভয় প্রকারের দলকে বুঝানো হয়েছে। এমনকি একজনও বুঝায়। দলে যদি তিনজন থাকে তবে তাদের একজন ইমাম হয়ে একজনকে নিয়ে নামায পড়বে এবং অপরজন পাহারা দেবে। তারপর অবশিষ্ট জন নামায পড়বে।

শাফেয়ী, নাসায়ী। আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ীর বর্ণনা অনুযায়ী জাবের রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ পড়েছেন। প্রথমে কিছু সংখ্যক সাহাবিকে নিয়ে দু'রাকাত পড়ে সালাম ফেরালেন। তারপর এই দলটি চলে গেলো এবং অপর দলটি এলো। তারা প্রথম দলটির জায়গায় দাঁড়ালো এবং রসূল সা. তাদেরকে নিয়ে দু'রাকাত পড়লেন ও সালাম ফেরালেন। এভাবে রসূলুল্লাহ সা. এর চার রাকাত হলো এবং সাহাবিদের দু'রাকাত হলো। আহমদ, বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা অনুসারে এ ঘটনাটি ছিলো যাতুর রিকায়।'

৪. শত্রু যখন কিবলার দিকে থাকবে, তখন ইমাম উভয় দলকে সাথে নিয়ে নামায পড়বে। তবে সাজদা পর্যন্ত সকলে এক যোগে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রহরারত থাকবে ও শত্রুর প্রতি নজরদারী অব্যাহত রাখবে। শুধু সাজদার সময় তারা দু'ভাগে বিভক্ত হবে। এক দল ইমামের সাথে সাজদা দেবে। আর অপর দল অপেক্ষায় থাকবে। প্রথম দল সাজদা সম্পন্ন করলে অপর দল সাজদা দেবে। এভাবে প্রথম রাকাত শেষ হলে যে দলটি পেছনে পড়েছিল, তারা এগিয়ে আসবে এবং প্রথম দলটি পেছনে চলে যাবে।

জাবের রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে আমরা সালাতুল খাওফ পড়েছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে তার পেছনে দু'কাতারে দাঁড় করালেন। শত্রু তখন আমাদের ও কিবলার মাঝখানে। রসূলুল্লাহ সা. তাকবীর দিলেন। আমরাও সবাই তাকবীর দিলাম। তিনি রুকু দিলে আমরা সবাই রুকু দিলাম। তিনি রুকু থেকে মাথা তুললে আমরা সবাই মাথা তুললাম। তারপর তিনি ও তাঁর সংলগ্ন কাতার সাজদা দিলো আর অপর কাতারটি শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সংলগ্ন কাতার যখন সাজদা সম্পন্ন করলো পরবর্তী কাতারটি সাজদা দিলো ও উঠে দাঁড়ালো। তারপর পেছনের কাতারটি সামনে ও সামনের কাতারটি পেছনে গেলো। তারপর রসূলুল্লাহ সা. রুকু দিলেন এবং আমরা সবাই রুকু দিলাম। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং আমরা সবাই মাথা তুললাম। তারপর রসূল সা. ও তাঁর সন্নিহিত কাতার, যা প্রথম রাকাতের সময় পেছনে ছিলো, সাজদায় গেলো এবং পেছনের কাতার শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ালো। তারপর যখন রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সংলগ্ন কাতারটি সাথে নিয়ে সাজদা দিলেন, তখন পেছনের কাতারও সাজদা দিলো। এ সময় সমগ্র জামাত এক যোগে সাজদায় গেলো। তারপল রসূলুল্লাহ সা. সালাম ফেরালেন এবং আমরা সবাইও সালাম ফেরালাম। – আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকি।

৫. উভয় দল এক সাথে ইমামের পেছনে নামায শুরু করবে। তারপর এক দল শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নিতে চলে যাবে এবং অপর দল ইমামের পেছনে এক রাকাত শেষ করবে। তারপর তারাও চলে যাবে এবং শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়াবে। তারপর অপর দলটি (যে দল নামায শুরু করেই চলে গিয়েছিল) ফিরে আসবে, তারা একাকি পৃথকভাবে এক রাকাত পড়ে নেবে এবং তখন দাঁড়িয়ে থাকা ইমাম তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত পড়বে। তারপর শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়ানো দলটি আসবে এবং তারা পৃথকভাবে এক রাকাত পড়ে নেবে। তখন ইমাম ও দ্বিতীয় দল বসা থাকবে। তারপর ইমাম সালাম ফেরাবে এবং সকলে সালাম ফেরাবে।

আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : নাজদ অভিযানের বছর আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়লাম। তিনি আসরের নামাযে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে একটি দল দাঁড়ালো। অপর দলটি শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়ালো। তাদের পেছনে ছিলো কিবলা। রসূলুল্লাহ সা. তাকবীর দিলেন এবং তাঁর সাথে সবাই তাকবীর (তাহরীমা) দিলো। (অর্থাৎ যারা তাঁর সাথে ছিলো তারাও এবং যারা শত্রুর মোকাবিলায় ছিলো তারাও।) তারপর রসূল সা. এক রাকাতের রুকু

দিলেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিলো তারাও রুকু দিলো। তারপর তিনি সাজদা দিলেন এবং তাঁর সংলগ্ন দলটিও সাজদা দিলো। আর অন্যরা শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রসূলুল্লাহ সা. উঠলেন এবং তাঁর সংগের দলটিও উঠলো। তারা তৎক্ষণাত শত্রুর দিকে ছুটে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়ালো। আর যে দলটি এতোক্ষণ শত্রুর মোকাবিলায় ছিলো, তারা ফিরে এলো, রুকু দিলো ও সাজদা দিলো। তখনো রসূল সা. আগের মতোই নামাযে দণ্ডায়মান। তারপর তারা সাজদা থেকে উঠলো। এবার রসূল সা. আর একটি রাকাতের রুকু দিলেন এবং তারাও তাঁর সাথে রুকু দিলো। তিনি সাজদা দিলেন এবং তারাও তাঁর সাথে সাজদা দিলো। তারপর যে দলটি শত্রুর মোকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিলো, তারা এলো, তারা নিজেরা রুকু ও সাজদা দিলো। তখনো রসূল সা. ও তার সংগি দলটি বসেছিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ সা. সালাম ফেরালেন এবং তাঁর সাথে সবাই সালাম ফেরালো। রসূলুল্লাহ সা. এর দু'রাকাত পড়া হলো। আর উভয় দলেরও দু'রাকাত করে পড়া হলো। – আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী।

৬. প্রত্যেক দল ইমামের সাথে মাত্র এক রাকাত পড়বে। ইমামের দু'রাকাত পড়া হবে, আর প্রত্যেক দলের হবে এক রাকাত করে।

ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যী কিরাদে নামায পড়ালেন। লোকেরা তাঁর পেছনে দুটি কাতারে দাঁড়ালো। একটা কাতার তাঁর পেছনে, অপরটা শত্রুর সমান্তরালে। তাঁর পেছনে যারা ছিল, তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত পড়লেন। তারপর তারা অপর কাতারটিতে চলে গেলো। আর সেই কাতারের লোকেরা তাঁর পেছনে চলে এলো এবং তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাকাত পড়লেন এবং তাদের এক রাকাত অবশিষ্ট রইল। –নাসায়ী, ইবনে হাব্বান। ইবনে আব্বাস রা. আরো বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের উপর আবাসে চার রাকাত, প্রবাসে দু'রাকাত এবং ভয়ের সময় এক রাকাত নামায ফরয করেছেন। –আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী। ছা'লাবা বিন যাহদাম রা. বলেছেন : আমরা তাবারিস্তানে সাঈদ বিন আ'সের সাথে ছিলাম। তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে কে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে ভয়ের নামায পড়বে? হুযায়ফা রা. বললেন : আমি। তিনি এক দলকে নিয়ে এক রাকাত এবং অপর দলকে নিয়ে আর এক রাকাত পড়লেন এবং কোনো দলই অবশিষ্ট এক রাকাত সম্পূর্ণ করেনি। –আবু দাউদ, নাসায়ী।

ভয়ের নামায হিসেবে মাগরিবের নামায : মাগারিবের নামাযে কোনো কসর হয়না এটা সুবিদিত। কিন্তু সালাতুল খাওফ মাগরিবে কিভাবে পড়া হবে, তা নিয়ে কোনো হাদিসে কিছু পাওয়া যায়না। এ জন্য ইমামগণের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। হানাফী ও মালেকীদের মত হলো, ইমাম প্রথম দলকে নিয়ে দু'রাকাত এবং দ্বিতীয় দলকে নিয়ে এক রাকাত পড়বেন। শাফেয়ী ও আহমদ প্রথম দলকে নিয়ে এক রাকাত এবং দ্বিতীয় দলকে নিয়ে দু'রাকাত পড়া বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। কেননা আলী রা. এরকম করেছেন বলে জানা গেছে।

ভয় যখন প্রবলতর হয় তখনকার নামায : ভয় যখন প্রবলতর হয় এবং দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে পদব্রজে অথবা আরোহী অবস্থায়, কেবলামুখী হতে পারুক বা না পারুক, ইশারায় রুকুও সাজদা দিয়ে যেভাবেই পারে নামায পড়বে। ইশারায় নামায পড়ার সময় সাজদাকে রুকুর চেয়ে নিচু করে আদায় করবে। আর নামাযের যেসব রুকন আদায় করা সম্ভব হবেনা, তা আদায় না করলেও চলবে। ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. ভয়ের নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন : ভয় যদি আরো বেশি হয়, তাহলে পদব্রজে কিংবা আরোহী হয়ে যেভাবে পারো সেভাবেই পড়বে। কেবলামুখী হোক

বা না হোক, কিছুই আসে যায়না। মুসলিমের একটি বর্ণনায় ইবনে উমর রা. বলেন : ভয় ভীতি যদি আরো বেড়ে যায়, তাহলে হেঁটে হোক, বাহনে চড়ে হোক, ইশারায় নামায পড়লেও চলবে।

২৭. শত্রুর পিছু ধাওয়াকারী ও শত্রুর ভয়ে পলায়নপর ব্যক্তির নামায

যে ব্যক্তি শত্রুর পেছনে ধাবমান এবং বিলম্ব করলে নামাযের সময় চলে যাবে বলে শংকিত, সে ইশারায় নামায পড়বে! চাই সে কেবলা অভিমুখের যাত্রী হোক বা না হোক। এ ক্ষেত্রে শত্রুর ভয়ে পলায়নপর ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রূপ। কোনো শত্রু যাকে রুকু ও সাজদা করতে বাধা দেয়, অথবা যার জীবন, সম্পদ বা পরিজন শত্রু, চোর ডাকাত বা হিংস্র জন্তুর হুমকির সম্মুখীন তারও একই অবস্থা। এ ধরনের ব্যক্তি যেদিকেই ধাবমান থাকুক, ঐ অবস্থাতেই ইশারায় নামায পড়তে পারে। ইরাকী বলেছেন : যে কোনো সংগত কারণে যেমন বন্যা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির কারণে পলায়নপর ব্যক্তি, যখন কোনো নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়না, অথবা আর্থিক সংকটে পতিত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যখন নিজের সংকটের প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনা। পাওনাদার তাকে পেলেই পাকড়াও করবে এবং তার কোনো ওযর আপত্তি বিশ্বাস ও গ্রহণ করবেনা, কিংবা যার মাথার উপর মৃত্যুদণ্ড ঝুলছে, কিছু দিন পালিয়ে থাকলে প্রতিপক্ষের ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার ও ক্ষমা পাওয়ার আশা পোষণ করে, এরূপ ব্যক্তির চলমান অবস্থায় ইশারায় যেদিকে চলছে, সেদিকেই নামায পড়ে নিতে পারবে।

আবদুল্লাহ বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাকে খালেদ বিন সুফিয়ানের নিকট পাঠিয়ে বললেন : "যাও, ওকে হত্যা করো।" তাকে দেখলাম। কিন্তু তখন আসরের নামায সমাগত। আমার মনে হলো, তাঁর সাথে আমার এমন কিছু ঘটার আশংকা রয়েছে। যা নামাযকে বিলম্বিত করবে। তাই আমি চলতে চলতেই ইশারায় নামায পড়তে লাগলাম এবং তাকে ধাওয়া করে ছুটতে লাগলাম। যখন তার কাছাকাছি পৌঁছলাম, সে বললো! তুমি কে? আমি বললাম : আরবের এক ব্যক্তি। আমি জানতে পেরেছি, তুমি এই ব্যক্তির জন্য জনগণকে সংঘবদ্ধ করছো। তাই আমি এ ব্যাপারে তোমার কাছে এলাম। সে বললো : আমি এই কাজেই ব্যস্ত আছি। এরপর তার সাথে কিছুক্ষণ চললাম। তারপর যখনই সুযোগ পেলাম তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলাম এবং সে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। (মারা গেলো।) – আহমদ, আবু দাউদ।

২৮. সফরের নামায

প্রবাসকালীন নামাযের জন্য কিছু বিধিমালা রয়েছে। নিচে সেগুলো উল্লেখ করছি :

১. চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে কসর (হ্রাস) করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণে বের হবে, তখন যদি আশংকা বোধ করো কাফিররা তোমাদেরকে নির্যাতন করবে, তাহলে নামাযকে সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো গুনাহ হবেনা।" আশংকার শর্ত এখানে কার্যকর নয়।

কেননা ইয়া'লা বিন উমাইয়া রা. বলেছেন : আমি উমর রা. কে বললাম : কসরের বিষয়টা ভেবে দেখেছেন? আল্লাহ তো বলেছেন : যদি তোমাদের আশংকা হয় কাফিররা তোমাদেরকে নির্যাতন করবে। এখন আর সে দিন নেই। উমর রা. বললেন : তোমার কাছে যেটা বিস্ময়কর লাগছে, তা আমার কাছেও বিস্ময়কর লেগেছিল। এটা আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলেছিলাম। তিনি বললেন : এটা একটা অনুগ্রহ, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। কাজেই তোমরা তার অনুগ্রহ গ্রহণ করো। –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। ইবনে জারীর আবু মুনীব জারশী থেকে বর্ণনা করেন! ইবনে উমর রা. কে বলা হলো! 'যখন তোমরা সফরে বের হবে .....' এই আয়াতে ভয়ের কারণে কসর করতে বলা হয়েছে। আজ তো আমরা নিরাপদ, কোনো ভয় পাইনা। তবুও

কি নামায কসর করবো? তিনি বললেন : "আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।" আয়েশা রা. বলেছেন : মক্কায় দু'রাকাত করে নামায ফরয করা হয়েছিল। পরে যখন রসূলুল্লাহ সা. মদিনায় এলেন, প্রত্যেক দু'রাকাতের সাথে দু'রাকাত বৃদ্ধি করলেন। কিন্তু মাগরিব এর ব্যতিক্রম। কেননা এটা দিনের বিতির। ফজরের নামাযেও তদ্রূপ। কারণ এ নামাযে লম্বা লম্বা কিরাত পড়া হয়। আর যখন রসূল সা. সফর করতেন, তখন মক্কায় ফরয হওয়া পূর্বের নামায় পড়তেন। আহমদ, বায়হাকি, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. মুসাফির হয়ে বেরিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে কসর করে দু'রাকাত পড়তেন। তিনি কখনো সফরে থাকাকালে চার রাকাত পূর্ণ পড়েছেন এমন প্রমাণ নেই। এ ব্যাপারে ইমামদের কেউ কোনো মতভেদও পোষণ করেননি। অবশ্য কসরের বাধ্যবাধকাতা নিয়ে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হয়েছে। আমর, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, জাবের প্রমুখের মতে কসর করা বাধ্যতামূলক। হানাফী মাযহাবের মতও তাই।

হানাফীদের মতে, চার রাকাত বিশিষ্ট ফরযে কোনো মুসাফির যদি দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদের পর বসে এবং চার রাকাত পূর্ণ করে, তবে তার নামায শুদ্ধ হবে কিন্তু মাকরূহ হবে। কেননা সালাম ফেরাতে বিলম্ব করেছে। দু'রাকাতের পরে যা পড়েছে, তা নফল হবে। আর যদি দু'রাকাতের পর না বসে, তবে তার নামায শুদ্ধ হবেনা। কেননা ওটা মুসাফিরের জন্য শেষ বৈঠক, যা ফরয। আর ফরয ছুটে গেলে নামায বাতিল হয়ে যায়।

মালেকী মাযহাবের মতে, কসর সুন্নতে মুয়াক্কাদা। জামাতের চেয়েও এর উপর তাকিদ বেশি। তাই মুসাফির যখন মুসাফির ইমাম না পায়, তখন জামাতে নামায পড়ার পরিবর্তে একাকী পড়বে। অমুসাফিরের ইমামতিতে জামাতে নামায পড়া তার জন্য মাকরূহ। হাম্বলীদের মতে, কসর বাধ্যতামূলক নয়, বরং জায়েয। তবে পুরো নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। কসর পরিমাণ দূরত্বের সফরে গেলে শাফেয়ী মাযহাবের মতও তদ্রূপ।

২. কসরের দূরত্ব

কুরআনের এ সংক্রান্ত আয়াত থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, যে কোনো সফর, চাই স্বল্প মেয়াদী হোক বা দীর্ঘ মেয়াদী হোক, তাঁর জন্য নামায কসর করতে হবে, তাতে রোযা ভংগ করা জায়েয হবে। এই অনুমতিকে শর্তযুক্ত করার কোনো প্রমাণ হাদিস থেকে পাওয়া যায়না। ইবনুল মুনযির এ বিষয়ে বিশটিরও বেশি মত উদ্ধৃত করেছেন, তন্মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ ও বায়হাকি ইয়াহিয়া বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন : আমি আনাস রা. কে নামায কসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আনাস বললেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন তিন মাইল বা তিন ফরসখ দূরত্বের সফরে যেতেন, তখন ফরয নামায কসর করে দু'রাকাত পড়তেন। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : কসরের দূরত্ব সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে সহীহ ও স্পষ্ট হাদিস। মাইল বা ফরসখ নিয়ে যে সংশয় দেখা যায়, তা নিরসন হয় আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদিসে। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন এক ফরসখ সফর করতেন। তখন নামায কসর করতেন।'

এক ফরসখে যে তিন মাইল হয় সেটা সুবিদিত। তাই আনাসের হাদিসে যে সংশয় থেকে যায়, তা আবু সাঈদের হাদিস দ্বারা দূর হয়ে যায়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, সর্বনিম্ন যে দূরত্বে রসূলুল্লাহ সা. কসর করতেন, তা ছিলো তিন মাইল। এক ফরসখ হচ্ছে ৫৫৪১ মিটার এবং

এক মাইল ১৭৪৮ মিটার। কসরের দূরত্ব সম্পর্কে সর্বনিম্ন যা হাদিসে এসেছে তা হচ্ছে এক মাইল। এটা ইবনে শায়বা ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হাযম এটা গ্রহণ করেছেন। এক মাইলের কমে কসর না করার পক্ষে প্রমাণ দর্শাতে গিয়ে তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. মৃত ব্যক্তিদের দাফনের জন্য বাকিতে এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মাঠে গিয়েছিলেন, কিন্তু কসর করেননি।

ফকীহগণ যে লম্বা সফরের শর্ত আরোপ করেন এবং কারো মতে এর সর্বনিম্ন দূরত্ব দুই দিনের পথ, কারো মতে তিন দিনের পথ, এসব কথার যথাযথ জবাব দিয়েছেন ইমাম আবুল কাসেমখারকী আল মুগনীতে। তিনি বলেন : ইমামদের অভিমতের পক্ষে আমি কোনো প্রামাণ পাইনা। কেননা সাহাবিদের মতামতই পরস্পর বিরোধী এবং মতভেদে পরিপূর্ণ। এই বিরোধ ও মতভেদের কারণে তা কারো পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ বহন করেনা। আমাদের ইমামগণ যে প্রমাণ দর্শিয়েছেন, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস থেকে তার বিপরীত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তারপর যদি তাও না পাওয়া যেতো, তাহলে রসূল রা. এর কাজ ও কথার উপস্থিতিতে যখন প্রমাণিত হয়নি, তখন তারা দূরত্বের যে পরিমাণ উল্লেখ করেছেন, তা বিবেচনায় আনার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেছে। এর কারণ দুটোর প্রথমত: রসূল সা. এর অনুসৃত যে সুন্নত আমরা বর্ণনা করেছি এটা তারও পরিপন্থী, কুরআনের আয়াতেরও সুস্পষ্ট ভাষ্যের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি সফরে বের হবে কুরআনে তার জন্যই কসরের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন : "যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণে বের হবে। তখন নামাযে কসর করাতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবেনা।" ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদিস দ্বারা কাফিরদের নির্যাতনের ভয়ের শর্ত রহিত হয়ে গেছে। এরপর আয়াতের বাহ্যিক ভাষা যে কোনো সফরকেই এর আওতাভুক্ত করে। আর রসূল সা. এর উক্তি "মুসাফির তিন দিন পর্যন্ত মসেহ করতে পারবে।" এ বক্তব্য শুধুমাত্র মসেহের মেয়াদ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে। কাজেই এ দ্বারা এ ক্ষেত্রে প্রমাণ দর্শানো গ্রহণযোগ্য নয়। আর যেহেতু ছোট খাট দূরত্ব তিন দিনে অতিক্রম করা সম্ভব এবং রসূল সা. একে সফর নামে আখ্যায়িত করেছেন তাই তিনি বলেছেন : কোনো মহিলা যদি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, তবে তার জন্য এক দিনের পথ সফর করা কোনো মুহরিম ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে ছাড়া বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত: কসরের যে দূরত্ব নির্ণিত হয়েছে সেটা অহিভিত্তিক ও অহিনির্ভর। তাই শুধুমাত্র মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা গবেষণা ও মতামতের ভিত্তিতে কোনো কিছুকে এর আওতায় আনা ঠিক হবেনা। বিশেষত এর যখন এমন কোনো মূলনীতি নেই, যার অধীনে একে আনা যায়। এমন কোনো নজীর নেই, যার উপর কোনো কিছুকে কিয়াস করা যায়। আর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে তাদের পক্ষে, যারা প্রত্যেক মুসাফিরের জন্য কসরের অনুমতি দেয়। একমাত্র এর বিপক্ষে ঐকমত্য থাকলেই এই অনুমতি রদ হতে পারে। এই সফর বিমানে হোক, রেলে হোক, কিংবা ধর্মীয় সফর হোক, বা অন্য ধরনের হোক, সব সফরের বেলায়ই কসর প্রযোজ্য। আর যাদের পেশাই এমন যে, সব সময় সফরের উপর থাকার দাবি জানায়, যেমন- নৌযানের চালক ও কর্মচারি ইত্যাদি, তাদের জন্য কসর ও রোযার বিরতি অনুমোদনযোগ্য। কেননা তারা যথার্থ মুসাফির।

৩. কোথা থেকে কসর শুরু করবে?

অধিকাংশ আলেমের মতে, নিজ বাসস্থান ত্যাগ ও নিজের আবাসিক শহর থেকে বের হওয়ার সময় থেকেই নামাযের কসর অনুমোদনযোগ্য এবং এটা শর্তও বটে। আর প্রত্যাবর্তনকালে নিজ শহরের প্রথম বাড়িতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পূর্ণ নামায পড়বেনা। ইবনুল মুনযির বলেছেন : মদিনা থেকে বের হয়েই রসূল সা. কসর করতেন। কোনো সফরে এর ব্যতিক্রম করেছেন

বলে আমার জানা নেই। আনাস বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে যোহরের নামায মদিনায় চার রাকাত আর যুল হুলায়ফায় দু'রাকাত পড়তাম। সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। কেউ কেউ মনে করেন, যে ব্যক্তি সফরের নিয়ত করেছে সে নিজের বাড়িতে থাকলেও কসর করবে।

৪. মুসাফির কখন পূর্ণ নামায পড়বে

মুসাফির যতোক্ষণ সফরে থাকবে ততোক্ষণ নামায কসর করবে। কোনো প্রয়োজনে যদি কোথাও উক্ত প্রয়োজন পূরণের অপেক্ষায় বসবাস করতে শুরু করে তাহলেও কসর করতে থাকবে। কেননা বহু বছর বসবাস করলেও সে প্রবাসী বলেই বিবেচিত হয়। সে যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বসবাসের নিয়ত করে, তাহলে ইবনুল কাইয়েমের মতে, সে যতোক্ষণ তার বসবাসের জায়গাকে স্থায়ী বসবাসের জায়াগা হিসেবে গ্রহণ না করবে ততোক্ষণ তার বসবাস দীর্ঘস্থায়ী হোক বা ক্ষণস্থায়ী হোক, সে মুসাফির হিসেবেই গণ্য হবে। এ ব্যাপারে আলেমদের বহু মত রয়েছে যার সংক্ষিপ্ত সার ইবনুল কাইয়েম উল্লেখ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. তবুকে বিশ দিন অবস্থান করেন এবং তার উম্মতকে বলেননি যে, তারা এর চেয়ে বেশি দিন কোথাও অবস্থান করলে কসর করবেনা। তবে এই মেয়াদটা তার থাকা হয়েছিল কাকতালীয়ভাবে।" সফরের মধ্যে এরূপ অবস্থান সফরকে স্থায়ী আবাসনে পরিণত করেনা, চাই এ অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হোক বা ক্ষণস্থায়ী হোক। তবে শর্ত এই যে, মুসাফির যেনো ঐ জায়গার স্থায়ী বসবাসকারী হবার বা নাগরিক হবার নিয়ত না করে। এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ হয়েছে।

সহীহ বুখারিতে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. তার কোনো একটি সফরে উনিশ দিন অবস্থান করেছেন এবং এই সময়ে তিনি দু'রাকাত করে নামায পড়েছেন। কাজেই আমরা যখন কোথাও উনিশ দিন থাকবো, দু'রাকাত পড়বো। আর এর চেয়ে বেশি থাকলে পুরো নামায পড়বো। ইমাম আহমদ বলেন : ইবনে আব্বাস এ দ্বারা মক্কা বিজয়ের সময়ে তার মক্কায় অবস্থানের মেয়াদ কাল বুঝিয়েছেন। কেননা তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ে সময় মক্কায় আঠারো দিন ছিলেন। তিনি তখন হুনাইনও জয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সেটা তখন হয়নি। তারপর তিনি অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। এটা হলো তার অবস্থান, যা ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। অন্যেরা বলেছেন রসূল সা. তবুকে বিশ দিন ছিলেন এবং এ সময় কসর পড়েছেন। -আহমদ। মিসওয়ার বিন মাখরমা বলেছেন : আমরা সিরিয়ার কোনো এক গ্রামে সা'দের সাথে চল্লিশ দিন ছিলাম, সা'দ তখন কসর পড়তেন, কিন্তু আমরা পুরো নামায পড়তাম। নাফে বলেছেন : ইবনে উমর আযরা বাইজানে ছয় মাস ছিলেন। এ সময় তিনি দু'রাকাত পড়তেন। কিন্তু তুষার পাতের কারণে তিনি সেখানে প্রবেশ করতে পারেননি। আর হাফস বলেছেন : আনাস সিরিয়ায় মুসাফিরের ন্যায় নামায পড়ে দু'বছর অবস্থান করেছেন। আনাস বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবিগণ হরমুয জলাশয়ে সাত মাস অবস্থান করেছেন এবং পুরো সময়টা কসর পড়েছেন। হাসান বলেছেন : আমি আবদুর রহমানের সাথে পুরো দু'বছর প্রবাসে অবস্থান করেছি, তিনি কসর পড়তেন এবং জুমা পড়তেননা। ইবরাহীম বলেছেন : তারা রায়তে পুরো বছর এবং তার বেশিও থাকতেন আর সিজিস্তানে দু'বছরও থাকতেন এবং কসর করতেন। এই হচ্ছে রসূলুল্লাহ সা. ও তার সাহাবিদের দৃষ্টান্ত এবং এটাই সঠিক। পক্ষান্তরে বিভিন্ন মাযহাবের খোঁজ নিলে দেখা যায়, ইমাম আহমদ চার দিনের অবস্থানের নিয়ত করা হলে পুরো নামায আর তার চেয়ে কম অবস্থান করলে কসর পড়ার রায় দিয়েছেন। আর উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, রসূল সা. ও

তার সাহাবিগণ সুনিশ্চিতভাবে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেননি। বরং তারা আজ যাবো, কাল যাবো করতে করতে দীর্ঘদিন থেকে যেতেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, যা কারো অজানা নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ সা. মক্কা জয় করলেন। এ ঘটনার তাৎপর্য সুবিদিত। তিনি সেখানে ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও শিরককে উচ্ছেদ করার জন্যই অবস্থান করেন। তিনি তার আশপাশের আরবদের মধ্যে ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। সবাই জানে এ কাজ এক বা দু'দিনে হতে পারেনা। দীর্ঘ দিন প্রয়োজন। তবুকে তাঁর অবস্থানও তদ্রূপ। তিনি সেখানে শত্রুর প্রতীক্ষায় অবস্থান করেছিলেন। আর এটা সুনিশ্চিতভাবে জানা ছিলো যে, তার ও তার শত্রুদের মাঝে ফয়সালা হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিলো। তিনি জানতেন যে, তারা চার দিনেই তার সাথে একমত হয়ে যাবেনা। তদ্রূপ ইবনে উমর আযরা বাইজানে যে ছয় মাস অবস্থান করলেন এবং তুষার পাতের কারণে কসর পড়ে পথে কাটালেন। এ ধরনের তুষার যে চার দিনে গলে গিয়ে রাস্তা সুগম করে দেয়না তা সুবিদিত। আনাসের সিরিয়ায় দু'বছর এবং সাহাবিদের হরমুয জলাশয়ে ছয়মাস কসর পড়ে কাটিয়ে দেয়াও তদ্রূপ। জানা কথা যে, এ ধরনের জিহাদ ও অবরোধ চার দিনে শেষ হয়না। ইমাম আহমদের শিষ্যগণ বলেছেন যে, কোথাও শত্রুর সাথে লড়াই শাসকের অবরোধ বা রোগব্যাধির দরুন অবস্থান করলে কসর পড়বে, চাই অল্প দিনে বা দীর্ঘ দিনে এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে বলে দৃঢ় ধারণা জন্মুক বা না জন্মুক। তবে তারা এ জন্য এমন একটা শর্ত আরোপ করেছেন যার কোনো প্রমাণ কুরআন হাদিস ইজমা বা সাহাবিদের কার্যকলাপ থেকে পাওয়া যায়না। তাদের এই শর্তটি হলো, চার দিনের কম সময়ের মধ্যে প্রয়োজন মেটার সম্ভাবনা থাকা চাই। তাদের নিকট জিজ্ঞাসা হলো, আপনারা এই শর্ত কোথা থেকে পেলেন? রসূলুল্লাহ সা. যখন মক্কা ও তবুকে চার দিনের অনেক বেশি সময় কসর পড়ে অবস্থান করলেন, তখন তো তিনি কাউকে কিছু বললেননা। তিনি তো জানালেননা যে, তিনি চার দিনের বেশি অবস্থান করার ইচ্ছা করেননি। অথচ তিনি জানতেন যে, মুসলমানরা তাঁকেই অনুসরণ করে নামায পড়বে এবং তাঁর অবস্থানকালে নামায কসর করার ব্যাপারে তারই পদাংক অনুসরণ করবে। তথাপি তিনি তাদেরকে একটা কথাও বললেন না। তিনি বললেননা যে, তোমরা চারদিনের বেশি অবস্থান করলে কসর করোনা। অথচ এটা স্পষ্ট করে বলা খুবই জরুরি ছিলো। পরবর্তীকালে সাহাবিগণও তাঁর পদাংক অনুসরণ করেছেন। তাদের সাথে যারা নামায পড়েছে তাদেরকে তারা কিছুই বলেননি।

মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন : যখন চার দিনের বেশি অবস্থানের নিয়ত করবে, তখন পুরো নামায পড়বে। আর তার চেয়ে কম থাকার নিয়ত করলে কসর করবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন : পনেরো দিন থাকার নিয়ত করলে পুরো নামায আর তার চেয়ে কম থাকার নিয়ত করলে কসর পড়বে। এটা লাইস বিন সা'দেরও মত। উমর, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস এ তিনজন সাহাবির মতও এরূপ বলে জানা গেছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেছেন : যখন চার দিন থাকবে তখন চার রাকাত পড়ো। অন্য রেওয়ায়েতে জানা যায়। তিনি আবু হানিফার মতো মত ব্যক্ত বরেছেন। আলী রা. বলেছেন : দশ দিন অবস্থান করলে পুরো নামায পড়তে হবে। এটা ইবনে আব্বাস থেকেও একটা রেওয়ায়েত বলে জানা যায়। হাসান বলেছেন : যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো নগরে না পৌছবে ততোক্ষণ কসর পড়বে। আয়েশা রা. বলেছেন : যতোক্ষণ পর্যন্ত তার পাথেয় ফুরিয়ে না যাবে এবং গন্তব্য হারিয়ে না ফেলবে ততোক্ষণ কসর পড়বে। একটি বিষয়ে চার ইমাম একমত। সেটি হলো যখন কোনো প্রয়োজনে কোথাও অবস্থান করবে এবং প্রয়োজন পূরণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, আর আজ যাই, কাল যাই করে

অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত থাকতে হবে, তখন অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্তই কসর পড়বে। তবে একটি বর্ণনা অনুযায়ী শাফেয়ী ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন : সতেরো কি আঠারো দিন পর্যন্ত কসর করা চলবে, তারপর আর নয়। ইবনুল মুনযির বলেছেন : মুসাফির যতোক্ষণ অবস্থানের মেয়াদের ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে ততোক্ষণ কসর পড়বে, চাই তাতে বছরের পর বছর লাগুক।

৫. সফরে নফল নামায পড়া

অধিকাংশ আলেমের মতে, সফরে কসর নামায আদায়কারীর জন্য নফল পড়া মাকরূহ নয়- চাই তা নিয়মিত সুন্নত নামায হোক বা অন্য কিছু।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. উম্মে হানীর বাড়িতে মক্কা বিজয়ের দিন গোসল করলেন এবং আট রাকাত নামায পড়লেন। ইবনে উমর বাহনের পিঠে বসে মাথা দিয়ে ইশারা করেও নফল নামায পড়তেন। হাসান বলেন : রসূল সা. এর সাহাবিগণ সফরে ফরয নামাযের আগে ও পরে নফল পড়তেন। ইবনে উমর রা. প্রমুখ মনে করেন, গভীর রাতে ব্যতিত ফরয নামাযের আগে বা পরে নফল নামায পড়া অনুমোদনযোগ্য নয়। কিছু লোককে তিনি নফল পড়তে দেখে বললেন : আমি যদি নফল পড়তাম, তাহলে কসর না পড়ে পুরো নামায পড়তাম। হে আমার ভাতিজা, আমি রসূল সা. এর সাথে থেকেছি। তিনি দু' রাকাতের বেশি মৃত্যু পর্যন্তও পড়েননি (অর্থাৎ সফরে)। আবু বকরের সাথেও চলেছি। তিনিও দু'রাকাতের বেশি পড়েননি। আর উমর ও উসমানের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন : তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। -বুখারি।

ইবনে কুদামা হাসান ও ইবনে উমরের বক্তব্যের সমন্বয় করে বলেছেন : হাসানের বক্তব্য প্রমাণ করে নফল পড়লে ক্ষতি নেই। আর ইবনে উমরের বক্তব্য প্রমাণ করে, নফল বর্জন করাতে ক্ষতি নেই।

৬. জুমার দিনে সফর

নামাযের সময় সমাগত হয়ে যাওয়া ছাড়া জুমার দিনে সফরে কোনো দোষ নেই। উমর রা. এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : জুমার দিন না হলে আমি বের হতাম। উমর রা. তৎক্ষণাত তাকে বললেন : তুমি বের হও। জুমা কাউকে সফর থেকে নিবৃত্ত করেনা। আবু উবায়দা জুমার দিন সফর করলেন। নামাযের অপেক্ষা করেননি। যুহরী দুপুরের প্রাক্কালে সফরের ইচ্ছা করলেন। তাকে যখন বলা হলো, আজ তো শক্রবার। তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ সা. শুক্রবারে সফর করতেন।

২৯. দুই নামায একত্রে পড়া

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহের যে কোনো একটিতে যোহর ও আসর এক সাথে যোহর বা আসরের সময়ে এবং মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে মাগরিব বা এশার সময়ে পড়া জায়েয। (তবে যোহর, আসর ও মাগরিব এশা ব্যতিত আর কোনো নামায সর্বসম্মতভাবে এক সাথে পড়া জায়েয নেই)।

১. আরাফা ও মুযদালিফায়

আলেমগণ একমত যে, আরাফায় যোহরের সময় যোহর ও আসরের নামায এক সাথে পড়া এবং মুযদালিফায় এশার সময় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া সুন্নত। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এ রকম করেছেন।

২. সফরে

উল্লিখিত দুই নামাযের যে কোনো একটির ওয়াক্তে দুই নামাযকে একত্রে পড়া সফরের সময়ে অধিকাংশ আলেমের মতে জায়েয- চাই চলমান অবস্থায় হোক বা যাত্রাবিরতি করার সময়ে হোক।

মুয়ায রা. বলেন : রসূল সা. তবুক অভিযানে থাকালে রওনা হবার আগে সূর্য বিবর্ণ হয়ে গেলে তিনি যোহর ও আসর একত্রে পড়েছেন। আর সূর্য বিবর্ণ হবার আগে রওনা হলে আসরের জন্য যাত্রাবিরতি করা পর্যন্ত যোহর বিলম্বিত করতেন। মাগরিবেও তেমন করতেন। রওনা হবার আগে সূর্য ডুবলে মাগরিব ও এশাকে একত্রিত করতেন। আর যখন সূর্যাস্তের আগে রওনা হতেন, তখন এশার জন্য যাত্রাবিরতি করা পর্যন্ত মাগরিবকে বিলম্বিত করতেন। তারপর যাত্রাবিরতি করতেন ও দুই নামায একত্রে পড়তেন। আবু দাউদ, তিরমিযি।

কুরাইব বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বললেন : রসূলুল্লাহ্ সা. সফরে কিভাবে নামায পড়তেন তা কি তোমাদেরকে জানাবোনা? আমরা বললাম : বলুন! তিনি বললেন : যাত্রা করার আগে যখন তাঁর বিরতির স্থানে সূর্য বিবর্ণ হয়ে যেতো তখন যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন। আর বিরতির স্থানে সূর্য বিবর্ণ না হলে রওনা হয়ে যেতেন। যখন আসরের সময় সমাগত হতো, তখন যাত্রাবিরতি করতেন এবং যোহর ও আসর একত্রে পড়তেন। আর যখন বিরতি স্থলে মাগরিব হয়ে যেতো তখন মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন। আর মাগরিব সমাগত না হলে রওনা হতেন এবং এশার সময়ে যাত্রাবিরতি করতেন ও মাগরিব এশা একত্রে পড়তেন। আহমদ ও শাফেয়ী এই মতেরই পক্ষে। শাফেয়ী বলেছেন : আর যখন সূর্য বিবর্ণ হবার আগে সফরে বের হতেন, তখন যোহরকে বিলম্বিত করে আসরের সাথে একত্রে পড়তেন। -বায়হাকি। তিনি আরো বলেছেন : সফরের কারণে দুই নামায একত্রে পড়া সাহাবা ও তাবেয়ীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো।

মালেক মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. একদিন তবুকে নামাযকে বিলম্বিত করলেন। তারপর তিনি বের হলেন এবং যোহর ও আসর একত্রে পড়লেন। তারপর আবার প্রবেশ করলেন। পুনরায় বের হলেন। তারপর মাগরিব ও এশা একত্রে পড়লেন। শাফেয়ী বলেছেন : আবার প্রবেশ করলেন, পুনরায় বের হলেন এ কথাটা শুধু বিরতিকালেই প্রযোজ্য। ইবনে কুদামা আল মুগনীতে এ হাদিস উল্লেখ করার পর বলেছেন : ইবনে আবদুল বার এ হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সীরাত লেখকগণ বলেছেন : তবুক অভিযানের ঘটনা ঘটেছিল নবম হিজরীতে। যারা বলেন : দুই নামায একত্রে পড়া কেবল তখনই জায়েয যখন কেউ সফর করতে করতে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে যায়, তাদের বিরুদ্ধে এ হাদিস অকাট্য প্রমাণ। কেননা রসূল সা. যাত্রাবিরতি কালেই একত্রে দুই নামায পড়তেন। তিনি তখন চলমান থাকতেন না। তাঁবুতে অবস্থান করতেন। সেখান থেকে বাইরে এসে দুই নামায একত্রে পড়তেন, তারপর তাঁবুতে চলে যেতেন। মুসলিম এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন : তিনি যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন। এ হাদিসটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে দুই নামায একত্রে পড়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। এ হাদিস দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট। এর বিরোধী কোনো হাদিস নেই। যেহেতু একত্রে দুই নামায পড়া সফরের একটা সুবিধা, তাই তা চলমান অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট নয়, যেমন কসর ও মসেহ চলমান অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট নয়। তবে বিলম্বিত করা উত্তম।

একত্রে দুই নামায পড়ার ও কসরে নিয়ত শর্ত নয়। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : এটা অধিকাংশ

আলেমের মত। রসূল সা. যখন তার সাহাবিদেরকে নিয়ে দুই নামায একত্রে পড়তেন, তখন তাদের কাউকে একত্রে পড়া ও কসর করার জন্য নিয়ত করার আদেশ দিতেননা। বরং মদিনা থেকে মক্কায় রওনা হয়ে যেতেন। পথিমধ্যে কসর পড়তেন। কোনো নামায একত্রিত করতেননা। তারপর আরাফায় যোহর পড়াতেন এবং কাউকে জানাতেননা যে, তিনি তারপর আসর পড়তে ইচ্ছুক। তারপর তিনি আসর পড়লেন। অথচ তারা একত্রে দুই নামাযের নিয়ত করেনি। এটা হলো আগের ওয়াক্তে একত্রিত করার উদাহরণ। অনুরূপ যখন তিনি মদিনা থেকে বের হতেন, তখন যুল হুলায়ফাতে আসরের নামায দু'রাকাত পড়াতেন। তাদেরকে কসরের নিয়ত করার আদেশ দিতেননা। দুই নামাযকে ধারাবাহিকভাবে একত্রিত করা সম্পর্কে বলেন : এখানে নিয়ত কোনো অবস্থাতেই শর্ত নয়। প্রথম নামাযের বেলায়ও নয়। দ্বিতীয় নামাযের বেলায়ও নয়। বস্তুত এর জন্য শরিয়তে কোনো নির্দিষ্ট সীমা বা বাধ্যবাধকতা নেই। যেহেতু এ ধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে তা নমনীয়তার উদ্দেশ্য নষ্ট করে দেয়। শাফেয়ী বলেছেন, কেউ যদি মাগরিব নিজের বাড়িতে একত্রে পড়ার নিয়তে পড়ে, তারপর মসজিদে গিয়ে এশা পড়ে, তবে তা বৈধ হবে। আহমদ থেকেও এরূপ বর্ণিত।

৩. বৃষ্টি-বাদলার সময়

আছরাম আবু সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : বৃষ্টির দিনে মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়া সুন্নত। আর বুখারি বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বৃষ্টির রাতে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়েছেন।

এ ব্যাপারে মাযহাবের মতামত সংক্ষেপে এরূপ : শাফেয়ী মাযহাব নিজ আবাসে বসবাসকারীর (মুকীম) জন্য যোহর ও আসরকে একত্রে এবং মাগরিব ও এশাকে একত্রে পূর্ববর্তী ওয়াক্তে আদায় করা বৈধ বলে রায় দিয়েছে। তবে শর্ত হলো, দুই নামাযের প্রথমটির তাকবীরে তাহরীমার সময়, প্রথম নামাযের সমাপ্তির সময়ে ও দ্বিতীয় নামায শুরুর সময়ে বৃষ্টি থাকা চাই।

মালেকী মাযহাবের মত হলো, বৃষ্টি চলছে বা বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা বাইরে কাদা ও ঘোর অন্ধকার বিরাজ করছে- এমন পরিস্থিতিতে মসজিদে বসে মাগরিব ও এশা একত্রে প্রথম ওয়াক্তে পড়া বৈধ। কাদা এতো বেশি পরিমাণে হওয়া চাই যে মধ্যম শ্রেণীর মানুষের জুতা পরে মসজিদে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বৃষ্টির জন্য যোহর ও আসরের নামায একত্রিত করা মাকরূহ।

আর হাম্বলী মাযহাবের মত হলো, শুধুমাত্র মাগরিব ও এশাকে একত্রিত করা বৈধ, চাই তা প্রথম ওয়াক্তের সাথে পড়ুক বা পরবর্তী ওয়াক্তের সাথে পড়ুক এবং বরফ, তুষার, কাদা, প্রবল বৃষ্টি ও কাপড় ভিজিয়ে দেয়া বৃষ্টি- যে কারণেই হোক। আর এই সুযোগ শুধু সেই ব্যক্তির জন্য, যে দূর থেকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে ইচ্ছুক এবং পথিমধ্যে বৃষ্টিতে কষ্ট পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি মসজিদে অবস্থান করছে অথবা নিজ বাড়িতে জামাতে পড়ে অথবা কোনো জিনিসের আড়ালে (ছাতা ইত্যাদি) মসজিদে যায় অথবা মসজিদ তার ঘরের নিকটে অবস্থিত, তার পক্ষে দুই নামায একত্রিত করা বৈধ নয়।

৪. রোগ বা ওযরের কারণে

ইমাম আহমদ, কাজী হোসাইন, খাত্তাবী এবং শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ মনে করেন, রোগজনিত ওযরে দুই নামাযকে আগে বা পিছে একত্রিত করা বৈধ। কেননা এ ক্ষেত্রে বৃষ্টির চেয়েও বেশি কষ্ট হয়ে থাকে। নববীর মতে প্রমাণের দিক দিয়ে এ মতটি শক্তিশালী। আর আল-মুগনীতে রয়েছে : একাধিক নামাযকে একত্রিত করার বৈধতা কেবল এমন রোগেই

নিশ্চিত, যে রোগে নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া কষ্টকর ও দু:সাধ্য হয়। আর হাম্বলিরা নমনীয়তা ও প্রশস্ততার নীতি অবলম্বন করেছেন। তারা বিভিন্ন রকমের ওযরে ও ভয় ভীতিতে আগে বা পেছনে একাধিক নামাযকে একত্রিত করার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন, যে ধাত্রীর প্রত্যেক নামাযে কাপড় ধোয়া কষ্টকর তার জন্য, মুস্তাহাযার জন্য (যে মহিলার মাসিক স্রাব সর্বোচ্চ মেয়াদের চেয়ে বেশি হয় ও সর্বনিম্ন মেয়াদের চেয়ে কম হয়), যার পেশাব অবিরত ধারায় টপকাতে থাকে, যার প্রতি ওয়াক্তে পবিত্রতা অর্জন করা অসম্ভব, যার জান মাল বা সম্পদহানির আশংকা থাকে এবং যে কয়েক ওয়াক্ত একত্রিত না করলে তার জীবিকা উপার্জনে ক্ষতির আশংকা থাকে, তাদের জন্য একাধিক নামায একত্রিত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : একত্রিকরণে সবচেয়ে নমনীয় মাযহাব হলো হাম্বলী মাযহাব। তারা কর্মব্যস্ততার কারণেও একত্রিতকরণের অনুমতি দিয়েছেন। নাসায়ী এই মর্মে একটি হাদিস রসূল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, বাবুর্চি এবং অনুরূপ এমন পেশাদারের জন্য একত্রিকরণ বৈধ, যে তার দ্রব্যসামগ্রি নষ্ট হওয়ার আশংকা করে।

৫. সাধারণ প্রয়োজনে দুই নামাযকে একত্রে আদায় করা

নববী মুসলিমের টিকায় বলেছেন : ইমামদের একটি দল এই মত পোষণ করেন, নিজ আবাসস্থলে অবস্থানকালে প্রয়োজনবোধে কেউ যদি একাধিক নামাযকে একত্রিত করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তা তার জন্য জায়েয। এটা ইবনে সিরীনেরও মত। ইমাম মালেকের শিষ্যদের মধ্য থেকে আশহাবও এই মত পোষণ করেন। খাত্তাবী, শাফেয়ীর শিষ্যদের মধ্য থেকে কাফফাল ও শাশী, আবু ইসহাক এবং আহলুল হাদিসের একটি দল এ মত পোষণ করেন। ইবনুল মুন্যিরও এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনে আব্বাসের একটি উক্তির বাহ্যিক ভাষ্য থেকেও এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। সেটি হলো তার থেকে মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের শেষাংশ : "তিনি চেয়েছেন যেনো তাঁর উম্মতের জন্য সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয়, তাই রোগ বা বৃষ্টিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেননি।" হাদিসটি হলো :

রসূলুল্লাহ সা. মদিনায় বসে কোনো বৃষ্টি বা ভীতির কারণ ছাড়াই একত্রে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা একত্রে পড়েছেন। ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো : এ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিলো? তিনি বললেন : যেনো তার উম্মতের জন্য সংকীর্ণতা বা অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস রা. থেকে আরো বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. মদিনায় যোহর ও আসর আট রাকাত এবং মাগরিব ও এশা সাত রাকাত একত্রে পড়েছেন। অর্থাৎ যোহর ও আসর এই আট রাকাত এক সময়ে এবং মাগরিব ও এশা এই সাত রাকাত এক সময়ে একত্রে পড়েছেন। মুসলিমে আবদুল্লাহ বিন শাকীক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : একদিন আসরের পর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। ভাষণটি এতো দীর্ঘ হলো যে, সূর্য ডুবে গেলো, নক্ষত্রসমূহ দেখা যেতে লাগলো এবং লোকেরা বলতে লাগলো : নামায, নামায। এই সময় বনু তাইম গোত্রের এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে এলো এবং অবিরতভাবে ও ধৈর্যহীনভাবে বলতে লাগলো : নামায, নামায। ইবনে আব্বাস বললেন : তুমি আমাকে সুন্নত শিখাচ্ছ নাকি? তারপর বললেন : আমি রসূল সা. কে যোহর ও আসর এক সাথে এবং মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়তে দেখেছি। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বললেন : ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনে একটু খটকা লাগলো। তাই আমি আবু হুরায়রার কাছে এলাম। তিনি ইবনে আব্বাসের বক্তব্য সমর্থন করলেন।

আল-মুগনীতে বলা হয়েছে : দুই নামাযকে প্রথম নামাযের ওয়াক্তে একত্রে আদায় করার পর দ্বিতীয় নামাযের সময় আসার আগে ওযর দূরীভূত হলে দ্বিতীয় নামায তার নির্ধারিত সময়ে পুনরায় পড়ার প্রয়োজন হবেনা। কেননা নামায বিশুদ্ধভাবেই আদায় হয়েছে এবং তার দায়িত্ব থেকে সে অব্যাহতি পেয়েছে। তার ওপরে উক্ত নামাযের যে দায়িত্ব ছিলো তা সে পালন করেছে। তাই পুনরায় তা পড়তে হবেনা। তাছাড়া যেহেতু সে দুই নামাযকে যখন একত্রে আদায় করেছিল তখন তার ওযর বহাল ছিলো। কাজেই সেই ওযর চলে যাওয়ার কারণে আদায় করলে ফরয বাতিল হবেনা। যেমন তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পরে পানি পাওয়া গেলে নামায দোহরাতে হয়না।

৩০. নৌকায়, ট্রেনে ও উড়োজাহাজে নামায পড়া

নৌকায়, ট্রেনে ও বিমানে নামায পড়া সম্পূর্ণ বৈধ। যেভাবেই পড়া সম্ভব হয় পড়বে, মাকরূহ হবেনা। ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কে নৌকায় নামায পড়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকলে নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। -দার কুতনি ও হাকেম। আর আবদুল্লাহ ইবনে আবি উতবা বলেছেন : আমি জাবের, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রার রা. সাথে নৌকায় সফর করেছি। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে জামাতে নামায পড়েছেন। তাদের একজন ইমামতি করেছেন যদিও তারা তীরে নামায পড়তে সক্ষম ছিলেন। -সাঈদ বিন মানসুর।

৩১. সফরের দোয়া :

বাড়ি থেকে সফরে বের হবার সময় এই দোয়া পড়া মুস্তাহাব :

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (রওয়ানা করলাম), আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। হে আল্লাহ, তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যেনো আমি বিপথগামী না হই এবং কেউ আমাকে বিপথগামী না করে। যেনো আমি পদস্খলিত না হই এবং কেউ আমার পদস্খলন না ঘটায়। যেনো আমি কারো উপর যুলুম না করি এবং কেউ আমার উপর যুলুম না করে, আমি কারো সাথে খারাপ আচরণ না করি এবং আমার সাথে কেউ খারাপ আচরণ না করে।"

এরপর কুরআন ও হাদিস থেকে যে কোনো দোয়া বেছে নিয়ে পড়া যেতে পারে। এ ধরনের কয়েকটি দোয়া নিম্নে দেয়া হলো :

১. আলী বিন রবীয়া বলেন : আমি আলী রা. কে দেখলাম, একটা জন্তু তাঁর কাছে আনা হলো তাঁর আরোহণের জন্য। যখন তিনি লাগামে পা রাখলেন, বললেন : 'বিসমিল্লাহ।' তারপর জন্তুটির ওপরে আরোহণ করে বললেন :

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ : যিনি এই বাহনটি আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা তাকে অনুগত করতে পারতামনা, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো।" অতপর তিনবার আল হামদু লিল্লাহ ও তিনবার আল্লাহু আকবার বললেন। তারপর বললেন : "সুবহানাকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা কাদ যলামতু নাফসী ফাগফির

লী, ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আন্তা।" তারপর আলী রা. হাসলেন। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন, হাসলেন কেন? তিনি বললেন : আমি যেরূপ করলাম, রসূল সা.কে তদ্রূপ করতে দেখেছি, তারপর তাঁকে হাসতে দেখেছি। বললাম : হে রসূলুল্লাহ, হাসলেন কেন? তিনি বললেন : বান্দা যখন বলে : হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ মুগ্ধ হন এবং বলেন : আমার বান্দা জেনে নিয়েছে, আমি ছাড়া কেউ তার গুনাহ মাফ করতে পারেনা।" আহমদ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম।

২. আযদি থেকে বর্ণিত : ইবনে উমর রা. তাকে শিখিয়েছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন সফরের জন্য বের হয়ে তাঁর উটের উপর আরোহণ করতেন, তখন তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন, তারপর বলতেন :

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

অর্থ : পবিত্র তিনি, যিনি এই বাহনটি আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, নতুবা একে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতামনা। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে সততা, সতর্কতা ও খোদাভীতি চাই। আর যে কাজে তুমি সন্তুষ্ট হও তা চাই। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এই সফর সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ, সফরে তুমি আমাদের সাথি, আর আমাদের পরিবারে ও ধন সম্পদে তুমি আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট, মন্দ প্রত্যাবর্তন এবং আমার পরিবার ও সম্পদের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

আর তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন বলতেন-

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

অর্থ : তওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী হয়ে ফিরে এলাম।" - আহমদ, মুসলিম।

৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন বলতেন :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الضُّبْنَةِ فِي السَّفَرِ وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ، اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ.

অর্থ : হে আল্লাহ, তুমি আমাদের সফরের সাথি। আমাদের পরিবারে আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ, সফরে এমন লোকদের সাহচর্য থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যাদের দ্বারা আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়না এবং প্রত্যাবর্তনের সময় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, দূরত্বকে আমাদের জন্য সংকুচিত করে দাও এবং আমাদের জন্য সফরকে সহজ করে দাও।" আর যখন ফিরে আসার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন : "তওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী হয়ে ফিরলাম।" আর যখন নিজ পরিবারের কাছে উপস্থিত হতেন, তখন বলতেন :

“তওবা করলাম, তওবা করলাম, আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করলাম, আমাদের নিকট কোনো পাপ যেনো আসতে না পারে।”- আহমদ, তাবরানী, বাযায।

৪. আবদুল্লাহ বিন সারজাস বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখনই কোনো সফরে বের হতেন, বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ .

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট দুর্গম পথ যাত্রা থেকে, প্রত্যাবর্তনের দু:খ দুর্দশা থেকে, বিশুদ্ধতার পর বিকৃতি থেকে, মযলুমের বদ দোয়া থেকে এবং সম্পদে ও পরিবারে খারাপ অবস্থা থেকে তোমার আশ্রয় চাই।” আর যখন ফিরে আসতেন তখনো অনুরূপ বলতেন। কেবল শেষ কথাটিতে “সম্পদে ও পরিবারে” না বলে প্রথমে পরিবারের উল্লেখ করে বলতেন : “পরিবারে ও সম্পদে।” - আহমদ, মুসলিম।

৫. ইবনে উমর রা. বলেন : রসূল সা. যখন কোনো অভিযানে বা সফরে বের হতেন এবং তারপর রাত উপস্থিত হতো, তখন বলতেন :

يَا أَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ .

অর্থ : হে পৃথিবী, আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই তোমার ক্ষতি থেকে, তোমার মধ্যে যা কিছু আছে তার ক্ষতি থেকে, তোমার মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তার ক্ষতি থেকে, তোমার উপর যা কিছু চলাফেরা করে তার ক্ষতি থেকে, সকল সিংহ, অজগর, সাপ ও বিচ্ছু থেকে, নগরবাসীর অকল্যাণ থেকে এবং প্রত্যেক পিতা ও তার সন্তানের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। - আহমদ, আবু দাউদ।

৬. খাওলা বিনতে হাকীম রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোথাও যাত্রাবিরতি করলো ও বললো : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

অর্থ : আমি আল্লাহর স্বয়ং সম্পূর্ণ বাণীসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর ক্ষতি থেকে”। সে উক্ত স্থান থেকে রওনা হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবেনা। - বুখারি ও আবু দাউদ ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

৭. আতা বিন আবু মারওয়ান বলেন, কাব তাকে মূসার জন্য যিনি সমুদ্র বিদীর্ণ করেছিলেন সেই আল্লাহর কসম খেয়ে বলেছেন, সুহাইব তাকে জানিয়েছেন যে, রসূল : সা. যে জনপদে ঢুকতে চাইতেন, তা দেখা মাত্রই বলতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا .

অর্থ : হে সাত আকাশ এবং সেগুলো যা কিছুকে তা ছায়া দেয় সেগুলোর প্রতিপালক! হে সাত স্তর পৃথিবী ও যা কিছুকে সে বহন করে তার প্রতিপলক! শয়তানের গোষ্ঠী ও যাদেরকে সে বিপথগামী করে তাদের প্রতিপালক, বাতাস ও যে সকল জিনিসকে তা উড়িয়ে নেয় তার প্রতিপালক! তোমার কাছে এই গ্রাম ও তার অধিবাসী ও তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তার

কল্যাণ চাই। আর এই গ্রাম, তার অধিবাসী ও তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তার অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাই। -নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, হাকেম।

৮. ইবনে উমর রা. বলেন : আমরা রসূল সা. এর সাথে সফর করছিলাম। যখন তিনি কোনো গ্রামে প্রবেশ করতে চাইতেন তা দেখা মাত্র বলতেন :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنَا جَنَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا إِلَيْنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! এই গ্রামে আমাদেরকে বরকত দিও (তিনবার)। হে আল্লাহ! এই গ্রামের ফলমূল আমাদেরকে দিও। এর অধিবাসীদের নিকট আমাদেরকে প্রিয় বানিয়ে দিও এবং এর সৎ অধিবাসীদেরকে আমাদের প্রিয় বানিয়ে দিও।" - তাবারানি।

৯. আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন কোন ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে চাইতেন, তখন সেই ভূখণ্ডের নিকট গিয়ে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهٖ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمَا جَمَعْتَ فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنَا جَنَاهَا، وَاَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلٰى اَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا إِلَيْنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এই ভূখণ্ডের যা কিছু কল্যাণ আছে এবং এই ভূখণ্ডে তুমি যা যা সঞ্চিত করেছ তাতে যা কিছু কল্যাণ আছে তা চাই। আর এই ভূখণ্ডের ও এই ভূখণ্ডে তুমি যা যা সঞ্চিত করেছো তাতে যা কিছু অকল্যাণ আছে তা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! এই ভূখণ্ডের ফলমূল আমাদেরকে দাও। এর বিপদ মুসিবত ও রোগব্যাধি থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও, এর অধিবাসীদের নিকট আমাদেরকে প্রিয় বানাও এবং এর সৎ অধিবাসীদেরকে আমাদের প্রিয় বানাও। - ইবনুল সুন্নি।

১০. আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো সফরে থাকা অবস্থায় শেষ রাত উপস্থিত হতো তখন বলতেন :

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحُسْنِ بَلَائِهٖ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَاَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : আমরা আল্লাহর উত্তম নিয়ামতের যে প্রশংসা করেছি, তা সাক্ষী থাকুক। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সাথি হও এবং আমাদের উপর অনুগ্রহ করো। আগুন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। - মুসলিম।

৩২. জুমার নামায

১. জুমার দিনের ফযিলত

জুমার দিন সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সূর্য উদিত হয় এমন দিনগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমার দিন। এই দিন আদম আ. কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিনই তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়। এই দিনই তাকে বেহেশত থেকে বের করা হয়। কিয়ামতও এই দিনই অনুষ্ঠিত হবে। - মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি। আবু লুবাবা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জুমার দিন সকল দিনের নেতা এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান দিন। এদিন আল্লাহর নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনের চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ। এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য : এ দিন আল্লাহ আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন, এ দিন আল্লাহ আদম আ. কে মৃত্যু দেন, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যাই চায়, যতোক্ষণ হারাম কিছু না চায়, ততোক্ষণ আল্লাহ তা দেন,

এই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পাহাড় ও সমুদ্র সকলেই জুমার দিনকে ভয় পায়।" - আহমদ, ইবনে মাজাহ।

২. জুমার দিনে দোয়া করা

জুমার দিনের শেষ মুহূর্তগুলোতে দোয়া করায় সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তখন বসা ছিলেন। আমি বললাম : আমরা আল্লাহর কিতাবে পাই জুমার দিনে এমন একটা সময় রয়েছে, কোনো বান্দা যদি নামাযের পর সেই সময়টিতে আল্লাহর কাছে কিছু চায়, তবে আল্লাহ তার প্রয়োজন অবশ্যই পূরণ করেন। আবদুল্লাহ বলেন : আমি যখন বললাম, 'একটা সময়' তখন রসূলুল্লাহ সা. আমার দিকে ইশারা করে বললেন : "অথবা সময়ের একটা অংশ।" আমি বললাম : "আপনি ঠিক বলেছেন : অথবা সময়ের একটা অংশ" তারপর বললাম : সেই সময়টা কখন? তিনি বললেন : "দিনের শেষ মুহূর্তগুলোর একটি মুহূর্ত।"

আমি বললাম : সেটি নামাযের সময় নয়। তিনি বললেন : হাঁ, নামাযের সময়। কেননা মুমিন বান্দা যখন নামায পড়ার পর পুনরায় নামায পড়ার অপেক্ষায় বসে থাকে, তখন সে নামাযেই আছে বলে গণ্য হবে। –ইবনে মাজাহ। আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জুমার দিনে এমন একটা সময় রয়েছে, যখন কোনো মুসলিম বান্দা আল্লাহর কাছে কোনো ভালো জিনিস চায়, আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দেন। এই সময়টা আসরের পর। –আহমদ। জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জুমার দিন বারো ঘণ্টা। তন্মধ্যে এমন একটা ঘণ্টা রয়েছে, যখন কোনো মুসলিম বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চায়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা দেন। এই ঘণ্টাটি তোমরা আসরের পরে অন্বেষণ করো।" -নাসায়ী, আবু দাউদ, হাকেম। আবু সালামা বিন আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. এর কতিপয় সাহবি সমবেত হয়ে জুমার দিন যে সময়টি রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারা যখন বৈঠক থেকে উঠে গেলেন, তখন তাদের কারো এ ব্যাপারে দ্বিমত ছিলনা যে, সময়টা জুমার দিনের শেষ সময়। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন : যে সময়টিতে দোয়া কবুলের আশা করা হয়, অধিকাংশ হাদিস থেকে জানা যায়, তা আসরের পরে এবং সূর্য ঢলে পড়ার পর সেটা আশা করা হয়। মুসলিম ও আবু দাউদে আবু মূসা থেকে যে হাদিস বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সা.কে জুমার দিনের বিশেষ সময়টি সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, তা হচ্ছে ইমামের মিম্বরে বসা থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত, সে হাদিসটি দুর্বল বলে আখ্যায়িত হয়েছে।

৩. জুমার দিনে ও রাতে রসূলুল্লাহ সা. এর উপর বেশি করে সালাত ও সালাম করা

আওস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের সর্বোত্তম দিনগুলোর মধ্যে একটি হলো জুমার দিন। এই দিনে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাকে মৃত্যু দেয়া হয়েছে, এই দিনেই শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, আবার এই দিনেই আরেকবার শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর আকাশ ও পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাণী সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে। কাজেই তোমরা এই দিন আমার উপর বেশি দরূদ পড়ো। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবিগণ বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আপনার নিকট কিভাবে আমাদের দরূদ পেশ করা হয়? অথচ আপনি তো ততোদিন মাটিতে মিশে যাবেন। তিনি বললেন : আল্লাহ তায়ালা নবীদের দেহ খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। –তিরমিযি ব্যতিত অপর পাচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : শুক্রবার দিনে ও রাতে রসূলুল্লাহ সা.-এর উপর বেশি বেশি দরূদ পড়া মুস্তাহাব। কারণ তিনি বলেছেন : "শুক্রবারের দিনে ও রাতে তোমরা আমার প্রতি বেশি

করে দরূদ পাঠাও।" রসূলুল্লাহ্ সা. সেরা সৃষ্টি আর শুক্রবার সেরা দিন। কাজেই এই দিনে তার জন্য দরূদ পাঠানোর একটা পৃথক মর্যাদা রয়েছে, যা অন্য দিনে নেই। তাছাড়া আরো একটা যুক্তি এই যে, রসূল সা. এর উম্মত দুনিয়া ও আখিরাতে যা কিছু কল্যাণ লাভ করেছে তা তাঁর হাত দিয়েই লাভ করেছে। তাই আল্লাহ তার উম্মতকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ দান করেছেন। সুতরাং তারা সবচেয়ে বড় যে মর্যাদা লাভ করে, তা জুমার দিনেই লাভ করে। কেননা জান্নাতের অধিবাসী হলে এই দিনেই তারা জান্নাতের বড় বড় প্রাসাদে প্রবেশ করবে এবং এ দিনেই তারা অধিকতর নিয়ামত লাভ করবে। দুনিয়ার জীবনে শুক্রবার তাদের জন্য ঈদের দিন। এদিনে আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের পার্থিব জিনিস দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেন। এসব কিছুই তারা রসূলূল্লাহ সা. এর কারণে ও তাঁর হাতেই পেয়েছে। তাই তাঁর শোকর ও ন্যূনতম হক আদায়ের জন্য শুক্রবার দিনে ও রাতে তাঁর উপর বেশি করে দরূদ পাঠানো উচিত।

৪. শুক্রবার দিনে ও রাতে সূরা কাহফ পড়া মুস্তাহাব :

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে সূরা কাহফ পড়বে, দুই জুমার মধ্যবর্তী সমগ্র সময় জুড়ে তা তার জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে এবং তাকে আলোকিত করবে। - নাসায়ী, বায়হাকি, হাকেম। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি শুক্রবারে সূরা কাহফ পড়বে, তার পায়ের নিচ থেকে আকাশ পর্যন্ত একটা আলো জ্বলবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে আলোকিত রাখবে এবং দুই জুমার মধ্যবর্তী তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। -ইবনে মারদুয়াই।

তবে মসজিদে উচ্চস্বরে সূরা কাহাফ পড়া মাকরূহ। শেখ মুহাম্মদ আবদুহ্ একটি ফতোয়া ঘোষণা করেছেন। তা হচ্ছে : শুধু শুক্রবারকে রোযা রাখার জন্য, শুক্রবারের রাতকে নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করা এবং সুনির্দিষ্টভাবে শুধু এই দিনেই সূরা কাহফ পড়া মাকরূহ। কেননা সূরা কাহফ সুললিতভাবে সুর করে ছাড়া পড়া হয়না। অথচ মসজিদের লোকেরা কথাবার্তা বলবে, হৈ চৈ করবে ও মনোযোগ দিয়ে শুনবেনা। তাছাড়া কুরআন পাঠকারী অনেক সময় নামাযীদের নামাযের দোয়া ও সূরায় ভুল করিয়ে ও তালগোল পাকিয়ে দেয়। তাই এরূপ ক্ষেত্রে সূরা কাহফ পড়া ঠিক নয়।

৫. শুক্রবারে গোসল, সাজসজ্জা, মিসওয়াক ও সুগন্ধি ব্যবহার

জুমার নামাযে হাজির হতে চায় অথবা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চায়, এমন প্রত্যেকের জন্য সর্বোচ্চ মানের পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জা গ্রহণ করা মুস্তাহাব, চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক, বয়স্ক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হোক, মুসাফির হোক বা মুকীম হোক। গোসল করা, সর্বোত্তম পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও দাঁত পরিষ্কার করা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে বহু হাদিস এসেছে। যথা :*

১. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জুমার দিন প্রত্যেক মুসলমানের গোসল করা ও সর্বোত্তম পোশাক পরা উচিত। আর নিজের সুগন্ধি থাকলে তা লাগানো উচিত। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম।

২. ইবনে সালাম রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. জুমার দিন মিম্বরে বসে বলেছেন :

* যে ব্যক্তি মসজিদে যেতে ইচ্ছুক নয় তার জন্য গোসল মুস্তাহাব নয়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমায় হাজির হবে, চাই পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, তার গোসল করা উচিত। আর যে হাজির হবেনা, তার গোসল করার প্রয়োজন নেই। - বায়হাকি।

তোমাদের কেউ যদি নিজের দৈনন্দিন পেশাগত পোশাক ছাড়া শুধু জুমার জন্য অতিরিক্ত দুটো পোশাক কিনে নেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।*

৩. সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি শুক্রবারে গোসল করে, সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করে। তেল মেখে চুল পরিপাটি করে ও সুগন্ধি ব্যবহার করে। অতপর মসজিদে যায় এবং কোথাও দুই ব্যক্তি গায়ে গায়ে মিশে বসা থাকলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে কাতারে না ঢুকে, তারপর ফরয নামায আদায় করে এবং ইমাম যা বলে তা মনোযোগ দিয়ে শোনে, তার এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। -আহমদ, বুখারি। আবু হুরায়রা রা. বলতেন : আরো তিন দিন বেশি। কেননা আল্লাহ একটি সৎ কাজে দশটি পুরস্কার দেন। আর গুনাহ মাফ হওয়া সগীরা অর্থাৎ ছোট গুনাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা ইবনে মাজায় আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে : "যতোক্ষণ না কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়।"

৪. আহমদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : শুক্রবারে প্রত্যেক মুসলমানের গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও দাঁত পরিষ্কার করা কর্তব্য।

৫. তাবারানিতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. কোনো এক জুমায় বলেছেন : হে মুসলমানগণ, এই দিনকে আল্লাহ তোমাদের জন্য ঈদ বানিয়েছেন। কাজেই তোমরা গোসল করো এবং দাঁত পরিষ্কার করো।

৬. জুমার নামাযে সময়ের আগে গমন

ইমাম ব্যতিত অন্যান্য মুসল্লীদের জুমার নামাযে সময়ের আগে মসজিদে গমন করা মুস্তাহাব। আলকামা বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে জুমায় গেলাম। তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন, তার আগে তিনজন সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তিনি বললেন : চার জনের মধ্যে চতুর্থ হয়েছি। চতুর্থজনও আল্লাহ থেকে দূরে নয়। আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি : "কিয়ামতের দিন লোকেরা আসন গ্রহণ করবে কে কতো আগে জুমার নামাযে গিয়েছিল তার ভিত্তিতে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এরূপ ধারাবাহিকতার মাধ্যমে। চতুর্থজনও আল্লাহ থেকে দূরে থাকবেনা।" -ইবনে মাজাহ। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমার দিন বীর্যপাতজনিত কারণে গোসল করার মতো গোসল করলো, (অর্থাৎ খুব ভালোভাবে) তারপর সকাল সকাল মসজিদে গেলো, সে যেনো একটা উটনী কুরবানি দিলো। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘণ্টায় গেলো, সে যেনো একটা গরু কুরবানি দিলো, আর যে ব্যক্তি তৃতীয় ঘণ্টায় গেলো, সে যেনো একটা শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানি দিলো। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ ঘণ্টায় গেলো সে যেনো একটা মুরগী কুরবানি দিলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম ঘণ্টায় গেলো সে যেনো একটা ডিম কুরবানি দিলো। আর যখন ইমাম উপস্থিত হয়, তখন ফেরেশতাগণ আলোচনা শুনতে উপস্থিত হয়। -ইবনে মাজাহ ব্যতিত সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ।

শাফেয়ী ও আলেমদের একটি দল এ হাদিসের ব্যখ্যায় বলেন : এই ঘণ্টাগুলো হচ্ছে দিনের ঘণ্টা। অর্থাৎ দিনের শুরু থেকে অর্থাৎ ভোর থেকেই মসজিদে গমন মুস্তাহাব। মালেকের মতে, এই ঘণ্টাগুলো সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বের ও পরের এক ঘণ্টার ভগ্নাংশ। অন্যেরা বলেন, সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বের এক ঘণ্টার ভগ্নাংশ। ইবনে রুশদের মতে শেষোক্ত মতটিই সঠিক। কেননা সূর্য ঢলার পরে মসজিদে যাওয়া ওয়াজিব।

---

* পেশা দ্বারা চাকরি বুঝানো হয়েছে। বায়হাকি জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. এর বিশেষ পোশাক ছিলো, যা তিনি ঈদে ও জুমায় পরতেন।" হাদিসে আরো উল্লেখ আছে, অন্যান্য দিনের পোশাক ব্যতিত জুমার দিনে বিশেষ পোশাক পরা মুস্তাহাব।

৭. মুসল্লীদের ঘাড় ডিংগিয়ে সামনে যাওয়া

তিরমিযি আলেমদের মত উদ্ধৃত করেছেন যে, তারা জুমার দিনে পরে মসজিদে এসে আগে হাজির হওয়া মুসল্লীদের ঘাড় ডিংগিয়ে সামনের কাতারে যাওয়াকে কঠোরভাবে অপছন্দ করেছেন। আবদুল্লাহ বিন বুছর রা. বলেন : জুমার দিন রসূল সা. খুতবা দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে মুস্ল্লীদের ঘাড় ডিংগাতে লাগলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি বসো। তুমি দেরিতে এসে মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো। - আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমদ

অবশ্য ইমামকে এবং যে ব্যক্তি সামনের ফাঁকা যায়গায় যেতে চায় এবং সেখানে যেতে হলে ঘাড় ডিংগানো অনিবার্য, তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি সামনের কোনো কাতারেই ছিলো, কোনো প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিল এবং পুনরায় তার আগের জায়গায় ফিরে যেতে চায়, সেও এর ব্যতিক্রম। তবে শর্ত এই যে, মানুষকে কষ্ট দেয়া পরিহার করা চাই। উকবা বলেন : রসূল সা. এর পেছনে মদিনায় আসর নামায পড়লাম। নামাযের পর তিনি অতিদ্রুত বের হলেন এবং মানুষের ঘাড় ডিংগিয়ে তাঁর কোনো এক স্ত্রীর কক্ষে গেলেন। তাঁর দ্রুত গমনে লোকেরা আতংকগ্রস্ত হলো। রসূল সা.. পরক্ষণেই ফিরে এলেন। দেখলেন লোকেরা তার দ্রুত গমনে অবাক হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন : কিছু স্বর্ণের কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, যা আমাদের কাছে ছিলো। ওটা আমাকে আঁটকে রাখবে এটা আমার মনোপুত নয় তাই ওটা বণ্টন করে দেয়ার হুকুম দিয়ে এলাম। - বুখারি, নাসায়ী।

৮. জুমার পূর্বে নফল নামায পড়া বৈধ কিনা?

ইমাম যতোক্ষণ তার কক্ষ থেকে বের না হন, ততোক্ষণ জুমার পূর্বে নফল পড়া যাবে। ইমাম বের হওয়ার পর নফল পড়া বন্ধ করতে হবে। তবে তাহিয়াতুল মসজিদের কথা স্বতন্ত্র। এটা খুতবা চলাকালেও পড়া যায়। তবে সংক্ষেপে পড়া উচিত। কিন্তু মুসল্লী যদি খুতবার শেষ ভাগে মসজিদে প্রবেশ করে এবং তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ার সময় সংকীর্ণ হয়ে যায়, তবে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়বেনা।

১. ইবনে উমর রা. জুমার পূর্বের নফল নামাযকে দীর্ঘায়িত করতেন এবং তার পরে দু'রাকাত পড়তেন আর বলতেন, রসূলুল্লাহ সা. এরূপ করতেন। - আবু দাউদ।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে, তারপর জুমার নামায পড়তে আসে এবং তার জন্য যতোটুকু নামায নির্ধারিত আছে তা পড়ে, তারপর চুপ করে ইমামের খুতবা শেষ অবধি শোনে এবং তার সাথে নামায পড়ে, তার ঐ জুমা ও পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী এবং অতিরিক্ত আরো তিনি দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। - মুসলিম।

৩. জাবের (রা) বলেন : এক ব্যক্তি শুক্রবার মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. খুতবা দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন : তুমি কি নামায পড়েছ? সে বললো : না। তিনি বললেন : তাহলে দু'রাকাত পড়ে নাও। - সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে : যখন তোমাদের কেউ জুমার দিন ইমামের খুতবাতে থাকা অবস্থায় মসজিদে আসে, তখন সে সংক্ষেপে দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়। - আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ। অপর বর্ণনায় রয়েছে : শুক্রবারে ইমাম বের হয়ে আসার পর তোমাদের কেউ মসজিদে এলে সে যেনো দু'রাকাত পড়ে নেয়। - বুখারি ও মুসলিম।

৯. মসজিদে কোনো মুসল্লীর তন্দ্রা এলে অন্য জায়গায় সরে যাওয়া উচিত

মসজিদে অবস্থানকালে কারো তন্দ্রা প্রবল হলে তার স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র সরে যাওয়া

উচিত। কেননা নড়াচড়া তন্দ্রা দূর করে দিতে পারে এবং জাগরণ এনে দিতে পারে। এটা শুক্রবারে ও অন্যান্য দিনে সমভাবে প্রযোজ্য।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে অবস্থানকালে তন্দ্রার শিকার হলে সে যেনো যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। –আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকি ও তিরমিযি।

১০. জুমার নামায ফরয হবার দলিল

আলেমগণ একমত যে, জুমার নামায ফরযে আইন এবং তা দু'রাকাত। আল্লাহ বলেছেন : "হে মুমিনগণ, শুক্রবারে যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা দ্রুত গতিতে আল্লাহর যিকরের দিকে ছুটে যাও এবং ক্রয় বিক্রয় পরিত্যাগ করো। তোমরা যদি জানতে, তবে এটা তোমাদের জন্য উত্তম।" (সূরা জুমা)

১. বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমি পৃথিবীতে শেষ যামানায় এলেও কিয়ামতের দিন আমাদের বিচারই সকলের আগে হবে, অথচ অন্যদেরকে আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে। আর আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তাদের পরে। তারপর এই দিনটি তাদের উপর ফরয করা হয়েছে। কিন্তু তারা দিনটি নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। আমাদেরকে আল্লাহ দিনটির ব্যাপারে হিদায়াত দান করেছেন। তাই মানুষ এ দিনের ব্যাপারে আমাদের অনুসারী। আর ইহুদীদের দিন আগামীকাল শনিবার, আর খৃষ্টানদের দিন তার পরের দিন রবিবার।

২. আহমদ ও মুসলিম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন : একটি গোষ্ঠী জুমার নামাযে আসতোনা। তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার ইচ্ছা হয়, কোনো এক ব্যক্তিকে নামাযে জনগণের ইমামতির দায়িত্ব দেই, তারপর যারা জুমার নামাযে আসেনা তাদের ঘরে আগুন দেই। - আহমদ, মুসলিম।

৩. আবু হুরায়রা ও ইবনে উমর জানিয়েছেন, তারা উভয়ে রসূলুল্লাহ সা. কে মিম্বরে বলতে শুনেছেন : যারা জুমা বর্জন করে তাদের এটা বর্জন থেকে বিরত থাকতেই হবে। নচেত আল্লাহ তাদের অন্তরে অবশ্যই সিল মেরে দেবেন। তারপর তারা উদাসীন হয়ে যাবেই। - মুসলিম, আহমদ, নাসায়ী।

৪. সাহাবি আবুল জাদ বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি অলসতা ও অবজ্ঞাবশত তিনটে জুমা পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তার অন্তরে সিল মেরে দেবেন। - পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

১১. কার উপর জুমা ফরয এবং কার উপর ফরয নয়

জুমার নামায পড়া এমন প্রত্যেক স্বাধীন, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর ফরয, যে জুমার জামাতে উপস্থিত হতে সক্ষম এবং যে জুমার নামায ত্যাগের অনুমতি আছে এমন ওযর থেকে মুক্ত।

পক্ষান্তরে যাদের উপর জুমা ফরয নয় তারা হলো :

১ ও ২. নারী ও শিশু। এ বিষয়ে আলেমগণ একমত।

৩. এমন অসুস্থ ব্যক্তি, যার পক্ষে জুমার নামাযে যাওয়া অত্যধিক কষ্টকর অথবা মসজিদে জুমা পড়তে গেলে রোগ বেড়ে যাওয়া বা তার নিরাময় বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকে। অনুরূপ, যে ব্যক্তির রোগীর সেবা ও পরিচর্যায় নিয়োজিত থাকে এবং সে ছাড়া আর কারো দ্বারা তা সমাধা হওয়া অসম্ভব।

তারেক বিন শিহাব রা. বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জুমার নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাতে আদায় করা ফরয, তবে চার ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে : দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ ব্যক্তি, মহিলা, শিশু ও রোগী।

৪. মুসাফির : জুমার ইকামত হচ্ছে এমন সময়ে যদি মুসাফির যাত্রাবিরতি করে, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে, তার উপর জুমা ফরয নয়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. সফরে জুমা পড়তেননা। তাঁর বিদায় হজ্জে যখন আরাফায় ছিলেন, তখন শুক্রবার ছিলো। তিনি যোহর ও আসর একত্রে যোহরের সময় পড়লেন, জুমা পড়লেননা। খলিফাগণও অনুরূপ করেছেন।

৫ ও ৬. অভাবী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যে গ্রেফতার হবার আশংকা করে এবং যালেম শাসকের ভয়ে যে ব্যক্তি পালিয়ে বেড়ায়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনলো, কিন্তু তার সাড়া দিলনা, (অর্থাৎ মসজিদে গেলোনা) তার নামায শুদ্ধ হবেনা। অবশ্য কোনো ওযর থাকলে সেকথা স্বতন্ত্র। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, কি ওযর? তিনি বললেন : ভয় কিংবা রোগব্যাধি। - আবু দাউদ।

৭. প্রত্যেক মাযূর (যার ওযর রয়েছে এমন) ব্যক্তি জামাত তরক করার অনুমতি প্রাপ্ত, যেমন বৃষ্টি, কাঁদা ও শীত ইত্যাদির কারণে।

ইবনে আব্বাস রা. প্রবল বৃষ্টিপাতের দিন তার মুয়াযযিনকে বলেছিলেন : তুমি যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বলবে, তখন "হাইয়া আলাস সালাহ" বলোনা। তার পরিবর্তে বলো : "সাল্লু ফী বুয়ূতিকুম" (তোমরা নিজ নিজ ঘরে/বাড়িতে নামায পড়ো।) লোকেরা এটাকে অপছন্দ করলো বলে মনে হলো। তাই তিনি বললেন : যিনি আমার চেয়ে উত্তম, তিনিই (অর্থাৎ রসূল সা.) এরূপ করেছেন। জুমার নামায একটা ধৈর্য সাপেক্ষ ফরয। এটা আদায় করার জন্য কাদাময় ও পিচ্ছিল পথে তোমাদেরকে বের করা আমার মনোপূত হচ্ছিলনা। আর আবু মুলাইহ রা. বলেন : তার পিতা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে শুক্রবারে দেখা করলেন এবং তারা বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেলেন। কিন্তু সে বৃষ্টি এতো কম ছিলো যে, তাদের জুতার তলাও ভেজেনি। রসূল সা. তাদেরকে হুকুম দিলেন তারা যেনো নিজ নিজ বাহন জন্তুর উপরই নামায পড়ে নেয়। - আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

তাদের কারো উপরই তখন জুমা ফরয ছিলোনা, কেবল যোহর পড়াই তাদের কর্তব্য ছিলো। তবে যদি কেউ জুমার নামায পড়ে, তবে তা বিশুদ্ধ হবে এবং তার আর যোহরের ফরয নামায দোহরাতে হবেনা।* রসলূ সা. এর আমলে মহিলারা মসজিদে আসতো এবং তাঁর সাথে জুমা পড়তো।

১২. জুমার নামাযের সময়

অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেঈর মত হলো, জুমার সময় যোহরেরই সময়। কেননা আহমদ, বুখারি, আবু দাউদ, তিরমিযি ও বায়হাকি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জুমার নামায পড়তেন তখন, যখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়তো। আহমদ ও মুসলিম সালমা বিন আকওয়া থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমরা রসূল সা. এর সাথে জুমার নামায আদায় করে ফিরে আসতাম এবং দেখতাম, প্রত্যেক জিনিসের ছায়া কত দূর? ইমাম বুখারি বলেছেন :

---

* যে ব্যক্তি জুমার নামায পড়ে ফেলেছে, তার জন্য যোহর পড়া সর্বসম্মতভাবে অবৈধ। কেননা জুমা যোহরেরই স্থলাভিষিক্ত। আল্লাহ আমাদের উপর ছয় ওয়াক্তের নামায ফরয করেননি। যারা জুমার পরে যোহর পড়া জায়েয বলেন, তাদের হাতে হাদিস কুরআন বা কোনো ইমাম থেকে প্রাপ্ত কোনো প্রমাণও নেই, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিও নেই।

সূর্য পশ্চিমে ঢললেই জুমার নামাযের সময় হয়। উমর ও আলী রা., নুমান বিন বশীর ও উমর বিন হারিছ থেকেও অনুরূপ মত জানা গেছে। শাফেয়ী বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আবু বকর, উমর, উসমান ও সকল ইমাম সূর্য পশ্চিমে ঢলার পর জুমা পড়তেন।

হাম্বলীগণ ও ইসহাকের মতে, জুমার সময় হলো ঈদের নামাযের প্রথম সময় থেকে যোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত। তাদের প্রমাণ হলো, আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী জাবের থেকে বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জুমার নামায পড়ানোর পর আমরা আমাদের উটের কাছে যেতাম এবং সূর্য ঢলার সময় আমরা উটগুলোকে বিশ্রাম করাতাম। এ থেকে প্রমাণিত, তারা সূর্য ঢলার আগে যোহর পড়তেন। তারা আবদুল্লাহ বিন সাঈদান সোলামীর হাদিস থেকেও প্রমাণ দেন। তিনি বলেন : আমি আবু বকরের সাথে জুমার নামাযে শরিক হয়েছি। তাঁর খুতবা ও নামায দুপুরের আগে হয়েছিল পরে উমরের রা. সাথেও পড়েছি। তার নামায ও খুতবা দুপুরের মধ্যে সম্পন্ন হতো। পরে উসমানের সাথেও জুমা পড়েছি। তার নামায ও খুতবা সূর্য ঢলে পড়ার সময় হতো। কাউকে দেখিনি এতে আপত্তি করতে বা অপছন্দ করতে। - দার কুতনী ও আহমদ।

অনুরূপ ইবনে মাসউদ, জাবের, সাঈদ ও মুয়াবিয়া থেকেও বির্ণত যে, তারা সূর্য ঢলার আগেই পড়েছেন, তাতে কেউ আপত্তি করেনি। অধিকাংশ আলেমগণ জাবেরের হাদিস সম্পর্কে বলেছেন যে, ওটা নামাযকে ত্বরান্বিত করা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বর্ণনা, অর্থাৎ সূর্য ঢলার পর সংগে সংগে পড়া হয়েছে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা করে পড়া হয়নি। গরমের তীব্রতা প্রশমিত হবার অপেক্ষা করা হয়নি। আর নামায ও উটের বিশ্রাম সূর্য ঢলার পরে হতো।

১৩. জুমার জামাতের জন্যে নামাযীর সংখ্যা

আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনোই মতভেদ নেই যে, জুমার নামাযের বিশুদ্ধতার জন্য জামাত একটা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। তারেক বিন শিহাব বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জুমা প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাতে আদায় করা ফরয। কিন্তু কতো সংখ্যক লোক হলে জুমা শুদ্ধ হবে সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে প্রায় পনেরোটি মত উল্লেখ করেছেন। তবে অগ্রগণ্য মতটি হলো, দুই বা ততোধিক লোক হলেই জুমা শুদ্ধ হবে। কেননা রসূল সা. বলেছেন : দুই বা ততোধিক লোক হলেই জামাত গঠিত হয়। শওকানি বলেছেন : দুইজনের জামাতে বাদ বাকি সব নামাযই যখন শুদ্ধ হয়। তখন জুমাও তো একটা নামায। কোনো প্রমাণ ছাড়া তার ক্ষেত্রে অন্যান্য নামাযের পরিপন্থী কোনো বিধি প্রযোজ্য হবেনা। অন্যান্য নামাযে যে কয়জনে জামাত গ্রহণযোগ্য, জুমার নামাযের জামাতে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের জামাতের প্রয়োজন- এই মর্মে কোনো প্রমাণ নেই। আবদুল হক বলেছেন : জুমার লোক সংখ্যা সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য হাদিস নেই। সুয়ূতীও বলেছেন : কোনো হাদিসে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার কোনো উল্লেখ নেই। তাবারি, দাউদ, ইবরাহিম নখয়ী ও ইবনে হাযমের মতও অনুরূপ।

১৪. জুমার নামাযের স্থান

জুমার নামায শহরে, বন্দরে, নগরে, গ্রামে, মসজিদে, শহরের ভবনসমূহে বা তার আওতাধীন চত্বরে পড়া বৈধ। এছাড়া একাধিক স্থানেও জুমা পড়া যায়। উমর রা. বাহরাইনবাসীকে লিখেছিলেন : তোমরা যেখানেই থাকো, জুমার নামায পড়ো। - ইবনে আবি শায়বা। এ দ্বারা শহর ও গ্রাম সবটাই উভয়ই জুমার বৈধ স্থান হিসেবে প্রমাণিত। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : প্রথম জুমার পর মদিনার মসজিদে নববীতে সর্বপ্রথম জুমার নামায পড়া হয়, তারপর জুমা

পড়া হয় বাহরাইনের গ্রাম "জাওয়াই"তে। -বুখারি, আবু দাউদ। লাইস বিন সায়ীদ বলেছেন : মিশর ও তার উপকূলবর্তী লোকেরা উমর রা. ও উসমান রা. এর আমলে তাদের নির্দেশে জুমা পড়তো এবং তাদের মধ্যে সাহাবিও ছিলেন। ইবনে উমর বলেন, মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী জলাশয়বাসীদেরকে তিনি জুমা পড়তে দেখতেন এবং এজন্য তাদেরকে কোনো ভর্ৎসনা করা হতোনা। - আবদুর রাযযাক।

১৫. জুমার ব্যাপারে ফকীহদের আরোপিত শর্তাবলি পর্যালোচনা

আগেই বলেছি, জুমা ফরয হওয়ার শর্ত হলো পুরুষ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সুস্থ থাকা, মুকীম হওয়া (সফরে না থাকা) এবং জুমা আদায় থেকে বিরত থাকা জরুরি হয়ে যায় এমন ওযর না থাকা। আর জুমার বৈধতার জন্য যে জামাত শর্ত, তাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। রসূলের কথা ও কাজ এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজ থেকে এতোটুকুই পাওয়া যায় এবং আল্লাহ আমাদের উপর এটুকুই দায়িত্ব আরোপ করেছেন। এর বাইরে অতিরিক্ত যে সকল শর্ত ফকীহগণ আরোপ করেছেন তার কোনো ভিত্তিও নেই; প্রমাণও নেই। এখানে "আর রওযাতুন নাদিয়া" গ্রন্থের গ্রন্থকারের বক্তব্য উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি :

"জুমার নামায অন্যান্য নামাযের মতোই। কারণ এমন কোনো দলিল প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যা দ্বারা এ নামায অন্যান্য নামায থেকে ভিন্ন প্রমাণিত হয়। এই উক্তি থেকেই আভাষ পাওয়া যাচ্ছে যে, এর জন্য কেন্দ্রীয় ইমাম, বড় শহর ও নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক শর্ত বলে যা কিছু বলা হয়েছে, তা বাতিল ও ভিত্তিহীন। কেননা এসব শর্তের পেছনে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা এগুলোর উপস্থিতিকে জরুরি ও শর্ত তো দূরের কথা, মুস্তাহাব বলেও প্রমাণ করা যায়। বরঞ্চ কোনো জায়গায় যদি দুই ব্যক্তি জুমার নামায পড়ে এবং সেখানে ঐ দু'জন ব্যতিত কোনো লোক না থাকে, তাহলে তারা দু'জন তাদের উপর অর্জিত ফরয আদায় করেছে বলে গণ্য হবে। তাদের একজন যদি খুতবা দেয়, তবে তো খুতবার সুন্নত আদায় করলো। আর যদি খুতবা না দেয়, তবে তো একটা সুন্নতই তরক করলো মাত্র। তারেক বিন শিহাবের হাদিসটি যদি না থাকতো, যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জামাতে থাকা ফরয এবং রসূল সা. এর আমলে এ নামায জামাত ব্যতিত আদায় করা হয়নি বলে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে অন্যান্য নামাযের মতো এ নামাযও একাকি পড়লেও ফরয আদায় হয়ে যেতো। পক্ষান্তরে এই যে বলা হয়ে থাকে : কমের পক্ষে চারজন মুক্তাদি লাগবে, ইমামতি করতে শাসক লাগবে -এ সম্পর্কে মর্যাদাপূর্ণ ইমামগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, এগুলো নবীর সা. কথাও নয়, সাহাবিদের কথাও নয়। সুতরাং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন নেই। এটা তো হলো হাসান বসরীর বক্তব্য। জুমার নামাযের এই অতিব মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত, যেটাকে আল্লাহ মুসলমানদের উপর সপ্তাহে একবার সমবেতভাবে আদায় করা ফরয করেছেন এবং ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, একে কেন্দ্র করে যে সব মনগড়া উক্তি ও বাতিল ধ্যান ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে যে কেউ বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারেনা। যেমন কেউ বলে : খুতবা দু'রাকাত নামাযের মতো, খুতবা যে পেলোনা, তার নামায শুদ্ধ হলোনা। এ ধরনের কথা কেবল সেই বলতে পারে, যার কাছে রসূল সা. এর এই সহীহ হাদিসটি পৌঁছেনি : "জুমার দু'রাকাত নামাযের এক রাকাত ছুটে গেলে নামায শেষে আর এক রাকাত পড়ে নেবে এবং তাতেই তার নামায পূর্ণতা লাভ করবে। আবার কেউ কেউ এ কথাও বলে : ইমামসহ

তিনজন না হলে জুমা হবেনা। কেউ বলে : চারজন লাগবে। কেউ বলে : সাতজন লাগবে। কেউ বলে : নয়জন। কেউ বলে : বারো জন, কেউ বলে বিশ জন, কেউ বলে ত্রিশ জন, কেউ বলে চল্লিশ জন, কেউ বলে পঞ্চাশ জন, কেউ বলে সত্তর জন না হলে জুমা আদায় হবেনা। আবার কেউ বলেন, বিরাট একটি জামাত হতে হবে, কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। কেউ কেউ বলেন : বড় শহরে ছাড়া জুমা শুদ্ধ হবেনা। আর এই শহরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, এর লোক সংখ্যা কয়েক হাজার হতে হবে, কেউ বলেন : ঐ শহরে জামে মসজিদ ও গণশৌচাগার থাকতে হবে। আরো অনেক বিচিত্র ধরনের বক্তব্য প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দেশের সর্বোচ্চ শাসক ব্যতিত জুমা ফরয হয়না। তাকে না পাওয়া গেলে বা তিনি যদি এমন হন যে, তার সততা ও ন্যায়নীতি যে কোনো দিক দিয়ে সন্তোষজনক নয়, তাহলে জুমা জরুরিও নয়, বৈধও নয়। এ ধরনের আরো বহু উক্তি প্রচলিত থাকতে দেখা যায়, যার পেছনে আদৌ কোনো দলিল প্রমাণ নেই। কুরআনে ও হাদিসে এমন একটি শব্দও পাওয়া যায়না, যা তাদের দাবি অনুযায়ী এ সকল জিনিসকে জুমার বৈধতার শর্ত, অথবা ফরয অথবা অবিচ্ছেদ অংশ বলে প্রমাণ করে। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মনগড়া মতামত মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়! তাদরে মাথা থেকে কতো রকমের আজগুবি ও উদ্ভট জিনিস বের হয়, যা কেবল গল্পের আসরেই শোভা পায় এবং পবিত্র ইসলামী শরিয়তের সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই। কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, সত্য ও ন্যায়ের উপর দৃঢ় পদে প্রতিষ্ঠিত এবং মনগড়া কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে সত্য থেকে বিচলিত হয়না এমন ব্যক্তি মাত্রই এ সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ভ্রান্ত ও অসত্য কথা যেই বলবে, তা তার মুখের উপরই ছুড়ে দিতে হবে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী হলো আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ। আল্লাহ বলেছেন :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ .

"তোমরা যদি কোনো বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও রসূলের নিকট উপস্থাপন করো।" إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

"মুমিনদেরকে যখন তাদের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা শুধু এ কথাই বলে থাকে যে, "শুনলাম ও মেনে নিলাম"

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

"না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা ততোক্ষণ মুমিন হতে পারবেনা, যতোক্ষণ না তাদের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়, সে বিষয়ে তোমাকে হুকুমদাতা মানবে, অতপর তুমি যে ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকবেনা এবং সর্বান্তকরণে তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।"

এ আয়াত কটি ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াত অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, মতভেদের ক্ষেত্রে একমাত্র মিমাংসাকারী হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালা। আল্লাহর ফায়সালা হলো তাঁর কিতাব। আর রসূলের ফায়সালা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুন্নাহ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে তা সে যতো বড় আলেম বা পণ্ডিত হোক না কেন - এ অধিকার ও ক্ষমতা দেননি যে, সে শরিয়ত সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণ নেই এমন কোনো কথা বলবে। ইজতিহাদকারীর যদিও অনুমতি রয়েছে যে, কোনো বিষয়ে কুরআন ও

সুন্নাহর দলিল প্রমাণ না পেলে নিজের সুচিন্তিত মত অনুযায়ী নিজে কাজ করতে পারে। কিন্তু অন্য কাউকে অনুমতি দেয়া হয়নি যে, তার উক্ত মত বিনা বিচারে ও অন্ধভাবে অনুসরণ করবে, চাই উক্ত মুজতাহিদ যতো বড় ব্যক্তিই হোন না কেন। আল্লাহ সাক্ষী, আমি এ ধরনের অন্ধ অনুকরণ গ্রন্থকারদের মধ্যে, জনগণের পথ নির্দেশনামূলক গ্রন্থাবলিতে এবং স্বল্প বিদ্যা ও জ্ঞানধারী সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত উপদেশে যখন দেখতে পাই, তখন আরো বেশি বিস্মিত হই। এটা কোনো মাযহাব, দেশ বা যুগের গণ্ডিতে সীমিত নেই, বরং সকল যুগেই সকল দেশে ও সকল মাযহাবেই দেখতে পাওয়া যায় পরবর্তী ব্যক্তি পূর্ববর্তী ব্যক্তির বক্তব্যের এমন অন্ধ অনুকরণ করছে, যেনো সে কুরআন থেকেই তা গ্রহণ করছে, অথচ আসলে তা সম্পূর্ণ মনগড়া কথা। এ ধরনের সুনির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য এই ইবাদত অর্থাৎ জুমার নামাযের ক্ষেত্রেই অধিক হারে প্রচলিত রয়েছে, যার সপক্ষে কুরআনে, সুন্নাহতে, শরিয়তে বা যুক্তিতে কোথাও কোনো প্রমাণ নেই।"

১৬. জুমার খুতবা বা ভাষণ

খুতবা সংক্রান্ত বিধি : অধিকাংশ আলেমের মতে জুমার খুতবা ওয়াজিব। এর প্রমাণ হিসেবে তারা উল্লেখ করে থাকেন যে, সহীহ হাদিস দ্বারা ক্রমাগতভাবে প্রমাণিত হয়ে এসেছে, রসূল সা. প্রত্যেক জুমায় খুতবা দিতেন। তারা এর প্রমাণ হিসেবে রসূলুল্লাহ সা. এর এ উক্তিও উদ্ধৃত করে থাকেন যে, "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো, সেভাবে নামায পড়ো।" আর আল্লাহর এ উক্তিও উদ্ধৃত করে থাকেন : "হে মুমিনগণ! জুমার দিন যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন দ্রুত আল্লাহর স্মরণের দিকে চলে যাও।"

এখানে আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে যাওয়ার আদেশ দেয়াতে ছুটে যাওয়ার কাজটা ওয়াজিবে পরিণত হয়েছে। আর যেহেতু যে কাজ ওয়াজিব নয়, তার জন্য ছুটে যাওয়া ওয়াজিব হতে পারেনা। তাই প্রমাণিত হলো, আল্লাহর স্মরণটাও ওয়াজিব। আর স্মরণকে খুতবা আখ্যা দেয়া হয়েছে। কেননা খুতবার মধ্যেই আল্লাহকে স্মরণ করতে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস নিহিত রয়েছে। শওকানি এই প্রমাণগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি প্রথম যুক্তির জবাবে বলেছেন : রসূল সা. নিয়মিত খুতবা দিতেন বলেই তা ওয়াজিব হয়ে যায়না। আর দ্বিতীয় যুক্তির জবাবে বলেছেন : এখানে তিনি যে নিয়ম ও পদ্ধতিতে নামায পড়তেন, সেভাবে শুদ্ধ নামায পড়ার আদেশই দেয়া হয়েছে। কিন্তু খুতবা নামায নয়। তৃতীয় যুক্তির জবাবে বলেছেন : যে স্মরণের দিকে দ্রুত ছুটে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেটা নামায ছাড়া আর কিছু নয়। বড়জোর এতোটুকু বলা যায় যে, আদেশটি নামায ও খুতবার মধ্যে আবর্তিত। অথচ নামায যে ফরয এবং খুতবার ওয়াজিব হওয়া ও না হওয়া বিতর্কিত, সে ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কাজেই এ যুক্তি দ্বারা খুতবা ওয়াজিব- এ সিদ্ধান্তে আসার অবকাশ নেই। অবশেষে শওকানি বলেছেন : সুতরাং স্পষ্টত হাসান বসরী, দাউদ জাহেরী, আল জুয়াইনী ও মালেকী মাযহাবের আবদুল মালেক ও ইবনুল মাজিশুনের এই মতই সঠিক যে, জুমার খুতবা নিছক মুস্তাহাব।

মিম্বরে আরোহণের পর ইমামের সালাম দেয়া মুস্তাহাব : জাবের রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. মিম্বরে আরোহণ করেই সালাম দিতেন। -ইবনে মাজাহ। অন্য হাদিসে রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. যখন মিম্বরে আরোহণ করতেন তখন জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন : আসসালামু আলাইকুম। শাবী বলেছেন : আবু বকর রা. ও উমর রা. এরূপ করতেন। সায়েব রা. বলেছেন, জুমার দিনের প্রথম আযান হতো রসূল সা. উমর রা. ও আবু বকর রা. এর আমলে ইমাম মিম্বরে আরোহণের পর। তারপর উসমানের রা. আমলে লোক সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে তিনি

তৃতীয় আযান মিনারের উপর চালু করেন। রসূল সা. এর মাত্র একজন মুয়াযযিনই ছিলো। - বুখারি, নাসায়ী, আবু দাউদ। আহমদ ও নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. যখন মিম্বরে বসতেন , তখন বিলাল আযান দিতেন, আর যখন নামতেন তখন ইকামত দিতেন। আদি বিন সাবেত বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন মেম্বরের ওপর দাঁড়াতেন, তাঁর সাহাবিগণ তার দিকে মুখ করে বসতেন। -ইবনে মাজাহ। তিরমিযি বলেছেন : এই হাদিস অনুসারেই সাহাবিগণ ও পরবর্তীগণ কাজ করতেন। ইমাম খুতবা দেয়ার সময় তার দিকে মুখ করে বসে থাকাকে মুস্তাহাব মনে করতেন।

খুতবার মধ্যে আল্লাহ ও রসূলের প্রশংসা করা, উপদেশ দেয়া ও কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব :

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে কথার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়না তাতে কোনো কল্যাণ নেই। - আবু দাউদ ও আহমদ।

অপর বর্ণনায় রয়েছে : যে খুতবায় কলেমা শাহাদাত নেই, তা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হাতের মতো। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি। তিরমিযির বর্ণনায় "শাহাদাতের" পরিবর্তে "তাশাহহুদ" বলা হয়েছে। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ যখন তাশাহহুদ পড়তেন, তখন বলতেন : "আলহামদু লিল্লাহি নাসতাঈনুহু ওয়া নাসতাগফিরহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা মাই ইয়াহদিল্লাহু ফালামুদিল্লা লাহু ওয়া মাই ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু, ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু আরসালাহু বিল হাক্কি বাশীরান ওয়া নাযীরান বাইনা ইয়াদায়িস সায়াহ, মাই ইউতিয়িল্লাহা ওয়া রসূলাহু ফাকদ রশাদা ওয়া মান ইয়াসিহিমা ফাইন্নাহু লা ইয়াদুররু ইল্লা নাফসাহ। ওয়ালা ইয়াদুররুল্লাহা শাইয়া।" ইবনে শিহাবকে রসূলুল্লাহ সা. এর জুমার দিনের তাশাহহুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উপরোক্ত তাশাহহুদ উল্লেখ করলেন। এতে আছে : "ওয়ামাই ইয়াসিহিমা ফাকাদ গাওয়া।"

উপরোক্ত উভয় বর্ণনা আবু দাউদ থেকে গৃহীত। (উপরোক্ত শাহাদাত তাশাহহুদের অনুবাদ : আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই ও ক্ষমা চাই। নিজেদের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারেনা। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল। তাকে সত্য বাণী দিয়ে কিয়ামতের পূর্বে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, সে সুপথ পাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে সে নিজের ছাড়া আর কারো ক্ষতি করবেনা সে বিপথগামী হবে এবং সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবেনা।) জাবের বিন সামুরা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন এবং দুই খুতবার মাঝে বসতেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পড়ে জনগণকে শুনাতেন ও তাদেরকে উপদেশ দিতেন। - বুখারি ও তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। তিনি আরো বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. তাঁর জুমার দিনের খুতবা লম্বা করতেননা। সেটি হতো সহজ ও সংক্ষিপ্ত কিছু কথার সমষ্টি। - আবু দাউদ। উম্মে হিশাম বলেছেন : সূরা কাফ আমার মুখস্থ হয়ে গেছে শুধু রসূল সা. এর মুখ থেকে শুনতে শুনতে। কেননা তিনি প্রতি জুমার দিনে খুতবার সময়ে মিম্বর থেকে এটি পড়তেন। - আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী ও আবু দাউদ। ইয়ালা বিন উমাইয়া রা. বলেছেন : আমি রসূল সা. কে মিম্বরে পড়তে শুনেছি : "ওয়া নাদাও ইয়া মালিকু" (সূরা যুখরুফ) -বুখারি, মুসলিম। ইবনে মাজাহতে

রয়েছে : উবাই রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জুমার দিনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর পার্থিব আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন জাতিগুলোর কথা স্মরণ করাতেন ও সূরা তাবারাকাল্লাজী পড়তেন। রওযাতুন নাদিয়া গ্রন্থে আছে : শরিয়ত সম্মত খুতবা সেটাই, যা রসূল সা. জনগণকে আখিরাতের সুসংবাদ ও সতর্কবাণী শুনিয়ে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং এটাই হলো খুতবার প্রাণ, যার জন্য শরিয়তে খুতবার প্রচলন হয়েছে। আর খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা, আল্লাহর রসূলের উপর দরূদ প্রেরণ বা কুরআনের অংশ বিশেষ পড়া শরিয়তে খুতবা প্রচলনের মূল উদ্দেশ্যের বাইরের ব্যাপার। রসূলুল্লাহ সা. এর খুতবায় এটা সংঘটিত হওয়া দ্বারা প্রমাণিত হয়না যে, এটাই খুতবার চরম ও পরম লক্ষ্য এবং অপরিহার্য শর্ত। যে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীকার করবেন খুতবার মূল উদ্দেশ্য হলো ওয়ায বা সদুপদেশ, খুতবার শুরুতে যে আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলের উপর দরূদ পাঠানো হয়, সেটা নয়।

আরবদের চিরাচরিত রীতি হলো, তাদের কেউ যখন কোনো পদে অধিষ্ঠিত হতো বা কোনো ভাষণ দিতো, তখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রশংসা দিয়েই তা শুরু করতো। এটাতো খুবই উত্তম ও চমৎকার রীতি। তবে সেটাই আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং তার পরবর্তী বক্তব্যগুলোই উদ্দেশ্য। আর যদি তিনি বলতেন : যে ব্যক্তি কোনো সভা সমাবেশে ভাষণ দিতে দাঁড়ায় তাঁর ভাষণের পেছনে আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলের প্রতি দরূদ ছাড়া আর কিছু প্রেরণাদাতা হিসেবে উপস্থিত থাকেন তবে গ্রহণযোগ্য হতোনা, বরং প্রত্যেক সুস্থ মন মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করতো। এটা যখন স্বীকৃত, তখন জানা গেলো, জুমার খুতবায় সদুপদেশই প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে স্থান লাভ করে, আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলের প্রতি দরূদ মূল উদ্দেশ্য নয়। কাজেই খতিব যখন সদুপদেশ দানের কাজটা সম্পন্ন করেন, তখন প্রকৃত শরয়ী কাজটিই তিনি সম্পন্ন করেন। তবে তিনি যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রশংসাও তার ভাষণে অন্তর্ভুক্ত করেন, অথবা কুরআনের উদ্দীপনাময় অংশগুলো তার সাথে যুক্ত করেন, তাহলে তা আরো ভালো ও পূর্ণাংগ হবে।

উভয় খুতবা দাঁড়িয়ে দেয়া ও দু'টির মাঝখানে স্বল্প সময়ের জন্য বসা : ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জুমার দিনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন তারপর আবার দাঁড়াতেন, যেমন আজকাল খতিবরা করে থাকেন। –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। জাবের বিন সামুরা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন, তারপর আবার দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। কাজেই যে ব্যক্তি বলে, তিনি বসে খুতবা দিতেন, সে মিথ্যা বলে। কেননা আল্লাহর কসম, আমি তাঁর সাথে দু'হাজার বারেরও বেশি নামায (অর্থাৎ ফরয নামায) পড়েছি। –আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ। আর তাউস বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আবু বকর, উমর ও উসমানরা দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। মুয়াবিয়াই সর্বপ্রথম বসে খুতবা দেন। শা'বী বলেছেন : মুয়াবিয়া কেবল তার পেটের ভুড়ি ও শরীরের গোশত বেড়ে গেলেই বসে খুতবা দিতেন। রসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবিগণ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন এবং খুতবার মাঝে বসতেন বলে এই দাঁড়ানো ও বসাকে কোনো কোনো ইমাম ওয়াজিব বলে রায় দিয়েছেন। কিন্তু কথার মাধ্যমে আদেশ দেয়া ব্যতিত নিছক তাঁদের কাজ দেখে কোনো কিছুকে ওয়াজিব স্থির করা সঠিক নয়।

খুতবা উচ্চ কণ্ঠে, সংক্ষিপ্ত আকারে ও গুরুত্ব সহকারে দেয়া বাঞ্ছনীয় : আম্মার বিন ইয়াসার রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : খুতবা সংক্ষিপ্ত করা ও নামাযকে দীর্ঘতর করা শরিয়তের ব্যাপারে বিচক্ষণতার লক্ষণ। সুতরাং তোমরা নামাযকে দীর্ঘ ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করো। –আহমদ ও মুসলিম। নামাযকে দীর্ঘ ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করা শরিয়ত সম্পর্কে

বিচক্ষণতার লক্ষণ বলার কারণ হলো, শরিয়তের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দক্ষতা যার থাকে (অর্থাৎ ফকীহ), সে অল্প কথায় ব্যাপক বক্তব্য রাখার যোগ্য শব্দ চয়ন করতে পারে।

জাবের বিন সামুরা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এর নামাযও ছিলো মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ, তাঁর খুতবাও ছিলো মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ। –বুখারি ও আবু দাউদ ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. নামায লম্বা ও খুতবা খাটো করতেন। –নাসায়ী। জাবির রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন খুতবা দিতেন, তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেতো, কণ্ঠ উঁচু হতো এবং আবেগে উদীপ্ত থাকতেন, যেনো একটি সেনাবাহিনীকে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, সাবধান, শত্রু বাহিনী সকালে বা সন্ধ্যায় এসে পড়বে। –মুসলিম ও ইবনে মাজাহ। নববী বলেছেন : খুতবা শ্রুতিমধুর, মার্জিত, সাবলীল, সহজবোধ্য, সুশৃঙ্খল, সুস্পষ্ট, নীতিদীর্ঘ ও নীতিসূক্ষ্ম হওয়া মুস্তাহাব। খুতবার ভাষা অশালীন হওয়া চাইনা। কেননা তা শ্রোতাদের মনে প্রভাব বিস্তার করেনা, খুতবার ভাষা অভদ্র ও অরুচিকর হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তাতে খুতবার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়না। বরঞ্চ খুতবায় রুচিশীল সহজ ও প্রাঞ্জল শব্দ চয়ন করা উচিত। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এর খুতবাও ছিলো তদ্রূপ। তা ছিলো আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রসূল ও আখেরাতের ঈমান এবং বেহেশত ও দোযখের বিবরণে ভরপুর। তাতে ছিলো আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের জন্য কী কী নিয়ামত রেখেছেন। আর তাঁর শত্রু ও অবাধ্যদের জন্য কী কী শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন তার বিবরণে পরিপূর্ণ। ফলে তার খুতবা শুনে তওহীদ, ঈমান এবং আল্লাহ ও তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন জাতিগুলো সংক্রান্ত কথা শুনে মানুষের মন ঈমান ও আবেগে পরিপূর্ণ হতো। অন্যদের ভাষণাদির মতো তার ভাষণ ছিলনা যা শুধু সৃষ্টি সংক্রান্ত তথ্যাবলি পরিবেশন করে, যা জীবন ও তার সুখ সম্ভোগের প্রতি আসক্ত এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভীত করে তোলে। সেসব ভাষণ শুনে শ্রোতারা কোনো উপকার লাভ না করেই বেরিয়ে যায়, একদিন তারা মারা যায়, তাদের সহায় সম্পত্তি বিলি বণ্টন হয়ে যায় এবং মাটি তাদের দেহকে খেয়ে ফেলে। সেসব ভাষণ থেকে ঈমানও জন্মেনা। তওহীদ বা কোনো উপকারি জ্ঞানও অর্জিত হয়না। পক্ষান্তরে কেউ যদি রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবিদের খুতবাসমূহ পর্যালোচনা করে, তাহলে দেখতে পাবে, সেগুলো হেদায়েত, তাওহীদ ও আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আলোচনায় পরিপূর্ণ। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো, আল্লাহর দিকে আহ্বান ও আল্লাহর নিয়ামতের বিবরণে পরিপূর্ণ। আল্লাহর শাস্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর স্মরণের মাধ্যমে তার আযাবের ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা তাতে লক্ষণীয়। আল্লাহর স্মরণ ও তার শোকরের জন্য তাতে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর গুণাবলির আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসা জন্মানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর ইবাদত, শোকর ও যিকিরের আদেশ দানের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে শ্রোতারা সেসব খুতবা শুনে যখন বের হতো, তখন আল্লাহ ও তাদের মধ্যে পুরোপুরি ভালোবাসার অটুট বন্ধন সৃষ্টি হয়ে যেতো। এরপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে। শরিয়তের বিধান ও আল্লাহর হুকুম নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। তার হক আদায় ও প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের কোনো চেষ্টা ও যত্ন নেই। তাই খুতবাগুলোও নেহাত সুশ্রাব্য গদবাঁধা ভাষণে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে এ থেকে আন্তরিকতা শুধু হ্রাস পায়নি বরং বলতে গেলে তা উধাও হয়ে গেছে এবং খুতবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

কোনো বিশেষ ঘটনার কারণে খুতবায় বিরতি : আবু বুরাইদা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। সহসা হাসান ও হুসাইন এলেন। তাদের গায়ে দুটো লাল জামা ছিলো। তারা আছাড় ও হোঁচট খেতে খেতে উঠে পড়ে করে হেঁটে আসছিল। তৎক্ষণাৎ

রসূলুল্লাহ সা. খোতবা স্থগিত রেখে মিম্বর থেকে নেমে এলেন। তাদেরকে কোলে করে নিজের সামনে রাখলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন, "তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদি পরীক্ষা মাত্র। আমি এই দুই শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আছাড় পাছাড় খেয়ে উঠে পড়ি করে হেঁটে আসছে। এজন্য আমি আমার খুতবায় বিরতি না দিয়ে পারিনি। –পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আবি রিফায়া রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় আমি তার কাছে গিয়ে হাযির হলাম। বললাম : হে রসূলুল্লাহ! আমি একজন প্রবাসী, আমি ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাই। আমি জানিনা আমার ধর্ম কী? রসূলুল্লাহ সা. তৎক্ষণাৎ আমার দিকে তাকালেন এবং খুতবা বন্ধ করে আমার কাছে চলে এলেন। তারপর এমন একটা কাঠের চেয়ার আনালেন যার পাগুলো লোহার তৈরি। তিনি চেয়ারাটিতে বসলেন এবং আল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে তাঁকে যতোটুকু জ্ঞান দান করেছেন তা থেকে কিছুটা আমাকেও দিতে লাগলেন। তারপর তিনি আবার মিম্বরে এসে খুতবা সম্পূর্ণ করলেন। –মুসলিম ও নাসায়ী।

ইবনুল কাইয়িম বলেছেন : কখনো কখনো রসূলুল্লাহ সা. বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বা সাহাবিদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য খুতবা স্থগিত করতেন। কখনো কখনো প্রয়োজনে মিম্বর থেকে নামতেন তারপর পুনরায় ফিরে যেতেন এবং খুতবা সম্পূর্ণ করতেন। যেমন হাসান ও হুসাইনের জন্য নেমেছিলেন, তাদেরকে কোলে নিয়ে মিম্বরে উঠেন। উঠে খুতবা শেষ করেছিলেন। খুতবার সময়ে কাউকে ডেকে বলতেন, হে অমুক, এসো, বসো, হে অমুক নামায পড়ো। রসূলুল্লাহ সা. পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে খুতবা দিতেন।

১৭. খুতবার সময়ে কথা বলা নিষেধ

অধিকাংশ আলেমের মতে নিরবে খুতবা শোনা ওয়াজিব এবং খুতবার সময় কথা বলা হারাম, এমনকি তা যদি সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা সংক্রান্তও হয় এবং সে সময় চাই খুতবা শোনা হোক বা না হোক। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "ইমাম খুতবা দেয়ার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে, সে সেই গাধার মতো যা বিপুল সংখ্যক বই বহন করে। আর যে ব্যক্তি তাকে বলে 'চুপ করো' তার জুমা আদায় হবেনা।" –আহমদ। (তার জুমা যোহর গণ্য হবে। কেননা এই ওয়াক্তের ফরয সর্বসম্মতভাবে বাতিল হয়ে গেছে।)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জুমার নামাযে তিন ধরনের লোক উপস্থিত হয় : কেউ উপস্থিত হয়ে বেহুদা কথাবার্তা বলে। এ ধরনের লোক তার বেহুদা কথা ছাড়া আর কিছুই পায়না। আরেকজন উপস্থিত হয় দোয়া করার জন্য। সে আল্লাহর কাছে যা চায়, তা আল্লাহ ইচ্ছা করলে দেবেন, নচেত দেবেননা। আরেকজন নিরবে উপস্থিত হয়, কাউকে কষ্ট দেয়না, কারো ঘাড় টপকায়না। তার জন্য জুমার নামায এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত সমস্ত গুনাহর কাফফারা হয়ে যায় এবং আরো তিন দিনের জন্যও কাফফারা হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি একটা ভালো কাজ করে তার জন্য তার দশগুণ সওয়াব রয়েছে।" –আহমদ, আবু দাউদ। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তুমি যখন তোমার পাশের লোককে বললে- "চুপ করো, তখন তুমি বেহুদা কথা বললে।" ইবনে মাজাহ ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আবু দারদা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. মিম্বরে বসলেন, খুতবা দিলেন এবং একটি আয়াত পড়লেন। তখন আমার পাশে উবাই বিন কা'ব বসা ছিলেন। আমি তাকে বললাম : হে উবাই, এ আয়াত কখন নাযিল হয়েছে? উবাই জবাব দিলেননা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম। এবারও জবাব দিলেননা। তারপর যখন রসূলুল্লাহ সা. মিম্বর থেকে

নামলেন, তখন উবাই আমাকে বললেন : আজকের জুমা থেকে তুমি তোমার বেহুদা কথা ছাড়া আর কিছু পেলেনা। এরপর যখন রসূলুল্লাহ সা. বের হলেন, তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে উবাই যা বলেছে তা জানালাম। তিনি বলেন : উবাই সত্য বলেছে। যখন তুমি শুনবে তোমার ইমাম কথা বলছে, তখন তা নিরবে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করবে। –আহমদ ও তাবারানি। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে যে ব্যক্তি ইমামের কথা শুনতে পায়, তার জন্য কথা বলা হারাম, আর যে ব্যক্তি ইমামের কথা শুনতে পায়না, তার জন্য কথা বলা হারাম নয়। তবে না বলা মুস্তাহাব। তিরমিযি বলেছেন : আহমদ ও ইসহাকের মতে ইমামের খুতবা দেয়ার সময় সালামের জবাব দেয়া ও হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা জায়েয। শাফেয়ী বলেছেন : কেউ যদি জুমার দিন হাঁচি দেয় এবং অপর ব্যক্তি ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে, আমি আশা করি এটা তার জন্য বৈধ হবে। কেননা হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা সুন্নত। তবে কেউ যদি কাউকে সালাম দেয় তবে তা মাকরূহ মনে করি। কিন্তু জবাব দেয়া উচিত। কেননা সালাম দেয়া সুন্নত এবং তার জবাব দেয়া ফরয। তবে খুতবার সময় ছাড়া অন্য সময়ে কথা বলা জায়েয। ছা'লাবা বিন আবু মালেক বলেছেন : উমর মিম্বরে বসা অবস্থায় লোকেরা কথা বলতো। মুয়াযযিন যখন আযান শেষ করতো, তখন উমর দাঁড়াতেন। তখন আর কেউ কথা বলতোনা উভয় খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর যখন উমর রা. মিম্বর থেকে নামতেন এবং নামায শুরু হওয়ার উপক্রম হতো তখন লোকেরা কথা বলতো। –মুসনাদে শাফেয়ী। আহমদ বর্ণনা করেছেন : উসমান রা. মিম্বরের উপর আছেন এবং মুয়াযযিন একামত দিচ্ছে, ইমতাবস্থায় তিনি লোকজনের কাছে তাদের হালহাকিকত ও বাজার দর জিজ্ঞাসা করতেন।

১৮. জুমার এক রাকাত বা তারও কম পাওয়া

অধিকাংশ আলেমের মতে, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমার এক রাকাত পাবে, সে জুমা পেয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং আরো এক রাকাত যোগ করা তার কর্তব্য।

ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমার এক রাকাত পাবে, সে যেনো আরো এক রাকাত পড়ে নেয়। তার নামায আদায় হয়ে যাবে। –নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দার কুতনি। আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পায় সে পুরো নামায পায়। –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

তবে যে ব্যক্তি এক রাকাতের কম পায়, সে জুমা থেকে বঞ্চিত এবং তাকে চার রাকাত যোহর পড়তে হবে। অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমার এক রাকাত পেয়েছে, সে যেনো আরো এক রাকাত পড়ে নেয়। আর যার দুই রাকাতই ছুটে যায় সে যেনো চার রাকাত পড়ে। –তাবারানি। ইবনে উমর রা. বলেছেন : যখন জুমার এক রাকাত পাও তখন আরেক রাকাত পড়ে নাও। আর যদি বৈঠকরত অবস্থায় জামাত পাও, তাহলে চার রাকাত পড়ো। –বায়হাকি।

এটা হলো শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মযহাব ও মুহাম্মদ বিন হাসানের মযহাব। আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তাশাহহুদ পায়, সে জুমার নামায পায়। ইমামের সালামের পর সে দু'রাকাত পড়লেই তার জুমা আদায় হয়ে যায়।

ভিড়ের সময় নামায : আহমদ ও বায়হাকি সাইয়ার থেকে বর্ণনা করেন, উমর রা. কে বলতে শুনেছি : রসূলুল্লাহ সা. এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আমরা মুহাজির ও আনসারগণ তাঁর সাথে ছিলাম। যখন ভিড় বেড়ে যায়, তখন অপরের পিঠের উপর সাজদা করো। একদল লোককে রাস্তার উপর নামায পড়তে দেখে তিনি বললেন : মসজিদে গিয়ে নামায পড়ো।

১৯. জুমার আগে ও পরে নফল নামায

জুমার নামাযের পরে চার রাকাত বা দু'রাকাত নামায পড়া সুন্নত। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ জুমার পরে নামায পড়লে সে যেনো চার রাকাত পড়ে। –মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি। ইবনে উমর রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. শুক্রবারে নিজের বাড়িতে দু'রাকাত নামায পড়তেন। –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জুমার নামাযের পর বাড়িতে প্রবেশ করে দু'রাকাত পড়তেন। আর যারা জুমা পড়েছে তাদেরকে চার রাকাত পড়ার হুকুম দিতেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : মসজিদে পড়লে চার রাকাত আর বাড়িতে পড়লে দু'রাকাত পড়তেন। বস্তুত: হাদিস থেকেও এটাই প্রমাণিত।

আবু দাউদ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন মসজিদে নামায পড়তেন তখন চার রাকাত পড়তেন, আর যখন বাড়িতে পড়তেন, তখন দু'রাকাত পড়তেন। বুখারি ও মুসলিমে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. জুমার পর বাড়িতে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন।

আর যখন তিনি চার রাকাত পড়তেন, তখন কেউ বলেন : এক সাথেই তা পড়তেন। আবার কেউ বলেন : প্রথম দু'রাকাত পড়ে সালাম ফেরাতেন, তারপর পুনরায় দু'রাকাত পড়তেন। তবে এ নামায বাড়িতে পড়াই উত্তম। আর মসজিদে পড়লে যে জায়গায় ফরয পড়েছে, সে জায়গা থেকে সরে পড়বে।

জুমার পূর্বে সুন্নত পড়া সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আযানের পর জুমার নামাযের আগে কোনো নামায পড়তেননা। কেউ তা বর্ণনাও করেনি। তাঁর আমলে তিনি মিম্বরে বসার পরেই আযান দেয়া হতো। বিলাল আযান দিতেন এবং তার পরই তিনি দুটি খুতবা দিতেন। তারপর বিলাল ইকামত দিতেন। তখন রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়াতেন। সুতরাং আযানের পর তার পক্ষেও কোন নামায পড়া সম্ভব ছিলোনা, তাঁর সাথে নামায আদায়কারী কোন মুসলমানের পক্ষেওনা। তিনি জুমার দিন বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে কোনো নামায পড়তেন এ কথা যেমন কেউ বর্ণনা করেনি, জুমার পূর্বে নির্দিষ্ট কোনো নামাযের উল্লেখও কেউ করেনি। রসূলুল্লাহ সা. মসজিদে যাওয়ার পরে নামায পড়তে উৎসাহ দিতেন ঠিকই। কিন্তু সে জন্য সময় ও রাকাত নির্দিষ্ট করেননি। শুধু শুক্রবারের কথা বলা আছে। যেমন তিনি বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো কিছুতে আরোহন না করে সকাল সকাল হেঁটে মসজিদে গিয়ে যা তার জন্য নির্দিষ্ট আছে তা পড়বে।" ..... এটাই সাহাবিদের থেকেও বর্ণিত রয়েছে। জুমার দিন তারা যখন মসজিদে আসতেন, মসজিদে প্রবেশের সময় থেকেই যার পক্ষে যতোটা সম্ভব নামায পড়তেন। কেউ দশ রাকাত, কেউ বারো রাকাত। কেউ আট রাকাত, কেউ আরো কম পড়তেন। এ জন্য অধিকাংশ ইমাম একমত যে, জুমার পূর্বে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক সুন্নত নেই। কেননা ওটা শুধু রসূলুল্লাহ সা. এর কথা অথবা কাজ দ্বারাই প্রমাণিত হতে পারে। অথচ তিনি তাঁর কথা কিংবা কাজ দ্বারা এ ব্যাপারে কোনো সুন্নত নামায চালু করেননি।

২০. একই দিনে ঈদ ও জুমা হলে

একই দিনে যখন জুমা ও ঈদ একত্রিত হয়ে যায়, তখন যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়েছে তার জুমা পড়ার প্রয়োজন নেই।

যায়দ বিন আরকাম রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. ঈদ পড়লেন এবং জুমার ব্যাপারে রেয়াত

দিলেন। বললেন : যার ইচ্ছা হয় পড়ুক। –পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আজকের দিনে তোমাদের কাছে একত্রে দুটো ঈদ সমাগত হয়েছে। যে চাইবে, ঈদ পড়লে তার জুমা না পড়লেও চলবে। আমরা জুমা পড়বো।" –আবু দাউদ।

যারা জুমায় উপস্থিত হতে চায় এবং ঈদে উপস্থিত হয়না, তাদের জন্য জুমার নামাযের ইমামতি করা ইমামের জন্য মুস্তাহাব। হাম্বলীদের মতানুসারে যারা জুমা পড়তে চায়না, তাদের জন্য যোহর পড়া ফরয। কেননা তারা ঈদে উপস্থিত থেকেছে। তবে ফরয নয়– এই মতটিই অগ্রগণ্য। কেননা ইবনে যুবায়ের থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : একই দিনে দুই ঈদ একত্রিত হয়েছে। তিনি উভয় নামায প্রত্যুষে দু'রাকাত করে পড়েছেন। আসর পর্যন্ত তার চেয়ে বেশি আর কোনো নামায পড়েননি।

৩৩. দুই ঈদের নামায

হিজরী ১ম বর্ষেই দুই ঈদের নামায প্রবর্তিত হয়। এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রসূলুল্লাহ সা. এ নামায নিয়মিতভাবে পড়তেন এবং মুসলিম নরনারীকে এ নামাযের জন্য বের হবার আদেশ দিয়েছেন। নিম্নে এ নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি জরুরি বিধি তুলে ধরা হলো :

১. গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরা

জাফর বিন মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক ঈদের দিন ইয়ামানী পোশাক বুরদ হিবরা' পরিধান করতেন। –শাফেয়ী ও বগবি। রসূল সা.-এর দৌহিত্র হাসান রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে ঈদে যথাসম্ভব সর্বোত্তম পোশাক পরতে, যথাসম্ভব সর্বোত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতে এবং যথাসম্ভব সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পশু কুরবানি করতে আদেশ দিয়েছেন। –হাকেম। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. উভয় ঈদে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরতেন। দুই ঈদ ও জুমায় পরার জন্য তাঁর একটা ভালো পোশাক ছিলো।

২. ঈদুল ফিতরের জন্য বের হবার আগে কিছু খাওয়া, ঈদুল আযহার পরে

রাসূল সা. ঈদুল ফিতরে নামাযের জন্য বের হবার আগে বেজোড় সংখ্যক খোরমা খেতেন। আর ঈদুর আযহায় ঈদের মাঠ থেকে ফেরার পর নিজে কুরবানি দিলে কুরবানির গোশত দিয়ে দিনের খাওয়া আরম্ভ করতেন।

আনাস রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. ঈদুল ফিতরের দিন যখন সকালে বের হতেন, তখন বেজোড় সংখ্যক খোরমা খেয়েই বের হতেন। –আহমদ, বুখারি। বুরাইদা রা. বলেছেন : ঈদুল ফিতরের দিন রসূলুল্লাহ সা. না খেয়ে বের হতেননা। আর ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহ থেকে না ফিরে কিছু খেতেননা। –তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, আহমদ। আমহদ যোগ করেছেন : নিজের কুরবানি থেকে খেতেন। মুয়াত্তায় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত : মুসলমানদেরকে ঈদুল ফিতরের দিন সকালে বের হবার আগে খাওয়ার আদেশ দেয়া হতো।

ইবনে কুদামা বলেছেন : ঈদুল ফিতরের দিন নামাযের পূর্বে খাওয়া মুস্তাহাব হবার ব্যাপারে কোনো মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই।

৩. ঈদগাহে গমন

ঈদের নামায মসজিদে পড়াও জায়েয। তবে ঈদগাহে পড়া উত্তম– যদি ঝড় বৃষ্টির কারণে কোনো বাধা-বিপত্তি দেখা না দেয়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. উভয় ঈদ ঈদগাহে পড়তেন। (মক্কা শরীফ বাদে। কেননা মসজিদুল হারামে ঈদের নামায সর্বোত্তম।) তিনি একবার বৃষ্টির কারণ ব্যতিত আর কখনো মসজিদে নববীতে ঈদ পড়েননি।

আবু হুরায়রা রা. বলেন : একবার ঈদের দিন বৃষ্টি হলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. মসজিদে ঈদের নামায পড়লেন। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম।

৪. ঈদের ময়দানে নারী ও শিশুদের গমন

শরিয়তে উভয় ঈদে নারী ও শিশুদের ঈদগাহে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, চাই সে কুমারী বা অকুমারী, যুবতী বা বুড়ি, কিংবা ঋতুবতী– যা-ই হোক না কেন। উম্মে আতিয়া রা. বলেছেন : আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল যেনো কুমারী এবং ঋতুবতী মেয়েদেরকেও উভয় ঈদে ঈদগাহে পাঠাই, যাতে তারা কল্যাণ ও মুসলমানদের উপদেশে যোগদান করতে পারে। ঋতুবতীরা কেবল নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকতো। –বুখারি, মুসলিম। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদেরকে উভয় ঈদে ঈদগাহের দিকে পাঠাতেন। –ইবনে মাজাহ, বায়হাকি। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন বের হলাম। তারপর তিনি নামায পড়ালেন ও খুতবা দিলেন। তারপর মহিলাদের কাছে এলেন, তাদেরকে সদুপদেশ দিলেন, আখেরাত স্মরণ করালেন এবং সদকা দেয়ার আদেশ দিলেন। –বুখারি।

৫. ভিন্ন ভিন্ন পথে যাওয়া ও আসা

অধিকাংশ আলেমের মতে, ঈদের নামাযের জন্য এক পথ দিয়ে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা মুস্তাহাব - চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদি। জাবির রা. বলেছেন : ঈদের দিন রসূল সা. এক পথ দিয়ে মাঠে যেতেন, অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতেন। –বুখারি। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : রসূল সা. ঈদের দিন এক পথ দিয়ে বের হতেন, অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতেন। –আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি। তবে যে পথ দিয়ে যাওয়া হয়, সেই পথ দিয়ে ফিরে আসা জায়েয। আবু দাউদ, হাকেম ও বুখারিতে বাকর বিন মুবাশশার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন রসূলুল্লাহর সাহাবিদের সাথে ঈদগাহ অভিমুখে যেতাম। আমরা বাতনে বিতহান নামক উপত্যকা দিয়ে ঈদগাহে যেতাম। রসূল সা.-এর সাথে নামায পড়ার পর পুনরায় বাতনে বিতহান দিয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে আসতাম।

৬. ঈদের নামাযের সময়

সূর্য তিন মিটার পরিমাণ উপরে উঠার পর থেকে হেলে যাওয়া পর্যন্ত ঈদের সময়। আহমদ জুনদুব থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. আমাদেরকে ঈদুল ফিতরের নামায পড়াতেন সূর্য দুই বর্শা পরিমাণ এবং ঈদুল আযহা এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠলে। (এক বার্শা তিন মিটার ধরা হয়)। শওকানি বলেছেন : দুই ঈদের নামাযের সময় নির্ধারণ এই হাদিসটিই সর্বোত্তম। হাদিস থেকে জানা যায়, ঈদুল আযহা অপেক্ষাকৃত কম বিলম্বিত ও ঈদুল ফিতর অপেক্ষকৃত বেশি বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। ইবনে কুদামা বলেছেন : কুরবানির সময়কে প্রশস্ত করার জন্য ঈদুল আযহার নামায ত্বরান্বিত করা ও ফিতরা দেয়ার সময়কে প্রশস্ত করার জন্য ঈদুল ফিতরের নামাযকে বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই।

৭. ঈদের নামাযে আযান ও ইকামত নেই

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন ঈদগাহে পৌঁছে যেতেন, তখন আযান ও ইকামত ছাড়াই এবং 'নামায শুরু হচ্ছে' মর্মে ঘোষণা দেয়া ছাড়াই নামায শুরু করে দিতেন। এ সবের কোনো কিছু না করাই সুন্নত।

ইবনে আব্বাস ও জাবির রা. বলেছেন : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার কোনোটাতেই কোনো আযান দেয়া হতোনা। -বুখারি ও মুসলিম। মুসলিম আতা থেকে বর্ণনা করেন : জাবির রা. আমাকে জানিয়েছেন, ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য ইমাম বের হবার সময় বা তার পরে কোনো আযান, ইকামত, ঘোষণা বা অনুরূপ কিছুই করা যাবেনা। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আযান ও ইকামত ছাড়াই ঈদের নামায পড়তেন। আর দুটো খুতবা দিতেন এবং উভয় খুতবার মাঝে কিছুক্ষণ বসতেন। -বাযযার।

৮. ঈদের নামাযে তাকবীর

ঈদের নামায দু'রাকাত এতে প্রথম রাকাত কিরাতের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার পরে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাত কিয়ামের তাকবীর ব্যতিত পাঁচটি তাকবীর দেয়া সুন্নত। প্রত্যেক তাকবীরে হাত তুলবে।

আমার ইবনে শুয়াইব থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. এক ঈদে বারটি তাকবীর দিলেন : প্রথম রাকাতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকাত পাঁচবার। ঈদের নামাযে আগে বা পরে আর কোনো নামায পড়েননি। -আহমদ, ইবনে মাজাহ। ইমাম আহমদ বলেছেন : আমি এই মতই পোষণ করি।

আবু দাউদ ও দারু কুতনির এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : "ঈদুল ফিতরে প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর। উভয় রাকাতেই তাকবীরের পরে কিরাত পড়তে হবে।"

এই মতটি সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য মত। অধিকাংশ সাহাবি, তাবেয়ী ও ইমাম এই মত পোষণ করতেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন : বিশুদ্ধ সনদে রসূল সা. থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তিনি উভয় ঈদে প্রথম রাকাতে সাতবার ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার তাকবীর দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে উমর, জাবির, আয়েশা আবু ওয়াকেদ ও আমর বিন আওফ মাযানী থেকে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। এর বিপরীত কোনো সহীহ বা দুর্বল হাদিস বর্ণিত হয়নি এবং সর্বপ্রথম এর উপরই আমল হয়েছে।

হানাফি মাযহাবে প্রথম রাকাত তাকবীর তাহরীমার পরে কিরাতের পূর্বে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাত কিরাতের পরে তিন তাকবীর প্রচলিত।

রসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প সময় বিরতি দিতেন। এই সময় নির্দিষ্ট কোনো দোয়া বা যিকির পড়তেন কিনা তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়না। তবে তাবারানি ও বায়হাকি বিশ্বস্ত সূত্রে ইবনে মাসউদের কথা ও কাজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুই তাকবীরের মাঝে আল্লাহর প্রশাংসা করতেন এবং রসূল সা. এর উপর দরূদ পাঠ করতেন। হুযায়ফা ও আবু মূসাও রা. অনুরূপ করতেন বলে জানা যায়।

আহমদ ও শাফেয়ী দুই তাকবীরের মাঝখানে "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" বা অনুরূপ কোনো দোয়া বা যিকির করা মুস্তাহাব মনে করেন। আবু হানিফা ও মালেক বলেছেন : তাকবীরগুলোর মাঝে কোনো দোয়া বা যিকিরের বিরতি না দিয়ে একটানা তাকবীর দেবে। ঈদের নামাযের এই তাকবীর সুন্নত। ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে যেভাবেই হোক কেউ এটা বাদ দিলে নামায বাতিল হবেনা। শওকানির মতে ভুলে তাকবীর বাদ দিলে সাহু সাজদা দিতে হবেনা। ইবনে কুদামাও এই মত পোষণ করেন এবং বলেন এতে কোনো মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই।

৯. ঈদের নামাযের পূর্বে ও পরে নামায

ঈদের নামাযের আগে বা পরে কোনো সুন্নত নামায আছে বলে প্রমাণ নেই। রসূল সা. ও তাঁর সাহাবিগণ ঈদগাহে যাওয়ার পর নামাযের আগে বা পরে কোনো নামায পড়তেননা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ঈদের দিন বের হতেন। তারপর দু'রাকাত নামায পড়তেন। তার আগে বা পরে কোনো নামায পড়তেননা। সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ঈদের দিন বের হলেন। ঈদের নামাযের আগেও কোনো নামায পড়লেননা, পরেও না। তিনি উল্লেখ করেছেন, রসূল সা. এরূপই করতেন। -বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছন : ঈদের আগে নামায পড়াকে তিনি মাকরূহ মনে করতেন। তবে সাধারণ নফল সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজর ফাতহুল বারীতে বলেছেন, কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে এটা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয়নি। অন্য সকল দিনে যে সময় নফল পড়া মাকরূহ এদিনও সেই সময় মাকরূহ।

১০. যাদের জন্য ঈদের নামায পড়া বৈধ

পুরুষ, মহিলা, শিশু, মুকিম, মুসাফির, সকলেরই ঈদের নামায পড়া বৈধ- চাই সে বাড়িতে, মসজিদে বা ঈদগাহে যেখানেই পড়ুক। জামাতের সাথে ঈদের নামায ছুটে গেছে এমন ব্যক্তি দু'রাকাত নামায পড়ে নেবে। ইমাম বুখারি, বলেছেন : ঈদের নামায ছুটে গেলে দু'রাকাত পড়ে নেবে। এ সংক্রান্ত অধ্যায় অনুরূপ, যারা বাড়িতে ও গ্রামে আছে, তারাও পড়বে। কেননা রসূল সা. বলেছেন : এটা আমাদের মুসলমানদের ঈদ। আনাস বিন মালেক যাবিয়ায় বসবাসরত তার মুক্ত গোলামকে ঈদ পড়ার আদেশ দিলেন। তদনুসারে সে তার স্বজনদেরকে সমবেত করে শহরবাসীর মতো তাকবীর সহকারে ঈদের নামায পড়তো। ইকরামা রা. বলেছেন : শহরতলীর লোকেরা ঈদের দিন একত্রিত হয় এবং ইমাম, যেভাবে পড়েন সেভাবে দু'রাকাত নামায পড়বে। আতা বলেছেন : যখন ঈদের জামাত ছুটে যায়, তখন দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়া উচিত।

১১. ঈদের নামাযের খুতবা

ঈদের নামাযের খুতবা দেয়া সুন্নত এবং তা শ্রবণ করাও সুন্নত। আবু সাঈদ রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন 'মুসাল্লাতে' (মসজিদে নববী থেকে একশো গজ দূরের একটি জায়গার নাম) চলে যেতেন। সেখানে সর্বপ্রথমে নামায পড়াতেন, তারপর ঘুরে জনগণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। জনগণ কাতার হয়ে বসে থাকতো। তখন তিনি তাদেরকে আদেশ, উপদেশ ও ওসিয়ত প্রদান করতেন। যদি কোথাও কোনো বাহিনী পাঠাতে চাইতেন তা পাঠানোর আদেশ দিতেন এবং তারপর চলে যেতেন। আবু সাঈদ বলেন : জনগণ এভাবেই দিন অতিবাহিত করতে থাকে। অবশেষে এক সময় এলো, যখন আমি মদিনার শাসক মারওয়ানের সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহায় বের হলাম। যখন আমরা মিম্বরের কাছে এলাম, দেখলাম, সেখানে কাছীর ইবনুস্ সালতের বানানো একটা মিম্বর রয়েছে। দেখলাম, মারওয়ান ঈদের নামাযের আগেই তার উপর আরোহন করতে উদ্যত হচ্ছে। তখন আমি তাকে তার কাপড় ধরে টানলাম। সেও আমাকে টানলো। অতপর সে মিম্বরে আরোহন করলো এবং নামাযের আগে খুতবা দিলো। আমি তাকে বললাম : আল্লাহর কসম, আপনি নিয়ম পাল্টে ফেলেছন। সে বললো : আবু সাঈদ, তুমি যে নিয়ম জানতে, তা অতিত হয়ে গেছে। আমি বললাম : আল্লাহর কসম, আমার জানা জিনিস অজানা জিনিসের চেয়ে ভালো। সে বললো : জনগণ নামাযের পরে আমাদের জন্য বসবেনা। তাই এটাকে আমি নামাযের

আগে নিয়ে এসেছি। -বুখারি, মুসলিম। আবদুল্লাহ বিন ছায়েব বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে ঈদে অংশ নিয়েছি। তিনি যখন নামায শেষ করলেন। তখন বললেন : এখন আমি খুতবা দিতে যাচ্ছি, যে ব্যক্তি খুতবা শোনার জন্য বসতে ইচ্ছুক, সে বসুক। আর যে ব্যক্তি চলে যেতে চায়, সে যেতে পারে। নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

ঈদের জন্য দুটো খুতবা দিতে হবে এবং ইমাম মাঝখানে কিছুক্ষণ বসে বিরতি দেবেন- এই মর্মে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা দুর্বল। নববী বলেছেন : দুই খুতবা সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই।

আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা খুতবা শুরু করা মুস্তাহাব। এর কোনো ব্যতিক্রম রসূল সা. থেকে পাওয়া যায়নি। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন : রসূল সা. তাঁর সকল ভাষণই আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করতেন। কোনো একটি হাদিসেও বলা হয়নি যে, রসূল সা. তকবীরের মাধ্যমে খুতবা শুরু করেছেন। কেবল ইবনে মাজাহ রসূলুল্লাহ সা. এর মুয়াযযিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. খুতবার মাঝে মাঝে তাকবীর দিতেন এবং দুই ঈদের খুতবায় বেশি করে তাকবীর দিতেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়না যে, তিনি খুতবা তাকবীর দ্বারা শুরু করতেন। ঈদের খুতবা ও ইসতিসকার খুতবার শুরু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : উভয়টিই তাকবীর দ্বারা শুরু হবে। কেউ বলেন : ইসতিসকার খুতবা ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) এর মাধ্যমে শুরু হবে। কেউ বলেন : উভয়টিই আল্লাহর প্রশংসার মধ্যে দিয়ে শুরু করা হবে। শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন বলেছেন : এটাই সঠিক। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করা না হলে তা ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে।" রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সকল খুতবা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করতেন। বহু সংখ্যক ফকীহ যদিও বলেছেন, ইসতিসকার খুতবা ইসতিগফার দ্বারা এবং ঈদের খুতবা তাকবীর দ্বারা শুরু করা হবে, তবে তাদের মতের সপক্ষে রসূলুল্লাহ সা. সুন্নতের আদৌ কোনো সমর্থন নেই। সুন্নত বরং এর বিপরীতটাই দাবি করে। সেটি হলো, সকল ধরনের খুতবা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করতে হবে।

১২. ঈদের নামাযের কাযা

আবু উমাইর বিন আনাস রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. এর আনসার সাহাবিদের একটি দল আমাকে জানিয়েছেন : একবার আমরা শওয়ালের চাঁদ দেখতে পাইনি। সকালে আমরা রোযা রাখলাম। দিনের শেষভাগে একটা কাফেলা এলো। তারা রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট সাক্ষ্য দিলো যে, তারা গতকাল চাঁদ দেখেছে। তখন রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরেকে রোযা ভেংগে ফেলার এবং পরের দিন ঈদের নামায পড়ার আদেশ দিলেন। -আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

তারা বলেন, কোনো লোক দলের যদি কোনো ওযরবশত ঈদের নামায ছুটে যায়, তবে তারা পরের দিন ঈদের নামায পড়বে।

১৩. ঈদে খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন গান ও খাওয়া দাওয়া

বৈধ খেলাধুলা, নির্দোষ চিত্তবিনোদন, ভালো গান এসব হচ্ছে ইসলামের রীতি, যা আল্লাহ তায়ালা ঈদের দিন শরীর চর্চা এবং মানসিক প্রফুল্লতা ও চিত্তবিনোদনের জন্য শরিয়তসম্মত করে চালু করেছেন।

আনাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন মদিনায় এলেন, তখন মদিনাবাসীর খেলাধুলার দুটো দিন প্রচলিত ছিলো। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য এর উত্তম বিকল্প নির্ধারণ করেছেন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। -নাসায়ী। আয়েশা রা. বলেছেন :

ঈদের দিন হাবশীরা রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট খেলাধুলা করতো। আমি তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে তা দেখার চেষ্টা করছিলাম, তিনি তার ঘাড় নিচু করলেন। ফলে আমি তার ঘাড়ের উপর দিয়ে দেখতে লাগলাম এবং তৃপ্ত হয়ে ফিরে গেলাম। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম। এই তিন গ্রন্থেই অপর এক বর্ণনায় আয়েশা রা. বলেন : আবু বকর ঈদের দিন আমাদের বাড়িতে এলেন। আমাদের কাছে তখন দুটো দাসী ছিলো। তারা (গানের মাধ্যমে) বুয়াস যুদ্ধের ঘটনাবলির স্মৃতিচারণ করছিল, সে দিন আওস ও খাযরাজের বড় বড় সরদার ও বীরযোদ্ধা নিহত হয়।

মদিনার দুটি গোত্র আওস ও খাজরাজের মধ্যে জাহেলী যুগে এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে খাজরাজের হাতে আওসের বিরাট হত্যাযজ্ঞ ঘটে। বুয়াস আওসের একটি দুর্গের নাম এই দুর্গের নামে বুয়াস যুদ্ধের নামকরণ করা হয়। যা প্রাচীন আরব ইতিহাসের একটি বিখ্যাত যুদ্ধ। তখন আবু বকর রা. বললেন : হে আল্লাহর বান্দা-বান্দীরা, তোমরা শয়তানের গান শুনছো নাকি? এ কথা তিনি তিনবার বললেন। রসূলুল্লাহ সা.তার একথা শুনে বললেন : হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির একটা উৎসবের দিন থাকে। আজ আমাদের উৎসবের দিন। বুখারির ভাষা হলো : "আয়েশা রা. বললেন। রসূলুল্লাহ সা. আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমার কাছে দু'জন দাসী বুয়াসের গান গাইছিল। রসূল সা. তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আবু বকরও এ সময় প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ধমক দিলেন। বললেন : রসূল সা. এর কাছে শয়তানের গান চলছে? তখন রসূল সা. আবু বকর রা. এর দিকে মনোযোগী হলেন এবং বললেন "দাসী দুটি যা গাইছে, গাইতে দাও।" তারপর যখন তিনি অন্য দিকে মনোযোগ দিলেন, তখন আমি দাসী দুটিকে টিপে দিলাম, অমনি তারা বেরিয়ে গেলো। দিনটি ছিলো ঈদের দিন। হাবশীরা ঐ দিন ঢাল ও বল্লম নিয়ে খেলা করতো। কখানো আমি রসূল সা. এর কাছে খেলা দেখতে চাইতাম। আবার কখানো তিনি বলতেন : তুমি কি খেলা দেখতে উৎসুক? আমি বলতাম হাঁ। তখন তিনি আমাকে তাঁর পেছনে এমনভাবে দাঁড় করাতেন যে, আমার গাল তাঁর গালের বরাবর থাকতো। তিনি বলতেন : "হে হাবশী যুবকরা, তোমরা ভালোভাবে খেলো।" অবশেষে আমি যখন দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে যেতাম, তখন বলতেন তুমি কি তৃপ্ত? আমি বলতাম : হাঁ। তিনি বলতেন : তবে চলে যাও।" হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন : আয়েশা বর্ণনা করেন। রসূল সা. সেদিন বললেন : মদিনার ইহুদীদের জানা উচিত, আমাদের ধর্মে প্রশস্ততা রয়েছে। আমাকে উদার তাওহীদী আদর্শ দিয়ে পাঠানো হয়েছে।" আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আইয়্যামুত তাশরীক হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।"

১৪. জিলহজ্জের দশ দিন সৎকাজ করার ফযীলত

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এই দিনগুলোর (জিলহজ্জের দশ দিন) সৎ কাজ আল্লাহর কাছে যতো প্রিয়, ততো আর কোনো দিন নয়। সাহাবিগণ বললেন : হে রসূলুল্লাহ; এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? রসূল সা. বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে সেই ব্যক্তির জিহাদ এর ব্যক্তিক্রম, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়েছিল কিন্তু এর কোনোটাই নিয়ে সে ফিরে আসেনি।" -মুসলিম ও নাসায়ী ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আহমদ ও তাবারানি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো সৎ কাজ আল্লাহর কাছে এই দশ দিনের চেয়ে অন্য কোনো দিনে অধিক

প্রিয় নয়। কাজেই তোমরা এই দিনগুলোতে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বেশি করে পড়ো।"

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : কুরআনের উক্তি "এবং তারা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহর নাম স্মরণ করে" এখানে কয়েকটি দিন অর্থ জিলহজ্জের দশ দিন। ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা. এই দশ দিন আল্লাহু আকবার বলতে বলতে বাজারে বেরিয়ে যেতেন। তাদের কথা শুনে জনগণ আল্লাহু আকবার বলতো। -বুখারি।

সাঈদ বিন জুবাইর জিলহজ্জের দশ দিন সমাগত হলে সৎ কাজের জন্য এতো বেশি পরিশ্রম করতেন যে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করাই দু'সাধ্য ছিলো। আওযায়ী বলেছেন : আমি জানতে পেরেছি, জিলহজ্জের দশ দিনের যে কোনো একদিনের নেক আমল আল্লাহর পথে এমন জিহাদের সমান, যে জিহাদের পাশাপাশি দিনে রোযা রাখা হয় এবং রাতে পাহারা দেয়া হয়। অবশ্য কাউকে যদি শাহাদতের মর্যাদা দিয়ে বিশিষ্টতা দান করা হয় তবে তার কথা স্বতন্ত্র। আওযায়ী বলেন : আমাকে রসূল সা. এর বরাত দিয়ে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বনু মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তি।

আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : জিলহজ্জের দশ দিন আল্লাহর ইবাদত করা আল্লাহর কাছে এতো প্রিয় যে, অন্য কোনো দিন তার ইবাদত এর চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। এর প্রত্যেক দিনের ইবাদত পুরো এক বছরের ইবাদতের সমান এবং এর প্রত্যেক রাত্রের ইবাদত লাইলাতুল কদরের ইবাদতের সমান। -তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, বায়হাকি।

১৫. ঈদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বিনিময় করা মুস্তাহাব

জুবাইর বিন নুফাইর বলেছেন : ঈদের দিন রসূল সা. এর সাহাবিগণ যখন পরস্পর মিলিত হতেন, তখন একজন অপরজনকে বলতেন : "আল্লাহ আমার ও তোমার ঈদ কবুল করুন।"

১৬. দুই ঈদের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তাকবীর বলা

ঈদের দিনগুলোতে তাকবীর বলা সুন্নত। ঈদুল ফিতর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : "যাতে তোমরা (রযমানের রোযার) সংখ্যা পূরণ করো, তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন বলে আল্লাহ মহিমা বর্ণনা করো এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত ১৮৫)। আর ঈদুল আযহা সম্পর্কে বলেছেন : "আর তোমরা আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনে স্মরণ করো।" (আল বাকারা : আয়াত ২০৩)

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : এই দিনগুলো হলো আইয়ামে তাশরীক। -বুখারি।

আল্লাহ আরো বলেছেন : "এভাবেই আল্লাহ এই পশুগুলোকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, যেনো আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন বলে তোমরা তার মহিমা ঘোষণা করো।" (সূরা আল হজ্জ : আয়াত ৩৭)

অধিকাংশ আলেমের মতে, ঈদুল ফিতরে তাকবীর দিতে হবে নামাযের জন্য বের হওয়ার সময় থেকে খুতবার শুরু হওয়া পর্যন্ত। এ ব্যাপারে কিছু দুর্বল হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবনে উমর রা. প্রমুখ থেকে সহীহ হাদিসও এসেছে। হাকেম বলেছেন : এটা এমন একটা সুন্নত যা হাদিস বর্ণনাকারীগণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। মালেক, আহমদ, ইসহাক ও আবু ছাওর এই মতই ব্যক্ত করেছেন। আরেক দল বলেছেন : তাকবীর শুরু হবে ঈদুল ফিতরের রাত থেকে যখন শওয়ালের চাঁদ দেখা যাবে এবং ঈদগাহে যাওয়া ও ইমামের বহির্গত হওয়া পর্যন্ত চলবে। আর ঈদুল আযহার তাকবীরের সময় হলো আরাফার দিন ফজর থেকে আইয়ামে তাশরীকের আসর পর্যন্ত। এই দিনগুলো হচ্ছে : জিলহজ্জের একাদশ দিন, দ্বাদশ দিন এবং ত্রয়োদশ দিন। সাহাবিদের থেকে সবচেয়ে শুদ্ধভাবে যে জিনিসটি জানা যায়। তা হলো আলী

রা. ও ইবনে মাসউদের উক্তি যে, তাকবীর চলবে আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার সর্বশেষ দিন আসর পর্যন্ত। ইবনে মুনযির, শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, উমর রা. ও ইবনে আব্বাস রা. এই মতের সমর্থক।

আইয়ামে তাশরীকে তাকবীর বলা কোনো বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং এই দিনগুলোর সকল সময়েই তা মুস্তাহাব।

বুখারি বলছেন : উমর রা. মিনায় তার তাঁবুতে তাকবীর বলতেন। মসজিদের লোকেরা তা শুনে তাকবীর দিতো এবং বাজারের লোকেরাও তাকবীর দিতো। ফলে সমগ্র মিনা তাকবীরের আওয়াযে প্রকম্পিত হতো। ইবনে উমর রা. মিনাতে নামাযের পরে তাঁর বিছানায়, তাঁর তাঁবুতে, তাঁর বৈঠকে, তার চলার পথে এই দিনগুলোর সব দিনেই তাকবীর দিতেন। মাইমুনা রা. কুরবানির দিন তাকবীর দিতেন। মহিলারা আব্বাস বিন উসমানের পেছনে ও উমর ইবনে আবদুল আযীযের পেছনে আইয়ামে তাশরীকের রাতগুলোতে মসজিদে পুরুষদের সাথে তাকবীর বলতেন। হাফেজ ইবনে হাজর বলেছেন : সাহাবিদের এই উক্তি ও কার্যধারা থেকে প্রমাণিত হয়, এই দিনগুলোতে নামাযের পরে ও অন্যান্য অবস্থায় তাকবীর বলার রেওয়াজ ছিলো। আলেমদের মধ্যে এর কিছু কিছু অংশে মতভেদ রয়েছে : কেউ বলেন : তাকবীর বলতে হবে সকল নামাযের পরে। কেউ বলেন : শুধু ফরয নামাযের পরে, নফলের পরে নয়। আবার কেউ বলেন : শুধু পুরুষদের বলতে হবে, মহিলাদের নয়। জামাতের সাথে, একাকী নয়। আদায় নামাযে, কাযা নামাযে নয়। মুকিমের নামাযে মুসফিরের নয় এবং শহরের নামাযে, গ্রামের নয়। ইমাম বুখারি উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই তাকবীর বলার পক্ষে বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি যেসব সাহাবির উক্তি ও কার্যধারা উল্লেখ করেছেন, তা তার এই মতকে সমর্থন করে। তাকবীরের ভাষা কী হবে সে সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো সালমানের। তিনি বলেছেন : তোমরা এভাবে তাকবীর বলো : "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরান।"

উমর ও ইবনে মাসউদের বর্ণনা হতে : "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।"

তৃতীয় অধ্যায়

যাকাত

১. যাকাতের সংজ্ঞা

মানুষ তার সম্পদ থেকে আল্লাহর যে প্রাপ্য অংশ দরিদ্রদের জন্য বের করে দেয়, তার নাম যাকাত। একে যাকাত নামকরণ করার কারণ হলো, এতে বরকতের আশা করা যায়, মন ও প্রবৃত্তির পবিত্রতা অর্জিত হয় এবং কল্যাণমুখী উন্নয়ন সাধিত হয়। 'যাকাতের' আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা ও বরকত অর্থাৎ সমৃদ্ধি। মহান আল্লাহ বলেছেন :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .

"তাদের সম্পদ থেকে তুমি সদাকা গ্রহণ করো, যা দিয়ে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করবে।" (সূরা তাওবা : আয়াত ১০৩)

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। বিরাশিটি আয়াতে নামাযের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবের মাধ্যমে, তার নবীর সুন্নতের মাধ্যমে ও তাঁর উম্মতের ইজমার মাধ্যমে এটি ফরয করেছেন।

১. সব কটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. যখন মুয়ায বিন জাবাল রা.কে ইয়ামানে পাঠালেন, তাকে বললেন : তুমি একটি আহলে কিতাব জনগোষ্ঠীর নিকট যাচ্ছো। তুমি তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল- এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাদের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। এ কথা মেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাদের উপর তাদের ধনসম্পদে একটা সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে নেয়া হয় এবং দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যদি তারা এ ব্যাপারে তোমার কথা মেনে নেয় তাহলে সাবধান, তাদের মূল্যবান ও সুন্দর জিনিসগুলো এড়িয়ে চলো। আর মাযলুমের বদদোয়া থেকে আত্মরক্ষা করো। কেননা উক্ত বদদোয়া এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই।

২. তাবারানি তাঁর আওসাত ও সগীরে বর্ণনা করেন : আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা মুসলিম, ধনিদের উপর তাদের সম্পদে এতোটা ফরয করেছেন (সদকা ফরয করেছেন) যা তাদের মধ্যে বিদ্যমান দরিদ্রদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। দরিদ্ররা যখন খাদ্যাভাবে বা বস্ত্রাভাবে কষ্ট পায়, তখন তাদের সেই কষ্টের জন্য ধনিদের আচরণই (অর্থাৎ কৃপণতাই) দায়ী। সাবধান, আল্লাহ তাদের কাছ থেকে কঠিনভাবে হিসাব নেবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

ইসলামের শুরুতে মক্কায় যাকাত অনির্দিষ্টভাবে ফরয ছিলো। কী পরিমাণ সম্পদে ও কতটুকু দেয়া ফরয, তা নির্ধারিত ছিলোনা। মুসলমানদের সচেতনতা ও সহানুভবতার উপরই এটি ন্যস্ত ছিলো। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর সম্পদের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বছরে। তখনই যাকাতের নিয়ম প্রকাশ করা হয়।

২. যাকাত আদায়ের নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান

১. সূরা তাওবার ১০৩ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন : "তুমি তাদের ধনসম্পদ থেকে সদকা

গ্রহণ করো, যা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র করবে ও পরিচ্ছন্ন করবে।" অর্থাৎ হে রসূল, মুমিনদের ধনসম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সদকা তথা ফরয যাকাত গ্রহণ করো, অথবা অনির্ধারিত পরিমাণ সদকা যথা নফল দান গ্রহণ করো, যা দিয়ে তাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে লোভ ও কার্পণ্য থেকে এবং দরিদ্র ও আর্ত মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও সংকীর্ণতা ও অন্যান্য অমানবিক দোষত্রুটি থেকে এবং তাদের সম্পদকে নৈতিক ও বাস্তব কল্যাণমুখিতা, বরকত ও সমৃদ্ধি দ্বারা সুশোভিত করবে। যাতে করে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ করে।

২. আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ . اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ . كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ . وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ . وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ .

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা বাগানসমূহে ও নহরসমূহে অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদেরকে যা দান করবেন তা তারা গ্রহণ করবে। কারণ তারা ইতিপূর্বে সৎকর্মশীল ছিলো। রাতে খুব কমই ঘুমাতো। আর শেষ রাতে তারা ক্ষমা চাইত। আর তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত জনের জন্য প্রাপ্য রয়েছে।" (সূরা আযযারিয়াত : আয়াত ১৫-১৯)

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সৎ কর্মশীলতাকে মহৎ লোকদের উৎকৃষ্টতম গুণ অভিহিত করেছেন তাদের রাতের নামাযকে তাদের সৎকর্মশীলতার প্রতিক, তাদের ভোর রাতের ক্ষমা চাওয়াকে আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য লাভের উপায় এবং দরিদ্রকে দয়া ও সহানুভূতিস্বরূপ দান করাকে সৎকর্মশীলতার প্রতিকরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

৩. আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ .

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে। তাদের উপর আল্লাহ রহমত করবেন।" (সূরা আত-তাওবা : আয়াত ৭১)

অর্থাৎ আল্লাহ যে জনগোষ্ঠীর উপর রহমত ও বরকত নাযিল করেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী, পরস্পরকে সাহায্য ও ভালোবাসা দ্বারা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধকারী, সৎ কাজে আদেশকারী, অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সংরক্ষণকারী এবং যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক মযবুতকারী জনগোষ্ঠী।

৪. আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেছেন :

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ .

"তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। বস্তুত: সব কাজের শেষ ফায়সালা আল্লাহর হাতে ন্যস্ত।" (সূরা আল-হাজ্জ : আয়াত ৪১)

আল্লাহ তায়ালা যাকাতকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করেছেন।

১. তিরমিযি আবু কাবশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনটি বিষয়ে আমি কসম খেয়ে বলছি, তোমরা তা মনে রেখো (১) দান সম্পদ কমায় না (২) কোনো বান্দার উপর কোনো যুলুম করা হলে এবং তার উপর সে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন (৩) কোনো বান্দা কারো কাছে কিছু চাওয়ার দুয়ার খুললে আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দুয়ার খুলে দেবেন।

২. আহমদ ও তিরমিযি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ, সদকা গ্রহণ করেন এবং তা ডান হাত দিয়ে নেন, অতপর তোমাদের একজনের জন্য সেভাবে তা বাড়ান, যেভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে বাড়ায়। এমনকি এক লোকমা খাবার অহুদ পাহাড়ের মতো বড় হয়ে যায়।" অকি বলেছেন : আল্লাহর কিতাবে এই হাদিসের সমর্থন বিদ্যমান। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ বলেছেন :

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَٰتِ .

"তারা কি জানেনা, আল্লাহ তায়ালাই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সদকা গ্রহণ করেন।" (সূরা আত-তাওবা : আয়াত ১০৪)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوٰا وَيُرْبِى الصَّدَقَٰتِ.

"সুদকে আল্লাহ কমিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২৭৬)

৩. বিশুদ্ধ সনদে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন আনাস রা. থেকে : "বনু তামীম গোত্র থেকে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট উপস্থিত হলো এবং বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমি বিপুল সম্পদের অধিকারী। আমার পরিবারের লোক সংখ্যাও প্রচুর, আমার জমিজমাও অনেক এবং আমার কাছে অনেক অতিথির সমাগমও ঘটে। এখন আমাকে বলে দিন, আমি কী করবো এবং কিভাবে খরচ করবো? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার সম্পদ থেকে তুমি যাকাত বের করবে। ওটা তোমাকে পবিত্র করার উপকরণ। তাছাড়া তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সম্পর্ক রক্ষা করো। দরিদ্র, প্রতিবেশী ও সাহায্য প্রার্থীর হকও চিনে নিও (অর্থাৎ চিনে হক দিও)।

৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনটে কথা আমি শপথ করে বলছি : ইসলামের অংশগুলো যে আদায় করে, তাকে আল্লাহ কখনো সেই ব্যক্তির মতো বানাবেন না যে কোনো অংশই আদায় করেনা। আর ইসলামের অংশ হচ্ছে তিনটে : নামায, রোযা ও যাকাত। আর আল্লাহ দুনিয়ায় কোনো বান্দাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন তাকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেননা। আর কোনো ব্যক্তি কোনো একদলকে ভালোবাসলে আল্লাহ তাকে (কিয়ামতের দিন) তাদের সাথেই রাখবেন। চতুর্থ আর একটি কথা আমি যদি শপথ করে বলি তবে আশা করি আমার গুনাহ হবেনা। সেটি হলো, আল্লাহ যদি দুনিয়ায় কোনো বান্দার দোষ লুকিয়ে রাখেন, তবে কিয়ামতের দিনও তার দোষ লুকিয়ে রাখবেন।

৫. তাবারানি তাঁর গ্রন্থ আওসাতে জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি বললো : হে রসূলুল্লাহ! কোনো ব্যক্তি যদি তার সম্পদের যাকাত দিয়ে দেয়, তবে তার কী লাভ হবে? রসূল সা. বললেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত দিয়ে দেবে, তার যাবতীয় বিপদ মুসিবত তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।

৬. জারীর বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন : তিনি (জারীর) বলেছেন : আমি রসূল সা.-এর নিকট বায়াত (অঙ্গিকার) করেছি, নামায কায়েম করতে, যাকাত দিতে এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করতে।

৩. যাকাত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক বাণী

১. মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ط هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা সঞ্চিত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করেনা। তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। যেদিন ঐসব স্বর্ণ ও রূপাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালিয়ে দগ্ধ করা হবে, তারপর তা দিয়ে তাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে সেঁকা দেয়া হবে আর বলা হবে : এ হচ্ছে, তোমরা নিজেদের জন্য যা সঞ্চয় করে রেখেছিলে তা। কাজেই যা সঞ্চয় করেছিলে, তা কেমন মজা লাগে, উপভোগ করো।" (সূরা আত-তাওবা : আয়াত ৩৪-৩৫)

২. আল্লাহ আরো বলেছেন :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যারা আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহের দান নিয়ে কার্পণ্য করে, তারা যেনো তাদের এ কার্পণ্যকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরঞ্চ তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। তাদের যে সম্পদ নিয়ে তারা কার্পণ্য করতো (যাকাত দিতোনা) তাকে কিয়ামতের দিন দোযখের আগুনে পুড়িয়ে ডান্ডাবেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পরানো হবে।" (সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৮০)

ইমাম আহমদ, বুখারি ও মুসলিম, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো সঞ্চয়কারী[১] তার সম্পদের যাকাত না দিলে সেই সম্পদকে দোযখের আগুনে দগ্ধ করে চওড়া ধাতব পৃষ্ঠা বানিয়ে তা দিয়ে তার দু'পাজরে ও কপালে ততোক্ষণ পর্যন্ত সেঁকা দেয়া হতে থাকবে, যতোক্ষণ পঞ্চাশ হাজার বছর ব্যাপী দিনে আল্লাহ তার বান্দাদের বিচার ফায়সালা সম্পন্ন না করবেন। অতঃপর তাকে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। কোনো উট পালের মালিক তার উট পালের যাকাত না দিলে কিয়ামতের দিন তার সেই উট পালের জন্য একটি বিশাল প্রান্তরকে প্রসারিত করে সর্বাধিক পরিমাণে প্রশস্ত করা হবে, অতঃপর সেই প্রান্তরে উটগুলো চরতে থাকবে। যখনই তার উপর ঐ পালের সর্বশেষ উটটি চরবে, তখনই তার প্রথম উটটি আবার সেখানে পৌঁছে যাবে। যতোক্ষণ না আল্লাহ তার বান্দাদের বিচার ফায়সালা সম্পন্ন না করবেন ততোক্ষণ এরূপ চলতে থাকবে পঞ্চাশ হাজার বছর ব্যাপী। তারপর তাকে হয় জান্নাতের দিকে নচেত জাহান্নামের দিকে পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। কোনো মেষ পালের মালিক যদি তার মেষ পালের যাকাত না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন সেই মেষ পালের জন্য একটা বিশাল প্রান্তরকে প্রসারিত করে সর্বাধিক পরিমাণে প্রশস্ত করা হবে। সেখানে উক্ত মেষপাল তার পায়ের নখর ও শিং দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে চরতে থাকবে। সেই মেষপালে একটি মেষও শিংবিহীন অথবা বাঁকা শিংধারী থাকবেনা। সেখানে শেষ মেষটি পৌঁছার সাথে সাথেই প্রথম মেষটি ফিরে আসবে। বর্তমানের হিসাবে পঞ্চাশ হাজার ব্যাপী সেই দিনে যতোক্ষণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিচার ফায়সালা সম্পন্ন না করবেন, ততোক্ষণ এরূপ চলতে থাকবে। তারপর তাকে হয় জান্নাতের দিকে নতুবা জাহান্নামের দিকে পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, তাহলে ঘোড়ার কী হবে? তিনি বললেন : ঘোড়ার

১. অর্থাৎ যে সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হয় অথচ যাকাত আদায় করা হয়না।

কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে। ঘোড়া তিন রকমের : তা কারো জন্য পুরস্কার, কারো জন্য আচ্ছাদন, কারো জন্য পাপ। যেটি তার জন্য পুরস্কার, তা হলো সেই ঘোড়া, যাকে তার মালিক আল্লাহর পথে গ্রহণ করে, আল্লাহর পথে চলার জন্য তাকে প্রস্তুত করে। সে তার পেটে যাই ঢুকায় অর্থাৎ খাওয়ায় তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য পুরস্কার লিখে দেন। তাকে যদি সে কোনো শস্য শ্যামল মাঠে চরায়। তবে সে যাই খাবে, তার বিনিময়ে তার জন্য আল্লাহ পুরস্কার লিখবেন। আর যদি তাকে কোনো নদী বা খাল থেকে পানি পান করায়। তবে প্রতি ফোঁটা পানি পান করানোর বিনিময়ে তার জন্য পুরস্কার নির্ধারিত থাকবে। এমনকি রসূলুল্লাহ সা. তার পেশাবে ও পায়খানায় পর্যন্ত পুরস্কারের উল্লেখ করলেন। আর যদি ঐ ঘোড়া উচ্চ পাহাড়ী একটি বা দুটি ভূমি চরে, তাহলে তার প্রতি কদমে কদমে ঘোড়ার মালিক সওয়াব পাবে। আর যে ঘোড়া মালিকের জন্য আচ্ছাদন হবে, তাহলো সেই ঘোড়া, যাকে তার মালিক আভিজাত্যবোধ বা সৌন্দর্যবোধবশত পালন করে, তার পেট ও পিঠের হক সে সুখ বা দুঃখের দিনে ভোলে না, (অর্থাৎ তার পিঠে যেমন আরোহণ করে, তেমনি তার পেটে ক্ষুধা লাগলে তাকে খেতে দিতেও ভুল করেনা)। আর যে ঘোড়া মালিকের জন্য পাপের বোঝা স্বরূপ, তা হলো সেই ঘোড়া, যাকে সে অতিমাত্রায় গর্ব ও অহংকারবশত এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে পালন করে। এই ঘোড়া তার জন্য পাপের বোঝা স্বরূপ। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ! গাধা সম্পর্কে কী বলেন? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহ গাধা সম্পর্কে আমার নিকট এই সর্বব্যাপী ও বিরল আয়াতটি ছাড়া আর কিছু নাযিল করেননি :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

"যে ব্যক্তি কণা পরিমাণ সৎ কাজ করবে তাও সে পাবে, আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, তাও সে পাবে।" (সূরা যিলযাল : আয়াত ৭-৮)

বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ যাকে কোনো সম্পত্তি দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দিলোনা, কিয়ামতের দিন সেই সম্পত্তি তার কাছে একটা বিষধর সাপের রূপ ধারণ করে আসবে, তাঁর দুই চোখের উপর দুটো কালো বিন্দু থাকবে। সেই সাপ তাকে কিয়ামতের দিন পেঁচিয়ে ধরবে এবং তার দুই চোঁয়াল চেপে ধরে বলবে : আমি তোর অর্থসম্পদ, আমি তোর সঞ্চয় করা ধন। তারপর রসূলুল্লাহ সা. এই আয়াত পাঠ করলেন : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ .

"যারা আল্লাহর করুণার দান নিয়ে কৃপণতা করে তারা যেনো তাদের এ কাজকে ভালো মনে না করে....." (সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৮০)

ইবনে মাজাহ, বাযযার ও বায়হাকি ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "হে মুহাজিরগণ, পাঁচটা খারাপ অভ্যাস- যা তোমাদের মধ্যে দেখা দিতে পারে, আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই যেনো তোমরা সেগুলোতে আক্রান্ত না হও : কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে ব্যভিচার সংঘটিত হতে থাকলে তাদের মধ্যে এমন সব রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটবে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের আমলে ছিলোনা। বিক্রয়ের সময়ে মানুষকে মাপে ও ওযনে কম দিলে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ও রাষ্ট্রীয় যুলুমের শিকার হবে। আর যারা যাকাত দেবেনা, তারা বৃষ্টির অভাবে ভুগবে। পশুরা না থাকলে তারা মোটেই বৃষ্টি পেতোনা। আর যারা আল্লাহ ও তার রসূলের অঙ্গিকার ভংগ করবে। তাদের উপর বিজাতীয় শত্রুরা ক্ষমতা লাভ করবে এবং তারা তাদের সম্পদের একাংশ ছিনিয়ে নেবে। আর যে জাতির শাসকরা তাদের উপর আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন করবেনা, তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।"

বুখারি ও মুসলিম আহনাফ বিন কায়েস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আহনাফ বলেন : আমি কুরাইশের একটি দলের বৈঠকে বসলাম। সহসা সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো উস্কো খুস্কো চুল, মোটা কাপড় ও এলোমেলো বেশধারী। লোকটি এসেই সকলের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলো (এই ব্যক্তি আবু যর রা.)। তারপর তিনি বললেন, যারা সম্পদ পুঁজি করে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো পাথরের সুসংবাদ দাও। তারপর তা তাদের প্রত্যেকের স্তনের বোঁটার উপর রাখা হবে, অবশেষে তা তার ঘাড়ের উপর ভাগ দিয়ে বের হবে, আবার তা তার ঘাড়ের উপর রাখা হবে এবং তা তার স্তনের বোঁটা দিয়ে বের হবে। ফলে সে কাঁপতে থাকবে। এরপর এই ব্যক্তি চলে গেলো এবং একটি সেনা দলের কাছে গিয়ে বসলো। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম এবং তার কাছে গিয়ে বসলাম। আমি তখনো জানিনা ঐ ব্যক্তি কে। আমি তাকে বললাম, আমার তো মনে হচ্ছে, জনতা আপনার বক্তব্য অপছন্দ করেছে। লোকটি বললো : ওরা কিছু বোঝেনা। আমাকে আমার বন্ধু বলেছেন, আমি বললাম : কে আপনার বন্ধু? সে বললো : রসূলুল্লাহ সা.। তুমি কি অহুদ (পাহাড়) দেখতে পাচ্ছো? আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। দিনের আর কতটুকু বাকি রয়েছে। আমার মনে হচ্ছিল, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে কোনো কাজে পাঠাবেন। আমি জবাব দিলাম : হাঁ, অহুদ দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন : আমার পছন্দ নয়, অহুদের পরিমাণ আমার নিকট স্বর্ণ থাক। আর তা থেকে আমি তিনটে দিনার রেখে বাদ বাকি সব দান করে দেই।' এরা কিছুই বোঝেনা। এরা শুধু দুনিয়ার সম্পদ পুঁজি করছে। আল্লাহর কসম, আমি যতোক্ষণ আল্লাহর সাথে মিলিত না হই, (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ না করি) তাদের কাছে দুনিয়ার কিছুই চাইবোনা। দীন সম্পর্কেও কিছু জিজ্ঞাসা করবোনা।

৪. যাকাত অস্বীকারকারী সম্পর্কে শরীয়ার বিধান

যাকাত ইসলামের এমন অকাট্য বিধান, যার ফরয হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত। এটি এতো খ্যাতি লাভ করেছে, যা একে ইসলামের অপরিহার্য বিধানের অঙ্গীভূতি করেছে। ফলে কেউ একে ফরয হিসেবে অস্বীকার করলে সে নিশ্চিতভাবে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হবে। অবশ্য সে যদি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী হয়ে থাকে, তবে ইসলামের যাবতীয় বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত তাকে অব্যাহতি দেয়া যাবে।

যে ব্যক্তি যাকাত দেয়া জরুরি ও ফরয- এটা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও দেয়া থেকে বিরত থাকে, সে ইসলাম থেকে খারিজ হবেনা সত্য, কিন্তু না দেয়ার কারণে সে গুনাহগার হবে। দেশের শাসকের অধিকার রয়েছে তার কাছ থেকে যাকাত জোরপূর্বক আদায় করার ও তাকে শাস্তি দেয়ার। তার কাছ থেকে যাকাতের চেয়ে বেশি কোনো সম্পদ আদায় করতে পারবেনা। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর পূর্ববর্তী মতানুযায়ী, তার থেকে সরকার যাকাতও নিতে পারবে, তৎসহ শাস্তি স্বরূপ তার অবশিষ্ট সম্পত্তির অর্ধেক নিয়ে নিতে পারবে। (যে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তির প্রকৃত পরিমাণ গোপন করে যাকাত দেয়া থেকে বিরত থেকেছে এবং পরে তা প্রকাশিত হয়েছে, তার কাছ থেকেও যাকাত ও অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে নিতে পারবে সরকার)। এর প্রমাণ হিসেবে ইমাম আহমদ, নাসায়ী, আবু দাউদ, হাকেম ও বায়হাকি বাহায ইবনে হাকীম তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি : "প্রত্যেক বিচরণশীল উটের পালের যাকাত দিতে হবে। চল্লিশটা উট হলে একটা বিনতে লাবুন দিতে হবে। কোনো উটকে তার হিসাব থেকে বাদ দেয়া যাবেনা। যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় দেবে, সে তার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি যাকাত দেবেনা, আমরা

তার কাছ থেকে তা আল্লাহর অপরিহার্য প্রাপ্য হিসাবে আদায় করবোই, সেই সাথে তার গোটা সম্পত্তির অর্ধেকও আদায় করবো। মুহাম্মদের বংশধরের জন্য এর কোনো অংশই হালাল হবেনা।" আহমদ বলেছেন, এ হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ। বাহায সম্পর্কে হাকেম বলেছেন, তার হাদিস সহীহ। (তবে বায়হাকি বলেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মতে হাদিস বিশারদগণের দৃষ্টিতে এ হাদিস সহীহ নয়)।

কোনো গোষ্ঠী যাকাতকে ফরয বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও দিতে রাযী না হলে এবং তারা খুব প্রভাবশালী ও শক্তিশালী হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করে হলেও যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা বুখারি ও মুসলিম ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "রসূল সা. বলেছেন : আমাকে সেই লোকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যতোক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. তার রসূল, নামায কায়েম না করবে এবং যাকাত না দেবে। এসব কাজ তারা যখন করবে, তখন তারা আমার কাছ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ করতে পারবে। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী আর কিছু প্রাপ্য থাকলে সে কথা স্বতন্ত্র। তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহই নেবেন।"

সব ক'টা সহীহ হাদিস গ্রন্থ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "যখন রসূলুল্লাহ সা. ইন্তিকাল করলেন এবং আবু বকর জীবিত, আর আরবদের মধ্য থেকে অনেকে ইসলাম ত্যাগ করে কাফের হয়ে গেলো। উমর রা. বললেন : আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে, যতোক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেবে, সে আমার কাছ থেকে তার জান ও মাল নিরাপদ করবে, কেবল ইসলামের প্রাপ্য ব্যতিত, আর তার হিসাব আল্লাহই নেবেন। আবু বকর রা. বললেন : আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, তার সাথে আমি যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হচ্ছে সম্পদে আল্লাহর হক বা অধিকার।[২] আল্লাহর কসম, তারা যে অপ্রাপ্ত বয়স্কা উটনী রসূল সা.-এর আমলে দিতো। তাও যদি দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। উমর বলেছেন : আল্লাহর কসম, এ কথা বলার একমাত্র কারণ ছিলো এই যে, আল্লাহ আবু বকরের বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ যুদ্ধের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিলোনা।) আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি যা বুঝেছেন, সেটাই সত্য। মুসলিম আবু দাউদ ও তিরমিযির ভাষা এরূপ, "তারা যদি উট বাঁধার রশিও দিতে অস্বীকার করে, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।" "অপ্রাপ্ত বয়স্কা উটনীর" পরিবর্তে।

৫. যাকাত কার উপর ফরয?

স্বাধীন মুসলমান নিসাব পরিমাণ (নির্ধারিত সর্বনিম্ন পরিমাণ) সম্পদের মালিক হলেই তার উপর যাকাত ফরয হয়। যে কয় ধরনের সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয় তার যে কোনোটিতে নির্ধারিত নিসাব হলেই যাকাত দিতে হবে।

৬. যাকাতের নিসাব

নিসাবের জন্য শর্ত হলো : ১. পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া চাই : অর্থাৎ

২. বনু ইয়ারবু গোত্র যাকাতের মাল আবু বকরের নিকট পাঠানোর জন্য একত্রিত করেছিল। কিন্তু মালেক বিন নুয়াইরা তাদেরকে পাঠাতে নিষেধ করে এবং যাকাতের মাল তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। এদেরকে নিয়েই মতভেদ দেখা দেয় এবং তাদেরকে নিয়ে উমর (রা.) এর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাই তিনি আবু বকরের সাথে তর্কে লিপ্ত হন ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আবু বকরের ঘোষণার প্রতিবাদ করেন। আবু বকর তার খিলাফতের প্রথম বছরে হিজরি একাদশ সনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যানবাহন ও উপার্জনের সরঞ্জাম সংগ্রহ করার পর উদ্বৃত্ত থাকলে যাকাত দেবে।

২. একটি পূর্ণ চন্দ্র বছর অতিবাহিত হওয়া চাই। নিসাবের মালিক হওয়ার দিন থেকেই এই বছর গণনা শুরু হবে এবং পুরো বছর এই নিসাব পূর্ণ থাকা চাই। বছরের মাঝে যদি ঘাটতি হয় এবং পরে আবার পূর্ণ হয়, তবে পূর্ণ হবার দিন থেকে পুনরায় গণনা শুরু করতে হবে।

নববী বলেছেন : আমাদের মাযহাব এবং মালেক, আহমদ ও অধিকাংশ ইমামের মাযহাব হলো : যে সম্পদে হুবহু ঐ সম্পদের অংশ হিসেবেই যাকাত ফরয হয় এবং যাতে বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য ও পশু, সেই সম্পদের যাকাতে সারা বছর নিসাব পূর্ণ থাকা জরুরি। বছরের কোনো অংশে তাতে ঘাটতি হলে বছর অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পরে আবার পূর্ণ হলে নতুন করে বছর শুরু হবে নিসাব পূর্ণ হবার সময় থেকে। আবু হানিফা বলেছেন : বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকাই যথেষ্ট। মাঝখানে তাতে ঘাটতি হলে ক্ষতি নেই। এমনকি তার কাছে যদি প্রথমে দুইশো দিরহাম থাকে, বছরের মাঝখানে এক দিরহাম ছাড়া সবই খোয়া যায়, অথবা প্রথমে চল্লিশটি ছাগল থাকে, পরে মাঝখানে একটা ছাড়া সব ধ্বংস হয়ে যায়। অতপর পুনরায় বছরের শেষে দুইশো ও চল্লিশ পূর্ণ হয়, তাহলে পুরোটার যাকাত ফরয হবে।[৩] তবে শস্য ও ফলের যাকাতে এই শর্ত কার্যকর থাকবেনা। সেখানে যাকাত ফরয হবে ফসল ঘরে তোলার দিন। কেননা আল্লাহ বলেছেন : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ "যেদিন ফসল ঘরে তোলা হবে, সেদিন তার প্রাপ্য (যাকাত) দিয়ে দাও।" আবদারী বলেছেন : যাকাতের মাল দু'রকমের : একটি হলো, যা নিজ থেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন- ফল ও শস্য দানা। এগুলো সংগৃহীত হওয়া মাত্রই তাতে যাকাত ফরয হয়। অপরটি হলো যার বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যেমন- টাকা, দিরহাম, দিনার, বাণিজ্যের পণ্য, পশু। এগুলোতে বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি। এতে নিসাব হলেও বছর পূর্ণ হওয়া ছাড়া যাকাত ফরয হয় না। এটাই ফকীহদের অভিমত।

৭. শিশু ও পাগলের সম্পদের যাকাত

পাগল ও শিশুর সম্পদের যখন নিসাব পূর্ণ হবে, তখন উভয়ের অভিভাবকের উপর তাদের পক্ষ থেকে যাকাত দেয়া ফরয হবে। আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো ইয়াতিমের অভিভাবক হয় এবং সেই ইয়াতিমের কিছু সম্পত্তি থাকে, তার কর্তব্য সেই সম্পত্তি দ্বারা তার জন্য ব্যবসা করা, যেনো উক্ত সম্পত্তি যাকাত দিতে দিতে নিঃশেষ হয়ে না যায়।" হাদিসটির সনদ জয়ীফ। ইমাম শাফেয়ী এ হাদিসের আলোকে সব রকমের সম্পত্তিতে যাকাত ফরয হয় একথা জোর দিয়ে বলেছেন।

আয়েশা রা. তার পালিত ইয়াতিমদের সম্পত্তি থেকে যাকাত বের করতেন।

তিরমিযি বলেন : এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। উমর, আলী, আয়েশা ও ইবনে উমরসহ একাধিক সাহাবির মতে ইয়াতিমের সম্পত্তিতে যাকাত ফরয হয়। মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের অভিমতও তাই। সুফিয়ান ও ইবনুল মুবারকসহ অপর একটি দলের মতে ইয়াতিমের সম্পত্তিতে কোনো যাকাত নেই।

৮. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাত

যে ব্যক্তির নিকট যাকাত ফরয হয় এমন সম্পদ রয়েছে, অথচ সে ঋণগ্রস্ত, সে প্রথমে উক্ত

৩. যদি কেউ বছরের মাঝখানে নিসাব বিক্রি করে দেয় অথবা অন্য প্রকারের সম্পদে রূপান্তরিত করে তাহলে যাকাতের বছর ছিন্ন হবে এবং নতুন করে বছর গণনা শুরু করতে হবে।

সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করবে, তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তার যাকাত প্রদান করবে- যদি তা নিসাব পরিমাণে পৌঁছে। নিসাব পরিমাণে না পৌঁছলে যাকাত দিতে হবেনা। কেননা এ অবস্থায় সে নিজেই একজন দরিদ্র। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ধনী ব্যক্তি ব্যতিত কারো উপর যাকাত ফরয নয়। -আহমদ, বুখারি।

রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন : যাকাত ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রাপ্য ঋণ ও বান্দার প্রাপ্য ঋণ- উভয়ই সমান। অপর হাদিসে বলা হয়েছে : "পরিশোধের ব্যাপারে আল্লাহর ঋণ অগ্রগণ্য।" এটি সামনে আসছে।

৯. যাকাত না দিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির যাকাত

যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয ছিলো, কিন্তু না দিয়েই মারা গেছে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যাকাত ফরয। ঋণ পরিশোধ, ওসিয়ত ও উত্তরাধিকার বণ্টনের উপর এই ফরয আদায়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৪] কেননা আল্লাহ তায়ালা উত্তরাধিকার সম্পর্কে বলেছেন : (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১২)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ·

"(উত্তরাধিকার বণ্টন করা হবে) মৃত ব্যক্তির কৃত ওসিয়ত আদায় ও ঋণ পরিশোধের পর।" নিসা : আয়াত ২২ আর যাকাত তো হচ্ছে আল্লাহর প্রাপ্য ঋণ, যা বহাল রয়েছে।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এলো এবং বললো : আমার মা মারা গেছেন। অথচ তার উপর এক মাসের রোযা পাওনা রয়েছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে কাযা করবো? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার মায়ের উপর যদি কোনো ঋণ থাকতো তা কি তুমি তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করতে? সে বললো : করতাম। রসূল সা. বললেন : তাহলে পরিশোধের ব্যাপারে আল্লাহর ঋণ অগ্রগণ্য। -বুখারি ও মুসলিম।

১০. যাকাত প্রদানে নিয়ত (সংকল্প) শর্ত

যাকাত একটি ইবাদত। কাজেই এর বিশুদ্ধতার জন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত হলো, যাকাত প্রদানের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য রূপে নির্ধারণ করা, এ দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে তার সওয়াব বা প্রতিদান কামনা করা এবং মন থেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, এটা তার উপর অর্পিত ফরয যাকাত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ·

"আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করত: আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে।" (সূরা বাইয়িনা : আয়াত ৫)

তাছাড়া সহীহ হাদিসে ঘোষণা করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যাবতীয় কাজ নিয়ত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিয়ত করে তেমনই প্রতিদান পায়।"

মালেক ও শাফেয়ীর মতে যাকাত প্রদানের সময় নিয়ত শর্ত। আবু হানিফার মতে প্রদানের সময় অথবা যে পরিমাণ সম্পদ প্রদান করতে হবে তা পৃথক করে রাখার সময় নিয়ত করা জরুরি। আহমদের মতে প্রদানের সামান্য পূর্বে নিয়ত করলেও তা জায়েয হবে।

১১. যখন ফরয হয় যাকাত তখনই আদায় করা

যে মুহূর্তে যাকাত ফরয হয় সেই মুহূর্তেই তা প্রদান করা ফরয। বিলম্বে প্রদান করা নিষেধ। তবে প্রদান করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সম্ভব হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েয। কেননা

---

৪. এটি শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আবু ছাওরের অভিমত।

আহমদ ও বুখারি উকবা ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : উকবা বলেছেন : "আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে আসরের নামায পড়লাম। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, তখন দ্রুত উঠে তাঁর জনৈকা স্ত্রীর নিকট গেলেন। তারপর আবার বেরিয়ে এলেন। তাঁর এই দ্রুততায় জামাতের লোকদের মধ্যে বিস্ময় প্রত্যক্ষ করে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : নামাযের মধ্যেই আমার মনে পড়েছে আমার বাড়িতে কিছু স্বর্ণ বা রৌপ্য রয়েছে। ওটা আমাদের কাছে থাকা অবস্থায় সন্ধ্যা হোক বা রাত কেটে যাক- এটা আমার পছন্দ ছিলোনা। তাই ওটা বণ্টন করার আদেশ দিয়ে এলাম।"[৫]

আর বুখারি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ও শাফেয়ী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কোনো সম্পদের সাথে যাকাত মিশ্রিত হলেই উক্ত সম্পদের ধ্বংস অনিবার্য।" একই হাদিস বর্ণনা করে হুমাইদী সংযোজন করেছেন : "কখনো এমন হতে পারে, তোমার সম্পদে যাকাত ফরয হয়েছে, কিন্তু তুমি তা বের করলেনা। তাহলে উক্ত হারাম সম্পদ হালাল সম্পদকে ধ্বংস করে ছাড়বে।"

১২. অগ্রিম যাকাত প্রদান

বছর পূর্ণ হবার আগে যাকাত দেয়া জায়েয। এমনকি এক সাথে দু'বছরের জন্যও যাকাত দেয়া যায়। যুহরী থেকে বর্ণিত : তিনি বছর পূর্ণ হবার আগে যাকাত প্রদান বৈধ মনে করতেন। এক ব্যক্তি তিন বছরের জন্য এক সাথে অগ্রিম যাকাত দিয়ে দিয়েছে- এটা যথেষ্ট হবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে হাসান বস্‌রি বললেন : হবে।

শওকানি, শাফেয়ী, আহমদ, আবু হানিফা, হাদী, কাসেম ও মুয়াইয়িদ বিল্লাহ বলেছেন : এটা উত্তম। কিন্তু মালেক, রবীয়া, সুফিয়ান ছাওরী, দাউদ, আবু উবাইদ বিন হারিস ও আহলুল বাইত থেকে নাসের বলেছেন : বছর পূর্ণ হবার আগে যাকাত দিলে তা জায়েয হবেনা।

শেষোক্ত দলটি সেসব হাদিস থেকে প্রমাণ দেন, যাতে বছর পূর্ণ হওয়াকে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ মত মেনে নিলেও যারা অগ্রিম দেয়াকে বৈধ বলেন, তাদের মত ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। কেননা বছর পূরণ হওয়ার উপর যাকাত ফরয হওয়া নির্ভরশীল, যা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বিতর্ক হলো তার আগে দেয়া বৈধ কিনা সেটি নিয়ে।

ইবনে রশীদ বলেন : মতনৈক্যের আসল কারণ হলো, যাকাত একটি ইবাদত, না দরিদ্রদের অধিকার। যারা বলেন, এটি ইবাদত এবং একে নামাযের সদৃশ্য বলে উল্লেখ করেন, তাদের মতে এটা সময় হওয়ার আগে বের করা বা প্রদান করা বৈধ নয়। আর যারা একে মানুষের প্রাপ্য অধিকার গণ্য করেন, তারা একে অগ্রিম দেয়া বৈধ মনে করেন।

শাফেয়ী তার মতের সপক্ষে আলীর রা. হাদিস দ্বারা প্রমাণ দর্শিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সা. আব্বাসের যাকাত ফরয হবার আগেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

১৩. যাকাত প্রদানকারীর জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব

যাকাত প্রদানকারীর কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের সময় তার জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। আল্লাহ বলেছেন : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۔

---

৫. ইবনে বাত্তাল বলেছেন : এ হাদিস থেকে জানা যায়, ভালো কাজ মাত্রই দ্রুত করা উত্তম, কেননা বিপদ মুসিবত ও বাধাবিপত্তি যখন তখন ঘটে থাকে। আর মৃত্যুরও কোনো গ্যারান্টি নেই। "পরে করা যাবে" এই মনোভাব পোষণ করা ঠিক নয়।

"তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং তাদের জন্য দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ।" (তওবা : আয়াত ১০৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত : যখনই রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট কোনো যাকাত আনা হতো, তখনই বলতেন : "হে আল্লাহ, তাদের উপর রহমত বর্ষণ করো।" আমার বাবা তাঁর নিকট যাকাত জমা দিলে বললেন : হে আল্লাহ, আবু আওফার বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আহমদ নাসায়ী ওয়ায়েল বিন হাজার থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. একটি সুদর্শন উটকে যাকাত হিসেবে প্রদানকারীর জন্য দোয়া করলেন : "হে আল্লাহ, তার উপর ও তার উটের উপর বরকত নাযিল করো।"

শাফেয়ী বলেছেন : শাসকের জন্য উত্তম নীতি হলো, যাকাত গ্রহণ করার পর যাকাত দাতার জন্য দোয়া করবে এবং বলবে : তুমি যা দিয়েছ তার জন্য আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিন, আর তুমি অবশিষ্ট যা রেখেছ তাতে বরকত দিন।

১৪. যে সকল সম্পদে যাকাত ফরয হয়

ইসলাম যে সকল সম্পদে যাকাত ফরয করেছে, তা হলো : স্বর্ণ, রৌপ্য, কৃষিজাত শস্যাদি, ফলমূল, বাণিজ্য পণ্য, চরণশীল পশু, খনিজ সম্পদ ও মাটির নিচে প্রোথিত মূল্যবান সম্পদ।

১৫. স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা। তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। যেদিন দোযখের আগুনে এগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পাজরে ও পিঠে সেঁকা দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এ হচ্ছে, সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। অতএব, যা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছো, তার স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা তাওবা : আয়াত ৩৪)

সোনা রূপা দুটিতেই যাকাত ফরয, যখন তা নেসাব পরিমাণে পৌছবে, তার উপর বছর ঘুরে আসবে এবং মৌলিক প্রয়োজন ও ঋণ থেকে মুক্ত হবে চাই তা কাঁচা হোক, গলিয়ে খাদ মুক্ত করা হোক অথবা মুদ্রায় পরিণত করা হোক।

১৬. স্বর্ণের নিসাব ও যাকাতের পরিমাণ :

বিশ দিনার পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত স্বর্ণে কোনো যাকাত নেই। যখন বিশ দিনার হবে এবং তার উপর বছর ঘুরে আসবে। তখন তা থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অর্ধ দিনার দিতে হবে। বিশ দিনারের উপরে যা থাকবে, তা থেকে একই হিসাবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাকে কোনো যাকাত দিতে হবেনা (অর্থাৎ স্বর্ণে) যতোক্ষণ না বিশ দিনার হয়। যখন তোমার বিশ দিনার হবে এবং তার উপর বছর ঘুরে আসবে। তখন তা থেকে অর্ধ দিনার দিতে হবে। এর অতিরিক্ত যা হবে তা থেকে

একই হিসাবে দিতে হবে। বছর ঘুরে না আসা পর্যন্ত কোনো সম্পদে যাকাত হয়না। আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকি, বুখারি, কর্তৃক সহীহ বলে আখ্যায়িত।

বনু ফুযারার মুক্ত গোলাম যিররীক থেকে বর্ণিত : উমর ইবনে আবদুল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর তাকে লিখলেন : যে সকল মুসলমান ব্যবসায়ী তোমার কাছ দিয়ে যায়, তারা যে সকল পণ্য নিয়ে ব্যবসা করে, তাতে প্রতি চল্লিশ দিনার থেকে এক দিনার যাকাত গ্রহণ করো। যদি এর কম হয়। তাহলে যে পরিমাণ কম হয়, সে হিসাবে বিশ দিনার পর্যন্ত নিও। কমতে কমতে যদি তিন দিনারে এসে দাঁড়ায়, তাহলে ছেড়ে দাও, তা থেকে কোনো যাকাত নিওনা। তাদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করো তার উপর বাদ বাকি বছরের জন্য সমপরিমাণ সম্পদ পর্যন্ত তাদেরকে অব্যাহতিপত্র লিখে দাও। ইবনে আবি শায়বা।

ইমাম মালেক মুয়াত্তায় বলেছেন : আমাদের নিকট যে সুন্নতে কোনো মতভেদ নেই, তা হলো : বিশ দিনারে ও দুশো দিরহামে যাকাত ফরয হয়।

বিশ দিনার মিশরীয় দিরহামের ওজন অনুসারে $২৮\frac{৪}{৮}$ দিরহামের সমান।

১৭. রৌপ্যের নিসাব ও যাকাতের পরিমাণ

দুশো দিরহামের সমপরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত রৌপ্যে কোনো যাকাত হয়না। যখন দুশো দিরহাম হবে, তখন তা থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। অতিরিক্ত যা হবে, তার জন্য একই হিসাবে দিতে হবে তা যতোই কম হোক বা বেশি হোক। মনে রাখতে হবে, স্বর্ণ ও রৌপ্যে নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর তার কোনো অংশে যাকাতের ছাড় নেই।

আলী রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ঘোড়া ও দাসদাসীর ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কাজেই রৌপ্যের যাকাত প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম দাও। একশো নব্বই দিরহামে কোনো যাকাত নেই। দুশো দিরহাম হলেই তা থেকে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

তিরমিযি বলেন : আমি বুখারিকে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : হাদিসটি সহীহ। আলেমদের অনুসৃত রীতি হলো, পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই। এক উকিয়া হচ্ছে চল্লিশ দিরহামের সমান। আর পাঁচ উকিয়া দুশো দিরহামের সমান।

১৮. স্বর্ণ ও রৌপ্যের সম্মিলন

যে ব্যক্তি নিসাবের চেয়ে কম পরিমাণ স্বর্ণ এবং নিসাবের চেয়ে কম পরিমাণ রৌপ্যের মালিক হয়। সে নিসাব পূর্ণ করার জন্য দুটোকে একত্রিত করবেনা। কেননা দুটো ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। এর একটা অপরটির সাথে একত্রিত হয়না যেমন একত্রিত হয়না গরু ও ছাগল। কাজেই কারো হাতে ১৯৯ দিরহাম রৌপ্য ও ১৯ দিনার স্বর্ণ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হবেনা।

১৯. ঋণের যাকাত

ঋণের দু'রকম অবস্থা হতে পারে : (১) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের স্বীকৃতি দেয় এবং তা দিতে প্রস্তুত এ ধরনের ঋণ সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।

প্রথম মত : আলী, ছাওরী, আবু ছাওর, হানাফী ও হাম্বলীদের মতে ঋণ দাতার উপর এর যাকাত ফরয। তবে ঋণ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত আদায় করতে হবেনা। হস্তগত হওয়ার পর অতিত সময় বাবদ যাকাত আদায় করবে।

দ্বিতীয় মত : উসমান, ইবনে উমর, জাবির, তাউস, নাখয়ী, হাসান, যুহরী, কাতাদা ও শাফেয়ীর মতে যাকাত এখনই দিতে হবে, চাই হস্তগত হোক বা না হোক।

তৃতীয় মত : যাকাত দিতে হবেনা। কেননা এ সম্পদের কোনো বৃদ্ধি নেই। তাই এতে যাকাত নেই। যেমন আয় রোযগারের সাজসরঞ্জামে যাকাত নেই। এটি ইকরামা আয়েশা ও ইবনে উমরের মত।

চতুর্থ মত : সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ও আতা ইবনে আবি রাবাহের মতে হস্তগত হওয়ার পর এক বছরের যাকাত দিতে হবে।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এতো অভাবী যে, পরিশোধে অক্ষম অথবা অস্বীকার করে। অথবা টালবাহানা করে। কাতাদা, ইসহাক, আবু ছাওর ও হানাফীদের মতে এ সম্পদে যাকাত দিতে হবেনা। কেননা মালিক এ সম্পদ দ্বারা লাভবান হতে অক্ষম। ছাওরী ও আবু উবাইদ প্রমুখের মতে, ঋণ ফেরত পাওয়ার পর অতিত সময়ের জন্য যাকাত দিতে হবে। কেননা ঐ সম্পদে তার মালিকানা বহাল রয়েছে এবং তা ব্যবহারের উপযোগী। তাই যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তার বাবদে যাকাত দেয়া ফরয। যেমন সচ্ছল ও সামর্থ্যবান লোকের নিকট প্রাপ্য ঋণ। এরূপ সম্পদ সম্পর্কে শাফেয়ী থেকে দু'ধরনের অভিমতই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে উমর ইবনে আবদুল আযীয, হাসান, লাইছ আওযায়ী ও মালেকের মতে হস্তগত হবার পর এক বছরের যাকাত দিতে হবে।

২০. ব্যাংক নোট বন্ড ও সার্টিফিকেটের যাকাত

ব্যাংক নোট (টাকা), বন্ড, সার্টিফিকেট ইত্যাদির যাকাত দিতে হবে। কারণ এগুলো সোনা রূপার পরিবর্তে বিনিময় মাধ্যম।

২১. অলংকারের যাকাত

আলেমগণ একমত, মণি, মুক্তা, ইয়াকুত, ইত্যাকার পথের জাতীয় মূল্যবান পাথর জাতীয় রত্নাদিতে যাকাত নেই। তবে এগুলো বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলে যাকাত দিতে হবে। মহিলাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারে যাকাত দিতে হবে কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আবু হানিফা ও ইবনে হাযম বলেছেন, নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। কেননা আমর বিন শুয়াইব বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : "রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট দু'জন মহিলা এলো। তাদের হাতে স্বর্ণের কংকন ছিলো। রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে বললেন : তোমরা কি পছন্দ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাদের হাতে আগুনের কংকন পরান? তারা উভয়ে বললো : না। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে তোমাদের হাতে যে কংকন রয়েছে তার হক আদায় করো অর্থাৎ যাকাত দাও।"

আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেন : আমি ও আমার খালা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট গেলাম। আমাদের পরনে তখন স্বর্ণের কংকন ছিলো। তিনি আমাদের বললেন : তোমরা কি এর যাকাত দিয়ে থাক? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : তোমরা কি ভয় পাওনা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে আগুনের কংকন পরাবেন? এর যাকাত দিয়ে দাও। - আহমদ।

আয়েশা রা. বলেন : "রসূলুল্লাহ সা. আমার কাছে এলেন। তখন আমার হাতে রৌপ্যের আংটি দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে বললেন : হে আয়েশা, এটা কী? আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আপনার সামনে সেজে গুজে থাকার জন্য এগুলো বানিয়েছি। তিনি বললেন : তুমি কি এর যাকাত দাও? আমি বললাম : না তো। তিনি বললেন : তাহলে এগুলো তোমার দোযখের জন্য যথেষ্ট। -আবু দাউদ, দার কুতনি, বায়হাকি।

বাকি তিনজন ইমামের মত হলো, নারীর গহনায় কোনো যাকাত নেই, চাই তার পরিমাণ যতোই হোক। বায়হাকি বর্ণনা করেন : জাবির বিন আবদুল্লাহকে অলংকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এতে কি যাকাত আছে? জাবির বললেন : না। আবার বলা হলো : তা যদি হাজার দিনারের হয় তবুও? জাবির বললেন : আরো বেশি মূল্যের হলেও। বায়হাকি আরো বর্ণনা করেছেন : আসমা বিনতে আবু বকর রা. তার মেয়েদেরকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার দিনারের সমান স্বর্ণালংকার দিয়ে সজ্জিত করতেন এবং যাকাত দিতেননা। আর মুয়াত্তায় আবদুর রহমান বিন কাসেম সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত হয়েছে : আয়েশা রা. তাঁর যে ইয়াতিম ভাইঝিদেরকে নিজের কাছে রেখে লালন পালন করতেন, তাদের কিছু অলংকারাদি ছিলো। কিন্তু তিনি তা থেকে যাকাত বের করতেননা। তা ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাঁর মেয়েদেরকে ও বাঁদীদেরকে অলংকার পরাতেন এবং তা থেকে যাকাত দিতেননা।

খাত্তাবী বলেছেন : "আল্লাহর কিতাবে যে সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে, তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অলংকারে যাকাত দেয়া ফরয। সাহাবিদের উক্তিও এর সমর্থক। যারা বলেন, দিতে হবেনা, তারা যুক্তিতর্কের দিকে গেছেন। কিছু সাহাবির উক্তিও তাদের পক্ষে আছে। তবে দিয়ে দেয়াই ভালো এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।" এসব অভিমত হলো, হালাল অলংকার সম্পর্কে। যদি কোনো মহিলা অবৈধ অলংকার গ্রহণ করে, যেমন পুরুষদের অলংকার গ্রহণ করলো, যথা, তরবারীর অলংকার- যা হারাম, তাতেও তার উপর তার যাকাত ফরয। অনুরূপ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের থালা বাটি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই বিধি প্রযোজ্য।

২২. মোহরানার যাকাত

আবু হানিফার মতে স্ত্রীর মোহরানায় ততোক্ষণ পর্যন্ত যাকাত নেই, যতোক্ষণ তা হস্তগত না হয়। হস্তগত হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ হওয়া ও বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। অবশ্য মোহরানার সাথে অন্য কোনো সম্পদ মিলে নিসাব পরিমাণ থাকলে ভিন্ন কথা। মোহরানা থেকে কিছু পরিমাণ হস্তগত হলে তা তার কাছে বিদ্যমান অন্য নিসাবের সাথে সংযুক্ত হবে এবং বছর পূর্ণ হলে তার যাকাত দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ীর মতে স্ত্রীর উপর তার মোহরানার যাকাত বছর পূর্ণ হলে ফরয। বছর শেষে সমস্ত সম্পত্তি থেকে যাকাত দিতে হবে- চাই তা সহবাসের আগেই হস্তগত হোক। মুরতাদ হওয়া বা অন্য কোনো কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার দরুন মোহরানা বাতিল হলে বা তালাকের কারণে অর্ধেক বাতিল হলেও যাকাতের বিধিতে কোনো রদবদল হবেনা। হাম্বলীদের মতে মোহরানা পাওনা থাকা স্ত্রীর একটি ঋণ পাওনা থাকার মতো। তাদের মতে এর বিধি অন্যান্য ঋণের মতো। স্বামী সচ্ছল ও ধনী হলে মোহরানায় যাকাত দিতে হবে। যখন তা হস্তগত হবে তখন অতিত সময়ের যাকাত দিয়ে দেবে। আর যদি সে অভাবী ও অক্ষম হয় অথবা অস্বীকার করে, তাহলেও খিরকীর মতে, যাকাত দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সহবাসের আগে বা পরে হস্তগত মোহরানায় কোনো পার্থক্য নেই। সহবাসের পূর্বে তালাক হওয়ার কারণে অর্ধেক মোহরানা রহিত হলে এবং অর্ধেক গ্রহণ করলে যেটুকু হস্তগত হয়, সেটুকুর যাকাত ফরয হবে। যেটুকু হস্তগত হবে না সেটুকুর নয়। অনুরূপ, হস্তগত হবার আগে সমগ্র মোহরানা যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো কারণে বিয়ে ভেংগে যাওয়ার দরুন রহিত হয়, তাহলে স্ত্রীর উপর যাকাত ফরয হবেনা।

২৩. ভাড়ার যাকাত

আবু হানিফা ও মালেকের মত হলো, যে ব্যক্তি নিজের ঘর বাড়া দেয়, সে শুধু ভাড়ার চুক্তি স্বাক্ষর করলেই ভাড়া তার পাওনা হয়না। ভাড়ার মেয়াদ শেষ হলেই ভাড়া পাওনা হয়। এ কারণে, যে ব্যক্তি তার কোনো ঘর ভাড়া দেয়, ঘর ভাড়ার অর্থ হস্তগত করা, তার উপর বছর ঘুরে আসা ও নিসাব পূর্ণ হওয়া ব্যতিত তার ঘর ভাড়ার উপর যাকাত ফরয হবেনা। পক্ষান্তরে হাম্বলী মাযহাবের মত হলো, ভাড়াদাতা চুক্তি স্বাক্ষরের সময় থেকেই ভাড়ার মালিক হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তি তার ঘর ভাড়া দেয়, তার ঘর ভাড়া নিসাব পরিমাণ হলেই এবং বছর ঘুরে এলেই তার উপর যাকাত ফরয হয়। বস্তুত ভাড়া প্রদানকারী তার ঘরভাড়াকে নানাভাবে কাজে লাগাতে পারে। ঘর ভাড়া যে কোনো সময় বাতিলযোগ্য, এ অজুহাতে যাকাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়না। যেমন সহবাসের পূর্বে বিয়ে বাতিল হয়ে যেতে পারে এই অজুহাতে সহবাসের পূর্বে মোহরানার যাকাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়না। ঘর ভাড়া হস্তগত হলে তা থেকে যাকাত আদায় করবে। আর যদি তা ঋণ হয়, তবে তা ঋণের মতোই- চাই তা ত্বরিত পরিশোধযোগ্য অথবা বিলম্বে পরিশোধযোগ্য- যাই হোক। (অর্থাৎ যখন তা হস্তগত করবে, তখন চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে যে সময় কেটে গেছে, এক বছর বা তার বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে থাকলে, সেই সময়ের জন্য যাকাত আদায় করতে হবে।) নববী তার গ্রন্থ 'আলমাজমু'তে বলেছেন : যদি কেউ তার ঘর ভাড়া দেয় অথবা তাৎক্ষণিক ভাড়ায় রূপান্তরিত করে এবং ভাড়া আদায় হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতভাবেই তার উপর যাকাত ফরয হবে।

২৪. ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত

সাহাবি, তাবেয়ী এবং ফকীহগণসহ অধিকাংশ আলেমের মতে বাণিজ্যিক পণ্যের উপর যাকাত ফরয। আবু দাউদ ও বায়হাকি সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, সামুরা ইবনে জুনদুব বলেছেন : "আমরা যেসব জিনিস বিক্রি করার জন্য রাখতাম, তা থেকে যাকাত দিতে রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন।" আর দার কুতনি ও বায়হাকি আবু যর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "উটে যাকাত রয়েছে, ছাগল ভেড়ায় যাকাত রয়েছে, গরুতে যাকাত রয়েছে এবং বাড়ির আসবাবপত্রে যাকাত রয়েছে।" শাফেয়ী, আহমদ, আবু উবায়েদ, দার কুতনি, বায়হাকি ও আবদুর রাযযাক আবু আমর বিন হিমাস থেকে এবং আবু আমর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : "আমি চামড়া ও বড় বড় খাবার পাত্র বিক্রি করতাম। একদিন উমর ইবনুল খাত্তাব আমার কাছ দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন : তোমার এসব মালপত্রের যাকাত দাও। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন, এতো চামড়া। তিনি বললেন : এর মূল্য নির্ণয় করো, তারপর তার যাকাত বের করো।" আলমুগনীতে বলা হয়েছে : এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে। কেউ এগুলো অস্বীকার করেনি। তাই এটা ইজমা তথা সর্বসম্মত মত গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যাহেরী মাযহাবের আলেমগণ বলেন : বাণিজ্যিক পণ্যের কোনো যাকাত নেই।

ইবনে রুশদ বলেছেন : বাণিজ্যিক পণ্যে যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে যা কিছু মতভেদ হয়েছে তার একমাত্র কারণ হলো কিয়াস এবং সামুরা ও আবু যরের হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে মতান্তর।

অধিকাংশ আলেমের কিয়াস হলো : যেসব পণ্য ব্যবসায়ের জন্য নির্দিষ্ট, তা দ্বারা সম্পদ বাড়ানোই লক্ষ্য। তাই যে সকল জিনিসে সর্বসম্মতভাবে যাকাত ফরয, বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে নির্দিষ্ট জিনিসগুলো সেসব জিনিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আল মানার' গ্রন্থে বলা হয়েছে : মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ আলেমের মতে বাণিজ্যিক পণ্যের

যাকাত ফরয। এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। কেবল কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যার কিছু বর্ণনা অপর কিছু কিছু বর্ণনাকে জোরদার করে। তবে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট উক্তিই এসব বর্ণনার পেছনে শক্তি যোগায়। ঐ উক্তিগুলোর মর্ম হলো, যে সকল বাণিজ্যিক পণ্য লাভজনক উদ্দেশ্যে লেনদেন করা হয়, তা এক ধরনের নগদ অর্থের মতোই। ঐসব পণ্যের মূল্য দিরহাম ও দিনারের (অর্থাৎ নগদ টাকা পয়সার) সাথে এসব পণ্যের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা শুধু এই টুকু, যাকাতের নিসাব পণ্য ও পণ্যের মূল্য তথা নগদ অর্থের মধ্যে উঠানামা করে। এর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকেনা। তাই বাণিজ্যিক পণ্যে যদি যাকাত ফরয না হতো, তাহলে সকল ব্যবসায়ী তাদের নগদ অর্থ দিয়ে এমনভাবে ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারতো, যাতে স্বর্ণ বা রৌপ্য-কোনোটার নিসাবের উপরই বছর না ঘোরে। এভাবে তাদের সমস্ত বাণিজ্যিক পণ্যে যাকাত বাতিল হয়ে যেতো।

এই বিধির মূল বিবেচ্য বিষয় হলো : আল্লাহ তায়ালা ধনীদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের সাহায্য ও সহানুভূতির উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে। এতে ধনীদের উপকারিতা হলো, কার্পণ্যের মতো ঘৃণ্য কলংক থেকে তাদের মন পবিত্র হয়। দরিদ্রদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের মহৎ গুণে তারা সমৃদ্ধ হয় এবং দেশ ও জাতিকে জনকল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা হয়। আর দরিদ্রদের উপকারিতা হলো, এতে তাদেরকে আকস্মিক বিপদ মুসিবতে সাহায্য করা যায়। সমাজে কতোগুলো বিকৃতি প্রতিহত করা হয়, যেমন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ কেন্দ্রিভূত হতে পারেনা এবং মুদ্রাস্ফীতি মূল্যস্ফীতি ঘটতে পারেনা। আল্লাহ তায়ালা রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের মহৎ উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন : كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

"যেন সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান না থাকে।" (আল-হাশর : আয়াত ৮)

যে ব্যবসায়ী সমাজের হাত দিয়ে জাতির অধিকাংশ সম্পদ লেনদেন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাদেরকে ইসলামের উল্লিখিত মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বাইরে থেকে যেতে দেয়া কি সমীচীন হতে পারে?

পণ্য কখন বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়? আল-মুগনীতে বলা হয়েছে : কোনো পণ্যের বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য দুটো শর্ত অপরিহার্য :

এক. নিম্নের কোনো না কোনো পদ্ধতিতে পণ্যের মালিক হতে হবে : ব্যবসা, বিয়ে, খুলা, উপহার গ্রহণ, ওসিয়ত, গণীমত, বৈধ চাকুরি বা উপার্জন। কেননা যে সম্পদ কারো মালিকানায় প্রবেশের মাধ্যমে তার উপর যাকাতের বিধি প্রযোজ্য বলে প্রমাণিত হয়না, তা শুধু নিয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয়না, যেমন রোযা। কোনো কিছুর বিনিময়ে মালিক হওয়া ও বিনিময় ছাড়া মালিক হওয়াতে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা সে নিজের কাজ দ্বারাই তার মালিক হয়েছে। এভাবে উক্ত সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মতো হয়েছে।

দুই. পণ্যের মালিকানা লাভের সময় এরূপ নিয়ত করা যে, এটা বাণিজ্যের জন্য। মালিক হওয়ার সময় যদি এরূপ না করে যে, এটি বাণিজ্যের জন্য, তাহলে তা বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হবেনা। পরে নিয়ত করলে সে নিয়ত কার্যকর হবেনা।

যদি কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হয় এবং তা দ্বারা ব্যবসা করার ইচ্ছা করে, তাহলে তা বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হবেনা। কেননা মূলত তা ব্যবহারিক সম্পত্তি। ব্যবসায় তার নবাগত অবস্থা। সুতরাং নিছক নিয়ত দ্বারা তা বাণিজ্যিক পণ্য হবেনা। যেমন কেউ যদি নিজ বাসস্থানে

অবস্থানরত থেকেই সফরের নিয়ত করে, তবে কার্যত সফরে বের হওয়া ছাড়া শুধু নিয়ত দ্বারা সে মুসাফির হবেনা। আর যদি সে ব্যবসায়ের জন্য কোনো পণ্য খরিদ করে, তারপর তাকে নিজের ব্যবহারের সম্পত্তি বলে নিয়ত করে, তাহলে তা ব্যবহারিক সম্পত্তি হয়ে যাবে এবং তাতে যাকাত প্রযোজ্য হবেনা।

২৫. বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত দেয়ার পদ্ধতি

যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ বাণিজ্যিক পণ্যের মালিক হয়ে যায় এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়। সে বছরের শেষে তার মূল্য নিরূপণ করবে এবং যাকাত আদায় করবে। উক্ত পণ্যের মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ে সারা বছর এ রকমই করবে। যে পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানাধীন, তা নিসাব পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত বছর গণ্য হবেনা।[৬] কেউ যদি নিসাবের চেয়ে কম কোনো পণ্যের মালিক হয়, অতঃপর তার উপর বছরের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়, আর তা সত্ত্বেও ঐ পণ্য যতোটুকু ছিলো ততোটুকুই থাকে, তারপর তার বর্ধিত অংশের মূল্য বেড়ে যায়। অথবা পণ্যের দর বেড়ে যায়, ফলে নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়, অথবা ঐ পণ্য নিসাবের বিনিময়ে বিক্রি করে। অথবা বছরের ভেতরে অন্য কোনো পণ্যের মালিক হয় অথবা এতো মূল্যের মালিক হয় যে, নিসাব পূর্ণ হয়, তাহলে তখন থেকে বছর শুরু হবে এবং অতিত সময় গণ্য হবেনা। এটা ছাওরী, হানাফী মাযহাব, শাফেয়ী, ইসহাক, আবু উবায়েদ, আবু ছাওর ও ইবনুল মুনযিরের অভিমত।

এরপর পুনরায় যখন বছরের মাঝখানে নিসাব কম হয়ে যায় এবং বছরের দুই প্রান্তে পূর্ণ থাকে, আবু হানিফার মতে, বছর ছিন্ন হবেনা। কেননা তাহলে তাকে প্রতি মুহূর্তে পণ্যের মূল্য জানতে হবে, যাতে সে বুঝতে পারে কখন তার মূল্য নিসাবে পৌঁছে যাবে। অথচ এটা একটা দুঃসাধ্য কাজ। হাম্বলীদের মতে, যখন বছরের মাঝখানে নিসাব কমে যায়, তারপর আবার বেড়ে নিসাব পূর্ণ হয়, তাহলে সেখান থেকে নতুন করে বছর গুণবে। কেননা মাঝখানে নিসাব কমে গিয়ে বছর ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

২৬. শস্য ও ফলমূলের যাকাত

মহান আল্লাহ তায়ালা তার নিম্নোক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে শস্য ও ফলমূলের উপর যাকাত ধার্য করেছেন : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"হে মুমিনগণ, তোমরা যে সকল হালাল জিনিস উপার্জন করেছ, তা থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য মাটি থেকে যা যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় করো।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৬৭) "ব্যয়" শব্দটি যাকাতের অর্থবোধক। আল্লাহ আরো বলেন :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

"আর তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ, যার কতক মাচান অবলম্বী এবং কতক মাচানবিহীন এবং খেজুর গাছ ও শস্য ক্ষেত, যাতে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়, আর যয়তুন ও ডালিম, যা পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ। যখন ফলবান হয় তখন তা থেকে ফল খাও এবং ফসল কাটার দিন তার হক দান করো।" (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৪১)

---

৬. ইমাম মালেকের মতে নিসাবের ভয়ে কমের উপরও বছর ধরা হয়। বছরের শেষে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে।

ইবনে আব্বাস এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : এর হক হলো যাকাত, যা ফরয করা হয়েছে। আর যাকাত হলো দশ ভাগের এক ভাগ এবং বিশ ভাগের এক ভাগ।

যে সকল কৃষি পণ্য থেকে রসূল সা.-এর আমলে যাকাত নেয়া হতো : রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে যাকাত আদায় করা হতো গম, যব, খোরমা ও কিশমিস থেকে।

আবু মূসা ও মুয়ায রা. থেকে বর্ণিত : "রসূলুল্লাহ তাদের দু'জনকে ইয়ামানে পাঠালেন জনগণকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য। তিনি আদেশ দিলেন যেনো এই চারটে জিনিস থেকে ছাড়া যাকাত না নেয়া হয় : গম, যব, খোরমা ও কিশমিস।" -দার কুতনি, হাকেম, তাবারানি, বায়হাকি। এ হাদিসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবদুল বার বলেছেন, আলেমরা একমত, যাকাত গম, যব, খোরমা ও কিশমিসের উপর ফরয।

ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে : "রসূলুল্লাহ সা. শুধু গম, যব, খোরমা, কিশমিস ও ভুট্টার যাকাত চালু করেছেন।"

যে সকল ফসলে যাকাত নেয়া হতোনা : শাক সবজি থেকে এবং আংগুর ও খেজুর ব্যতিত কোনো ফলে যাকাত নেয়া হতোনা। আতা ইবনে সায়েব থেকে বর্ণিত :

আবদুল্লাহ ইবনুল মুগীরা মূসা ইবনে তালহার ক্ষেতে উৎপন্ন শাক সবজি থেকে যাকাত আদায় করতে চেয়েছিলেন। মূসা ইবনে তালহা তাকে বললেন : আপনি এটা করতে পারেননা। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলতেন, এগুলোতে যাকাত নেই। -দার কুতনি ও হাকেম। আর মূসা ইবনে তালহা বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. থেকে পাঁচটি জিনিসে যাকাত চালু রয়েছে : গম, যব, জোয়ার, কিশমিস ও খোরমা। এছাড়া আর মাটি থেকে উৎপন্ন আর কোনো ফসলে উশর (দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত) নেই। তিনি আরো বলেছেন : মুয়ায সবজি তরকারীতে যাকাত নেননি।

মাছরাম বর্ণনা করেছেন : উমরের প্রশাসক তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, ফিরসিক জাতীয় আংগুর ও ডালিমের মধ্যে কোন্‌টি সাধারণ আংগুরের চেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তিনি জবাবে, লিখলেন : এতে কোনো উশর নেই। এটা একটা কাঁটাদার গাছ। তিরমিযি বলেছেন : আলেমদের অধিকাংশের মত এটাই, শাক সবজি ও তরকারীতে যাকাত নেই।

কুরতুবি বলেছেন : যাকাত খাদ্য শস্যের সাথে সম্পৃক্ত- সবজি ও তরকারীর সাথে নয়। তায়েফে ফিরসিক, ডালিম ও লেবু ছিলো। কিন্তু রসূল সা. এবং তার খলিফাদের কেউ এগুলো থেকে যাকাত আদায় করেছেন বলে প্রমাণ নেই। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন : ঘোড়া ও দাসদাসী থেকে যাকাত গ্রহণ করা রসূল সা.-এর রীতি ছিলোনা। গাধা, খচ্চর, শাক সবজি, বাংগী, তরমুজ এবং যে সকল ফল মাপে বা ওজনে বিক্রি হয়, তা থেকেও যাকাত নিতেননা। তবে আংগুর ও খেজুর থেকে পাইকারী হারে যাকাত নিতেননা। শুকনো বা অশুকনো খেজুরে পার্থক্য করতেননা।

ফকীহদের মতামত : খাদ্য শস্য ও ফলমূলে যে যাকাত ফরয, সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ রয়েছে কেবল কী কী শ্রেণীর খাদ্য শস্যে যাকাত ফরয তাই নিয়ে। এ ব্যাপারে আলেমগণের মতামত সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. হাসান বসরী, ছাওরী ও শা'বী বলেছেন : কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় যেসব শস্যের নামোল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে ছাড়া কোনো যাকাত নেই। এই শস্যগুলো হলো, গম, যব, ভুট্টা, খোরমা, কিশমিস। কেননা এছাড়া অন্যান্য শস্যের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে কোনো উল্লেখ নেই। শওকানির দৃষ্টিতে এটাই সঠিক মত।

২. আবু হানিফার মত : যাবতীয় কৃষিজাত দ্রব্যে- যা মাটি থেকে উৎপন্ন হয় যাকাত ফরয, চাই তা শাক সবজি ও তরিতরকারি হোক বা অন্য কিছু। তিনি শুধু মাটির ব্যবহার ও মাটি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ইচ্ছা থাকার শর্ত আরোপ করেছেন। কেবল জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, মাদক জাতীয় উদ্ভিদ ও যে গাছে ফল ধরেনা, তাতে যাকাত নেই। এ মতের পক্ষে তিনি প্রমাণ দর্শান রসূল সা. উক্তি : "আকাশের বৃষ্টিতে যা কিছু ফসল জন্মে, তাতে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে"। কেননা এ উক্তিতে বৃষ্টির পানি দ্বারা উৎপন্ন প্রতিটি কৃষি দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলোর চাষ করা দ্বারা মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ইচ্ছা করা হয়। তাই এগুলো শস্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৩. আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মত : যা কিছুই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়, তা থেকে যাকাত দিতে হবে। তবে এ জন্য শর্ত হলো, অত্যধিক যত্ন ছাড়াই তা যেনো এক বছর টিকে থাকে, চাই তার পরিমাপ ওজন বা মাপ- যেভাবেই করা হোক। ওজনের মাধ্যমে যা পরিমাপ করা হয় তার উদাহরণ হলো তুলো ও চিনি, আর মাপের মাধ্যমে যেগুলো পরিমাপ করা হয় তার উদাহরণ শস্যবীজসমূহ। এক বছর যদি টিকে না থাকে যেমন শসা, খিরাই, তরমুজ, বাংগী ইত্যাকার ফলমূল ও সবজি, তবে তাতে যাকাত নেই।

৪. মালেকের মত : ভূমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্য মাত্রই যাকাত দিতে হবে। তবে শর্ত হলো, তা যেনো টিকে থাকে, শুকায় ও মানুষের প্রচেষ্টায় উৎপন্ন হয়, চাই তা খাদ্যশস্য হোক, যেমন- গম ও যব অথবা খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য কিছু, যেমন কিরতিম নামক শস্যদানা ও তিল। তার মতে সবজি ও ফলমূল, যেমন- ডুমুর, ডালিম ও আপেল ইত্যাদিতে যাকাত নেই।

৫. শাফেয়ীর মতে, ভূমি থেকে উৎপন্ন যে শস্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সংরক্ষণ করা হয় এবং মানুষের চেষ্টায় তা উৎপন্ন হয়। যেমন গম ও যব- এগুলোতে যাকাত ফরয। নববী বলেছেন : খেজুর ও আংগুর ছাড়া আর কোনো ফলে আমাদের মাযহাবে যাকাত নেই। খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত হয় এমন শস্য ব্যতিত আর কোনো শস্যে যাকাত নেই। সবজিতেও যাকাত নেই।

আহমদের মতে, আল্লাহ ভূমি থেকে যা কিছুই উৎপন্ন করেন, তাতে যাকাত দিতে হবে, যেমন- শস্যবীজ, ফলমূল যা শুকায়, টিকে থাকে, মাপের মাধ্যমে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং মানুষ নিজের চেষ্টায় ও নিজের ভূমিতে উৎপাদন করে- চাই তা খাদ্য জাতীয় হোক- যেমন গম (উল্লেখ্য, কেউ যদি কৃষিপণ্য বা ফল খাবার জন্যে ক্রয় করে অথবা অন্য তবে তাতে যাকাত ফরয হবেনা।) অথবা গম ও যব ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্য হোক। (যেমন- ডাল, ছোলা, কলাই, শিম ইত্যাদি) অথবা তরকারি জাতীয় হোক, অথবা শসা ও খিরাই হোক অথবা কিরতিম ও তিল হোক। তার মতে, এসব কৃষিজাত শস্যের সম গুণসম্পন্ন ফলমূলে যথা আপেল, নাশপাতি ও ডুমুর, যা শুকায়না এবং সবজি যথা শসা, খিরাই, তরমুজ, গাজর ও শালগমে যাকাত নেই।

জলপাই-এর যাকাত : নববী বলেছেন, আমাদের নিকট বিশুদ্ধ মত হলো- জলপাইতে যাকাত নেই। হাসান বিন সালেহ, ইবনে আবি লায়লা ও আবুস্ উবাইদের মতও অদ্রূপ। পক্ষান্তরে যুহরী, আওযায়ী, লায়ছ, মালেক, ছাওরী, আবু হানিফা ও আবুস্ ছাওরের মতে, এতে যাকাত ফরয। যুহরী, লায়স ও আওযায়ী বলেছেন, জলপাইতে অনুমান চালাতে হবে এবং জলপাই-এর তেলের হিসেবে যাকাত দেয়া হবে। মালেক বলেন : অনুমানের দরকার নেই। নির্যাস বের করার পর যখন পাঁচ ওয়াসাক হবে তখন উশর (এক দশমাংশ) নেয়া হবে।

মতভেদের কারণ ও উৎস : ইবনে রুশদ বলেছেন : যারা যাকাতকে কেবল সর্বসম্মত দ্রব্যাদির মধ্যে সীমিত রাখেন এবং যারা খাদ্য জাতীয় সঞ্চয়যোগ্য জিনিসগুলোতেও তাকে সম্প্রসারিত করেন, তাদের মধ্যে মতভেদের কারণ হলো, এই চারটি সর্বসম্মত জিনিসের সাথে যাকাতের সম্পর্কের কারণ নিয়ে মতভেদ। প্রশ্ন হলো, এই সম্পর্ক কি শুধু ঐ জিনিসগুলোর জন্য, না ঐগুলোর কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য যা ধরে নেয়া হয় খাদ্য জাতীয় হওয়া। যারা বলেন, কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, বরং ঐ জিনিস চারটির জন্যই যাকাত ফরয হয়েছে। তারা এই চারটির মধ্যেই যাকাতকে সীমিত রাখার প্রবক্তা। আর যারা বলেন, খাদ্য জাতীয় হওয়ার বৈশিষ্ট্যের জন্যই, তারা যাবতীয় খাদ্য জাতীয় শস্যকে যাকাতের আওতাধীন করেন। আর যারা যাকাতকে শুধু খাদ্যশস্যের মধ্যে সীমিত করেন এবং যারা সকল শস্যকে যাকাতের আওতাধীন করেন- কেবল মাদক জাতীয় ফল, জ্বালানি কাঠ ও বাঁশ ব্যতিত- তাদের মতভেদের কারণ পরস্পর বিরোধী।

শাব্দিক ব্যাপকতার কারণে কিয়াস : শাব্দিক ব্যাপকতা, যা সকল কৃষিজাত দ্রব্যকে যাকাতের আওতাধীন করার দাবি জানায়, তা রয়েছে রসূল সা. এর হাদিসে : আকাশের বৃষ্টির পানিতে যা জন্মে, তাতে এক দশমাংশ এবং যা সেচের মাধ্যমে যা জন্মে, তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। এ হাদিসে "যা" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। অনুরূপ কুরআনের এ উক্তিতেও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ বিদ্যমান : وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ .....

"তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ, যার কতক মাচান সম্বলিত এবং কতক মাচানবিহীন .....যেদিন তা কেটে ঘরে তোলো, সেদিন তার হক দাও।"

এখানে কিয়াস তথা যুক্তি হলো, যাকাতের একমাত্র উদ্দেশ্য অভাব বা দারিদ্র্য দূর করা- যা খাদ্য জাতীয় শস্য ছাড়া অন্য কোনো শস্য দ্বারা প্রায়ই সফল হয়না। কাজেই যারা এই কিয়াস দ্বারা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ শস্যকে নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে সীমিত করেন, অর্থাৎ শুধু খাদ্য জাতীয় শস্য বুঝান, তারা খাদ্য জাতীয় শস্য ব্যতিত অন্য সব শস্যকে যাকাতের আওতা বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করেন। আর যারা ব্যাপকভাবে বহাল রাখেন, তারা খাদ্যশস্য ব্যতিত অন্যান্য শস্যেও যাকাত ফরয বলে মত দেন। অবশ্য সর্বসম্মত মতানুসারে যা যাকাত বহির্ভূত তা যাকাত বহির্ভূতই থাকবে।

আর যারা খাদ্য জাতীয় শস্যেই যাকাত ফরয- এই মর্মে একমত, তারাও কিছু কিছু জিনিসে দ্বিমত পোষণ করেন। এই দ্বিমতের কারণ হলো, ঐ জিনিসগুলো যথার্থই খাদ্য জাতীয় কিনা সে ব্যাপারে তাদের মতানৈক্য। এ ধরনের একটি মতানৈক্যের উদাহরণ হলো জলপাই সম্পর্কে ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর মতানৈক্য। মালেক জলপাইতে যাকাত ফরয মনে করেন। আর শাফেয়ী মিশরে বসে সর্বশেষ যে মত দিয়েছেন, তাতে জলপাইতে যাকাত ফরয নয়। এই মতভেদের কারণ হলো, একজন একে খাদ্য জাতীয় ফসল মনে করেন, অন্যজন করেননা।

২৭. শস্য ও ফলের যাকাতের নেসাব

অধিকাংশ আলেমের মতে কোনো ফল ও শস্যে যাকাত ফরয নয়- যতোক্ষণ না তা তার খড় ও খোসা থেকে পৃথক করার পর পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হয়। খোসা ছাড়ানো নাহলে তার নিসাব দশ ওয়াসাক।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোনো যাকাত নেই। -আহমদ, বায়হাকি।

২. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : খোরমা বা কোনো শস্য দানা পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে তাতে যাকাত নেই। এক ওয়াসাক হলো সর্বসম্মতভাবে ষাট সা'।

আবু হানিফা ও মুজাহিদ বলেছেন, যে কোনো শস্যে, কম হোক বেশি হোক, যাকাত ফরয। কেননা রসূল সা. এর উক্তি "যা বৃষ্টির পানি দ্বারা জন্মে তাতে উশর ধার্য রয়েছে" কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। তাছাড়া এতে যেহেতু বছরের শর্ত নেই, তাই নেসাবেরও শর্ত নেই।

ইবনুল কাইয়িম এই মতটির পর্যালোচনা প্রসংগে বলেছেন : যে সকল জিনিসে উশর ফরয হয়, বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার নিসাব পাঁচ ওয়াসাক ধার্য করা হয়েছে। যেমন রসূল সা. বলেছেন : বৃষ্টির পানি দ্বারা যে ফসল জন্মে তাতে উশর (এক দশমাংশ) আর যা সেচ দ্বারা জন্মানো হয় তাতে অর্ধ উশর ফরয। তারা বলেছেন : এখানে কোনো নিসাব নেই। কম হোক, বেশি হোক, যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যে হাদিসে নির্দিষ্টভাবে নিসাব ধার্য করা হয়েছে, সে হাদিস এ হাদিসের বিপরীত। অথচ ব্যাপক অর্থবোধক হাদিসের বক্তব্যও নির্দিষ্ট অর্থবোধক হাসিদের মতোই অকাট্য। আর দুই হাদিস যখন পরস্পর বিরোধী হয়, তখন যেটি পালন করা অধিকতর সতর্কতামূলক, সেটি অগ্রগণ্য। আর সেটি হলো, নিসাবের কম হলেও ফলফসলের যাকাত ফরয।

এ সমস্যার সমাধানে বলা হয়, উভয় হাদিসের উপর আমল করা জরুরি এবং একটি দ্বারা অপরটিকে পুরোপুরি বাতিল করা জায়েয নয়। কেননা উভয় হাদিসেই রসূলের আনুগত্য ফরয। এই উভয় হাদিস কোনোভাবেই পরস্পরের বিরোধী নয়। কেননা "বৃষ্টির পানি দ্বারা যে ফসল জন্মে তাতে উশর ধার্য রয়েছে"। এ হাদিসে আসলে কোন্‌টার উশর ও কোন্‌টার অর্ধ উশর ধার্য, তা পৃথক পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উভয়টির উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয়টির কোন্‌টিতে কতোটুকু যাকাত দিতে হয়, তা পৃথক করে বলে দেয়া হয়েছে। নিসাবের বিষয়টি এ হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি। সেটি বলা হয়েছে অপর হাদিসটিতে। কাজেই যে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত বা হাদিসে তার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ব্যতিত অন্য কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, তাকে এমন একটা অস্পষ্ট আয়াত বা হাদিসের অর্থে গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে, যার লক্ষ্য একটা অনির্দিষ্ট বক্তব্যকে নির্দিষ্ট বক্তব্য দ্বারা বিশ্লেষণ করা। যেমন যাবতীয় অনির্দিষ্ট বক্তব্য অপর একটা নির্দিষ্ট বক্তব্য দ্বারা বিশ্লেষিত হয়ে থাকে।

ইবনে কুদামা বলেছেন : "পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলে কোনো যাকাত ধার্য নেই" এ হাদিসটি নির্দিষ্ট, যাকে অগ্রে উল্লেখ করা এবং এ দ্বারা অপর অনির্দিষ্ট হাদিসের নির্দিষ্টকরণ জরুরি। যেমন "সকল চরণশীল উটে যাকাত ধার্য রয়েছে" এ অনির্দিষ্ট ও ব্যাপক অর্থবোধক হাদিসকে "পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই" এই হাদিস দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপ "বৃষ্টিস্নাত ভূমির উৎপন্ন ফসলে এক দশমাংশ বা উশর ধার্য" এ হাদিস "পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোনো যাকাত নেই" এ হাদিস দ্বারা নির্দিষ্ট ও বিশ্লেষিত হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু এটি এমন সম্পদ, যাতে যাকাত ধার্য রয়েছে, কাজেই তার স্বল্প পরিমাণে কোনো যাকাত ধার্য নেই। যাকাতের আওতাধীন সকল জিনিসের ব্যাপারেই এই মূলনীতি কার্যকর। ফসলের ক্ষেত্রে বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি নয়। কারণ ফসল কেটে ঘরে তুললেই তার বৃদ্ধি পূর্ণ হয়ে যায়, তাকে রেখে দেয়া দ্বারা পূর্ণ হয়না। অন্যসব জিনিসে বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা অন্য সকল ফসলে বছর পূর্ণ হলে বৃদ্ধি পূর্ণ হতে পারে বলে ধারণা জন্মে। নিসাবের শর্ত ধার্য রয়েছে, যাতে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যা দ্বারা মানুষকে সাহায্য করা সম্ভব। তাছাড়া যাকাত তো ধনিদের উপরই ফরয। অথচ কোনো যাকাত প্রদেয় সম্পদে নিসাব ছাড়া ধনাঢ্যতা প্রমাণিত হয়না।

সা' হলো একটা পান পাত্র ও তার এক তৃতীয়াংশ। এভাবে নিসাব পঞ্চাশ পানপাত্রের সমানও হতে পারে। উৎপন্ন ফসল যদি পাত্র দ্বারা মাপা সম্ভব না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ইবনে কুদামা বলেছেন : জাফরান, তুলো এবং অনুরূপ ওজন দ্বারা পরিমাপ্য জিনিসের নিসাব হলো, এক হাজার ছয়শো ইরাকী রতল। (উল্লেখ্য, পাঁচ ওয়াসাক হচ্ছে- এক হাজার ছয়শো ইরাকী রতল। আর এক ইরাকী রতল হলো প্রায় ১৩০ দিরহামের সমান) কাজেই এর ওজন এক হাজার ছয়শো ইরাকী রতলের সমান।

আবু ইউসুফ বলেছেন : উৎপন্ন ফসল যদি পাত্র দ্বারা পরিমাপযোগ্য না হয়, তাহলে তাতে যাকাত ফরয হবেনা। তবে যা পাত্র দিয়ে মাপা হয়, তা যদি নিসাবের মূল্যের সমান হয়, তা হলে যাকাত দিতে হবে।

পাঁচ ওয়াসাক সর্বনিম্ন যে জিনিস পাত্র দিয়ে মাপা হয় যেমন যব ইত্যাদি, তার সমান না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরয হবেনা। কেননা এটিকে শুধু এর দ্বারা হিসাব করা সম্ভব নয়, তাই অন্য জিনিস দ্বারা হিসাব করা হয়। যেমন টাকা পয়সা ছাড়া অন্যান্য পণ্য বস্তুকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাবের মধ্যে যেটি ক্ষুদ্রতর, সেই অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়।

মুহাম্মদ বলেছেন : কোনো জিনিসের সর্বোচ্চ মানের পাঁচ গুণ হওয়া জরুরি। তাই তুলোর ক্ষেত্রে পাঁচ কিনতার হলে যাকাত দিতে হবেনা। কেননা যা ওয়াসাক দ্বারা মাপা হয়, তাকে ওয়াসাক দ্বারা হিসাব করার কারণ হলো, ওটা ঐ শ্রেণীর জিনিসকে পরিমাপ করার সর্বোচ্চ মাধ্যম বা মানদণ্ড।

যাকাত আদায় করার পরিমাণ : ফসলের যাকাতের পরিমাণ তাতে যে পানি ব্যবহার করা হয়, তার শ্রেণীভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো যন্ত্র ব্যবহার ছাড়াই যদি পানি দেয়া হয়। তাহলে তাতে উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ বা উশর দিতে হবে। আর যদি কোনো যন্ত্র ব্যবহৃত হয় অথবা ক্রয় করা পানি দেয়া হয় তাহলে তাতে অর্ধ উশর অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।

১. মুয়ায রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে সকল শস্য বৃষ্টি, নিজস্ব আর্দ্রতা ও স্রোতের পানি দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে উশর তথা এক দশমাংশ আর যে সকল শস্য পুকুর বা নদী খাল থেকে সেচ দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে অর্ধ উশর তথা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। -বায়হাকি ও হাকেম।

২. আর ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : বৃষ্টি বা নদীখালের পানি দিয়ে যে ফসল জন্মানো হয় অথবা স্বাভাবিক আর্দ্রতা দ্বারা জন্মানো হয়, তাতে উশর আর যে ফসল সেচ দ্বারা জন্মানো হয়, তাতে অর্ধ উশর দিতে হবে। -বুখারি। আর যদি কখনো যান্ত্রিক উপায়ে, কখনো অযান্ত্রিক উপায়ে চাষ করা হয়, তবে উভয়টি যদি সমান সমান হয়, তাহলে তাতে উশরের চার ভাগের তিনভাগ যাকাত দিতে হবে।

ইবনে কুদামা বলেন : এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত আছে বলে জানিনা। আর যদি এই দুটোর একটা বেশি হয়, তাহলে যেটি কম, তার বিধি যেটি বেশি, তার আওতাধীন হবে। এটা আবু হানিফা, আহমদ ও ছাওরীর মত এবং শাফেয়ীর দুই মতের একটি।

আর ফসলের যাবতীয় খরচ, যথা কাটা, বহন করা, মাড়াই করা, পরিষ্কার করা ও সংরক্ষণ করা- এই সবই মালিকের সম্পত্তি থেকে সম্পন্ন হবে। এর একটিও যাকাতের সম্পদ থেকে দেয়া হবেনা।

ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমরের মতে, চাষ করা ও ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে যদি ঋণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে সেটা যাকাত থেকে হিসাব করা হবে। আর জাবির বিন যায়দ থেকে বর্ণিত : যে ব্যক্তি ঋণ নিয়ে তার ফসলে ও পরিবারে ব্যয় করে, তার সম্পর্কে ইবনে উমর বলেছেন : যে পরিমাণ অর্থ সে ঋণ নিয়েছে, আগে তা পরিশোধ করবে, অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা থেকে যাকাত দেবে। আর ইবনে আব্বাস্ বলেছেন : যা ফসলে ব্যয় করেছে, আগে তা পরিশোধ করবে। অতঃপর বাকি অংশ থেকে যাকাত দেবে। ইয়াহইয়া ইবনে আদম তাঁর গ্রন্থ কিতাবুল খারাজে বলেছেন : প্রথমে ফসলের পেছনে ব্যয় করবে। অতঃপর যা বাকি থাকে তা থেকে যাকাত দেবে। আর ইবনে হাযম আতা থেকে বর্ণনা করেছেন : যা ফসল পাওয়া যায় তা থেকে ফসলের পেছনে ব্যয় হয়েছে তা কেটে নেবে। এরপর যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে যাকাত দেবে, নচেত দেবেনা।

২৮. খেরাজী জমির যাকাত

জমি দু'রকমের : উশরী ও খেরাজী।

১. উশরী হলো সেই জমি, যার মালিক সেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা যে জমি শক্তি প্রয়োগে বিজিত হয়েছে এবং মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে অথবা যে জমিকে মুসলমানরা চাষযোগ্য করেছে।

২. আর খেরাজী জমি হলো- যে জমি বল প্রয়োগে দখল করে তার মালিকদের হাতেই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনার বিনিময়ে রেখে দেয়া হয়েছে। খেরাজ হলো খাজনা বা কর।

উশরী জমির ন্যায় খেরাজী জমিতেও যাকাত ফরয হয় যখন তার মালিকরা ইসলাম গ্রহণ করে। অথবা কোনো মুসলমান তা খরিদ করে। এতে একই সাথে উশর ও খাজনা দুটোই দিতে হবে। একটি দেয়াতে অন্যটি দেয়া বন্ধ হবেনা। ইবনুল মুনযিরের মতে এটা অধিকাংশ আলেমদের অভিমত। এই মত আরো যারা সমর্থন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন উমর ইবনে আবদুল আযীয, রবীয়া, যুহরী, ইয়াহইয়া আনসারী, মালেক, আওযায়ী, হাসান বিন সালেহ, ইবনে আবি লায়লা, লায়স, ইবনুল মুবারক, আহমদ, ইসহাক, আবু উবায়েদ ও দাউদ যাহেরী। তারা তাদের মতের সমর্থনে প্রমাণ দিয়েছেন কুরআন, হাদিস ও কেয়াস থেকে। কুরআন থেকে যে প্রমাণ দিয়েছেন তা হলো সূরা বাকারার ২৬৭ নং আয়াত :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা যে হালাল সম্পদ উপার্জন করেছো এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে ব্যয় করো।"

এখানে ভূমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর শর্তহীনভাবে যাকাত ফরয করা হয়েছে চাই তা খাজনা দেয়া জমি হোক অথবা উশরী জমি হোক। আর হাদিস হলো, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বৃষ্টির পানিতে যা কিছুই উৎপন্ন হয় তাতে উশর ফরয। এখানে "যা কিছু" শব্দটা ব্যাপক অর্থবোধক, যার আওতায় উশরী ও খেরাজী উভয় রকমের জমি এসে যায়। আর কেয়াস হলো, যেহেতু যাকাত ও খেরাজ দুটোই স্বতন্ত্র হক, যা দুটো স্বতন্ত্র কারণে নির্দিষ্ট, তাই হকদারদের প্রাপ্য হয়ে থাকে। কাজেই একটি আর একটির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। যেমন ইহরাম রত ব্যক্তি যদি কারো মালিকানাভুক্ত জন্তুকে শিকার হিসেবে হত্যা করে, তাহলে মালিককেও তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আবার ইহরাম রত অবস্থায় নিষিদ্ধ শিকার করার জন্য আলাদা একটা কুরবানিও দিতে হবে। তাছাড়া উশর যেহেতু কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট আদেশের ভিত্তিতেই ফরয, তাই ইজতিহাদ (গবেষণা) ভিত্তিক খাজনার কারণে তা মওকুফ হতে পারেনা।

আবু হানিফার মতে, খাজনা দেয়া জমিতে উশর ফরয নয়। সেখানে আগের মতো শুধু খাজনাই দিতে হবে। উশর ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, জমি যেনো খেরাজী না হয়।

আবু হানিফার প্রমাণ ও তার পর্যালোচনা : আবু হানিফা তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ পেশ করেছেন :

১. ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : কোনো মুসলমানের জমিতে একই সাথে উশর ও খেরাজ উভয়টা প্রদেয় হয়না। কিন্তু এ হাদিসটি সর্বসম্মতভাবে দুর্বল। বায়হাকিও একে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপ, হানাফি ইমাম কামাল ইবনে হুমামও এ হাদিসকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। (তিনি অধিকাংশের মতকেই অগ্রগণ্য বলে মত দিয়েছেন। তার পর্যালোচনা আমাদের এই পর্যালোচনা থেকে ভিন্ন নয়।)

২. আহমদ, মুসলিম ও আবু দাউদ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : ইরাক তার টুকরিভরা শস্য ও দিরহাম দেয়া বন্ধ করবে। সিরিয়া তার দুই মুদ শস্য ও দিনার দেয়া বন্ধ করবে। মিশর তার ২৪ সা' মাপের পাত্র ভর্তি শস্য ও দিনার দেয়া বন্ধ করবে। আর তোমরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলে, সেখানে ফিরে যাবে। তিনবার বললেন। আবু হুরায়রার গোশত ও রক্ত এ ব্যাপারে সাক্ষী রয়েছে।*

কিন্তু এ হাদিসে খেরাজী জমি থেকে যাকাত আদায় করা হবেনা এই মর্মে কোনো প্রমাণ নেই। আলেমগণ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন, এর অর্থ হলো, ইরাক সিরিয়া ও মিশরবাসী একদিন ইসলাম গ্রহণ করবে, ফলে তাদের জিযিয়া মওকুফ হবে। অথবা শেষ যামানায় যাকাত জিযিয়া ইত্যাদি অবশ্য দেয় হকসমূহ যে দেয়া হবেনা, সেদিকেই এখানে ইংগিত করা হয়েছে। উল্লিখিত উভয় ব্যাখ্যার পর নববী বলেছেন : তারা যে ব্যাখ্যা করেছেন তা যদি সঠিক হতো তাহলে দিরহাম, দিনার (স্বর্ণ ও রৌপ্য) ও ব্যবসায় পণ্যের যাকাত ফরয হতোনা। অথচ এরূপ মত কেউ পোষণ করেনা।

৩. বর্ণিত আছে, জনৈক কৃষক যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন উমর রা. বললেন, ওর জমি ওর কাছে সমর্পণ করে দাও এবং ওর কাছ থেকে খাজনা নাও।" এ থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, খেরাজ আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, উশর আদায়ের নয়।

উল্লিখিত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, ভূমির মালিকের ইসলাম গ্রহণে খেরাজ ও উশর কোনোটাই রহিত হয়না। এখানে খেরাজের উল্লেখের কারণ হলো, ইসলাম গ্রহণ করলে যেসব জিযিয়া রহিত হয়ে যায়, তেমনি খেরাজও (ভূমিকর) রহিত হয় বলে ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। আর উশর তো প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমানের উপর ফরয, এটা সবার জানাই থাকে। কাজেই এর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ, উক্ত কৃষকের কাছ থেকে পালিত পশুর যাকাত এবং স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাত ইত্যাদি আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। উশরের উল্লেখ না করার কারণ এও হতে পারে, উশর যেসব ফসলে ফরয হয়, তা হয়তো তার ছিলোনা।

৪. "শাসক ও ইমামগণ একই ব্যক্তির কাছ থেকে উশর ও খেরাজ উভয়টা আদায় করতেননা" -এ যুক্তি অচল। কেননা ইবনুল মুনযির বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয উভয়টা আদায় করতেন।

৫. "খেরাজ হলো উশরের বিপরীত। কেননা খেরাজ আরোপিত হয় শাস্তি স্বরূপ, আর উশর

* এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ দর্শানো হয়েছে এই বলে : অবশ্য প্রদেয় হকসমূহ প্রদান এক সময় যে বন্ধ করা হবে এবং এই হকসমূহের মাঝে যে বাধার সৃষ্টি করা হবে, সে কথা এখানে জানানো হয়েছে। আর এ হাদিসে খেরাজের কথাই বলা হয়েছে। উশর যদি ফরয হতো, তাহলে তার উল্লেখ করা হতো।

আরোপিত হয় ইবাদত স্বরূপ। তাই একই ব্যক্তির কাছ থেকে উভয়টা আদায় করা যায়না।" প্রাথমিক অবস্থায় এ কথা ঠিক। কিন্তু স্থায়ীভাবে সঠিক নয়। আর সব ক্ষেত্রে খারাজের ভিত্তি জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ নয়। জবরদস্তি ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিতে খেরাজ আরোপ করা যেতে পারে। যেমন অন্য একটা খেরাজী জমির নিকটবর্তী জমি অথবা যে জমিকে নদী বা খালের পানি দ্বারা চাষযোগ্য করা হয় ও সেচ দেয়া হয়, সে জমিতেও খেরাজ আরোপ করা হয়।

৬. "খেরাজ ও উশর উভয়ের মূল কারণ একই। সেটি হচ্ছে জমি উর্বরা ও উৎপাদনশীল হওয়া, চাই তা স্বাভাবিকভাবেই হোক অথবা কৃত্রিমভাবে। কেননা জমি যদি লবণাক্ত, আর্দ্র বা জলা হয় এবং তা দ্বারা কোনো উপকার পাওয়া না যায়, তাহলে তাতে খেরাজ ও উশর কোনোটাই নেই।"

আর কারণ যখন একই হবে, তখন সে জমিতে খেরাজ ও উশর দুটোই আরোপিত হবেনা। কেননা একই কারণ থেকে কখনো একই ধরনের দুটো হক প্রাপ্য হয়না। যেমন কেউ যদি পালিত চরণশীল পশুকে ব্যবসায়ে লাগায় এবং তা থেকে বছর পূর্ণ হওয়ায় নিসাবের মালিক হয়, তাহলে তাতে দু'বার যাকাত আরোপিত হবেনা।"

এর জবাব হলো, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কেননা উশর আরোপিত হয় জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের উপর। আর খেরাজ আরোপিত হয় জমির উপর-চাই জমি চাষ করুক অথবা বেকার ফেলে রাখুক। ইবনে হুমাম বলেন : যদি মেনেও নেয়া হয় যে, খেরাজ ও উশরের একই কারণ, তাহলেও জমির সাথেই উভয়টিকে সম্পৃক্ত করার পথে কোনো বাধা নেই।

২৯. ইজারা দেয়া জমির ফসলের যাকাত

অধিকাংশ আলেমের মত হলো, যে ব্যক্তি কোনো জমিকে ভাড়া নেয় এবং ফসল ফলায়, তার যাকাত তার উপরই ফরয, জমির মালিকের উপর নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে, মালিকের উপরই যাকাত ফরয। ইবনে রুশদ বলেছেন : এই মতভেদের কারণ হলো, উশর জমির উপর ধার্য হয়, না ফসলের উপর। সবাই যখন একমত যে, এই দুয়ের যে কোনো একটির উপর ধার্য হয়, তখন তারা এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে যে, এই দুটির কোন্‌টি আল্লাহর পথে দানের স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে অগ্রগণ্য। আর সেটি হলো, জমি ও ফসল- দুটোই এক মালিকের অধীন থাকা।

অধিকাংশ আলেমের মতে, যাকাত যে জিনিসের উপর আরোপিত হয়, তা হলো শস্য। আর ইমাম আবু হানিফার মতে, যাকাত সেই জিনিসের উপর ধার্য হয় যা যাকাত ফরয হওয়ার মূল কারণ। আর সেটি হলো জমি।

ইবনে কুদামা অধিকাংশ আলেমের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : যাকাত ফসলের উপর ধার্য হয়। তাই ফসলের মালিকের উপরই যাকাত আরোপিত। এর উদাহরণ হলো ফসল যখন বাণিজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, তখন তার মূল্যের যাকাত এবং তার মালিকানাধীন ফসলের উশর। তাদের এ উক্তি ঠিক নয় যে, উশর হলো জমির ব্যয়। কেননা উশর যদি জমির ব্যয় হতো তাহলে জমিতেই তা ধার্য হতো- যদিও তাতে চাষ করা না হয় যেমন খেরাজ। আর তা মুসলিমের উপরও ধার্য হতো যেমন খেরাজ ধার্য হয়। আর তার পরিমাণ ফসলের পরিমাণ দ্বারা নয়, বরং জমির পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হতো। আর তাহলে যেখানে যেখানে ফাই (খাজনা) বন্টন করা হয়। সেখানে সেখানে উশরও ব্যয় করা জরুরি হতো, যাকাতের হকদারদেরকে উশর দেয়া বাধ্যতামূলক হতোনা।

৩০. খেজুর ও আংগুরের নিসাব নির্ণয়

খেজুর ও আংগুরে যখন পাক ধরে এবং তার পূর্ণ পরিণতি স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তার নিসাব অনুমান দ্বারা নির্ধারণ করা হবে, মেপে নয়। একজন সৎ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুমান করবে খেজুর গাছে ও আংগুর গাছে কত আংগুর ও খেজুর আছে, অতঃপর তাকে কিশমিস ও খোরমা দ্বারা পরিমাপ করবে। যাতে উক্ত ফলে যাকাতের পরিমাণ জানতে পারে। তারপর যখন ফল শুকিয়ে যাবে, তখন ইতিপূর্বে তাতে নির্ধারিত পরিমাণ অনুসারে তা থেকে যাকাত নেয়া হবে।

আবু হুমাইদ সায়েদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে তবুক অভিযানে গিয়েছিলাম। তিনি যখন ওয়াদিউল কুরাতে পৌঁছলেন, তখন জনৈকা মহিলাকে তার নিজের বাগানে অবস্থানরত দেখতে পেলেন। রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে বললেন : "তোমরা অনুমান করো (কী পরিমাণ ফল তার বাগানে থাকতে পারে) এবং রসূলুল্লাহ সা. নিজে অনুমান করলেন দশ ওয়াসাক। তারপর মহিলাকে বললেন তুমি গণনা করো, এ ফল থেকে কী পরিমাণ (উশর) বের হয়।" -বুখারি। এটা হচ্ছে রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত এবং তাঁর পরে তার সাহাবিগণও এভাবেই কাজ করেছেন। অধিকাংশ আলেমের অভিমতও এটাই। (ইমাম মালেক এরূপ অনুমানের ভিত্তিতে উশর নির্ণয় করাকে ওয়াজিব বলেছেন। আর শাফেয়ী ও আহমদের মতে এটি সুন্নত।) কিন্তু হানাফীগণ এর বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন, অনুমান অনুমানই, তা দ্বারা কোনো কাজ করা বাধ্যতামূলক হতে পারেনা।

তবে রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নত অধিকতর সঠিক পথনির্দেশক। অনুমান ধারণা সৃষ্টির সহায়ক নয়। বরং তা ফলের পরিমাণ নির্ণয়ে ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য, যেমন পচনশীল দ্রব্যাদির মূল্য নির্ণয়ে ইজতিহাদ কার্যকর। এ ক্ষেত্রে অনুমানের কারণ হলো, লোকেরা ফলমূল পাকা অবস্থায় খেতে অভ্যস্ত। তাই কেটে ঘরে তোলা ও খাওয়ার আগে যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় করা জরুরি। এতে করে বাগানের মালিকরা ফসলের ব্যাপারে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে এবং যাকাত পরিমাণ সম্পদ বের করার দায়িত্ব বহন করবে। যে ব্যক্তি অনুমান করবে, তার কর্তব্য অনুমানের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দেয়া, যাতে ফসলের মালিকরা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশস্ততা উপভোগ করতে পারে। কেননা তারা নিজেরাও যেমন তা খেতে হয়, তাদের অতিথি ও প্রতিবেশীদেরও দিতে হয়। তাছাড়া ফসলের উপর নানা রকমের দুর্যোগ এসে থাকে। পাখী ও পথিক খায় এবং ঝড়, বাতাসে পড়ে যায়। এমতাবস্থায় পুরো ফসল থেকে যাকাত হিসাব করা হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সাহল ইবনে আবি হাছমা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যখন তোমরা অনুমান লাগাবে, তখন এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিয়ে নিও। এক তৃতীয়াংশ যদি না ছাড় তবে এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিও। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ী, হাকেম ও ইবনে হাব্বান। তিরমিযি বলেছেন : সাহল বর্ণিত হাদিসই অধিকাংশ আলেমের নিকট অনুসরণীয়। (মালিকের পরিবারের লোক সংখ্যা অনুপাতে এটা স্থির হবে। লোক সংখ্যা বেশি হলে এক তৃতীয়াংশ আর কম হলে এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিতে হবে।)

বশীর ইবনে ইয়াসার বলেছেন : উমর ইবনুল খাত্তাব আবু হাছমা আনসারীকে মুসলমানদের শস্যাদির পরিমাণ অনুমান করার জন্য পাঠালেন এবং বলে দিলেন : যখন দেখবে, লোকেরা তাদের খেজুরের বাগানেই হেমন্তকালে বসবাস করছে, তখন তারা যা খায় খেতে দাও, তাদের অবস্থানকালে অনুমান করে পরিমাণ নির্ণয় করোনা। মাকহুল বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন

অনুমানকারীকে পাঠাতেন, বলতেন : জনগণের ঘাড়ে অতিরিক্ত দায়দায়িত্ব চাপিওনা। কেননা ফসলের কিছু অংশ দানে চলে যায়, কিছু অংশ পদতলে পিষ্ট হয়, কিছু অংশ মালিক ও তার স্বজনরা খায়।" -আবু উবায়েদ।

৩১. যাকাত প্রদানের পূর্বে ফসল থেকে কিছু কিছু খাওয়া

ফসলের মালিকের তার ফসল থেকে যাকাত প্রদানের পূর্বে কিছুকিছু খাওয়া বৈধ। ফসল কেটে ঘরে তোলার আগে যা খেয়েছে তা হিসাবে আসবেনা। কেননা এটা প্রথাসিদ্ধ। তাছাড়া যা খাওয়া হয়, তার পরিমাণ কম হয়ে থাকে। এর উদাহরণ হলো, ফল বাগানের মালিকরা যেমন কিছু কিছু ফল নিজেরাও খায়, অন্যদেরকেও খাওয়ায়। পরে যখন ফসল কেটে ঘরে তোলা হবে এবং দানার খোসা ছাড়ানো হবে, তখন বিদ্যমান ফসলের যাকাত দিয়ে দেবে। আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল শস্যের মালিক তার দলিত শস্যদানা থেকে (যা শস্য ক্ষেতে ঝরে পড়ে থাকে) কী পরিমাণ খেতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন : যে পরিমাণ প্রয়োজন, খেতে পারবে। শাফেয়ী, লায়েছ ও ইবনে হাযমও এই মত সমর্থন করেছেন। (তবে, ইমাম মালেক ও আবু হানিফা বলেছেন : শস্য কেটে ঘরে তোলার আগে শস্যের মালিক যতোটাই খাক, নিসাবের অংশ রূপে গণ্য হবে।)

৩২. শস্য ও ফল পরস্পরের সাথে যুক্ত করা

আলেমগণ এ ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন, বিভিন্ন শ্রেণীর ফলমূলকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করা যাবে, যদিও সেগুলোর কতক ভালো, কতক মন্দ ও বিভিন্ন বর্ণের হয়। অনুরূপ, কিশমিসের বিভিন্ন শ্রেণীকে, গমের বিভিন্ন শ্রেণীকে ও যাবতীয় শস্যের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করা যাবে। (ভালো মানেরটা মন্দ মানেরটার সাথে যুক্ত করা হলে প্রত্যেকটির পরিমাণ অনুসারে যাকাত গ্রহণ করা হবে। ফল যদি বিভিন্ন মানের হয় তবে মধ্যম মানেরটার হিসেবে যাকাত নেয়া হবে।) আলেমগণ এ মর্মেও একমত হয়েছেন, বাণিজ্যিক পণ্যগুলোকে মূল্যের সাথে ও মূল্যকে পণ্যের সাথে যুক্ত করা যাবে। তবে শাফেয়ী একই শ্রেণীর পণ্যের সাথে মূল্য সংযোজন করার পক্ষে। কেননা তার নিসাব সেই শ্রেণীর হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে।

আর এ ব্যাপারেও তারা একমত হয়েছেন, শস্য ও ফলমূল ব্যতিত এক শ্রেণীর সাথে অন্য শ্রেণীকে যুক্ত করে নিসাব পূর্ণ করা যাবেনা। এক জাতের পশুকে আরেক জাতের পশুর সাথে যুক্ত করা যাবেনা। তাই নিসাব পূর্ণ করার জন্য উটকে গরুর সাথে যুক্ত করা যাবেনা। ফলমূলেও এক শ্রেণীর সাথে আরেক শ্রেণীকে, যেমন খোরমাকে কিশমিসের সাথে যুক্ত করা যাবেনা।

বিভিন্ন জাতের শস্যদানাকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম ও অগ্রগণ্য মত হলো, নিসাব হিসাব করার জন্য এর কোনোটি অপরটির সাথে যুক্ত করা যাবেনা। প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে নিসাব হিসাব করা হবে। কেননা শস্যদানা অনেক জাতের ও অনেক শ্রেণীর। প্রত্যেকটার ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। তাই যবকে গমের সাথে এবং গমকে যবের সাথে, খোরমাকে কিশমিসের সাথে এবং কিশমিসকে খোরমার সাথে, কিংবা ভুট্টাকে ডালের সাথে যুক্ত করা যাবেনা। এটা আবু হানিফার, শাফেয়ীর ও আহমদ থেকে বর্ণিত একটি মত। প্রাচীন আলেমদের অনেকেই এই মত পোষণ করেন।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : গরু ও ছাগলের সাথে উটকে, ছাগল ভেড়ার সাথে গরুকে এবং কিশমিসের সাথে খোরমাকে যুক্ত করা যাবেনা- এ ব্যাপারে এজমা বা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। কাজেই অন্যান্য শ্রেণীতেও একটির সাথে আরেকটিকে যুক্ত করা যাবেনা। যারা এক জাতকে আরেক জাতের সাথে যুক্ত করার পক্ষে বলেন, তাদের কারোই তাদের মতের পক্ষে কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

৩৩. ফসলে ও ফলমূলে যাকাত ধার্য হয় কখন

ফসলে যাকাত ধার্য হয় তখন, যখন তার দানা শক্ত হয় ও ঝরে পড়তে আরম্ভ করে। আর ফলে যখন তার পক্কতা দৃষ্টিগোচর হয়। আর এটা চেনা যায় খেজুরের লাল হওয়া ও আংগুরের মিষ্ট হওয়া দ্বারা। দানা আবর্জনামুক্ত হওয়া ও ফল শুকানোর আগে যাকাত বের করা হবেনা। আর যখন কৃষক শস্যদানা শক্ত হওয়ার ও ফলের পক্কতা প্রকাশ পাওয়ার পর বিক্রি করবে, তখন সেই শস্য ও ফলের যাকাত তাকেই দিতে হবে। ক্রেতাকে নয়। কেননা বিক্রয়ের চুক্তিই যাকাত ফরয হওয়ার কারণ এবং তা তখন তারই মালিকানাধীন থাকে।

৩৪. উত্তম সম্পদ দ্বারা যাকাত দেয়া

আল্লাহ্ তায়ালা যাকাতদাতাকে তার সম্পদের হালাল ও উত্তম অংশ দ্বারা যাকাত দিতে আদেশ দিয়েছেন এবং খারাপ অংশ দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

"হে মুমিনগণ, তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছো এবং আমি যে সম্পদ তোমাদেরকে মাটি থেকে উৎপাদন করে দিয়েছি, তা থেকে উত্তম সম্পদ দান করো। তার খারাপটা দেয়ার ইচ্ছা করোনা। অথচ তোমরা নিজেরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকোনা চোখ বন্ধ করে ছাড়া। জেনে রেখো, আল্লাহ ধনী ও প্রশংসিত।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৬৭)

আবু দাউদ ও নাসায়ী প্রমুখ সাহল বিন হানিফ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. জারূর ও হাবিক- এই দুটো নিকৃষ্ট শ্রেণীর খোরমা দান করতে নিষেধ করেছেন।" যেহেতু সাধারণ লোকেরা তাদের ফলমূল থেকে যেগুলো নিকৃষ্ট, তা যাকাত হিসেবে দিতো, তাই উপরোক্ত আয়াতে (ও হাদিসে) তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

বারা রা. বলেন : "নিকৃষ্ট সম্পদ দান করোনা" -এ আয়াত আমাদের মতো একদল আনসার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমরা খেজুর বাগানের মালিক ছিলাম। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নিজের খেজুর বাগান থেকে আসতো। কারো বেশি খেজুর ছিলো, কারো কম ছিলো। তারা এক কাঁদি বা দুই কাঁদি খেজুর এনে মসজিদে নববীতে ঝুলিয়ে রাখতো। সুফফাবাসী দরিদ্র মুহাজিরদের খাবারের সংস্থান থাকতোনা। তারা ক্ষুধার্ত হলে ঝুলন্ত কাঁদির কাছে এসে লাঠি দিয়ে আঘাত করতো। তখন অধিক পাকা খেজুর ও খোরমা ঝরে পড়তো ও তা খেতো। যারা সৎ কাজে আগ্রহী ছিলোনা, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এমন কাঁদি নিয়ে আসতো, যাতে নিকৃষ্ট মানের খেজুরও থাকতো। কোনো কাঁদি এমনও থাকতো যে, ভেংগে গেছে, সেটাই ঝুলিয়ে রাখতো। এ জন্যই আল্লাহ নাযিল করলেন : "নিকৃষ্ট জিনিস দান করার ইচ্ছা করোনা। অথচ তোমরা নিজেরা চোখ বুজে ছাড়া তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবেনা।" বারা বলেন : তোমাদের কেউ যা দান করেছে, তদ্রূপ জিনিস যদি কেউ তাকে উপহার দিতো, তবে চোখ বুজে ও লজ্জার সাথে ছাড়া তা গ্রহণ করতোনা। এরপর থেকে আমরা আমাদের উৎকৃষ্ট জিনিসই নিয়ে আসতাম। -তিরমিযি।

শওকানি বলেন : এ হাদিস থেকে প্রমাণিত, মালিকের পক্ষে যাকাত ফরয হওয়া জিনিস থেকে উৎকৃষ্ট জিনিস রেখে নিকৃষ্ট জিনিস যাকাত হিসেবে বের করা ও আদায়কারীর পক্ষে তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। খোরমার ক্ষেতে এটা প্রত্যক্ষ আদেশ স্বরূপ। আর এর উপর ভিত্তি করে যাকাত ফরয হয় যে, সকল জিনিসে তার সব কটিতে কিয়াস স্বরূপ এ বিধি কার্যকর হবে।

৩৫. মধুর যাকাত

অধিকাংশ আলেমের মতে মধুতে কোনো যাকাত নেই। ইমাম বুখারি বলেছেন : বিশুদ্ধ হাদিস মতে মধুতে যাকাত নেই। শাফেয়ী বলেন : মধু থেকে যাকাত না নেয়াই আমার পছন্দনীয় মত। কেননা রসূল সা. ও সাহাবাদের উক্তি ও দৃষ্টান্তসমূহ কিসে কিসে যাকাত দিতে হবে সে সম্পর্কে প্রমাণিত। কিন্তু মধু সম্পর্কে কিছুই প্রমাণিত নয়। সুতরাং এতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ইবনুল মুনযির বলেছেন : মধুর যাকাত বিষয়ে কোনো প্রামাণ্য হাদিস নেই। ইজমাও নেই। কাজেই এতে কোনো যাকাত নেই। এটাই অধিকাংশের মত।

হানাফি ইমামগণ ও আহমদের মতে মধুতে যাকাত দিতে হবে। যদিও এ সম্পর্কে কোনো হাদিস নেই। তথাপি এ সম্পর্কে সাহাবাদের এমন বহু উক্তি রয়েছে, যার একটি অপরটিকে দৃঢ় করে। তাছাড়া যেহেতু এটি গাছের কলি ও ফুল থেকে উৎপন্ন হয়, মাপা হয় ও সংরক্ষণ করা হয়, কাজেই শস্য ও খোরমার ন্যায় এতেও যাকাত ফরয। তাছাড়া যেহেতু ফল ও ফসলের চেয়ে এতে ব্যয় কম। আবু হানিফার মতে, মধুতে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত হলো, তা উশর দিতে হয় এমন জমিতে উৎপন্ন হওয়া চাই। তিনি এতে কোনো নিসাবের শর্ত আরোপ করেননি। কম হোক বেশি হোক তা থেকে উশর নেয়া হবে। ইমাম আহমদের মতে নিসাব শর্ত এবং তা হলো, দশ ফারাক। এক ফারাক ১৬ ইরাকী রতলের সমান। (এক ইরাকী রতল = ১৩০ দিরহাম) তার মতে, মধু খেরাজী বা উশরী যে জমিতেই উৎপন্ন হোক, উশর দিতে হবে। আবু ইউসুফ বলেছেন : মধুর নিসাব দশ রতল। মুহাম্মদের মত পাঁচ ফারাক। আর ফারাক হলো ৩৬ রতলের সমান।

৩৬. পশুর যাকাত

বিশুদ্ধ হাদিস অনুসারে উট গরু ও ছাগল ভেড়ায় যাকাত দিতে হয়। এ ব্যাপার মুসলমানদের ইজমা তথা মতৈক্যও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

১. পশুর যাকাতের শর্ত

পশুর যাকাতের তিনটে শর্ত : (১) নিসাব পরিমাণ হওয়া চাই (২) বছর পূর্ণ হওয়া চাই (৩) চরণশীল হওয়া চাই। অর্থাৎ অনুমোদিত তৃণ মাঠে বছরের অধিকাংশ সময় নিজেই চরে ঘাস খেয়ে বেড়ায়। অধিকাংশ আলেম এই শর্ত জরুরি মনে করেন। মালেক ও লায়েছ ব্যতিত কেউ এর বিরোধিতা করেননি। তারা উভয়ে বিনা শর্তে পশুর উপর যাকাত ধার্য করেন, চাই তা নিজেই চরণশীল হোক, তাকে বেঁধে রেখে খাওয়ানো হোক, তাকে কাজে খাটানো হোক বা না হোক। কিন্তু বিশুদ্ধ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে 'স্বয়ং চরণশীল' বলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এ দ্বারা সুস্পষ্ট যে, বেঁধে খাওয়ানো পশুতে কোনো যাকাত নেই। তা নাহলে 'স্বয়ং চরণশীল' কথাটা নিরর্থক হয়ে যায়।

ইবনে আবদুল বার বলেছেন : কোনো অঞ্চলের ফকীহরা মালেক ও লায়েছের বক্তব্য সমর্থন করেছেন বলে আমার জানা নেই।

২. উটের যাকাত

উটের সংখ্যা পাঁচটায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত কোনো যাকাত নেই। যখন পাঁচটা স্বয়ং চরণশীল

উট হবে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন তাতে একটা এক বছর বয়সের ছাগল দিতে হবে। যখন দশটা হবে, তখন দিতে হবে দুটো ছাগল। এভাবে যখনই পাঁচটা বাড়বে, একটা ছাগল বেশি দিতে হবে। তারপর যখন পঁচিশটা হবে তখন দিতে হবে এক বছর পার হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে, এমন একটা উটনী। অথবা দু'বছর অতিবাহিত হয়েছে ও তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন একটা উট। (নিসাবে যখন উটনী নির্ধারিত থাকে তখন যাকাতে উট দেয়া চলবেনা। তবে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উটনী না পাওয়া গেলে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট দেয়া যাবে। আর যখন সমস্ত উটের পালে শুধুই পুরুষ উট থাকবে তখন পুরুষ উট যাকাতে নেয়া যাবে।)

যখন উটের সংখ্যা ৩৬টিতে পৌঁছবে, তখন যাকাত হিসেবে দিতে হবে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী। আর ৪৬টিতে পৌঁছলে চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী, ৬১টিতে পৌঁছলে পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী, ৭৬টিতে পৌঁছলে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী দুটি উটনী এবং ৯১টিতে পৌঁছলে চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী দুটি উটনী দিতে হবে এবং ১২০টি পর্যন্ত ৩টা। এরপরেও যদি সংখ্যা বাড়ে, তবে প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উটনী এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি করে চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উটনী দিতে হবে।

যখন যাকাত হিসেবে দেয় উটগুলোর বয়সের স্তর বিভিন্ন হবে তখন যার উপর একটা পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উটনী যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয, অথচ তার কাছে এই বয়সের উটনী নেই, তবে চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী রয়েছে, তার কাছ থেকে ওটাই গ্রহণ করা হবে, আর সম্ভব হলে সেই সাথে দুটো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম অতিরিক্ত দেবে। আর যার উপর চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী যাকাত হিসেবে ধার্য হয়েছে, অথচ তার কাছে পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী ছাড়া আর কিছু নেই, তার কাছ থেকে সেটাই নেয়া হবে, তবে যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দুটো ছাগল দেবে। আর যার উপর যাকাত হিসেবে একটা চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উটনী ধার্য হয়েছে, কিন্তু তা তার কাছে নেই। তার কাছে আছে শুধু ৩য় বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী, তার কাছ থেকে সেটিই নেয়া হবে। উপরন্তু সম্ভব হলে তার সাথে আরো দুটো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম দেবে। আর যার কাছে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী যাকাত হিসেবে প্রাপ্য, অথচ তার কাছে চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উটনী ছাড়া অন্য কিছু নেই, তার কাছ থেকে সেটিই গ্রহণ করা হবে। আর আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দুটো ছাগল দেবে। আর যার কাছে যাকাত হিসেবে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী প্রাপ্য, কিন্তু তার কাছে সেটি নেই, বরং তার কাছে রয়েছে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী। তার কাছ থেকে সেটিই নেয়া হবে। সেই সাথে সম্ভব হলে তাকে অতিরিক্ত দুটো ছাগল অথবা বিশ দিরহাম দিতে হবে। আর যার নিকট দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী একটি উটনী যাকাত হিসেবে প্রাপ্য, অথচ তার নিকট তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী একটা পুরুষ উট ছাড়া আর কিছু নেই। তার কাছ থেকে সেটিই নেয়া হবে। তার সাথে অন্য কিছু যোগ করতে হবেনা। আর যার মাত্র চারটা উট আছে, তার উপর কোনো যাকাত নেই। তবে উটের মালিক যা ইচ্ছা, দিতে পারে।*

---

* ইমাম শওকানি বলেছেন : এ জাতীয় উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, বস্তুগত সম্পদে যাকাত ফরয। এতে যদি মূল্য স্থির করে যাকাত দেয়া ফরয হতো, তাহলে এ কথা বলার কোনো অর্থ থাকতোনা। কেননা স্থান ও কাল ভেদে মূল্য বিভিন্ন হয়ে থাকে।

এ হলো উটের যাকাতের বিধান। সাহাবিদের উপস্থিতিতে আবু বকর সিদ্দীক রা. এ বিধান বাস্তবায়িত করেন। কেউ এর বিরোধিতা করেনি।

যুহরী থেকে বর্ণিত, সালেমের পিতা বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. যাকাতের বিধান লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তা তাঁর কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করেননি। আবু বকর রা. সেটি হস্তান্তর করেন ও মৃত্যু পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত করেন। পুনরায় তাঁর পরে উমর রা. এটি প্রচার করেন ও মৃত্যু পর্যন্ত তা অনুসরণ করেন। এমনকি উমর রা. যেদিন ইন্তিকাল করেন, সেদিন এটিকে তার ওসিয়তের অন্তর্ভুক্ত করেই ইন্তিকাল করেন।"

৩. গরুর যাকাত : (মহিষও এর অন্তর্ভুক্ত)

স্বয়ং চরণশীল গরুর সংখ্যা ত্রিশ না হওয়া পর্যন্ত গরুতে কোনো যাকাত নেই। ত্রিশটিতে উপনীত হলে এবং বছর পূর্ণ হলে এক বছর বয়সী একটা বাছুর (ষাড় অথবা বকনা) দিতে হবে। গরুর সংখ্যা চল্লিশে না পৌঁছা পর্যন্ত আর কিছু দিতে হবেনা। চল্লিশে পৌঁছলে ষাটে না পৌঁছা পর্যন্ত দু'বছর বয়সী একটা বকনা গরু দিতে হবে। ষাটটিতে পৌঁছলে এক বছর বয়সী দুটো বাছুর দিতে হবে। (হানাফি মাযহাব অনুসারে দু'বছর বয়সী বলদ বা গাভী দেয়া যাবে। অন্যদের মতে, চল্লিশটিতে একটি মাত্র দু'বছর বয়সী গাভী দেয়া বাধ্যতামূলক। তবে সব গরু যদি পুরুষ জাতীয় হয়, তবে পুরুষ জাতীয় গরু দিয়েই যাকাত দেয়া চলবে। এটা সর্বসম্মত মত।) সত্তরটি হলে দু'বছর বয়সী দুটা গাভী এবং নব্বইটি হলে তিনটে এক বছর বয়সী পুরুষ বাছুর দিতে হবে। আর একশোটি হলে দু'বছর বয়সী একটা গাভী ও এক বছর বয়সী দুটো বাছুর। একশো দশটিতে দু'বছর বয়সী দুটো গাভী ও এক বছর বয়সী একটা পুরুষ বাছুর। একশো বিশটিতে দু'বছর বয়সী তিনটি গাভী অথবা এক বছর বয়সী চারটে পুরুষ বাছুর। অতঃপর যা বৃদ্ধি পাবে, তার প্রতি ত্রিশটিতে এক বছর বয়সী একটা পুরুষ বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটিতে দু'বছর বয়সী একটি গাভী।

৪. ছাগল ও ভেড়ার যাকাত

ছাগল ভেড়ার সংখ্যা চল্লিশটি না হওয়া পর্যন্ত কোনো যাকাত নেই। যখন চল্লিশটি স্বয়ং চরণশীল ছাগল হবে এবং তার উপর বছর পূর্ণ হবে, তখন তাতে একশো বিশটি পর্যন্ত একটা ছাগল দিতে হবে। একশো একুশটি হলে দুটো ছাগল দিতে হবে এবং তা দুশো পর্যন্ত বহাল থাকবে। দুশো একটা হলে তাতে তিনটে ছাগল দিতে হবে এবং তা তিনশো হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। তিনশোর চেয়ে বেশি হলে প্রতি একশোতে একটা ছাগল দিতে হবে। পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী ভেড়া ও সামনের দাঁত পড়া ছাগল যাকাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ছাগল ভেড়ার ক্ষেত্রে পুরো নিসাব পুরুষ হলে যাকাত হিসেবে পুরুষ ছাগল-ভেড়া দেয়া জায়েয হবে। শুধু স্ত্রী জাতীয় হলে অথবা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় হলে হানাফিদের মতে, পুরুষ জাতীয় ছাগল ভেড়া দ্বারা যাকাত দেয়া যাবে। অন্যদের মতে, শুধু স্ত্রী জাতীয় ছাগল ভেড়াই দিতে হবে। (উল্লেখ্য, ছাগল ও ভেড়াতে একই শ্রেণী গণ্য করা হয়ে থাকে এবং একটির সাথে অপরটিকে যুক্ত করা যাবে।) -ইবনুল মুনযির।

৫. যাকাত থেকে অব্যাহতির অবস্থা

যাকাত ফরয হওয়ার দুটি স্তরের মাঝে সর্বসম্মতভাবে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী থেকে জানা গেছে, উটের যাকাতের ক্ষেত্রে ২৫টি হলে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী একটা উটনী দিতে হবে। এরপর ৩৬টিতে পৌঁছলে, ৪৫টি পর্যন্ত তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী একটা উটনী দিতে হবে। সুতরাং ২৫ ও ৩৬ এর মধ্যবর্তী সংখ্যক উটের জন্য

যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। গরুর যাকাত প্রসংগে তিনি বলেছেন : ত্রিশটি গরু হয়ে গেলে চল্লিশ পর্যন্ত এক বছর বয়সী একটা বাছুর, পুরুষ বা স্ত্রী, দিতে হবে। যখন চল্লিশ হবে তখন দিতে হবে দু'বছর বয়সী একটা গাভী। সুতরাং ত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত গরুতে যাকাত নেই। অনুরূপ, ছাগল-ভেড়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যখন চল্লিশটা হবে, তখন একশো বিশটা পর্যন্ত একটা ছাগল দিতে হবে। এখানেও চল্লিশ থেকে একশো বিশ পর্যন্ত যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

৬. যে সকল সম্পদে যাকাত নেই

যাকাত গ্রহণের সময় সম্পদের মালিকদের অধিকারের দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি। তাই তাদের মূল্যবান ও প্রিয় সম্পদকে যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা চলবেনা। তবে তারা স্বেচ্ছায় দিতে চাইলে নেয়া যাবে। অনুরূপ, দরিদ্রদের অধিকারের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই এমন খুঁতযুক্ত জন্তু গ্রহণ করা যাবেনা, যার খুঁত প্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে ত্রুটি হিসেবে গণ্য। তবে যখন সকল জন্তু ত্রুটিযুক্ত হবে তখন গ্রহণ করা যাবে। যাকাত নিতে হবে মধ্যম মানের সম্পদ থেকে।

১. আবু বকরের গ্রন্থে রয়েছে : যাকাত হিসেবে এমন জন্তু নেয়া হবেনা, যার সমস্ত অথবা অনেক দাঁত পড়ে গেছে, অনুরূপ এক চোখ কানা ও পাঠা নেয়া হবেনা।

২. সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ ছাকাফী থেকে বর্ণিত : উমর রা. যাকাত আদায়কারীকে বন্ধ্যা ছাগল, দুধ খাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘরে পালিত ছাগল, শীঘ্রই সন্তান প্রসব করবে এমন পশু এবং প্রজননের জন্য রাখা পাঠা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩. আবদুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া আল-গাযেরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনটে কাজ যে ব্যক্তি করবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে : যে ব্যক্তি এক আল্লাহর উপর ঈমান আনবে ও বিশ্বাস করবে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, নিজের মালের যাকাত স্বেচ্ছায়, সানন্দে ও উপকারের মানসিকতা নিয়ে প্রতি বছর দেবে, দাঁত পড়া, চর্মরোগী, রোগাক্রান্ত, দুধ দিতে চায়না- এমন জন্তু দেবেনা, খারাপ ও ক্ষুদ্র জিনিস দেবেনা, বরং তোমাদের মধ্যম মানের সম্পদ থেকে দেবে। কেননা আল্লাহ তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ চাননি, নিকৃষ্টতম সম্পদও দিতে আদেশ করেননি। -আবু দাউদ, তাবারানি।

৭. গবাদি পশু ব্যতিত অন্যান্য পশুর যাকাত

গবাদি পশু ব্যতিত অন্য কোনো প্রাণীতে যাকাত নেই। সুতরাং ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, যদি ব্যবসায়ের পণ্য না হয়, তবে সেগুলোতে যাকাত নেই।

আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদেরকে ঘোড়া ও দাসদাসীর যাকাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছি। এগুলোতে কোনো যাকাত নেই। -আহমদ, আবু দাউদ।

আর আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাতে যাকাত আছে কি? তিনি বললেন : এই চমৎকার আয়াতটি ছাড়া এ ব্যাপারে কোনো বিধান আসেনি : 'যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও ভালো কাজ করবে, সে তার ফল পাবে। আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, সে তার ফল পাবে।' -আহমদ

আর হারেছা বিন মুযাররাব থেকে বর্ণিত : তিনি উমর রা. এর সাথে হজ্জ করেন। তখন তাঁর নিকট সিরিয়ার নেতৃস্থানীয় লোকেরা এলো। তারা বললো : হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা কিছু দাস ও জীবজন্তু পেয়েছি। আমাদের সম্পদ থেকে সদকা নিয়ে আমাদেরকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন : এটি এমন কাজ, যা আমার পূর্বের দুই ব্যক্তি করেননি। (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সা. ও আবু

বকর রা., তবে তোমরা অপেক্ষা করো। আমি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করে নেই। -আহমদ, তাবারানি, হায়ছামী।

আর যুহরী সালমান বিন ইয়াছার থেকে বর্ণনা করেছেন : সিরিয়াবাসী আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.কে বললো, আমাদের সম্পদ ও দাসদাসী থেকে যাকাত নিন। তিনি অস্বীকার করলেন। অতঃপর উমর রা.-এর নিকট লিখলেন। তিনিও অস্বীকার করলেন। সিরিয়াবাসী তার সাথে কথা বললো। তিনি উমর রা.কে লিখলেন। উমর রা. তাকে জবাব দিলেন : তারা যদি দিতে চায় তবে তা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করো এবং তাদের মধ্যেই আবার তা বণ্টন করো (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদের মধ্যে) এবং তাদের দাসদাসীদেরকে দান করো। -মালেক, বায়হাকি।

৮. এক বছরের কম বয়সী পশুর যাকাত

যে ব্যক্তি উট, গরু ও ছাগল ভেড়ায় নিসাবের মালিক হয় এবং বছরের মাঝখানে এগুলো বাচ্চা প্রসব করে, তার উপর বড়গুলোর বছর সমাপ্তিতে সবগুলোর যাকাত ফরয হবে। বড় ও বাচ্চা পশুর বাবদ একটা সম্পদেরই যাকাত বের করতে হবে। এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত।

কারণ মালেক ও শাফেয়ী সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ সাকাফী থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব বললেন : তাদের সেসব মেষ শাবক ও ছাগল ছানাও গণনা করবে, যেগুলোকে রাখাল বহন করে নিয়ে চলে। সেসব শাবক গ্রহণ করোনা। বন্ধ্যা, দুধ খাওয়ার জন্য বাড়িতে পালিত, অচিরেই বাচ্চা প্রসব করবে ও প্রজননের জন্য রক্ষিত ছাগল ভেড়া বা গবাদি পশু গ্রহণ করোনা। এক বছর বয়সী বা এক বছরের কাছাকাছি বয়সী ছাগল ভেড়া, পাঠা হোক বা পাঠি হোক, একেবারেও শিশু নয় আবার একেবারেও উৎকৃষ্ট নয়- এমন বাচ্চা গ্রহণ করো।

আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আবু ছাওর মনে করেন, বয়স্ক পশুর নিসাব পূর্ণ হওয়া ছাড়া বাচ্চাদেরকে হিসেবে গণ্য করা যাবেনা। আবু হানিফা একথাও বলেছেন : বয়স্ক জন্তুর নিসাবের সাথে বাচ্চাদের যুক্ত করা হবে, চাই সেগুলো ঐ বয়স্ক জন্তু থেকেই জন্ম নিক অথবা খরিদকৃত হোক, অতঃপর বছর পূর্ণ হলে যাকাত দেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ীর শর্ত হলো, নিসাবের বয়স্ক পশুর বাচ্চা হতে হবে, যা তার মালিকানায় রয়েছে এবং বছর পূর্ণ হবার আগে প্রসব হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কেবল বাচ্চাদের নিসাবের মালিক হয়, আবু হানিফা, মুহাম্মদ, দাউদ, শায়াবী ও একটি বর্ণনা অনুসারে আহমদের মতানুসারে তার উপর যাকাত ফরয হবেনা। কেননা আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকি ও দার কুতনি সুয়াইদ বিন গাফলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা.-এর যাকাত আদায়কারী আমাদের কাছে এলো। তাকে আমি বলতে শুনলাম : দুধখাওয়া বাচ্চা গ্রহণ করবোনা- এটা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেকের মতে ও আহমদের একটি উক্তি মোতাবেক বয়স্ক জন্তুর মতো বাচ্চাদের থেকেও যাকাত নেয়া হবে। কেননা ও গুলোকে যখন বড়দের সাথে হিসাবে ধরা হয়, তখন পৃথকভাবেও ধরা হবে। শাফেয়ী ও আবু ইউসুফের মতে বাচ্চাদের মধ্য থেকে একটা বাচ্চা যাকাত হিসেবে নেয়া হবে।

৯. একত্রিত করা ও বিচ্ছিন্ন করা সংক্রান্ত বিধান

১. সুয়াইদ বিন গাফলা বলেছেন : আমাদের নিকট রসূল সা. প্রেরিত যাকাত আদায়কারী এলেন। তাকে বলতে শুনলাম : আমরা কোনো দুধ খাওয়া বাচ্চা নেইনা। এক সাথে থাকা পশুদেরকে বিচ্ছিন্ন করিনা এবং বিচ্ছিন্ন পশুদেরেকে একত্রিতও করিনা। এক ব্যক্তি তার কাছে উঁচু চুটওয়ালী একটি উটনী নিয়ে এলো। তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী।

২. আনাস রা. আবু বকর রা. থেকে লিখলেন : এ হচ্ছে ফরয সদকা (যাকাত), যা রসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদের উপর ফরয করেছেন। আর যাকাতের ভয়ে পৃথক পৃথক পশুকে একত্র করা হবেনা এবং একত্রে থাকা পশুকে পৃথক পৃথক করা হবেনা। যে পশুর পাল দু'শরিকের মালিকানাভুক্ত থাকে, তাতে উভয়ে পরস্পরের নিকট সমান সমান অংশ পাওনাদার হবে। (খাত্তাবী এর ব্যাখ্যায় বলেন : উদাহরণ স্বরূপ, উভয়ের বিশটি করে চল্লিশটি ছাগল এক সাথে রয়েছে। উভয়ে তাদের ছাগলগুলোকে নির্দিষ্টভাবে চিনে। যাকাত আদায়কারী এসে একজনের নিকট থেকে একটা ছাগল যাকাত হিসেবে নিয়ে গেলো। এমতাবস্থায় যার ছাগল নেয়া হলো, সে তার শরিকের নিকট থেকে প্রাপ্য অর্ধেক ছাগলের মূল্য আদায় করে নিতে পারবে।) -বুখারি।

মালেক তাঁর মুয়াত্তায় বলেছেন : এর অর্থ হলো, তিন ব্যক্তি আলাদা আলাদাভাবে চল্লিশটি করে ছাগল পালন করে। এতে প্রত্যেকের উপর, একটা করে ছাগল ফরয হবে। এভাবে তিনটে ছাগল দিতে হবে। তাই তারা তাদের সকল ছাগলকে একত্র করলো। এতে তাদের উপর সম্মিলিতভাবে মাত্র একটা ছাগল ফরয হলো। (কেননা একত্র থাকলে চল্লিশ থেকে একশো বিশটা পর্যন্ত একটা ছাগল ফরয হয়। এটা যাকাতের ভয়ে পৃথক থাকা জন্তুকে একত্র করার উদাহরণ।) অথবা, দুই শরিকের ২০১টা ছাগল একত্রে রয়েছে। তাদের উপর তিনটে ছাগল ফরয হবে। এখন তারা যদি এগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করে, তাহলে তাদের উভয়ের উপর একটা করে ছাগল ফরয হবে। (এটা যাকাতের ভয়ে একত্রিত পশুপালকে বিভক্ত করার উদাহরণ।)

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : এ হাদিসে সম্পদের মালিক ও আদায়কারী উভয়ের জন্য নির্দেশ রয়েছে। উভয়কে সতর্ক করা হয়েছে, যেনো যাকাতের ভয়ে একত্রকে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্নকে একত্র না করে। মালিক যাকাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে এই ভয়ে বিচ্ছিন্ন জন্তুগুলোকে একত্রিত অথবা একত্রিতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, যাতে পরিমাণ কম থাকে। আর আদায়কারী যাকাতের পরিমাণ কমে যাওয়ার আশংকায় একত্রিত বা বিচ্ছিন্ন করতে পারে, যাতে তা বৃদ্ধি পায়। (যেমন দুই শরিকের প্রত্যেকের চল্লিশটি করে ছাগল রয়েছে এক সাথে থাকলে একটিই ছাগল উভয়ের উপর ফরয হয়। তাই আদায়কারী পৃথক করে উভয়ের কাছ থেকে একটা করে মোট দুটো ছাগল আদায় করলো। অথবা উভয়ের বিশটা করে ছাগল রয়েছে। এতে দু'জনের কারো উপর মোটেই যাকাত ফরয হয়না। তাই আদায়কারী উভয়ের ছাগলের পালকে একত্রিত করে চল্লিশটি বানালো যাতে একটা ছাগল, আদায় করতে পারে।) সুতরাং 'যাকাতের ভয়ে' কথাটার অর্থ হলো, যাকাতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার ভয়ে। হানাফিদের মাযহাব আদায়কারীর পক্ষে একই মালিকানাভুক্ত সম্পদকে বিভক্ত করে যাকাতের পরিমাণ বাড়ানো নিষিদ্ধ। যেমন এক ব্যক্তির একশো বিশটা ছাগল রয়েছে। তাকে সে তিন ভাগ করলো, যাতে তাতে তিনটে ছাগল ফরয হয়। অথবা একজনের মালিকানাভুক্ত সম্পদকে আরেকজনের সম্পদের সাথে যুক্ত করে যাকাতের পরিমাণ বাড়ালো। যেমন কারো একশো একটা ছাগল রয়েছে। অনুরূপ আরেকজনেরও সমপরিমাণ রয়েছে। আদায়কারী এই দুই পালকে যুক্ত করলে তিনটে ছাগল আদায় করতে পারে। অথচ যুক্ত করার আগে উভয়ের উপর একটা করে মোট দুটো ছাগল ফরয ছিলো।

১০. সংযুক্তির কারণে যাকাতে কোনো প্রভাব পড়ে কি?

হানাফিদের মতে, সংযুক্তিতে কিছু এসে যায়না, চাই তা শরিকদের মধ্যে সম্মিলিত মালিকানাজনিত সংযুক্তি হোক, অথবা শরিকদের যৌথ মালিকানাভুক্ত পশু চিহ্নিত হোক, কিংবা

পাশাপাশি অবস্থান এবং বিচরণ ও আবাসন এক সাথে হোক। বস্তুত কোনো যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পদে ততোক্ষণ পর্যন্ত যাকাত ফরয হবেনা যতোক্ষণ উভয়ের অংশ আলাদা আলাদাভাবে নিসাবে উত্তীর্ণ না হয়। সর্বসম্মত মূলনীতি হলো : একক ব্যক্তির মালিকানা ছাড়া যাকাত ধার্য হয়না।

মালেকীদের মত হলো, পশু সম্পদের শরিকরা যাকাতের ক্ষেত্রে একক মালিকের মত। উভয় মালিক নিসাবের অধিকারী না হলে যৌথ মালিকানায় কোনো প্রভাব পড়বেনা। তবে এজন্য শর্ত হলো, তাদের একক রাখাল, বাসস্থান ও প্রজনকের অধীন হতে হবে এবং শরিকানার নিয়ত থাকতে হবে, প্রত্যেক শরিকের সম্পদ আলাদাভাবে চিহ্নিত হতে হবে এবং প্রত্যেক শরিকের যাকাত প্রদানের উপযুক্ত হতে হবে। আর সংযুক্তির প্রভাব পশু ব্যতিত অন্য কোনো সম্পদে পড়বেনা। আর যে সম্পদ যাকাত হিসেবে নেয়া হবে, তা সমানুপাতিক হারে সকল শরিকের উপর বর্তাবে। কোনো শরিকের যদি একক কোনো সম্পদ থেকে থাকে, তবে তার সবটাই যৌথ ও সংযুক্ত গণ্য হবে।

শাফেয়ীদের মত হলো, উভয়ের সম্পদের সংযুক্তিতে যাকাতে প্রভাব পড়বে এবং দুই বা একাধিক ব্যক্তির সম্পদ একক সম্পদের মতো গণ্য হবে। এভাবে তার প্রভাবের যাকাত ফরয হবে এবং যাকাতের পরিমাণ কমবে বা বাড়বে। যাকাত ফরয হওয়ার উপর প্রভাবের উদাহরণ : দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের বিশটি করে ছাগল রয়েছে। সংযুক্তির কারণে একটি ছাগল ফরয হবে। পৃথক থাকলে কোনোই যাকাত ফরয হতোনা। যাকাত বেশি হবার উদাহরণ : একজনের একশো ছাগলের সাথে আরেকজনের একশো সংযুক্ত হলো। এতে প্রত্যেকের উপর দেড়টি করে ছাগল যাকাত ফরয হবে। পৃথক থাকলে একটি করে ছাগল ফরয হতো। আর যাকাত কমানোর উদাহরণ হলো : তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের চল্লিশটি করে ছাগল রয়েছে এবং সেগুলোকে একত্রিত করেছে। তাদের সবার উপর সম্মিলিতভাবে একটা ছাগল ফরয হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের উপর একটা ছাগলের এক তৃতীয়াংশ ফরয হবে। অথচ একত্রিত না করে প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ছাগলগুলোকে আলাদা আলাদা রাখতো তাহলে প্রত্যেকের উপর একটা করে ছাগল ফরয হতো। এজন্য শাফেয়ীগণ পাঁচটা শর্ত আরোপ করেছেন :

১. শরিকরা সবাই যাকাত প্রদানের যোগ্য হওয়া চাই। (অর্থাৎ তাদের উপর যাকাত ফরয হওয়া চাই।)
২. একত্রিত সম্পদ যেন নিসাব পরিমাণ হয়।
৩. তার উপর যেনো পুরো এক বছর অতিবাহিত হয়।
৪. তাদের সকলের পশুর রাতের বেলা থাকার জায়গা, ঘাস খাওয়া ও বিচরণের জায়গা, পানি পান করার জলাশয়, রাখাল ও দুধ দোহনের জায়গা সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন হওয়া চাই।
৫. পশু যদি একই জাতের হয়, তবে তার প্রজনকও অভিন্ন হওয়া চাই।

ইমাম আহমদও শাফেয়ীর ন্যায় একই মত প্রকাশ করেছেন। পার্থক্য শুধু এতোটুকু, আহমদের মতে, সংযুক্তির প্রভাব শুধু পশুর মধ্যে সীমিত থাকবে, অন্য কোনো সম্পদে পড়বেনা।

৩৭. গুপ্ত ও খনিজ সম্পদের যাকাত

১. গুপ্ত সম্পদ

এখানে বুঝানো হয়েছে জাহেলী যুগের প্রোথিত ধনরত্ন। এটা চেনা যাবে তাদের খোদাই করা নাম ও ছবি ইত্যাদি দ্বারা। এর উপর যদি ইসলামের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহলে তার উপর হারানো সম্পদের বিধি কার্যকর হবে, প্রোথিত সম্পদের বিধি নয়। যখন কোনো নিদর্শনই

প্রাওয়া যায়না এবং জাহেলী যুগের না ইসলামী যুগের কিছুই বুঝা যায়না তখনও তা হারানো সম্পদ গণ্য হবে।

ইমাম মালেক বলেছেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত মত এবং আলেমদের নিকট থেকে যা শুনেছি তা হলো : রিকায ততোক্ষণ জাহেলী আমলের প্রোথিত সম্পদ গণ্য হবে, যতোক্ষণ তা কোনো অর্থের বিনিময়ে খোঁজা হয়না। তার পেছনে কোনো অর্থ ব্যয় করা হয়না। কোনো বড় রকমের পরিশ্রম ও সাধনা করা হয়না। যে জিনিস অর্থের বিনিময়ে উদ্ধার করা হয়। যার পেছনে বড় রকমের চেষ্টা ও পরিশ্রম করা হয় এবং কখনো চেষ্টা সফল হয়, কখনো বৃথা যায়। তা রিকায নয়। আবু হানিফা বলেছেন : মাটির নিচে প্রোথিত যে কোনো সম্পদের নামই রিকায, চাই তা সৃষ্টিকর্তা রাখুন অথবা তার কোনো সৃষ্টি রাখুক।

২. খনিজ সম্পদ ও ফকীহদের নিকট তাতে যাকাতের শর্ত

মা'দান শব্দটি 'আদান' থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ স্থায়ী হওয়া। এজন্য বেহেশতের আরেক নাম আদান। কেননা তা মুমিনদের চিরস্থায়ী নিবাস।

যে মা'দানে অর্থাৎ খনিজ সম্পদে যাকাত ফরয হয়, তার সংজ্ঞা নিরূপণে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। ইমাম আহমদের মতে, মাটি ব্যতিত অন্য কোনো পদার্থ থেকে সৃষ্ট এমন যে কোনো মূল্যবান বস্তুই মা'দান তথা যাকাতযোগ্য খনিজ সম্পদ, যা ভূগর্ভ থেকে নির্গত বা উত্তোলিত হয়, যথা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তামা, সীসা, নীলকান্ত মণি, যাবারজাদ, যমরূদ, ফিরোযা, স্ফটিক, আকীক, সুরমা, সেঁকো, আলকাতরা, পেট্রোল, গন্ধক, জমাট সালফিউরিক এসিড ইত্যাদি। তিনি এতে শর্ত আরোপ করেছেন, নির্গত খনিজ দ্রব্য সরাসরি অথবা মূল্য নিরূপণের মাধ্যমে নিসাব পরিমাণ হওয়া চাই। আর আবু হানিফার মতে, একমাত্র সেই খনিজ দ্রব্যেই যাকাত ফরয হবে, যাকে আগুন দিয়ে গলানো ও ছাঁচে ঢালাই করা যায়, যেমন সোনা, রূপা, লোহা ও তামা। তরল খনিজ যেমন আলকাতরা এবং জমাট খনিজ যা আগুনে গলেনা যেমন নীলকান্ত মণি, এগুলোতে যাকাত ফরয হয়না। এতে কোনো নিসাবের শর্তও তিনি আরোপ করেননি। তবে কম হোক বা বেশি হোক, এর এক পঞ্চমাংশ বা খুমুস দান করা ওয়াজিব। মালেক ও শাফেয়ীর মতে কেবলমাত্র উত্তোলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যে যাকাত ফরয। তাদের উভয়ের মতে, স্বর্ণ বিশ মিসকাল ও রৌপ্য দুশো দিরহাম পরিমাণ হওয়া চাই, যেমনটি ইমাম আহমদের মত। এতে বছর পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কৃষিজাত ফসলের মতো যে মুহূর্তেই তা হস্তগত হবে, সেই মুহূর্তেই এ দুটিতে যাকাত দিতে হবে। উক্ত তিন ইমামের মতে, যাকাত বের করতে হবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং যে যে খাতে যাকাত বন্টন করা হয়, এ যাকাতও সেই সেই খাতে বণ্টিত হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, যে যে খাতে ফাই (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বণ্টিত হয়, এটাও সেই সেই খাতে বণ্টিত হবে।

৩. গুপ্ত ও খনিজ সম্পদে যাকাত ফরযের বিধান

এই দুটিতে যাকাত ফরয হওয়ার মূল বিধি ছয়টি সহীহ হাদিস গ্রন্থে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসে পাওয়া যায় :

"রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কোনো পশু বন্ধন ছুটে যায় তখন তার দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হয় তার জন্য কেউ দায়ি হবেনা, যখন কেউ কূয়া খনন করে এবং তাতে কেউ পড়ে মরে, তখন তার জন্য কেউ দায়ি নয়। খনির ক্ষয়ক্ষতির জন্যও কেউ দায়ি নয়। তবে প্রোথিত সম্পদে এক পঞ্চমাংশ দিতে হবে। ইবনুল মুনযির বলেন : এ হাদিসের কেউ বিরোধিতা করেছে বলে

আমার জানা নেই কেবল হাসান ব্যতিত। তিনি আরবের অর্থাৎ মুসলমানদের ভূমি ও কাফিরদের ভূমিতে পার্থক্য করেছেন। অমুসলমানদের ভূমিতে প্রাপ্ত খনিজে এক পঞ্চমাংশ এবং মুসলমানদের ভূমিতে প্রাপ্ত খনিজে যাকাত দিতে হবে। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : "খনির ক্ষয়ক্ষতির জন্য কেউ দায়ি নয়" এ কথার ব্যাখ্যায় দুটি মত রয়েছে। এক, যখন কাউকে খনি খননের জন্য নিয়োগ করা হয়, অতঃপর খনি তার উপর পতিত হয় ও তাতে সে নিহত হয়। তখন এই মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ি হবেনা। পশু ও কূপ সংক্রান্ত উক্তি এর পাশাপাশি থাকায় এই ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। দুই, এতে যাকাত নেই। এর পরবর্তী উক্তি : "এবং রিকাযে এক পঞ্চমাংশ দিতে হবে" এ দ্বারা এই ব্যাখ্যা সমর্থিত। এখানে খনিজ সম্পদে ও প্রোথিত সম্পদে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। রিকায তথা প্রোথিত সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ধার্য করা হয়েছে। কেননা এটা একটা সঞ্চিত সম্পদ, যা নাগালে পেতে কোনো কষ্ট ও অর্থ ব্যয় হয়না। এটিকে খনিজ থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা এটি উত্তোলনে যথেষ্ট শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়।

যে রিকাযে খুমুছ (এক পঞ্চমাংশ) দিতে হয় তার বিবরণ : যে রিকাযে খুমুস ওয়াজিব হয়, তা হলো, যে জিনিস নিজেই সম্পদ, যেমন সোনা, রূপা, লোহা, শিসা, থালাবাসন ইত্যাদি। এটা হানাফি, হাম্বলী, ইসহাক, ইবনুল মুনযিরের মত এবং মালেক ও শাফেয়ীর দুটি মতের একটি। শাফেয়ীর অপর উক্তি হলো : শুধুমাত্র সোনা ও রূপার খুমুছ দিতে হবে।

রিকাযের স্থান : এর সম্ভাব্য স্থান নিম্নোক্ত স্থানগুলোর যে কোনো একটি হতে পারে :

১. পতিত জমি অথবা যে জমির মালিক অজ্ঞাত, যদিও রিকায ভূপৃষ্ঠ থেকে উদ্ধার হয়, অথবা চলাচল পরিত্যক্ত কোনো পথে কিংবা অনাবাদি গ্রামে পাওয়া যায়। এসব জায়গার প্রোথিত সম্পদে সর্বসম্মতভাবে এক পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান করবে এবং নিজে চার পঞ্চমাংশ গ্রহণ করবে। নাসায়ী আমর ইবনে শুয়াইব থেকে এবং শুয়াইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন : "রসূলুল্লাহ সা.কে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন : চলাচলের পথে কিংবা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় যা পাও, এক বছর পর্যন্ত তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে থাকো। এতে যদি তার মালিক উপস্থিত হয় তবে তা তাকে দিয়ে দেবে। নচেত এটা তোমার। আর যে জিনিস চলাচলের পথে অথবা জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ব্যতিত আর কোথাও পাওয়া যায়, তাতেও রিকাযে খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) দিতে হবে।" (এ হাদিস থেকে জানা গেলো, মালিক পাওয়া না গেলে ওটা প্রাপকের হবে, যদি সে দরিদ্র হয়। অন্যথায় দান করে দেবে।)

২. যে সম্পত্তির মালিকানা কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে, তার অভ্যন্তরে যে রিকায পাওয়া যাবে, তা ঐ ব্যক্তির। কেননা রিকায জমির ভেতরে গচ্ছিত জিনিস। তাই জমির মালিকানা লাভেই তার মালিকানা লাভ করা যাবেনা। জমির দখলে আসলেই তার মালিকানা অর্জিত হবে। সুতরাং এটা অন্যের জমিতে পাওয়া ঘাস, কাঠ ও শিকারের পর্যায়ের, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত ও অনুমোদিত। তাই সেই এর বেশি হকদার। তবে যার কাছ থেকে মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছে, সে যদি দাবি জানায় ওটা তার, তাহলে ওটা তারই হবে। কেননা তা তারই হাতে ছিলো। কারণ সেটা তার জায়গাতেই ছিলো। আর যদি সে দাবি না জানায়, তবে যে পায় তার। এটা আবু ইউসুফের মত এবং হাম্বলীদের বিশুদ্ধতম মত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : ওটা পূর্বতন মালিকের যদি সে তার স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি না দিলে তারও পূর্বতন মালিকেশ। এভাবে প্রথম মালিক পর্যন্ত যাবে। আর যদি উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়ির মালিকানা হস্তান্তরিত হয়, তবে তা উত্তরাধিকার বলে স্থির করা হবে। কিন্তু যদি উত্তরাধিকারিরা একমত হয়ে বলে ওটা তাদের পূর্ব পুরুষের ছিলোনা, তবে তা প্রথম মালিকের। আর যদি প্রথম মালিকের পরিচয়

না জানা যায়, তবে তা হারানো জিনিসের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং মালিকবিহীন গণ্য হবে। আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রা. বলেছেন : রিকায জমির প্রথম মালিকের অথবা তার উত্তরাধিকারিদের যদি তারা পরিচিত হয়। পরিচিত না হলে বাইতুল মালে জমা করা হবে।

৩. রিকায যদি কোনো মুসলমান অথবা আইনানুগ অমুসলিমদের (জিম্মি) মালিকানায় পাওয়া যায়, তবে তা আবু হানিফা ও মুহাম্মদের মতে এবং একটি রেওয়ায়াত অনুযায়ী আহমদের মতেও যার মালিকানায় পাওয়া গেছে তার। আহমদ থেকে এটাও বর্ণিত, ওটা যে পেয়েছে তার। এটা হাসান বিন সালেহ ও আবু ছাওরেরও অভিমত। আবু ইউসুফ এই মতকে পছন্দ করেছেন। এর কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হলো, জমির মালিকানার সাথে সাথেই আপনা আপনি রিকাযের মালিকানা অর্জিত হয়না। জমির মালিক যদি তা দাবি করে তবে তার কথাই গৃহিত হবে। কেননা মালিকানার আওতাধীন তার উপর তার অধিকার রয়েছে। আর যদি সে দাবি না করে তবে যে পেয়েছে তার। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : মালিক স্বীকার করলে, রিকায তার। আর স্বীকার না করলে প্রথম মালিকের।

রিকাযে কতোটুকু প্রদেয় : আগেই বলা হয়েছে, রিকায হলো জাহেলী যুগে মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদ এবং এতে পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রদেয়। অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ জমির প্রাচীনতম মালিকের যদি সে পরিচিত হয়। আর যদি সে মৃত হয় তবে তার উত্তরাধিকারিদের- যদি তারা পরিচিত হয়। নচেত বাইতুল মালে জমা দেয়া হবে। এটা আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ী ও মুহাম্মদের মাযহাব। আহমদ ও আবু ইউসুফ বলেছেন : জমির মালিক দাবিদার নাহলে যে পেয়েছে তার। নচেত সর্বসম্মতিক্রমে জমির মালিকের। রিকাযের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, তার এক পঞ্চমাংশ প্রদান করতে হবে এবং এর কোনো নিসাবও নির্ধারিত নেই। আবু হানিফা, আহমদ, মালেকের দুই মতের বিশুদ্ধতার মত এবং শাফেয়ীর মতে, নিসাব বিবেচনা করতে হবে। তবে বছর পুরো হওয়ার শর্ত যে এতে নেই, সেটা সর্বসম্মত।

কার উপর খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ দেয়া ওয়াজিব : অধিকাংশ আলেমের মতে, রিকায যে পেয়েছে তার উপরই খুমুস দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত, চাই সে মুসলমান, অনুগত অমুসলিম নাগরিক, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রকৃতিস্থ, অপ্রকৃতিস্থ,- যাই হোক। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রকৃতিস্থের অভিভাবককেই খুমুস দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : যে সকল আলেমের মতামত আমরা জানতে পেয়েছি, তারা সবাই মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন : কোনো অনুগত অমুসলিম রিকায পেয়ে থাকলে খুমুস তার উপরই বর্তাবে। মালেক, মদিনাবাসী, ছাওরী, আওযায়ী, ইরাকবাসী, স্বাধীন মতাবলম্বীগণ প্রমুখ এই মতের ধারক। শাফেয়ী বলেছেন : যার উপর যাকাত ফরয, খুমুসও তার উপরই ফরয। অন্য কারো উপর নয়। কেননা খুমুসও যাকাত।

খুমুস পাওয়ার অধিকারী কারা : শাফেয়ীর মতে যারা যাকাত পাওয়ার অধিকারী, তারাই খুমুস পাওয়ারও অধিকারী। কেননা আহমদ ও বায়হাকি বিশর খাসয়ামী থেকে বর্ণনা করেছেন তার গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে :

"তিনি বলেছেন : বিশরের যাকাত আদায়কালে কুফায় একটা প্রাচীন মন্দিরের নিকট আমার উপর চার হাজার দিরহাম ভর্তি একটা পাত্র এসে পড়ে। আমি সেটি নিয়ে আলী রা. এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন : ওটাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করো। আমি ভাগ করলাম। আলী তা থেকে এক ভাগ বা এক খুমুস নিয়ে নিলেন আর আমাকে চার খুমুস দিলেন। এরপর যখন আমি চলে

আসছিলাম, আমাকে ডেকে বললেন : তোমার প্রতিবেশীদের ভেতরে দরিদ্র লোক আছে কি? বললাম! আছে। তিনি বললেন : এগুলো নিয়ে যাও এবং তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।"

পক্ষান্তরে আবু হানিফা, মালেক ও আহমদের মতে, যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়ার অধিকারী, তারাই রিকাযের খুমুস পাওয়ার অধিকারী। কেননা শা'বী বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি মদিনার বাইরে এক হাজার দিনার মাটিতে প্রোথিত পেলো। তা নিয়ে সে উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট এলো। তিনি তা থেকে খুমুস দুইশো দিনার নিয়ে নিলেন এবং লোকটিকে অবশিষ্ট আটশো দিনার দিলেন। উমর রা. উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে উক্ত দুশো দিনার বণ্টন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তা থেকে সামান্য কিছু অবশিষ্ট রাখলেন। তারপর বললেন : দিনারের মালিক কোথায়? লোকটি তার নিকট গেলো। উমর রা. বললেন : এই দিনারগুলো নাও, এগুলো তোমার।" মুগনীতে বলা হয়েছে : এটা যদি যাকাত হতো, তাহলে এই দিনারগুলো বণ্টনে তিনি যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদেরকে নির্দিষ্ট করতেন এবং যে ব্যক্তি গুপ্তধন পেয়েছে তাকে ফেরত দিতেননা। তাছাড়া এই খুমুস অনুগত অমুসলিম নাগরিকেরও দেয়া বাধ্যতামূলক। অথচ যাকাত অমুসলিমের উপর ফরয নয়।

৩৮. সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত

অধিকাংশ আলেমের মতে সকল সামুদ্রিক সম্পদে, যথা মণি, মুক্তা, যাবরজাদ, আম্বর, মাছ ইত্যাদিতে যাকাত ফরয হয়না। একমাত্র আহমদের থেকে প্রাপ্ত দুটি বর্ণনার একটি অনুসারে নিসাব পরিমাণ সামুদ্রিক সম্পদে যাকাত ফরয। আবু ইউসুফ কেবল মুক্তা ও আম্বরে তার মত সমর্থন করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : আম্বরে যাকাত নেই। ওটাতো সমুদ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত একটা জিনিস। জাবির বলেন : আম্বরে কোনো যাকাত নেই। ওটা যার হস্তগত হয় তার জন্য গনিমত স্বরূপ।

৩৯. আহরিত সম্পদে যাকাত

যে ব্যক্তি এমন কোনো সম্পদ আহরণ করলো যাতে বছর পূর্ণ হওয়া ছাড়া যাকাত হয়না এবং তা নিসাবের পর্যায়ে পৌছলো। অথচ তার অন্য কোনো সম্পদ নেই। অথবা একই জাতের সম্পদ রয়েছে। কিন্তু নিসাবে উপনীত হয়নি। এমতাবস্থায় আহরিত সম্পদ যুক্ত হয়ে নিসাবে উপনীত হলো, তার উক্ত সম্পদে সেই মুহূর্ত থেকেই যাকাতের বছর হিসাব করা হবে। যখন বছর পূর্ণ হবে, যাকাত ফরয হবে।

আর যদি তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে থাকে তবে আহরিত সম্পদ নিম্নোক্ত তিন প্রকারের যে কোনো একটি হওয়া অনিবার্য :

১. আহরিত সম্পদ একই সম্পদের বর্ধিত রূপ, যেমন ব্যবসার মুনাফা ও পশুর বাচ্চা। এটা বছর ও যাকাত উভয় ক্ষেত্রেই মূল সম্পদের আওতাধীন হবে।

সুতরাং যার নিকট নিসাব পরিমাণ বাণিজ্যিক পণ্য অথবা জন্তু রয়েছে, অতঃপর বছরের মাঝখানে ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জিত হলো ও পশুর শাবক জন্মালো, তাকে সর্বসম্মত মতানুসারে মূল ও আহরিতসহ সমগ্র সম্পদ বাবদ যাকাত দিতে হবে।

২. আহরিত সম্পদ তার কাছে সঞ্চিত নিসাব পরিমাণ সম্পদের জাতভুক্ত, তার অংশও নয়, সন্তানও নয় বরং ক্রয়, দান বা উত্তরাধিকার সূত্রে আহরিত। আবু হানিফার মতে এ ধরনের আহরিত সম্পদকে নিসাবধারী সম্পদের সাথে যুক্ত করা হবে। তার অধীনে এনে বছর গণনা করা হবে এবং মূল ও আহরিত সম্পদের সম্মিলিত গোটা সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে।

শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন : আহরিত সম্পদ মূল সম্পদকে অনুসরণ করবে কেবল নিসাবের ক্ষেত্রে এবং তা দিয়ে নতুন বছর গণনা করা হবে, চাই মূল সম্পদ নগদ অর্থ হোক অথবা কোনো প্রাণী হোক। যেমন, তার নিকট দুশো দিরহাম ছিলো। তারপর বছরের মাঝে আরো কিছু দিরহাম আহরণ করলো। সে এই উভয় সম্পদে যাকাত দেবে বছর পূর্ণ হওয়ার পর। মালেকের অভিমত পশুর ব্যাপারে আবু হানিফার মত। আর সোনা রূপায় শাফেয়ী ও আহমদের মত।

৩. আহরিত সম্পদ তার নিকট সঞ্চিত সম্পদ থেকে ভিন্ন জাতের। এরূপ আহরিত সম্পদকে তার কাছে বিদ্যমান সম্পদের সাথে যুক্ত করে নেসাব বা বছর কোনোটাই হিসাব করা যাবেনা। বরং তা যদি নিসাব পরিমাণ থেকে থাকে তবে তা নিয়ে বছর পূর্ণ করতে হবে এবং বছর শেষে যাকাত দিতে হবে। নচেত কিছুই দিতে হবেনা। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

৪০. যাকাত ফরয হয় দায়িত্বের উপর, হুবহু সম্পদের উপর নয়

হানাফী, মালেক ও আহমদের একটি মতানুসারে এবং একটি বর্ণনা অনুসারে শাফেয়ীর মতানুসারেও যাকাত হয় হুবহু সম্পদের উপর। আহমদ ও শাফেয়ীর অপর মত হলো, যাকাত সম্পদের মালিকের দায়িত্বের উপর অর্পিত হয়। হুবহু সম্পদের উপর নয়। এই মতভেদের ফলে বাস্তবায়নের কর্মপন্থার যে তারতম্য ঘটে সেটা এ রকম : এক ব্যক্তি দুশো দিরহামের মালিক হয়েছে এবং যাকাত দেয়া ছাড়াই তার উপর দু'বছর কেটে গেছে। তখন যিনি বলেন : হুবহু সম্পদের উপর যাকাত ফরয, সে বলবে, এই ব্যক্তিকে এখন মাত্র এক বছরের যাকাত দিতে হবে। কেননা প্রথম বছরের যাকাত দেয়ার পর তাতে নিসাবের চেয়ে পাঁচ দিরহাম কমে গেছে। আর যিনি বলেন : যাকাত দায়িত্বের উপর অর্পিত হয়। তিনি বলবেন, সে দুটো যাকাত দেবে পর পর দু'বছরের জন্য। কেননা যাকাত ফরয হয়েছে তার দায়িত্বের উপর। কাজেই তার কোনো প্রভাব নিসাব কমার উপর পড়বেনা। ইবনে হাযম দায়িত্বের উপর ফরয হওয়াকে অগ্রগণ্য মনে করেন। তিনি বলেন : আমাদের যুগ থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ সা. এর যুগ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কোনো ব্যক্তির মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, যে ব্যক্তির উপর গম, যব, খোরমা, সোনা, রূপা, উট, গরু বা ছাগল ভেড়ার যাকাত ফরয হয় এবং সে উক্ত শস্য, সোনা, রূপা, উট, গরু ও ছাগল ভেড়া ব্যতিত অন্য কোনো জিনিস দ্বারা যাকাত দেয়, তাকে তা থেকে বাধা দেয়াও যাবেনা। অপছন্দও করা যাবেনা। বরং সে ঐ সম্পদ দিয়েই দিক, অথবা তার কাছে বিদ্যমান অন্য কিছু দিয়ে দিক। অথবা অন্য কোনো খরিদযোগ্য, দানযোগ্য বা ধারযোগ্য জিনিক দিয়ে দিক- সবই সমান। কাজেই এটা সুনিশ্চিতভাবে সঠিক প্রমাণিত। যাকাত দায়িত্বের উপরই অর্পিত। হুবহু সম্পদের উপর নয়। কেননা হুবহু সম্পদের উপর যদি হতো, তবে কোনো অবস্থাতেই অন্য কিছু দিয়ে দেয়া বৈধ হতোনা এবং তাকে ঐ কাজ থেকে বাধা দেয়া হতো। যেমন যে ব্যক্তির সাথে অন্য কেউ উল্লিখিত জিনিসগুলোর কোনো একটিতে শরিক রয়েছে, তার পক্ষে তার শরিকের সম্মতি ব্যতিত শরিককে যে জিনিসের মধ্যে তারা অংশীদার, তার ছাড়া অন্য কোনো জিনিস থেকে কিছু দেয়া বৈধ নয়।

অনুরূপ, যাকাত যদি হুবহু কোনো সম্পদের উপর ফরয হতো, তাহলে নিম্নোক্ত দুটো অবস্থার যে কোনো একটি দেখা না দিয়ে পারতোনা : হয় উক্ত সম্পদের প্রতিটি অংশের উপর যাকাত ফরয হবে। অথবা হুবহু তার উপর না হয়ে তার কোনো একটিতে যাকাত ফরয হবে। যদি তার সকল অংশে যাকাত ফরয হতো, তাহলে তার উপর তার একটি দানাও বা কিছু পরিমাণও

বিক্রি করা হারাম হয়ে যেতো। কেননা যারা যাকাতের প্রাপক, তারা সবাই উক্ত অংশে শরিক, অনুরূপ তার একটুও ভক্ষণ করা তার জন্য হারাম হয়ে যেতো। অথচ সর্বসম্মতভাবে এটা বাতিল। অনুরূপ, ছাগলকে গোটা পাল থেকে মূল্য নির্ণয় করা ছাড়া বের করা বৈধ হতোনা, যেমন আবশ্যিকভাবে অংশিদারিতে করা হয়। আর যদি যাকাত কোনো সম্পদের অংশ বিশেষের উপর ফরয হতো- হুবহু সম্পদের উপর নয়, তবে তা বাতিল হতো। কেননা সে অবস্থার হয়তো না জেনেই যাকাতের প্রাপকদের অংশ ভক্ষণ করতো।

৪১. যাকাত ফরয হওয়ার পর ও দেয়ার আগে সম্পদ বিনষ্ট হলে

যাকাত ফরয হওয়ার পর বছর অতিবাহিত হয়েছে অথবা ফসল কাটার সময় সমাগত হয়েছে এমতাবস্থায় যাকাত দেয়ার আগেই সমস্ত সম্পদ অথবা তার অংশ বিশেষ বিনষ্ট হয়ে গেলে মালিকের উপর পুরো যাকাতের দায় বহাল থাকবে, চাই তার কোনো অবহেলার কারণে অথবা অবহেলা ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে থাকুক। এটা ইবনে হাযমের মত এবং ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মাযহাব। কিন্তু আবু হানিফার মতে, মালিকের কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াই যদি সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। আর যদি অংশ বিশেষ নষ্ট হয়, তবে তার আনুপাতিক হারে যাকাত রহিত হবে। কেননা তাঁর মতে হুবহু সম্পদের সাথেই যাকাতের সম্পর্ক তার মূল্যের সাথে নয়। পক্ষান্তরে যখন তা কোনো বাড়াবাড়ির কারণে বিনষ্ট হবে, তখন যাকাত রহিত হবেনা। শাফেয়ী , হাসান বিন সালেহ, ইসহাক আবু ছাওর ও ইবনুল মুন্যির বলেছেন : যাকাত দেয়ার সামর্থ্য হবার আগে যদি নিসাব বিনষ্ট হয়। তবে যাকাত রহিত হবে। আর যদি তার পরে বিনষ্ট হয়। তাহলে রহিত হবেনা। ইবনে কুদামা এই মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং বলেছেন : আল্লাহ চাহেন তো বিশুদ্ধ মত হলো, সম্পদ বিনষ্ট হলে যাকাত রহিত হবে তখনই, যখন যাকাত দেয়ায় মালিক গড়িমসি না করে। কেননা যাকাত ফরয হয় সহানুভূতির ভিত্তিতে। তাই সম্পদ না থাকলেও এবং মালিকের দারিদ্র্য সত্ত্বেও তা ফরয হবে এটা হতে পারেনা।

অবহেলার অর্থ হলো, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাকাত না দেয়া। সামর্থ্য না থাকলে সেটা অবহেলা গণ্য হয়না, চাই যাকাত পাওয়ার অধিকারী কাউকে না পাওয়ার কারণে হোক অথবা সম্পদ তার কাছে থেকে দূরে থাকার কারণে হোক, অথবা যাকাত হিসেবে যা দিতে হবে, তা সম্পদের মধ্যে নেই, কিনে দেয়ার প্রয়োজন, অথবা কিনে দিতে পাওয়া গেলোনা, অথবা খরিদ করার জন্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলো অথবা এ ধরনের অন্য কোনো কারণে যাকাত দিতে অসামর্থ্য দেখা দিক। আর যদি আমরা সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার পরও যাকাত ফরয বলি, অতপর মালিক যাকাত দিতে সমর্থ হয়, তবে দিয়ে দেবে। নচেত তাকে তার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া সামর্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হবে। কেননা মানুষের ঋণের জন্য যখন মালিককে অবকাশ দেয়া বাধ্যতামূলক, তখন আল্লাহর হক যাকাতের জন্য অবকাশ দেয়া আরো বেশি অগ্রগণ্য।

৪২. যাকাত পৃথক করার পর বিনষ্ট হলে

যাকাতকে পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখার পর তার সবটা অথবা আংশিক নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় যাকাত দিতে হবে। কেননা আল্লাহ যাদের নিকট যাকাত পৌছাতে আদেশ দিয়েছেন, তাদের কাছে না পৌছানো পর্যন্ত এটা মালিকের দায়িত্বে বহাল থাকবে।

ইবনে হাযম ইবনে আবি শায়বা, হাফস বিন গিয়াস, জারীর, মুতামার বিন সুলায়মান তাইমী, যায়দ বিন হুবাব ও আবদুল ওহাব বিন আতা থেকে বর্ণনা করেন, হাফস বলেছেন, হিশাম বিন হাসসান থেকে ও হাসান বসরী থেকে, জারীর বলেছেন, মুগীরা ও তার শিষ্যদের থেকে

মুতামার বলেছেন, মুযাম্মার থেকে ও হাম্মাদ থেকে, যায়দ বলেছেন, শুবা থেকে ও হাকাম থেকে, আবদুল ওয়াহাব বলেছেন : ইবনে আবি আরূবা থেকে, হাম্মাদ থেকে ও ইবরাহীম নাখ্য়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। অতপর এরা সবাই একমত হয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যাকাত বের করলো অতঃপর তা বিনষ্ট হলো, তাকে পুনরায় যাকাত দিতে হবে।' আতা থেকে বর্ণিত : পুনরায় যাকাত দেয়া লাগবেনা।

৪৩. যাকাত দিতে বিলম্ব হলে তা রহিত হয়না

যে ব্যক্তির বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়েছে, অথবা তার উপর যে যাকাত ফরয ছিলো, তা দেয়নি, তাকে অতীতের সব যাকাত দিতে হবে, চাই যাকাত ফরয হওয়ার কথা তার জানা থাকুক বা অজানা থাকুক এবং চাই সে মুসলমানদের দেশে বসবাসরত থাকুক বা অমুসলিমের দেশে। এটা শাফেয়ী মাযহাবের মত।

৪৪. মূল সম্পদের পরিবর্তে মূল্য প্রদান

যাকাতে যে ক্ষেত্রে মূল সম্পদ থেকে যাকাত দেয়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে একমাত্র তখনই মূল্য প্রদান করা যথেষ্ট হবে, যখন উক্ত মূল সম্পদ বা তার সমজাতীয় সম্পদ পাওয়া যাবেনা। কারণে যাকাত হলো একটা ইবাদত। আর ইবাদত আদায় করা শুদ্ধ হবে কেবল শরিয়ত যার উপর নির্দেশ দিয়েছে তার উপর। তাছাড়া দরিদ্ররা যাতে ধনিদের মূল সম্পদে অংশীদার হতে পারে, সেজন্য মূল সম্পদ দিয়েই যাকাত দেয়া উচিত।

মুয়ায বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : "রসূলুল্লাহ সা. তাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বললেন : শস্য থেকে শস্য নিও, ছাগল ও ভেড়া থেকে ছাগল নিও, উট থেকে উট নিও এবং গরু থেকে গরু নিও।" -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকি ও হাকেম।

শওকানি বলেছেন , প্রকৃত সত্য হলো যাকাত মূল সম্পদ থেকেই ফরয এবং ওযর ছাড়া মূল্য দিলে চলবেনা। তবে মূল সম্পদ থেকে দেয়ার সাধ্য থাকা অবস্থায়ও মূল্য থেকে দেয়া আবু হানিফার মতে বৈধ। কেননা যাকাত দরিদ্রের অধিকার। আর দরিদ্রের কাছে মূল সম্পদ বা তার মূল্যে কোনো পার্থক্য নেই। বুখারি বর্ণনা করেছেন : "মুয়ায ইয়ামানবাসীকে বললেন : তোমরা যাকাত বাবদ আমার কাছে পাড়ওয়ালা রেশমী কাপড় বা পরিধান করার পোশাক নিয়ে এসো। এটা তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হবে"।

মদিনায় রসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবিদেরকে মূল্য প্রদানের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল।

৪৫. অংশীদারির সামগ্রীতে যাকাত

যখন কোনো সম্পদ দু'জন অংশীদারের বা তার বেশি অংশীদারের মালিকানাধীন থাকবে, তখন অধিকাংশ আলেমের মতানুসারে পৃথক পৃথকভাবে তারা প্রত্যেকে নিসাবের মালিক না হলে কারো উপর যাকাত ফরয হবেনা।

৪৬. যাকাত ফাঁকি দানকারী

ইমাম মালেক, আহমদ, আওযায়ী, ইসহাক ও আবু উবাইদ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যে কোনো ধরনের সম্পদে নিসাবের মালিক হলে এবং বছর সমাপ্তির আগে সে তা বিক্রি, বা দান করে দিলে অথবা তার একাংশ নষ্ট করে দিলে যাকাত দিলে থেকে অব্যাহতি পাবেনা। এ কাজটা যদি সে বছরের শেষে ভাগে করে তাহলে তার কাছ থেকে বছরের শেষে যাকাত আদায় করা হবে। আর যদি বছরের প্রথম ভাগে করে তাহলে তার যাকাত দিতে হবেনা। কেননা এ দ্বারা সে যাকাত ফাঁকি দিতে চায় এমন মনে হয়না। আবু হানিফা ও শাফেয়ী বলেছেন : তার যাকাত

রহিত হবে। কেননা সে বছরের সমাপ্তির আগেই সম্পদ কমিয়ে ফেলেছে। তবে সে ইচ্ছাকৃত যাকাত ফাঁকি দিতে চাইলে গুনাহগার ও আল্লাহর অবাধ্য গণ্য হবে।

যারা প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তা তারা সূরা কলমের ১৮-২১ নং আয়াত থেকে প্রমাণ দর্শান :

إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ.

"আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি যেমন করেছি বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করলো, অতি প্রত্যুষে তারা ফল আহরণ করবে এবং তারা ইনশাল্লাহ বলেনি। অতঃপর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বাগানের উপর, এক বিপর্যয় এলো, তখন তারা ছিলো ঘুমন্ত। ফলে বাগানটি শস্য কাটা ক্ষেত্রের মতো হয়ে গেলো।" এভাবে আল্লাহ তাদেরকে যাকাত ফাঁকি দেয়ার জন্য শাস্তি দিলেন।

এর আরো কারণ হলো, যারা যাকাত পাওয়ার অধিকারী তাদেরকে সে বঞ্চিত করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। তাছাড়া, যেহেতু সে একটা অন্যায় ইচ্ছা করেছে, তাই তার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাকে শাস্তি দেয়াকেই বিচক্ষণতার দাবি ছিলো। যেমন কেউ তার উত্তরাধিকার প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করতে পিতাকে হত্যা করলো। তাই শরিয়ত তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দিয়েছে।

৪৭. যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

যাকাতের ক্ষেত্র আটটি। আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন :

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِينِ وَالْعٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"যাকাত তাদের প্রাপ্য, যারা দরিদ্র, মিসকীন, যারা যাকাত আদায়ের কর্মচারি, যাদের চিত্ত আকর্ষণ কাঙ্ক্ষিত এবং দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাবান"। (সূরা তাওবা : আয়াত ৬০)

আর যিয়াদ বিন হারেছ সুদায়ী বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এলাম এবং তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করলাম। সেসময় এক ব্যক্তি এসে বললো, আমাকে যাকাত থেকে কিছু দিন। তিনি বললেন : যাকাতের ব্যাপারে কোনো নবী বা অন্য কারো ফায়সালায় আল্লাহ সম্মত নন। তাই তিনি নিজেই এটা বণ্টন করেছেন এবং আট শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করেছেন। তুমি যদি এই আট শ্রেণীর কেউ হও, তাহলে তোমাকে দেবো।" - আবু দাউদ।

আয়াতে বর্ণিত আটটি শ্রেণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

১-২ ফকির ও মিসকীন : যারা তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে অন্যের মুখাপেক্ষী। এর বিপরীত হলো, সেসব ধনাঢ্য লোক, যারা তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে স্বয়ং সম্পূর্ণ। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, যে পরিমাণ সম্পদ লাভ করলে কাউকে ধনী বলা যায়, তা হলো তার ও তার সন্তানদের জন্য মৌলিক প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ। এই মৌলিক প্রয়োজনসমূহের আওতায় পড়ে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বাসস্থান, পরিবহন ব্যবস্থা ও জীবিকা উপার্জনের উপায়। কেননা এগুলো ছাড়া মানুষের জীবন চলেইনা। যে ব্যক্তি এই প্রয়োজন পূরণের উপযুক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত, সে দরিদ্র এবং সে যাকাতের অধিকারী।

মুয়াযের হাদিসে রয়েছে : 'তাদের ধনিদের নিকট থেকে সম্পদ নেয়া হবে এবং দরিদ্রদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। যার কাছ থেকে নেয়া হবে সে ধনী ও নিসাবের মালিক। আর যাকে ফিরেয়ে দেয়া হবে, সে তার বিপরীত পক্ষ দরিদ্র অর্থাৎ ধনীর সমপরিমাণ সম্পদ যার নেই। দরিদ্র ও মিসকীনের মধ্যে প্রয়োজন ও অভাবের দিক দিয়ে এবং যাকাতের হকদার হিসেবে কোনো পার্থক্য নেই। তবে আয়াতে যেভাবে 'আত্ফ' অর্থাৎ সংযোজন পদ (ও, এবং) দ্বারা একত্রিত করা হয়েছে। তাতে দু'টো পৃথক শ্রেণী বুঝালেও আমাদের বক্তব্য খণ্ডিত হবেনা। কেননা মিসকীন হলো দরিদ্রের একটা শ্রেণী, যাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটুকুই তাদের পৃথক শ্রেণী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হাদিস থেকে জানা যায়, মিসকীন সেসব দরিদ্র যারা মানুষের কাছে কিছু চায়না। আর জনগণও তাদেরকে চিনতে পারেনা। এজন্য আয়াতে তাদের আলাদা উল্লেখ করেছে। কেননা হতে পারে তাদের ভদ্রতার কারণে তাদেরকে চেনা যায়না।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "সেই ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে একটা বা দু'টো খোরমা কিংবা এক গ্রাস বা দু'গ্রাস খাবার দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়। মিসকীন হলো সেই ব্যক্তি, যে চাওয়া এড়িয়ে চলে। তারা কাকুতি মিনতি করে কারো কাছে কিছু চায়না।" অন্য রেওয়ায়েতের ভাষা হলো : "সেই ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে এক গ্রাস বা দুই গ্রাস খাবার এবং একটা বা দুটো খোরমা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়। বরং মিসকীন হলো সেই ব্যক্তি, যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হবার উপায় খুঁজে পায়না, কেউ থাকে চিনতেও পারেনা যে, তাকে কিছু দান করবে। সে মানুষের কাছে কিছু চায়ওনা।" -বুখারি, মুসলিম।

দরিদ্রকে কী পরিমাণ যাকাত দেয়া হবে : যাকাতের উদ্দেশ্য হলো, দরিদ্রকে দারিদ্র্য মুক্ত করা ও তার প্রয়োজন মেটানো। তাই যাকাত থেকে যে পরিমাণ দিলে সে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে স্থায়ীভাবে সচ্ছল হতে পারবে এবং পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হতে পারবে, সেই পরিমাণ তাকে দিতে হবে। অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে এই পরিমাণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। উমর রা. বলেছেন : "যখন কাউকে দান করবে, তাকে স্বনির্ভর করে দাও।" কাযী আবদুল ওয়াহাব বলেছেন : ইমাম মালেক এ ব্যাপারে কোনো সংজ্ঞা দেননি। তিনি শুধু বলেছেন : যার বাসস্থান, চাকর ও পরিবহনের জন্তু এই মৌলিক জিনিসগুলো রয়েছে, তাকেও দেয়া যাবে। হাদিসে আরো এসেছে : দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে সাহায্য চাওয়া হালাল যাতে সে আয় রোযগারের একটা উপায় অবলম্বন করতে পারে এবং সারা জীবন তা দিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে।

কুবাইসা বিন মুখারিক হিলালী বলেন : আমার ঘাড়ে একট ঋণ ছিলো। সে ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করতে গেলাম। তিনি বললেন : তুমি এখানে অবস্থান করো আমাদের নিকট যাকাত আসা পর্যন্ত। তখন তোমাকে কিছু দিতে বলবো। তারপর বললেন : হে কুবাইসা, তিন ব্যক্তির একজন হওয়া ব্যতিত আর কারো জন্য সাহায্য প্রার্থনা হালাল নয়। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত তার সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে সে সাহায্য পায় এবং তারপর চাওয়া থেকে বিরত হয়। যে ব্যক্তি এমন বিপদে আক্রান্ত, যার দরুন তার প্রচুর সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে, তার সাহায্য চাওয়া হালাল, যাতে সে জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারে। অন্য বর্ণনা অনুসারে যাতে সে নিজের প্রয়োজন মেটাতে ও স্বাবলম্বী হতে পারে। আর এমন ব্যক্তি যে এতো মারাত্মক অভাবে পতিত যদি, তার গোত্রের তিনজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, অমুক মারাত্মক অভাবে পতিত। এরূপ ব্যক্তির জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে সে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে এবং স্বাবলম্বী হতে পারে। হে কুবাইসা, এ তিন ব্যক্তি ছাড়া আর যে ব্যক্তি সাহায্য চায়, সে হারাম উপার্জন করে ও হারাম খায়। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ নাসায়ী।

সুস্থ সবল উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে কি যাকাত দেয়া যাবে? ধনী ব্যক্তিকে যেমন যাকাত দেয়া যায়না, তেমনি শক্তিমান উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকেও যাকাত দেয় যায়না।

১. উবায়দুল্লাহ বিন আদি আল খিয়ার বলেন, দুজন ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে, তারা বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এলো। তখন তিনি যাকাত বন্টন করছিলেন। তারা বলেন, আমরা দু'জনে যাকাত চাইলাম। তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিলেন। তিনি আমাদের উভয়কে শক্তিমান দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : তোমরা চাওতো দিতে পারি। তবে এতে কোনো ধনবানের বা কোনো শক্তিমান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির কোনো অংশ নেই। -আবু দাউদ, নাসায়ী।

খাত্তাবী বলেন : এ হাদিসে যে মূলনীতিটি পাওয়া যায় তা হলো : সে ব্যক্তি যার কোনো সম্পদ আছে বলে জানা যায়না, তার সম্পদ নেই বলে ধরে নিতে হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, বাহ্যিক শক্তি সামর্থ্য ও তাগড়া দেহ যাকাতের ব্যাপারে বিবেচ্য নয়, উপার্জন কেমন যাচাই করা ব্যতিত। কেননা অনেক লোক এমন থাকে যে দৈহিকভাবে সুস্থ সবল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজ কর্মে এতো অদক্ষ যে, কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেনা। হাদিসটি দ্বারা প্রমাণিত, এ ধরনের লোককে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা চলবেনা।

রায়হান বিন এযিদ আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো ধনীর জন্য, সুস্থ সবল শ্রম ও উপার্জনে সক্ষম এবং সকল অংগ প্রত্যংগ সুস্থ ও স্বাভাবিক এমন ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। -আবু দাউদ, তিরমিযি। এটা হচ্ছে শাফেয়ী, ইসহাক, আবু উবাইদ ও আহমদের মত।

হানাফিরা বলেন : সর্বোচ্চ দুশো দিরহাম বা তার বেশি সম্পদের অধিকারী নয় এমন সুস্থ সবল ব্যক্তিরও যাকাত গ্রহণ বৈধ।

নববী বলেন, যে সকল লোক সচরাচর শরীরিক শ্রম দ্বারা উপার্জনে অভ্যস্ত নয়, অথচ শক্ত সমর্থ তারা কি যাকাতের যে অংশ দরিদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট, তা থেকে নিতে পারবে? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম গাজ্জালী বলেছেন : 'হাঁ পারবে।' বস্তুত এটা বিশুদ্ধ মত। যে পেশা যার জন্য মানানসই, সেটাই তার জন্য বিবেচ্য।

নিসাবের মালিক, অথচ নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মতো সচ্ছল নয়, তার বিধান :

যে ব্যক্তি কোনো না কোনো ধরনের সম্পদে নিসারের মালিক। অথচ পরিবারের লোক সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে অথবা মূল্য বৃদ্ধির কারণে ঐ সম্পদ তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়, সে নিসাবের মালিক হওয়ায় ধনী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার সম্পদে যাকাত যথাবিহিত ফরয হবে। আবার তার মালিকানাধীন সম্পদ তার প্রয়োজন পূরণ করেনা বিধায় সে দরিদ্রও বটে। কাজেই তাকে দরিদ্র হিসেবে যাকাত দেয়াও হবে। ইমাম নববী বলেন : যার ভূ-সম্পত্তি রয়েছে কিন্তু তা থেকে উৎপন্ন সম্পদ তার সচ্ছলতা নিশ্চিত করেনা যাকাত থেকে তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করা হবে এবং ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করতে তাকে বাধ্য করা হবেনা।

আল মুগনীতে বলা হয়েছে, মাইমুনী বলেছেন : আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে বললাম : এমন ব্যক্তি বিরল নয়, যার কিছু উট ও ছাগল ভেড়া রয়েছে, যাতে যাকাত ফরয, অথচ সে দরিদ্র। তার চল্লিশটি ছাগলও থাকে, তার ভূ-সম্পত্তি থাকে, যা তার প্রয়োজন পূরণ করেনা। তাকে কি যাকাত দেয়া হবে? আহমদ বললেন : হাঁ। কেননা সে এতোটা সম্পদে মালিক নয় যা তাকে

সচ্ছলতা দেয় এবং সচ্ছলতা এনে দিতে পারে এতোটা উপার্জনেও সে সক্ষম নয়, তার জন্য যাকাত নেয়া বৈধ, যেমন যে সম্পদে যাকাত ফরয হয়না তার মালিক হলে বৈধ হতো।

৩. যাকাত বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারি কর্মকর্তাগণ : এরা হলো তারা যাদেরকে সরকার বা সরকারের অনুমোদিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ধনিদের কাছ থেকে যাকাত আদায়ে ও সংগ্রহে নিযুক্ত করে। যাকাতের সম্পদ সংরক্ষণ, যাকাতের পশুর রাখাল এবং যাকাতের হিসাবপত্র রক্ষকগণও এদের আওতাভুক্ত। এদের অবশ্যই মুসলমান হওয়া চাই এবং যাদের উপর যাকাত হারাম, যথা রসূলুল্লাহ সা.-এর বংশধর বনু হাশেম ও বনু আবদুল মুত্তালিব -তাদের কোনো সদস্য না হওয়া চাই।

মুত্তালিব বিন রবীয়া ইবনুল হারেছ বিন আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও ফযল বিন আব্বাস রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট গেলাম, তারপর আমাদের একজন বললো : হে রসূলুল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এজন্য এসেছি যে, আমাদেরকে যাকাতের দায়িত্বে নিযুক্ত কররেন এবং এই উপলক্ষে অন্যরা যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আমরাও তা ভোগ করবো এবং অন্যরা আপনার নিকট যা এনে দেয় আমরাও এনে দেবো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : মুহাম্মদ ও তার বংশধরের জন্য যাকাত ও সদকা সমীচীন নয়। ওগুলো তো মানুষের ময়লা।" - আহমদ ও মুসলিম।

তবে যাকাত বিভাগের কর্মচারি ও কর্মকর্তাগণ ধনী হলেও তাদের জন্যে বেতনভাতা হিসেবে যাকাত বৈধ।

আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বললেন : পাঁচ ব্যক্তি ব্যতিত কোনো ধনীর জন্য যাকাত হালাল নয়, ১. যে ব্যক্তি যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত, ২. যে ব্যক্তি নিজের টাকা দিয়ে যাকাতের সামগ্রি কিনেছে, ৩. ঋণ গ্রস্ত, ৪. আল্লাহর পথে জিহাদরত এবং ৫. কোনো মিসকীন যাকাত ও হিসেবে প্রাপ্ত সামগ্রি থেকে কোনো ধনীকে উপহার দিলে। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম। যাকাতের কাজে নিযুক্তরা যাকাত থেকে কেবল তাদের কাজের পারিশ্রমিকই নিয়ে থাকে।

অবদুল্লাহ আস্ সা'দী থেকে বর্ণিত, তিনি সিরিয়া থেকে উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট এলেন। উমর রা. তাকে বললেন : আমি শুনেছি, তুমি মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত অথচ এজন্য তোমাকে যে বেতন দেয়া হয় তা গ্রহণ করোনা, এটা কি সত্য? আবদুল্লাহ্ বললেন : হাঁ আমার অনেক ঘোড়া ও দাসদাসি রয়েছে। আমি সচ্ছল। আমি চাই, আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সদকা হয়ে যাক। উমর রা. বললেন : তুমি যে মনোভাব পোষণ করছ, আমি তাই পোষণ করতাম। রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে বিনিময়ে কিছু দিতেন। আমি বলতাম : যে ব্যক্তি আমার চেয়েও দরিদ্র তাকে এটা দিন। একবার তিনি আমাকে কিছু দিলেন। আমি বললাম : যে ব্যক্তি আমার চেয়েও অভাবী, তাকে এটা দিন। তিনি বললেন : এই সম্পদ থেকে আল্লাহ্ তোমাকে যা দেন তোমার চাওয়া বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া, তা নিয়ে নাও, তারপর বিনিযোগ করো অথবা দান করে দাও। আর যা আল্লাহ না দেন, তার জন্য লালায়িত হয়োনা। -বুখারি ও নাসায়ী।

যাকাতের কাজে নিয়োজিতদের পারিশ্রমিক তাদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয় এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

"মুসতাউরিদ বিন শাদ্দাদ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ বলেছেন : যে ব্যক্তি জনগণের কোনো কাজে নিযুক্ত হয়, তার যদি বাড়ি না থাকে তার বাড়ি যোগাড় করা উচিত, স্ত্রী না থাকলে বিয়ে করা উচিত। চাকর না থাকলে চাকর নিয়োগ করা উচিত। পরিবহন না থাকলে পরিবহন

সংগ্রহ করা উচিত। আর যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি কিছু সংগ্রহ করলো, সে একজন আত্মসাতকারী। -আহমদ, আবু দাউদ, এর সনদ বিশুদ্ধ।

খাত্তাবী বলেছেন, এ হাদিসের ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা যায় : এক রসূলুল্লাহ সা. চাকর ও বাসস্থান তার কাজের পারিশ্রমিক থেকেই যোগাড় করার অনুমতি দিয়েছেন। এর অতিরিক্ত কোনো সুবিধা গ্রহণের অনুমতি নেই। দুই, কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের আবাসিক সুবিধা ও চাকর প্রাপ্য। তার যদি বাসস্থান না থাকে তবে যতোদিন এই কাজে নিয়োজিত থাকবে ততোদিনের জন্য একটা বাড়ি তার জন্য ভাড়া করা হবে। চাকর না থাকলে তার জন্য চাকর নিয়োগ করা হবে এবং চাকরের জন্য পর্যাপ্ত মজুরীর ব্যবস্থা করা হবে।

৪. যাদের হৃদয় জয় করা প্রয়োজন : তফসীর আল মানারে এই গোষ্ঠীর পরিচয় নিম্নরূপ তুলে ধরা হয়েছে : এরা হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠী, যাদের মনকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট ও ভালোবাসায় সিক্ত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হয় এবং তাদেরকে ইসলামের উপর সমবেত করা ও মজবুত করার প্রয়োজন হয়। ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যের দুর্বলতার কারণে যাকাতের একটি অংশ দিয়ে এটা করার প্রয়োজন হয়। এ দ্বারা তাদের ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করা কিংবা মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় তাদের সেবা গ্রহণ করাও কাম্য হয়ে থাকে। ফকীহগণ এই গোষ্ঠীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন- মুসলমান ও কাফির।

মুসলমানরা আবার চার রকমের :

১. মুসলমানদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয়, যেমন আবু বকর রা. আদী বিন হাতেমকে ও যাবারকান বিন বদরকে দিয়েছিলেন। অথচ তাদের ইসলামে কোনো দুর্বলতা ও ত্রুটি ছিলোনা। এর কারণ ছিলো, তাদের গোত্রে তাদের বিশেষ মর্যাদা।

২. দুর্বল মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা নিজ নিজ গোত্রে ও গোষ্ঠিতে যথেষ্ট মান্য গণ্য। তাদেরকে যাকাতের অংশ দিয়ে ইসলামের উপর তাদের অবিচলতা, ঈমানী দৃঢ়তা ও জিহাদ ইত্যাদিতে তাদের সমর্থন ও শুভাকাঙ্ক্ষা নিশ্চিত করাই উদ্দেশ্য। বনু হাওয়াযেনের গনীমত থেকেও রসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী একদল মক্কাবাসীকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে মুনাফিকও ছিলো, দুর্বল ঈমানধারী মুসলমানও ছিলো। যাকাতের এই খাতের উপহারাদি পেয়ে তাদের বেশির ভাগের ঈমান মজবুত হয়েছিল এবং তারা ভালো মুসলমান হয়েছিল।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের ও শত্রু রাষ্ট্রের সীমান্তের কাছাকাছি বসবাসকারী একদল মুসলমান। শত্রুর আক্রমণের সময় তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের আশায় তাদেরকে এটা দেয়া হয়। তফসীর আল মানারের লেখক বলেন : আমি মনে করি, এটাই কুরআনে উল্লিখিত মুরাবাতা বা প্রতিরক্ষা। এই ফকীহগণ এটাকে এই খাতকে 'আল্লাহর পথ', শীর্ষক খাতের আওতাভুক্ত করেছেন। এ দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধই বুঝানো হয়েছে। আমাদের যুগে মুসলমানদের সেই গোষ্ঠীটিরই হৃদয় আকর্ষণ অগ্রগণ্য, যাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য কাফিররা চেষ্টা চালায় যাতে তারা তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। অথবা কমপক্ষে তাদের সমর্থক হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলমানদেরকে নিজেদের গোলামে পরিণত করা ও তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের দেশের সম্পদের একটা অংশ বরাদ্দ করছে, যাতে মুসলমানদের মনকে আকৃষ্ট ও জয় করতে পারে। তাদের কেউবা মুসলমানদেরকে সরাসরি খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা ও ইসলাম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত। কেউবা তাদেরকে শুধু তাদের সমর্থক বানানো, মুসলিম দেশগুলোর শত্রু বানানো ও ইসলামী

ঐক্য বিনষ্ট করার কাজে ব্যবহার করতে চায়। এমতাবস্থায় এই মুসলমানদেরক বিধর্মীদের হীন ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেয়া থেকে রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুসলমানদের অধিকতর জরুরি কর্তব্য নয় কি?

৪. মুসলমানদের মধ্যে হতে এমন কোনো গোষ্ঠী, যাকাত আদায়ের জন্য যাদের সাহায্য সহযোগিতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রয়োজন হতে পারে। যারা যুদ্ধ ছাড়া যাকাত দিতে রাজি হয়না, তাদের কাছ থেকে এই প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজেদের প্রতিপত্তি ও দাপট দ্বারা যাকাত আদায় করিয়ে দিতে পারে। সরকারকে এই সাহায্য করা তাদের পক্ষে অধিকতর কম ক্ষতিকর ও বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিকতর অগ্রাধিকার যোগ্য। যাকাতের খাত থেকে অনুদান দিয়ে এ ধরনের গোষ্ঠীর সহায়তা লাভ করা যায়।

পক্ষান্তরে কাফিরদের মধ্যে যাদের হৃদয় জয় ও আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তারা দু'প্রকারের :

১. যাদেরকে অনুদান দিয়ে হৃদয় জয় করলে তারা মুসলমানও হয়ে যেতে পারে এরূপ আশা করা যায়। যেমন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, যাকে রসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ের দিন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন এবং তাকে চার মাস সময় দিয়েছিলেন, যাতে এই সময়ের মধ্যে সে নিজের কী করণীয় ভেবে দেখতে ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে পলাতক ছিলো, নিরাপত্তা পেয়ে উপস্থিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণের আগেই হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যোগ দিলো। রসূল সা. যখন হুনাইন অভিযানে বের হন, তখন তার কাছ থেকে তার অস্ত্রশস্ত্র ধার নিয়েছিলেন। রসূল সা. তাকে একটা উপত্যকায় বিচরণরত বিপুল সংখ্যক ভারবাহী উট দান করলেন। এগুলো পেয়ে সে বললো : "এ হলো সেই মহানুভব ব্যক্তির দান যিনি দারিদ্র্যের ভয় করেননা। রসূলুল্লাহ সা. আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃনিত ব্যক্তি ছিলেন। তথাপি তিনি আমাকে এগুলো দান করলেন এবং দান করতেই থাকলেন। এর ফলে এখন তিনি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।"

২. যার বা যাদের পক্ষ থেকে ক্ষতিকর তৎপরতার আশংকা করা হয়। তাকে বা তাদেরকে যাকাত দিলে তাদের ক্ষতিকর তৎপরতা বন্ধ হবে বলে আশা করা যায়। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এক শ্রেণীর লোক আসতো। তিনি যদি তাদেরকে কিছু দিতেন, তবে তারা ইসলামের প্রশংসা করতো। আর না দিলে নিন্দা ও সমালোচনা করতো। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারব, আকরা বিন হাবিস ও উয়াইনা বিন হিসন ছিলেন এই শ্রেণীর লোক। এদের প্রত্যেককে রসূলুল্লাহ সা. একশটি করে উট দিয়েছিলেন।

হানাফিদের মত হলো, হৃদয় আকৃষ্ট করার খাত রহিত হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী ও পরাক্রমশালী করেছেন। উয়াইনা ইবনুল হিসন, আকরা বিন হাবিস ও আব্বাস বিন মিরদাস আবু বকরের কাছে এসে তাদের হিসসা চেয়েছিলেন, আবু বকর তাাদেরকে তাদের হিসসা দেয়ার চিঠি লিখে দিলেন। তারা উমরের নিকট এলো এবং ঐ চিঠি দিলো। কিন্তু তিনি দিতে অস্বীকার করলেন ও চিঠি ছিড়ে ফেললেন। উমর রা. বললেন : এটা রসূলুল্লাহ সা. তোমাদেরকে দিতেন তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। এখন ইসলাম তোমাদের মুখাপেক্ষী নয়। এখন তোমরা যদি ইসলামের উপর অবিচল থাকো, তবে ভালো? নচেত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে তলোয়ার দ্বারা ফায়সালা হবে। অতপর এ আয়াত পড়লেন : وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.

"হে নবী! বলে দিন, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই সত্য এসেছে। যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা কুফরী করুক।" (সূরা কাহফ : আয়াত ২৯)

এরপর তারা পুনরায় আবু বকরের নিকট গেলো। তাকে বললো : খলীফা কি আপনি না উমর? আপনি আমাদেরকে চিঠি দিলেন, সে চিঠি উমর ছিড়ে ফেললো।" আবু বকর বললেন : সে ইচ্ছা করলে এটা করতেই পারে।

হানাফিগণের যুক্তি হলো : আবু বকর উমরের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন। আর কোনো সাহাবি এ ফায়সালায় আপত্তি জানায়নি। এমনকি উসমান এবং আলীও নয়। এর জবাবে বলা হয় এটা উমরের ইজতিহাদ। (স্বাধীন বিচার বিবেচনা প্রসূত, অভিমত) তিনি মনে করেছেন, ইসলাম তাদের গোত্রগুলোতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদেরকে দেয়ার আর প্রয়োজন নেই। তারা ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়ে গেলেও কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। আর উসমান ও আলী এই খাত থেকে যাকাত না দেয়া দ্বারা হৃদয় আকৃষ্ট করার খাত রহিত হওয়ার হানাফি অভিমত প্রমাণিত হয়না। উসমান ও আলীর আমলে কাফিরদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন ছিলোনা বলেও তারা এ খাতে যাকাত না দিয়ে থাকতে পারেন। এর দ্বারা এ খাতের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন প্রমাণ করেনা। কোনো শাসকের আমলে এর প্রয়োজন দেখা দিলেও দিতে পারে। সর্বোপরি প্রমাণ দর্শানোর জন্য কুরআন ও সুন্নাহই সর্বোত্তম সনদ। এ দুটো এমন উৎস, যা থেকে কোনো অবস্থায়ই সরে যাওয়ার অবকাশ নেই। -আহমদ ও মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের শর্তে যা কিছুই চাওয়া হতো তাই দিতেন। যেমন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে কিছু চাইলো। তিনি দুই পাহাড়ের মাঝখানে বিচরণশীল যাকাতের ছাগল থেকে বিপুল সংখ্যক ছাগল তাকে দিলেন। সে তার গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে বললো : হে আমার গোত্র, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ মুহাম্মদ এমন মুক্ত হস্তে দান করেন যে, নিজের অভাবে পড়ার আশংকাকেও পাত্তা দেননা।

শওকানির মতে, হৃদয় আকৃষ্ট করার খাতে যাকাত দেয়া বৈধ। এ মত পোষণ করেন ইতরা, জিবাই, বলখী, ইবনে মুবাশশির, মালেক, আহমদ ও এক বর্ণনা অনুসারে শাফেয়ীও।

শাফেয়ী বলেছেন : কোনো কাফিরের হৃদয় আকৃষ্ট করোনা। তবে গুনাহগার মুসলমানকে হৃদয় আকৃষ্ট করণের খাত থেকে দেয়া যেতে পারে।

আবু হানিফা ও তার শিষ্যরা বলেন : ইসলামের বিস্তৃতি ও বিজয় দ্বারা এ খাত রহিত হয়ে গেছে। আবু সুফিয়ান, উয়াইনা, আকরা ও আব্বাস বিন মিরদাসকে যাকাত দিতে আবু বকরের অস্বীকৃতিকে তারা তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।

তবে ধ্রুব সত্য হলো, যখন প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন হৃদয় আকর্ষণের খাতে যাকাত দেয়া জায়েয হবে। যখন দেখা যাবে, একটি দল বা গোষ্ঠী পার্থিব স্বার্থের খাতিরে ছাড়া ইসলামী সরকারকে মানেই না এবং সরকার তাদেরকে বলপ্রয়োগ ব্যতিত আর কোনো উপায়ে আনুগত্যের অওতায় আনতে সক্ষম হয়না, তখন সরকার যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিস্তৃতি বাধা হবেনা কেননা এরূপ ক্ষেত্রে ইসলামের বিস্তৃতি ফলদায়ক হয়না।

তফসীর আল-মানারে বলা হয়েছে : সামগ্রিকভাবে এটাই সঠিক মত। বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে কেবল উপযোগিতা অনুসারে, যাকাতের প্রদেয়ের পরিমাণ নির্ণয়ে এবং গনীমত ইত্যাকার জনকল্যাণমূলক সম্পদ থাকলে তার পরিমাণ নির্ণয়েই ইজতিহাদ সীমিত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার পরামর্শ ও মতামত অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খলিফাগণও ইজতিহাদী বিষয়গুলোতে পরামর্শক্রমে ফায়সালা করতেন। হৃদয় আকর্ষণের খাতিরে যাকাত প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক বলপ্রয়োগে অবদ্ধ লোকদেরকে অনুগত করার ব্যাপারে অক্ষমতার

শর্ত আরোপ কতোটা যৌক্তিক তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কেননা এটা কখানো স্থায়ী হয়না। বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর ও অধিকতর কল্যাণকর ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দান।

৫. দাসমুক্তকরণ

ক্রীতদাস চুক্তিবদ্ধরাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যাকাতের অর্থ দ্বারা এদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করা হবে। এ অর্থ দ্বারা গোলামদেরকে মুক্ত করে স্বাধীন করে দেয়া হবে।

বারা রা. থেকে বর্ণিত : "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এলো এবং বললো : আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে ও জাহান্নাম থেকে দূরে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন : দাসমুক্ত করো ও পরাধিনতা দূর করো। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ, এ দুটো এক নয় কি? তিনি বললেন : না দাসমুক্ত করার অর্থ তুমি এককভাবে কোনো গোলামকে মুক্ত করে দেবে। আর পরাধিনতা দূর করার অর্থ হলো, তুমি দাসত্বের মূল্য দিয়ে অর্থাৎ মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভে সাহায্য করবে। -আহমদ, দারু কুতনি।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব, আল্লাহর পথে যুদ্ধরত ব্যক্তি, নিজের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ সংগ্রহে সচেষ্ট ব্যক্তি, নিজের সততা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিয়ে করার উদ্যোগ গ্রহণকারী ব্যক্তি। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ, তিরমিযি এটাকে বিশুদ্ধ ও ভালো আখ্যায়িত করেছেন।

শওকানি বলেছেন : কুরআনে যে 'দাসমুক্ত করনে' বলা হয়েছে, এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আলী ইবনে আবি তালেব, সাঈদ বিন জুবাইর, লাইছ, ছাওরী , ইতরা, হানাফিগণ, শাফেয়ীগণ ও অধিকংশ আলেম বলেছেন : এ দ্বারা মুকাতাব অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হবার জন্যে চুক্তিবদ্ধদের বুঝানো হয়েছে। যাকাত দিয়ে তাদের মুক্তিপণ প্রদানপূর্বক মুক্তি অর্জনে সাহায্য করা হবে। আর ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, মালেক, আহমদ বিন হাম্বল, আবু ছাওর, আবু উবাইদ, ইবনুল মুনযির এবং বুখারি বলেন : এর অর্থ হলো, দাসদেরকে মুক্ত করার উদ্দেশে ক্রয় করা। তারা আরো বলেছেন : এ দ্বারা যদি শুধু মুকাতাবদেরকে বুঝানো হতো, তাহলে তারা তো ঋণগ্রস্তের খাতের আওতায় চলে আসতো। কেননা মুকাতাব তো ঋণগ্রস্ত। তাছাড়া মুক্ত করার জন্য দাস খরিদ করা মুকাতাবকে সাহায্য করার চেয়ে শ্রেয়। কেননা মুকাতাবকে সাহায্য করা হলেও তাকে স্বাধীন করা নাও হতে পারে। কেননা একটা টাকাও বাকি থাকা পর্যন্ত সে দাস থেকে যায়। তাছাড়া ক্রয় করা সব সময়ই সম্ভব। মুকাতাব হওয়া সব সময় সম্ভব নয়।

যুহরী বলেছেন : দাস ও মুকাতাব উভয়ই এর আওতাধীন। মুনতাকাল আখবার গ্রন্থের লেখক এদিকেই ইংগিত করেছেন। এটাই অধিকতর স্পষ্ট। কেননা আয়াতে দুটোই অন্তর্ভুক্ত।

আর বারার হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, স্বাধীনতায় সাহায্য করা ও স্বাধীন করা এক কথা নয়। হাদিস থেকে আরো জানা গেছে, দাস মুক্ত করা ও মুকাতাবকে মুক্তিপণ সংগ্রহে সাহায্য করা জান্নাতের কাছে নিয়ে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া কাজগুলোর অন্যতম।

৬. ঋণগ্রস্ত

যারা ঋণভারে জর্জরিত এবং পরিশোধ করতে অক্ষম, এদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে : যেমন কোনো জরিমানা, রক্তপণ বা অন্য কোনো ঋণের দায়গ্রস্ত। কারো ঋণের যামিন হওয়া এবং সেই ঋণের দায় নিজের সম্পদ দিয়ে পরিশোধ করতে গেলে নিজের সমস্ত সম্পদ খোয়ানোর ঝুঁকির সম্মুখীন অথবা খুইয়ে ফেলে পুরোপুরি পরিশোধ করতে পারেনি এমন ব্যক্তি,

অথবা তার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করেছে, অথবা কোনো গুনাহ্ থেকে তওবা করেছে এবং তার কাফফারা দেয়ার জন্য ঋণের মুখাপেক্ষী। এই সকল ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত থেকে সাহায্য নিতে পারবে।

১. আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সাহায্য প্রার্থনা করা কেবল তিন ব্যক্তির জন্য বৈধ : যে ব্যক্তি এতো কঠিন অভাবে জর্জরিত যে, এক টুকরো উদ্ভিদশূন্য ভূমি ছাড়া তার আর কিছু নেই। অন্যায়ভাবে ও কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই জবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেয়া কোনো অর্থদণ্ডে দিশেহারা ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি, যে এমন কোনো নিকটাত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে রক্তপণ দিয়ে বাঁচাতে উদগ্রীব, যে কাউকে হত্যা করেছে এবং তার রক্তপণ না দিলে তাকে হত্যা করা হবে, যা তার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে।

২. মুসলিম আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর আমলে কিছু শস্য কিনে খুবই ফাঁপরে পড়ে গেলো। সে অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লো। রসূল সা. মুসলমানদেরকে বললেন : তোমরা এই ব্যক্তিকে যাকাত সদকা দাও। লোকেরা যাকাত সদকা দিলো। কিন্তু তাতেও তার ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ হলোনা। রসূলুল্লাহ সা. তার পাওনাদারদের বললেন : তোমরা যতোটুকু পেয়েছো ততোটুকুই নিয়ে নাও। এর অতিরিক্ত আর কিছু তোমরা পাবেনা। (অর্থাৎ এখন যা তার কাছে আছে, আপাতত তার বেশি তোমরা পাওয়ার অধিকারী নও এবং যতোক্ষণ সে অভাবগ্রস্ত থাকবে ততোক্ষণ তোমরা তাকে আটক করতে পারবেনা। কাজেই এ হাদিসে পাওনাদারদের অবশিষ্ট পাওনা বাতিল করা হয়নি।)

৩. কুবাইসা ইবনে মুখারিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি একটা 'হুমালা' (দায়) ঘাড়ে নিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন : তুমি এখানে অবস্থান করো, যতোক্ষণ না আমাদের নিকট কোনো যাকাত আসে এবং তা থেকে তোমাকে কিছু দিতে আদেশ দেই।

আলেমগণ বলেছেন : 'হুমালা' হলো এমন কোনো দায়, যা কোনো মানুষ বহন করে এবং ঋণ স্বরূপ নিজের ঘাড়ে নেয়। কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তা দেয়। আরবদের মধ্যে যখন কোনো গোলযোগ হতো, যাতে কোনো রক্তপণ বা অন্য কিছু বাবদ জরিমানা প্রদানের প্রয়োজন হতো এবং তার ফলে উক্ত গোলযোগের অবসান ঘটতো। এটা যে একটা মহৎ চারিত্রিক গুণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জনসাধারণ যখন জানতো তাদের কেউ 'হুমালা' গ্রহণ করেছে, তখন তাকে সাহায্য করার জন্য সবাই ছুটে যেতো এবং তাকে এতোটা সাহায্য দিতো, যা দ্বারা সে উক্ত দায় থেকে মুক্ত হতে পারে। এ ধরনের হুমালা বা দায় গ্রহণকারী নিজে যদি মানুষের কাছে সাহায্য চাইতো, তবে তাকে কেউ দূষণীয় নয় বরং গর্বের বিষয় মনে করতো। এ ধরনের দায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যাকাত নেয়া বৈধ। এ ক্ষেত্রে যাকাত নেয়ার জন্য আর্থিক অসামর্থ্য শর্ত নয়। বরং আর্থিক সামর্থ্য থাকলেও যাকাত নেয়া যাবে।

৭. আল্লাহ্ পথে

আল্লাহর পথ অর্থ আল্লাহর সন্তোষ লাভের পথ, চাই তা ইসলামি জ্ঞানর্জ্জন হোক অথবা ইসলামের কোনো কাজ হোক। অধিকাংশ আলেমের মতে, এ দ্বারা ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধ করা বুঝায়। যারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যায় অথচ তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো নিয়মিত বেতন দেয়া হয়না, তাদেরকে এই খাতের যাকাতের অর্থ দেয়া হয়। তারা ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, তারা যাকাতের অংশ পাওয়ার অধিকারী। ইতিপূর্বে রসূলুল্লাহর হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে,

যাতে তিনি বলেছেন : যাকাত কোনো ধনীর জন্য হালাল নয়, কেবল পাঁচজন ব্যতিত আল্লাহর পথে যুদ্ধরত... ।"

হজ্জ আল্লাহর পথের এমন কোনো কাজ নয় যাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়। কেননা ওটা প্রয়োজনীয় আর্থিক সচ্ছলতার অধিকারী মানুষের উপরই ফরয, অন্য কারো উপর নয়।

তফসীর আল মানারে বলা হয়েছে : "হজ্জে আসা যাওয়ার পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত" করার কাজে এবং হাজিদের জন্য পানি, খাদ্য ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করার কাজে এই খাত থেকে ব্যয় করা যায় যদি তা ব্যয় করার মতো আর কিছু না থাকে। 'আল্লাহর পথ'-এ খাতটিতে ইসলামের সার্বিক স্বার্থ ও কল্যাণ সংক্রান্ত সেসব কর্মকাণ্ডই অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদি কাজ। তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগণ্য যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড, যথা অস্ত্র ক্রয়, সৈন্যদের খাদ্য, পরিবহন, সরঞ্জাম সংগ্রহ ও যোদ্ধাদেরকে লড়াই এর জন্য সজ্জিত করা। তবে যোদ্ধাদেরকে সরবরাহকৃত সরঞ্জাম যুদ্ধের পর সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতে হবে, যদি তা স্থায়ী জিনিস হয়। যেমন অস্ত্র ও ঘোড়া ইত্যাদি। কেননা এসব জিনিস শুধু যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় বিধায় কোনো যোদ্ধা স্থায়ীভাবে এর মালিক হয়না। বরং সে এগুলো আল্লাহর পথের যোদ্ধা হিসেবে ব্যবহার করে এবং যুদ্ধ শেষ হবার পরও সেগুলো আল্লাহর পথের বহাল থাকে। পক্ষান্তরে দরিদ্র যাকাত বিভাগের কর্মচারি ঋণগ্রস্ত যার চিত্ত আকর্ষণ কাম্য ও মুসাফির- এসব লোক ঠিক এর বিপরীত। তারা যা নিয়েছে, তা তাদেরকে আর কখনো ফেরত দিতে হবেনা যদিও তার দারিদ্র্য দূর হয়ে যায় এবং যাকাত বিভাগে কর্মরত না থাকে, ঋণগ্রস্ত না থাকে, চিত্ত আকর্ষণের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় ও মুসাফির স্বগৃহে ফিরে। এই খাত এতো ব্যাপক যে, সামরিক হাসপাতাল ও সাধারণ হাসপাতাল নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, সামরিক রেলপথ নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, যুদ্ধ বিমান সংগ্রহ, দুর্গ ও পরিখা নির্মাণ এর আওতাধীন । তবে বাণিজ্যিক রেলপথ নির্মাণ এর আওতাভুক্ত নয়।

আমাদের যুগে আল্লাহর পথে ব্যয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো ইসলাম প্রচারক তৈরি করা ও তাদেরকে অমুসলিম দেশে প্রেরণ। সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদেরকে পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা দিয়ে পাঠাবে। যেমন অমুসলিমরা তাদের ধর্ম প্রচারের খাতিরে করে থাকে। ইসলামি শিক্ষা ও জনস্বার্থ ও জনকল্যাণমূলক অন্য যে কোনো শিক্ষা বিতরণ করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানাদিতে ব্যয়ও এই খাতের আওতাভুক্ত। এ ক্ষেত্রে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যতোক্ষণ শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে অন্যান্য পেশা দ্বারা অর্থোপার্জন করতে অক্ষম থাকে, ততোক্ষণ তাদেরকে এই খাত থেকে বেতন ভাতাদি দেয়া হবে। তবে কোনো ধনী আলেমকে তার জ্ঞান বিতরণের জন্য দেয়া হবেনা যদিও তিনি জনগণকে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করেন।

৮. মুসাফির

আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন : যে পথিক নিজের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাকে তার সফরের উদ্দেশ্য সফল করতে সহায়ক হয় এমন সাহায্য যাকাত থেকে দেয়া যাবে- যখন তার নিজের অর্থ সম্পদ হস্তগত করা সম্ভব না হয়। কেননা এরূপ অবস্থায় সে সাময়িকভাবে দরিদ্রে পরিণত হয়। তবে শর্ত হলো, তার সফর সৎকাজের উদ্দেশ্য হওয়া চাই। অন্তত গুনাহর কাজের উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। বৈধ সফর নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ীর মতে সর্বোত্তম মত হলো, সে যদি নিছক বিনোদনমূলক সফরে যায়, তাহলেও যাকাত নিতে পারবে।

শাফেয়ীদের নিকট মুসাফির দু'রকমের :

১. যে ব্যক্তি তার আবাসিক এলাকা থেকে বের হয়, যদিও নিজে দেশেই থাকে।
২. স্বদেশ অতিক্রম করে বিদেশে সফরকারী।

উভয়েরই যাকাত গ্রহণের অধিকার রয়েছে চাই তার প্রয়োজন পূরণ হয় এমন অর্থ তাকে কেউ ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকে এবং স্বদেশে তার উক্ত ঋণ পরিশোধ করার মতো সম্পদ থেকে থাকে। ইমাম মালেক ও আহমদের মতে, কেবল স্বদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া প্রবাসীই যাকাত নিতে পারবে। নিজ দেশে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সফরকারী নয়। যাকে ঋণ দেয়ার মতো কোনো লোক প্রবাসে পাওয়া যায় এবং তার ঋণ পরিশোধ করার মতো সম্পদ স্বদেশে আছে, তাকে যাকাত দেয়া যাবেনা। ঋণদাতা না পাওয়া গেলে কিংবা ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য তার না থাকলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

যাকাত পাওয়ার অধিকারী কতককে বা সকলকে যাকাত প্রদান : আয়াতে যাকাত পাওয়ার অধিকারী যে আটটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলো : দরিদ্র, মিসকীন, যাকাত বিভাগের কর্মচারি যাদের চিত্তাকর্ষণ কাম্য, দাসদাসী মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, পথিক ও আল্লাহর পথের মুজাহিদ। এদেরকে যাকাত প্রদান সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও তার শিষ্যগণের মতে, মালিক স্বয়ং বা তার প্রতিনিধি যাকাত বণ্টন করলে যাকাতের কর্মচারির খাত রহিত হবে এবং অবশিষ্ট সাতটি খাত যদি বিদ্যমান থাকে তবে তাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। নচেত যে কয় খাতের লোক পাওয়া যায় তাদেরকেই দেয়া হবে। কোনো খাতের লোক থাকা সত্ত্বেও তাকে বাদ দেয়া বৈধ নয়। বাদ দেয়া হলে তার অংশ দেয়ার দায়িত্ব মালিকের ঘাড়ে থেকে যাবে। ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন : যাকাতের সামগ্রি যদি অনেক হয়, তবে সকল খাতে ভাগ করে দিতে হবে। আর যদি কম হয় তাহলে একটি খাতেও দেয়া যাবে। আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন : সকল খাতে বণ্টন করাই অগ্রগণ্য। তবে এক খাতে দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ইমাম মালেক বলেছেন : কোন্ শ্রেণীর লোকদের বেশি প্রয়োজন তা তদন্ত করে দেখতে হবে। যাদের বেশি প্রয়োজন, পর্যায়ক্রমে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে- দরিদ্র ও অভাব অনটনের তীব্রতা অনুসারে। কোনো বছর যদি দরিদ্রদের চাহিদা বেশি থাকে তবে সেই বছর তাদেরকে, অন্য বছর যদি পথিক ও মুসাফিরদের চাহিদা বেশি থাকে তবে সে বছর তাদেরকে অগ্রধিকার দেয়া হবে। হানাফিগণ ও সুফিয়ান ছাওরী বলেছেন : যাকাতদাতা যে কোনো শ্রেণীকে দিতে পারে। হুযায়ফা, ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও আতা বিন আবি রাবাহর মতও তদ্রূপ। আবু হানিফা বলেন, যে কোনো এক শ্রেণীর এক ব্যক্তিকেও সমুদয় যাকাত দেয়া যায়।

মতভেদের কারণ : ইবনে রুশদ বলেছেন, আলেমদের মতভেদের কারণ হলো, শব্দগত ও মর্মগত তাৎপর্যের ব্যাখ্যাগত বিভিন্নতা। শব্দগত দিক দিয়ে আয়াত দাবি জানায় যাকাত সকল শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হোক। পক্ষান্তরে মর্মগত দিক দাবি জানায় যাদের প্রয়োজন বেশি তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হোক। কেননা যাকাতের উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য ও অভাব মোচন। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে আয়াতে যে আটটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য দাঁড়ায় শ্রেণীগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে পরচিত করা- সকলকে এক সাথে যাকাতের মধ্যে শরিক করা নয়। প্রথমোক্ত বক্তব্য শব্দগতভাবে অধিকতর স্পষ্ট, আর দ্বিতীয়টি মর্মগতভাবে অধিকতর স্পষ্ট।

ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হলো আবু দাউদে সাদায়ী থেকে বর্ণিত হাদিস : "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট যাকাত প্রার্থনা করলো। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : আল্লাহ

তায়ালা চাননি কোনো নবী বা অন্য কেউ যাকাত সম্পর্কে ফায়সালা করুক। তাই তিনি নিজেই এ ব্যাপারে ফায়সালা করেছেন এবং একে সাতটি খাতে বণ্টন করেছেন। তুমি যদি সেই খাতগুলোর আওতাভুক্ত হয়ে থাকো, তাহলে আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্য দেবো।"

শাফেয়ীর মতের উপর অধিকাংশের মতের অগ্রগণ্যতা : 'আর রওদাতুন নাদিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে : সমুদয় যাকাত একটি খাতে বণ্টন যাকাত সংক্রান্ত বাণীসমূহের বিশ্লেষণ থেকে অধিকতর উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রতীয়মান হয়। মোটকথা, আল্লাহ্‌ তায়ালা যাকাতকে উল্লিখিত আটটি শ্রেণীর সাথে সংশ্লিষ্ট ও তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এদের বাইরে অন্য কাউকে যাকাত দেয়া যাবেনা। আর এই আট শ্রেণীর জন্য এটিকে নির্দিষ্ট করার অর্থ এ নয়, তাদের সকলের মধ্যে সমভাবে যাকাত বণ্টন করতে হবে। যাকাত সামগ্রি কম হোক বা বেশি হোক, সবাইকে তার কিছু না কিছু দিতে হবে এটাও নয়। বরং এর অর্থ হলো, সামগ্রিকভাবে যাকাত এই শ্রেণীগুলোর জন্য। যার উপর কোনো ধরনের যাকাত ফরয হবে, সে এই শ্রেণীগুলোর যে কাউকে দিলেই তার আল্লাহর হুকুম পালন করা হয়ে যাবে এবং আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। যদি বলা হয় : সম্পদের অধিকারী যখন যাকাত যোগ্য কোনো সম্পদে অধিকারী হয়, তখন তা উক্ত আট শ্রেণীর সকলের মধ্যে বণ্টন করা জরুরি যদি সকল শ্রেণী বিদ্যমান থাকে, তাহলে এটা একদিকে যেমন অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ হবে, অন্যদিকে তেমনি এটা হবে, অতিতে সকল মুসলমানদের অনুসৃত কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সকল শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করলে কখনো কখনো প্রাপ্ত জিনিস এতো তুচ্ছ পরিমাণ হতে পারে যে, এক ধরনের হলেও প্রত্যেক শ্রেণী তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবেনা। একাধিক ধরনের হলে তো উপকৃত হওয়া আরো কঠিন হবে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো, রসূলুল্লাহ সা. সালমা বিন সাখরকে যেভাবে সমগ্র বনী যিরবিকের যাকাত নিয়ে তা দ্বারা তার কাফফারা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে তা দ্বারা সকলকে যাকাত দেয়ার অপরিহার্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রত্যেক ধরনের যাকাতকে সকল শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা জরুরি, এমন কোনো উক্তি কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। সেই হাদিসটি দ্বারাও এ মতের সপক্ষে প্রমাণ দেয়া সম্ভব নয় যাতে রসূলুল্লাহ সা. মুয়াযকে আদেশ দিয়েছেন যেনো ইয়ামানের ধনাঢ্যদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তা তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে। কেননা সেটিও মুসলমানদের একটি দলের যাকাত, যা সামগ্রিকভাবে আটটি শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। যিয়াদ বিন হারেস সাদায়ীর হাদিসও অদ্রূপ। তিনি উপরোক্ত হাদিসের উল্লেখ করে বলেন : উক্ত হাদিসের সনদে রয়েছে আবদুর রহমান যিয়াদ আল আফরিকী যাকে নিয়ে একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। আর যদি ধরেও নেয়া হয়, উক্ত হাদিস প্রমাণ দর্শানোর যোগ্য, তথাপি যাকাতকে বিভক্ত করার অর্থই হলো যাকাত ব্যয়ের খাতগুলোকে বিভক্ত করা। সূরা তাওবার সেই আয়াতটির সুস্পষ্ট বক্তব্যও অবিকল। তাই সে আয়াতের দিকে রসূলুল্লাহ সা. ইংগিত করেছেন। (অর্থাৎ যে আয়াতে যাকাত ব্যয়ের আটটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে।) আর যদি উক্ত হাদিস দ্বারা যাকাতের বিভক্তিই বুঝানো হতো এবং যাকাতের কোনো অংশই নির্দিষ্ট খাতে ছাড়া ব্যয় করা জায়েয নয়, এমনটি বুঝানো হতো, তাহলে যে খাতের লোকের অস্তিত্বই নেই, সে খাতের যাকাত অন্য খাতে ব্যয় করাই বৈধ হতোনা। অথচ এটা মুসলমানদের এজমা তথা সর্বসম্মত মতের বিপরীত।

তাছাড়া অনুরূপ ব্যাখ্যা যদি মেনেও নেয়া হয়, তবে তা বিবেচিত হবে সরকারের নিকট আদায় হওয়া সমগ্র যাকাতের হিসেবে, প্রত্যেক খাতের যাকাতের হিসেবে নয়। সুতরাং প্রত্যেক খাতে আলাদাভাবে যাকাত বিলি করার অপরিহার্যতা সাব্যস্ত করার মতো কোনো প্রমাণ নেই। বরং কিছু খাতে কিছু যাকাত দেয়া ও অন্য কিছু খাতে অন্য কিছু যাকাত দেয়া জায়েয। অবশ্য যখন

কোনো দেশের সরকার সেই দেশের সমস্ত যাকাত একত্রিত করে এবং তার কাছে আটটি খাতেরই মানুষ প্রার্থী হয়। তখন আল্লাহর ধার্য করা অংশ পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক খাতের মানুষেরই থাকবে। প্রত্যেক খাতের মধ্যে সমপরিমাণে বন্টন করা সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক হবেনা এবং প্রত্যেক খাতের মানুষকেই কিছু না কিছু দিতেই হবে এটাও জরুরি নয়। বরং সরকার এক খাতে অন্য খ্যাতের চেয়ে বেশি এমনকি এক খাতকে একেবারে বাদ দিয়ে অন্য খাতে বন্টন করতেও পারবে- যদি তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ দেখতে পায়।

উদাহরণ স্বরূপ, সরকারের নিকট যাকাত জমা হয়েছে, সহসা জিহাদ শুরু হয়ে গেলো এবং কাফির ও বিদ্রোহিদের আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিলো। এমতাবস্থায় জিহাদরতদের খাতে ব্যয় করে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া জায়েয, এমনকি সমস্ত যাকাতও যদি এই একটি খাতেই ব্যয় করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অনুরূপ যখন জিহাদরতদের ছাড়া অন্য কোনো খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া বৃহত্তর স্বার্থে অপরিহার্য হয়ে পড়ে তখন সে খাতেই ব্যয় করা যাবে। এটাই সর্বাধিক অগ্রগণ্য মত।

৪৮. যাদের যাকাত দেয়া বা নেয়া বৈধ নয়

এ পর্যন্ত আমরা যাকাত বন্টনের খাত ও যাকাত পাওয়ার অধিকারীদের বিবরণ দিলাম। অবশিষ্ট রয়েছে সেসব শ্রেণীর বিবরণ যাদের জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয় এবং যারা যাকাত পাওয়ার অধিকারী নয়। তারা হলো :

১. কাফির ও নাস্তিক : এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। কেননা হাদিসে বলা হয়েছে : "তাদের ধনিদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" এ হাদিসে মুসলিম ধনী ও মুসলিম দরিদ্রদের বুঝানো হয়েছে- অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী ধনী দরিদ্রকে নয়। ইবনুল মুন্‌যির বলেছেন : যে সকল আলেমের কথা আমার মনে পড়ে, তাদের সকলেই একমত, অমুসলিদেরকে যাকাতের কোনো অংশ দেয়া যাবেনা। তবে আগেই যেমন বলেছি, যে সকল অমুসলিমের হৃদয় আকৃষ্ট করা কাম্য তারা এর ব্যতিক্রম। তাদেরকে যাকাত ব্যতিত নফল সদকা দেয়াও বৈধ। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا .

"তারা আল্লাহর প্রেমে মিসকীন, এতীম ও বন্দিদেরকে খাদ্য খাওয়ায়।" (সূরা দাহর : আয়াত ৮)

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে : "তোমার মার সাথে সদাচরণ করো।" অথচ তার মা মুশরিক ছিলো।

২. বনু হাশেম

এ দ্বারা আলী, আকীল, জাফর, আব্বাস ও হারেসের বংশধরদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে কুদামা বলেছেন : বনু হাশেমের জন্য যে যাকাত হালাল নয়, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "মুহাম্মদের বংশধরের জন্য যাকাত সমীচীন নয়। যাকাত হচ্ছে মানুষের ময়লা বা বর্জ্য।" সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : "হাসান যাকাতের খোরমা থেকে একটা খোরমা হাতে নিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সা. তৎক্ষণাৎ বললেন : ফেলে দাও, ফেলে দাও। তুমি কি জানোনা আমরা যাকাত সদকা খাইনা?" -বুখারি, মুসলিম। বনু মুত্তালিব-এর ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ীর মতে, বনু হাশেমের মতো

তাদেরও যাকাত নেয়া জায়েয নয়। শাফেয়ী, আহমদ ও বুখারি জুবাইর বিন মুতয়িম থেকে বর্ণনা করেছেন : খয়বরের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সা. আত্মীয়দের অংশ বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের মধ্যে বন্টন করলেন এবং বনু নাওফেল ও বনু আবদ শামসকে দিলেননা। তাই আমি ও উসমান বিন আফফান রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং বললাম : হে রসূল! বনু হাশেমের সেই মর্যাদা অস্বীকার করিনা, যা তাদের মধ্যে আপনার অবস্থানের কারণে তারা পেয়েছে, কিন্তু আমাদের ভাই বনু আবদুল মুত্তালিবের সাথে আমাদের ব্যবধানটা কোথায়? আপনি তাদেরকে দিলেন, আর আমাদেরকে বাদ দিলেন। অথচ আমাদের উভয় গোত্রের আত্মীয় স্বজন একই। রসূল সা. বললেন : "আমাদের ও বনুল মুত্তালিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ইসলামেও না, জাহেলী যুগেওনা। আমরা ও তারা একই।" এই বলে তিনি তাঁর আংগুলের মধ্যে আংগুল ঢুকালেন।

ইবনে হাযম বলেছেন : এ থেকে বুঝা গেলো বিধিগতভাবে বনু মুত্তালিবের ও বনু হাশেমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা জায়েয নেই। রসূলুল্লাহ সা.-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকেই এটা প্রমাণিত। সুতরাং বনু মুত্তালিব মুহাম্মদ সা.-এরই বংশধর। আর তারা যখন মুহাম্মদ সা. এর বংশধর, তখন তাদের জন্যে হারাম।

আবু হানিফার মতে, বুন মুত্তালিব যাকাত নিতে পারবে। আহমদ থেকে এই মতের পক্ষে ও বিপক্ষে দুটো রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। আর রসূলুল্লাহ সা. যেমন বনু হাশেমের উপর যাকাত হারাম করেছেন, তেমনি তাদের মুক্ত দাসদাসিদের উপরও তা হারাম করেছেন।

রসূলুল্লাহ সা.-এর মুক্ত গোলাম আবু রাফে বলেন : রসূলুল্লাহ সা. বনু মাখযুমের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করতে পাঠালেন। আবু রাফে তাকে বললেন : "আমাকে সাথে নাও, যাতে যাকাত থেকে কিছু অংশ পাই।" আদায়কারী বললো : না, রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট উপিস্থত হয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত এটা হবেনা। অতঃপর সে রসূলুল্লাহর নিকট গেলো ও জিজ্ঞাসা করলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : যাকাত আমাদের জন্য হালাল নয়। আর কোনো গোত্রের মুক্ত গোলামরা ঐ গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি।

নফল দানের ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে, এটা বনু হাশেমের জন্য হালাল, না হারাম?

শওকানি এ সংক্রান্ত মতামতগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরে বলেছেন : রসূল সা.-এর উক্তি "আমাদের জন্য সদকা হালাল নয়" থেকে সুস্পষ্ট, ফরয ও নফল যাবতীয় সদকাই হারাম। খাত্তাবীসহ অনেকে বলেছেন : সর্বসম্মতভাবেই যাবতীয় সদকা রসূল সা.-এর জন্যে হারাম। তিনি এও বলেছেন, একাধিক ব্যক্তি শাফেয়ী থেকে নফল সদকা সম্পর্কে পৃথক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, অনুরূপ আহমদ থেকেও একটি বর্ণনা এসেছে। ইবনে কুদামা বলেছেন : আহমদ থেকে যা উদ্ধৃত হয়েছে, তা সুস্পষ্ট নয়। তবে অধিকাংশ হানাফির মতে, হাম্বলীদের মতেও যায়দীদের অনেকের মতে রসূল সা.-এর বংশধরের জন্য নফল সদকা গ্রহণ জায়েয, তবে যাকাত নয়। কেননা মানুষের ময়লাই তাদের উপর হারাম এবং তা যাকাত, নফল সদকা নয়। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী শাফেয়ীদের মতও তাই। আল বাহর গ্রন্থে বলা হয়েছে : নফল সদকাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে দান উপহার ও ওয়াক্‌ফের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে। আবু ইউসুফ ও আবুল আব্বাস বলেছেন : ফরয সদকার মতো নফল সদকাও তাদের উপর হারাম। কেননা এ সংক্রান্ত হাদিসে এই দুই ধরনের সদকায় পার্থক্য করা হয়নি। এটা অগ্রগণ্য মত।

৩-৪. পিতা ও সন্তান

ফকীহগণ একমত যে, মা, বাবা, দাদা, দাদি, পুত্র, পৌত্র, কন্যা ও কন্যার সন্তানদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কেননা যাকাত দাতার উপর তার বাপদাদা ও সন্তানদের ভরণ পোষণ করা কর্তব্য। তারা যদি দরিদ্রও হয়, তথাপি যেহেতু সে ধনী তাই সেই সুবাদে তারাও ধনী, কাজেই তাদেরকে যখন যাকাত দেয়া হবে, তখন সে নিজেই উপকৃত হবে। এতে তার উপর যে ভরণ পোষণের দায়িত্ব রয়েছে তা ব্যাহত হবে।

ইমাম মালেক দাদা, দাদি ও পৌত্র পৌত্রীদেরকে বাদ দিয়েছেন। তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তাদেরকে যাকাত দিতে তিনি অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা তখনকার জন্য যখন তারা দরিদ্র হয়। তারা যদি ধনী হয় এবং স্বেচ্ছা সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে অংশ নেয়, তাহলে তাদেরকে 'আল্লাহর পথ' খাতের অংশ থেকে যাকাত দিতে পারে। যেমন তারা ঋণগ্রস্ত হলে তাদেরকে ঋণগ্রস্তের খাত থেকে যাকাত দিতে পারে। কেননা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে সে বাধ্য নয়। অনুরূপ তারা যদি যাকাত বিভাগের কর্মচারি হয়, তাহলে এই খাত থেকেও তাদেরকে যাকাত দেয়া যায়। ইবনে তাইমিয়ার মতে, পিতামাতার ভরণ পোষণ দিতে অক্ষম হলে এবং পিতামাতা যাকাতের মুখাপেক্ষী হলে তাদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ।

৫. স্ত্রী

ইবনুল মুন্যির বলেছেন : আলেমগণ একমত, স্ত্রীকে স্বামী যাকাত দিতে পারবেনা। কেননা তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত। তাই পিতামাতার মতো সে যাকাতের মুখাপেক্ষী নয়। কেননা ভরণ পোষণের জন্য যা কিছু তার প্রয়োজন তা স্ত্রীকে স্বামী ও পিতামাতাকে সন্তান সরবরাহ করতে বাধ্য। তবে স্ত্রী ঋণগ্রস্ত হলে তাকে ঋণগ্রস্তের খাতের অংশ থেকে যাকাত দিতে পারে যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

৬. আল্লাহর নৈকট্য লাভের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা

সূরা তাওবার আয়াতটিতে যাকাত দেয়ার যে আটটি খাতের উল্লেখ রয়েছে, তা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এমন অন্য কোনো কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয নয়। সুতরাং মসজিদ পুনঃনির্মাণ, রাস্তা সংস্কার, অতিথি আপ্যায়নের সামর্থ্য বৃদ্ধি, মৃতদের সৎকার ইত্যাকার কর্মকাণ্ডে যাকাত দেয়া যাবেনা।

আবু দাউদ বলেছেন : আমি শুনেছি, আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মৃতদের কাফনের ব্যবস্থা কি যাকাত থেকে করা যাবে? তিনি জবাব দিলেন : না। অনুরূপ যাকাত থেকে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করাও যাবেনা। (কেননা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত। তাকে তো কোনো কিছু দেয়া যায়না। আর যদি ঋণদাতাকে দেয়া হয়, তাহলে সে তো ঋণদাতাকে দেয়া হবে, ঋণগ্রস্তকে নয়) যাকাত থেকে মৃত ব্যক্তির নয় জীবিত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা যায়। কেননা মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়না। জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে তার পরিবারকে দেয়া যাবে? আহমদ বললেন : তার পরিবারের যদি ঋণ থাকে তাহলে দেয়া যাবে।

৪৯. যাকাত আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব পালন করবে কে?

রসূলুল্লাহ সা. যাকাত আদায়ের জন্য এবং তা উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বন্টনের জন্য প্রতিনিধি পাঠাতেন। আবু বকর ও উমর রা.ও প্রতিনিধি পাঠাতেন। যে সমস্ত সম্পদ থেকে সরাসরি তার অংশ দিয়ে যাকাত দেয়া হয়, যেমন ক্ষেতের ফসল, পশু ও খনিজ দ্রব্য আর যে সকল সম্পদে

মূল্য নিরূপণ করত মূল্য দ্বারা যাকাত দিতে হয়- যথা ব্যবসায়িক পণ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রোথিত মূল্যবান সম্পদ এই দুই প্রকার সম্পদে কোনো পার্থক্য নেই। এরপর যখন উসমান খলিফা হলেন তখন তিনিও কিছুকাল এভাবেই চালালেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন মূল্যায়ন যোগ্য সম্পদ বেড়েই চলেছে এবং মনে করলেন, এটা অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য অত্যধিক দুঃসাধ্য ও এর অনুসন্ধান মালিকদের জন্য ক্ষতিকর, তখন তিনি সম্পদের মালিকেদের উপরই যাকাত দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

ফকীহগণ একমত হয়েছেন, যাকাত যখন মূল্যায়ন যোগ্য সম্পদ থেকে দেয়া হবে, তখন সম্পদের মালিকরা নিজেরাই যাকাত দেয়ার ব্যবস্থা করবে। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন : উসমান ইবনে আফফানকে রসূলুল্লাহ সা.-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুনেছি : "এটা তোমাদের যাকাত দেয়ার মাস। তোমাদের কেউ ঋণগ্রস্ত থাকলে সে যেনো তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়, যাতে তোমাদের সম্পদ ঋণমুক্ত হয় এবং তা থেকে তোমরা যাকাত দিতে পরো। -বায়হাকি।

নববী বলেছেন : এটা সর্বসম্মত মত। আমাদের ইমামগণ এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। মূল্যায়ন যোগ্য সম্পদের যাকাত দেয়ার অধিকার যখন স্বয়ং মালিকদের রয়েছে তখনও প্রশ্ন হলো, এটাই কি উত্তম, না সরকারের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া উত্তম, যাতে সরকার তা বণ্টন করে? শাফেয়ীদের মতে, সরকার যদি ন্যায়পন্থী হয় তাহলে তার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়াই উত্তম। হাম্বলীদের মতে, মালিকের নিজের উদ্যোগে বণ্টন করাই উত্তম। কিন্তু সরকারের নিকট অর্পণ করলে তাও বৈধ হবে। তবে যে সকল সম্পদ থেকে সরাসরি তার অংশ দ্বারা যাকাত দেয়া হয়, সেগুলোর যাকাত আদায় করা ও বণ্টন করার অধিকার মালেকী ও হানাফিদের মতানুসারে সরকার ও তার প্রতিনিধিদের। পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে উভয় প্রকারের সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাত আদায় ও বণ্টনের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন।

৫০. যাকাত বণ্টনের জন্যে হস্তান্তর

মুসলমানদের শাসক যখন ইসলামী নীতিমালা মেনে চলে, তখন সে ন্যায়বান বা অত্যাচারী যা-ই হোক, তার নিকট যাকাত সমর্পণ করা বৈধ। মালিক তার নিকট যাকাত সমর্পণ করেই দায়মুক্ত হবে। তবে যদি দেখা যায়, সরকার উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে বা খাতে যাকাত বণ্টন করছেনা, তাহলে উপযুক্ত খাতে মালিকের নিজের যাকাত বণ্টন করা উত্তম। অবশ্য সরকার বা সরকারি কর্মচারি যদি তা চেয়ে নিয়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা। দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাত দেয়ার সময় "এটা যাকাত দিলাম" বলা জরুরি নয়। বরং শুধু দেয়াই যথেষ্ট - চাই যাকাতদাতা সরাসরি দিক অথবা সরকারের মাধ্যমে দিক।

১. আনাস রা. বলেছেন, বনু তামীমের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে বললো, হে রসূলুল্লাহ! আমি যখন আপনার প্রতিনিধির নিকট যাকাত দিয়ে দেবো, তখন সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে কি? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হাঁ, যখন তুমি আমার প্রতিনিধির নিকট যাকাত দিয়ে দেবে, তখন তুমি দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তুমি তার প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি তাতে কোনো রদবদল ঘটাবে, তার উপরেই তার গুনাহ বর্তাবে। -আহমদ।

২. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেন : আমার পরে আত্মকেন্দ্রিকতা ও এমন বহু জিনিসের উদ্ভব ঘটবে যা তোমাদের কাছে অপরিচিত ও অপছন্দনীয়। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে আপনি কি করতে আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন :

তোমাদের নিকট যা প্রাপ্য তা দিয়ে দিও, আর তোমাদের যা প্রাপ্য তা আল্লাহর কাছে চেয়ো।" -বুখারি ও মুসলিম।

৩. ওয়ায়েল ইবনে হাজর বলেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি ভেবে দেখেছেন, আমাদের উপর যদি কখানো এমন শাসক নিযুক্ত হয়, যারা শুধু নিজের পাওনা চাইবে এবং আমাদের পাওনা আটকে রাখবে, তখন আমরা কী করবো? তিনি বললেন, তোমরা তাদের হুকুম শুনবে ও আনুগত্য করবে। কারণ তাদের কর্মের জন্য তারা দায়ী হবে, আর তোমাদর কর্মের জন্য তোমরা দায়ী হবে। -মুসলিম। শওকানি বলেছেন : এসব হাদিস থেকে অধিকাংশ আলেমের মতে, জালেম শাসকদের কাছেও যাকাত অর্পণ করার বৈধতা ও তাতে যাকাত আদায় হয়ে যায় বলে প্রমাণিত হয়। তবে এটা মুসলিম দেশের মুসলমান শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে প্রচলিত আধুনিক সরকারগুলোর নিকট যাকাত দেয়া যাবে কিনা, সে সম্পর্কে শাইখ রশিদ রেযা বলেছেন :

"এ যুগে অধিকাংশ দেশে মুসলমানদের কোনো ইসলামী সরকার নেই, যা মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়, ইসলামী বিধানকে বাস্তবায়িত করে, ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার প্রতিরোধ করে, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য জিহাদ করে যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ক্ষেত্র বিশেষে ফরযে আইন (ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের উপর) বা ফরযে কেফায়া (সমষ্টিক ফরয, যা কতক লোকে পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে পালিত হয়), ইসলামের শাস্তির বিধান কার্যকরী করে, আল্লাহর আদেশ কৃত যাকাত আদায় করে এবং তার নির্ধারিত খাতসমূহে ব্যয় করে। বরং অধিকাংশ মুসলিম দেশ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অধীন হয়ে পড়েছে। কোনো কোনোটিতে এমন মুসলিম শাসক রয়েছে যাদেরকে বিজাতীয়রা ইসলামের নামে জনগণকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করার জন্য ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে। এমনকি ইসলামের ক্ষতি সাধনেও তাদেরকে ব্যবহার করে এবং এসব শাসক নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্পদের জোরে যাকাত সদকা ও ওয়াকফ ইত্যাকার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এ ধরনের সরকারগুলোর নিকট যাকাতের এক কপর্দকও অর্পণ করা বৈধ নয়, এসব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির উপাধি, ধর্ম যাই হোক না কেন। এ ছাড়া যেসব মুসলিম দেশের শাসকরা ইসলামের আনুগত্য করে এবং শাসকদেরকে ডিংগিয়ে মুসমলানদের কোষাগারে বিদেশীরা কর্তৃত্ব চালায়না, সেসব দেশের সরকারের নিকটই সরাসরি দেয় যাকাত (যথা শস্য, ফল ও পশুর যাকাত) দেয়া বাধ্যতামূলক, অনুরূপ স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাত সরকার চাইলে দেয়া বাধ্যতামূলক। ফকীহগণের মতানুসারে এসব দেশে শাসকরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বৈরাচারি ও যুলুমবাজ হলেও তাদের নিকট যাকাত দেয়া যাবে।"

৫১. যাকাত সৎ লোকদেরকে দেয়া মুস্তাহাব

নির্ধারিত আটটি খাতের আওতাভুক্ত ও পাওয়ার উপযুক্ত হলে মুসলমানকেই যাকাত দিতে হবে, চাই সে সৎ লোক হোক বা ফাসেক তথা অসৎ লোক হোক (কবীরা গুনাহে জড়িত অথবা সগীরা গুনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ফাসেক বলা হয়), তবে যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে, সে এ দ্বারা কোনো হারাম কাজ সংঘটিত করতে সামর্থ্য অর্জন করবে তখন তাকে দেয়া যাবেনা, যাতে সে হারাম কাজ করার সামর্থ্য লাভ না করে। কিন্তু যখন কিছুই জানা যায়না এবং এ দ্বারা সে উপকৃত হবে এটা জানা যায়, তখন দেয়া যাবে। যাকাতদাতা যাকাত দেয়ার জন্য সৎ আলেম, পরোপকারী ও মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন লোককে নির্বাচন করলে ভালো হয়।

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মুমিন ও ঈমানের উদাহরণ হলো,

খুটো দিয়ে বাঁধা ঘোড়ার মতো। সে চার দিকে যতোই ঘুরুক অবশেষে খুটোর কাছেই ফিরে আসে। (অর্থাৎ বান্দা ঈমানের দাবি অনুসারে সৎ কাজ বর্জন করে ঈমান থেকে দূরে সরে যায়। বর্জনের জন্য অনুতপ্ত হয়েও ভবিষ্যতে আর বর্জন না করার সংকল্প নিয়ে পুনরায় ঈমানের দিকে ফিরে আসে যেমন ঘোড়া তার খুটোর নিকট ফিরে আসে।) মুমিন কখনো কখনো ভুল করে, আবার ঈমানের দিকে ফিরে আসে, সুতরাং তোমরা খোদাভীরু ও সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে আহার করাও। -আহমদ।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : সাহায্যের মুখাপেক্ষী ব্যক্তি যদি বেনামাযী হয়, তবে তওবা না করা ও নামাযের পাবন্দী না করা পর্যন্ত তাকে কিছুই দেয়া হবেনা। ইবনে তাইমিয়ার এমত সঠিক, কেননা নামায তরক করা মস্ত বড় গুনাহ, যে ব্যক্তি এতো বড় গুনাহে জড়িত, সে তাওবা না করা পর্যন্ত তাকে কোনো সাহায্য করা বৈধ হতে পারেনা।

যারা বেহুদা অর্থহীন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, সেসব বেপরোয়া ধরনের লোক যারা খারাপ কাজ থেকে আত্মসম্বরণ করেনা, কোনো বিপথগামিতা থেকে নিবৃত্ত থাকেনা, যাদের বিবেক বিনষ্ট হয়ে গেছে, স্বভাব বিকৃত হয়ে গেছে এবং ভালো অনুভূতি ও মন্দ প্রেরণা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, তারাও বেনামাযীদের মতো যাকাত পাওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবে- যদি না তা তাদেরকে সৎপথের দিকে আকৃষ্ট ও আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং তাদের ভেতরে ধর্মীয় আবেগ ও সৎকর্মের প্রেরণা পুনর্জীবিত করতে পারে।

৫২. যাকাতদাতার জন্যে তার যাকাতের মাল ক্রয় করা নিষেধ

রসূলুল্লাহ সা. যাকাতদাতাকে যে যাকাত আল্লাহর উদ্দেশ্য দিয়েছে তা খরিদ করতে নিষেধ করেছেন, ঠিক যেভাবে মুহাজিরদেরকে হিজরত করে মক্কা ছেড়ে যাওয়ার পর সেখানে ফিরে যেতে নিষেধ করেছেন।

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, উমর রা. এক ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য একটা ঘোড়া দিলেন। পরে দেখলেন ঐ ঘোড়াটা বিক্রি হচ্ছে। তাই তিনি ঘোড়াটি খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলে রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : খরিদ করোনা এবং তোমার প্রদত্ত সদকা ফিরিয়ে নিওনা। -বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী।

নববী বলেছেন : এ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম বুঝানো হয়নি, মাকরূহ বুঝানো হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি কোনো জিনিস যাকাত বা সদকা হিসেবে অথবা কাফফরা মানত বা অনুরূপ কোনো নফল দান হিসেবে কাউকে দিয়েছে, তা যাকে সে দিয়েছে তার কাছ থেকে খরিদ করা তার জন্য মাকরূহ তথা অবাঞ্ছনীয়। খরিদ করা বা অন্য কোনো পন্থায় সেচ্ছায় পুনরায় উক্ত জিনিসের মালিক হওয়া সমীচীন নয়। তবে যদি উত্তরাধিকার সূত্রে তার মালিক হয় তাহলে মাকরূহ হবেনা। ইবনে বাত্তাল বলেছেন : উমর রা.-এর এই হাদিসের আলোকে অধিকাংশ আলেম কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিজের দেয়া সদকা খরিদ করা অপছন্দনীয় মনে করেন। কিন্তু ইবনুল মুনযির বলেছেন : হাসান, ইকরামা, রবীয়া ও আওযায়ী সদকাকৃত সামগ্রি ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে হাযম এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : পাঁচ ব্যক্তি ব্যতিত কোনো ধনীর জন্য যাকাত হালাল নয় : আল্লাহর পথের যোদ্ধা, যাকাত বিভাগের কর্মচারি, ঋণগ্রস্ত, যে ব্যক্তি নিজের টাকা দিয়ে যাকাত বা সদকার সামগ্রি কিনে নেয় অথবা কোনো ব্যক্তির একজন দরিদ্র প্রতিবেশি ছিলো, সে সেই দরিদ্রকে যাকাত দিলো, অতঃপর সেই দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিকে যাকাতের উক্ত সামগ্রি উপহার স্বরূপ দিলো।

৫৩. স্বামী ও আত্মীয়দের যাকাত দেয়া মুস্তাহাব

স্ত্রীর যখন যাকাত দেয়ার উপযুক্ত সম্পদ থাকে এবং স্বামী যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হয়, তখন তাকে যাকাত দেয়া তার জন্য বৈধ। কেননা স্ত্রীর উপর স্বামীকে ভরণ পোষণ দেয়ার কোনো দায়িত্ব নেই। অন্য কাউকে দেয়ার চেয়ে অভাবি স্বামীকে দেয়াতে সওয়াব বেশি হবে।

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. আপনি আজ সদকা করার আদেশ দিয়েছেন। আমার কাছে একটি গহনা ছিলো। সেটি আমি সদকা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ইবনে মাসউদ দাবি করলো, সে ও তার সন্তান অন্যদের চেয়ে আমার সদকার বেশি উপযুক্ত। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ইবনে মাসউদ সত্য বলেছে, তোমার স্বামী ও সন্তান তোমরা সদকা পাওয়ার অধিকতর উপযোগী।" -বুখারি।

শাফেয়ী, ইবনুল মুনযির, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যাহেরী মাযহাব ও ইমাম আহমদ থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনার অভিমত এটাই। কিন্তু আবু হানিফা প্রমুখের মত হলো, স্বামীকে স্ত্রীর যাকাত দেয় জায়েয নয়। যয়নবের হাদিস নফল সদকা সংক্রান্ত, যাকাত সংক্রান্ত নয়। ইমাম মালেক বলেছেন : স্ত্রীর কাছ থেকে যাকাত নিয়ে স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণ পোষণেই ব্যয় করতে চায়, তাহলে তা জায়েয হবেনা। অন্য কোনো ব্যয় নির্বাহ করতে চাইলে জায়েয হবে।

অবশ্য বাদবাকি আত্মীয় স্বজন, যেমন ভাই, বোন, মামা, খালা, ফুফু ইত্যাদি, তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয, যদি তারা যাকাতের যোগ্য হয়। অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দরিদ্র মিসকিনকে দান করলে তা দান। (অর্থাৎ তাতে দানের সওয়াব পাওয়া যায়) আর আত্মীয়কে দান করলে তা দান এবং আত্মীয় সমাদর দুটোই। (অর্থাৎ এতে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়ার যায় : একটি দানের আর একটি আত্মীয় সমাদরের।) -আহমদ নাসায়ী, তিরমিযি।

৫৪. ইসলামী জ্ঞানার্জনরতদের যাকাত দেয়া যাবে, ইবাদতে মশগুলদেরকে নয়

নববী বলেছেন : কোনো ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জনে সক্ষম, কিন্তু কোনো ধরনের ইসলামী জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত থাকায় তা পারেনা। কেননা জীবিকা উপার্জন করতে গেলে বিদ্যা উপার্জন করা সম্ভব হয়না। এরূপ ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয। কেননা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা ফরযে কেফায়া, তবে যে ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞান অর্জনে অক্ষম অথচ জীবিকা উপার্জনে সক্ষম, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়, চাই সে বিদ্যালয়েই সর্বক্ষণ অবস্থান করুক। এটাই প্রসিদ্ধ সঠিক মত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নফল ইবাদতে নিয়োজিত থাকে, জীবিকা উপার্জন তার নফল ইবাদতে আংশিক বা পুরোপুরি বাধা দেয়, তার জন্য যাকাত গ্রহণ সর্বসম্মতভাবেই অবৈধ। কেননা তারা ইবাদতের উপকারিতা তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে ইসলামী বিদ্যা উপার্জনকারীর অবস্থা এর বিপরীত।

যাকাত থেকে ঋণ পরিশোধ করা : নববী বলেছেন, কোনো অসচ্ছল ব্যক্তির ঘাড়ে যদি কোনো ঋণ থাকে এবং সে তার যাকাত থেকে ঋণ কেটে দিতে চায় আর বলে আমি আমার যাকাত থেকে এই ঋণ কেটে দিলাম, তাহলে এ ব্যাপারে দুটো মত রয়েছে। বিশুদ্ধতর মত হলো, যাকাত আদায় হবেনা। এটা আহমদ ও আবু হানিফার মত। কেননা যাকাত তার ঘাড়ে রয়েছে। ওটা কারো দখলে দিয়ে দেয়া ব্যতিত তা থেকে সে দায়মুক্ত হবেনা। দ্বিতীয় মত হলো, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এটা হাসান বসরী ও আতার মত। কেননা সে যদি কাউকে দিয়ে আবার তার কাছ থেকে নিয়ে নিতো, তাহলে সেটা জায়েয হতো। সুতরাং যখন তার দখলে দেয়নি, তখনও তা জায়েয হবে, যেমন কারো কাছে যদি আমানত স্বরূপ কিছু টাকা থাকে এবং

যাকাত বাবদ তা দিয়ে দেয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে চাই সে দখলে নিক বা না নিক। তবে যদি কেউ তার ঋণ বাবদ ফেরত দেয়ার শর্তে যাকাত দেয়, তাহলে যাকাত আদায় হবেনা এবং সর্বসম্মতভাবে যাকাত থেকে দায়মুক্ত হবেনা, এতে সর্বসম্মতভাবে ঋণও পরিশোধ হবেনা। আর যদি উভয়ের অদ্রূপ নিয়ত থাকে কিন্তু এরূপ শর্ত আরোপ করেনি তাহলে সর্বসম্মভাবে এটা জায়েয হবে এবং যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি ঋণ বাবদ তাকে ফেরত দেয়, তাহলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

৫৫. যাকাতের স্থানান্তর

ফকীহগণ এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের নিকট যাকাত স্থানান্তরকে জায়েয বলে মতৈক্য প্রকাশ করেছেন- যদি যাকাতদাতার শহরের লোকদের মধ্যে কেউ তার মুখাপেক্ষী না থাকে। কিন্তু যদি যাকাতদাতার গোত্র বা শহরের লোকেরা তার মুখাপেক্ষী থাকে, তাহলে বহু হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক শহরের যাকাত সেই শহরের দরিদ্রদের মধ্যেই বণ্টন করতে হবে এবং অন্য শহরে পাঠানো যাবেনা। কেননা যাকাতের উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক শহরের দরিদ্রদের দারিদ্র্য মোচন। কোনো শহরে দরিদ্র লোক থাকা সত্ত্বেও যদি যাকাতকে সেই শহর থেকে অন্য শহরে পাঠানোর অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে এটা ঐ শহরের দরিদ্রদেরকে দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে নিপতিত রাখারই শামিল হবে। ইতিপূর্বে মুয়াযের হাদিসে বলা হয়েছে : "তাদেরকে জানিয়ে দিও, তাদের উপর যাকাত দেয়ার দায়িত্ব রয়েছে, যা তাদের মধ্য থেকে যারা ধনী, তাদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"

আবু জুহাইফা বলেছেন : আমাদের নিকট রসূলুল্লাহ সা.-এর যাকাত আদায়কারী এলো। সে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করলো এবং দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করলো। আমি একজন ইয়াতিম কিশোর ছিলাম, আমাকে একটা অল্প বয়স্ক উটনী দিলো। -তিরিমিযি। আর ইমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত, তাকে যাকাত আদায়ের কর্মচারি নিয়োগ করা হলো। তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো : আদায়কৃত সামগ্রি কোথায়? তিনি বললেন : এসব সামগ্রির জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন কি? রসূলুল্লাহ সা.-এর সময় যেখান থেকে যাকাত আদায় করতাম সেখান থেকেই আদায় করেছি এবং যেখানে বণ্টন করতাম সেখানেই বণ্টন করে এসেছি। -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। তাউস বলেছেন : মুয়াযের চিঠিতে লেখা ছিলো : যে ব্যক্তি এক শহর থেকে অন্য শহরে যাবে, তার যাকাত ও উশর তার আপন জনেরা যে শহরে থাকে, সেখানেই বণ্টন করা হবে। -সুনানে আছরাম।

এসব হাদিস থেকে ফকীহগণ প্রমাণ দর্শিয়েছেন, প্রত্যেক শহরের যাকাত সেই শহরের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তবে আগে যেমন বলা হয়েছে : যাকাতদাতার শহরবাসীর যদি যাকাতের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে তা অন্য শহরের উপযুক্ত লোকদের কাছে স্থানান্তর করা জায়েয হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। তবে হানাফিরা বলেছেন : অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করা মাকরূহ। অন্য শহরে দরিদ্র আত্মীয় থাকলে তাদেরকে দেয়া মাকরূহ হবেনা। কেননা এতে আত্মীয়দের সমাদর করা হবে। তাছাড়া অন্য শহরে যদি এমন কোনো জনগোষ্ঠী থাকে, যারা তার শহরবাসীর চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী অথবা অন্য শহরে স্থানান্তর করলে যদি মুসলমানদের বেশি উপকার হয়, তাহলেও স্থানান্তর করা মাকরূহ হবেনা। অনুরূপ, অমুসলিম দেশ থেকে মুসলিম দেশে, ইসলামী বিদ্যানুরাগীদের কাছে, কিংবা বছর শেষ হবার আগে অগ্রিম পাঠালে স্থানান্তর করা মাকরূহ হবেনা।

শাফেয়ীদের মতে, যে শহরে যাকাত ফরয হয়েছে, সেখানে যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোক না থাকলেই অন্য শহরে যাকাত পাঠানো যাবে। থাকলে সেখানেই বণ্টন করতে হবে এবং অন্য

শহরে পাঠানো জায়েয হবেনা। কেননা আমর ইবনে শুয়াইব থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. মুয়ায বিন জাবালকে পাঠানোর পর থেকে রসূল সা.-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সৈন্যদের সাথেই ছিলেন। তারপর তিনি উমরের নিকট এলেন। উমর রা. তাকে আগের দায়িত্বেই ফেরত পাঠালেন এরপর মুয়ায উমরের নিকট জনগণের যাকাত পাঠালেন। এতে উমর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং বললেন : আমি তোমাকে যাকাত সদকা ও জিযিয়া আদায় করতে পাঠাইনি। তোমাকে পাঠিয়েছি শুধু ধনিদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করতে। মুয়ায বললেন : আমার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করার মতো কাউকে না পেয়েই আপনার কাছে পাঠিয়েছি। পরবর্তী বছর মুয়ায অধিক যাকাত উমরের কাছে পাঠালেন। এরপরও উভয়ের মধ্যে আগের মতো বাক্য বিনিময় হলো। তৃতীয় বছরে মুয়ায পুনরায় সমগ্র যাকাত উমরের নিকট পাঠালেন। উমর এবারও আগের মতো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। মুয়ায বললেন : আমি যাকাত নেয়ার মতো কাউকে পাইনি। আবু উবাইদ ইমাম মালেক বলেছেন : কোনো শহরে প্রয়োজন দেখা দেয়া ছাড়া সেখানে যাকাত পাঠানো জায়েয নয়। এরূপ অবস্থায় সরকার বিচার বিবেচনা করে সেখানে যাকাত পাঠাবে। হাম্বলীদের মতে, এক শহরের যাকাত সেই শহর থেকে এতো দূরে পাঠানো যাবেনা যেখানে যেতে নামায কসর করতে হয়। যেখানে যাকাত ফরয হয়েছে সেখানে অথবা তার কাছেই কসরের চেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

আবু দাউদ বলেছেন : আহমদকে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত পাঠানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন পাঠানো চলবেনা। বলা হলো সেখানে যদি যাকাতদাতার আত্মীয় স্বজন থাকে? তিনি বললেন : না, তবে তার নিজ শহরের দরিদ্ররা যদি তার মুখাপেক্ষী না থাকে তাহলে স্থানান্তর করা যাবে। এর প্রমাণ হিসেবে উপরোক্ত আবু উবাইদের হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা বলেছেন : কেউ যদি এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে অন্য শহরে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যাকাতদাতা যদি এক শহরে এবং তার সম্পদ অন্য শহরে থাকে তাহলে যে শহরে সম্পদ রয়েছে, সেটিই বিবেচ্য। কেননা সম্পদই যাকাত ফরয হওয়ার কারণ এবং যাকাত প্রাপকদের দৃষ্টি সেদিকেই কেন্দ্রীভূত থাকে। আর যদি কিছু সম্পদ যে শহরে সে অবস্থান করছে সেখানে এবং বাকি সম্পদ অন্য শহরে থাকে, তাহলে যে শহরে সে অবস্থান করছে সেখানে পুরো যাকাত বন্টন করবে। এ হলো যাকাতের বিধান। ফেতরার বিধান হলো, তা যেখানে ওয়াজিব হয় সেখানেই বন্টন করতে হবে, চাই তার সম্পদ সেখানে থাকুক বা না থাকুক।

৫৬. যাকাতের বন্টনে ভুল হলে

যাকাত কাদের প্রাপ্য আর কাদের জন্য নিষিদ্ধ, তার বিবরণ আগেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু যাকাতদাতা যদি ভুলক্রমে যার জন্য নিষিদ্ধ তাকে দিয়ে ফেলে এবং অজ্ঞতাবশত যার প্রাপ্য তাকে বাদ দেয়, তারপর নিজের ভুল বুঝতে পারে, তাহলে কি তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে, নাকি যাকাত তার কাঁধে ঋণ হিসেবে বহাল থাকবে এবং তাকে পুনরায় উপযুক্ত খাতে যাকাত দিতে হবে? এ ব্যাপারে ফকীহদের দৃষ্টিভংগিতে পার্থক্য রয়েছে।

আবু হানিফা, মুহাম্মদ, হাসান ও আবু উবাইদের মতে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে, পুনরায় তাকে আর যাকাত দিতে হবেনা।

মুয়ান বিন ইয়াযীদ বলেছেন : আমার পিতা কিছু দিনার সদকা হিসেবে দেয়ার উদ্দেশ্য বের করলেন এবং মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রাখলেন। আমি এসে সেই দিনারগুলো নিলাম

এবং পিতার কাছে হাযির করলাম। তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে দিতে চাইনি, আমি বিবাদী হয়ে বিষয়টি রসূল সা.-এর নিকট নিয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে ইয়াযীদ, তুমি যা নিয়ত করেছ অদ্রূপ ফল পাবে। আর হে মুয়ান, তুমি যা নিয়েছ, তা তোমারই থাকবে। -আহমদ ও বুখারি।

হাদিসটিতে উল্লিখিত সদকার যদিও নফল হবার সম্ভাবনাও রয়েছে, তথাপি এতে 'যা' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। তাই নফল বা ফরয যাই হোক, তার বিধি একই হবে।

এর প্রমাণ হিসেবে আবু হুরায়রার আর একটি হাদিস উল্লেখ্য করা হয়। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করলো : আজ রাতে আমি কিছু সদকা করবোই। তারপর সে তার সদকা নিয়ে বের হলো। অতপর সে নিজের অজান্তে এক চোরকে সদকা দিলো। লোকেরা বলাবলি করলো : আজ রাতে জনৈক চোর সদকা পেয়েছে। এরপর ঐ ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহ! তোমরা প্রশংসা। সে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করলো : আজ রাতে আমি কিছু সদকা করবোই। তারপর সে সদকা নিয়ে বের হলো। এবার সে নিজের অজান্তে এক ব্যভিচারিণী মহিলাকে সদকা দিয়ে বসলো। এবারও লোকেরা বলাবলি করলো : আজ রাতে জনৈকা ব্যভিচারিণী মহিলা সদকা পেয়েছে। লোকটি বললো : হে আল্লাহ তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা যদিও একটি ব্যভিচারিণীকে সদকা দিয়ে থাকি। আমি অবশ্যই পুনরায় সদকা করবো। তারপর সে সদকা নিয়ে বের হলো এবং নিজের অজান্তে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে সদকা দিয়ে বসলো। এবারও লোকেরা বলাবলি করলো : আজ জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি সদকা পেয়েছে। এরপর ঐ ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহ চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনাঢ্য লোককে সদকা দিয়েছি এজন্য তোমার প্রশংসা। এরপর সেই ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো : কে যেনো তাকে বলছে : তুমি যে চোরকে সদকা দিয়েছ, তাতে সে চুরি থেকে নিজেকে সংশোধন করতে পারে। আর ব্যভিচারিণী সদকা পেয়ে ব্যভিচার থেকে তাওবা করতে পারে। আর ধনী ব্যক্তি সদকা পেয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে দান করতে পারে। -আহমদ, বুখারি ও মুসলিম।

আর রসূলুল্লাহ সা. তার কাছে যে ব্যক্তি সদকা চেয়েছিল তাকে তিনি বলেছিলেন : "তুমি যদি সেই আটজনের একজন হও তাহলে আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্র্য দেবো।" আর তিনি দু'জন সুস্থ সবল লোককে যাকাত দিলেন এবং বললেন : তোমরা চাইলে তোমাদেরকে দিতে পারি। অথচ যাকাতে কোনো ধনীরও হক নেই, সুস্থ সবল ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরও হক নেই।"

আল মুগনীতে বলা হয়েছে : সচ্ছলতাকে যদি হিসেবে ধরা হতো, তাহলে তাদেরকে শুধু বলেই ক্ষান্ত থাকা হতোনা।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু ইউসুফ, ছাওরী ও ইবনুল মুনযিরের অভিমত হলো, ভুল যখন ধরা পড়েছে, তখন অযোগ্য ব্যক্তিকে যাকাত দেয়াতে যাকাত আদায় হবেনা, পুনরায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে যাকাত দিতে হবে। কেননা যে প্রাপ্য নয় সে তাকে ফরয যাকাত দিয়েছে। কাজেই সে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়নি। যেমন মানুষের মধ্য থেকে যার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে তাকে ফেরত না দিয়ে অন্যকে ফেরত দিলে ঋণ পরিশোধ হবেনা। ইমাম আহমদের মত দু'রকম বর্ণিত হয়েছে। যাকে ধনী মনে করে যাকাত দিলো, সে ধনী প্রমাণিত হলে এক বর্ণনা অনুসারে আদায় হয়ে যাবে, অন্য বর্ণনা অনুসারে আদায় হবেনা। তবে যদি প্রকাশ পায়, যাকে যাকাত দেয়া হয়েছে সে যাকাত পাওয়ার অযোগ্য। যথা- গোলাম, কাফির, হাশেমী কিংবা দাতার আত্মীয়, তাহলে যাকাত আদায় হবেনা। এক্ষেত্রে ইমাম আহমদ থেকে এই একটি মতই বর্ণিত। কেননা অন্যদেরকে চেনা গেলেও কে ধনী কে দরিদ্র তা চেনা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন : "মূর্খ মানুষ তাদের লোভহীনতার কারণে তাদেরকে ধনী মনে করে।"

৫৭. যাকাত বা সদকা প্রকাশ্যে দান করা

যাকাত ও দান প্রকাশ্যে প্রদান করা জায়েয। তবে সাবধান থাকতে হবে যেনো লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে না দেয়া হয়। অবশ্য গোপনে দান করাই সর্বোত্তম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দাও তবে তাও ভাল। আর যদি গোপনে দাও ও দরিদ্রদেরকে দাও, তবে সেটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৭১)

আহমদ, বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতিত আর কোনো ছায়া থাকবেনা, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাঁর ছায়ার নিচে স্থান দেবেন : ১. ন্যায়নিষ্ঠ শাসক বা নেতা, ২. আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে এমন যুবক, ৩. এমন ব্যক্তি যার মন মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকে, ৪. এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই পরস্পর সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, আল্লাহর জন্যই একত্রিত হয় এবং আল্লাহর জন্যই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, ৫. এমন এক ব্যক্তি যে এতো গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানেনা, ৬. এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে যায় এবং ৭. এমন এক ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলা নিজের দিকে (খারাপ উদ্দেশ্যে) ডাকে, কিন্তু সে বলে : আমি আল্লাহকে ভয় করি।"

৫৮. যাকাতুল ফিতর (ফিতরা)

রমযানের শেষে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে যে সদকা দিতে হয় তাই যাকাতুল ফিতর। এটা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব, চাই ছোট হোক বা বড় হোক, পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক, স্বাধীন হোক বা গোলাম হোক।

বুখারি ও মুসলিম উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. রমযানের ফিতরা ধার্য করেছেন এক সা' খোরমা অথবা এক সা' গম প্রত্যেক স্বাধীন বা গোলাম, নারী বা পুরুষ এবং ছোট ও বড় মুসলমানের উপর।"

ফিতরার উদ্দেশ্য : দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে ফিতরার বিধান জারি করা হয়, যাতে এটা রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে। কেননা রোযার মধ্যে তার দ্বারা কিছু গর্হিত ও অশালীন কাজ সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া এ দ্বারা দরিদ্র ও বিত্তহীনদের কিছু সাহায্য হয়।

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারু কুতনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. রোযাদারকে নিষ্প্রয়োজন ও অশালীন কথা ও কাজ থেকে পবিত্র করা ও দরিদ্রকে খাওয়ানোর জন্য ফিতরা ধার্য করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের আগে এটা দিয়ে দেবে, তার জন্য এটা পবিত্রকারী হিসেবে গৃহিত হবে। আর যে নামাযের পরে দেবে, তার জন্য এটা হবে সাধারণ দান।"

কার উপর ফিতরা ওয়াজিব : নিজের ও নিজের পরিবারের একদিন ও এক রাতের খাদ্যের অতিরিক্ত এক সা' পরিমাণ খাদ্যের মালিক প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমানের উপর ফিতরা ওয়াজিব। নিজের পক্ষ থেকে এবং যার যার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত যথা স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, চাকর বাকর তাদের পক্ষ থেকে ফিতরা দিতে হবে। (মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মাযহাব অনুসারে পরিবারের একদিন ও এক রাতের খাবারের অতিরিক্ত এক সা' খাবার থাকলেই ফিতরা ওয়াজিব। শওকানি বলেন : এটাই সঠিক। হানাফিদের মতে, যাকাতের নিসাবের মালিক হওয়া শর্ত)।

ফিতরার পরিমাণ : ওয়াজিব ফিতরার পরিমাণ এক সা' গম, যব, খোরমা, কিশমিস, কিংবা ইকিত (মাখন তোলা হয়নি এমন শুকনো দুধ) চাউল, ভুট্টা ইত্যাদি, যা প্রধান খাদ্য বলে বিবেচিত হয়। (এক সা' = চার মুদ, আর এক মুদ হলো, একজন পূর্ণ বয়স্ক মধ্যম আকৃতির মানুষের দুই মুঠের সমান, যা ছোট বা বড় একটি পানপাত্র ও আরেক পানপাত্রের এক তৃতীয়াংশ বা দুই পানপাত্র পরিমাণ।) আবু হানিফা এক সা' এর মূল্য দেয়াকেও জায়েয বলেছেন। তাঁর মতে, ফিতরাদাতা যদি গম থেকে ফিতরা দেয়, তাহলে আধা সা' দিলেও ফিতরা আদায় হবে।

আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন : যখন রসূলুল্লাহ সা. জীবিত ছিলেন, তখন আমরা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও গোলাম বাবদ এক সা' খাদ্য শষ্য অথবা এক সা' ইকিত অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খোরমা অথবা এক সা' কিশমিস দিতাম। মুয়াবিয়া হজ্জ বা ওমরা করতে আসা পর্যন্ত আমরা এভাবেই দিয়ে যাচ্ছিলাম। মুয়াবিয়া এসে মিম্বার থেকে জনগণের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন : আমি মনে করি, সিরিয়ার গমের অর্ধ সা' এক সা' খোরমার সমান। লোকেরা এটা মেনে নিলো। কিন্তু আবু সাঈদ বলেন : আমি যতোদিন বেঁচে আছি, এক সা'ই দিয়ে যাচ্ছি। সবকটি হাদিস গ্রন্থ। তিরমিযি বলেছেন : আলেমদের কেউ কেউ এটাই অর্থাৎ সব কিছু থেকেই এক সা' দেয়ার পক্ষে। এটা শাফেয়ী ও ইসহাকের মত।

কোনো কোনো আলেম বলেন : গম ছাড়া আর সব কিছুরই এক সা' দিতে হবে। গম থেকে অর্ধ সা' দিলে চলবে। সুফিয়ান, ইবনুল মুবারক ও কুফাবাসীর মতও এটাই।

ফিতরা কখন ওয়াজিব হয়? ফকীহগণ একমত, ফিতরা রমযানের শেষ ভাগে ওয়াজিব হয়। তবে এর সুনির্দিষ্ট সময় নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে। ছাওরী, আহমদ, ইসহাক, শাফেয়ীর মত ও মালেকের দুটি বর্ণিত মতের একটি হলো : ঈদুল ফিতরের রাতের (রমযানের শেষ দিনের) সূর্যাস্তের সময়ে ওয়াজিব হয়। কেননা ওটা রমযানের রোযার পরিসমাপ্তির সময়। আর আবু হানিফা, লায়ছ, শাফেয়ীর পূর্বের মত ও মালেকের দ্বিতীয় মত হলো : ঈদের দিনের সূর্যোদয়ের সময়ে ফিতরা ওয়াজিব হয়।

এই মতভেদের ফলাফল দেখা দেয় ঈদের দিন ফজরের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়- তার বেলায়। তার ফিতরা দেয়া ওয়াজিব কিনা? প্রথমোক্ত মতানুসারে ওয়াজিব নয়। কেননা সে ওয়াজিব হওয়ার সময়ের পরে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর দ্বিতীয় মতানুসারে ওয়াজিব হবে। কেননা ওয়াজিব হওয়ার সময়ের আগেই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

ওয়াজিব হওয়ার সময়ের আগে ফিতরা দেয়া জায়েয কিনা : অধিকাংশ ফকীহের মতে ঈদের একদিন বা দু'দিন আগে ফিতরা দেয়া জায়েয। ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে ফিতরা দিতে। নাফে' বলেছেন : ইবনে উমর ঈদের একদিন বা দু'দিন আগে ফিতরা দিয়ে দিতেন। এর চেয়েও আগে দেয়া জায়েয কিনা তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে।

আবু হানিফার মতে, রমযানের আগে ফিতরা দেয়া জায়েয। শাফেয়ী বলেন : মাসের প্রথম দিনের আগে দেয়া জায়েয। মালেক ও আহমদের প্রসিদ্ধ মতানুসারে একদিন বা দু'দিন আগে দেয়া জায়েয। ইমামগণ একমত, ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার পর দিতে বিলম্ব করলে তা রহিত হয়না। বরং তা ঋণের ন্যায় পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা থেকে যায়। এমনকি মৃত্যুর আগে হলেও তা দিতে হবে। ইবনে সিরীন ও নাখ্য়ী ব্যতিত আর সবাই একমত, ঈদের দিন অতিবাহিত করে ফিতরা দেয়া জায়েয নয়। তাদের মতে, ঈদুল ফিতরের দিনের শেষ অবধি

দেয়া জায়েয। ইবনে সিরীন ও নাখয়ীর মতে, ঈদের দিনের পরও ফিতরা দেয়া জায়েয। আহমদ বলেন : আমি আশা করি ঈদের দিনের পরে দেয়াতে কোনো অসুবিধা হবেনা। ইবনে রিসলান বলেছেন : ঈদের দিনের পরে দেয়া সর্বসম্মতভাবে হারাম। কেননা এটা এক ধরনের যাকাত। কাজেই এটি বিলম্বিত করাতে গুনাহ্ না হয়ে পারেনা। যেমন নামায নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করায় গুনাহ্ হয়। ইতিপূর্বে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, ঈদের নামাযের আগে ফিতরা দিলে তা হবে গৃহিত সদকা, নামাযের পরে দিলে হবে একটা সাধারণ সদকা (যা সব সময় দেয়া যায় এবং দেয়া হয়।)

ফিতরা কারা পাবে : যারা যাকাত পাওয়ার অধিকারী ফিতরা পাওয়ার অধিকারীও তারাই। অর্থাৎ সূরা তাওবার আয়াতে যে আট শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে তারা। এ শ্রেণীগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগণ্য হলো দরিদ্ররা। কেননা ইতিপূর্বেই হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. ফিতরা ধার্য করেছেন রোযাদারকে পবিত্র করার জন্য বেহুদা ও অশালীন কথা ও কাজ থেকে এবং দরিদ্রদেরকে খাওয়ানোর জন্য।

বায়হাকি ও দারু কুতনি বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর রা. থেকে। রসূলুল্লাহ্ সা. ফিতরা ধার্য করেছেন এবং বলেছেন : দরিদ্রদেরকে এ দিন তোমরা অভাবশূন্য করে দাও। অন্য বর্ণনায় : দরিদ্রদেরকে এ দিন ঘরে ঘরে ধর্না দেয়া থেকে অব্যাহতি দাও।

ফিতরা কোন্ জায়গায় দিতে হবে, সে সম্পর্কে যাকাত স্থানান্তর সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিম নাগরিককে ফিতরা দেয়া : যুহরী, আবু হানিফা, মুহাম্মদ ও ইবনে শাবরুমা, অমুসলিম নাগরিকদেরকে ফিতরা দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ .

"যারা (কাফিররা) তোমাদের সাথে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেনি, তাদের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন ও সুবিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বানদের ভালোবাসেন।" (সূরা মুমতাহিনা : আয়াত ৮)

৫৯. সম্পদের যাকাত ছাড়া আর কোনো হক দেয়া কি জরুরি?

ইসলাম সম্পদের ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টিভংগি পোষণ করে। সম্পদ তার দৃষ্টিতে জীবনের শিরা উপশিরা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির অবলম্বন। আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا .

"তোমরা নির্বোধ লোকদের নিকট তোমাদের ধন সম্পদ সমর্পণ করোনা, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য অবলম্বন বানিয়েছেন।" (সূরা নিসা : আয়াত ৫)

এ থেকে বুঝা যায়, যাকাতের বণ্টন এমনভাবে হওয়া চাই, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্য সকল মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হয়, যা পূর্ণ হওয়া একান্ত অপরিহার্য -যাতে সমাজে এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট না থাকে, যে সম্পদ নষ্ট করে এবং যার কোনো অবলম্বন নেই। সম্পদ বণ্টনে সচ্ছলতা আনয়নে যাকাতের পন্থাটাই সর্বোত্তম পন্থা। এদ্বারা একদিকে যেমন ধনীর বিলাসিতা সীমিত হয়, তেমনি দরিদ্রকে সচ্ছলতার পর্যায়ে উন্নীত করে এবং তার জীবন থেকে সংকীর্ণতা ও বঞ্চনার দুঃখ বেদনা দূরীভূত করে।

যাকাত ধনী কর্তৃক দরিদ্রকে প্রদত্ত কোনো করুণা নয়। বরং তা তার অধিকার। যা আল্লাহ

ধনীর হাতে গচ্ছিত রেখেছেন, যাতে সে তার উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারে। এখান থেকে এই মহান সত্যটি প্রমাণিত হয় যে, ধন সম্পদ শুধু ধনীদের একচেটিয়া নয়, বরং তা ধনী দরিদ্র সকলের সমানভাবে। বিনাযুদ্ধে অর্জিত যে সম্পদ অর্থাৎ 'ফাই' এর বণ্টন ব্যবস্থায় যৌক্তিকতা আল্লাহর এ উক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে : كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

"যেনো ধন সম্পদ শুধু তোমাদের ধনিদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান না করতে থাকে"। অর্থাৎ এই বণ্টন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো, সম্পদ যেনো শুধু ধনিদের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে না থাকে, বরং তা ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন হতে থাকা জরুরি।

যাকাত হলো সম্পদের যেটুকু গরীব মানুষেদের অবশ্য প্রাপ্য হক তা, যখন তা দরিদ্রদের অভাব দূর করে, বঞ্চিতদের প্রয়োজন পূর্ণ করে। আর্তদের সচ্ছলতা এনে দেয় এবং তাদের ক্ষুধা দূর করে আহার করায় ও ভীতি দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু যখন যাকাত অভাবীদের অভাব পূরণে যথেষ্ট হয়না, তখন সম্পদে যাকাত ব্যতিত অন্য হক প্রাপ্য হবে। এই হকের সীমা ও পরিমাণ নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হলো অভাব পূরণ। সুতরাং ধনীদের সম্পদ থেকে যতোটুকু নিলে দরিদ্রদের অভাব পূরণ হবে ততোটুকুই নেয়া হবে।

কুরতুবী বলেছেন : "আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সম্পদ দান করে" এই আয়াতাংশ থেকে প্রমাণিত হয় : সম্পদে যাকাত ছাড়াও দরিদ্রদের হক রয়েছে এবং সেই হক দেয়ার মাধ্যমেই দানের পূর্ণতা সাধিত হয়। কেউ কেউ বলেন : এ আয়াতে 'দান করে' দ্বারা ফরয যাকাত বুঝানো হয়েছে। তবে বিশুদ্ধতর মত হলো, এ দ্বারা যাকাতের অতিরিক্ত হক বুঝানো হয়েছে।

দারু কুতনি ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যাকাত ছাড়াও সম্পদে (দরিদ্রের) হক রয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন : "কেবল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোই পুণ্যের কাজ নয়। বরং পুণ্যের কাজ হলো আল্লাহর উপর, আখেরাতের উপর, ফেরেশতাদের উপর, সকল কিতাবের উপর, সকল নবী ও রসূলের উপর ঈমান আনা, আর আল্লাহর প্রেমে আত্মীয় স্বজন, ইয়াতিম মিসকিন, সাহায্য প্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, কৃত ওয়াদা পূরণ করা, আর অভাবে রোগে শোকে ও যুদ্ধ-বিগ্রহে ধৈর্য ধারণ করা। এরাই প্রকৃত সত্যপরায়ণ আর এরাই মুত্তাকি।" -ইবনে মাজাহ, তিরমিযি।

হাদিসটি যদিও সনদের দিক দিয়ে বিতর্কিত, কিন্তু এ আয়াতের বক্তব্য হাদিসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। কেননা আয়াতে নামাযের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "আল্লাহ প্রেমে অর্থ দানের" যে বিষয়টি এখানে রয়েছে তা দ্বারা ফরয যাকাত বুঝানো হয়নি। তা যদি বুঝানো হতো, তাহলে যাকাতের বিষয় দু'বার উল্লেখ করা হতো না।

তাছাড়া আলেমগণ একমত হয়ে বলেছেন : যাকাত আদায়ের পর যখন মুসলমানদের আর কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেজন্য অর্থ দান করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম মালেকের এ উক্তিতেও সবাই একমত এবং আমাদের উপরোক্ত মত তা দ্বারা সমর্থিত হয় যে, "মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করতে যদি মুসলমানদের সমস্ত সম্পদও ব্যয় হয়ে যায় তবুও তাদেরকে মুক্ত করা ওয়াজিব"। তফসীর আল-মানারে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে : অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্থ দান করে অথবা সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তা দান করে।" ইমাম শেখ মুহাম্মদ আবদুহু বলেছেন : "এই দান যাকাতের অতিরিক্ত। এটাও যাকাতের মত অত্যাবশ্যকীয় সৎকর্ম ও মৌলিক পুণ্যকর্ম। যেখানেই অর্থ দানের প্রয়োজন দেখা দেবে এবং এমন সময়ে প্রয়োজন দেখা দেবে, যখন কারো যাকাত দেয়ার সময় হয়নি, যেমন

যাকাত দেয়ার পর ও বছর পূর্ণ হয়ে পুনরায় যাকাত দেয়ার সময় হওয়ার আগেই কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখা গেলো। এরূপ দানের জন্য কোনো নিসাব বা পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। এর পরিমাণ নির্ভর করে সামর্থ্যের উপর। ধরা যাক, কোনো এক ব্যক্তির নিকট মাত্র একটা রুটি রয়েছে। আর ঠিক এ সময় এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলো, যার ঐ রুটিটির প্রয়োজন এতো বেশি যে, না হলে তার জীবনই বাঁচবেনা। অপরদিকে রুটির মালিকের ওটা অতোটা প্রয়োজনীয় নয়, সে যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্বশীল, তাদের কারোই ওটা অতোটা প্রয়োজনীয় নয়, এরূপ অবস্থায় রুটিটি দান করা ওয়াজিব। আর শুধু বিপন্ন ও অসহায় ব্যক্তিরই সাহায্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তা নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুমিনকে আদেশ দিয়েছেন যেনো যাকাত বহির্ভূত অর্থ থেকে আত্মীয় স্বজনকেও দান করে। বদান্যতা, সমমর্মিতা ও সম্পর্ক মজবুত করার স্বার্থে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ ধনী থাকলে স্বভাবতই তার মন তার দিকে আকৃষ্ট হয় অধিকতর সমমর্মিতা ও দয়া সহকারে।

অন্যান্য আত্মীয়ের তুলনায় রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের অভাব ও ক্ষুধায় অধিকতর ব্যথিত হওয়া মানুষরে সহজাত বৈশিষ্ট্য। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সম্মানে সে নিজেকে সম্মানিত আর তার অপমানে নিজেকে অপমানিত বোধ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি রক্ত সম্পর্ক অবজ্ঞা করে এবং তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা যতো কষ্টে থাকে থাকুক নিজের সুখে থাকা চাই-ই চাই, এরূপ মনোভাব পোষণ করে, সে তার সহজাত স্বভাব থেকেও দূরে, ইসলাম থেকেও দূরে এবং পুণ্য ও কল্যাণ থেকে দূরে। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর হয়, তার কাছে তাদের হক অধিকতর অগ্রগণ্য ও তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা অধিকতর মহৎ কাজ বিবেচিত হয়ে থাকে।

আয়াতটিতে ইয়াতিমের বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইয়াতিমের অভিভাবক মারা গেলে তার অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই সচ্ছল ও সহানুভূতিশীল মুসলমানদের উপর ন্যস্ত হয়, যাতে তাদের জীবন জীবিকা ও শিক্ষা দীক্ষা বিপর্যস্ত না হয়। বিপর্যস্ত হলে তো তারা তাদের নিজেদের জন্যও যেমন বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, সমাজের জন্যও তেমন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।

এরপর আসছে মিসকিন অর্থাৎ হতদরিদ্র জন গোষ্ঠির প্রসংগ। মৌলিক প্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জনে অক্ষম হলেও অতি অল্প জীবিকায় তুষ্ট হয়ে তারা অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকে। এ ধরনের লোকদেরকে সাহায্য করা ও সহানুভূতি দেখানো প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে 'ইবনুস্ সাবীল' অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পাথেয় হাতছাড়া হয়েছে এমন মুসাফির, যার কারণে সে আত্মীয়ের সাথে বা পরিবারের সাথে মিলিত হতে সমর্থ নয়। 'ইবনুস্ সাবীল' এর শাব্দিক অর্থ 'পথের ছেলে' অর্থাৎ পথই যেনো তার মা, বাবা ও পরিবার পরিজন। এটা এমন তাৎপর্যময় পরিভাষা, যে অন্য কোনো শব্দ এর সমকক্ষতা দাবি করতে পারেনা।

মুসাফিরকে সাহায্য করা ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবার আদেশ দিয়ে ইসলাম মানুষকে ভ্রমণ ও পর্যটনে উৎসাহিত করেছে।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে সাহায্য প্রার্থীর বিষয়। এরা সেসব আর্ত, পীড়িত ও অভাব অনটনে জর্জরিত মানুষ, যারা সর্বস্তরের জনগণের সাহায্যের জন্য হাত পাততে বাধ্য হয়। এদের প্রসংগটা অপেক্ষাকৃত বিলম্বে এসেছে। কেননা তারা সাহায্য চায় এবং চাওয়ার কারণেই লোকেরা তাদেরকে দেয়। কখনো কখনো মানুষ অন্যকে দেয়ার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে সাহায্য আদায় করে। অনিবার্য প্রয়োজন ও অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতিত সাহায্য চাওয়া শরিয়তে হারাম। কারো সাহায্য চাইতে হলে তার এই অনন্যোপায় অবস্থার সীমা অতিক্রম করা চলবেনা।

আয়াতটিতে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে 'দাস মুক্তি'। দাসদাসি ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়া, যারা মনিবের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি অর্জনের অনুমতি পেয়েছে, সেই 'মুকাতাব' শ্রেণীর দাসদাসিকে তাদের কিস্তি পরিশোধে সাহায্য করা এবং যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিপণ দেয়ায় সাহায্য করাও এর আওতাভুক্ত।

মুসলমানদের সম্পদ থেকে একটি অংশ এই খাতে ব্যয় করাকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করায় প্রমাণিত হয়, ইসলাম মানুষকে গোলামীমুক্ত করতে কতো আগ্রহী। প্রমাণিত হয়, ইসলাম কিছু অনিবার্য সাময়িক পরিস্থিতি ব্যতিত মানুষকে জন্মগতভাবে স্বাধীন বলেই বিবেচনা করে। কিছু অনিবার্য পরিস্থিতি এমন সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে, যখন জনস্বার্থেই বন্দীকে দাসদাসিতে রূপান্তরিত করা ছাড়া গত্যান্তর থাকেনা। এ শ্রেণীকে সবার শেষে উল্লেখ করার কারণ হলো, এ শ্রেণীটির উদ্ভব শুধু প্রাণ রক্ষার খাতিরেও হয়ে থাকে। আর দাসের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়োজনটা তার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থায় উন্নিত হওয়ার জন্যই হয়ে থাকে। এসব শ্রেণীকে সাহায্য করার জন্য যাকাত বহির্ভূত খাত থেকে অর্থ ব্যয়ের যে বাধ্যবাধকতা ইসলামে আরোপ করা হয়েছে, তা কোনো বিশেষ সময়ের মধ্যে সীমিত নয় এবং কোনো নিসাবের সাথেও শর্তযুক্ত নয়। আর মালিকানাভুক্ত মোট সম্পদের তুলনায় প্রদত্ত সাহায্যের আনুপাতিক হারও নির্ধারিত নেই। যেমন তা এক দশমাংশ (উশর), চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা ২.৫০% শতাংশ হবে কিনা ইত্যাদি। এটা সম্পূর্ণ শর্তহীন পরোপকারমূলক একটা দান, যা সম্পূর্ণরূপে দাতার মহানুভবতা ও প্রার্থীর দুর্দশার উপর নির্ভরশীল। মানুষ একটি পরম সম্মানিত প্রাণী। তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির দায়িত্ব। ধ্বংস থেকে রক্ষা করার অতিরিক্ত কে কতদূর করবে তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা পরিসীমা নেই।

এসব গণঅধিকারের অধিকাংশ সম্পর্কেই জনগণ উদাসীন। অথচ পবিত্র কুরআন এগুলোর ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছে। কেননা এগুলোতে সুস্থ, সমন্বিত ও সম্মানজনক সামষ্টিক জীবনের নিশ্চয়তা বিদ্যমান। অথচ অধিকাংশ মানুষ এ সকল অভাবী মানুষকে স্বতস্ফূর্তভাবে সাহায্য দিতে চায়না। একমাত্র যারা সাহায্য প্রার্থী হয় তাদেরকেই কিছু কিছু দিতে দেখা যায়। অথচ তারা এ যুগে সাহায্য পাওয়ার সবচেয়ে কম হকদার। কেননা তারা চাওয়া বা ভিক্ষা করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর পেশাদার ভিক্ষুকদের অধিকাংশই প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে থাকে।

ইবনে হাযম বলেছেন, প্রত্যেক শহরের ধনিদের দায়িত্ব সেই শহরের দরিদ্রদের অভাব মোচন করা। যাকাত ও মুসলমানদের সমগ্র সম্পদ দিয়েও যখন তাদের অভাব মোচন সম্ভব হয়না, তখন শাসকেরও কর্তব্য তাদেরেকে এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা। এরূপ ক্ষেত্রে ধনিরা যা খায় তা থেকে তাদেরকে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করবে, শীত ও গ্রীষ্মের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পোশাক দেবে। বৃষ্টি, রোদ, গ্রীষ্ম ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। এর প্রমাণ রয়েছে পবিত্র কুরআনে : وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

"আত্মীয় স্বজনকে, দরিদ্রজনকে, বিপন্ন পথিককে তার প্রাপ্য দাও।" (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত ২৬)

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

"পিতা মাতার সাথে, আত্মীয় স্বজনের সাথে, ইয়াতিমদের সাথে, মিসকীনদের সাথে, আত্মীয় প্রতিবেশি, অনাত্মীয় প্রতিবেশি ও স্ত্রীর সাথে, বিপন্ন পথিকের সাথে ও দাসদাসির সাথে সদ্ব্যবহার করো।" (সূরা নিসা : আয়াত ৩৬)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা মিসকীন, মুসাফির, দাসদাসি ও আত্মীয় স্বজনের হক দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। আর পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, মিসকীন প্রতিবেশি ও দাসদাসির সাথে সদ্ব্যবহার করারও আদেশ দিয়েছেন। উপরে যা যা উল্লেখ করেছি, তার সবই সদ্ব্যবহারের আওতাধীন। আর এগুলো না করা নিঃসন্দেহে অসদ্ব্যবহার। পরকালে জান্নাতীরা জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসা করবে : مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرٍ قَالُوْا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ .

"তোমাদেরকে কিসে দোযখে ঢুকালো? তারা বলবে : আমরা নামায পড়তামনা এবং অভাবীদের খাওয়াতামনা।" (সূরা মুদ্দাসসির : আয়াত ৪২-৪৪)

এভাবে আল্লাহ মিসকীনকে খাওয়ানো ও নামাযকে একই সাথে উল্লেখ করে উভয়কে সমান গুরুত্বপূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি মানুষের উপর দয়া করেনা, তার উপর আল্লাহ দয়া করেন না।" সুতরাং যে ব্যক্তির প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে এবং তার মুসলমান ভাইকে ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন দেখতে পেয়েও তাকে সাহায্য করলোনা, সে যে তার উপর দয়া দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দীক রা. বলেছেন : সুফফাবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র লোক ছিলেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : যার কাছে দু'জনের খাবার আছে, তার উচিত তৃতীয় একজনকে নিয়ে যাওয়া, আর যার কাছে চার জনের খাবার রয়েছে, তার উচিত পঞ্চম বা ষষ্ঠ জনকে সাথে নিয়ে যাওয়া।

ইবনে উমর রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার উপর যুলুমও করতে পারেনা। তাকে এড়িয়েও যেতে পারেনা।" মুসলমান ভাইকে ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন দেখে তাকে খাদ্য ও বস্ত্র দিতে সক্ষম হয়েও না দেয়া, তাকে এড়িয়ে যাওয়ার শামিল।

আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যার পরিবহন জন্তুর পিঠে অতিরিক্ত স্থান রয়েছে, তার উচিত সেখানে যার কোনো পরিবহন জন্তু নেই তাকে বসানো। আর যার বাড়তি পাথেয় রয়েছে, তার উচিত যার পাথেয় নেই তাকে পাথেয় দেয়া। এরপর তিনি একে একে সেই সকল সামগ্রির নাম উল্লেখ করলেন, যা উল্লেখ করা হয়। ফলে আমরা বুঝলাম, কোনো বাড়তি সামগ্রিতেই আমাদের কোনো অধিকার নেই।

এটা আবু সাঈদ খুদরীর হাদিস হলেও এর উপর সকল সাহাবির মতৈক্য রয়েছে। আর আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীকে দেখাতে যাও ও বন্দীকে মুক্ত করো।"

এর বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে বহু নির্দেশ রয়েছে।

উমর রা. বলেছেন : আমি এখন বিলম্বে যা উপলব্ধি করেছি, তা যদি আগে উপলব্ধি করতাম, তাহলে ধনীদের বাড়তি সম্পদ নিয়ে নিতাম এবং তা দরিদ্র মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করতাম। এ হাদিসের সনদ অত্যন্ত শুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আলী রা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা ধনীদের সম্পদ থেকে এতোটা দান করার আদেশ দিয়েছেন, যতোটা দরিদ্রদের সচ্ছলতা এনে দিতে সক্ষম। তথাপি যদি তারা খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণ না হওয়ায় কষ্ট পায় এবং ধনীরা তা তাদেরকে না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তাদেরকে সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং আল্লাহ সেজন্য তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

ইবনে উমর রা. বলেছেন : "তোমার সম্পদে যাকাত ছাড়াও দরিদ্রদের প্রাপ্য রয়েছে"।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা., হাসান বিন আলী রা. ও ইবনে উমর রা. বলেছেন : তুমি যদি কোনো মর্মান্তিক রক্তঋণ, কোনো ভয়ংকর ঋণ কিংবা তীব্র দরিদ্র জর্জরিত হয়ে কারো কাছে সাহায্য চাও, তাহলে সেটি তোমার অবশ্য প্রাপ্য হবে।

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনশো সাহাবির পক্ষ থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা গেলো, তাদের রসদ শেষ হয়ে গেছে। অতপর আবু উবায়দার নির্দেশে দুইটি থলিতে তাদেরে রসদ সংগ্রহ করা হলো এবং তাদের সকলকে সমানভাবে খাদ্য দেয়া হতে লাগলো।

সুতরাং এটা সাহাবিদের পক্ষ থেকে অকাট্য ও সুনিশ্চিত মতৈক্য এবং তাদের মধ্যে থেকে কেউ এর বিরোধী নেই। শা'বী, মুজাহিদ, তাউস, প্রমুখ বলেছেন : যাকাত ছাড়াও সম্পদে হক রয়েছে। কোনো মুসলমানের নিকট যতোক্ষণ তার সাথি মুসলমান বা অমুসলিম নাগরিককে দেয়ার মতো অতিরিক্ত খাদ্য থাকে, ততোক্ষণ তার পক্ষে ঠেকায় পড়ে মৃতদেহ বা শূকরের গোশ্‌ত খাওয়া হালাল হবেনা। কেননা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়া যার কাছে খাদ্য আছে তার উপর ফরয। এটা তা উপর ফরয হওয়ার কারণেই সে এতোটা নিরুপায় বা ঠেকা নয় যে, মরা প্রাণী বা শূকরের গোশ্‌ত খেতে পারবে। এজন্য তার সশস্ত্র লড়াই করারও অধিকার রয়েছে। এ লড়াইতে সে নিহত হলে তার হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য হবে। আর যে অতিরিক্ত খাদ্যের মালিক হয়েও খাদ্য দেয়নি, সে নিহত হলে তার অভিশপ্ত মৃত্যু হবে। কেননা সে একটা হক দেয়া থেকে বিরত থেকেছে এবং এজন্য সে একজন যালেম। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ .

"এক দল যদি আরেক দলের উপর যুলুম করে, তাহলে যে দল যুলুম করে তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো যতোক্ষণ না সে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে।" আর যে ব্যক্তি তার ভাইকে তার হক দেয়না, সে অবশ্যই তার উপর যুলুমকারী। এ কারণেই আবু বকর সিদ্দীক রা. যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

আমরা কুরআন ও হাদিসের এ সকল উক্তি এতো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলাম শুধু ইসলামে মানুষের প্রতি কতো দরদ ও সহানুভূতির ব্যবস্থা রয়েছে, আধুনিক বিধি ব্যবস্থাগুলোর চেয়ে তা কতো বেশি মহৎ ও উন্নত এবং সেগুলো যে ইসলামের উজ্জ্বল সূর্যের সামনে নিভু নিভু মোমবাতি সদৃশ, সেটাই দেখিয়ে দেয়ার জন্য।

৬০. নফল দান (সাধারণ দান)

ইসলাম মানুষকে শুধু যে দান করার আহ্বান জানিয়েছে তা নয়। বরং এ কাজে তাকে এমনভাবে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেছে যে, তার অন্তরে স্বতস্ফূর্তভাবে বদান্যতা ও মহানুভবতার প্রেরণা জেগে উঠে এবং পরোপকার, জনকল্যাণ ও জনসেবার চেতনায় সে সদা উজ্জীবিত থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এ ব্যয় একটি শস্যদানার মতো যা সাতটি শীষ উদগত করে এবং প্রত্যেক শীষে একশোটি করে শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্য চাইবেন, দ্বিগুণ করে দেবেন। আল্লাহ্ বিশাল, মহাজ্ঞানী।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৬১)

আল্লাহ্ আরো বলেছেন :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

"তোমরা যতোক্ষণ তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে দান না করবে, ততোক্ষণ পুণ্য লাভ করতে পারবেনা। আর তোমরা যে জিনিসই দান করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবগত।" (সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৬০)

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ .

“যে সম্পদে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন, তা থেকে দান করো। তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও দান করবে, তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে”। (সূরা হাদিদ : আয়াত ৭)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ১. “সদকা আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু রোধ করে।” -তিরমিযি।

২. “মুসলমানের সদকা তার আয়ু বৃদ্ধি করে, অপমৃত্যু তথা খারাপ পরিণাম রোধ করে এবং আল্লাহ এ দ্বারা অহংকার ও গর্ব দূর করেন। ” -তিরমিযি।

৩. “প্রতিদিন সকাল বেলা দু'জন ফেরেশেতা নেমে আসে। তাদের একজন বলে : হে আল্লাহ! যে দানশীল, তাকে আরো সম্পদ দাও। আর অপরজন বলে : হে আল্লাহ! যে কৃপণ তার সম্পদ বিনষ্ট করে দাও।” -মুসলিম।

৪. পরোপকারের কাজগুলো খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। গোপন দান আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত করে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে দান করায় আয়ু বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক মহৎ আচরণ সদকা। যারা দুনিয়ার মহৎ আচরণ করে তারা আখেরাতেও মহৎ আচরণ পাবে। যারা দুনিয়ায় খারাপ আচরণ করে, তারা আখেরাতে খারাপ আচরণ পাবে। যারা মহৎ আচরণকারী, তারাই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে। -তাবারানি।

দানের প্রকারভেদ

দান কোনো নির্দিষ্ট ধরনের কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সাধারণ নীতি হলো, প্রত্যেক পরোপকারমূলক কাজই দান বা সদকা।

এ সংক্রান্ত কতিপয় হাদিস নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে :

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ১. “প্রত্যেক মুসলমানের কিছু না কিছু দান বা সদকা করা উচিত। সাহাবিগণ বললেন : হে আল্লাহর নবী, যার দান করার মতো কিছু নেই সে, কী করবে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : সে নিজ হাত দিয়ে কাজ করে উপার্জন করবে, তা দিয়ে নিজের উপকার সাধন করবে এবং তারপর যা বাঁচে, তা দান করবে। লোকের বললো : তাও যদি করতে না পারে? তিনি বললেন : কোনো বিপন্ন লোককে সাহায্য করবে, (চাই সে কোনো নিপীড়িত অথবা অক্ষম লোক হোক) লোকেরা বললো : সে সুযোগও যদি না পায়? তিনি বললেন : তাহলে যে কোনো সৎকাজ ও পরোপকারমূলক করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে, সেটাই তার জন্য দান বলে গণ্য হবে। -বুখারি।

২. প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর প্রত্যেক মানুষের উপর সদকা করা কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়। তন্মধ্যে দু'জনের মধ্যে ইনসাফের সাথে বিবাদ মিটিয়ে দেয়াও সদকা। নিজের জন্তুর পিঠে আরেকজনকে আরোহন করিয়ে সাহায্য করাও সদকা। একটা ভালো কথা বলাও সদকা। নামাযের দিকে আগুয়ান প্রতিটি পদক্ষেপও সদকা। -আহমদ।

৩. আবু যর গিফারী থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নিজের পক্ষ থেকে নিজের উপর সদকা করা কর্তব্য। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, কোথা থেকে সদকা করবো? আমাদের তো সম্পদই নেই। তিনি বললেন : আল্লাহু আকবর, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আসতাগফিরুল্লাহ বলাও সদকা। সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও সদকা। রাস্তা থেকে কাঁটা,

পাথর ও হাড় সরানোও সদকা। অন্ধকে পথের সন্ধান দেয়া, বোবা ও বধিরকে বুঝাতে চেষ্টা করা, কাউকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসের সন্ধান দেয়া যখন তুমি জানো তা কোথায় আছে, সাহায্যপ্রার্থী বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা, দুর্বলকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা এসবই সদকা। এমনকি তোমার স্ত্রীর সাথে সহবাসেও তোমার জন্য সওয়াব রয়েছে। -আহমদ ও মুসলিম।

মুসলিমে আরো রয়েছে : লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ! আমাদের কোনো ব্যক্তি নিজের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে, তাতেও তার জন্য সওয়াব রয়েছে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, সে যদি অবৈধ পন্থায় কাম চরিতার্থ করতো, তাহলে কি তার গুনাহ হতোনা? তেমনি সে যদি বৈধ পন্থায় কাম চরিতার্থ করে; তাহলে তাতে অবশ্যই সওয়াব হবে।

৪. আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানের উপর প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর সদকা করা কর্তব্য। বলা হলো : আমরা এতো সম্পদ কোথায় পাবো যে, প্রতিদিন সদকা দেবো? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : পুণ্য অর্জনের অনেক উপায় রয়েছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া, বধিরকে বুঝানো, অন্ধকে পথ প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় বস্তুর সন্ধান প্রার্থীকে সন্ধান দেয়া, বিপন্ন সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা, দুর্বলকে সাহায্য করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা- এসবই তোমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য সদকা। -ইবনে হিব্বান, বায়হাকি। বায়হাকি আরো উদ্ধৃত করেছেন : তোমার ভাই এর সামনে মুচকি হাসাও সদকা, মানুষের চলাচলের পথ থেকে কাঁটা, পাথর ও হাড় সরানোও সদকা এবং পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখানোও সদকা।

৫. রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করতে সামর্থ্য রাখে, সে যেনো একটা খোরমার একাংশ দান করে হলেও তা করে। আর যে না পারে সে যেনো অন্তত একটা ভালো কথা দ্বারা তা করে। -আহমদ ও মুসলিম (এ হাদিস থেকে জানা গেলো, সদকাকে তুচ্ছ মনে করা অনুচিত।)

৬. রসূলুল্লাহ সা. বললেন : "আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন : হে আদম সন্তান, আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। আদম সন্তান বলবে : হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনাকে কিভাবে দেখবো? আপনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন : তুমি কি জানোনা, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল, তুমি তাকে দেখতে যাওনি। যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে আমাকে তার কাছেই পেতে। হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনাকে কিভাবে খাওয়াবো? আপনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন : তুমি কি জানোনা, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তাকে যদি খাবার দিতে, তাহলে আমার কাছে তুমি তার প্রতিদান পেতে। হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক, আপনাকে কিভাবে পানি পান করবো? আপনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন : আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি যদি তাকে পানি পান করতে তাহলে আমার কাছে তা পেতে। -মুসলিম।

৭. "কোনো মুসলমান যদি কোনো চারা লাগায় বা কোনো শস্য ফলায়, তা থেকে কোনো মানুষ বা পশু কিছু খেয়ে নেয়, তবে তা তার জন্য সদকা গণ্য হবে।" -বুখারি।

৮. "প্রত্যেক কাজ সদকা, আর তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করা এবং তোমার বালতি থেকে তাকে কিছু পানি ঢেলে দেয়াও সৎ কাজ।" -আহমদ, তিরমিযি।

দান পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে কে কে?

সদকা পাওয়ার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে সদকাকারীর সন্তানরা, তার পরিবার পরিজন ও তার আত্মীয় স্বজন। যে ব্যক্তি তার নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য কোনো জিনিসের মুখাপেক্ষী, তার পক্ষে নিজের প্রয়োজন মেটানোর আগে সেই জিনিস অন্যকে দান করা জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদিস নিম্নরূপ :

১. জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ দরিদ্র হয়, তখন নিজের সম্পদ আগে নিজের পেছনে ব্যয় করা উচিত। যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা পরিবারের পেছনে, তারপর উদ্বৃত্ত থাকলে তা আত্মীয় স্বজনের পেছনে ব্যয় করা উচিত। অন্য বর্ণনা মতে : রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের পেছনে। আরো কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে এখানে ও ওখানে।" -আহমদ ও মুসলিম।

২. "তোমরা সদকা করো। এক ব্যক্তি বললো : আমার কাছে একটা দিনার আছে । তিনি বললেন : ওটা তোমার নিজের উপর সদকা করো। (অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করো।) সে বললো : আমার কাছে আরো একটি দিনার আছে। তিনি বললেন : ওটা তোমার চাকরকে দান করো। সে বললো : আমার কাছে আরো একটা দিনার আছে। তিনি বললেন : ওটি সম্পর্কে তুমিই ভালো বুঝবে। -আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম।

৩. "কোনো ব্যক্তি তার পরিবারের কোনো সদস্যকে অভুক্ত রাখবে, এটা তার জন্য মস্ত বড় গুনাহ।" -মুসলিম, আবু দাউদ।

যে দান নষ্ট হয়ে যায়

দাতা যাকে দান করে, তাকে পরবর্তীতে খোটা দেয়া বা কষ্ট দেয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা দেয়া হারাম। এতে দান নষ্ট হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ، كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاۤءَ النَّاسِ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা খোটা দেয়া ও কষ্ট দেয়া দ্বারা তোমদের দানকে নষ্ট করোনা, ঐ ব্যক্তির মতো যে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্য তার সম্পদ দান করে"। (বাকারা : আয়াত ২৬৪)

(খোটা দেয়া মানে : যে সদকা দেয়া হয়েছে, তা মনে করিয়ে দেয়া ও তার কথা আলোচনা করা, তার বিনিময়ে যাকে দেয়া হয়েছে তাকে কোনো কাজে খাটানো অথবা সেজন্য তার উপর বড়াই ও অহংকার করা। আর কষ্ট দেয়া : সদকার কথা এমনভাবে প্রকাশ করা, যাতে যাকে দেয়া হয়েছে সে কষ্ট পায়, অথবা তাকে ধমক দেয়া।)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেননা, তাদের দিকে তাকাবেননা, তাদেরকে পবিত্র করবেননা এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আবু যর বললেন : তারা তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত, হে রসূলুল্লাহ তারা কারা? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে টাখনুর নিচে কাপড় গড়িয়ে নিয়ে চলে, যে দান করে খোটা দেয় এবং যে মিথ্যে শপথ করে পণ্য বিক্রি করে।

হারাম সম্পদ দিয়ে দান করা

দান যখন হারাম মাল দ্বারা দেয়া হয়, তখন আল্লাহ তা কবুল করেন না। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

১. "হে জনতা, আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া গ্রহণ করেননা। তিনি রসূলগণকে যা আদেশ দিয়েছেন, মুমিনদেরকেও তাই আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

يَآيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য খাও এবং সৎ কাজ করো। তোমরা যা করো, তা আমি অবহিত।

আল্লাহ অরো বললেন : يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ .

"হে মুমিনগণ, আমি যে জীবিকা তোমাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র জীবিকা আহার করো।" এরপর রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে, আর মাথার চুল এলোমেলো ও ধুলি ধুসরিত হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় আল্লাহর কাছে দু'হাত মেলে বলে : হে আমার প্রতিপালাক, হে আমার প্রতিপালাক, অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পরিধান করে তাও হারাম এবং হারাম খাদ্য দিয়ে সে পুষ্টি লাভ করে। তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে? -মুসলিম।

২. "যে ব্যক্তি একটি খোরমার সমান সম্পদ নিজের হালাল উপার্জন থেকে দান করে, আল্লাহ তা নিজের ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করেন, তারপর তাকে তার মালিকের জন্য এমনভাবে লালন পালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার দুধ ছাড়ানো ঘোড়ার শাবককে লালন পালন করে। এভাবে লালন পালন করতে করতে এক সময় সেই দান পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। বস্তুত আল্লাহ হালাল সম্পদ ব্যতিত কোনো দান গ্রহণ করেননা। -বুখারি।

স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর দান করা

স্ত্রী যদি নিশ্চিত হয় তার স্বামীর সম্মতি আছে, তাহলে তার সম্পদ থেকে দান করতে পারে। কিন্তু যদি নিশ্চিত না হয়, তাহলে দান করা অবৈধ। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন স্ত্রী তার সংসারের খাদ্য থেকে ন্যায়সংগতভাবে দান করে, তখন সে যা দান করলো তার সওয়াব পাবে। তার স্বামী যা আয় করেছে, সে তার সওয়াব পাবে এবং যে রক্ষক উক্ত দান সংরক্ষণ করে সেও তার সওয়াব পাবে। কেউ কারো সওয়াব কমাবেনা। -বুখারি।

আবি উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনিছি : স্বামীর অনুমতি ব্যতিত স্ত্রী তার বাড়ি থেকে কোনো কিছু ব্যয় করতে পারবেনা। জিজ্ঞাসা করা হলো : হে রসূলুল্লাহ! খাদ্যও নয়? তিনি বললেন : খাদ্য তো আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। -তিরমিযি।

তবে অতি সামান্য বস্তু যা প্রচলিত রীতিতে দূষণীয় মনে করা হয়না, অনুমতি ছাড়াও দান করা জায়েয। আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সা.কে বললেন : যুবাইর (তার স্বামী) অত্যন্ত কড়া মেযাজের মানুষ। আমার কাছে দরিদ্র লোক আসে। তাদেরকে আমি তার সম্পদ থেকে তার অনুমতি ছাড়াই দান করে থাকি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : প্রচলিত প্রথামতে যে স্বল্প পরিমাণ দেয়ার রেওয়াজ রয়েছে, তাই দাও। গোলাজাত করে রেখোনা। তাহলে আল্লাহ গোলাজাত করে রাখবেন এবং তোমাকে দেবেননা। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম।

পুরো সম্পদ দান করে দেয়া

উপার্জনের ক্ষমতা সম্পন্ন সুস্থ সবল লোক যদি তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিতে চায়, তবে

তা দেয়া জায়েয আছে। (ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেছেন : জায়েয থাকলেও এক তৃতীয়াংশের বেশি না দেয়া মুস্তাহাব।

উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেনো আমরা দান করি। আমি কিছু সম্পদ দান করবো বলে স্থির করলাম। মনে মনে বললাম : আবু বকরের চেয়ে তো বেশি দান করতে কখনো পারিনি। আজকে আমি তার চেয়ে বেশি দান করবো। আমি আমার অর্ধেক সম্পদ রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে নিয়ে এলাম। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি তোমার পরিবারের জন্য কতোটুকু রেখে এসেছ? আমি বললাম : যতোটুকু এনেছি, আর এতোটুকু। কিন্তু আবু বকর রা. তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ সা. জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন : তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রসূলকে রেখে এসেছি। আমি বললাম, আমি আপনার সাথে আর কখনো প্রতিযোগিতা করবোনা। -আবু দাউদ, তিরমিযি।

তবে আলেমগণ সমস্ত সম্পদ দান করার জন্য শর্ত আরোপ করেছেন দানকারী যেনো সুস্থ সবল, উপার্জনশীল, ধৈর্যশীল ও ঋণমুক্ত হয় এবং তার দায়িত্বে এমন কেউ না থাকে, যার ভরণ পোষণ তাকে বহন করতে হয়। এ সকল শর্ত পূরণ না হলে এটা মাকরূহ হবে।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদিন রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে ছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি ডিম আকৃতির একটা স্বর্ণপিণ্ড নিয়ে এলো। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ! আমি এটা একটা খনি থেকে পেয়েছি। এটি আপনি নিন। এটি সদকা। এ ছাড়া আমার আর কিছু নেই। রসূলুল্লাহ সা. তাকে উপেক্ষা করলেন। এরপর সে বাম দিক থেকে তার কাছে এলো। তখনও রসূলুল্লাহ সা. তাকে উপেক্ষা করলেন। এরপর সে পেছন দিক থেকে এলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. স্বর্ণপিণ্ডটি নিলেন এবং তৎক্ষণাত ছুড়ে ফেলে দিলেন। লোকটির গায়ে লাগলে সে ব্যথা পেতো বা আহত হতো। তারপর রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমাদের কেউ কেউ এমন যে, তার সমস্ত সম্পদ সদকা করতে নিয়ে আসে, তারপর মানুষের নিকট হাত পাতে। সদকা তো ধনীর দায়িত্ব। -আবু দাউদ, হাকেম।

শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং করেনি এমন অমুসলিমকে দান করা জায়েয : যে অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করেছে আর যে করেনি- উভয়কে সদকা দেয়া জায়েয এবং মুসলমান এজন্য সওয়াব পাবে। আল্লাহ তায়ালা দানকারীদের প্রশংসা করে বলেছেন :

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَاَسِيْرًا.

"তারা আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকিনকে, ইয়াতিমকে ও বন্দীকে খাদ্য খাওয়ায়।" বন্দী হচ্ছে, বশ্যতা স্বীকার করেনি এমন অমুসলিম। আল্লাহ আরো বলেছেন :

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"যারা তোমাদের সাথে ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি বদান্যতা দেখাতে ও সুবিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননা। আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা মুমতাহিনা : আয়াত ৮)

আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমার মা আমার নিকট এলেন। তখনও তিনি মুশরিক। আমি বললাম : "হে রসূলুল্লাহ! আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি কিছু পাওয়ার জন্য উৎসুক। আমি কি তাকে দান করবো? তিনি বললেন : হাঁ তোমার মাকে দান করো।"

জীবজন্তুকে দান করা

১. বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে তীব্র পিপাসায়, কাতর হলো। তারপর একটা কূয়া পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করে বেরুলো। বেরিয়েই দেখলো একটা কুকুর পিপাসায় জিহবা বের করে হাপাচ্ছে। লোকটি তা দেখে মনে মনে বললো, এই কুকুরটি পিপাসায় ঠিক তেমনি কষ্ট পাচ্ছে, যেমন আমি পাচ্ছিলাম। তাই সে আবার কূয়ায় নামলো। নিজের মোজা খুলে তাতে পানি ভরলো। তারপর মোজাটি দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে উপরে উঠলো এবং কুকুরটিকে পান করালো। তারপর সে আল্লাহর শোকর আদায় করলো। আল্লাহ্ তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিলেন। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ্! আমাদের জীবজন্তুতে আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন : প্রত্যেক কলিজাকে সজীব রাখাতে সওয়াব রয়েছে।

২. বুখারি ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : একটি কুকুর পিপাসায় প্রায় মরার উপক্রম হয়ে একটা কূয়ার পাশ দিয়ে ঘুরছিল। বনী ইসরাইলের এক ব্যভিচারিণী তাকে দেখে নিজের পায়ের মোজা খুলে তার জন্য পানি তুললো এবং তাকে পানি পান করালো। এতে তার গুনাহ্ মাফ হয়ে গেলো।

সদকায়ে জারিয়া (প্রবহমান দান)

আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায় কেবল তিনটি জিনিস ব্যতিত : ১. সদকা জারিয়া (চলমান দান), ২. এমন বিদ্যা যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় অথবা ৩. এমন সৎ সন্তান যে, তার জন্য দোয়া করে। -আহমদ, মুসলিম।

দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

১. আবু দাউদ ও নাসায়ীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় চায়, তাকে তোমরা আশ্রয় দাও, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে কিছু চায়, তাকে দান করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দাও, যে ব্যক্তি তোমাদের কিছু দান করে তার প্রতিদান দাও, যদি কিছু দিতে না পারো তবে তার জন্য দোয়া করো, যাতে সান্ত্বনা পাও যে, তাকে কিছু প্রতিদান দিয়েছ।

২. আহমদ আশয়াস বিন কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের শোকর করেনা, সে আল্লাহর শোকর করেনা।

৩. তিরমিযি উসামা বিন যায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যার কোনো উপকার করা হলো এবং সে তার উপকারকারীকে বললো : "আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন" সে প্রচুর প্রশংসা করলো।

❖❖❖

সিয়াম (রোযা)

১. সিয়াম : অর্থ, ফযিলত ও প্রকারভেদ

আরবী সিয়াম শব্দটির আভিধানিক অর্থ সংযত হওয়া বা নিবৃত্ত হওয়া। আল্লাহ্ বলেন :

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا .

“আমি দয়াময় আল্লাহর নামে সওম মানত করেছি।” অর্থাৎ বাক সংযম করার মানত করেছি।

এখানে সিয়াম দ্বারা বুঝানো হয়েছে নিয়ম সহকারে ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে নিবৃত্ত থাকা।

রোযার ফযিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা বলেন : আদম সন্তানের সকল কাজই তার নিজের জন্য। কেবল রোযা ব্যতিত। রোযা আমার জন্য। (আমার জন্য বলার উদ্দেশ্য রোযাকে মর্যাদাপূর্ণ করা) আর আমিই তার প্রতিদান দেবো। (হাদিসটির কুদসী অংশ এখানে শেষ। পরবর্তী অংশ রসূল সা. এর নিজের উক্তি) আর রোযা একটা ঢাল। (যা গুনাহ্ থেকে রক্ষা করে) তোমাদের কেউ যেদিন রোযা রাখবে, সেদিন সে যেনো কোনো অশ্লীল কথা না বলে, চিৎকার না করে এবং অভদ্র আচরণ না করে। কেউ যদি তাকে গালাগাল বা তার সাথে মারামারি করতে আসে, তবে সে যেনো দু'বার বলে : আমি রোযা রেখেছি। মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতে, সেই আল্লাহর কসম, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ (রোযার কারণে পরিবর্তিত গন্ধ) কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়েও সুগন্ধিপূর্ণ। আর রোযাদারের দুটো আনন্দ : যখন ইফতার করে, তখন ইফতার করার আনন্দ, আর যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোযার কারণে আনন্দ লাভ করবে। -আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী।

২. বুখারি ও আবু দাউদে বর্ণিত : “রোযা একটা ঢাল। তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখবে, তখন সে যেনো অশ্লীল কথা না বলে ও অভদ্র আচরণ না করে। কেউ যদি তার সাথে মারামারি বা গালাগালি করতে আসে তবে সে যেনো দু'বার বলে : আমি রোযাদার। যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর কসম : রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও পবিত্র। সে আমার উদ্দেশ্যেই তার পানাহার ও যৌনাচার বর্জন করে। রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেবো। আর প্রত্যেক সৎ কাজের প্রতিদিন তার দশগুণ।”

৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : রোযা ও কুরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে : হে আমার প্রতিপালক! ওকে আমি দিনের বেলা পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে : ওকে আমি রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। অত:পর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। - আহমদ।

৪. আবু উমামা রা. বর্ণনা করেছেন : আমি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আমাকে এমন একটা কাজের আদেশ দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন :

তোমার রোযা রাখা উচিত। এর সমতুল্য কিছুই নেই। এরপর আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি আবারও বললেন : তোমার রোযা রাখা উচিত। -আহমদ, নাসায়ী।

৫. আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো বান্দা আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখলেই সেদিনের বিনিময়ে আল্লাহ তার কাছ থেকে দোযখকে সত্তর বছর দূরে নিয়ে যাবেন। - আবু দাউদ ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত।

৬. সাহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে, তার নাম রাইয়ান। কেয়ামতের দিন বলা হবে রোযাদাররা কোথায়? অতপর যখন সর্বশেষ রোযাদার প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। -বুখারি ও মুসলিম।

রোযা দু'রকম : ফরয ও নফল। আবার ফরয রোযা তিন রকমের :
১. রমযানের রোযা। ২. কাফফারার রোযা। ৩. মানতের রোযা।

এখানে কেবল রমযানের রোযা ও নফল রোযা নিয়েই আলোচনা করা হবে। অন্যান্য রোযা নিয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

২. রমযানের রোযা

বিধান : রমযানের রোযা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে ফরয।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমী হতে পারো।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩)

মহান আল্লাহ আরো বলেন : "রমযান মাস, এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের পথ প্রদর্শক হিসেবে, হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলির বাহক হিসেবে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী হিসেবে। কাজেই তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ এ মাসটি পাবে সে যেনো এ মাসে রোযা রাখে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এই সাক্ষ্য দান। নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা ও আল্লাহর ঘরে হজ্জ করা। তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করলেন : হে রসূলুল্লাহ, আল্লাহ আমার উপর কোন্ রোযা ফরয করেছেন আমাকে বলুন। তিনি বললেন : রমযান মাসের রোযা। সে বললো, এছাড়া আর কোনো রোযা আমাকে রাখতে হবে কি? তিনি বললেন : না, তবে নফল রোযা রাখতে পারো।

এছাড়া সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মতৈক্য রয়েছে যে, রমযানের রোযা ফরয, এটা ইসলামের পাঁচটা স্তম্ভের অন্যতম, যা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিচিত এবং যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করে, সে কাফের ও মুরতাদ।

হিজরি দ্বিতীয় বছরের শাবান মাসের দুই তারিখ সোমবার রোযা ফরয হয়েছে।

৩. রমযান মাস ও এ মাসের আমলের ফযিলত

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রমযান সমাগত হলে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমাদের কাছে একটি কল্যাণময় মাস এসেছে। এ মাসের রোযা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানের

পায়ে বেড়ি পরানো হয়। এ মাসে একটা রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসের কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত, সে তো বঞ্চিতই। - আহমদ, নাসায়ী।

২. আরফাজা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি উতবা বিন ফারকাদের নিকট ছিলাম। তিনি রমযান সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন : মুহাম্মদ সা.এর সাহাবিদের মধ্য থেকে একজন আমাদের কাছে এলেন। তাকে দেখে উতবা ভড়কে গেলেন এবং নীরব হয়ে গেলেন। তিনি রমযান সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করলেন। বললেন : রসূলুল্লাহ সা.কে রমযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি : এ মাসে দোযখের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বেহেশতের দরজাগুলো খোলা হয় এবং শয়তানের পায়ে শৃংখল পরানো হয়। এ মাসে একজন ফেরেশতা আহ্বান জানায় : হে কল্যাণ সন্ধানী, সুসংবাদ নাও, আর হে দুষ্কর্ম সন্ধানী, রমযান শেষ হওয়া পর্যন্ত থামো। - আহমদ ও নাসায়ী।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমা থেকে জুমা ও রমযান থেকে রমযান মধ্যবর্তী সময়কার সমস্ত গুনাহর জন্য কাফফারা যদি কবীরা গুনাহ বর্জন করা হয়। -মুসলিম।

৪. আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে, এর সীমারেখা জানে এবং যেসব কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত, তা থেকে আত্মরক্ষা করে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়। -আহমদ, বায়হাকি।

৫. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

৪. রমযানে রোযা ভাংগার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইসলামের স্তম্ভ তিনটে; যার উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, যে ব্যক্তি এর কোনো একটি বর্জন করবে, সে কাফের এবং তার রক্ত হালাল! আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই- এই সাক্ষ্য দেয়া, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়া ও রমযানের রোযা রাখা। -আবু ইয়ালা, দায়লামি।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানের কোনো একদিন আল্লাহর অনুমোদিত কারণ ছাড়া রোযা ভংগ করবে, সে যদি সারা জীবনও রোযা রাখে, তবু তাতে তার ভংগ করা রোযার কাযা আদায় হবেনা। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। বুখারি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : যে ব্যক্তি রমযানের একদিনও কোনো ওযর বা রোগ ব্যতিত রোযা ভংগ করবে, সে যদি এরপর সারা জীবনও রোযা রাখে, তবু তার কাযা আদায় হবেনা। ইবনে মাসউদও এরূপ বলেছেন।

ইমাম যাহাবি বলেছেন : মুমিনদের নিকট সর্বস্বীকৃত যে, যে ব্যক্তি কোনো রোগ ছাড়া রমযানের কোনো রোযা ত্যাগ করে সে ব্যভিচারী ও মদখোরের চেয়েও অধম। বরং তার মুসলমান থাকা নিয়েই মুসলমানরা সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তাকে কাফের ও ধর্মত্যাগী বলে ধারণা করে।

৫. রমযান কিভাবে প্রমাণিত হয়

শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হবার পর অথবা একজন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মুমিন ব্যক্তি চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিলেও রমযান মাস প্রমাণিত হবে।

১. ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : লোকেরা চাঁদ দেখাদেখি করলো। আমি রসূলুল্লাহ সা.কে জানালাম : আমি চাঁদ দেখেছি। এর ফলে রসূলুল্লাহ সা. রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। -আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে হাব্বান।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ভংগ করো। যদি চাঁদ দেখতে না পাও তাহলে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। -বুখারি ও মুসলিম।

তিরমিযি বলেছেন : অধিকাংশ আলেম এই মত অনুসারেই কাজ করেন। তারা বলেন : রোযা রাখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। ইবনুল মুবারক, শাফেয়ি ও আহমদ এই মতই পোষণ করেন। নববী বলেন : এটাই বিশুদ্ধতম মত।

পক্ষান্তরে শাওয়ালের চাঁদ রমযানের ত্রিশ দিন সম্পূর্ণ করার পর প্রমাণিত হয় এবং এতে একজন সৎ লোকের সাক্ষ্য অধিকাংশ ফকীহের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তারা দু'জন সৎ লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়ার শর্ত আরোপ করেন। তবে আবুছ ছাওর শাওয়ালের চাঁদ ও রমযানের চাঁদে পার্থক্য করেন না। তিনি বলেন : একজন সৎ লোকের সাক্ষ্য শাওয়ালের চাঁদের ব্যাপারেও গ্রহণযোগ্য হবে।

ইবনে রুশদ বলেছেন : আবু বকর ইবনুল মুনযির ও আবুছ ছাওরের অভিমত একই রকম। আমি মনে করি, যাহেরি মাযহাবের অভিমত এটাই।

আবু বকর ইবনুল মুনযির, যুক্তি প্রদর্শন করেছেন : এক ব্যক্তির সাক্ষ্যে যখন রোযা রাখা ও রোযা ভাংগা বাধ্যতামূলক হয়। তখন মাসের আগমন ও নির্গমনেও এক ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট হওয়া অপরিহার্য। কেননা উভয়টিই রোযার সময়কে রোযা ভংগের সময় থেকে পৃথক করে।

শওকানি বলেছেন : রোযা ভংগের সাক্ষ্যের ব্যাপারে দু'জনেকে গ্রহণ করার পক্ষে যখন কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়না, তখন এটাই স্পষ্ট যে, রোযা রাখার উপর কেয়াস্ করে রোযা ভংগ করার ক্ষেত্রেও এক ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।

তাছাড়া এক ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণ করে ইবাদত করা প্রমাণ করে, এটা সব ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা যাবে। তবে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে একজনের সংবাদ গ্রহণ করে ইবাদত না করার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেলে সেকথা, স্বতন্ত্র। যেমন অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে বা অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ। সুতরাং আবুছ ছাওরের মতটাই অগ্রগণ্য।

৬. চাঁদ উদয়ের স্থানভেদ

অধিকাংশ আলেমের মতে চাঁদ উদয়ের স্থানের ভেদাভেদ গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যখন কোনো এক ব্যক্তি চাঁদ দেখতে পায়, তখন সব মানুষের উপর রোযা রাখা ফরয হয়ে যায়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ভাংগো।" এ আদেশ সমগ্র উম্মতের প্রতি প্রযোজ্য। কাজেই কোনো মুসলমান যে কোনো জায়গায় চাঁদ দেখলে সেটা সকল মুসলমানের চাঁদ দেখার শামিল হবে।

তবে ইকরামা, কাসেম বিন মুহাম্মদ, সালেম, ইসহাক, হানাফিদের বিশুদ্ধ মত ও শাফেয়িদের অগ্রগণ্য মত হলো : প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা শুধু তাদের জন্যই বিবেচ্য। অন্য দেশের চাঁদ দেখা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কেননা কুরাইব বর্ণনা করেছেন : আমি সিরিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমি শুক্রবার সন্ধ্যায় রমযানের চাঁদ দেখলাম। তারপর মাসের শেষে মদিনা গেলাম। ইবনে আব্বাস আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কবে চাঁদ

দেখেছিলে? আমি বললাম : শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখেছি। তিনি বললো : তুমি দেখেছ? আমি বললাম : হাঁ, আমিও দেখেছি, লোকেরাও দেখেছে। সবাই রোযা রেখেছে। মুয়াবিয়াও রোযা রেখেছেন। তিনি বললেন : কিন্তু আমরা শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। কাজেই আমরা চাঁদ দেখা অথবা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করা পর্যন্ত রোযা রাখবো। আমি বললাম : মুয়াবিয়ার চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে আপনি যথেষ্ট মনে করছেন না? তিনি বললেন : না। আমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ সা. এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।" -আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি।

তিরমিযি বলেছেন : এ হাদিস উত্তম ও বিশুদ্ধ। আলেমগণ এই হাদিস অনুসারেই কাজ করেন এবং প্রত্যেক দেশের জন্য সেই দেশের অধিবাসীদের চাঁদ দেখাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন। বুলুগুল মুরামের টীকা ফাতহুল আল্লামে বলা হয়েছে : সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, যে দেশে চাঁদ দেখা গেছে, সেই দেশের ও তদসংলগ্ন অঞ্চলের জনগণের জন্য তা বাধ্যতামূলক হবে।

৭. যে ব্যক্তি একা চাঁদ দেখে

ফকীহগণ মতৈক্যে পৌঁছেছেন, যে ব্যক্তি একা চাঁদ দেখতে পায়, তার উপর রোযা রাখা ফরয। তবে আতা এর বিরোধিতা করে বলেছেন : তার সাথে অন্য কেউ চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তার রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। অবশ্য একাকি শাওয়ালের চাঁদ দেখা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে রোযা ভাংতে হবে এই মতটাই সঠিক। শাফেয়ি ও আবুছ ছাওরের অভিমত এটাই। কেননা চাঁদ দেখে রোযা রাখতে ও রোযা ভাংতে রসূল সা. আদেশ দিয়েছেন। সে নিজে যখন নিশ্চিতভাবেই দেখেছে এবং এটা তার অনুভূতির ব্যাপার। তখন তার সাথে অন্য কারো শরিক হবার প্রয়োজন নেই।

৮. রোযার ফরয

রোযার দুটো ফরয, যা দ্বারা রোযার গঠিত হয় :

১. ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

"এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও, তোমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা অন্বেষণ করো এবং পানাহার কর যতোক্ষণ না তোমাদের কাছে সাদা সুতো কালো সুতো থেকে পৃথক হয় অর্থাৎ ভোর হয়, তারপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮২)

সাদা সুতো অর্থ দিনের সাদা রেখা আর কালো সুতো অর্থ রাতের অন্ধকার। কেননা বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে : আদী ইবনে আবি হাতেম বলেছেন : এ আয়াত নাযিল হবার পর আমি একটা সাদা রশি ও এটা কালো রশি যোগাড় করে আমার বালিশের নিচে রাখলাম। রাতের বেলা দুটোকে দেখতে লাগলাম। কিন্তু আমার কাছে কিছুই পরিষ্কার হচ্ছিল না। সকালে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট গিয়ে ঘটনা জানালাম। তিনি বললেন : সাদা সুতো হলো দিনের আলো আর কালো সুতো হলো রাতের অন্ধকার।

২. নিয়ত : দ্বিতীয় ফরয হলো রোযার নিয়ত করা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ .

"তাদেরকে শুধু আদেশ দেয়া হয়েছে আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য 'নির্দিষ্ট' করে তাঁর ইবাদত করতে।" (সূরা বাইয়েনা : আয়াত ৫)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কাজগুলো শুধু নিয়ত দ্বারাই নির্ণিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু তাই পায়, যা সে নিয়ত করে।" -সহীহ্ বুখারি।

রমযানের প্রত্যেক রাতে ফজরের আগেই নিয়ত করা জরুরি।[১]

হাফসা রা. বলেছেন : "যে ফজরের আগেই রোযা রাখার ব্যাপারে মন স্থির করেনা, তার রোযা হয়না।" (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান) রাতের যে কোনো অংশে নিয়ত করলে তা শুদ্ধ। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা এটা মনের কাজ। এতে জিহ্বার করণীয় কিছু নেই। কেননা নিয়তের মূল কথা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও আদেশ পালন করার জন্য কাজ করার সংকল্প করা। কাজেই যে ব্যক্তি রোযার উদ্দেশ্যে, সাহরী খায় এবং আত্মসংযমের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায়, তার নিয়ত সম্পন্ন হয়ে যায়। আর কেউ যদি সাহরী নাও খায়, কিন্তু রোযা বিনষ্টকারী সব কাজ দিনের বেলায় বর্জন করার জন্য বদ্ধপরিকর হয় ঐকান্তিকভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে, তারও নিয়ত শুদ্ধ হয়। অনেক ফকীহ বলেছেন : নফল রোযার নিয়ত দিনের বেলায় করলেও চলবে যদি তার আগে পানাহার না করে থাকে।

আয়েশা রা. বলেন, "রসূল সা. একদিন আমার কাছে এলেন এবং বললেন : তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : আমি রোযাদার (আমি রোযা রাখলাম)।" -মুসলিম, আবু দাউদ।

হানাফিদের মতে দুপুরের আগেই নিয়ত করা জরুরি। শাফেয়িরও প্রসিদ্ধ মত এটাই। ইবনে মাসউদ ও আহমদের দুই মতের মধ্য থেকে এটাই অধিকতর পরিচিত যে, দুপুরের আগে বা পরে যখনই নিয়ত করুক, তা যথেষ্ট হবে।

৯. কার কার উপর রোযা ফরয

আলেমগণ একমত হয়েছেন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক, নিরোগ, নিজ আবাসিক এলাকায় অবস্থানরত মুসলমানের উপর রোযা ফরয। মহিলাদের জন্য হায়েয ও নেফাস থেকে মুক্ত থাকা শর্ত। কাজেই কোনো কাফের, উন্মাদ, শিশু, রোগী, মুসাফির, হায়েয, নেফাসধারী মহিলা, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী মা এবং অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর রোযা রাখা ফরয নয়। এদের মধ্যে কতকের উপর তো রোযা আদৌ ফরয নয়- যেমন কাফের ও উন্মাদ। কতক এমন যে, তাদের অভিভাবক তাদেরকে রোযা রাখার আদেশ দেবে। কতকের উপর আপাতত রোযা ভাংগা ও পরে কাযা করার হুকুম, আর কতক রোযা ভাংবে ও ফিদিয়া দেবে। এই শ্রেণীগুলোর বিবরণ নিম্নে আলাদাভাবে দেয়া হলো :

১০. কাফের ও উন্মাদের রোযা

রোযা ইসলামের একটি ইবাদত। কাজেই এটা অমুসলিমদের উপর ফরয নয়। আর পাগলের উপরও রোযার হুকুম নেই। কেননা যে বিবেক বুদ্ধির উপর দায়িত্ব অর্পণ নির্ভরশীল, সেই বিবেক বুদ্ধি থেকেই সে বঞ্চিত। আলী রা. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিন ব্যক্তির উপর থেকে আল্লাহর কলম তুলে নেয়া হয়েছে। পাগল, যতোক্ষণ তার চেতনা-বুদ্ধি ফিরে না আসে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতোক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং বালক যতোক্ষণ প্রাপ্তবয়স্ক না হয়। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি।

---

১. নিয়ত মানে- সংকল্প করা, মানসিকভাবে আজকে রোযা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। নিয়তের জন্যে আমাদের দেশে যে বাক্য পাঠ করার প্রচলন দেখা যায় তা সুন্নত সম্মত নয়। -সম্পাদক।

১১. বালকের রোযা

বালকের উপর যদিও রোযা ফরয নয়, তবে তার অভিভাবকের উচিত তাকে রোযা রাখার আদেশ দেয়া, যাতে ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস গড়ে উঠে। তবে এজন্য তার সক্ষমতা শর্ত।

রুবাঈ বিনতে মুয়াওয়ায থেকে বর্ণিত : রসূল সা. আশুরার দিন সকালে আনসারদের পল্লীগুলোতে বার্তা পাঠালেন : যে ব্যক্তি রোযা রেখেছে, সে যেনো রোযা পূর্ণ করে, আর যে ব্যক্তি রোযা ভেংগেছে, সে যেনো অবশিষ্ট দিন রোযা রাখে। এরপর থেকে আমরা এই দিন রোযা রাখতাম, আমাদের ছোট বালকদেরকে রোযা রাখাতাম এবং মসজিদে যেতাম, অতপর তাদের জন্য পশম দিয়ে খেলনা বানাতাম। তাদের কেউ যখন খাবার জন্য কাঁদতো, তখন তাদেরকে ঐ খেলনা দিতাম, যাতে ইফতার পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকে। -বুখারি, মুসলিম।

১২. রোযা ভংগ করার অনুমতি ও ফিদিয়া দেয়ার হুকুম যাদের উপর

অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলার রোযা ভংগ করার অনুমতি রয়েছে। অনুরূপ, এমন রোগীর, যার রোগ নিরাময়ের আশা নেই এবং অত্যন্ত কষ্টকর কাজে নিয়োজিতদের। যাদের ঐ কাজ ছাড়া জীবিকা উপার্জনের আর কোনো সুযোগ নেই। এসব শ্রেণীর পক্ষে যখন বছরের সকল ঋতুতেই রোযা রাখা অত্যধিক কষ্টকর, তখন এদের জন্য রোযা ভাংগার অনুমতি রয়েছে। তবে প্রতিদিনের জন্য একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার দেয়া তাদের জন্য জরুরি। এই খাবারের পরিমাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ নেই।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : অতিশয় বৃদ্ধের জন্য রোযা ভাংগার অনুমতি রয়েছে। তবে প্রতিদিন বিনিময়ে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার দিতে হবে। তার রোযার কিন্তু কোনো কাযা করতে হবেনা। -দার কুতনি ও হাকেম।

বুখারি আতা থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি ইবনে আব্বাসকে এ আয়াত পড়তে শুনেছেন : "যাদের পক্ষে রোযা রাখা অতিশয় কষ্টসাধ্য তাদের উপর একজন মিসকিনের খাবার দেয়া জরুরি" (সূরা বাকারা : ১৮৪)। ইবনে আব্বাস বলেছেন : এ আয়াত মানসূখ (রহিত) নয়। এটা অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলার জন্য : যারা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখেনা। তার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে। (ইমাম মালেক ও ইবনে হাযমের মতে, তাকে ফিদিয়াও দিতে হবেনা, কাযাও করতে হবেনা)।

আর যে রোগীর রোগ সারবার আশা নেই এবং রোযা রাখা অতিশয় কষ্টকর তার বিধান অতিশয় বৃদ্ধের মতোই। কোনো পার্থক্য নেই। কঠিন শ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকরাও তদ্রূপ।

শেখ মুহাম্মদ আবদুহু বলেছেন : আয়াতে "যাদের জন্য রোযা রাখা কষ্টকর" একথাটা দ্বারা অতিশয় বৃদ্ধ ও নিরাময়ে হতাশ রোগী ও তদ্রূপ কঠোর শ্রম যথা পাথুরে কয়লার খনির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এদের মধ্যে সেসব দণ্ডিতরাও অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আজীবন কঠিন শ্রমে নিয়োজিত রাখা হয়। তাদের রোযা রাখা কার্যত কষ্টকর হলে এবং তারা ফিদিয়া দিতে সক্ষম হলে তাদের রোযা ভাংগার অনুমতি রয়েছে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী মা : এই দুই শ্রেণী রোযা ভাংতে পারবে তখনই যখন নিজেদের ও তাদের সন্তানদের জীবনের আশংকাবোধ করবে (ধারণা, অভিজ্ঞতা কিংবা ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী)। তাদের ফিদিয়া দিতে হবে, কিন্তু কাযা করতে হবেনা। এটা ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাসের অভিমত।

আবু দাউদ ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন : উক্ত আয়াতে অতিশয়

বৃদ্ধ নারী ও পুরুষ রোযা রাখতে সক্ষম হলেও প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাওয়ানোর শর্তে তাদেরকে রোযা ভাংগার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী শিশুর জীবনের আশংকাবোধ করলে রোযা ভাংবে ও খাওয়াবে। -বাযযার। ইবনে আব্বাস তার জনৈকা গর্ভবতী দাসীকে বলতেন : তুমি অক্ষমদেরই একজন। সুতরাং তুমি ফিদিয়া দাও। তোমার কাযা করতে হবেনা।

নাফে থেকে বর্ণিত, গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : সে যদি সন্তানের জীবন নিয়ে আশংকাবোধ করে তবে রোযা ভাংবে এবং প্রতিদিন একজন মিসকিনকে এক মুদ গম দেবে। -মালেক, বায়হাকি।

অপর হাদিসে বলা হয়েছে : আল্লাহ তায়ালা মুসাফিরকে রোযা ও অর্ধেক নামায থেকে এবং গর্ভবতী ও ধাত্রীকে রোযা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

হানাফি ফকীহগণ, আবু উবাইদ ও আবুছ ছাওরের মতে স্তন্য দানকারিণী ও গর্ভবতী ফিদিয়া দেবেনা, কেবল কাযা করবে। শাফেয়ি ও আহমদের মতে, তারা যদি শুধু শিশুর জীবনের আশংকাবোধ করে তাহলে রোযা ভাংবে এবং তাদের উপর কাযা ও ফিদিয়া উভয়ই জরুরি। আর যদি শুধু নিজেদের জীবনের আশংকাবোধ করে অথবা নিজেদের ও শিশুদের উভয়ের জীবনের আশংকাবোধ করে, তাহলে তাদেরকে শুধু কাযা করতে হবে, ফিদিয়া নয়।

১৩. যাদের জন্য রোযা ভাংগার অনুমতি আছে এবং কাযা ওয়াজিব

যে রোগীর রোগ নিরাময়ের আশা আছে তার ও মুসাফিরের রোযা ভাংগার (না রাখার) অনুমতি আছে এবং উভয়ের রোযা কাযা করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ -

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা সফরে থাকবে, সে পরবর্তী দিনগুলোতে তা পূরণ করবে।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)

আহমদ, আবু দাউদ ও বায়হাকি মুয়ায রা. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর উপর রোযা ফরয করেছেন এবং নাযিল করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ .

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল" থেকে "আর যাদের জন্য রোযা অতিশয় কষ্টসাধ্য, তাদের উপর একজন মিসকিনের খাবারের পরিমাণ ফিদিয়া ধার্য হয়েছে।" এজন্য যে ইচ্ছা রোযা পালন করতো রোযা রাখতো, আর যে ইচ্ছা একজন মিসকিনকে খাবার দিতো।

এটাই তার জন্য যথেষ্ট হতো। এরপর আল্লাহ আর একটা আয়াত নাযিল করলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ إِلَى قَوْلِهِ : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .

"রমযান মাস, যে মাসে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন" থেকে "কাজেই তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে, সে যেনো রোযা রাখে।" (সূরা বাকারা : ১৮৫)

এভাবে তিনি মুকিম সুস্থ্য ব্যক্তির উপর রোযা বাধ্যতামূলক করলেন। রোগী ও মুসাফিরকে অব্যাহতি দিলেন এবং রোযা রাখতে অক্ষম বৃদ্ধের জন্য দরিদ্রকে খাওয়ানোর আদেশ দিলেন।"
রোগ যখন জটিল হয় এবং রোযা রাখলে তা আরো বাড়বে বা আরোগ্য হওয়া বিলম্বিত হবে বলে আশংকা হয়, তখন সেই রোগে রোযা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। (রোগের বৃদ্ধি বা

নিরাময় বিলম্বিত হওয়া অভিজ্ঞতা, ধারণা বা বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারের মতামত দ্বারা জানা যেতে পারে।)

আল মুগনীতে বলা হয়েছে : কোনো কোনো প্রাচীন মনীষী কোনো রোগে রোযা ভাংগার অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি আংগুল ও দাঁতের ব্যথার জন্যও। কেননা আয়াতে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ দ্বারা রোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেহেতু মুসাফিরের দরকার না হলেও রোযা ভাংগার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কাজেই রোগীর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ হবে। এটাই বুখারি, আতা ও যাহেরি মাযহাবের মতো। আর যে সুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলে রোগের আশংকা করে সে রোগীর মতো রোযা ভাংগতে পারবে। অনুরূপ, যে ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসায় এতো কাতর হয়ে পড়ে যে, মৃত্যুর আশংকাবোধ করে, তার জন্য রোযা ভংগ করা বাধ্যতামূলক, যদিও সে সুস্থ ও মুকিম হয়ে থাকে। তবে তাকে কাযা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর দয়ালু।" (সূরা ৪ নিসা : আয়াত ২৯)

আল্লাহ আরো বলেছেন : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ .

"আল্লাহ তোমাদের জন্য দীনে কোনো অচলাবস্থার সৃষ্টি করেননি।" (সূরা হজ্জ : আয়াত ৭৮)।

আর যখন রোগী কষ্ট করে রোযা রাখে, তখন তার রোযা শুদ্ধ হবে। তবে আল্লাহর পছন্দনীয় অবকাশকে সে উপেক্ষা করায় এটা মাকরূহ হবে। কেননা এতে তার ক্ষতিও হতে পারে। রসূল সা.-এর আমলে কোনো কোনো সাহাবি রসূল সা.-এর নির্দেশনা অনুযায়ী রোযা রাখতেন, কেউবা রোযা ভাংতেন।

হামযা আসলামী বললেন : "হে রসূলুল্লাহ, আমি সফরের সময়ে রোযা রাখার সামর্থ্য অনুভব করি। আমার রোযা রাখাতে কি কোনো অসুবিধা আছে! রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া একটা অবকাশ। এটা গ্রহণ করাও ভালো। না করলেও ক্ষতি নেই।" -সহীহ মুসলিম।

আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত : "আমরা রসূল সা.এর সাথে মক্কা অভিযানে গেলাম। এখন আমরা রোযা রেখেছিলাম। অত:পর আমরা এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলাম। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমরা তোমাদের শত্রুর কাছাকাছি এসে পড়েছ। এখন রোযা ভংগ করলে তোমাদের শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি হবে। তবে এটা ছিলো অবকাশ। তাই আমাদের কেউ রোযা রাখলো, কেউ ভাংলো। পুনরায় অন্য এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলাম। এবার তিনি বললেন : তোমরা সকাল বেলা তোমাদের শত্রুর মুখোমুখী হবে। রোযা ভাংলে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে। অতএব রোযা ভাংগো। এটা ছিলো বাধ্যতামূলক। তাই আমরা রোযা ভেংগে ফেললাম। এরপর আমি দেখলাম, সফরে রসূল সা. এর সাথে আমরা রোযা রেখেছি।" -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ।

আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে আরো বর্ণিত : আমরা রসূল সা. এর সাথে রমযানে যুদ্ধে যেতাম, কেউ রোযা রাখতাম, কেউ রাখতামনা। রোযাদার অরোযাদারকে এবং অরোযাদার রোযাদারকে এজন্য দোষারোপ করতোনা। সবাই মনে করতেন, যে সামর্থ্য অনুভব করে রোযা রাখে, সেও ভালো করে। আর যে দুর্বল মনে করে রোযা ভাংগে সেও ভালো করে। -আহমদ, মুসলিম।

এই দুটোর কোন্‌টা উত্তম তা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। আবু হানিফা, শাফেয়ী ও

মালেকের মতে, যার সামর্থ্য আছে তার জন্য রোযা রাখা উত্তম, আর যার সামর্থ্য নেই, তার জন্য রোযা না রাখা উত্তম। আহমদের মতে, রোযা না রাখাই উত্তম।

উমর ইবনে আবদুল আযীয বলেছেন : যেটি সহজ সেটি উত্তম। যার পক্ষে তাৎক্ষণিক রোযা রাখা সহজ এবং পরে কাযা রাখা কঠিন, তার জন্য রোযা রাখাই উত্তম। শওকানি বলেছেন : যার জন্য রোযা রাখা কষ্টকর ও ক্ষতিকর এবং যে অবকাশ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, তার জন্য রোযা না রাখা উত্তম। আর যে সফরে রোযা রাখলে রিয়াকারী বা আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হবার আশংকাবোধ করে, তার জন্য রোযা না রাখা উত্তম। আর যখন রোযা রাখলে এসব আশংকা থাকেনা, তখন রোযা রাখা উত্তম।

মুসাফির যখন রাতের বেলা রোযার নিয়ত করে ও রোযা শুরু করে দেয়। তার জন্য দিনের বেলা রোযা ভাংগা বৈধ।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন এবং রোযা রাখলেন। যখন গমীম উপত্যকায় পৌছলেন, তখন অন্যরাও তাঁর সাথে রোযাদার ছিলো। তাঁকে বলা হলো : লোকদের রোযা রেখে কষ্ট হচ্ছে। লোকেরা যে রোযা রেখেছে, তা নিয়ে ভাবছে। তখন রসূল সা. আসরের পর এক পাত্র পানি আনালেন এবং তা পান করলেন। সবাই এ দৃশ্য দেখছিল। তাদের কতক রোযা ভাংলো। কতক রোযা রাখলো। রসূল সা. জানতে পারলেন। কিছু লোক রোযা রেখেছে। তিনি বললেন : ওরা অবাধ্য হয়েছে। (কেননা তিনি আদেশ দিয়েছেন রোযা ভাংগতে। কিন্তু তারা সে আদেশ লংঘন করেছে।) -মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযি।

তবে যদি কেউ মুকিম থাকা অবস্থায় রোযার নিয়ত করে, তারপর দিনের বেলা সফর করে। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে তার রোযা ভাংগা জায়েয হবেনা। আহমদ ও ইসহাকের মতে জায়েয হবে।

তিরমিযি মুহাম্মদ বিন কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন : "আমি রমযানে আনাস বিন মালেকের কাছে এলাম। তিনি সফরে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। সফরের সমস্ত প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিলেন। এমনকি সফরের পোশাকও পরেছেন। সহসা খাবার আনতে বললেন এবং খেলেন। আমি বললাম : এটা কি রসূলের সুন্নত? বললেন : হাঁ, সুন্নত। তারপর রওয়ানা হলেন। তিরমিযি বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

উবাইদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি রমযান মাসে প্রাচীন মিশরের ফুসতাত শহর থেকে একটা নৌকায় আবু বাসরা আল গিফারীর সাথে আরোহণ করলাম। আবু বাসরা ধাক্কা দিয়ে নৌকা ভাসালেন, তারপর খাবার এগিয়ে দিলেন এবং বললেন : এগিয়ে এসো। আমি বললাম : আপনি কি এখনো বাড়ির সীমানার মধ্যে নন? আবু বাসরা বললেন : তুমি কি রসূলুল্লাহর সুন্নতকে উপেক্ষা করছ? -আহমদ, আবু দাউদ।

শওকানি বলেছেন : এ দুটো হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, মুসাফির যে এলাকা থেকে সফরে যেতে চায়, সে এলাকা থেকে বের হবার আগেই রোযা ভাংতে পারে।

ইবনুল আরাবি বলেছেন : আনাস রা. এর হাদিসটি সহীহ এবং সফরের প্রস্তুতি নিলেই রোযা ভংগ করা জায়েয। তিনি বলেছেন : এটাই সঠিক মত। যে সফরে নামায কসর হয়, সেই সফরে রোযা ভাংগা বৈধ। অনুরূপ, যতোদিন কোথাও যাত্রাবিরতি করলে কসর চালু রাখা জায়েয। ঠিক ততোদিনই রোযা ভাংগাও বৈধ। কসর নামাযের অধ্যায়ে ইতিপূর্বে এটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকি ও তাহাবি মানসূর কালবী থেকে বর্ণনা করেন : দিহইয়া বিন খলিফা একবার রমযানে দামেস্কের একটি এলাকা থেকে আনুমানিক এক ফরসাখ তথা প্রায় আট কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে রওনা হলেন এবং নিজে তার সাথি একটি দলসহ রোযা ভাংলেন। কিন্তু অন্যরা রোযা ভাংগা পছন্দ করলোনা। তারপর তিনি নিজ এলাকায় ফিরে বললেন : আল্লাহর কসম, আজ আমি এমন একটি বিষয় দেখলাম, যা কখনো দেখবো বলে ভাবিনি। একটি দল রসূল সা.ও তাঁর সাহাবিদের অনুসৃত নীতি উপেক্ষা করলো। যারা রোযা রেখেছিল তাদের সম্পর্কে তিনি একথা বললেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহ, আমাকে আপনার কাছে তুলে নিন।

এই হাদিসের একমাত্র বর্ণনাকারী মানসূর কালবী ব্যতিত আর সব বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। তবে ইজলীর মতে মানসূর কালবীও বিশ্বস্ত।

১৪. যার উপর রোযা ভাংগা ও কাযা করা- দুটোই বাধ্যতামূলক

ফকীহগণ একমত : হায়েয ও নেফাস (মাসিক ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর ঋতুস্রাব) চলাকালীন সময়ে রোযা রাখা হারাম। কেউ রাখলে রোযা বাতিল হবে। তবে এ দিনগুলোর রোযা পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন, আয়েশা রা. বলেছেন : রসূল সা. এর সময় আমাদেরকে স্রাবকালে রোযা কাযা করতে আদেশ দেয়া হতো, কিন্তু নামায কাযা করতে আদেশ দেয়া হতোনা।

১৫. যে দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

যে দিনগুলোতে রোযা রাখা সুস্পষ্টভাবে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো হলো :

১. দুই ঈদের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ : আলেমগণ একমত যে, দুই ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম, চাই ফরয বা নফল যে নিয়তেই রাখা হোক। কেননা উমর রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. এই দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন তো তোমাদের রমযানের রোযা ভাংগার দিন। আর ঈদুল আযহার দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও।" -আহমদ ও অন্য চারটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

২. আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষিদ্ধ : ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিনও সব রকমের রোযা রাখা নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাকে মিনায় ঘুরে ঘুরে এরূপ ঘোষণা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন : এই দিনগুলোতে তোমরা রোযা রেখোনা। কেননা এগুলো হচ্ছে, পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন। -আহমদ।

তাবারানি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. একজন দূত পাঠালেন চিৎকার করে একথা বলার জন্য : এ দিনগুলোতে তোমরা রোযা রেখোনা। কেননা এগুলো পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের দিন।"

তবে শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণ মানত, কাফফারা বা কাযার প্রয়োজনে আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে (নিছক নফলের উদ্দেশ্যে) এ দিনগুলোতে রোযা রাখা সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। তাদের মতে, এটা নামাযের মতো। যা নিষিদ্ধ সময়ে অনুরূপ প্রয়োজনে জায়েয।

৩. শুধু শুক্রবারে রোযা রাখা নিষিদ্ধ : শুক্রবার মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক ঈদ। এজন্য

শরিয়তে এদিন রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ আলেমের মতে এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম নয় বরং মাকরূহ বুঝানো হয়েছে যদি শুধু এই দিনটিতে নির্দিষ্টভাবে রাখা হয়। কিন্তু যখন এই সাথে আগে একদিন অথবা পরে একদিনও রাখা হয় অথবা তার রোযা রাখার কোনো অভ্যাসের সাথে এদিন মিলিত হয়, অথবা এদিন আরাফা বা আশুরার দিন পড়ে যায়, তাহলে শুক্রবারের রোযা মাকরূহ হবেনা। ইমাম মালেক ও আবু হানিফার মতে, শুক্রবারের রোযা কোনো অবস্থায়ই মাকরূহ নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া বিনতে হারেসের নিকট গেলেন। সেদিন শুক্রবার ছিলো এবং জুয়াইরিয়া রোযাদার ছিলেন। তিনি তাকে বললেন : তুমি কি কাল রোযা রেখেছিলে? জুয়াইরিয়া বললেন : না। তিনি বললেন : তুমি আগামীকাল রোযা রাখতে চাও? জুয়াইরিয়া বললেন : না। তখন রসূল সা. বললেন : তাহলে তুমি রোযা ভেংগে ফেলো। -আহমদ, নাসায়ী।

আমের আশয়ারী রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি : শুক্রবার তোমাদের ঈদের দিন। কাজেই এদিন তোমরা রোযা রেখোনা। তবে এর আগে একদিন বা পরে একদিন রোযা রাখলে এদিন রোযা রাখতে পারো। -বাযযার, সনদ হাসান।

আলী রা. বলেছেন : তোমাদের কেউ নফল রোযা রাখতে চাইলে সে যেনো বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, শুক্রবারে রোযা না রাখে। কেননা শুক্রবার পানাহার ও যিকরের দিন। -ইবনে আবি শায়বা।

জাবের রা. থেকে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : শুক্রবারের আগে একদিন অথবা পরে একদিন রোযা রাখা ব্যতিত শুধু শুক্রবারে রোযা রেখোনা। মুসলিমের এক বর্ণনার ভাষ্য এ রকম : অন্যসব রাত বাদ দিয়ে শুধু শুক্রবারের রাতকে নামাযের জন্য এবং অন্য সব দিনকে বাদ দিয়ে শুক্রবারের দিনকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করোনা। তবে তোমাদের কারো রোযা রাখার অভ্যাসের তারিখে শুক্রবার পড়লে ক্ষতি নেই।"

৪. শুধু শনিবারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করা : বুস্‌র আস সুলামী থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের উপর ফরযকৃত রোযা ব্যতিত শনিবারে রোযা রেখোনা। (অভ্যাসের তারিখে হলে আরাফা, কাযা, মানত ও নফল রোযা রাখা যাবে।) আর যদি তোমাদের কেউ আংগুরের খোসা কিংবা গাছের কাঠ ছাড়া আর কিছু না পায়, তবে তাই যেনো বিছায়। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

তিরমিযি বলেছেন : এদিনে রোযা রাখা মাকরূহ হওয়ার অর্থ হলো, শনিবারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত নয়। কেননা ইহুদীরা শনিবারকে মর্যাদাবান মনে করে।

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. বলেছেন : রসূল সা. অন্যান্য দিন অপেক্ষা শনি ও রবিবারে অধিকতর রোযা রাখতেন। আর বলতেন : এ দুটো দিন মোশরেকদের উৎসবের দিন। আমি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই। -আহমদ, বায়হাকি, হাকেম, ইবনে খুযায়মা। হাকিম এবং ইবনে খুযায়মা বলেছেন, এটি সহীহ হাদিস।

এসব প্রমাণের ভিত্তিতেই হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলি মাযহাবে এককভাবে শুধু শনিবারে রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু ইমাম মালেক শেষোক্ত হাদিসটির ভিত্তিতে মাকরূহ মনে করেন না।

৫. সংশয়পূর্ণ দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ : আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. বলেছেন : "সংশয়পূর্ণ দিনে যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সে মুহাম্মদ সা.এর বিরুদ্ধাচরণ করে।" -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

তিরমিযি বলেছেন : এটি সহীহ্ ও উত্তম হাদিস। অধিকাংশ আলেমের নিকট এটিই অনুসরণীয়। এটি সুফিয়ান ছাওরী, মালেক বিন আনাস, আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকেরও মত। তারা সকলেই সংশয়পূর্ণ দিনে রোযা রাখাকে মাকরূহ মনে করেন। তাদের অধিকাংশের মতে, এদিন যদি কেউ রোযা রাখে এবং দিনটি রমযানের দিন ছিলো বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তার পরিবর্তে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে। আর যদি সে তার প্রচলিত অভ্যাস মতো রোযা রেখে থাকে, তাহলে তার রোযা জায়েয হবে, মাকরূহ হবেনা। হানাফিদের মতানুসারে, যদি জানা যায়, ঐদিন রমযান ছিলো তাহলে ঐ রোযাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : রমযানের রোযার একদিন বা দু'দিন আগে অন্য কোনো রোযা রেখোনা। তবে কারো অভ্যাসগত রোযা হলে তা রাখতে পারে। -সব কটি সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত।

তিরমিযি বলেছেন : এ হাদিস সহীহ্ ও উত্তম এবং আলেমগণ কর্তৃক অনুসৃত। রমযানের প্রতি ভক্তির কারণে কেউ রমযান আসার আগেই তাড়াহুড়ো করে রোযা রাখতে শুরু করবে- এটাকে তারা মাকরূহ মনে করেন। আর যদি কেউ কোনো রোযা রাখতে অভ্যস্ত থেকে থাকে এবং তা ঘটনাক্রমে ঐদিনেই পড়ে, তাহলে তাতে আপত্তি নেই।

৬. সারা বছর রোযা রাখা নিষিদ্ধ : বছরে যে দিনগুলো রোযা রাখা নিষিদ্ধ, সেগুলোসহ সারা বছর রোযা রাখা হারাম। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখলো, সে কোনো রোযাই রাখলোনা।" -আহমদ, বুখারি, মুসলিম।

তবে যদি দুই ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীকে রোযা ভাংগে এবং অবশিষ্ট দিনগুলো রোযা রাখে, তবে এভাবে সারা বছর রাখা মাকরূহ হবেনা। যদি রোযাদার সারা বছর রোযা রাখার শারীরিক সামর্থ্য রাখে।

তিরমিযি বলেছেন : এক দল আলেম ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও আইয়ামে তাশরীকে রোযা না ভাংলে সারা বছর রোযা রাখাকে মাকরূহ গণ্য করেছেন। এ দিনগুলোতে রোযা ভাংলে বাকি বছর রোযা রাখা মাকরূহ হবেনা। মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের মতও এটাই। রসূলুল্লাহ্ সা. হামযা আসলামীর অবিরত রোযা রাখাকে এই বলে সমর্থন দিয়েছেন : ইচ্ছা করলে রোযা রাখো, ইচ্ছা করলে রোযা ভাংগো।

৭. স্বামী বাড়িতে থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা : রসূলুল্লাহ্ সা. স্বামী বাড়ি থাকাকালে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে স্ত্রীকে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : স্বামী বাড়িতে থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর রমযান ব্যতিত আর কোনো রোযা রাখা চলবেনা। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম। আলেমগণ রসূল সা. এর নিষেধাজ্ঞাকে হারাম ঘোষণার পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেছেন এবং স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া রোযা রেখে থাকলে তার রোযা ভেংগে দেয়ার অনুমতি বলে চিহ্নিত করেছেন। কেননা স্ত্রী এভাবে তার অধিকার হরণ করেছে। তবে মনে রাখা চাই, এটা রমযান ব্যতিত অন্য রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা রমযানের ফরয রোযা স্বামীর অনুমতির উপর নির্ভরশীল নয়। স্বামী বাড়িতে না থাকলেও তার অনুমতি ছাড়া সে রোযা রাখতে পারে। বাড়ি এসে পড়লে স্বামী রোযা ভেংগে দিতে পারে। স্বামী বাড়িতে থাকা অবস্থায় যদি অসুস্থ্ ও সহবাসে অক্ষম থাকে তাহলেও তার অনুমতি ছাড়া রোযা রাখা স্ত্রীর জন্য অবৈধ।

১৬. অবিরত রোযা রাখা নিষিদ্ধ

সাহরী ও ইফতার ব্যতিত এক নাগাড়ে রোযা রাখাকে সওমে বেসাল বা অবিরত রোযা বলা হয়।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "খবরদার, অবিরত রোযা রাখবেনা"- তিনবার বললেন। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, আপনি তো অবিরত রোযা রাখেন? তিনি বললেন : এ ক্ষেত্রে তোমরা আমার মতো নও। আমাকে আমার প্রতিপালক সারা রাত আহার করান ও পান করান। (অর্থাৎ পানাহারকারীর মতো শক্তি দেন।) সুতরাং তোমরা ততটুকু কাজের দায়িত্ব নিও, যতটুকু করার সামর্থ্য রাখো। -বুখারি ও মুসলিম।

ফকীহগণ এই নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহ ঘোষণার শামিল গণ্য করেছেন। আহমদ, ইসহাক ও ইবনুল মুনযির রোযাদারের খুব কষ্ট নাহলে সাহরী পর্যন্ত অবিরাম রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা বুখারি আবু সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা অবিরাম রোযা রেখোনা। তেব কেউ যদি রাখতেই চায়, সাহরী পর্যন্ত রাখবে।

১৭. যেসব নফল রোযা রাখা সুন্নত

রসূলুল্লাহ সা. নিম্নোক্ত রোযাগুলো রাখতে খুবই উদগ্রীব থাকতেন :

শাওয়ালের ছয় রোযা : বুখারি ও নাসায়ী ব্যতিত অন্য সবক'টি সহীহ হাদিস গ্রন্থ আবু আইয়ূব আনসারি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর শাওয়ালে ছয়টি রোযা রাখলো, সে যেনো সারা বছর রোযা রাখলো। এটা সেই ব্যক্তির জন্য যে, প্রতি বছর রমযানের রোযা রাখে। আলেমগণ বলেছেন : প্রত্যেক সৎ কাজের দশগুণ সওয়ার। রমযান মাসের বিনিময়ে দশ মাস আর শাওয়ালের ছয়দিনের বিনিময়ে দু'মাস।

ইমাম আহমদের মতে : শাওয়ালের ছয় রোযা একটানা বা বিরতি সহকারে- যেভাবেই রাখা হোক, আদায় হবে। এতে ফযিলতের কোনো হের ফের হবেনা। তবে হানাফি ও শাফেয়িদের মতে, একটানা ছয়টা ঈদের অব্যবহিত পরে রাখা উত্তম।

হজ্জ রত নয় এমন ব্যক্তির আরাফার দিনের রোযা : ১. আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আরাফার দিনের রোযা এক বছর আগের ও এক বছর পরের গুনাহর কাফফারা করে দেয়। আর আশূরার রোযা এক বছর আগের গুনাহর কাফফারা করে দেয়। -বুখারি ও তিরমিযি ব্যতিত সবক'টি সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

২. হাফসা রা. থেকে বর্ণিত : চারটি জিনিস রসূলুল্লাহ সা. কখনো ছাড়তেন না; আশূরার রোযা, জিলহজ্জের এক দশকের রোযা (অর্থাৎ ১ম ৯ দিনের), প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা, আর সকালে নাস্তার আগের দু'রাকাত নামায (ইশরাক)। আহমদ, নাসায়ী।

৩. উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও আইয়ামে তাশরীক, এগুলো আমাদের মুসলমানদের ঈদ, পানাহারের দিন। -ইবনে মাজাহ ব্যতিত অবশিষ্ট সবক'টি সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. আরাফার ময়দানে অবস্থানকারীকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

তিরমিযি বলেছেন : আলেমগণের মতে আরাফার দিনের রোযা আরাফায় ব্যতিত অন্য সব জায়গায় মুস্তাহাব।

৫. উম্মে ফযল থেকে বর্ণিত : রসূল সা. আরাফার দিন রোযা রাখবেন কিনা, সে ব্যাপারে লোকেরা সন্দিহান ছিলো। আমি তার কাছে কিছু দুধ পাঠালাম। তিনি তখন আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি ভাষণ দেয়া অবস্থায়ই দুধ পান করলেন। -বুখারি, মুসলিম।

মহরম ও আশুরার রোযার গুরুত্ব :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ফরয নামাযের পর কোন্ নামায উত্তম? তিনি বললেন : মধ্য রাতের নামায। বলা হলো : রমযানের পর কোন্ রোযা উত্তম? বললেন : আল্লাহর মাস, যাকে তোমরা মহরম বলো। -আহমদ, মুসলিম ও আবু দাউদ।

২. মুয়াবিয়া রা. ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি : আজ আশুরার দিন। এদিনের রোযা তোমাদের উপর ফরয করা হয়নি। আমি রোযা রেখেছি। যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে। যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে। যার ইচ্ছা রোযা নাও রাখতে পারে। -বুখারি, মুসলিম।

৩. আয়েশা রা. বলেছেন : আশুরার দিন কুরাইশরা জাহেলি যুগে রোযা রাখতো। রসূল সা.ও রোযা রাখতেন। তিনি যখন মদিনায় এলেন তখনও রোযা রাখলেন এবং রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। এরপর যখন রমযান ফরয করা হলো, তখন বললেন : যার ইচ্ছা আশুরার রোযা রাখতে পারে। যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারে। -বুখারি, মুসলিম।

৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. মদিনায় এলেন। দেখলেন, ইহুদীরা আশুরার রোযা রাখে। তিনি বললেন : এটা কি? তারা বললো : একটা মহান দিন, এদিন আল্লাহ মূসা ও বনী ইসরাইলকে তাদের শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করেন। তাই মূসা এদিন রোযা রাখতেন। রসূল সা. বললেন : আমি তোমাদের চেয়েও মূসার বেশি হকদার। তিনি এই দিন রোযা রাখলেন এবং সবাইকে রোযা রাখার আদেশ দিলেন। -বুখারি, মুসলিম।

৫. আবু মূসা আশয়ারি রা. থেকে বর্ণিত : "ইহুদীরা আশুরার দিনকে খুবই মান্য করতো এবং এই দিন উৎসব পালন করতো। রসূলুল্লাহ সা. মুসলিমদের বললেন : তোমরা এদিন রোযা রাখো।" -বুখারি, মুসলিম।

৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ রা. যখন আশুরার দিন রোযা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখার আদেশ দিলেন, তখন লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, এদিনটাকে তো ইহুদী ও খৃষ্টানরা সম্মান করে। তিনি বললেন : আগামী বছর ইনশায়াল্লাহ আমরা নয় তারিখেও রোযা রাখবো। ইবনে আব্বাস বলেন : পরবর্তী বছর আগমনের আগের রসূলুল্লাহ সা. ইন্তিকাল করেন। -মুসলিম ও আবু দাউদ।

অপর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই নয় তারিখেও (অর্থাৎ দশ তারিখের সাথে) রোযা রাখবো। -আহমদ ও মুসলিম।

আলেমগণ উল্লেখ করেছেন : আশুরার দিনের রোযা তিন রকমের : এক. তিন দিন রোযা রাখা। নয়, দশ ও এগারো মুহরম। দুই. দুই দিন রোযা রাখা- নয় ও দশ মুহরম। তিন. দশ মুহরম।

আশুরার দিন পরিবারে অধিক ব্যয় করা : জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের পেছনে ও পরিবারের পেছনে আশুরার দিন অধিক ব্যয় করবে, আল্লাহ সারা বছর তাকে সচ্ছলতা দান করবেন। -বায়হাকি।

শা'বান মাসের বেশির ভাগ রোযা রেখে কাটানো : রসূলুল্লাহ সা. শা'বান মাসের বেশির ভাগ রোযা রাখতেন। আয়েশা রা. বলেছেন : রমযান মাস ছাড়া আর কখনো রসূল সা.কে পুরো মাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাসের চেয়ে বেশি রোযা রাখতেও আর কোনো মাসে দেখিনি। -বুখারি ও মুসলিম

উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি (উসামা) বলেন, আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আপনাকে শা'বান মাসের মতো এতো বেশি রোযা আর কোনো মাসে রাখতে দেখিনি। রসূল সা. বললেন : রজব ও রমযানের মাঝে এই মাসটি সম্পর্কে লোকেরা উদাসীন থাকে। এ মাসে বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট মানুষের কাজগুলো উপস্থাপন করা হয়। তাই এ মাসে আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার কাজগুলো এমন অবস্থায় উপস্থাপিত হোক, যখন আমি রোযাদার। -আবু দাউদ, নাসায়ী।

মধ্য শা'বানের রোযাকে অন্যান্য দিন অপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ ধারণা করা বা চিহ্নিত করার পক্ষে কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

নিষিদ্ধ মাসগুলোর রোযা : নিষিদ্ধ মাস চারটি অর্থাৎ জিলকদ, জিলহজ্জ, মুহরম ও রজব। এসব মাসে বেশি করে রোযা রাখা মুস্তাহাব।

বাহেলা গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত : তিনি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এলেন এবং বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আমি গত বছর আপনার কাছে এসেছিলাম। রসূল সা. বললেন : তুমি এতটা বদলে গেছো কেন? তোমার শরীর ও চেহারা তো সুন্দর ছিলো। তিনি বললেন : আপনার সাথে আমার সর্বশেষ যেদিন সাক্ষাৎ হয়েছে, তারপর থেকে রাতে ছাড়া আমি কোনো খাবার খাইনি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি নিজেকে কষ্ট দিয়েছ কেন? ধৈর্যের মাস (অর্থাৎ রমযান মাস) রোযা রাখো এবং প্রত্যেক মাসে একদিন রোযা রাখো। তিনি বললেন : আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। আমার ক্ষমতা আছে। রসূল সা. বললেন : প্রতি মাসে দু'দিন রোযা রাখো। তিনি বললেন : আরো একটু বাড়িয়ে দিন। রসূল সা. বললেন : নিষিদ্ধ মাসে, কিছু রোযা রাখো এবং কিছু বাদ দাও (তিনবার বললেন)। তিনি তাঁর তিনটে আংগুল একবার একত্রিত করলেন, পুনরায় বিচ্ছিন্ন করলেন। (অর্থাৎ তিন দিন রোযা রাখা ও তারপর তিন দিন বাদ দেয়ার দিকে ইংগিত করলেন।) -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

রজব মাসের রোযার অন্য মাসের তুলনায় শুধু এতটুকু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, ওটা একটা নিষিদ্ধ ও সম্মানিত মাস। সহীহ হাদিসে এ মাসের রোযার বিশেষ কোনো মর্যাদা আছে বলে প্রমাণ নেই। যা পাওয়া যায়, তা প্রমাণ হিসেবে পেশ করার যোগ্য নয়। ইবনে হাজার বলেন : এ মাসের বিশেষ কোনো ফযীলত সম্পর্কে এবং এ মাসের কোনো নির্দিষ্ট দিনের রোযা বা রাতের নামাযের ফযীলত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদিস নেই।

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যেদিনটিতে সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন তা ছিলো সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন : প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের কৃত কর্মগুলো আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয়। তখন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে অথবা বলেছেন বলেছেন প্রত্যেক মুমিনকে ক্ষমা করে দেন। তবে যে দু'জন মুমিন পরস্পরে কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখে, তাদেরকে ক্ষমা করেন না। আল্লাহ বলেন : ঐ দু'জনের ব্যাপারে ফায়সালা বিলম্বিত করো। -আহমদ। মুসলিমে রয়েছে : "রসূল সা.কে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন : ঐদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐদিন আমার নিকট অহি নাযিল হয়েছে।

প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা : আবু যর গিফারী রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে প্রতি মাসে (চন্দ্র মাসে) আইয়ামে বীজের তিন দিন, অর্থাৎ তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখ রোযা রাখতে উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন : এটা সারা বছর রোযা রাখার মতো। -নাসায়ী।

রসূল সা. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : তিনি এক মাসে শনি, রবি ও সোমবার এবং অপর মাসে মঙ্গল বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। কোনো কোনো হাদিসে রয়েছে, তিনি প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখ থেকে তিন দিন রোযা রাখতেন। কোনো কোনো হাদিসে আছে : তিনি বৃহস্পতিবার, মাসের প্রথম দিন, তারপরের সোমবার এবং তার পরের সোমবার রোযা রাখতেন।

একদিন রোযা রাখা আর একদিন রোযা ভাংগা : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন, "রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন : শুনেছি, তুমি প্রত্যেক রাত জেগে নামায পড়ো আর দিনে রোযা রাখো? আমি বললাম : ইয়া রসূলাল্লাহ, ঠিকই শুনেছেন। তিনি বললেন : তুমি কখনো রোযা রাখো, কখনো রোযা ভাংগ। কখনো নামায পড়ো। কখনো ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার দেহেরও হক আছে, তোমার স্ত্রীরও হক আছে। তোমার মেহমানেরও হক আছে। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা তোমার জন্য যথেষ্ট। এরপর আমি আরো কঠোরতা চাইলাম। তিনি আমার উপর আরো কঠোরতা আরোপ করলেন। আমি বললাম : আমি নিজের মধ্যে কিছু সামর্থ্য অনুভব করি। তিনি বললেন : বেশ, তবে প্রত্যেক শুক্রবার থেকে তিন দিন রোযা রাখো। এরপর আমি আরো কঠোরতা চাইলাম। তিনি আরো কঠোরতা আরোপ করলেন। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আমি নিজের মধ্যে সামর্থ্য অনুভব করি। তিনি বললেন : আল্লাহর নবী, দাউদের রোযা রাখো। তার চেয়ে বেশি নয়। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, দাউদ আ. এর রোযা কী ছিলো? তিনি বললেন : তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন রোযা ভাংতেন। -আহমদ প্রমুখ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে আরো বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা হচ্ছে দাউদ আ. এর রোযা, আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় নামায ছিলো দাউদ আ. এর নামায। তিনি কখনো রাতের অর্ধেক, কখনো রাতের ছয় ভাগের এক ভাগ ঘুমাতেন এবং তিন ভাগের এক ভাগ নামায পড়ে কাটাতেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযা ভাংতেন।

১৮. নফল রোযা ভাংগা জায়েয

১. উম্মে হানী রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ের বছর আমার কাছে এলেন। তাঁকে শরবত দেয়া হলো। তিনি তা পান করলেন। অত:পর আমাকে পান করতে দিলেন। আমি বললাম : আমি রোযা রেখেছি। তিনি বললেন : নফল ইবাদতকারী নিজের ব্যাপারে স্বাধীন। তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখো, ইচ্ছা করলে ভেংগে দাও। -আহমদ, দার কুতনি।

২. আবু জুহাইফা বলেন : রসূল সা. সালমান ও আবুদ দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। একদিন সালমান আবুদ দারদার বাড়িতে গেলেন। তিনি উম্মে দারদা (আবু দারদার স্ত্রীকে)কে একেবারেই সাদামাটা বেশ ভূষায় দেখলেন। এজন্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার কী হয়েছে! উম্মে দারদা বললেন : আপনার ভাই আবুদ দারদার দুনিয়ার কোনো কিছুর প্রতি আসক্তি নেই। তৎক্ষণাত আবুদ দারদা এলেন। তিনি এসেই সালমানের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর সালমানকে বললেন : আপনি খান, আমি রোযাদার। সালমান বললেন : আপনি না খেলে আমি খাবো না। অগত্যা তিনি খেলেন। যখন রাত হলো এবং আবুদ দারদা

নামায পড়তে যেতে চাইলেন। সালমান তাকে বললেন : ঘুমান। অগত্যা আবুদ দারদা ঘুমালেন। আবার যেতে চাইলেন। সালমান বললেন : ঘুমান। আবুদ দারদা ঘুমালেন। যখন শেষ রাত হলো, তখন বললেন : এখন নামায পড়ুন। অতপর উভয়ে নামায পড়লেন। তারপর সালমান বললেন : তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের যেমন হক রয়েছে, তেমনি তোমার নিজেরও হক রয়েছে, তোমার পরিবারেরও হক রয়েছে। অতএব প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক প্রদান করো। আবুদ দারদা এরপর রসূল সা. এর কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : সালমান সত্য বলেছে। -বুখারি ও তিরমিযি।

৩. আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেছেন : "আমি রসূলুল্লাহ সা. এর জন্য খাবারের আয়োজন করলাম। তিনি ও তার সাহাবিগণ আমার কাছে এলেন। যখন খাবার পরিবেশন করা হলো, তখন একজন বললেন : আমি রোযা রেখেছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার ভাই তোমাদেরকে দাওয়াত করেছে এবং তোমাদের জন্য কষ্ট করেছে। আজ তুমি রোযা ভাংগো এবং এর পরিবর্তে অন্যদিন রোযা রাখো- যদি ইচ্ছা করো। -বায়হাকি, সনদ হাসান।

এসব সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ হাদিসের ভিত্তিতে অধিকাংশ আলেম মনে করেন, নফল রোযাদারের জন্য রোযা ভাংগা জায়েয। তবে তার জন্য ঐ রোযার কাযা করা মুস্তাহাব।

১৯. রোযার কিছু পালনীয় নিয়ম

রোযাদারের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মসমূহ পালন করা মুস্তাহাব :

১. সাহরী খাওয়া : সমগ্র উম্মত একমত, সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব এবং যে সাহরী না খেয়ে রোযা রাখে তার কোনো গুনাহ হবেনা। আনাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরী বরকতপূর্ণ। - বুখারি ও মুসলিম।

মিকদাদ বিন মা'দীকারব বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন : "তোমরা সাহরী খেয়ো। কারণ ওটা একটা বরকতময় খাবার।" -নাসায়ী।

বরকতময় মানে এটি রোযাদারকে শক্তি যোগায় এবং রোযা রাখা সহজ করে দেয়।

কতটুকু খাবার দ্বারা সাহরী সম্পন্ন হয় : খাবার কম হোক বা বেশি হোক, সাহরী সম্পন্ন হয়। এমনকি এক ঢোক পানি পান করলেও সাহরী সম্পন্ন হয়। আবু সাঈদ খুদরি বলেন : "সাহরীতে বরকত রয়েছে। তোমরা সাহরী বর্জন করোনা। এমনকি এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী খাও। কেননা যারা সাহরী খায়, তাদের উপর আল্লাহ রহম করেন এবং ফেরেশতারা দোয়া করেন। -আহমদ।

সাহরীর সময় : সাহরীর সময় রাত দুপুর থেকে ফজর পর্যন্ত। তবে একে বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. বলেছেন : আমরা রসূল সা.-এর সাথে সাহরী খেলাম। তারপর নামাযে গেলাম (অর্থাৎ ফজরের নামাযে)। রাবী বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম : মাঝে কতটুকু সময় ছিলো? তিনি বললেন : পঞ্চাশ আয়াত। (অর্থাৎ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে যতোক্ষণ লাগে ততোক্ষণ) -বুখারি ও মুসলিম।

আমর ইবনে মাইমুন বলেন : রসূল সা. এর সাহাবিগণ ইফতারে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং সাহরীতে ধীর গতিসম্পন্ন ছিলেন।

আবু যর গিফারী রা. বলেন : রসূল সা. বলেছেন : আমার উম্মত যতোদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ও বিলম্বে সাহরী খাবে, ততোদিন ভালো থাকবে।

ফজর হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিলে : যদি ফজর হওয়া নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়, তবে ফজর

হয়েছে বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা জায়েয। সন্দেহ সংশয়ের ভিত্তিতে কাজ করা যাবেনা। কেননা আল্লাহ ফজর হওয়া নিয়ে সংশয় নয়, নিশ্চয়তাকেই পানাহারের শেষ সময়রূপে নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন :

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ .

"তোমরা আহার করো এবং পান করো, যতোক্ষণ না তোমাদের নিকট কালো সুতো থেকে সাদা সুতো অর্থাৎ ফজর সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৮৭)

এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রা. কে বললো : সাহরী খেতে যখনই সন্দেহ হয় আমি খাওয়া বন্ধ করি। ইবনে আব্বাস বলেছেন : "যতোক্ষণ সন্দেহের মধ্যে থাক ততোক্ষণ খেতে থাকো সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত।"

আবু দাউদ বলেছেন : ইমাম আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন : রোযাদার যখন ফজর হওয়া নিয়ে সংশয়ে থাকে, তখনও খেতে থাকবে ফজর হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত।" এটা ইবনে আব্বাস, আতা ও আওযায়ীর অভিমত।

নববী বলেছেন : ফজরের সময় সম্পর্কে সন্দেহকারীর জন্য খাওয়া জায়েয আছে- এটা শাফেয়িদের সর্বসম্মত অভিমত।

২. তাড়াতাড়ি ইফতার করা : রোযাদারের জন্য সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়ার পর দ্রুত ইফতার করা মুস্তাহাব। সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জনগণ যতোদিন দ্রুত ইফতার করবে, ততোদিন তারা ভালো থাকবে। - বুখারি ও মুসলিম।

তাজা পাকা বেজোড় সংখ্যক খেজুর দিয়ে ইফতার করা ভালো। তা না পাওয়া গেলে পানি দিয়েও করা যায়। আনাস রা. বলেছেন : রসূল সা. তাজা পাকা খেজুর দিয়ে নামাযের আগে ইফতার করতেন। খেজুর না থাকলে খোরমা দিয়ে করতেন। তাও যদি না থাকতো, তাহলে শুদ্ধ কয়েক ঢোক পানি পান করতেন। -আবু দাউদ, হাকেম, তিরমিযি।

সালমান বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন তার খোরমা দিয়ে ইফতার করা উচিত। তা যদি না থাকে তবে পানি দিয়ে। কারণ পানি পবিত্রকারী। -আহমদ ও তিরমিযি।

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মাগরিবের আগে এরূপ সংক্ষিপ্ত ইফতার করা মুস্তাহাব। নামাযের পর বাকি খাবার খেয়ে নেবে। তবে ইফতারের খাবার যদি প্রস্তুত থেকে থাকে, তাহলে তা দিয়ে শুরু করবে। আনাস রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রাতের খাবার যখন (ইফতারে) পরিবেশন করা হয়, তখন তা দিয়েই মাগরিবের পূর্বে ইফতার শুরু করো এবং খাবার রেখে ইফতার সম্পন্ন করতে তাড়াহুড়ো করোনা। -বুখারি ও মুসলিম।

৩. ইফতারের সময় রোযাদার অবস্থায় দোয়া করা : ইবনে মাজাহ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়না। ইফতারের সময় আবদুল্লাহ এই দোয়াটি করতেন : হে আল্লাহ, তোমার যে দয়া অন্য সবকিছুর উপর প্রশস্ত, সেই দয়ার দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আবেদন জানাই, আমাকে ক্ষমা করে দাও।

আরো প্রমাণিত আছে, রসূল সা. বলতেন : পিপাসা দূর হয়েছে, রগগুলো পানি দ্বারা সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ চাহেন তো রোযার সওয়াব প্রাপ্য হয়েছে। আরো বর্ণিত আছে : তিনি বলতেন : হে আল্লাহ, তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার জীবিকা দ্বারাই ইফতার

করলাম। আর তিরমিযি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনজনের দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয়না : রোযাদার, যতোক্ষণ না ইফতার করে, (এ দ্বারা সমগ্র রোযার সময়টা জুড়েই দোয়া করা মুস্তাহাব বুঝা যায়।) ন্যায়নীতি অনুসারী শাসক এবং নির্যাতিত-মযলুম ব্যক্তি।

৪. রোযার সাথে মানানসই নয় এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা : রোযা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহ মানুষের প্রবৃত্তিকে শালীন করতে ও তাকে সৎ কর্মে অভ্যস্ত করতে এটি প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং রোযাদারের উচিত তার রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা, যাতে সে তার রোযা দ্বারা উপকৃত হয় এবং সেই তাকওয়া অর্জন করতে পারে, যার কথা আল্লাহ তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মুমনিগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহর ভয়ে মন্দ কাজ থেকে সংযত থাকা) অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩)

রোযা শুধু পানাহার ও রোযার সময় নিষিদ্ধ অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকার নাম নয়। কেননা আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রোযা শুধু পানাহার থেকে নিবৃত্ত থাকা নয়। বরং যাবতীয় বেহুদা, অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা। কেউ যদি তোমাকে গালি দেয়, কিংবা কোনো অন্যায় আচরণ করে, তাহলে বলো : আমি রোযাদার, আমি রোযাদার। -ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান ও হাকেম।

মুসলিম ব্যতিত সব ক'টি সহীহ হাদিস গ্রন্থে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত না থাকে, তার পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (অর্থাৎ আল্লাহ তার রোযা কবুল করেন না।) তিনি আরো বলেছেন : বহু রোযাদার এমন রয়েছে, যাদের রোযা দ্বারা ক্ষুধা ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয়না এবং রাত জেগে অনেক নামায আদায়কারী এমন রয়েছে, যাদের রাত জাগরণ ছাড়া আর কোনো লাভ হয়না। -নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকেম।

৫. মেসওয়াক করা : রোযার সময় মেসওয়াক করা রোযাদারের জন্য মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে দিনের প্রথম ভাগ ও শেষ ভাগে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম তিরমিযি বলেছেন : ইমাম শাফেয়ী দিনের প্রথমাংশে ও শেষাংশে, মেসওয়াক করাতে কোনো অসুবিধা আছে মনে করতেন না। রসূল সা. রোযাদার অবস্থায় মেসওয়াক করতেন। এটি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. দানশীলতা ও কুরআন চর্চা : দানশীলতা ও কুরআন নিয়ে আলোচনা করা সব সময়ই মুস্তাহাব। তবে রমযানে এর উপর অধিকতর জোর দেয়া হয়েছে।

বুখারি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. সকল মানুষের চেয়ে সেরা দানশীল ছিলেন। আর সবচেয়ে বেশি দানশীল হতেন রমযান মাসে যখন জিবরীল তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রমযানের প্রতি রাতেই জিবরীল তার সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তার সাথে কুরআন অধ্যয়ন করতেন। বস্তুত রসূলুল্লাহ সা. ঝড়ো বাতাসের চেয়েও দানশীলতায় বেশি বেগবান ছিলেন। (অর্থাৎ এতো ব্যাপক ও দ্রুত গতিতে দান করতেন যে, ঝড়ো বাতাসও তার কাছে দ্রুততায় হার মানতো।)

৭. রমযানের শেষ দশ দিনে ইবাদতে কঠোর সাধনা : ১. বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. রমযানের শেষ দশ দিন সমাগত হলেই রাত জাগতেন,

পরিবার পরিজনকে জাগাতেন এবং কঠোর সাধনা করতেন। মুসলিমের অন্য বর্ণনা মতে : শেষ দশ দিনে যতো চেষ্টা সাধনা করতেন, অন্য সময়ে ততোটা করতেন না।

২. তিরমিযি আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. রমযানের শেষ দশ দিন পরিবারকে জাগাতেন এবং নিজে কঠোর পরিশ্রম সহকারে ইবাদত করতেন।

২০. রোযায় যেসব কাজ বৈধ

রোযায় নিম্নোক্ত কাজগুলো বৈধ :

১. পানিতে নামা ও ডুব দেয়া : আবু বকর বিন আবদুর রহমান রসূলুল্লাহর এক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা.কে দেখেছি রোযাদার অবস্থায় তীব্র গরম বা পিপাসার দরুন মাথায় পানি ঢালছেন। – আহমদ, মালেক ও আবু দাউদ।

তাছাড়া বুখারি ও মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. এর রোযাদার অবস্থায় কখনো কখনো 'জানাবাত' (স্ত্রী সহবাস জনিত অপবিত্রতা) সহকারেই সকাল হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন।

রোযাদারের পেটে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি ঢুকে গেলে তার রোযা শুদ্ধ হবে।

২. চোখে সুরমা লাগানো : এমন কোনো তরল জিনিস ফোঁটা কেটে দেয়া, যা চোখে দেয়া হয়- চাই কণ্ঠনালীতে তার স্বাদ অনুভব করুক বা না করুক, এতে রোযার কোনো ক্ষতি নেই। কারণ চোখ থেকে কোনো জিনিস পেটে যায়না। আর আনাস রা. সম্পর্কে জানা গেছে, তিনি রোযাদার অবস্থায় চোখে সুরমা লাগাতেন। এটা শাফেয়ী ইমামগণ, ইবনুল মুনযির, আতা, হাসান, নাসায়ী, আওযায়ি, আবু হানিফা ও আবু ছাওরের অভিমত। আর সাহাবিদের মধ্য থেকে ইবনে উমর, আনাস ও ইবনে আবি আওফারও অভিমত। এটা দাউদেরও অভিমত। তবে তিরমিযির মতে, এসব বিষয়ে রসূল সা. এর কাছ থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

৩. স্ত্রীকে চুমু খাওয়া : সেই ব্যক্তির জন্য জায়েয, যে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম।

আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. রোযাদার অবস্থায় চুমু খেতেন এবং স্ত্রীদের শরীর স্পর্শ করতেন। তিনি তো নিজের প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি সক্ষম ছিলেন। উমর রা. বলেছেন : একদিন আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম এবং চুমু খেলাম। অথচ আমি তখন রোযাদার। তারপর রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এলাম এবং বললাম : আমি আজ একটা ভয়াবহ কাজ করে ফেলেছি। রোযাদার অবস্থায় চুমু খেয়েছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি কি ভেবে দেখেছ, রোযাদার অবস্থায় যদি পানি দিয়ে কুলি করতে, তাহলে কী হতো? আমি বললাম, তাতে তো কিছু হতোনা। তিনি বললেন : তাহলে এতে কী?

ইবনুল মুনযির বলেছেন : উমর, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আয়েশা, আতা, শা'বী, হাসান, আহমদ ও ইসহাক চুমু খাওয়া জায়েয বলে অনুমতি দিয়েছেন। হানাফি ও শাফেয়িদের মাযহাব অনুযায়ী যার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়ে যায় তার জন্য চুমু খাওয়া মাকরূহ, অন্যদের জন্য মাকরূহ নয়। তবে এটা এড়িয়ে চলাই উত্তম।

ব্যাপারে যুবক ও বৃদ্ধের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বিবেচ্য বিষয় হলো কামোত্তেজনা ও বীর্যপাতের আশংকা। যুবক বা সামর্থ্যবান বৃদ্ধের যদি কামোত্তেজনা হয়, তবে এটা মাকরূহ। আর কামোত্তেজনা হয়না এমন বৃদ্ধ বা দুর্বল যুবকের জন্য মাকরূহ নয়। কিন্তু সর্বাবস্থায় এটা বর্জন করা উত্তম, চাই চিবুকে বা মুখে চুমু দিক বা আর কোথাও দিক। অনুরূপ, হাত দিয়ে শরীর স্পর্শ করা ও আলিঙ্গন করা- উভয়ই চুমু দেয়ার পর্যায়ভুক্ত।

৪. ইনজেকশন নেয়া : এটার বিধান চুমুর মতোই চাই তা পুষ্টির উদ্দেশ্যে হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হোক, আর চাই তা রগে দেয়া হোক বা চামড়ার নিচে। কেননা এভাবে ওষুধ যদিও পেট পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু স্বাভাবিক পথ দিয়ে পৌঁছেনা।

৫. শিংগা নেয়া : মাথা কিংবা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ থেকে শিংগা বা অন্য কোনো যন্ত্র দ্বারা রক্ত বের করা না জায়েয নয়; রসূলুল্লাহ্ সা. রোযাদার অবস্থায় শিংগা লাগিয়ে রক্ত বের করতেন। তবে এতে যদি রোযাদারের মধ্যে দুর্বলতা আসে, তাহলে এটা মাকরূহ হবে। ছাবেত বুনানী আনাস রা.কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : রসূলুল্লাহ্ সা. এর আমলে আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিংগা লাগিয়ে রক্ত বের করা অপছন্দ করতেন! আনাস জবাব দিলেন : না, তবে দুর্বলতার আশংকা থাকলে করতাম না। -বুখারি।

৬. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া : তবে এ কাজে বাড়াবাড়ি করা (যেমন গরগরা করা) মাকরূহ। লাকীত বিন সাবরা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যখন তুমি নাকের ভেতরে পানি দাও, তখন ভালোভাবে দিও। তবে রোযাদার হলে নয়। -তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

অবশ্য আলেমগণ নাকে ওষুধ নেয়াকে মাকরূহ মনে করেছেন এবং তাতে কিছু খেয়ে ফেলার আশংকা আছে বলে মত পোষণ করেছেন। হাদিসে তাদের এ বক্তব্যকে সমর্থন করে এমন উপাদান বিদ্যমান আছে।

ইবনে কুদামা বলেছেন : অযু বা গোসল করতে গিয়ে কুলি করা বা নাকে পানি দেয়ার সময় যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতিরিক্ত পানি ব্যবহার ছাড়াই কণ্ঠনালীতে পানি চলে যায়, তাহলে রোযার কোনো ক্ষতি হবেনা। এটা আওযায়ি, ইসহাক ও শাফেয়ির দুই মতের একটি। ইবনে আব্বাসের মতও এটাই।

মালেক ও আবু হানিফার মতে এতে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা সে রোযার কথা মনে থাকা সত্ত্বেও পেটে পানি ঢুকিয়েছে। কাজেই ইচ্ছাকৃতভাবে পানি পান করলে যেমন রোযা ভেংগে যায়। তেমনি রোযা ভেংগে যাবে।

ইবনে কুদামা বলেন : প্রথম মতটিই অগ্রগণ্য (অর্থাৎ রোযা ভংগ হবেনা।) এছাড়া আমাদের হাতে এ যুক্তিও রয়েছে যে, তার কণ্ঠনালীতে পানি ঢুকেছে তার ইচ্ছা বা অতিরিক্ত পানি খরচ করা ছাড়াই। একটা মাছি যদি উড়ে গিয়ে কারো গলায় ঢুকে পড়ে, তাহলে তাতে যেমন রোযা ভংগ হয়না, তেমনি এক্ষেত্রেও রোযা ভংগ হবেনা। ইচ্ছাকৃতভাবে কণ্ঠনালীতে পানি ঢুকানোর সাথে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। (ইবনে আব্বাস বলেছেন : রোযাদারের গলার ভেতরে মাছি ঢুকে গেলে রোযা ভংগ হয়না।)

৭. অন্যান্য : অনুরূপ, যেসব জিনিস এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব যেমন থুথু ও পথের ধুলোবালি গিলে ফেলা। আটা চালার সময়ে গলার ভেতরে চলে যাওয়া, কফ ইত্যাদি গলার ভেতরে ঢুকে যাওয়া ইত্যাদি। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : খাবারের ত্রুটি এবং যে জিনিস ক্রয় করতে উদ্যোগ নিয়েছে, তা চোখে দেখা বা স্বাদ গ্রহণ করে পরখ করা বৈধ। হাসান রোযাদার অবস্থায় তার পৌত্রকে আখরোট চিবিয়ে দিতেন। ইবরাহীমও এটা অনুমোদন করেছেন। তবে আঠালো খাদ্য, যা চিবালে টুকরো হয়না, তা চিবানো মাকরূহ। শাবী, নাখয়ি, হানাফি, শাফেয়ি ও হাম্বলী ইমামগণও একে মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু আয়েশা ও আতা একে বৈধ বলেছেন। কেননা এটা পেট পর্যন্ত পৌঁছেনা। এটা মুখের ভেতরে রাখা পাথরের টুকরোর মতো। যে খাদ্য চিবালে ভাংগেনা বা টুকরো হয়না, তার ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। যে খাদ্য টুকরো হয় এবং কোনো

টুকরো পেটে ঢুকে যায়, তাতে রোযা ভংগ হবে। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : রোযাদারের জন্য সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যের ঘ্রাণ নেয়া বৈধ। তবে সুরমা নেয়া, ইঞ্জেকশন নেয়া, পুরুষাংগের ছিদ্রে কোনো তরল পদার্থের ফোটা প্রবেশ করানো, মাথার মধ্যখানে ও পেটের অভ্যন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ওষুধ দেয়া, -এসব বিষয় নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কতকের মতে এর কোনো কোনোটিতে রোযা ভংগ হয়। কারো কারো মতে সুরমা নেয়া ব্যতিত এর সব কটাতে রোযা ভংগ হয়। কারো কারো মতে এর সব কাটতে রোযা ভঙ্গ হয়। তবে ফোঁটা দেয়াতে নয়। কারো কারো মতে, সুরমা ও ফোঁটা নেয়া ব্যতিত আর সব কটাতে রোযা ভংগ হয়। এরপর তিনি প্রথমোক্ত মতটিকে অগ্রগণ্য আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন, সবচেয়ে শক্তিশালী মত হলো, এর কোনোটিতেই রোযা ভংগ হয়না। কেননা রোযা হলো, ইসলামের একটি অংগ। যার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। আর এ কাজগুলো যদি এমন হতো যে আল্লাহ ও তার রসূল রোযা থাকা অবস্থায় এগুলোকে হারাম করেছেন এবং এ দ্বারা রোযা নষ্ট হয়, তাহলে এগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা আল্লাহর রসূলের অপরিহার্য কর্তব্য হতো। আর তিনি যদি এগুলো বর্ণনা করে থাকতেন, তবে সাহাবিগণ তা জানতেন এবং উম্মাহকে জানাতেন, যেমন শরিয়তের অন্যান্য বিধানগুলো জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি, কোনো সাহাবি বা কোনো আলেম এগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. থেকে কোনো সহীহ বা দুর্বল হাদিসও বর্ণনা করেননি। তখন স্পষ্ট হয়ে গেছে, আল্লাহ বা তাঁর রসূল সা. এর কোনো একটিকেও আপত্তিকর বা রোযা ভংগকারী বলে আখ্যায়িত করেননি। যে সকল কাজ অনিবার্য ও সর্বব্যাপী, সেগুলো সম্পর্কে রসূল সা. কর্তৃক সাধারণ ও সার্বজনীন ঘোষণা দেয়া অপরিহার্য এবং উম্মাহ কর্তৃক তা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের নিকট হস্তান্তর করাও অপরিহার্য। সুতরাং বুঝা গেলো, সুরমা লাগানো ইত্যাদি অনিবার্য সর্বব্যাপী উপসর্গসমূহের অন্যতম। যেমন তেল নেয়া, গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও ধুপধুনি দেয়া ইত্যাদি। এগুলোতে যদি রোযা নষ্ট হতো, তাহলে রসূল সা. তা বর্ণনা করতেনই। যেমন অন্য যেসব কাজ দ্বারা রোযা ভংগ হয়, তা বর্ণনা করেছেন। কাজেই বর্ণনা যখন করেননি, তখন বুঝা গেলো, এগুলো সুগন্ধি নেয়া, ধুপধুনি দেয়া ও তেল নেয়া ধরনের কাজ। ধুপধুনি কখনো কখনো নাক পর্যন্ত উঠে যায়, মগজে ঢুকে যায় এবং সমগ্র শরীরে সংক্রমিত হয়। আর তেলকে শরীর শুষে নেয়া, শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকে যায় এবং তা দ্বারা শরীর শক্তি অর্জন করে। অনুরূপ সুগন্ধি দ্বারাও শরীর খুবই শক্তি অর্জন করে। এগুলো থেকে যখন তিনি রোযাদারকে নিষেধ করেননি, তখন প্রমাণিত হলো, ধুপধুনি নেয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা, তেল নেয়া ও সুরমা নেয়া বৈধ। রসূল সা. এর আমলে মুসলমানরা জিহাদে বা অন্যান্য ঘটনায় মাথায় বা পেটে আহত হতেন এবং ক্ষত স্থানে ওষুধ নিতেন। এতে যদি রোযা ভংগ হতো, তাহলে অবশ্যই তা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতেন। রোযাদারকে যখন এসব ব্যবহার করতে নিষেধ করেননি, তখন জানা গেলো, এগুলো নিষিদ্ধ বা রোযা ভংগকারী নয়। সুরমা তো শরীরে কোনো খাদ্য বা পুষ্টি যোগান দেয়না। কেউ তার পেটে সুরমা প্রবেশও করায়না, নাক দিয়েও নয়, মুখ দিয়েও নয়। অনুরূপ যে ইঞ্জেকশন দ্বারা শরীর থেকে কোনো পদার্থ বের করা হয়, তা শরীরকে খাদ্য বা পুষ্টি যোগায়না, বরং শরীর থেকে নিষ্কাশন করে। যেমন পাতলা পায়খানা করানোর জন্য এমন কোনো জিনিসের ঘ্রাণ শুকানো হয় বা এমন ভয় পায়, যা পেটের ভেতর থেকে সব কিছু উগরে বের করে দেয়। অথচ তা পেটে ঢুকাতে হয়না। আর পেটের ও মাথার ক্ষতের চিকিৎসাকালে দেয়া যে ওষুধ পেটে পৌছে যায়, তা পেটে পৌছা খাদ্যের পর্যায়ভুক্ত নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের ওপরও রোযা ফরয করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

আর রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "রোযা ঢালস্বরূপ।" তিনি আরো বলেছেন : "শয়তান আদম সন্তানের রক্তের ধারার মধ্যদিয়ে চলাচল করে। কাজেই তোমরা ক্ষুধা ও রোযা দ্বারা শয়তানের চলাচলের পথকে সংকীর্ণ করে দাও।" এদ্বারা বুঝা গেলো, রোযাদারকে মূলত পানাহার থেকেই বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা পানাহার থেকে বিরত থাকার মধ্যেই তাকওয়া নিহিত। পানাহার দ্বারা প্রচুর রক্ত উৎপন্ন হয়, যার ভেতরে শয়তান চলাচল করে। এই রক্ত খাদ্য থেকে জন্ম নেয়। ইঞ্জেকশন থেকেও নয়, সুরমা থেকেও নয়, পুরুষাংগে ফোঁটা দেয়া তরল পদার্থ থেকেও নয় এবং পেট ও মাথার ক্ষতস্থানে যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তা থেকেও নয়।

৮. রোযাদারের জন্য ফজর হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ : ফজর হওয়ার সময় যদি তার মুখে খাবার থাকে তবে তা ফেলে দিতে হবে আর সহবাসরত থাকলে তা বন্ধ করতে হবে। খাবার ফেলে দিলেও সহবাস বন্ধ করলে রোযা শুদ্ধ হবে। আর মুখের খাবার স্বেচ্ছায় গিলে ফেললে কিংবা সহবাস অব্যাহত রাখলে রোযা ভংগ হবে। বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। কাজেই তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার করতে থাকো।"

৯. জুনুবি অবস্থায় সকাল হওয়া : ইতিপূর্বে আয়েশা রা. বর্ণিত হাদিস থেকেই জানা গেছে, রোযাদারের জন্য সকাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত 'জুনবি' অবস্থায় (বৃহত্তর অপবিত্রতা সহকারে) কাটানো বৈধ।

১০. হায়েয নেফাস থেকে পবিত্রতা : মাসিক ঋতুবতী ও প্রসবোত্তর ঋতুবতী মহিলার রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর সকাল পর্যন্ত গোসল বিলম্বিত করা বৈধ। এই অবস্থায় তারা রোযাও রাখতে পারবে। তবে নামায পড়ার জন্য পবিত্র হতে হবে।

২১. যেসব কাজে রোযা ভংগ হয়

রোযা ভংগের কারণসমূহ দু'প্রকারের :
১. যেগুলো রোযা ভংগ করে ও কাযা করা বাধ্যতামূলক করে।
২. যেগুলো রোযা ভংগ করে এবং কাযা ও কাফফারা দুটোই দিতে বাধ্য করে।

যেগুলো রোযা ভেংগে দেয় এবং তার বদলায় শুধু কাযা করা যথেষ্ট তা হচ্ছে :

১ ও ২. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা : ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলেই রোযা ভেংগে যাবে এবং সে রোযার কাযা করতে হবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে বা রোযার কথা ভুলে গিয়ে বা বল প্রয়োগে বাধ্য হয়ে পানাহার করলে তাকে কাযা ও কাফফারা কোনোটাই করতে হবেনা।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে রোযাদার হয়েও ভুলক্রমে আহার করে বা পান করে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহ নিজেই তাকে আহার ও পান করিয়েছেন। -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

তিরমিযি বলেছেন : অধিকাংশ আলেম এই হাদিস অনুযায়ীই আমল করেন। সুফিয়ান ছাওরী, শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক এই মত পোষণ করেন।

দার কুতনি, বায়হাকি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন : আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানে ভুলক্রমে রোযা ভংগ হবার কাজ করে, তার কোনো কাযা বা কাফফারা করতে হবেনা।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ আমার উম্মতের ভুলত্রুটি ও যা করতে তার ওপর বল প্রয়োগ করা হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। -ইবনে মাজাহ, তাবারানি, হাকেম।

৩. **ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা** : কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে তার রোযার কাযা করতে হবে। তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বমি হলে কাযা বা কাফফারা কিছুই দিতে হবেনা। কেননা আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বমি হয়, তার রোযা কাযা করতে হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে (বমি হয় এমন জিনিসের ঘ্রাণ নিয়ে বা গলায় আংগুল দিয়ে) তাকে কাযা করতে হবে। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, দার কুতনি, হাকেম।

খাত্তাবী বলেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত বমিতে যে কাযা নেই এবং ইচ্ছাকৃত বমিতে যে কাযা আছে- এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।

৪ ও ৫. **হায়েয ও নেফাস** : (মাসিক ও প্রসবোত্তর স্রাব) এমনটি সূর্যাস্তের পূর্বে শেষ মুহূর্তেও যদি হয়, তবে রোযা ভংগ হবে এবং কাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত।

৬. **ইচ্ছাকৃতভাবে বীর্যপাত ঘটানো** : তা এর কারণ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে চুমু দেয়া বা আলিংগন করা হোক, অথবা হস্তমৈথুন বা অন্য কোনো উপায়ে হোক, এতে রোযা বাতিল হয় এবং কাযা করা বাধ্যতামূলক। রোযাদার অবস্থায় দিনের বেলায় স্ত্রীর প্রতি শুধু দৃষ্টি দিলেই যদি বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে তাতে রোযা ভংগও হয়না এবং এতে কাযা বা কাফফারাও ওয়াজিব হয়না। অনুরূপ, মযিও রোযার কোনো ক্ষতি করেনা, চাই বেশি হোক বা কম হোক।

৭. **স্বাভাবিক পন্থায় যা খাওয়া হয়না বা তা পেটে ঢুকানো** : যেমন বেশি পরিমাণে লবণ খাওয়া। অধিকাংশ আলেমের মতে এতে রোযা ভংগ হয়।

৮. যে ব্যক্তি রোযাদার অবস্থায় রোযা ভাংগার নিয়ত করে, সে কিছু পানাহার না করলেও তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা নিয়ত রোযার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই রোযা ভাংগার নিয়ত করলে রোযা অবশ্যই ভেংগে যাবে।

৯. সূর্য অস্ত গেছে কিংবা ভোর হয়নি মনে করে পানাহার বা সহবাস করলে এবং পরে সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলে চার ইমামসহ অধিকাংশ আলেমের মতে তার রোযা কাযা করতে হবে। কিন্তু ইসহাক, দাউদ, ইবনে হাযম, আতা, উরওয়া, হাসান বসরী ও মুজাহিদের মতে তার রোযা শুদ্ধ এবং তাকে কাযা করতে হবেনা। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ .

"তোমরা ভুলক্রমে যা কিছু করো, তাতে তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই। তবে তোমাদের মন যা করার ইচ্ছা করে তার কথা আলাদা।" (সূরা আহযাব : আয়াত ৪)

তাছাড়া একটু আগেই রসূল সা. এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছি : আল্লাহ আমার উম্মাতের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন : উমর ইবনুল খাত্তাবের আমলে লোকেরা ইফতার করলো। আমি দেখলাম, হাফসার রা. বাড়ি থেকে বিরাট বিরাট ডেগচি বের হলো এবং লোকেরা পান করলো। এর পরক্ষণেই মেঘের নিচ থেকে সূর্য বেরিয়ে এলো। এ ঘটনায় জনগণ খুবই বিব্রত হলো। অনেকেই বললো : আমরা এ দিনের রোযা কাযা করবো। উমর রা. বললেন : কেন? আল্লাহর কসম, আমরা তো গুনাহ করতে ইচ্ছুক ছিলামনা।"

বুখারি আসমা বিনতে আবি বকর থেকে বর্ণনা করেছেন : আমরা রসূল সা. এর আমলে একদিন মেঘলা পরিবেশে ইফতার করলাম। এরপর সূর্য বের হলো। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : এ হাদিস দ্বারা দুটো জিনিস প্রমাণিত হয় :

প্রথমত : আকাশ মেঘলা থাকলে সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ইফতার বিলম্বিত করা মুস্তাহাব নয়। কেননা রসূল সা. ও সাহাবিগণ এটা করেননি। রসূল সা. সাহাবিদেরকে তা করতে আদেশও দেননি। অথচ সাহাবিগণ পরবর্তীকালের সকল মুসলমান অপেক্ষা আল্লাহ ও তার রসূলের অধিক অনুগত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত : এ কারণে রোযা কাযা করাও জরুরি নয়। কেননা রসূল সা. যদি তাদেরকে কাযা করতে আদেশ দিতেন তবে তা সর্বত্র প্রচারিত হতো যেমন ইফতারের ঘটনা প্রচারিত হয়েছে। সেটা যখন বর্ণিত হয়নি, তখন প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাযা করার আদেশ দেননি।

অধিকাংশ আলেমের মতে যে জিনিসটির কারণে কাযা ও কাফফারা দুটোই ওয়াজিব হয়, তা একমাত্র স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর কিছু নয়।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এলো। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন : কিসে তোমাকে ধ্বংস করলো? সে বললো : রমযানে স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। রসূল সা. বললেন : একটা দাস মুক্ত করার মতো সামর্থ্য আছে তোমার? সে বললো : না। তবে একটানা দু'মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বললো : না। তিনি বললেন : ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে? সে বললো : না। এরপর সে অপেক্ষায় থাকলো। কিছুক্ষণ পরই রসূল সা. এর নিকট প্রায় পনেরো 'সা' খোরমা এলো। রসূল সা. বললেন : নাও, এটা সদকা করে দাও। সে বললো : আমার চেয়ে দরিদ্র কেউ কি আছে? মদিনার আশপাশে আমার চেয়ে এই খোরমার প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী কেউ নেই। একথা শুনে রসূল সা. এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তার মাড়ির চারটি দাঁত বেরিয়ে পড়লো। তিনি বললেন : যাও, তোমার পরিবারকে এটা খাওয়াওগে।" -সবকটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ (ইমাম শাফেয়ির দু'টি মতের একটি হলো, দারিদ্র্যের কারণে কাফফারা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এটা ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মত। মালেকি মযহাবেরও কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, দারিদ্র্যের কারণে কাফফারা রহিত হয়না।)

অধিকাংশ আলেমের মত হলো, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে নিয়ত সহকারে রোযা রেখেও রমযানের দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে এবং কোনো বল প্রয়োগ ব্যতীত সহবাস করে থাকলে উভয়ের ওপরই কাফফারা ওয়াজেব হবে। (তবে রোযা যদি রমযানের কাযা বা মানতের রোযা হয় এবং সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভেংগে যায় তাহলে কাফফারা দিতে হবেনা।) কিন্তু সহবাস যদি ভুলক্রমে সংঘটিত হয় কিংবা ইচ্ছাধীনভাবে সংঘটিত না হয়, যেমন বল প্রয়োগ, ধর্ষণ বা বলাৎকারের মাধ্যমে করানো হয়, অথবা তারা রোযার নিয়ত করেছিলনা এমন হয়, তাহলে দু'জনের কাউকেও কাফফারা দিতে বাধ্য হবেনা। আর যদি স্ত্রীকে স্বামী সহবাসে বাধ্য করে অথবা কোনো ওযরবশত সে রোযা ভেংগে দেয়, তাহলে স্বামীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে, স্ত্রীর ওপর নয়। এক্ষেত্রে শাফেয়ি মাযহাবের বিধান হলো, স্ত্রীর ওপর কোনো অবস্থায়ই কাফফারা ওয়াজিব হবেনা। চাই স্বেচ্ছায় করুক অথবা বাধ্য হয়ে করুক। তার ওপর শুধু রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে। নববী বলেছেন : সার্বিকভাবে সবচেয়ে নির্ভুল মত হলো, শুধু পুরুষের ওপর তার নিজের পক্ষ থেকে কাফফারা ওয়াজিব। স্ত্রীর ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়। কেননা এটা সহবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা আর্থিক অধিকার। তাই এটা পুরুষের সাথেই সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর সাথে

নয়। এটা মোহরানার সাথে তুলনীয়। আবু দাউদ বলেছেন : রমযানে স্ত্রী সহবাস করেছে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তার স্ত্রীকে কি কাফফারা দিতে হবে? তিনি বললেন : স্ত্রীকে কাফফারা দিতে হয় এমন কথা আমরা শুনিনি।

আল মুগনীতে বলা হয়েছে : এর কারণ হলো : রসূলুল্লাহ সা. রমযানে সহবাসকারী পুরুষকে একটা দাস মুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন। স্ত্রীকে কিছুই আদেশ দেননি। অথচ সেও এ কাজে জড়িত তা তিনি জানতেন।

আর কাফফারা হাদিসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা অনুসারেই দিতে হবে। এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। সে অনুসারে প্রথমে দাস মুক্ত করতে হবে। তা না করতে পারলে এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। (এই দু'মাসে কোনো রমযান, ঈদ ও আইয়ামে তাশরীক থাকতে পারবেনা।) তাও না পারলে নিজ পরিবারের মধ্যম মানের খাদ্য অনুযায়ী ষাটজন মিসকিনকে খাবার দিতে হবে। (খাবারের ব্যাপারে ইমাম আহমদের মত হলো, প্রত্যেক মিসকিনকে এক মুদ করে গম অথবা অর্ধ 'সা' করে যব বা খোরমা দিতে হবে। আবু হানিফার মতে অর্ধ 'সা' করে গম এবং অন্যান্য জিনিস এক সা করে দিতে হবে। শাফেয়ী ও মালেকের মতে, যে জিনিসই দিক, এক মুদ করে দিতে হবে। এটাই আবু হুরায়রা, আতা ও আওযায়ির মত এবং এটাই অধিকতর প্রসিদ্ধ। কেননা বেদুইনকে ১৫ সা দেয়া হয়েছিল।) এই ধারাক্রমে একটি থেকে অপরটিতে স্থানান্তর কেবল আগেরটায় অক্ষম হলেই জায়েয। মালেকিদের মত এবং আহমদের একটি মত হলো, এই তিনটিতে সে স্বাধীন। এর যেটিই বেছে নেবে, কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা মালেক আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা ভেংগে ফেললো। তখন রসূলুল্লাহ সা. তাকে একটা দাস মুক্ত করতে, অথবা অবিরাম দু'মাস রোযা রাখতে, অথবা ষাট মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে আদেশ দিলেন। -মুসলিম। এখানে 'অথবা' দ্বারা স্পষ্টতই স্বাধীনতা দেয়া বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু একটা বিধি লংঘনের কারণেই কাফফারা ওয়াজিব হয়, তাই বিকল্পগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করার স্বাধীনতা থাকাই সমীচীন, যেমন কসমের কাফফারায় রয়েছে।

শওকানি বলেছেন : বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ধারাবাহিকতা ও স্বাধীনতা দুটোই পাওয়া যায়। তবে ধারাবাহিকতা সংক্রান্ত রেওয়ায়াতই বেশি। মুহাল্লাব ও কুরতুবি একাধিক ঘটনাবলীসহ সব কটি রেওয়ায়াত একত্রিত করেছেন।

হাফেয বলেছেন : একাধিক ঘটনা সুদূর পরাহত। কেননা ঘটনা একটাই। উপলক্ষ এক এবং ঘটনা একাধিক না হওয়াই মূল কথা। আলেমদের কেউ কেউ মনে করেন, ধারাবাহিকতা দ্বারা অগ্রগণ্যতা এবং স্বাধীনতা দান দ্বারা প্রত্যেক বিকল্পের বৈধতা বুঝায়। আবার কেউ কেউ ঠিক এর বিপরীত মত পোষণ করেন। (অর্থাৎ ধারাবাহিকতা দ্বারা প্রতিটি বিকল্পের বৈধতা এবং স্বাধীনতা দান দ্বারা অগ্রগণ্যতা বুঝায়।)

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানে স্ত্রী সহবাস করে এবং কাফফারা দেয়না, অতপর পুনরায় রমযানের শেষে আরেকদিন সহবাস করে, তার একবার কাফফারা দিলেই চলবে। এটা হানাফিদের মত এবং আহমদ থেকে প্রাপ্ত একটি মত। কেননা এটা এমন একটা অপরাধের শাস্তি, যা শাস্তি কার্যকর হওয়ার আগে অপরাধের কারণ বারংবার সংঘটিত হয়েছে। তাই একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ীও এক বর্ণনা মতে আহমদ বলেছেন : তাকে দুটো কাফফারা দিতে হবে। কেননা প্রতিদিন একটা স্বতন্ত্র ইবাদতের দিন। তা নষ্ট হওয়ার কারণে যখন কাফফারা ওয়াজিব হয়েছে, তখন একটি অপরটির সাথে যুক্ত হয়ে একাকার হবেনা। যেমন দুই রমযানে সংঘটিত হলে হয়না।

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানে সহবাস করে কাফফারা দিয়ে পুনরায় আর একদিন সহবাস করলে তাকে আলাদা আর একটা কাফফারা দিতে হবে। অনুরূপ এ ব্যাপারেও তারা একমত হয়েছে, যে ব্যক্তি একই দিন দু'বার সহবাস করে এবং প্রথম বারের কাফফারা না দিয়েই দ্বিতীয়বার করে, তার ওপর একটা কাফফারা ওয়াজিব হবে। প্রথম সহবাসের কাফফারা দিয়ে থাকলে দ্বিতীয় সহবাসের জন্য অধিকাংশ ইমামের মতে কাফফারা দিতে হবেনা। ইমাম আহমদের মতে দ্বিতীয়বার কাফফারা দিতে হবে।

২২. রমযানের রোযার কাযা

রমযানের রোযার কাযা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হয়না বরং প্রশস্ততা সহকারে ওয়াজিব হয়। যে কোনো সময় আদায় করা যায়। কাফফারাও তদ্রূপ। কেননা আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : রমযানে তাঁর যে কটা রোযা ছাড়তে হতো তিনি তা শা'বান মাসে কাযা করতেন এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রমযানের অব্যবহিত পর কাযা করতেন না। আর কাযা রোযা মূল রোযারই সমমানের। অর্থাৎ যে কয়টা ছুটে যাবে, সে কয়টাই রাখতে হবে। একটিও বেশি নয়। মূল রোযার সাথে কাযা রোযার পার্থক্য হলো, কাযা রোযা একটানা রাখা জরুরি নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন : "যে ব্যক্তি রুগ্ন থাকবে কিংবা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনগুলোতে তা পূর্ণ করবে।" অর্থাৎ রোগ বা সফরের কারণে যে ব্যক্তি রোযা ভাংবে, সে যতো সংখ্যক রোযা ভেংগেছে ততো সংখ্যক রোযা অন্য দিনে রাখবে, একটানা হোক বা বিরতি সহকারে হোক। কেননা আল্লাহ শর্তহীনভাবে রোযা রাখতে বলেছেন, কোনো শর্ত জুড়ে দেননি।

দার কুতনি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রমযানের কাযা বিরতি সহকারেও রাখতে পারে। অবিরত ধারায়ও রাখতে পারে।

আর কেউ যদি কাযা করতে বিলম্ব করে ফেলে এবং আরেক রমযান এসে পড়ে তাহলে যে রমযান এসে পড়েছে তার রোযা রাখবে, তারপর রমযানের পর বাকি রোযা রেখে দেবে। কোনো ফিদিয়া দিতে হবেনা। এই বিলম্ব কোনো ওযরের কারণে হোক কিংবা বিনা ওযরে হোক, কিছুই এসে যায়না। এটা হানাফি মাযহাব ও হাসান বসরীর অভিমত।

তবে ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও হানাফিগণের মতে ওযরবশত বিলম্ব করলে ফিদিয়া দেয়া লাগবেনা। কিন্তু বিনা ওযরে বিলম্ব করলে তাকে সমাগত রমযানের রোযা রেখে তারপর কাযা আদায় করতে হবে এবং প্রত্যেক রোযা বাবদ অতিরিক্ত এক মুদ করে খাদ্য ফিদিয়া দিতে হবে। তবে এই মতের স্বপক্ষে তাদের কাছে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। এ ব্যাপারে হানাফিদের মযহাবই সঠিক। কেননা আয়াত বা সহীহ হাদিস ছাড়া শরিয়তের কোনো বিধি গ্রহণযোগ্য নয়।

যে ব্যক্তি রোযা অনাদায়ী রেখে মারা যায় : আলেমগণ একমত হয়েছেন : যে ব্যক্তি কিছু নামায অনাদায়ী রেখে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে তার ওলী বা অন্য কেউ নামায পড়লে আদায় হবেনা। অনুরূপ যে ব্যক্তি রোযা রাখতে অক্ষম তার জীবদ্দশায় তার পক্ষ থেকে অন্য কারো রোযা রাখার বিধান নেই।

আর যে ব্যক্তি রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর আগে রোযা না রেখে রোযা অনাদায়ী রেখে মারা যায়। ফকীহগণ তার ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

আবু হানিফা ও মালেকসহ অধিকাংশ আলেমের মত এবং শাফেয়ির প্রসিদ্ধ মত হলো, তার ওলী তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবেনা, বরং প্রতিদিন বাবদ এক মুদ করে (হানাফিদের মতে

অর্ধ সা করে গম এবং অন্য খাদ্য শস্য এক সা করে) খাদ্য বিলি করবে। শাফেয়ি মাযহাবের মনোনীত মত হলো, ওলীর জন্য তার পক্ষ থেকে রোযা রাখা মুস্তাহাব এবং এতে মৃত ব্যক্তি অব্যাহতি পাবে। তার পক্ষ থেকে খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। 'ওলী' দ্বারা আত্মীয় বুঝানো হয়। চাই সে পিতৃকুলীয় হোক, উত্তরাধিকারী হোক বা অন্য কেউ হোক।

আর ওলীর অনুমতিতে কোনো আত্মীয় মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখলে তা শুদ্ধ হবে। অনুমতি ছাড়া রাখলে শুদ্ধ হবেনা। এর প্রমাণ আহমদ, বুখারি ও মুসলিমে আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদিস : "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি যোযা অনাদায়ী রেখে মারা যায়, তার ওলী তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে।" বাযযার এর বর্ণনায় "যদি চায়" এই কথাটা অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে।

আর আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এসে এবং বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমার মা এক মাসের রোযা অনাদায়ী রেখে মারা গেছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে কাযা করবো? রসূল সা. বললেন : তোমার মায়ের যদি ঋণ থাকতো তা কি তুমি শোধ করতে? তিনি বললেন : অবশ্যই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা সর্বাধিক অগ্রগণ্য।"

নববী বলেছেন, এই মতটি বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। আমরা এটিতে বিশ্বাস করি। আর আমাদের ইমামগণের মধ্যে যারা বিচক্ষণ এবং হাদিস ও ফিকাহর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন তারাও এ মতটিকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করেছেন।

যে সকল দেশে দিন লম্বা ও রাত ছোট সেখানে রোযার সময় নির্ণয়ের পন্থা : যে সকল দেশে দিন লম্বা ও রাত ছোট এবং যে সকল দেশে রাত লম্বা ও দিন ছোট, সেসব দেশে কোন্ দেশ অনুসারে সময় নির্ণয় করা হবে। তা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কেউ বলেন : সেসব দেশে মধ্যম মানের কোনো দেশ বা শহরকে অনুসরণ করে সময় নির্ণয় করা হবে যেখানে শরিয়ত চালু রয়েছে, যেমন মক্কা ও মদীনা। আবার অন্যেরা বলেন : নিকটতম মধ্যম মানের দেশ অনুসারে সময় নির্ণয় করা হবে।

২৩. লাইলাতুল কদর

ফযিলত : লাইলাতুল কদর বছরের শ্রেষ্ঠ রাত। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

অর্থ : আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি। তুমি কিভাবে জানবে লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।" অর্থাৎ লাইলাতুল কদরে কৃত সৎ কাজ যথা নামায, তেলাওয়াত যিকির ইত্যাদি হাজার মাসে কৃত সৎ কাজের চেয়ে উত্তম, যাতে কোনো লাইলাতুল কদর নেই।

লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা মুস্তাহাব : রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা মুস্তাহাব। কেননা রসূলুল্লাহ সা. রমযানের শেষ দশদিনে এর অন্বেষণে কঠোর সাধনা করতেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রমযানের শেষ দশ দিন এলেই রসূল সা. রাত জাগতেন, পরিবার পরিজনকে জাগাতেন এবং কঠোর সাধনা করতেন। (অর্থাৎ স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরত্ব অবলম্বন করতেন এবং অধিক পরিমাণে ইবাদত করতেন।)

লাইলাতুল কদর কোন্ রাতে : এ রাতটি নির্ণয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন : একুশতম রাত। কেউ বলেছেন : তেইশতম রাত। কেউ বলেছেন :

পঁচিশতম রাত। কেউ বলেছেন : উনত্রিশতম রাত। আবার কেউ কেউ বলেন : শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে তা স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশের মতে সাতাশতম রাতই লাইলাতুল কদর। আহমদ ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করে, সে যেন সাতাশতম রাতে তা অন্বেষণ করে।" আর মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন, "উবাই বলেছেন : সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতিত আর কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই সেটি রমযানেই রয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি জানি সেটি কোন্ রাত। সেটি সেই রাত, যে রাতে নামায পড়তে রসূল সা. আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। সেটি সাতাশতম রাত। তার নিদর্শন হলো, এই দিনের প্রভাতে সূর্য সাদা হয়ে উদিত হবে, তার কোনো কিরণ থাকবেনা।"

এ রাতের নামায ও দোয়া : ১. বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাত জেগে নামায পড়বে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ২. আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আমি যদি লাইলাতুল কদর কোন্‌টি চিনতে পারি, তাহলে সেই রাতে কী পড়বো? তিনি বললেন, পড়বে : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ হে আল্লাহ, তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাস, তাই আমাকে ক্ষমা করো।"

২৪. ইতিকাফ

১. ইতিকাফের অর্থ : আভিধানিক অর্থে ইতিকাফ হচ্ছে কোনো জিনিসের সাথে লেগে থাকা এবং নিজেকে তার মধ্যে আটকে রাখা- চাই তা ভালো হোক বা মন্দ হোক। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর পূজোয় তোমরা লেগে রয়েছো?" অর্থাৎ এগুলোর উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে? এর পরিভাষাগত অর্থ, যা এখানে বুঝানো হয়েছে, তা হলো : মসজিদে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অবিরাম অবস্থান করা।

২. শরিয়তের দৃষ্টিতে ইতিকাফ : আলেমগণ একমত, ইতিকাফ শরিয়ত সম্মত। কেননা, রসূলুল্লাহ সা. প্রতি রমযানে দশ দিন ইতিকাফ করতেন। যে বছর তিনি **ইন্তিকাল করেন**। সে বছর বিশ দিন ইতিকাফ করেন। -বুখারি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

তাঁর সাহাবী ও স্ত্রীগণ তাঁর সাথে এবং তার পরেও ইতিকাফ করেছেন। যদিও রসূল সা. ইতিকাফকে পরিচিত করেছেন, কিন্তু এর ফযিলত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদিস নেই। আবু দাউদ বলেন : আমি ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইতিকাফের ফযিলত সম্পর্কে কি কিছু জানেন? তিনি বললেন : কিছু দুর্বল কথা ছাড়া কিছু পাইনি।

৩. ইতিকাফের প্রকারভেদ : ইতিকাফ দু'প্রকারের : সুন্নত ও ওয়াজিব। যে ইতিকাফ একজন মুসলমান নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য লাভ, সওয়াব অর্জন এবং রসূলুল্লাহ সা. এর অনুকরণ ও অনুসরণের উদ্দেশ্যে করে, সেটাই সুন্নত ইতিকাফ। সুন্নত ইতিকাফ রমযানের শেষ দশ দিনে করাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইতিপূর্বেই বলেছি, এ সময়টিতে রসূলুল্লাহ সা. ইবাদতের জন্য সর্বাধিক চেষ্টা সাধনায় মগ্ন হতেন।

পক্ষান্তরে যে ইতিকাফ কোনো ব্যক্তি নিজের ওপর ওয়াজিবরূপে আরোপ করে সেটাই ওয়াজিব ইতিকাফ। যেমন কেউ শর্তহীনভাবে মানত করলো এই বলে : আমার ওপর আল্লাহর জন্য এতোটা সময় ইতিকাফ বাধ্যতামূলক বা ওয়াজিব (অথবা আল্লাহর উদ্দেশ্যে এতো দিন বা এতোটা সময় আমি ইতিকাফ করবো) কিংবা শর্তযুক্তভাবে মানত করলো এই বলে : আমার

রোগীকে যদি আল্লাহ আরোগ্য দান করেন, তবে এতো দিন বা এতোটা সময় ইতিকাফ করবোই। সহীহ বুখারিতে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতের মান্নত বা প্রতিজ্ঞা করবে, সে যেন তার ইবাদত করে। বুখারিতে আরো বর্ণিত হয়েছে : উমর রা. বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আমি মসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করার মানত করেছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার মানত পূর্ণ করো।"

৪. ইতিকাফের সময় : ওয়াজিব ইতিকাফ যতটুকু সময়ের জন্য মানতকারী মানত করেছে, ততটুকু সময়ের জন্যই করতে হবে। যদি একদিন বা তার বেশি সময়ের জন্য মানত করে থাকে, তবে ঠিক একদিন বা তার বেশি (নির্দিষ্ট) সময়ের জন্য ইতিকাফ করতে হবে।

পক্ষান্তরে সুন্নত বা মুস্তাহাব ইতিকাফের কোনো ধরা বাঁধা মেয়াদ নেই। ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করলেই ইতিকাফ আদায় হবে, চাই তার মেয়াদ দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত হোক। মসজিদে যেটুকু সময় থাকবে, তার জন্য সওয়াব পাবে। পরে যখন মসজিদ থেকে বের হবে এবং পুনরায় সেখানে ফিরে আসবে, তখন ইতিকাফের সংকল্প করে থাকলে নতুন করে নিয়ত করবে। ইয়ালা বিন উমাইয়া বলেছেন : আমি মসজিদে এক ঘণ্টা অবস্থান করলেও ইতিকাফের উদ্দেশ্য ব্যতিত অবস্থান করিনা। আতা বলেছেন : যতক্ষণই কেউ মসজিদে থাকবে তা ঐ সময়ের ইতিকাফ। কেউ যদি পুণ্য ও সওয়াব লাভের আশায় মসজিদে বসে, তবে তাও ইতিকাফ, নচেত ইতিকাফ নয়। মুস্তাহাব ইতিকাফকারী যে সময়ের জন্য ইতিকাফের নিয়ত করে, ইচ্ছা করলে তার আগেও ইতিকাফ বন্ধ করে দিতে পারে।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন, তখন প্রথমে ফজরের নামায পড়তেন, তারপর নিজের ইতিকাফের কক্ষে প্রবেশ করতেন। একবার তিনি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি তার জন্য ইতিকাফের কক্ষ বানিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তা বানিয়ে দেয়া হলো। আয়েশা রা. বললেন : আমি যখন এটা দেখলাম তখন আমার কক্ষ বানিয়ে দেয়ার আদেশ দিলাম এবং তা বানানো হলো। রসূলুল্লাহ সা.এর অন্যান্য স্ত্রীরাও কক্ষ বানানোর আদেশ দিলেন এবং তা বানানো হলো। রসূলুল্লাহ সা. ফজরের নামায শেষে কক্ষগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন : এসব কী? তোমরা কি ইবাদত করতে চাও? তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ সা. তাঁর ইতিকাফের কক্ষ ভেংগে ফেলার আদেশ দিলেন এবং ভেংগে ফেলা হলো। তাঁর স্ত্রীরাও তাদের কক্ষগুলো আদেশ দিয়ে ভাংগিয়ে ফেললেন। অতপর শাওয়ালের প্রথম দশ দিন পর্যন্ত ইতিকাফকে বিলম্বিত করা হলো।

রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক তাঁর স্ত্রীদেরকে ইতিকাফের কক্ষগুলো ভেংগে ফেলা ও তাদের নিয়ত করার পরও ইতিকাফ পরিত্যাগ করার আদেশ দান থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইতিকাফ শুরু করার পর তা বন্ধ করা যায়। হাদিসে আরো জানা যায়, স্বামী স্ত্রীকে তার অনুমতি ছাড়া ইতিকাফ করা থেকে বিরত রাখতে পারে এবং এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, একবার অনুমতি দেয়ার পর পুনরায় নিষেধ করার অধিকার স্বামীর আছে কিনা। শাফেয়ি, আহমদ ও দাউদের মতে, নফল ইতিকাফ থেকে বিরত রাখা ও নিষেধ করার অধিকার স্বামীর রয়েছে।

(আয়েশার উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, ইতিকাফকারীর নিজের জন্য মসজিদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা বানিয়ে নেয়া জায়েয আছে। যেখানে সে ইতিকাফের পুরো সময় নিভৃতে অবস্থান করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, এতে অন্যান্য লোকের যেন কোনো অসুবিধা ও জায়গার সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয়। আর এ ধরনের স্বতন্ত্র জায়গা বা কক্ষ বানাতে হলে তা

মসজিদের শেষ প্রান্তে বা সংলগ্ন খোলা জায়গায় বানাবে, যাতে অন্যদের জায়গার সংকীর্ণতা বা বিরক্তির সৃষ্টি না হয় এবং তার নিজের জন্য অধিকতর পূর্ণাংগ নিভৃত স্থান হয়। আর এই হাদিসে রসূল সা. এর স্ত্রীদের আলাদা আলাদা কক্ষ বানানোর প্রতি রসূল সা.এর যে অসন্তোষের উল্লেখ দেখা যায় তার কারণ মুসলিমের টীকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই কারণ হলো, তিনি আশংকা করেছিলেন, স্ত্রীরা ইতিকাফে একনিষ্ঠ ও আন্তরিক নাও হতে পারেন। বরঞ্চ তারা হয়তো রসূল সা.কে কে কত ভালোবাসে এবং তিনি কাকে কত ভালোবাসেন তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে নিছক তার নিকটে অবস্থান করার বাসনা পোষণ করে থাকতে পারেন। তাই তিনি তাদের মসজিদে অবস্থান করাটা অপছন্দ করলেন, যদিও অন্যদেরকে তিনি মসজিদে সমবেত করতেন এবং সাধারণ বেদুইনরা এমনকি মুনাফিকরা পর্যন্ত তার কাছে আসতো। অথচ স্ত্রীদেরকে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে তার কাছে আসা যাওয়া করতে ও দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথাবার্তা তাকে বলতে হতো। এর আরেকটা কারণ এও হতে পারে। তিনি নিজে ইতিকাফ করা অবস্থায় যখন স্ত্রীদেরকে নিজের কাছে দেখবেন, তখন মনে হবে, তিনি নিজের বাড়িতেই স্ত্রীদের কাছেই অবস্থান করছেন। এতে ইতিকাফের উদ্দেশ্যই বিফল হবে। যা স্ত্রী ও পার্থিব সম্পর্কগুলো ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যই করা হয়। অথবা তারা তাদের আলাদা আলাদা কক্ষ দ্বারা মসজিদের জায়গা সংকীর্ণ করে ফেলেছিলেন- এটাও এই অসন্তোষের কারণ হয়ে থাকতে পারে।)

৫. ইতিকাফের শর্তাবলি : ইতিকাফের শর্ত হলো, ইতিকাফকারীকে মুসলমান, ন্যায় ও অন্যায় বাছবিচারের ক্ষমতাসম্পন্ন, মাসিক ও প্রসবোত্তর স্রাব থেকে এবং বীর্যস্খলনজনিত অপবিত্রাবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে। সুতরাং কোনো কাফেরের, অপরিণত বুদ্ধি বালকের ও অপবিত্র ব্যক্তির ইতিকাফ শুদ্ধ হবেনা।

৬. ইতিকাফের আরকান বা স্তম্ভ : ইতিকাফের মূল সত্তা হলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বা নিয়তে, মসজিদে অবস্থান করা। মসজিদে অবস্থান না করলে কিংবা আল্লাহর ইবাদতের নিয়ত না করলে ইতিকাফ হবেনা। নিয়ত যে অপরিহার্য তার প্রমাণ হলো আল্লাহর এই বাণী : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .

"তাদেরকে একমাত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করারই আদেশ দেয়া হয়েছিল।" (সূরা বাইয়িনাহ : আয়াত : ৫)

এবং রসূলুল্লাহ সা. এর উক্তি : "যাবতীয় কাজ নিয়ত অনুযায়ীই বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে কেবল তাই পায়।" -সহীহ্ বুখারি।

ইতিকাফের জন্য যে মসজিদ অত্যাবশ্যক, তার প্রমাণ আল্লাহর এই উক্তি :

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ .

"তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত থাকাকালে স্ত্রী সহবাস করোনা।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, ইতিকাফ যদি মসজিদ ছাড়া আর কোথাও শুদ্ধ হতো, তাহলে নির্দিষ্টভাবে মসজিদে ইতিকাফ করা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ করা হতোনা। কেননা ওটা ইতিকাফের পরিপন্থী। সুতরাং জানা গেলো, ইতিকাফ শুধু মসজিদেই করতে হয়।

৭. যে মসজিদে ইতিকাফ শুদ্ধ হয়, তার সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহদের মতামত : যে মসজিদে ইতিকাফ শুদ্ধ হয় তার সংজ্ঞা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। আবু হানিফা, আহমদ, ইসহাক ও আবুছ ছাওরের মতে, যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া হয় ও জামাত অনুষ্ঠিত

হয়, সে মসজিদেই ইতিকাফ শুদ্ধ হয়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "এমন প্রতিটি মসজিদে ইতিকাফ শুদ্ধ, যে মসজিদে ইমাম ও মুয়াযযিন নিযুক্ত আছে।" -দার কুতনি।

আর ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও দাউদ বলেন, যে কোনো মসজিদে ইতিকাফ শুদ্ধ। কেননা কিছু মসজিদকে বাদ দেয়া ও কিছু মসজিদকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়না।

শাফেয়ীদের মতে, জুমা মসজিদে ইতিকাফ করা উত্তম। কেননা রসূল সা. জুমা মসজিদে ইতিকাফ করতেন। তাছাড়া এসব মসজিদে বেশির ভাগ নামায জামাতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইতিকাফের সময়ের মধ্যে জুমার নামায থাকলে অন্য মসজিদে ইতিকাফ করা ঠিক নয়।

আযান দেয়ার মিনার বা স্থান যদি মসজিদের ভেতরে বা তার প্রাংগণে হয়, তাহলে সেখানে গিয়ে আযান দেয়া ইতিকাফকারীর জন্য বৈধ। মসজিদের ছাদেও আরোহণ করতে পারে। কেননা এগুলো সবই মসজিদের অংশ। তবে মিনারের দরজা যদি মসজিদের বাইরে হয় তবে স্বেচ্ছায় সে মিনারে উঠলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। আর মসজিদের খোলা চত্বর হানাফি ও শাফেয়িদের মতে এবং ইমাম আহমদ থেকে একটি মতে মসজিদের অংশ। কিন্তু আহমদ থেকে বর্ণিত অপর মতানুসারে এবং মালেকের মতানুসারে মসজিদের অংশ নয়। সুতরাং ইতিকাফকারী মসজিদের চত্বরে বের হতে পারবেনা।

অধিকাংশ আলেমের মতানুসারে স্ত্রীলোকের জন্য তার বাড়িতে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ শুদ্ধ হবেনা। কেননা ঐ স্থানটি মসজিদ নামে অভিহিত হয়না। ঐ স্থান বিক্রি করার বৈধতার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এদিকে রসূল সা. এর স্ত্রীদের মসজিদে নববীতে ইতিকাফ করার পক্ষে বিশুদ্ধ প্রমাণ রয়েছে।

৮. ইতিকাফকারীর রোযা : ইতিকাফকারী রোযা রাখলে ভালো। না রাখলেও ক্ষতি নেই। বুখারি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর রা. রসূলুল্লাহ সা.কে বললেন, হে রসূলুল্লাহ, আমি জাহেলী যুগে মানত করেছিলাম মসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করবো। রসূল সা. বললেন : "তোমার মানত পূরণ করো।" রসূল সা. কর্তৃক তাকে মানত পূরণের এ আদেশ থেকে প্রমাণিত হয়, রোযা রাখা ইতিকাফের জন্য শর্ত নয়। কেননা রাতের বেলা রোযা শুদ্ধ হয়না। আবু সাহল থেকে সাঈদ বিন মানসুর বর্ণনা করেছেন, সাহল বলেছেন : আমার পরিবারের মহিলার ইতিকাফ করার মানত ছিলো। আমি উমর ইবনে আবদুল আযীযকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : সে যদি রোযার মানত করে থাকে তবেই তাকে রোযা রাখতে হবে। নচেত নয়। তখন যুহরী বললেন : রোযা ছাড়া কোনো ইতিকাফ নেই। উমর বললেন : এ কথা কি তুমি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছ থেকে শুনেছ? যুহরী বললেন : না। তিনি বললেন : তবে আবু বকর থেকে? তিনি বললেন : না। তিনি বললেন : তবে উমর রা. থেকে? তিনি বললেন : না। তিনি বললেন : উসমান থেকে? তিনি বললেন : না। .....তখন আমি তার কাছ থেকে বেরিয়ে এসে আতা ও তাউসের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম। তাউস জনৈক ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে বললেন : অমুক মনে করতেন, উক্ত মহিলা রোযা রাখার মানত না করলে তাকে রোযা রাখতে হবেনা। আর আতা বললেন : উক্ত মহিলা রোযার মানত না করলে তার রোযা রাখা জরুরি নয়। খাত্তাবী বলেছেন : এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হাসান বসরী বলেছেন : রোযা ছাড়া ইতিকাফ করলে ইতিকাফ শুদ্ধ হবে। ইমাম শাফেয়িরও মত এটা। আলী রা. ও ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত : তারা বলেছেন : ইতিকাফকারী ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারবে। ইচ্ছা করলে রোযা ছাড়াও ইতিকাফ করতে পারবে। আওযায়ি ও মালেকের মতে রোযা ছাড়া ইতিকাফ হয়না। এই মত

ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আয়েশা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, যুহরী এবং 'আহলুর রায়' নামে আখ্যায়িত কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি ইজতিহাদকারী আলেমদের।

৯. ইতিকাফের জায়গায় প্রবেশ ও সেখান থেকে বের হওয়ার সময় : আমরা আগেই বলেছি, মুস্তাহাব ইতিকাফের কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। ইতিকাফকারী যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে ও তার অভ্যন্তরে অবস্থান দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করবে, সে বের না হওয়া পর্যন্ত ইতিকাফকারী গণ্য হবে। যদি রমযানের শেষ দশ দিনের ইতিকাফের নিয়ত করে, তাহলে সূর্যাস্তের আগেই ইতিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে। বুখারি আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করবে সে যেন শেষ দশ দিন ইতিকাফ করে।" আর দশ দিন দ্বারা দশ রাত বুঝায়। দশ রাতের প্রথম রাত হচ্ছে একুশতম বা বিশতম রাত। যে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন, তখন ফজরের নামায পড়ে ইতিকাফের জায়গায় প্রবেশ করতেন, তার অর্থ হলো, ফজরের পর তিনি ইতিকাফের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় প্রবেশ করতেন। কিন্তু ইতিকাফের জন্য তাঁর মসজিদে প্রবেশের সময় রাতের প্রথম ভাগই ছিলো।

আর যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করবে, আবু হানিফা ও শাফেয়ীর মতে, সে রমযানের শেষ দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মসজিদ থেকে বেরুবে। মালেক ও আহমদের মতে, সূর্যাস্তের পর বেরুলে দশ দিনের ইতিকাফ সম্পন্ন হবে, তবে ঈদের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা মুস্তাহাব। আছরাম আবু কিলাবা থেকে বর্ণনা করেন : তিনি ঈদুল ফিতরের রাত (অর্থাৎ পূর্ববর্তী রাত) মসজিদে কাটাতেন। তারপর সকালে এমনভাবে বেরুতেন যেন ঈদের নামাযে যাচ্ছেন। তিনি ইতিকাফে থাকাকালে তার জন্য কোনো চাটাই বা জায়নামায বিছানো হতোনা। বরং অন্যান্য নামাযীদের মতোই তিনি বসে থাকতেন। ঈদুল ফিতরের দিন আমি তার কাছে গেলাম। দেখলাম জুয়াইরিয়া মুযাইনা তার কোলে রয়েছে। আমি মনে করলাম সে তার একটা মেয়ে। কিন্তু পরে জানা গেলো, সে তার একটা দাসী। তিনি তাকে স্বাধীন করে দিলেন। অতপর এমনভাবে রওনা হলেন যেন ঈদের নামাযে যাচ্ছেন। ইবরাহীম বলেছেন : রমযানের শেষ দশ দিন কেউ ইতিকাফ করলে সে ঈদুল ফিতরের রাতে মসজিদে অবস্থান করুক তারপর সকাল বেলা মসজিদ থেকে ঈদগাহে যাক- এটাই জনগণ পছন্দ করতো। আর যদি কেউ একদিন বা নির্দিষ্ট কয়েকদিন ইতিকাফের মানত করে অথবা মুস্তাহাব ইতিকাফ করে, সে ভোর হওয়ার আগে ইতিকাফে বসবে এবং সূর্য পুরোপুরি অস্ত গেলে মসজিদ থেকে বেরুবে, চাই তা রমযানে হোক বা অন্য কোনো সময়ে হোক। আর যদি কেউ এক রাত বা নির্দিষ্ট কয়েক রাত ইতিকাফের মানত করে অথবা মুস্তাহাব ইতিকাফ করে, তবে সে পুরোপুরি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে ইতিকাফে প্রবেশ করবে এবং ভোর হওয়ার পর বের হবে। ইবনে হাযম বলেছেন : এর কারণ হলো, সূর্যাস্তের পরই রাতের শুরু আর ভোর হওয়ার মধ্যদিয়েই রাতের সমাপ্তি। আর দিনের শুরু ভোর হওয়ার মধ্যদিয়ে এবং সূর্যাস্তের মধ্যদিয়ে দিনের সমাপ্তি। অথচ যে যা নিয়ত করে বা নিজের জন্য অপরিহার্য বলে ধার্য করে, তাই ছাড়া তার জন্য আর কিছু করার বাধ্যবাধকতা থাকে না। কেউ যদি এক মাস ইতিকাফ করার মানত করে অথবা নফল ইতিকাফের নিয়ত করে, তবে তার মাস শুরু হবে ঐ মাসের প্রথম রাত থেকে। সে পূর্ণ সূর্যাস্তের আগে মসজিদে ঢুকবে এবং মাসের শেষে পূর্ণ সূর্যাস্তের পর বের হবে, চাই রমযানে হোক বা অন্য কোনো মাসে হোক।

১০. ইতিকাফকারীর জন্য যেসব কাজ মুস্তাহাব ও যেসব কাজ মাকরূহ : অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করা, নামায পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ,

আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া, গুনাহ মাফ চাওয়া মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ, দোয়া করা এবং অনুরূপ আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ়কারী ইবাদতসমূহ করা ইতিকাফকারীর জন্য মুস্তাহাব। ইসলামী জ্ঞানের চর্চা, তাফসীর, হাদিস, নবীগণ ও সৎ কর্মশীল মানুষদের জীবনী এবং ফিকহ ও ধর্ম বিষয়ক বই পুস্তক অধ্যয়নও বাঞ্ছনীয়। রসূলুল্লাহ সা. এর অনুকরণে মসজিদের চত্বরে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করা মুস্তাহাব। আর যেসব কাজ এবং যেসব কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনায় কোনো লাভ নেই তা করা মাকরূহ। কেননা তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ আবু বাসরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "মানুষের একটি মহৎ ইসলামী বৈশিষ্ট্য হলো বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।"

তাই বলে সর্বাত্মক নীরবতা অবলম্বন করা এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সহায়ক মনে করা মাকরূহ। কেননা বুখারি আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন : একদিন রসূলুল্লাহ সা. ভাষণ দিচ্ছিলেন। সহসা দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা জানালো, সে ইসরাইলের বাবা। মানত করেছে শুধুই দাঁড়িয়ে থাকবে, কখনো বসবেনা, ছায়ার নিচে অবস্থান করবেনা এবং রোযা থাকবে। রসূল সা. বললেন : ওকে কথা বলতে, ছায়ায় অবস্থান করতে, বসতে ও রোযা সম্পন্ন করতে আদেশ দাও।" আবু দাউদ আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন : প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যে ব্যক্তি পিতৃহীন হয় তাকে এতিম বলা যাবেনা এবং রাত পর্যন্ত পুরো দিন নীরবতা অবলম্বন করা উচিত নয়। ইতিকাফকারীর জন্য যা যা করা মুবাহ বা বৈধ :

১১. ইতিকাফকারীর জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো বৈধ : ১. পরিবার পরিজনকে বিদায় জানাতে ইতিকাফের জায়গা থেকে বের হওয়া। সফিয়া রা. বলেন : "রসূলুল্লাহ সা. ইতিকাফে ছিলেন। আমি রাত্রে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলাম। তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার পর বেরিয়ে বাড়িতে ফিরে চললাম। রসূল সা. আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আমার সাথে চললেন। সফিয়ার বাসস্থান ছিলো উসামা বিন যায়দের বাড়িতে। এ সময় দুই আনসার ব্যক্তি তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা রসূলুল্লাহ সা.কে দেখে তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়ার উপক্রম করলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : একটু ধীরে যাও। শোন, এ হচ্ছে (আমার স্ত্রী) সফিয়া বিনতে হুয়াই। তারা বললো : হে রসূলুল্লাহ, সুবহানাল্লাহ! (অর্থাৎ আমরা কি কখনো আপনার সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করতে পারি যে, আপনি কোনো বেগানা মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করছেন?) রসূলুল্লাহ সা. বললেন : শয়তান মানুষের রক্তের সাথে শিরা উপশিরার মধ্যদিয়ে চলাচল করে। তাই আমার আশংকা হলো, সে তোমাদের দু'জনের মনে কোনো কুধারণা ঢুকিয়ে দিতে পারে। -বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ।

(খাত্তাবী বলেছেন : এ হাদিস থেকে জানা গেল, তিনি সফিয়াকে তার বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য মসজিদ থেকে বের হয়েছিলেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইতিকাফকারী শরিয়তের দৃষ্টিতে জরুরি কেনো কাজে মসজিদ থেকে বেরুলে ইতিকাফ ভংগ হবেনা এবং কোনো পরোপকারমূলক কাজ করার পথে ইতিকাফ অন্তরায় নয়। ইমাম শাফেয়ি থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : আনসারী সাহাবিদ্বয়ের প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়েই রসূল সা. তাদের কাছে সফিয়ার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। কেননা তারা যদি রসূল সা.-এর প্রতি কুধারণা পোষণ করতেন তাহলে কাফের হয়ে যেতেন। এ জন্য তিনি উদ্যোগী হয়ে তাদেরকে ব্যাপারটা জানালেন, যাতে তাদের ঈমান বিনষ্ট না হয়। তারিখে ইবনে আসাকিরে ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন : আমরা ইবনে উয়াইনার বৈঠকে ছিলাম। তখন সেখানে ইমাম শাফেয়ি উপস্থিত থেকে

এ হাদিস আলোচনা করছিলেন। ইবনে উয়াইনা ইমাম শাফেয়িকে বললেন : এ হাদিসটির শিক্ষা কী? তিনি বললেন : তোমরা যখন এ রকম পরিস্থিতিতে পড়বে, তখন এ রকম করবে, যাতে তোমাদের সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণার সৃষ্টি না হয়। রসূল সা. তার সাহাবিদেরকে কখনো তার প্রতি কুধারণা পোষণের দায়ে অভিযুক্ত করেননি। কেননা তিনি তো পৃথিবীতে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা সৎ ব্যক্তি।" ইবনে উয়াইনা বললেন : হে আবু আবদুল্লাহ (ইমাম শাফেয়ির উপনাম) আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনি সব সময় এমন কথাই বলেন যা আমাদের খুবই ভালো লাগে।)

২. চুল আঁচড়ানো, মাথা মুড়ানো, নখ কাটা, শরীর থেকে ময়লা সাফ করা, উত্তম পোশাক পরা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। আয়েশা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. মসজিদে ইতিকাফে থাকা অবস্থায় কক্ষের ফাঁকা স্থান দিয়ে আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন, আর আমি তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় রয়েছে : "আমি ঋতুবতী অবস্থায় চিরুনী দিয়ে তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম। -বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ।

৩. অনিবার্য প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া : আয়েশা রা. বলেন : "রসূল সা. যখন ইতিকাফে থাকতেন, আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন, আমি মাথার চুল আঁচড়ে দিতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে ঢুকতেন না। -বুখারি ও মুসলিম।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলেমগণ একমত, ইতিকাফের সময় পেশাব পায়খানার জন্য বের হওয়া বৈধ। কেননা এটা অনিবার্য প্রয়োজন, যা মসজিদের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব নয়। খাদ্য ও পানীয় এনে দেয়ার মতো কাউকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে পানাহারের প্রয়োজনেও বের হওয়া বৈধ। হঠাৎ বমি এসে গেলে বের হওয়া যাবে, যাতে মসজিদের বাইরে বমি করা যায়। যে কোনো অতি জরুরি কাজ, যা মসজিদে করা যায়না, তা করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ সময় বাইরে থাকা যাবেনা। দীর্ঘ সময় বাইরে অবস্থান না করলে ইতিকাফ নষ্ট হবেনা। বীর্যস্খলনজনিত অপবিত্রতা দূর করার জন্য গোসল করা এবং শরীর ও পোশাকের নাপাকি পরিষ্কার করার জন্যও বের হওয়া যাবে।

সাঈদ বিন মানসুর বর্ণনা করেন, আলী বিন আবু তালেব রা. বলেছেন : কেউ ইতিকাফে বসলেও তার জুমা ও জানাযার নামাযে শরিক হওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং পরিবারকে তার প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার আদেশ দিতে যাওয়া উচিত। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আদেশ দিয়ে মসজিদে ফিরে আসতে হবে। আলী রা. তার ভাগ্নেকে একজন চাকর খরিদ করার জন্য সাতশো দিরহাম দিলেন। ভাগ্নে বললো : আমি ইতিকাফে আছি। আলী রা. বললেন : বাজারে গিয়ে কিনে আনলে তোমার কী ক্ষতি হতো? কাতাদা ইতিকাফকারীর জন্য মৃত ব্যক্তির দাফনে শরিক হওয়া ও রোগীকে দেখতে যাওয়া শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর মতে এসব কাজে মু'তাকিফ বাইরে যেতে পারে। কাজগুলো হলো : রোগীকে দেখতে যাওয়া, জুমা ও জানাযার নামাযে শরিক হওয়া এবং প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে যাওয়া। তিনি বলেছেন : একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো বাড়ির দেউড়ি বা প্রাংগণে না ঢোকা উচিত। খাত্তাবী বলেন : একদল আলেমের মতে, জুমা, জানাযা ও রোগীকে দেখতে যাওয়া ইতিকাফকারীর জন্য জায়েয। এটা আলী রা. সাঈদ ইবনুল জুবাইর, হাসান বাসরী ও নাখয়ীর অভিমত।

আর আবু দাউদ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ইতিকাফে থাকাকালে রোগীর নিকট দিয়ে যেতেন। কিন্তু সেখানে অবস্থান করে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন না, বরং চলতে চলতেই জিজ্ঞাসা করতেন। তবে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে হাদিসে বলা হয়েছে যে, ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নাহ সম্মত পন্থা হলো রোগীকে দেখতে না যাওয়া, তার অর্থ হলো, ইতিকাফকারী রোগী দেখার উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হবেনা, রোগীর জন্য বিরক্তি সৃষ্টি করবেনা, সেখানে অবস্থান না করেই তার কুশল জিজ্ঞাসা করে ফিরে আসবে।

৪. মসজিদের ভেতরে পানাহার করা ও ঘুমানো ইতিকাফকারীর জন্য বৈধ। তবে তাকে মসজিদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ করতে হবে। মজজিদে বিয়ে, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদির চুক্তি সম্পাদন করাও তার জন্য বৈধ।

১২. কিসে কিসে ইতিকাফ বাতিল হয় : নিম্নোক্ত কাজগুলোর যে কোনোটি করলে ইতিকাফ বাতিল হয় :

১. বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদের বাইরে যাওয়া- তা সে যতো অল্প সময়ের জন্যই হোক। কেননা এতে মসজিদে অবস্থান, যা ইতিকাফের অবিচ্ছেদ্য অংশ হাতছাড়া হয়ে যায়।

২. মুরতাদ হওয়া : কেননা এটা ইবাদতের বিপরীত। আল্লাহ্ বলেন : "তুমি যদি শিরক করো, তবে তোমার সৎ কাজ বাতিল হয়ে যাবে।" (সূরা যুমার : আয়াত ৬৫)

৩, ৪, ৫ : পাগল বা মাতাল হওয়ার কারণে বুদ্ধি হারানো এবং মাসিক ও প্রসবোত্তর ঋতুস্রাব : কেননা প্রথমটিতে ভালো মন্দ বাছ বিচারের ক্ষমতা থাকেনা এবং শেষের দুটিতে পবিত্রাবস্থা থাকেনা, যা ইতিকাফের জন্য পূর্বশর্ত।

৬. সহবাস : আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَا تُقَرِبُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا -

তোমরা মসজিদে ইতিকাফ করা অবস্থায়, স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়োনা। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কাজেই এ কাজের নিকটবর্তী হয়োনা। (সূরা বাকারা : আয়াত ৮৭)

অবশ্য কামাবেগ ব্যতীত স্পর্শ করাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ রসূল সা. এর জনৈকা স্ত্রী তার ইতিকাফের সময় কেশ বিন্যাস করে দিতেন। কামাবেগ সহকারে চুমু দেয়া ও স্পর্শ করা সম্পর্কে আবু হানিফা ও আহমদ বলেছেন : এটা অন্যায় ও নিষেধ। তবে বীর্যপাত না হলে তাতে ইতিকাফ বাতিল হবেনা। মালেক বলেছেন : বীর্যপাত না হলেও ইতিকাফ বাতিল হবে। কেননা এটা একটা নিষিদ্ধ মিলন, যা বীর্যপাতের মতোই ইতিকাফকে নষ্ট করবে। শাফেয়ি থেকে উল্লিখিত দুটি মতের মতো দুটো মত বর্ণিত হয়েছে। ইবনে রুশদ বলেছেন : 'মুবাশারাত' (মিলন) শব্দটি একটি ইসমে মুশতারিক তথা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। এ ধরনের শব্দ, একই সময়ে উভয় অর্থ বুঝায় কিনা, তা নিয়েই ইমামদের মতভেদ। যারা বলেন, একই সময়ে উভয় অর্থ বুঝায়, তাদের মতে মুবাশারাত (মিলন) শব্দটি দ্বারা সহবাস বা সহবাসের কাছাকাছি কাজ উভয়টাই বুঝানো হয়। কাজেই উল্লিখিত আয়াতে যে মিলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সহবাস ও সহবাসের কাছাকাছি কাজ- উভয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর যাদের মতে মিলন দ্বারা একই সাথে উভয় অর্থ বুঝানো হয়না, তারা বলেন : মিলনের অর্থ হয় সহবাস, নতুবা তার কাছাকাছি কাজ। বস্তুত এই মতটিই অধিকাংশের সমর্থিত। অতএব আমরা যদি বলি, এর অর্থ সহবাস, তখন একথা বলা যাবেনা যে, এর অর্থ সহবাসের কাছাকাছি কাজও। কেননা একই শব্দ একই সাথে একটি জিনিস ও তার কাছাকাছি জিনিসকে বুঝাবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যারা বীর্যপাতকে সহবাসের পর্যায়ভুক্ত বলেন, তাদের মতে বীর্যপাতযুক্ত মিলন (স্পর্শ বা চুমু) সহবাসেরই অর্থবোধক। আর যারা বীর্যপাতকে সহবাসের পর্যায়ভুক্ত বলেন না, তাদের মতে মিলন শব্দটি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সহবাস বুঝায়না।

১৩. ইতিকাফের কাযা : যে ব্যক্তি নফল ইতিকাফ শুরু করে, তারপর তা ভংগ করে বা ত্যাগ করে, তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইতিকাফ কাযা করা মুস্তাহাব, কেউ বলেন ওয়াজিব। তিরমিযি বলেছেন : ইতিকাফকারী নিয়ত করে ইতিকাফ শুরু করার পর শেষ করার আগে বর্জন করলে ইমাম মালেকের মতে তার কাযা করা ওয়াজিব। তারা প্রমাণ দেন এই হাদিস দ্বারা : "রসূল সা. ইতিকাফ থেকে বের হলেন, তারপর শওয়াল মাসের দশ দিন

ইতিকাফ করলেন।" শাফেয়ী বলেছেন : সে যদি মানত বা অন্য কোনোভাবে ইতিকাফকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক না করে থাকে এবং ইতিকাফ নফল হয়, তারপর তা বর্জন করে, তাহলে তার কাযা করতে হবেনা। সে স্বেচ্ছায় ওয়াজিব করে নিলেও ওয়াজিব হবেনা। শাফেয়ী বলেন : যে কোনো কাজ তুমি শুরু করতে পারো। শুরু করার পর তুমি যদি তা থেকে বেরিয়ে যাও, তাহলে তোমার তা কাযা করতে হবেনা একমাত্র হজ্জ ও উমরা ব্যতিত।

তবে কেউ যদি একদিন বা কয়েকদিন ইতিকাফ করার মানত করে, তারপর তা শুরু করে ভঙ্গ করে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তাকে কাযা করতে হবে। কাযা করার আগে সে যদি মারা যায়, তবে তার পক্ষ থেকে কাযা করা লাগবেনা। তবে আহমদের মতে তার অভিভাবকের ওপর তার পক্ষ থেকে কাযা করা ওয়াজিব। আবদুল করীম বিন উমাইয়া বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন উতবাকে বলতে শুনেছি : আমাদের মার ওপর ইতিকাফ ওয়াজিব ছিলো। এমতাবস্থায় তিনি মারা গেলেন। এ বিষয়ে আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তার পক্ষ থেকে তুমি ইতিকাফ করো ও রোযা রাখো। সাঈদ বিন মানসুর বর্ণনা করেছেন : আয়েশা রা. তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে ইতিকাফ করেছিলেন।

১৪. ইতিকাফকারী মসজিদের একটি জায়গায় অবস্থান নেবে এবং সেখানে তাঁবু গাড়বে:
১. ইবনে মাজাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। নাফে বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমাকে রসূল সা. যে জায়গায় ইতিকাফ করতেন, সে জায়গাটি দেখিয়েছেন।

২. ইবনে উমর রা. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : তিনি যখন ইতিকাফ করতেন, তখন তার জন্য তওবার খুঁটির কাছে বিছানা বিছানো হতো অথবা খাট পেতে দেয়া হতো। (জনৈক সাহাবী এই খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করার পর বাঁধন খুলেছিলেন তাই এটির নাম তওবার খুঁটি।)

৩. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তুর্কী ভবনের দরজায় চাটাই বিছিয়ে ইতিকাফ করেছিলেন। (দরজার ওপর চাটাই বিছানোর উদ্দেশ্য হলো, যেন কেউ তার দিকে দৃষ্টি দিতে না পারে।)

১৫. কোনো নির্দিষ্ট মসজিদে ইতিকাফের মানত করা : যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে, মসজিদে নববীতে অথবা মসজিদুল আকসায় ইতিকাফ করার মানত করবে, তার ওপর তার নির্ধারিত মসজিদে ইতিকাফ করা ওয়াজিব হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনটে মসজিদ ব্যতীত আর কোথাও সফর করা যাবেনা : মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও আমার এই মসজিদ। কিন্তু এই তিন মসজিদ ব্যতীত আর কোনো মসজিদে ইতিকাফ করার মানত করলে নির্ধারিত মসজিদে ইতিকাফ করা তার উপর ওয়াজিব হবেনা। সে যে মসজিদেই ইচ্ছা করবে ইতিকাফ করতে পারবে। কেননা আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট করেননি। তাছাড়া উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত আর কোনো মসজিদের অন্যান্য মসজিদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোনো মসজিদ অপেক্ষা আমর এই মসজিদে নামায এক হাজার গুণ শ্রেষ্ঠতর। আর মসজিদুল হারামের নামায আমার এই মসজিদের নামাযের চেয়ে একশো গুণ উত্তম।"

যদি কেউ মসজিদে নববীতে ইতিকাফের মানত করে, তার জন্য মসজিদুল হারামে ইতিকাফ করা জায়েয। কেননা মসজিদুল হারাম মসজিদে নববী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

❖❖❖

পঞ্চম অধ্যায়

রোগীর সেবা, জানাযা ও দাফন কাফন

১. রোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ইসলামের নীতিমালা

রোগ সংক্রান্ত বহু সংখ্যক হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে : রোগ ব্যাধি গুনাহের কাফফারা ও পাপ মোচন করে। এসব হাদিসের কয়েকটি উল্লেখ করছি :

১. বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে রোগ ব্যাধি ও বিপদাপদে আক্রান্ত করেন।

২. বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা থেকে আরো বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মুসলমান যদি কোনো রোগ-শোক, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয় এমনকি একটি কাঁটাও যদি তার দেহে বিদ্ধ হয়, তবে আল্লাহ তা দ্বারা তার গুনাহ মোচন করেন।

৩. বুখারি ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আপনি তো ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বললেন : হাঁ, আমি তোমাদের অন্য দু'ব্যক্তির মতোই প্রবল জ্বরে ভুগছি। বললাম : আপনার জন্য তো দ্বিগুণ সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে। তিনি বললেন : হাঁ, অন্যদেরও তদ্রূপ। যে কোনো মুসলমান ক্ষুদ্র একটা কাঁটার খোঁচা থেকে শুরু করে যতো বড় দুঃখ কষ্টই ভোগ করুক, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ এমনভাবে মোচন করেন, যেভাবে গাছের পাতা ঝরে যায়।

৪. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মুমিনের উদাহরণ সেই চারা গাছের বাগানের মতো, যাতে যেদিক থেকেই বাতাস আসুক, তা তাকে উর্বর করে। তারপর যখন গাছগুলো কাণ্ডের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায় তখন তা সব রকমের দুর্যোগ থেকে সুরক্ষিত হয়ে যায়। আর পাপী ব্যক্তি দেবদারু গাছের মতো, উদ্ধত ও দুর্বল, আল্লাহ যখন চান, তাকে ধ্বংস করে দেন।

রোগে ধৈর্য ধারণ

রোগী যে কষ্ট ভোগ করে তাতে তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা ধৈর্যের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস কোনো বান্দাকে দান করা হয়নি।

১. মুসলিম সুহাইব বিন সিনান থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেন : মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সব কিছুই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতিত আর কারো অবস্থা এমন নয়। তার যদি আনন্দদায়ক কিছু হয়, তবে আল্লাহর শোকর আদায় করে এবং তাতে তার কল্যাণ হয়। আর যদি তার কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাতেও তার কল্যাণ হয়।

২. বুখারি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেছেন : যখন আমি আমার বান্দাকে তার চোখ দুটিতে কোনো বিপদ দেই এবং তাতে সে ধৈর্য ধারণ করে, তখন তাকে তার বিনিময়ে জান্নাত দান করি। (বিপদে ধৈর্য ধারণের অর্থ বিপদ মোকাবিলার বৈধ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা নয়, বরং হতাশ না হয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তা থেকে মুক্তি লাভের বৈধ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালা কল্যাণকর এ বিশ্বাসে অটল থাকা)।

৩. বুখারি ও মুসলিম আতা বিন আবি রাবাহ্ থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতবাসী মহিলাকে দেখাবোনা? আমি (আতা বিন আবি রাবাহ) বললাম : হাঁ, দেখান। তিনি বললেন : এই কালো মহিলা। সে রসূল সা. এর নিকট এসে বললো : আমি শ্বাস কষ্টে বেশামাল হয়ে অনাবৃত হয়ে যাই। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। রসূল সা. বললেন : তুমি যদি চাও ধৈর্য ধারণ করতে পারো, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর যদি চাও, আল্লাহর কাছে দোয়া করবে যেন তোমাকে রোগমুক্ত করেন। মহিলা বললো : আমি ধৈর্য ধারণ করবো। সে পুনরায় বললো : আমি যে অনাবৃত হয়ে যাই। তাই, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন অনাবৃত না হই। তখন তিনি তার জন্য দোয়া করলেন।

রোগীর নিজের রোগের কথা ব্যক্ত করা :

রোগীর নিজের রোগ ও কষ্টের কথা চিকিৎসক ও বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করা বৈধ। তবে তা কোনো ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করার পদ্ধতিতে হওয়া উচিত নয়। ইতিপূর্বে রসূলুল্লাহ সা. এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে : "তোমাদের যে কোনো দুই ব্যক্তির মতো আমিও জ্বরে আক্রান্ত হই।" একবার আয়েশা রা. রসূল সা. এর নিকট তার কষ্ট ব্যক্ত করলেন এই বলে : "উহ্, আমার মাথা গেলো রে..." তখন রসূল সা. বললেন : আমারও একই অবস্থা" এরপর আসমা যখন ব্যথায় কাতর ছিলেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তাকে বললেন : তোমার কেমন লাগছে? তিনি বললেন : খুব ব্যথা! রোগীর নিজের রোগের কথা ব্যক্ত করার আগে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। ইবনে মাসউদ বলেন : রোগের কথা ব্যক্ত করার আগে আল্লাহর শোকর করলে রোগের কথা ব্যক্ত করার তেমন কষ্ট থাকেনা। আর যে কোনো দুঃখকষ্ট সম্পর্কে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা সম্পূর্ণ বৈধ। ইয়াকুব আ. বলেছিলেন : "আমি আমার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কথা শুধু আল্লাহকে জানাবো।" আর রসূলুল্লাহ সা. (তায়েফের নির্যাতনের পর) বলেছিলেন : "হে আল্লাহ, আমার শক্তি সামর্থ্যের অপ্রতুলতার বিষয়টি শুধু তোমার কাছেই ব্যক্ত করছি ।"

রোগী সুস্থাবস্থায় যে সৎ কাজ করতো. রুগ্ন অবস্থায় সেগুলো তার নামে লেখা হয়। বুখারি আবু মূসা আশয়ারি থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কোনো বান্দা অসুস্থ হয়, বা সফরে যায়, তখন সে সুস্থ অবস্থায়ও নিজ বাসস্থানে থাকা অবস্থায় যা যা করতো। সেসবই তার নামে লেখা হয়।

রোগী দেখতে যাওয়া

ইসলামের একটা সৌজন্যমূলক রীতি হলো, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ও তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা, যাতে রোগীর মন প্রফুল্ল থাকে ও তার হক আদায় হয়। ইবনে আব্বাস বলেছেন : রোগীকে প্রথম দিন দেখতে যাওয়া সুন্নত এবং তারপর নফল। বুখারি আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীকে দেখতে যাও এবং বন্দীকে মুক্তি দাও।"

বুখারি ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন : মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূলুল্লাহ, সেগুলো কী কী? রসূল সা. বললেন : যখন তার সাথে তোমার দেখা হবে, তখন তাকে সালাম দেবে, যখন তোমাকে দাওয়াত দেবে, তা কবুল করবে। যখন তোমার নিকট কেউ সদুপদেশ চায়, তাকে সদুপদেশ দেবে। যখন সে হাঁচি দেবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করবে, তখন তাকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে দোয়া করবে। যখন সে

রোগাক্রান্ত হবে, তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে মারা যাবে তখন তার জানাযায় ও দাফনে অংশগ্রহণ করবে।"

রোগী দেখতে যাওয়ার ফযিলত

১. ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে যায়, তাকে আকাশ থেকে একজন ঘোষক বলে : তুমি উত্তম, তোমার যাত্রাও উত্তম হোক এবং জান্নাতে তোমার বাসস্থান হোক।"

২. আবু হুরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন : হে আদম সন্তান, আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। সে বলবে : হে আমার প্রভু, আমি কিভাবে আপনাকে দেখতে যাবো? আপনি তো সারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন : তুমি কি জানোনা আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত ছিলো, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানোনা তাকে দেখতে গেলে তার কাছেই আমাকে পেতে? তারপর আবার বলবেন : হে আদম সন্তান, আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার খাওয়াওনি। সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক, আপনাকে কিভাবে খাওয়াবো? আপনি নিজেই তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন : তুমি কি জানোনা, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার খাওয়াওনি। তুমি কি জানতেনা তাকে যদি খাওয়াতে তবে আমার কাছে তা পেতে? হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক, আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করাবো? আপনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। তিনি বলবেন : আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল। কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতেনা তাকে যদি পানি পান করাতে তাহলে আমার কাছে তা পেতে?

৩. ছাওবান থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মুসলমান যখন তার মুসলমান ভাইকে দেখতে যায় তখন সেখান থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সে জান্নাতের খুরফার মধ্যে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হলো : হে রসূলুল্লাহ, জান্নাতের খুরফা কি? তিনি বললেন : ফল ফলারিতে ভরা বাগান।

৪. আলী রা. থেকে বর্ণিত, আলী রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি : কোনো মুসলমান অপর কোনো পীড়িত মুসলমান ব্যক্তিকে সকাল বেলা দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার কল্যাণের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করে, আর বিকালে দেখতে গেলে তার কল্যাণের জন্য সকাল পর্যন্ত দোয়া করে সত্তর হাজার ফেরেশতা। আর বেহেশতে তার জন্য বিপুল পরিমাণ ফলমূল সংরক্ষিত থাকে। -তিরমিযি। তিরমিযি বলেছেন হাদিসটি উত্তম।

রোগী দেখার নিয়ম

রোগী দেখতে গিয়ে রোগীর রোগমুক্তি এবং সার্বিক সুখ ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা ও রোগীকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া মুস্তাহাব। তাঁকে এমন কথাবার্তা বলা উচিত যাতে তার মন প্রফুল্ল হয় ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। রসূল সা. বলেছেন : যখন তোমরা রোগীর কাছে যাবে, তখন তাকে তার দীর্ঘ জীবনের প্রতি আশাবাদী করে তোলো। অবশ্য এর দ্বারা কোনো কিছু প্রতিহত করা যাবেনা (অর্থাৎ তার ভাগ্যে যা আছে তা খণ্ডন করা যাবেনা)। তবে রোগীর মনে প্রফুল্লতা ও প্রশান্তি আসবে। রসূলুল্লাহ সা. যখনই কোনো রোগীকে দেখতে যেতেন, তার কাছে পৌঁছেই বলতেন : ভয় নেই, আল্লাহ চাহেন তো সুস্থ হয়ে যাবে।" তবে রোগী দেখতে গিয়ে

সেখানে বেশিক্ষণ অবস্থান না করা ও ঘন ঘন যাওয়া থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকা মুস্তাহাব, যাতে রোগীর জন্য তা বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক না হয়ে ওঠে। অবশ্য রোগী নিজেই যদি এতে আগ্রহী হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

পুরুষ রোগীকে স্ত্রী লোকের দেখতে যাওয়া

ইমাম বুখারি বলেছেন : পুরুষ রোগীকে স্ত্রী লোকের দেখতে যাওয়া সংক্রান্ত অধ্যায় : উম্মু দারদা মসজিদ নববীতে জনৈক আনসারকে দেখতে গিয়েছিলেন। আর আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন আবু বকর ও বিলাল প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি তাদেরকে দেখতে গেলাম। বললাম : আব্বা, আপনি কেমন আছেন? বিলাল, আপনি কেমন আছেন? আবু বকর জ্বরে আক্রান্ত হলে এই কবিতা আবৃত্তি করতেন :

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ - وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .

'প্রত্যেক ব্যক্তি তার আপনজনদের মধ্যে প্রভাব অতিবাহিত করে, অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের চেয়েও নিকটবর্তী।'

আর বিলালের যখন জ্বর ছেড়ে যেতো, তখন বলতেন :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً - بِوَادٍ وَحَوْلِيْ إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ - وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ - وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ .

'হায়, আমি কি এমন সমতল ভূমিতে রাত কাটানোর সুযোগ পাবো? যেখানে আমার আশপাশে ইযখির ও জলীল ফুলের সমারোহ থাকবে। আমি কি কোনো দিন প্রচুর পানি বিশিষ্ট জলাশয়ে নামতে পারবো? আর আমার সামনে কি কালো উট ও পুকুরের নিচের ঘোলা পানি দেখা দেবে?' (মক্কার স্মৃতিচারণ করছিলেন)

আয়েশা বলেন : আমি রসূল সা. এর কাছে গিয়ে আবু বকর ও বিলালের জ্বরের কারণে কবিতা আবৃত্তি করার কথা) জানালাম। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে আল্লাহ, মদিনাকে আমাদের নিকট মক্কার মতো বা তার চেয়েও বেশি প্রিয় বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ, মদিনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও এবং এর সব কিছুতে বরকত দাও। মদিনা থেকে জ্বর হটিয়ে দাও এবং তাকে জলাশয়ের কাছে স্থাপন করো। (অর্থাৎ মদিনায় পানির প্রাচুর্য দাও)।

কাফের রোগীকে মুসলমানের দেখতে যাওয়া

কোনো মুসলমানের কোনো কাফের রোগীকে দেখতে যাওয়ায় কোনো দোষ নেই। বুখারি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন : জনৈক ইহুদী যুবক রসূলুল্লাহ সা. এর চাকর ছিলো। সে যখন রোগাক্রান্ত হলো, তখন রসূলুল্লাহ সা. তাকে দেখতে গেলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন : তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলো। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেছেন : আবু তালেব যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন রসূলুল্লাহ সা. তার কাছে গিয়েছিলেন।

চক্ষু রোগীকে দেখতে যাওয়া

আবু দাউদ যায়দ বিন আরকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমার যখন চোখে যন্ত্রণা হয়েছিল, তখন রসূল সা. আমাকে দেখতে এসেছিলেন।

রোগীর নিকট দোয়া চাওয়া

ইবনে মাজাহ উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তুমি কোনো

রোগীর কাছে যাবে, তখন তাকে অনুরোধ করবে তোমার জন্য দোয়া করতে। কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য)।

রোগের চিকিৎসা

বহু হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. রোগের চিকিৎসার আদেশ দিয়েছেন :

১. আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ উসামা বিন শুরাইক থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তাঁর সাহাবিগণ এমনভাবে বসে আছেন যেন তাদের মাথায় পাখী বসে আছে (অর্থাৎ মনোযোগের সাথে তার কথা শুনছেন)। আমি সালাম করে বসলাম। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে বেদুইনরা আসতে লাগলো। তারা জিজ্ঞাসা করলো : হে রসূলুল্লাহ সা. আমরা কি রোগের চিকিৎসা করাবো? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : চিকিৎসা করাও। কেননা আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টিই করেননি, যার জন্য ওষুধ সৃষ্টি করেননি। কেবল একটি রোগ ব্যতিক্রম, সেটি হলো বার্ধক্য।

২. নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার নিরাময়ের ব্যবস্থা করেননি। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা করাও।

৩. মুসলিম জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেন : প্রত্যেক রোগের ওষুধ রয়েছে। যখন কোনো রোগের ওষুধ সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় রোগ আরোগ্য হয়।

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা

অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, মদ প্রভৃতি হারাম বস্তু দ্বারা রোগের চিকিৎসা করা অবৈধ। তারা নিম্নোক্ত হাদিসগুলো দ্বারা প্রমাণ দর্শিয়েছেন :

১. মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযি ওয়ায়েল বিন হাজর হাযরামী থেকে বর্ণনা করেছেন, তারেক বিন সুয়াইদ রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, মদ দিয়ে কি ওষুধ বানানো যাবে? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ওটা ওষুধ নয়, বরং ওটা একটা রোগ।" এ হাদিস থেকে জানা গেলো, মদ দ্বারা চিকিৎসা করা অবৈধ। বরং মদ নিজেই একটা রোগ।

২. বায়হাকি উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেন : আল্লাহ যেসব জিনিস তোমাদের ওপর হারাম করেছেন, সেসব জিনিসে তোমাদের রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখেননি। হাদিসটি বুখারিও ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩. আবু দাউদ আবুদ দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেন : আল্লাহ তায়ালা রোগ ও ওষুধ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক রোগের জন্য ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা রোগের চিকিৎসা করো। তবে হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করোনা।

৪. আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. নিকৃষ্টতম ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ বিষ'।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মদের ফোঁটা, যা স্পষ্টভাবে চোখে পড়েনা এবং যাতে মাতলামীর সৃষ্টি হয়না, তা যখন ওষুধের উপাদান মিশ্রিত হয়, তখন তা হারাম হয়না যেমন পোশাকে সামান্য পরিমাণ রেশম থাকলে দোষ নেই।

অমুসলিম চিকিৎসক

ইবনে মুফলিহ তাঁর আদাবুশ শরিয়া গ্রন্থে শেখ তকীউদ্দীনের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

"কোনো ইহুদী বা খৃস্টান যদি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ও জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়, তবে তাকে চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। যেমন তার কাছে কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখা যায় এবং তার সাথে লেনদেন করা যায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا .

"কিতাবধারীদের (ইহুদী ও খৃস্টান) মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যার কাছে তুমি প্রচুর সম্পদ গচ্ছিত রাখলেও তা সে তোমাকে ফেরত দেবে। আবার কিতাবধারীদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যার কাছে তুমি একটি মাত্র দিনার গচ্ছিত রাখলেও তাকে তাগাদা দিতে থাকা ছাড়া সে তা তোমাকে ফেরত দেবেনা।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৭৫)

সহীহ্ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ্ সা. যখন হিজরত করলেন, তখন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ায় পারদর্শী জনৈক মোশরেককে মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগ করেন। তিনি নিজের প্রাণ ও সম্পদের ব্যাপারে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাছাড়া বনু খোযায়া গোত্রের মুসলমান ও কাফের নির্বিশেষে সকলেই রসূল সা. এর সহযোগী ছিলো। রসূল সা. হারেস বিন কালদা কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাকে চিকিৎসার জন্য ডাকার আদেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য যখন কোনো মুসলমানকে চিকিৎসার কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়, তখন লেনদেন ও আমানত রাখার জন্য যেমন কোনো মুসলমান পাওয়া গেলে তাকে বাদ দিয়ে কাফের ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া সমীচীন নয়, তেমনি চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তা উচিত। যখন প্রয়োজন হয়, তখন কিতাবধারীর নিকট আমানত রাখা বা তার কাছে চিকিৎসা চাওয়া বৈধ। কুরআনে ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে যে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এটা তার পর্যায়ে পড়েনা। তবে তাদের সাথে তর্কবিতর্ক করার প্রয়োজন পড়লে তা অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থায় করা বাঞ্ছনীয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

"তোমরা কিতাবধারীদের সাথে অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থায় ব্যতীত তর্কবিতর্ক করোনা।" আবুল খাত্তাব হোদাইবিয়ার সন্ধি, রসূল সা. কর্তৃক বনু খোযায়া গোত্রের লোককে তার সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ ও তার সংবাদ গ্রহণ সংক্রান্ত হাদিস উল্লেখপূর্বক বলেছেন : এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, কাফের চিকিৎসক যখন রোগের বিবরণ ও চিকিৎসার পদ্ধতি ব্যক্ত করবে এবং যা ব্যক্ত করবে, তাতে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করার কারণ থাকবেনা এবং সন্দেহ করারও অবকাশ থাকবেনা, তখন তাকে চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ।

মহিলা ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ

প্রয়োজনে পুরুষ কর্তৃক মহিলার এবং মহিলা কর্তৃক পুরুষের চিকিৎসা করা বৈধ। পুরুষ স্ত্রী লোকের এবং স্ত্রীলোক পুরুষের চিকিৎসা করতে পারবে কি? এই শিরোনামে বুখারি রুবাঈ বিনতে মুয়াওয়ায বিন আফরা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে যুদ্ধে যেতাম, রণাঙ্গনে যোদ্ধাদেরকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা সুশ্রূষা করতাম এবং হতাহতদের মদিনায় পাঠাতাম। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : বেগানা নারী পুরুষকে প্রয়োজনের সময় চিকিৎসা দেয়া বৈধ। আর দৃষ্টিদান ও হাত দ্বারা স্পর্শ করা ইত্যাদি ততোটুকুই বৈধ হবে যতোটুকু চিকিৎসার প্রয়োজনে অপরিহার্য। ইবনে মুফলিহ তার গ্রন্থ আদাবুশ শরীয়াতে বলেন : কোনো মহিলা যদি রোগাক্রান্ত হয় এবং পুরুষ ছাড়া তার চিকিৎসার জন্য কাউকে না পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত পুরুষ তার দিকে যতোটুকু প্রয়োজন

ততোটুকু তাকাতে পারবে এমনকি জরুরি হলে যৌনাংগ পর্যন্তও দেখতে পারবে। পুরুষের সাথে পুরুষের বিধানও তদ্রূপ। ইবনে হামদান বলেছেন : পুরুষের চিকিৎসার জন্য যদি মহিলা ব্যতিত কাউকে না পাওয়া যায়, তবে সেই মহিলার জন্য উক্ত পুরুষের পুরুষাংগসহ যতোটুকু দেখা প্রয়োজন দেখা বৈধ। কাযী বলেছেন : প্রয়োজনের সময় চিকিৎসকের জন্য মহিলা রোগীর এবং মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্য পুরুষের দেহের গোপনীয় অংশ দেখা বৈধ।

ঝাড় ফুঁক ও দোয়া দ্বারা চিকিৎসা

ঝাড় ফুঁক ও দোয়া কালাম যদি আল্লাহর যিকর তথা স্মরণ বিষয়ক এবং বোধগম্য আরবি শব্দ দ্বারা করা হয় তবে তা শরিয়ত সম্মত। যে শব্দ অবোধগণ্য, তাতে শিরক থাকবেনা এমন নিশ্চয়তা নেই। আওফ বিন মালেক বলেছেন, আমরা জাহেলী যুগে ঝাড় ফুঁক করতাম। রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে রসূলুল্লাহ, এ কাজটা সম্পর্কে আপনার মত কী? তিনি বললেন : ঝাড় ফুঁকের কথাগুলো আমাকে শুনাও। এগুলোতে শিরক না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই।" -মুসলিম, আবু দাউদ।

রবী বলেছেন : আমি তাবিজ ও ঝাড় ফুঁক সম্পর্কে শাফেয়িকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : কুরআন ও তোমার জানা আল্লাহর স্মরণমূলক শব্দাবলি দিয়ে তাবিজ ও ঝাড় ফুঁকে দোষ নেই। আমি বললাম : কিতাবধারীরা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) কি মুসলমানদেরকে ঝাড় ফুঁক করতে পারবে? তিনি বললেন : হাঁ, যদি তা আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর যিকির সম্বলিত পরিচিত শব্দাবলি দ্বারা করা হয়।"

চিকিৎসা সংক্রান্ত কয়েকটি প্রসিদ্ধ দোয়া

১. বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. তাঁর পরিবারের কাউকেও কাউকেও অসুস্থ হলে ব্যথার স্থান মুছে দিতেন এবং এই দোয়া পড়ে ফু দিতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اِذْهَبِ الْبَأْسَ اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِيْ، لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا .

"হে আল্লাহ, মানবজাতির প্রতিপালক, কষ্ট দূর করে দাও, রোগ নিরাময় করে দাও, তুমিই তো নিরাময়কারী, তোমার নিরাময় ছাড়া কেউই নিরাময় করতে পারেনা, তোমার নিরাময় কোনো রোগেই ব্যর্থ হয়না।"

২. উসমান বিন আবিল আ'স থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, উসমান বিন আবিল আ'স রসূল সা.-এর নিকট তার শরীরে অনুভূত একটি ব্যথার কথা জানালেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা, তার ওপর হাত রাখো এবং বলো :

بِسْمِ اللّٰهِ : এবং সাতবার বলো : أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ .

"আল্লাহর প্রতাপ ও পরাক্রম এবং তার ক্ষমতার নিকট আমি আশ্রয় চাই যে জিনিস আমি অনুভব করি ও সতর্কতাবশত: যাকে এড়িয়ে চলি তার ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে।" এরপর আমি কয়েকবার এরূপ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহ আমার ব্যথা দূর করে দিলেন। এরপর থেকে আমি আমার পরিবার পরিজনকে ও অন্যদেরকে এ ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি।

৩. তিরমিযি মুহাম্মদ বিন সালেম থেকে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ বিন সালেম বলেছেন : আমাকে ছাবিত বানানী বলেছেন : হে মুহাম্মদ, তোমার যখন কোনো ব্যথা লাগে, তখন যে স্থানে ব্যথা লাগে, সেখানে হাত রাখো, তারপর বলো :

بِسْمِ اللّٰهِ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِيْ هٰذَا ـ

"আল্লাহর নামে আল্লাহর প্রতাপ ও পরাক্রমের নিকট আশ্রয় চাইছি আমি যে ব্যথা অনুভব করছি তার কুফল থেকে।" তারপর হাত ওঠাও। তারপর বেজোড় সংখ্যক বার পুনরায় এরূপ করো। কেননা আনাস বিন মালেক আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তাঁকে এরূপ করতে বলেছেন।

৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মৃত্যুর সময় সমাগত হয়নি এমন রোগীর নিকট উপস্থিত হয়ে যে ব্যক্তি সাতবার বলবে :

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ -

"মহান আরশের অধিপতি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করুন" আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই রোগ থেকে নিরাপদ করবেন। -আবু দাউদ, তিরমিযি।

৫. বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন :

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ـ

রসূল সা. হাসান ও হুসাইনকে এই কথাগুলো বলে ফু দিতেন : আল্লাহর পূর্ণাংগ বাণীগুলোর নিরাপদ আশ্রয়ে তোমাদের দু'জনকে সমর্পণ করছি প্রত্যেক শয়তান থেকে ও প্রত্যেক ঘাতক বিষধর ও ক্ষতিকর প্রাণী থেকে এবং সকল বদ নযর থেকে।" তিনি বলতেন : তোমাদের পিতা (অর্থাৎ ইবরাহীম আ.) ইসমাইল ও ইসহাককে এই দোয়া পড়ে ফু দিতেন।

৬. সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে মুসলিমে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. তাকে তার রুগ্নাবস্থায় দেখতে গেলেন এবং বললেন : اللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدً.

"হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত করো। হে আল্লাহ, সা'দকে রোগমুক্ত করো। হে আল্লাহ, সা'দকে রোগমুক্ত করো।"

তাবিজ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা

রসূলুল্লাহ সা. তাবিজ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ১. উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো তামীমা (তাবিজ) ঝুলাবে আল্লাহ যেনো তাকে পূর্ণতা না দেন, আর যে ব্যক্তি কোনো শামুক বা ঝিনুকের খোল ঝুলাবে আল্লাহ যেনো কোনো জিনিস তার নিকট গচ্ছিত না রাখেন। (অর্থাৎ তাকে যেনো কোনো নিয়ামত দান না করেন।)

তামীমা বা তাবিজ হলো, এমন পড়া সুতা (বা সুতা দ্বারা বাঁধা কোনো তাবিজ) যা আরবরা (জাহেলী যুগে) তাদের সন্তানদের গায়ে ঝুলাতো। তারা ধারণা করতো এর দ্বারা তারা তাদের বাচ্চাদেরকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারবে। ইসলাম এটিকে বাতিল ও নিষিদ্ধ করেছে। যারা এই তামীমা ঝুলায় তাদের বিরুদ্ধে রসূল সা. বদ দোয়া করেছেন যেন তাদের ভাগ্য পূর্ণতা না পায়। কেননা তারা তাদের ভাগ্যকে ঝুলিয়ে রাখতে চেয়েছে।

২. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি যখন তার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলেন, দেখলেন, তখন তার গলায় একটা জিনিস বাঁধা ছিলো। তিনি সেটা টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর বললেন : আবদুল্লাহর বংশধররা আল্লাহর সাথে এমন কোনো জিনিসকে শরিক করার আর মুখাপেক্ষী নেই, যার স্বপক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। তারপর বললেন : আমি রসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি : তাবিজ, তন্ত্রমন্ত্র ও তাওলা শিরকের আওতাভুক্ত। লোকেরা বললো :

তাবিজ ও তন্ত্রমন্ত্র তো আমরা চিনি। 'তাওলা'টা কী? তিনি বললেন : এটি এমন এক ধরনের তাবিজ, যা স্ত্রী লোকেরা স্বামীদের কাছে প্রিয় থাকার জন্য ব্যবহার করে। (কথিত আছে, এটা যাদুমন্ত্র দিয়ে পড়া এক ধরনের সুতো, কিংবা এক টুকরো কাগজ, যাতে এমন তন্ত্রমন্ত্র লেখা থাকে, যার প্রভাবে নারীরা পুরুষদের অথবা পুরুষরা স্ত্রীদের কাছে প্রিয় থাকে।) -হাফেয ও ইবনে হিব্বান।

৩. ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন, রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তির বাহুতে একটা বৃত্ত দেখলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, বৃত্তটি ছিলো তামার তৈরি। তিনি বললেন : তোমাকে ধিক! এটা কি? লোকটি বললো : 'ওয়াহিনা' (দুর্বলতা)-এর কারণে এটা পরেছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : জেনে রেখো, এটা দুর্বলতাকে শুধু বাড়াবেই। ওটা তোমার শরীর থেকে ছুড়ে ফেলো। কেননা ওটা তোমার শরীরে থাকা অবস্থায় তুমি যদি মারা যাও তবে তুমি কখনো সফলকাম হবেনা। -আহমদ।

ওয়াহিনা এক ধরনের বাত, যা ঘাড় ও সমগ্র হাতকে আক্রান্ত করে। কেউ কেউ বলেন : বাহুকে আক্রান্ত করে এমন ব্যাধি। লোকটি তামার একটা বৃত্ত হাতে পরে এসেছিল। সে মনে করতো, এটা তাকে তার ব্যথা বেদনা থেকে মুক্তি দেবে। তাই রসূলুল্লাহ সা. তাকে এটা পরতে নিষেধ করলেন এবং একে তাবিজ আখ্যায়িত করলেন।

৪. ঈসা বিন হামযা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আলী আবদুল্লাহ বিন হাকিমের নিকট গেলাম। তখন তিনি বাতবিসর্গ রোগে (চামড়া লাল হওয়া ও ফুলে যাওয়া) আক্রান্ত। আমি বললাম, আপনি কোনো তাবিজ নেন না? তিনি বললেন : নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। (তা থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।) কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি তাবিজ নেয়, তাকে তাবিজের নিকটই সোপর্দ করা হয়।

কুরআন ও হাদিসে উল্লিখিত দোয়াগুলোকে তাবিজ বানিয়ে ঝুলানো যায় কি?

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন স্বপ্ন দেখে ভয় পায় তখন সে যেন পড়ে :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنَ.

"আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীগুলোর আশ্রয় চাই তার ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে, তার বান্দাদের ক্ষতি থেকে, শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে এবং আমার নিকট শয়তানদের আগমণ থেকে"। তাহলে তার সেই ভয়ংকর স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। আর আবদুল্লাহ ইবনে আমর তার সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদেরকে এই দোয়া শেখাতেন। আর যারা প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তাদের জন্য এটা একটা কাগজে লিখে তাদের গলায় ঝুলাতেন। -আবু দাউদ নাসায়ী, তিরমিযি। আয়েশা, মালেক, অধিকাংশ শাফেয়ি আলেমগণ এবং আহমদ থেকে বর্ণিত একটি মত এই মতের সমর্থক। কিন্তু ইবনে আব্বাস, হুযায়ফা, হানাফি আলেমগণ, শাফেয়িদের কেউ কেউ এবং আহমদ থেকে বর্ণিত অপর মতটি হলো, কোনো কিছুই তাবিজ করে গলায় ঝুলানো বৈধ নয়। কেননা ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদিসগুলোতে সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে।

২. রোগীর ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা

সুস্থদের মধ্যে রোগীকে অবস্থান করতে না দেয়া

যে ব্যক্তি ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত, তাকে সুস্থদের থেকে আলাদা রাখা বৈধ। সে সুস্থদের

পাশাপাশি অবস্থান করবেনা। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সুস্থদের পাশে ছোঁয়াচে রোগীকে রাখা চলবেনা। এমনকি রুগ্ন উটের মালিককেও সুস্থ উটের মালিকের পাশে রাখতে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন- যদিও তিনি বলেছেন : ছোঁয়াচে ও কুলক্ষুণে বলে কিছু নেই। আরো বর্ণিত হয়েছে : জনৈক কুষ্ঠরোগী যখন রসূল সা. এর নিকট বায়াত গ্রহণের জন্য এলো, তখন তিনি দূত মারফত তাকে বায়াত পাঠিয়ে দিলেন এবং তাকে মদিনায় প্রবেশের অনুমতি দিলেননা।

প্লেগ আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করা ও বের হওয়া

যে এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, সেখানে প্রবেশ করতে এবং সেই এলাকা থেকে বের হতে রসূল সা. নিষেধ করেছেন। কেননা এতে বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রসূল সা. এর উক্ত নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য রোগকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সীমিত করে রাখা এবং মহামারির বিস্তার রোধ করা। একে ব্যাধি সংক্রমণ রোধ ব্যবস্থা নামে আখ্যায়িত করা হয়। তিরমিযি উসামা বিন যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. প্লেগের উল্লেখ করে বললেন : বনি ইসরাইলের একটি গোষ্ঠীর ওপর যে আযাব ও গযব নাযিল হয়েছিল, এটা তার অবশিষ্টাংশ। এটা কোনো এলাকায় দেখা দিলে তোমরা সেখানে থাকলে সেখান থেকে বের হবেনা। আর তোমরা সেখানে না থাকলে সেখানে প্রবেশ করোনা।

আর বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : উমর ইবনুল খাত্তাব সিরিয়ার সফরে গেলেন। যখন তিনি সিরিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন, তখন তার সাথে সেনাপতি আবু উবায়দা ও তার সাথিরা সাক্ষাৎ করলেন। তারা উমর রা. কে জানালেন, সিরিয়ায় মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। তখন উমর বললেন : প্রথম যুগের মুহাজিরগণকে আমার নিকট ডেকে আনো।

ইবনে আব্বাস বলেন, আবু উবায়দা তাদেরকে ডেকে আনলেন এবং উমর তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা জানালেন, সিরিয়ায় মহামারি দেখা দিয়েছে। এবার করণীয় নিয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত হলেন। কেউ কেউ বললেন : আমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি তা থেকে পিছিয়ে আসার আমাদের ইচ্ছা নেই। অন্য একদল বললেন : আপনার সাথে অবশিষ্ট লোকজন এবং রসূল সা. এর সাহাবিগণ রয়েছেন। আপনি তাদেরকে এই মহামারির মধ্যে এগিয়ে দেবেন- এতে আমাদের সায় নেই। উমার বললেন : তোমরা আমার কাছ থেকে চলে যাও। আমার নিকট আনসারদেরকে ডেকে পাঠাও। আমি (ইবনে আব্বাস) তাদেরকে ডেকে দিলাম। তাদের মধ্য থেকে কোনো দুই ব্যক্তিও এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করলোনা। তারা সবাই বললো : আমাদের মত হলো, আপনি লোকজন নিয়ে চলে যান এবং এই মহামারি উপদ্রুত এলাকায় তাদেরকে এগিয়ে দেবেননা। তখন উমর জনতাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন : আমি সকাল বেলাই ঘোড়ার পিঠে উঠবো, তোমরাও ওঠো। (অর্থাৎ এই স্থান ত্যাগ করবো।) আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ বললেন : আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য থেকে পালাতে চান? উমর বললেন : হে আবু উবায়দা, এ কথাটা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বললেই মানানসই হতো। হাঁ, আমরা আল্লাহর এক ভাগ্য থেকে আর এক ভাগ্যের দিকে পালাতে চাই। ভেবে দেখো তো, তোমার যদি কিছু সংখ্যক উট থাকতো এবং সেগুলো একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে নেমে বিচরণ করতো, আর সেই প্রান্তরে দুটো উপত্যকা থাকতো, একটা উর্বর আর একটা তরুলতাহীন ও পানিহীন। তুমি যদি উটগুলোকে উর্বর ভূমিতে চরাতে তবে তাও আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের আওতাধীন চরাতে, আর যদি অনুর্বর ভূমিতে চরাতে তবে তাও আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের আওতায়ই চরাতে। ঠিক নয় কি? এই সময় আবদুর রহমান বিন আওফ এলেন। তিনি তার কোনো প্রয়োজনে এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমার নিকট একটা তথ্য আছে। আমি রসূল সা.কে বলতে শুনেছি : 'যখন কোনো এলাকায় মহামারি দেখা দিয়েছে বলে শুনবে তখন

সেখানে যেয়োনা, আর যদি তোমরা যে এলাকায় অবস্থান করছো, সেখানে মহামারির উপদ্রব ঘটে, তবে সেখান থেকে বের হয়োনা।' তখন উমর আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও বিদায় হলেন।

মৃত্যুর কথা স্মরণ ও আমলের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ মুস্তাহাব

রসূলুল্লাহ সা. মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে ও তার জন্য সৎ কাজের মধ্যদিয়ে প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করেছেন এবং একে কল্যাণের পথ প্রদর্শক বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি দশজন লোক সাথে নিয়ে রসূল সা. এর নিকট গেলাম। সহসা আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ! সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সবচেয়ে বিচক্ষণ মানুষ কে? রসূল সা. বললেন : যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি নেয়, সে-ই বেশি বুদ্ধিমান। সে দুনিয়ায় সম্মান ও আখেরাতে মর্যাদা লাভ করবে। ইবনে উমর রা. আরো বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সকল স্বাদ ও আনন্দের বিলোপ সাধনকারীকে (অর্থাৎ মৃত্যুকে) বেশি করে স্মরণ করো। -তাবারানি।

ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করতে চান তার বুককে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূল সা. বলেছেন : আল্লাহর জ্যোতি যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন তা প্রসারিত ও প্রশস্ত হয়। লোকেরা বললো : এর কি কোনো লক্ষণ আছে, যা দ্বারা তা চেনা যাবে? তিনি বললেন : চিরস্থায়ী জগতের দিকে ঝোঁক, অহংকার ও ধোকার জগতকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা, (অর্থাৎ দুনিয়ার সুখ ও ঐশ্বর্যকে এড়িয়ে চলা) এবং মৃত্যু আসার আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। -ইবনে জারীর।

মৃত্যু কামনা করা মাকরূহ

দারিদ্র্য, রোগ-শোক, বিপদ-মুসবিত বা অনুরূপ অন্য কিছুর কারণে মৃত্যু কামনা করা বা মৃত্যু চেয়ে দোয়া করা মাকরূহ। কেননা সব কটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে আনাস রা. থেকে বর্ণিত :

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ তার উপর আপতিত কোনো কষ্ট বা আপদ বালাই-এর জন্য যেন কোনোক্রমেই মৃত্যু কামনা না করে। একান্তই যদি মৃত্যু কামনা করতে চায়, তবে সে যেন এভাবে দোয়া করে :

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

"হে আল্লাহ, আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রাখো, যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর। আর আমাকে তখনই মৃত্যু দিও, যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে।"

মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করার তাৎপর্য উম্মুল ফযল (আব্বাস রা. এর স্ত্রী) বর্ণিত হাদিসে রয়েছে : একবার রসূলুল্লাহ সা. আব্বাসের কাছে গেলেন। তখন আব্বাস রা. অসুস্থ ছিলেন এবং মৃত্যু কামনা করছিলেন। রসূল সা. বললেন : হে আব্বাস, হে রসূলুল্লাহর চাচা, মৃত্যু কামনা করবেন না। আপনি যদি সৎকর্মশীল হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি (দীর্ঘায়ু হলে) আরো সৎকর্ম করবেন। আপনার সৎকর্মের পরিমাণ বাড়বে এবং তা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি আপনি অসৎকর্মশীল হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার মৃত্যু বিলম্বিত হলে অনুশোচনাপূর্বক গুনাহ ত্যাগ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ পাবেন। সুতরাং আপনি মৃত্যু কামনা করবেন না। -আহমদ ও হাকেম।

তবে যদি কেউ নিজের ধর্মান্তরের আশংকাবোধ করে, তাহলে তার জন্য মৃত্যু কামনা করা মাকরূহ নয়।

বর্ণিত আছে : রসূলুল্লাহ সা. এভাবে দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِىْ وَتَرْحَمَنِىْ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِىْ قَوْمِىْ فَتَوَفَّنِىْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ .

"হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট যাবতীয় সৎকাজ করার, যাবতীয় অন্যায় কাজ বর্জন করার, দরিদ্রদেরকে ভালোবাসার প্রেরণা ও তওফীক চাই, তোমার ক্ষমা ও দয়া চাই, আর যখন তুমি আমার জাতির মধ্যে বিপথগামিতা ছড়াতে চাইবে, তখন বিপথগামী হবার আগেই আমাকে মৃত্যু দিও। আমি তোমার ভালোবাসা চাই, যে তোমাকে ভালোবাসে তার সাথে সম্প্রীতি চাই। আর যে কাজ আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করবে সেই কাজের প্রতি ভালোবাসা চাই।" -তিরমিযি।

মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে : উমর রা. দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّىْ، وَضَعُفَتْ قُوَّتِىْ، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِىْ، فَاقْبِضْنِىْ إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ.

"হে আল্লাহ, আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আমার কর্মক্ষমতা কমে গেছে, আর আমার প্রজারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই আমার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হবার আগে এবং আমার ভেতরে অলসতা ও শৈথিল্য দেখা দেয়ার আগে আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও।"

নেক আমলের সাথে দীর্ঘ জীবন একটা নিয়ামত

১. আবদুর রহমান বিন আবু বকর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন : যার জীবন দীর্ঘ এবং কার্যকলাপ সৎ। সে বললো : নিকৃষ্টতম মানুষ কে? তিনি বললেন : যার জীবন দীর্ঘ ও আমল খারাপ। -আহমদ, তিরমিযি।

২. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো তা কি তোমাদের জানাবোনা! লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, বলুন। তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে দীর্ঘজীবী ও সৎকর্মশীল। -আহমদ।

মৃত্যুর পূর্বে সৎকাজ করা ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণের লক্ষণ

আনাস রা. থেকে আহমদ, তিরমিযি, হাকেম ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন আল্লাহ কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে কাজে লাগান। বলা হলো : কিভাবে কাজে লাগান? তিনি বললেন : মৃত্যুর আগে তাকে কিছু সৎকাজের প্রেরণা দেন, তারপর তাকে তুলে নেন।"

রোগীর আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব

রুগ্ন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর সুপ্রশস্ত রহমতের কথা স্মরণ করা ও আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা বাঞ্ছনীয়। জাবের রা. থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, জাবের বলেন, আমি রসূল সা.কে তাঁর মৃত্যুর তিনদিন আগে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করার সময় অবশ্যই যেন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। হাদিসে রুগীর মনের আশাকে জোরদার করা এবং ক্ষমা লাভের আশা জাগ্রত করা মুস্তাহাব বলা হয়েছে, যাতে সে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় অবস্থায় মিলিত হয়। কেননা তিনি পরম দয়ালু, মহা করুণাময় এবং

অসীম দাতা। তিনি ক্ষমা ও আশাকে ভালোবাসেন। হাদিসে বলা হয়েছে : প্রত্যেকে যে অবস্থায় মারা যায় সেই অবস্থায়ই কেয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হয়।

ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. মৃত্যু আসন্ন এমন এক যুবকের কাছে গেলেন। তাকে বললেন : তুমি কেমন অনুভব করছো? সে বললো : আল্লাহর করুণা প্রত্যাশা করছি, আবার নিজেরকৃত গুনাহগুলোর ভয়ও পাচ্ছি। রসূল সা. বললেন : এই পরিস্থিতিতে কোনো বান্দার মনে এই দুটো একত্রিত হলে আল্লাহ তাকে সে যা আশা করে তা দেন আর যার ভয় পায় তা থেকে তাকে নিরাপদ করেন।

মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে যা করা সুন্নত

যে ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন, তার কাছে নেককার লোকদের যাওয়া ও আল্লাহর বিষয়ে আলোচনা করা মুস্তাহাব।

১. আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমরা রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট গমন করবে, তখন ভালো কথা বলবে। কেননা ফেরেশতারা তোমাদের কথাগুলোর উপর আমিন (কবুল করুন) বলেন। সালামার বাবা (উম্মে সালমার স্বামী) যখন মারা গেলেন, তখন আমি রসূল সা. এর নিকট গেলাম। বললাম : হে রসূলুল্লাহ, সালামার বাবা মারা গেছে। তিনি বললেন : তুমি দোয়া করো : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً .

"হে আল্লাহ তাকে ও আমাকে ক্ষমা করো এবং তার বদলায় আমাকে উত্তম প্রতিদান দাও।" আমি এই দোয়া করলাম। এর ফলে আল্লাহ আমাকে তার চেয়েও যিনি উত্তম তাকে প্রতিদান স্বরূপ দিলেন। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২. সহীহ মুসলিমে উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. আবু সালামার নিকট (তার মৃত্যুর পর) উপস্থিত হলেন। তার চোখ খোলা ছিলো। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন : যখন মানুষের রূহকে তুলে নেয়া হয়, তখন সেই সাথে তার দৃষ্টিও চলে যায়। তখন তার পরিবারের কিছু লোক বিলাপ করে উঠলো। রসূল সা. বললেন : তোমরা নিজেদের জন্যে কেবল কল্যাণের জন্য দোয়া করো। তোমরা যা কিছু বলবে, তার উপর ফেরেশতারা আমিন আমিন বলবে। তারপর তিনি দোয়া করলেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَأَخْلِفْهُ فِيْ عَقِبِهِ الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ. وَأَفْسِحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ .

"হে আল্লাহ, আবু সালামাকে ক্ষমা করো, হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদাশীল করো এবং তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদের জন্য (অর্থাৎ তাদের সংশোধনের জন্য) তুমি তার স্থলাভিষিক্ত হও, আর হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক, তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করো, তার কবরকে প্রশস্ত করো এবং আলোকিত করো।"

মৃত্যু পথযাত্রীর জন্য যা যা করা সুন্নত

কারো মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসলে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা সুন্নত :

১. মৃত্যুপথযাত্রীকে لا اله الا الله বলানো। মুসলিম, আবুদ দাউদ ও তিরমিযি আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন : তোমাদের যারা মৃত্যুপথযাত্রী, তাদেরকে لا اله الا الله বলাও। আর মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যার শেষ কথা হবে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে যাবে।"

কলেমা বলানোর এই উদ্যোগ নেয়া হবে তখনই যখন সে "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি" বাক্য দ্বারা কলেমা বলতে সক্ষম হবেনা। সেটি বলতে পারলে তাকে আর শেখানোর দরকার নেই। কলেমা শেখানো হবে তখনই, যখন মৃত্যুপথযাত্রীর সংজ্ঞা লোপ পায়নি এবং বাকশক্তি বহাল আছে। যার বিবেক বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, তাকে কলেমা শেখানো সম্ভব নয়। শুধু বাকশক্তি লুপ্ত কিন্তু বিবেক বুদ্ধি বহাল আছে এমন ব্যক্তি মনে মনে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিতে পারে। আলেমগণ বলেছেন : কলেমা উচ্চারণ করার জন্য তার উপর বেশি চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়। তাকে বলবেনা :

لا إله إلا الله বলো। কেননা এতে আশংকা আছে, সে বিরক্ত হয়ে কোনো অবাঞ্ছিত কথা উচ্চারণ করে বসবে। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার মনোযোগ আকর্ষণের ভংগিতে কলেমা বলবে, যাতে সে তা বুঝতে পারে এবং অনুকরণ করে বলতে পারে। একবার কলেমা উচ্চারণ করলে পুনরায় তা উচ্চারণ করার জন্য তাকে অনুরোধ করবেনা। অবশ্য এরপরে যদি অন্য কোনো কথা বলে থাকে তাহলে পুনরায় তার সামনে কলেমা পেশ করা হবে, যাতে কলেমাই তার শেষ কথা হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে, মৃত্যুপথযাত্রীকে কেবল কলেমা তাইয়েবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ শেখানোই যথেষ্ট। কেননা হাদিসে একথাই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কতক আলেম মনে করেন, কলেমা তাইয়েবা ও কলেমা শাহাদাত দুটোই শেখাবে। কেননা আল্লাহর একত্বের কথা স্মরণ করানোই উদ্দেশ্য, যা এই দুটোর ওপরই নির্ভরশীল।

২. মৃত্যুপথযাত্রীকে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়ে ডান কাতে শোয়াবে। বায়হাকি ও হাকেম আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন মদিনায় এলেন, তখন বারা ইবনে মারুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বললো : সে মারা গেছে। সে আপনার জন্য তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করে গেছে এবং তার মৃত্যু আসন্ন হলে তাকে কেবলামুখি করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : সে ইসলামের বিধান অনুসারে সঠিক নির্দেশ দিয়ে গেছে। আমি তার এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তার সন্তানকে ফেরত দিলাম। তারপর তিনি তার জানাযা পড়তে চলে গেলেন এবং এভাবে দোয়া করলেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَأَدْخِلْهُ جَنَّتَكَ وَقَدْ فَعَلْتَ .

"হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করো, তার ওপর দয়া করো, তাকে তোমার জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তুমি তো তা করেছই (অর্থাৎ দোয়া কবুল করেছ।)

আহমদ বর্ণনা করেছেন : মুহাম্মদ সা. এর কন্যা ফাতেমাকে তার মৃত্যুর সময় পশ্চিমমুখি করে শোয়ানো হয়, তারপর তাকে ডান কাতে শোয়ানো হয়।

রসূল সা. এভাবেই প্রত্যেককে ঘুমানোর আদেশ দিয়েছেন এবং মৃত ব্যক্তিকে কবরে শোয়ানোর পদ্ধতিও এটাই। শাফেয়ি থেকে প্রাপ্ত এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, মৃত্যুপথযাত্রীকে কেবলার দিকে পা দিয়ে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং তার মাথা সামান্য একটু উপরে তোলা হবে, যাতে তার মুখ কেবলামুখি করা হয়। তবে প্রথম মতটি অধিকাংশ আলেমের এবং সেটিই অগ্রগণ্য।

৩. সূরা ইয়াসীন পাঠ : আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম ও ইবনে হিব্বান মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদয়। কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের কামনায় যদি এটি পড়ে, তবে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হবে। আর তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ওপর এ সূরা পাঠ করো।

ইবনে হিব্বান বলেছেন : এ হাদিসে 'মৃত ব্যক্তি' অর্থ মুমূর্ষ ব্যক্তি। মুসনাদে আহমদে

সাফওয়ান রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রবীণ আলেমগণ বলতেন : মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পড়া হলে তা দ্বারা আল্লাহ তার মৃত্যুকে সহজ করে দেন।

৪. মানুষ মারা যাওয়ার পর তার চোখ বন্ধ করে দিতে হয়। কেননা মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. আবু সালামার (মৃত্যুর পর তার) কাছে গেলেন। তখন তার চোখ খোলা ছিলো। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন : রূহ যখন তুলে নেয়া হয় তখন সেই সাথে দৃষ্টিশক্তিও তুলে নেয়া হয়।

৫. মৃত ব্যক্তিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, যাতে তার ছতর নিরাপদ থাকে এবং তার পরিবর্তিত চেহারাকে মানুষের দৃষ্টির আড়াল করে রাখা যায়। কেননা আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন ইন্তিকাল করলেন তখন তাকে নকশা খচিত চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। -বুখারি ও মুসলিম।

মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেয়া বৈধ। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। রসূলুল্লাহ সা. উসমান বিন মাযউনকে তার মৃত্যুর পর চুম্বন করেছিলেন। আর আবু বকর রসূল সা. এর মৃত্যুর পর তাঁর উপর ঝুকে পড়ে দুই চোখের মাঝখানে চুম্বন করেন। তারপর বলেন : হে নবী, হে শ্রেষ্ঠতম!"

৬. মৃত্যু নিশ্চিত হবার পর যতো দ্রুত সম্ভব তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা। লাশে পচন ধরার আগেই তাঁর অভিভাবক গোসল, দাফন ও জানাযার প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করবে। (চিকিৎসক কিংবা অনুরূপ কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃত্যু না সংজ্ঞাহীনতা, তা নিশ্চিত করবে।) -আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, তালহা ইবনুল বারা রোগাক্রান্ত হলে রসূল সা. তাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন : আমি তো দেখতে পাচ্ছি তালহা মারা গেছে। কাজেই তোমরা আমাকে জানিও (কখন জানাযা ও কাফন দাফন ইত্যাদি করা হবে) এবং দ্রুত কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো। কোনো মুসলমানের লাশ তার পরিবারের মধ্যে আটক থাকা সমীচীন নয়।

অভিভাবক ব্যতীত আর কারো অপেক্ষায় থেকে লাশ কাফন দাফনে বিলম্ব করা উচিত নয়। লাশে পচন ধরার পূর্ব পর্যন্ত অভিভাবকের জন্য অপেক্ষা করা যাবে। আহমদ ও তিরমিযি আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সা. তাকে বললেন : হে আলী, তিনটে কাজে বিলম্ব করোনা : নামায, যখন তার সময় উপস্থিত হয়। জানাযা যখন তা আসে এবং অবিবাহিত মেয়ের বিয়ে যখন উপযুক্ত বর পাওয়া যায়।

৭. মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা। আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মুমিনের রূহ তার ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ তা পরিশোধ করা না হয়। অর্থাৎ তার ভাগ্য অনির্ধারিত থেকে যাবে সে মুক্তি পাবে, না ধ্বংস হবে। এর অর্থ এও হতে পারে, তাকে জান্নাতে যাওয়া থেকে আটকে রাখা হবে। এ ব্যবস্থা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ঋণ পরিশোধ করার মতো সম্পত্তি রেখে মারা যায়। কিন্তু যার সম্পত্তি নেই কিন্তু ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা ছিলো, পরিশোধ না করেই মারা গেছে, তার ঋণ আল্লাহ পরিশোধ করবেন বলে প্রমাণ রয়েছে। অনুরূপ, যে ব্যক্তি সম্পত্তি রেখে মারা গেছে, ঋণ পরিশোধে ইচ্ছুকও ছিলো এবং তার উত্তরাধিকারীরা তার সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করেনি। তার ঋণও আল্লাহ পরিশোধ করবেন। বুখারি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে এবং ফেরত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করতো, আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। আর যার ইচ্ছা ছিলো আত্মসাত করা, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন। -আহমদ, আবু নাঈম, বাযযার

ও তাবারানি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কেয়ামতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে আহ্বান করা হবে এবং আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হবে : হে আদম সন্তান, তুমি কি উদ্দেশ্যে এ ঋণ নিয়েছিলে এবং কি কারণে মানুষের হক নষ্ট করেছ? সে বলবে : হে আল্লাহ, তুমি তো জানো, আমি এ ঋণ নেয়ার পর তা আমি খাইওনি, পানও করিনি। অপচয়ও করিনি। কিন্তু আমার ওপর অগ্নিকাণ্ড, চুরি ও লোকসান ইত্যাকার বিপদ এসেছিল। আল্লাহ বলবেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে। তোমার ঋণ পরিশোধে আমিই সর্বাধিক উপযুক্ত। তখন আল্লাহ একটা জিনিস আনার আদেশ দেবেন, তারপর সেই জিনিসটাকে তিনি দাঁড়িপাল্লায় রাখবেন, তার ফলে তার সৎ কাজগুলো মন্দ কাজগুলোর চেয়ে ভারি হয়ে যাবে। অতঃপর সে আল্লাহর রহমতে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

রসূলুল্লাহ সা. এক সময় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা পড়াতেননা। কিন্তু পরে যখন আল্লাহ তাকে বিভিন্ন দেশ জয় করালেন এবং সম্পদ বৃদ্ধি পেলো, তখন ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির উপর জানাযা পড়তেন এবং তার ঋণ পরিশোধ করে দিতেন। বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমি মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অগ্রগণ্য। সুতরাং যে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে এবং ঋণ পরিশোধ করার মতো সম্পত্তি রেখে যায়নি, তার ঋণ আমি পরিশোধ করবো। আর যে ব্যক্তি সম্পত্তি রেখে মারা যাবে, তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব তার উত্তরাধিকারীদের।

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, তার ঋণ মুসলমানদের বাইতুলমাল অর্থাৎ সরকারি কোষাগার থেকে যাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাত ঋণগ্রস্তদের খাত থেকে পরিশোধ করা হবে। মৃত্যুর কারণে তার এ অধিকার বিলুপ্ত হবেনা।

৩. মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে করণীয়

কোনো মুসলমানের মৃত্যুর সংবাদে যা করা মুস্তাহাব

একজন মুসলমান তার কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুর সংবাদ পেলে প্রথমে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা আল্লাহরই নিকট ফিরে যাবো) পড়বে এবং তারপর তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। এটা মুস্তাহাব।

১. আহমদ ও মুসলিম উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, উম্মে সালামা রা. বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : কোনো বান্দার ওপর বিপদ এলে সে যদি বলে :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا.

"আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবো। হে আল্লাহ, আমাকে আমার বিপদে প্রতিদান দাও আর এর বদলায় আমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দাও", তাহলে আল্লাহ তাকে তার বিপদে প্রতিদান দেবেন এবং তাকে তার বদলায় তার চেয়ে উত্তম জিনিস দেবেন। উম্মে সালামা বলেন : আবু সালামা যখন মারা গেলো তখন রসূলুল্লাহ সা. যা বলার উপদেশ দিয়েছিলেন আমি তা বললাম। এর ফলে আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. কে। (উম্মে সালামার স্বামীর মৃত্যুর পর রসূল সা. তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।)

২. তিরমিযিতে আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তার ফেরেশতাদেরকে বলেন : তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে তুলে এনেছো? তারা বলে : হাঁ। আল্লাহ বলেন : তার কলিজার টুকরাকে নিয়ে এসেছো? তারা বলে : হাঁ। আল্লাহ বলেন : তখন আমার বান্দা কী বললো? তারা বলে : আপনার প্রশংসা করেছে এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলেছে। তখন

আল্লাহ বলেন : আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটা ঘর বানাও এবং তাকে "আল্লাহর প্রশংসার ঘর" নামে আখ্যায়িত করো।

৩. আর বুখারিতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেন : দুনিয়াবাসির মধ্য থেকে আমার মুমিন বান্দার প্রিয়জনকে যখন আমি তুলে নেই, অতপর সে বান্দা তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তখন সেই বান্দাকে পুরস্কার দেয়ার জন্য আমার কাছে জান্নাত ছাড়া আর কিছুই থাকেনা।

৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তায়ালার উক্তি : যাদের ওপর কোনো বিপদ এলে তারা বলে :

اَلَّذِيْنَ إِذَ أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

"আমরা তো আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যাবো" তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অশেষ অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষিত হয় এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত"। ইবনে আব্বাস বলেন : এ আয়াতে আল্লাহ জানালেন, মুমিন যখন আল্লাহর ফয়সালার কাছে আত্মসমর্থন করে, প্রত্যাবর্তন করে এবং বিপদ মুসিবতে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার কথা স্মরণ করে। তখন তার জন্য তিনটে শুভ জিনিস নিশ্চিত করা হয় : আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, করুণা এবং হেদায়াত প্রাপ্তি।

মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনদেরকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানানো মুস্তাহাব

আলেমগণ মৃত ব্যক্তির আপনজন, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও পুণ্যবান লোকদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করা মুস্তাহাব মনে করেন, যাতে তারা তার কাফন দাফনে শরিক হওয়ার সওয়াব অর্জন করতে পারে। আবু হুরায়রা রা. থেকে সব ক'টি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : "রসূলুল্লাহ সা. নাজ্জাসী যেদিন মারা যায়, সেদিন তার মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করেন এবং মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তার (গায়েবী) জানাযার নামায পড়তে মাঠে চলে যান। সেখানে তিনি তার সাহাবিদেরকে কাতারবন্দী করেন এবং চার তকবীরে নাজ্জাসীর জন্য নামায আদায় করেন। আর আহমদ ও বুখারি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. যায়দ, জাফর ও ইবনে রওয়াহার শাহাদতের সংবাদ জানিয়েছিলেন তাদের সংবাদ আমার আগেই।" তিরমিযি বলেন : কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর খবর তার ভাই ও আত্মীয়দেরকে জানানোতে কোনো বাধা নেই।

পক্ষান্তরে বায়হাকি বলেছেন : মালেক বিন আনাস রা. সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি : তিনি বলেছেন : কোনো মানুষের মৃত্যুর খবর মসজিদ থেকে গলাবাজী করে প্রচার করা আমি পছন্দ করিনা। তবে কেউ যদি মসজিদের দরজায় এসে অবস্থান করে এবং মানুষকে তার মৃত্যুর খবর জানায়, তাহলে তাতে আপত্তি নেই।

অপরদিকে আহমদ ও তিরমিযি হুযায়ফা থেকে যে বর্ণনা করেছেন, হুযায়ফা বলেছেন : "আমার মৃত্যুর পর তা কাউকে জানিওনা। কেননা আমি আশংকা করি, রসূল সা. যে মৃত্যুর প্রচারণাকে নিষিদ্ধ করেছেন, এটা সেই পর্যায়ে পড়ে যায় কিনা।" তবে এদ্বারা জাহেলী যুগের মৃত্যুর প্রচারণাকে বুঝানো হয়েছে। তাদের রীতি ছিলো, কোনো সম্ভ্রান্ত লোক মারা গেলে একজন ঘোড় সওয়ার দূতকে গোত্রে গোত্রে পাঠাতো। সে গিয়ে বলতো : "অমুক মারা গেছে, সেই সাথে গোটা আরব জাতির মৃত্যু হয়েছে।" আর সাথে সাথে সে চিৎকার করতো ও কাঁদতো।

মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা

আলেমগণ একমত, উচ্চস্বরে চিৎকার ও বিলাপ ছাড়া মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা বৈধ। সহীহ বুখারিতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : চোখের পানি ফেলা ও মনের শোকে কাতর হওয়ার জন্য আল্লাহ শাস্তি দেননা, তিনি শাস্তি দেন করুণা করেন শুধু এই জিনিসটার কারণে এই বলে তিনি জিহ্বা দেখালেন। তিনি নিজের ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন এবং বলেছিলেন : চোখ অশ্রু ঝরায় এবং মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট থাকেন তা ছাড়া আর কিছুই আমরা বলিনা। হে ইবরাহীম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা ব্যথিত। তিনি তার মেয়ে যয়নবের মেয়ে উমায়মার মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। তা দেখে সা'দ বিন উবাদা বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আপনি কি যয়নবকে কাঁদতে নিষেধ করেননি? আর এখন নিজেই কাঁদছেন? রসূল সা. বললেন : এ হচ্ছে মমতা, যা আল্লাহ তার বান্দাদের মনে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যারা মমতাবান তাদের ওপর করুণা করেন।"

আর তাবারানি আবদুল্লাহ বিন যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন : উচ্চস্বরে বিলাপ করা ছাড়া কাঁদার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

উচ্চস্বরে বিলাপসহকারে কাঁদলে তা মৃত ব্যক্তির আযাব ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, যখন উমর রা. আহত হলেন, তখন তাঁর জন্য চিৎকার করে কাঁদা হলো। তিনি যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলেন বললেন : তোমরা কি জানতেনা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জীবিতদের কাঁদাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তি শাস্তি পায়" আর আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, উমার যখন আহত হলেন তখন সুহাইব চিৎকার করে বলতে লাগলেন : ভাই গো!" উমর রা. বললেন : হে সুহাইব, তুমি কি জাননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জীবিতদের কাঁদার কারণে মৃত ব্যক্তি শাস্তি পায়?" আর মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : যার জন্য চিৎকার করে কাঁদা হয় তাকে শাস্তি দেয়া হয়।" এই হাদিসগুলো বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত।

ব্যাখ্যা : এ হাদিস কয়টির তাৎপর্য হলো, মৃত ব্যক্তি তার স্বজনদের কাঁদাকাটিতে দুঃখ পায় ও ব্যথিত হয়। কেননা তাদের কান্না শুনতে পায় এবং তাদের কৃতকর্ম তার সামনে তুলে ধরা হয়। হাদিসের অর্থ এ নয়, তার স্বজনদের কান্নার কারণে সে আযাব ভোগ করে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে : "একজনের পাপের জন্য আরেকজন শাস্তি ভোগ করেনা।" ইবনে জারির আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন : আবু হুরায়রা রা. বলেন : তোমাদের মৃত আত্মীয়দের সামনে তোমাদের কৃতকর্মগুলো তুলে ধরা হয়। ভালো কর্ম দেখলে তারা খুশি হয়। আর খারাপ দেখলে বিব্রত হয়। আর আহমদ ও তিরমিযি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : তোমাদের মৃত আত্মীয় ও স্ববংশীয়দের সামনে তোমাদের কৃতকর্ম তুলে ধরা হয়। ভালো হলে খুশি হয়। ভালো না হলে তারা বলে : তুমি আমাদেরকে যেমন সঠিক পথে পরিচালিত করেছো, তেমনি ওদেরকেও সঠিক পথে পরিচালিত না করে মৃত্যু দিওনা।"

নুমান ইবনে বশীর বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা যখন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন, তখন তার বোন এভাবে চিৎকার করে বিলাপ করতে লাগলেন : ও পাহাড় গো! ও অমুক! ও অমুক! এভাবে বেশ কয়েকটি শব্দ বলতে লাগলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা সংজ্ঞা ফিরে পেলে বললেন : তুমি আমাকে যা যা বলেছো, প্রত্যেকবার আমাকে বলা হয়েছে : তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ?" -বুখারি

উচ্চস্বরে বিলাপ করা

একাধিক হাদিসে উচ্চস্বরে বিলাপ করে কাঁদাকে কঠোর ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবু মালেক আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : আমার উম্মতে জাহেলিয়াতের চারটা প্রথা এখনো অব্যাহত রয়েছে : পূর্ব পুরুষদের নামে বড়াই করা, মানুষকে অপমান করার জন্য তাকে নিচ বংশীয় বলে আখ্যা দেয়া, নক্ষত্রকে বৃষ্টি হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে প্রভাবশালী বলে বিশ্বাস করা এবং মৃত ব্যক্তির শোকে উচ্চস্বরে বিলাপ করে কাঁদা। তিনি আরো বলেছেন : পেশাদার বিলাপকারিণীগণ যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তবে তাদেরকে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় দাঁড় করানো হবে যে, তাদের পরিধানে থাকবে আলকাতরার পোশাক ও খোশপাঁচড়া সৃষ্টিকারী বর্ম। -আহমদ ও মুসলিম। উম্মে আতিয়া বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যেন আমরা উচ্চস্বরে বিলাপ করে কেঁদে শোক প্রকাশ না করি। বাযযার বিশ্বস্ত সনদে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দুটো শব্দ দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত : আনন্দ প্রকাশের জন্য বাদ্য বাজানোর শব্দ এবং বিপদে সুর করে কাঁদার শব্দ। বুখারি ও মুসলিমে আবু মূসা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. তিন শ্রেণীর মহিলা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন : যে মহিলা শোকে চিৎকার করে কাঁদে, বিপদে মাথা ন্যাড়া করে ও পরিধানের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে। আহমদ আনাস থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সা. মহিলাদের বায়াত করার সময় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা চিৎকার করে বিলাপ করবেনা। মহিলারা বললো : হে রসূলুল্লাহ, জাহেলী যুগে কিছু মহিলা আমাদের সাথে শোক প্রকাশে সহযোগিতা করেছিল, এখন ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা কি তাদের শোক প্রকাশে সহযোগিতা করবোনা? রসূল সা. বললেন : ইসলামে বিলাপে সহযোগিতার কোনো স্থান নেই।

মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালন

মহিলাদের জন্য তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোক পালন করা তিন দিন পর্যন্ত বৈধ যদি না তার স্বামী তাকে নিষেধ করে। স্বামী ব্যতিত আর কারো উপর তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দতের মেয়াদ পর্যন্ত শোক পালন করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। এই মেয়াদ হলো চার মাস দশ দিন। তিরমিযি ব্যতিত সব ক'টি সহীহ হাদিস গ্রন্থে উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মহিলার স্বামী ব্যতিত আর কোনো মৃত ব্যক্তির জন্যে তিন দিনের চেয়ে বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। ইয়ামানী চাদর ব্যতিত আর কোনো রঙ্গীন পোশাক পরবেনা, সুরমা লাগাবেনা, সুগন্ধি ব্যবহার করবেনা, মেহেদী রঞ্জিত হবেনা, পবিত্রাবস্থায় ব্যতীত চুল আঁচড়াবেনা, মাসিক স্রাব সমাপ্তিতে সুগন্ধিযুক্ত পানি দিয়ে গোসল করবে।

শোক পালনের পদ্ধতি হলো, মহিলারা সচরাচর যেসব সাজসজ্জা গ্রহণ করে, যেমন গহনা পরা, সুরমা লাগানো, রেশমী পোশাক পরা, সুগন্ধি লাগানো, মেহেদী রঞ্জিত হওয়া- এসব বর্জন করা। এগুলো বর্জন করে কেবলমাত্র স্বামীর জন্য ইদ্দতের মেয়াদব্যাপী শোক পালন করা স্ত্রীর কর্তব্য, যাতে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তার হক পালন করা সম্ভব হয়।

মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার সরবরাহ করা মুস্তাহাব

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার সরবরাহ করো। কারণ তাদের উপর এমন মুসিবত এসেছে, যা তাদেরকে খাবার তৈরি করতে দিচ্ছেনা। (অর্থাৎ জাফরের শাহাদত) -আবু দাউদ, ইবনে

মাজাহ, তিরমিযি। এ কাজটিকে মুস্তাহাব ঘোষণা করার কারণ হলো, এটা একটা সওয়াবের ও মহানুভবতার কাজ এবং এদ্বারা প্রতিবেশী ও আপনজনদের সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদের জন্য সর্বোত্তম হলো, তার পরিবারকে পুরো দিন ও রাত তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানো। এটাই সুন্নত ও মহৎ লোকদের রীতি।

আলেমগণ মৃতের পরিবারকে পীড়াপীড়ি করে খাওয়ানোও মুস্তাহাব মনে করেন, যাতে তারা লজ্জাবশত: অথবা শোকের আধিক্য হেতু খাওয়া দাওয়া বর্জন করে দুর্বল না হয়ে পড়ে। তবে উচ্চস্বরে বিলাপকারিণী মহিলাদের জন্য খাবার দিয়ে আসা বৈধ নয়। কেননা তা হবে তাদের গুনাহর কাজে সাহায্য করার শামিল।

তবে ইমামগণ মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে গণভোজের আয়োজন করা সর্বসম্মতভাবে মাকরূহ মনে করেন। কেননা এতে তাদের মুসবিতের ওপর মুসিবত এবং ঝামেলার উপর ঝামেলা বাড়ে, আর জাহেলী যুগের রীতিপ্রথার সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। জারির বলেন, মৃতের বাড়িতে জনসমাবেশ করা এবং তার দাফনের পর গণভোজের আয়োজন করাকে আমরা অবৈধ শোক প্রকাশ গণ্য করতাম। কোনো কোনো আলেম এটিকে হারামও বলেছেন।

ইবনে কুদামা বলেছেন : বাস্তব প্রয়োজনে এটা করা বৈধ। কেননা কখনো কখনো দূরবর্তী গ্রাম ও অন্যান্য এলাকা থেকে মৃত ব্যক্তির আপনজনেরা এসে থাকে, তারা সেখানে রাত কাটাতে বাধ্য হয় এবং তাদের আতিথেয়তা না করে গত্যন্তর থাকেনা।

মৃত্যুর পূর্বে কাফন ও কবর প্রস্তুত রাখা বৈধ

বুখারি বলেছেন, রসূল সা. এর আমলে কেউ কেউ কাফন প্রস্তুত রাখতেন এবং রসূলুল্লাহ সা. তাতে আপত্তি করতেননা। সাহল রা. থেকে বুখারি বর্ণনা করেন : জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট একটা বুনানো চাদর নিয়ে এলো। তাতে পাড় ছিলো। সাহল বলেন : কি চাদর জানো? লোকেরা বললো, শামলা। (উৎকৃষ্ট ধরনের চাদর) সাহল বললেন : হাঁ। মহিলা বললো : আমি চাদরটি নিজ হাতে বুনেছি। তারপর তা তাঁকে পরাবার জন্য নিয়ে এসেছি। সেটি রসূল সা. নিলেন এবং তাঁর প্রয়োজনীয় ছিলো। তারপর তিনি ওটি লুংগির মতো পরে আমাদের কাছে এলেন। এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করলো এবং বললো : এটি আমাকে পরতে দিন। এটি কতো সুন্দর। লোকেরা বললো : তুমি ভালো করোনি। এটি রসূল সা. পরেছেন এবং তার এটির প্রয়োজনও ছিলো। তারপর তুমি এটি চাইলে। তুমি জানতে যে, তিনি প্রার্থনাকারীকে ফেরত দেননা। সে বললো : আল্লাহর কসম, আমি ওটি পরার জন্য তার কাছে চাইনি। আমি চেয়েছি এজন্য যে, তা আমার কাফন হবে। সাহল বলেন : অত:পর চাদরটি তার কাফন হয়েছিল। হাফেজ ইবনে হাজার এই শিরোনামের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন : বুখারি "রসূল সা. তাতে আপত্তি করতেন না" একথাটা জুড়ে দিয়েছেন এজন্য যে, সাহাবিদের পক্ষ থেকে যে আপত্তি এসেছিল সেদিকে ইংগিত করতে চেয়েছেন। জনৈক সাহাবির চাদর প্রার্থনায় সাহাবিরা আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু যখন সেই সাহাবি (নাম উল্লেখ নেই) তার ওযর তাদেরকে জানিয়েছেন (অর্থাৎ তা নিজের কাফন বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন) তখন তাতে তারা আপত্তি করেননি। এ থেকে বুঝা যায়, মৃত ব্যক্তির জন্য কাফন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস জীবিতাবস্থায় সংগ্রহ করা বৈধ। প্রশ্ন হলো, কবর খনন করাও কি বৈধ? ইবনে বাত্তাল বলেছেন : এ দ্বারা কোনো জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয়ার আগেই তা প্রস্তুত রাখা বৈধ প্রমাণিত হয়। বহু সংখ্যক পুণ্যবান ব্যক্তি তাদের কবর মৃত্যুর আগেই খনন করে রাখতেন। তবে যায়ন ইবনুল মুনীর বলেছেন : এ কাজটি কোনো সাহাবি করেননি। এটা যদি মুস্তাহাব হতো, তাহলে বহু সাহাবিই তা করতেন।

আইনী বলেছেন : সাহাবিদের কেউ কোনো বিশেষ কাজ না করায় তা অবৈধ প্রমাণিত হয়না। সাধারণ মুসলমানরা কোনো কাজকে ভালো মনে করলে তা আল্লাহর নিকট ভালো। বিশেষত একদল আলেম সৎ লোক যখন তা করে।

ইমাম আহমদ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি তার কবরের জন্য জায়গা খরিদ করে এবং তাকে সেখানে দাফন করার জন্য ওসিয়ত করে তবে তাতে আপত্তির কিছু নেই। বর্ণিত আছে, উসমান, আয়েশা ও উমার ইবনে আবদুল আযীয এরূপ করেছেন।

মক্কা বা মদিনায় মৃত্যু কামনা করা মুস্তাহাব

মক্কা বা মদিনায় মৃত্যু চেয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করা মুস্তাহাব। কেননা বুখারি হাফসা থেকে বর্ণনা করেছেন : উমর রা. দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِى سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ ۝

“হে আল্লাহ, আমাকে তোমার পথে শাহাদত দান করো এবং তোমার নবীর শহরে আমাকে মৃত্যু দাও।” হাফসা বলেন, আমি বললাম : এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেন : আল্লাহর ইচ্ছা থাকে তো তিনি এটা আমাকে দেবেন।” আর তাবারানি জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই হারাম শরিফের (মক্কা ও মদিনার) যে কোনো একটিতে মারা যাবে, সে কেয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে।

আকস্মিক মৃত্যু

আবু দাউদ জনৈক সাহাবি উবাইদ বিন খালেদ সুলামী থেকে বর্ণনা করেছেন, (বর্ণনাকারী কখনো এটি রসূলুল্লাহর সা. উক্তি কখনো সাহাবি উবাইদের উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন) : আকস্মিক মৃত্যু একটি দুঃখজনক ঘটনা।” (আকস্মিক মৃত্যুকে অপছন্দ করা হতো এজন্য যে, এতে রোগ ভোগের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হওয়া এবং তওবা ও নেক আমলের মাধ্যমে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ থাকে না।) হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস বিন মালেক, আবু হুরায়রা ও আয়েশা রা. থেকেও বর্ণিত।

যার সন্তান মারা যায়

১. বুখারি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মুসলমানের যদি তিনটে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা যায়, তাহলে তাদের ওসিলায় আল্লাহ নিজ রহমতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

২. বুখারি ও মুসলিম আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, মহিলারা রসূল সা. কে বললো : আমাদের উপদেশ দেয়ার জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করুন। অতপর রসূল সা. মহিলাদেরকে উপদেশ প্রদান প্রসংগে বললেন : যে মহিলার তিনটে সন্তান মারা যাবে। তাকে তারা আগুন থেকে রক্ষা করবে। জনৈক মহিলা বললো : আর যদি দুটো মারা যায়? রসূল সা. বললেন : দুটো মারা গেলেও।

মুসলিম উম্মাহর জনগণের বয়স

তিরমিযি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার উম্মতের (গড়) বয়স হবে ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। খুব কম লোকই এটি অতিক্রম করতে পারবে।

মৃত্যু এক ধরনের পরিত্রাণ

বুখারি ও মুসলিম আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. এর কাছ দিয়ে একটা

জানাযা অতিক্রম করলো। তা দেখে রসূল সা. বললেন, এই মৃত ব্যক্তি রা. পরিত্রাণ পেয়েছে নচেত তার কাছ থেকে অন্যেরা পরিত্রাণ পেয়েছে। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, কোন্ মৃত ব্যক্তি পরিত্রাণ পায় এবং কোন্ মৃত ব্যক্তি থেকে অন্যেরা পরিত্রাণ পায়। রসূল সা. বললেন : মুমিন বান্দা (মৃত্যুর মধ্যদিয়ে) দুনিয়ার বিপদ মুসিবত ও দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ পায়। আর পাপী বান্দা যখন মারা যায় তখন অন্যান্য বান্দারা, গোটা দেশ, গাছপালা ও জীবজন্তু তার কবল থেকে পরিত্রাণ পায়।

মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো, কাফন পরানো, তার জানাযার নামায পড়া ও দাফন করা ওয়াজিব। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া গেলো :

মৃত ব্যক্তির গোসল

১. গোসলের বিধান : অধিকাংশ আলেমের মতে মুসলমান মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরযে কেফায়া। কিছু লোক এ কাজটি সম্পাদন করলে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এ কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং সকল মুসলমানকে এ আদেশ যাতে পালিত হয়, তা তদারক করার আদেশ দিয়েছেন।

২. কাকে গোসল করানো ওয়াজিব এবং কাকে গোসল করানো ওয়াজিব নয় : এমন প্রত্যেক মুসলমানকে গোসল করানো ওয়াজিব, যে কোনো যুদ্ধে কাফেরদের হাতে নিহত হয়নি।

৩. মৃত ব্যক্তির দেহের অংশ বিশেষের গোসল ও জানাযা :

মুসলমান মৃত ব্যক্তির লাশের অংশ বিশেষের গোসলের ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইবনে হাযমের মতে, তার গোসল, কাফন ও জানাযার নামায পড়া হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : আমরা জেনেছি, উষ্ট্রযুদ্ধের ঘটনায় একটা পাখি মক্কায় একখানা হাত ফেলেছিল। লোকেরা হাতের আংটি দেখে সনাক্ত করতে পেরেছিল কার হাত। (হাতটি ছিলো আবদুর রহমান বিন ইতাব বিন উসাইদের) অতপর সাহাবিদের এক সমাবেশে তার গোসল ও জানাযার নামায সম্পন্ন হয়। ইমাম আহমদ বলেছেন : আবু আইয়ুব একজনের পায়ের এবং উমর রা. কতগুলো হাড়ের জানাযার নামায পড়েছেন। ইবনে হাযম বলেন : মুসলমান মৃত ব্যক্তির যে অংশই পাওয়া যাবে, তাকে গোসল করানো ও কাফন পরানো হবে। একমাত্র শহীদ এর ব্যতিক্রম। তিনি বলেছেন : যে অংশটুকু পাওয়া যাবে তার জানাযার নামায আদায় করার সময় তার সমস্ত দেহ ও রূহের ওপর জানাযার নিয়ত করা হবে।

আবু হানিফা ও মালেকের মতে দেহের অর্ধেকের বেশি পাওয়া গেলে তাকে গোসল করানো হবে ও নামায পড়া হবে। নচেত গোসল ও নামায পড়া হবেনা।

৪. শহীদকে গোসল করানো হবেনা : যুদ্ধে কাফেরদের হাতে নিহত শহীদকে গোসল করানো হবেনা। এমনকি তার ওপর যদি গোসল ফরয বা ওয়াজিব থেকে থাকে তবুও নয়। (গোসল ফরয বা ওয়াজিব ছিলো এমন শহীদকে মালেকিদের মতে গোসল করানো হবেনা। শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধতম মত এবং ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফের মতও তদ্রূপ। এর প্রমাণ হলো, হানযালা রা. গোসল ফরয থাকা অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন। তথাপি রসূল সা. তাকে গোসল করাননি।) শহীদের পরিধানে যে পোশাক বিদ্যমান, তা কাফনের জন্য যথেষ্ট হলে তা দিয়েই তাকে কাফন দেয়া হবে। নচেত অবশিষ্ট কাফন যোগ করে কাফন পূর্ণ করা হবে। আর সুন্নত কাফনের চেয়ে পরিধানে বেশি পোশাক থাকলে অতিরিক্ত পোশাক খুলে ফেলা হবে। তার

রক্তসহই তাকে দাফন করা হবে। এক বিন্দু রক্তও ধোয়া মোছা যাবেনা। আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : শহীদদেরকে গোসল করিওনা। কেননা প্রত্যেকটি ক্ষত এবং প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত থেকে কেয়ামতের দিন মেশকের ঘ্রাণ ছুটবে। রসূলুল্লাহ সা. ওহুদের শহীদদেরকে তাদের রক্তসহই দাফনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের গোসলও দেননি, তাদের ওপর জানাযার নামাযও পড়েননি।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : গোসল ও নামায ছাড়া দাফন করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, তারা তাদের ক্ষতস্থানগুলো নিয়েই আল্লাহর সাথে মিলিত হবেন। কেননা তাদের রক্তের ঘ্রাণ হবে মেশকের ঘ্রাণ। আল্লাহ তাদেরকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তার পর তাদের আর জানাযার নামাযের প্রয়োজন নেই। আর এতে অবশিষ্ট মুসলমানদের দুর্দশাও লাঘব হয়েছিল। কেননা যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই আহত হয়ে কাতরাচ্ছিলেন। তাছাড়া তাদের উপর শত্রুদের পুনরাক্রমণের আশংকাও ছিলো। আর তাদের পরিবার পরিজনকে নিয়ে তাদের এবং তাদেরকে নিয়ে তাদের পরিবার পরিজনের দুশ্চিন্তাও ছিলো। (আর এ কারণে তাদের দ্রুত পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন ছিলো।) কারো কারো মতে, শহীদদের জানাযার নামায বর্জনের নিগূঢ় রহস্য হলো, জানাযার নামায তো মৃতের উপর পড়া হয়। অথচ শহীদ তো জীবিত। অথবা জানাযার নামায হচ্ছে এক ধরনের সুপারিশ। শহীদদের এই সুপারিশের প্রয়োজন নেই। কেননা তারাই অন্যদের সুপারিশ করবে।

৫. যে সকল শহীদকে গোসল করাতে হয় এবং জানাযার নামায পড়তে হয় : যে সকল মুসলমান নিহত হয়েছে, কিন্তু কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ফলে নয়, রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকেও 'শহীদ' নামে আখ্যায়িত করেছেন, তবে তাদেরকে গোসল করানো হবে এবং তাদের জানাযা নামাযও পড়তে হবে। এ ধরনের যারা রসূল সা. এর জীবিতাবস্থায় মারা গেছে, তাদেরকে তিনি গোসল করিয়েছেন এবং তার পরে মুসলমানরা উমর, উসমান ও আলীকেও গোসল করিয়েছেন। অথচ তারা সবাই শহীদ ছিলেন। এখানে আমরা এ ধরনের শহীদদের বিবরণ দিচ্ছি :

১. জাবের বিন আতীক থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : আল্লাহর পথে নিহতরা ছাড়াও সাত ব্যক্তি শহীদ : প্লেগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, দেহের পার্শ্বে অভ্যন্তর ভাগে সৃষ্ট ফোঁড়ায় মৃত, পেটের রোগে মৃত, আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত, ধসের নিচে চাপা পড়ে মৃত এবং প্রসবের সময় মৃত মহিলা। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে শহীদ মনে করো? সাহাবিগণ বললেন : হে রসূলুল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে। রসূল সা. বললেন : তাহলে তো আমার উম্মতে শহীদদের সংখ্যা খুবই কম। তারা বললেন : হে রসূলুল্লাহ! তাহলে কারা কারা শহীদ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মারা যায় (অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যে থাকা অবস্থায়) সেও শহীদ, যে ব্যক্তি প্লেগে (মহামারি) মারা যায় সেও শহীদ, যে ব্যক্তি পেটের রোগে মারা যায় সেও শহীদ এবং পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তিও শহীদ। -মুসলিম।

৩. সাঈদ বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে (আত্মরক্ষার চেষ্টায়) নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি ইসলামের রক্ষার চেষ্টায় নিহত হয় সেও শহীদ এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ। -আহমদ ও তিরমিযি।

৬. কাফেরকে গোসল করাতে হয়না : কোনো মুসলমানের ওপর কোনো কাফেরকে গোসল করানো ওয়াজিব নয়। কারো কারো মতে এটা বৈধ। মালেকি ও হাম্বলিদের মতে কোনো মুসলমানের পক্ষে তার কোনো অমুসলিম আত্মীয়কে গোসল করানো, কাফন পরানো ও দাফন করা বৈধ নয়। অবশ্য লাশ খোয়া যাবে আশংকা থাকলে তাকে মাটি চাপা দেয়া জরুরি। কেননা আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকি বর্ণনা করেছেন, আলী রা. বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বললাম : আপনার বৃদ্ধ বিপথগামী বাবা (অর্থাৎ আলীর পিতা আবু তালেব) মারা গেছেন। তিনি বলেন : যাও, -তোমার বাবাকে মাটি চাপা দিয়ে এসো। আর আমার কাছে না আসা পর্যন্ত তুমি কাউকে কিছু বলবেনা। এরপর আমি গেলাম এবং তাকে মাটি চাপা দিয়ে এলাম। অতপর রসূল সা. এর নিকট এলাম। তখন তিনি আমাকে গোসল করার আদেশ দিয়েছিলেন। আমি গোসল করলাম। তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : মৃতের গোসলে অনুসরণ করার মতো কোন সুন্নত নেই।

গোসলের নিয়ম

মৃতের গোসলে সমস্ত শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ওয়াজিব সে যদি মাসিক স্রাবজনিত কারণে অথবা বীর্যপাতজনিত কারণে অপবিত্র থেকে থাকে তবুও। এতে মুস্তাহাব হলো, মৃত ব্যক্তিকে কোনো উঁচু জায়গায় রেখে তার পোশাক খুলে নেয়া হবে। (ইমাম শাফেয়ীর মতে, তার জামা যদি এমন পাতলা হয় যে দেহে পানি পৌঁছাতে বাধা পায়না, তাহলে জামা সহই গোসল করানো উত্তম। কেননা রসূলুল্লাহ সা.কে তার জামা সহই গোসল করানো হয়েছিল। তবে দৃশ্যত: মনে হয়, এটা শুধু রসূল সা. এর সাথে নির্দিষ্ট। নচেত শরীরের গোপনীয় অংগ ব্যতিত মৃতকে কাপড় খুলে গোসল করানোই প্রসিদ্ধ রীতি ছিলো।) তারপর সে বালক না হলে তার শরীরের গোপনীয় অংশ ঢেকে দিতে হবে। আর তার গোসলের সময় যার উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন সে ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকবেনা। যে গোসল করাবে, তাকে একজন সৎ ও বিশ্বস্ত লোক হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে সে যা কিছু ভালো দেখবে, তা প্রকাশ করবে, আর যা কিছু খারাপ দেখবে তা গোপন করবে। কেননা ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন : তোমাদের মৃতদেহগুলোকে তাদেরই গোসল করানো উচিত, যারা নিরাপদ। যে ব্যক্তি গোসল করাবে তার নিয়ত করা ওয়াজিব। কেননা গোসলের কাজটি তার ওপরই অর্পিত হয়েছে। এরপর গোসল করানো শুরু করবে। শুরুতে হাল্কাভাবে পেটে চাপ দেবে, যাতে পেটে কিছু থাকলে তা বেরিয়ে আসে। তারপর শরীরে কোনো ময়লা ও অপবিত্র জিনিস থাকলে তা দূর করবে। হাতে একখানা ন্যাকড়া নিয়ে তা দিয়ে দেহের গোপন অংশ মুছে দেবে। কেননা খালি হাতে গোপন অংশ স্পর্শ করা হারাম। তারপর তাকে নামাযের মতো ওযু করাবে। কেননা রসূল সা. বলেছেন তার ডান পাশ দিয়ে ও ওযুর অংগ প্রত্যংগগুলো দিয়ে গোসলের কাজটি শুরু করবে। তাছাড়া উজ্জ্বল চিহ্নগুলো পরিস্ফুটকরণে মুমিনের আলামত পুনরুজ্জীবিত করার জন্যও ওযুর অংগগুলো দিয়ে শুরু করা বাঞ্ছনীয়। তারপর তাকে পানি ও সাবান দিয়ে তিনবার গোসল করাবে। ডান দিক থেকে শুরু করবে। যদি তিনবার করায় ভালোভাবে পরিষ্কার না হয় কিংবা অন্য কোনো কারণে তিনবারের বেশি গোসল করানো প্রয়োজন মনে করে, তাহলে পাঁচবার বা সাতবার করবে। সহীহ বুখারিতে রয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা মৃতকে বেজোড় সংখ্যক অর্থাৎ তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার অথবা যদি প্রয়োজন মনে করো আরো বেশিবার গোসল করাও। (ইবনে আবদুল বার বলেছেন : সাতবারের বেশি করতে বলেছে এমন কোনো আলেমের নাম শুনিনি। আহমদ ও ইবনে মুনযির সাতবারের বেশি গোসল করানো

মাকরূহ বলেছেন।) ইবনুল মুনযির বলেছেন : যারা গোসল করায় তাদেরকে কতবার গোসল করাবে তা নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এই শর্তে যে, তা অবশ্যই বেজোড় সংখ্যক বার হতে হবে। মৃত ব্যক্তি যদি মহিলা হয়, তবে তার চুল খুলতে হবে খোলার পর ধুয়ে, আবার আগের মতো বেনী বেঁধে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। উম্মে আতিয়ার বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা.-এর এক কন্যার মাথার চুলকে মহিলারা তিনটে বেনী করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, বেনী খুলে পুনরায় তিনটে বেনী করা হয়েছিল? উম্মে আতিয়া বললেন : হাঁ।

মৃতের গোসল শেষ হলে তার দেহকে একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে দিতে হবে যাতে তার কাফনের কাপড় ভিজে না যায়। তারপর শরীরে সুগন্ধি মাখাতে হবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির গায়ে সুগন্ধীযুক্ত ধুনি দেবে তখন তিনবার দিও।" বায়হাকি, হাকেম, ইবনে হিব্বান।

আবু ওয়ায়েল বলেন : আলীর নিকট মেশ্ক ছিলো। তিনি ওসিয়ত করেছিলেন যেন উক্ত মেসক দ্বারা তার মরদেহকে সুবাসিত করা হয়। তিনি বলেন : এটা রসূলুল্লাহ সা. এর উদ্বৃত্ত সুগন্ধি দ্রব্য। অধিকাংশ আলেমের মতে মৃত ব্যক্তির নখ কাটা, গোফ, বগল ও নাভির নিচের পশম কাটা বা কামানো মাকরূহ। তবে ইবনে হাযমের মতে বৈধ।

গোসলের পর কাফনের পূর্বে পেট থেকে কোনো অপবিত্র বর্জ্য বেরুলে শুধুমাত্র বর্জ্যটুকু ধুয়ে ফেলে পরিষ্কার করা যে ওয়াজিব, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। নতুন করে মৃত ব্যক্তিকে পবিত্র করা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেন : ওযু করালে যথেষ্ট হবে। কেউ বলেন : পুনরায় গোসল করাতে হবে। যে মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে ইজতিহাদ করেছেন তা উম্মে আতিয়ার হাদিস, যা সব কটা সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : রসূল সা. এর কন্যা যখন মারা গেলো, তখন তিনি আমাদের কাছে এলেন। আমাদেরকে বললেন : তোমরা ওকে পানি ও সিদরের পাতা দিয়ে তিনবার গোসল করাও, অথবা পাঁচবার অথবা যদি প্রয়োজন মনে করো আরো বেশি বার। অবশেষে কর্পুর লাগাও। তারপর আমাকে জানাও। কাজ শেষ হলে রসূলুল্লাহ সা.কে জানালাম। তখন তিনি আমাদেরকে তার লুংগী দিলেন এবং বললেন, এটা তার কাফনের নিচে পরিয়ে দাও।"

কর্পুর লাগানোর তাৎপর্য সম্পর্কে আলেমগণ যা বলেছেন তা হলো, এটা সুগন্ধিযুক্ত জিনিস এবং এ সময়টা ফেরেশতাদের আগমনের সময়। তাছাড়া এতে যে কোনো জিনিসকে ঠাণ্ডা করা ও নিঃশেষ করার ক্ষমতা রয়েছে, বিশেষত শবদেহকে শক্ত করা, কীটপতংগকে তা থেকে হটানো এবং দ্রুত বিকৃতি রোধ করার গুণ রয়েছে। কর্পুরের অভাবে একই ধরনের গুণবৈশিষ্ট্য সার্বিকভাবে বা আংশিকভাবে বিদ্যমান এমন অন্য বস্তুও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পানির অভাবে মৃত ব্যক্তিকে তাইয়াম্মুম করানো

পানি না পাওয়া গেলে মৃত ব্যক্তিকে তাইয়াম্মুম করাতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন : "তোমরা যদি পানি না পাও তবে তাইয়াম্মুম করো।" আর রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে।

সেই অবস্থায়ও তাইয়াম্মুম করানো যায় যখন গোসল করানো হলে মৃত দেহের টলমলে ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। অনুরূপ, যখন কোনো মহিলার মৃতদেহকে গোসল করানোর জন্য বেগানা পুরুষ এবং পুরুষের মৃতদেহকে গোসল করানোর জন্য বেগানা স্ত্রী লোক ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যাবেনা তখনও তাইয়াম্মুম করানো যাবে। আবু দাউদ ও বায়হাকি

বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কোনো মহিলা এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার সাথে কতক পুরুষ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মহিলা নেই এবং যখন কোনো পুরুষ এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার সাথে কতক মহিলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পুরুষ নেই, তখন এই মৃত নারী ও পুরুষকে তাইয়াম্মুম করিয়ে দাফন করা হবে। তারা পানির অভাবকালীন মৃত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত।

নারীকে তার কোনো মাহরাম পুরুষ হাত দিয়ে তাইয়াম্মুম করাবে। মাহরাম পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন বেগানা পুরুষ নিজের হাতে ন্যাকড়া পেচিয়ে তাইয়াম্মুম করাবে। এ হলো আবু হানিফা ও আহমদের মাযহাব। মালেক ও শাফেয়ির মতে, মাহরাম পুরুষ পাওয়া গেলে সে তাকে গোসল করাবে। কেননা মৃত মহিলা তার নিকট পুরুষের মতোই।

'মুসাওয়া' গ্রন্থে ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আলেমদের কাছ থেকে শুনেছেন : যখন কোনো মহিলা এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার আশপাশে কোনো মহিলাও নেই, তার কোনো মাহরাম পুরুষও নেই, তখন তাকে তাইয়াম্মুম করানো হবে, তার মুখমণ্ডল ও দু'হাতকে মাটি দিয়ে মুছে নিতে হবে। আর যখন কোনো পুরুষ মারা যায় এমন অবস্থায় যে, তার কাছে কিছু মহিলা ছাড়া কোনো পুরুষ নেই, তখন উক্ত মহিলারা তাকে তাইয়াম্মুম করাবে। (ইবনে হাযম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন : যখন কোনো পুরুষ এমন জায়গায় মারা যায় যেখানে শুধুই মহিলারা রয়েছে, কোনোই পুরুষ নেই, অথবা মহিলা এমন জায়গায় মারা যায়, যেখানে শুধুই পুরুষরা রয়েছে, কোনো মহিলা নেই, তখন মহিলারা পুরুষকে এবং পুরুষরা মহিলাকে মোটা কাপড়ে ঢেকে গোসল করাবে, হাত দিয়ে মৃতদেহ স্পর্শ না করেই সমগ্র শরীরে পানি ঢালবে। পানি পাওয়া গেলে গোসলের পরিবর্তে তাইয়াম্মুম করানো বৈধ হবেনা।)

স্বামী ও স্ত্রী কর্তৃক পরস্পরকে গোসল করানো

স্ত্রী স্বামীকে গোসল করাতে পারবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। আয়েশা রা. বলেছেন : "গোসল করানোর কাজে আমার দায়িত্ব পালনে আমি যদি এগিয়ে যাই, তবে আর পিছিয়ে আসিনা। রসূল সা. কে তাঁর স্ত্রীরাই গোসল করিয়েছেন।" -আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে গোসল করাতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে বৈধ। কেননা আলী রা. ফাতেমা রা.কে গোসল করিয়েছেন, একথা দার কুতনি ও বায়হাকি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আর রসূলুল্লাহ সা. আয়েশা রা.কে বলেছিলেন : তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তবে তোমাকে আমি গোসল করাবো ও কাফন পরাবো। -ইবনে মাজাহ।

হানাফিরা বলেন : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে গোসল করানো বৈধ নয়। স্বামী ছাড়া আর কাউকে না পাওয়া গেলে স্বামী তাকে তাইয়াম্মুম করাবে। কিন্তু হাদিসগুলো হানাফিদের মতের বিপক্ষে।

মহিলা কর্তৃক বালককে গোসল করানো : ইবনুল মুনযির বলেন : নির্ভরযোগ্য সকল আলেম একমত, মহিলা কর্তৃক বালককে গোসল করানো বৈধ।

৪. জানাযা, দাফন কাফন ও কবর যিয়ারত

কাফন

১. বিধি : মৃতদেহকে পুরোপুরিভাবে আবৃত করে এমন কাফন পরানো ফরযে কেফায়া- চাই তা একটা কাপড় দিয়েই হোক না কেন। বুখারি খাব্বাব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, খাব্বাব বলেন : "আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে হিজরত করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছেই প্রাপ্য ছিলো। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ

তাদের মধ্যে একজন হলেন মুসয়াব ইবনে উমাইর। তিনি ওহুদ যুদ্ধে নিহত হন। তাকে কাফন পরানোর জন্য একটা চাদর ছাড়া আর কিছুই আমরা পাইনি। তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যায়, পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যায়। রসূল সা. আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন তার মাথা ঢেকে দেই আর দু'পায়ের ওপর ইযখির (সুগন্ধিযুক্ত এক ধরনের ঘাস, যা দ্বারা কাঠ সহযোগে ঘরের চাল ঢাকা হয়।) রেখে দেই।"

২. কাফনের মুস্তাহাব : ১. কাফনের কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সমস্ত শরীর আবৃতকারী হওয়া চাই : ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার ভাই এর অভিভাবক হয়, তখন সে যেন তাকে ভালোভাবে কাফন পরায়।

২. কাফন সাদা হওয়া মুস্তাহাব : আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো। সাদা কাপড়ই উত্তম কাপড়। আর সাদা কাপড়ে তোমাদের মৃতদেরকে কাফন পরাও।

৩. কাফনকে ধুপ, ধুনি ও সুগন্ধিতে মণ্ডিত করা উচিত। আহমদ ও হাকেম জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা মৃত ব্যক্তিকে যখন ধুনি দেবে, তখন তিনবার দেবে। আর আবু সাঈদ ও ইবনে আব্বাস রা. ওসিয়ত করেছেন, তাদের কাফনকে যেন চন্দন কাঠ দ্বারা ধুনি দেয়া হয়।

৪. পুরুষের জন্য চারটা এবং মহিলার জন্য পাঁচটা আবরণী : আয়েশা রা. থেকে সব কটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ সা. কে তিনটে নতুন সাদা সুতি কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছিল। তাতে কোনো পাগড়ী ছিলনা। তিরমিযি বলেছেন : রসূল সা. এর সাহাবিদের মধ্যে যারা বিদ্বান ছিলেন তাদের অধিকাংশ এই হাদিস অনুসারেই কাজ করতেন। সুফিয়ান সাওরি বলেছেন : পুরুষকে তিনটে কাপড়ে কাফন পরানো হবে। যদি চাও, একটা জামা ও দুইটা আবরনী, নচেত তিনটে আবরনী। আর দুইটা কাপড় না পাওয়া গেলে একটা কাপড় যথেষ্ট হবে। দুইটা কাপড়ও যথেষ্ট হবে। সম্ভব হলে তিনটে কাপড় সবচেয়ে ভালো। এটাই শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাকের মত। তারা বলেছেন : মহিলাকে পাঁচটা কাপড়ে কাফন পরানো হবে। উম্মে আতিয়া বলেছেন : রসূল সা. তাকে একটা লুংগী, একটা জামা, একটা মাথার ঢাকনী ও দুইটা আবরনী দিয়েছিলেন।

৩. ইহরাম রত ব্যক্তির কাফন : ইহরাম রত ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন তাকে অন্য যারা ইহরাম রত নয় তাদের মতোই গোসল করানো হবে এবং তার ইহরামের কাপড়ে তাকে কাফন পরানো হবে। তার মাথা ঢাকা হবেনা এবং তাকে সুগন্ধিও মাখানো হবেনা। কেননা ইহরামের বিধি তখনো বহাল। সহীহ হাদিস গ্রন্থগুলোতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রসূল সা. এর সাথে আরাফার ময়দানে অবস্থানরত এক ব্যক্তি সহসা তার বাহক জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে গেলো। সংগে সংগে জন্তুটি তার ঘাড় মটকে দিলো। বিষয়টি রসূলুল্লাহ সা.কে জানানো হলো। তিনি বললেন : ওকে পানি ও সিদর দিয়ে গোসল করাও এবং তার দুটি ইহরামের কাপড়েই কাফন দাও, তাকে সুবাসিত করোনা এবং তার মাথা ঢেকোনা। আল্লাহ তায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন লাব্বাইকা বলা অবস্থায়ই পুনরুজ্জীবিত করবেন।

হানাফি ও মালেকিগণ বলেন : ইহরাম রত ব্যক্তি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ইহরাম ভেংগে যায়। তাই ইহরাম না থাকার কারণে তাকে ইহরাম বিহীন ব্যক্তির ন্যায় কাফন পরানো হবে। তার কাফন সেলাই করা হবে। তার মাথা ঢাকা হবে এবং তাকে সুবাসিত করা হবে। তারা

বলেন : বাহক জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে মৃত ব্যক্তির ঘটনাটা একটা ব্যতিক্রমী ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তাই তার কাফনের পদ্ধতিটা তার মধ্যেই সীমিত থাকবে। সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে রসূল সা. কর্তৃক তাকে কেয়ামতের দিন 'লাব্বাইকা' উচ্চারণ করা অবস্থায় পুনরুজ্জীবিত করা হবে বলে কারণ দর্শানোর বিষয়টি যে কোনো ইহরাম রত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা সুবিদিত। আর এটা চিরস্থায়ী মূলনীতি, যে বিধি কোনো একজনের বেলায় প্রযোজ্য, তা ঐ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সকলের বেলায় প্রযোজ্য।

৪. কাফনে বাড়াবাড়ি করা মাকরূহ : কাফন উত্তম মানের হওয়া উচিত। বেশি দামের কাপড় দিয়ে বা যা ব্যবহারে সাধারণত অভ্যস্ত নয় তা দিয়ে কাফন দেয়া অনুচিত।

শাবী বলেন, আলী রা. বলেছেন : আমার কাফনে বাড়াবাড়ি করোনা। কেননা আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: কাফনে বাড়াবাড়ি করোনা। তা অতি দ্রুত খুলে নেয়া হয়। -আবু দাউদ।

হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমরা কাফনে বাড়াবাড়ি করোনা। আমার জন্য দুটো পরিষ্কার কাপড় কিনে নিয়ে এসো। আর আবু বকর রা. বলেছেন : আমার পরিধানের এই কাপড়টা ধুয়ে নিও, এর ওপর দুটো কাপড় বাড়িয়ে দিও, (যুক্ত করো) অতঃপর এইগুলো দিয়ে আমাকে কাফন দিও। আয়েশা রা. বললেন : এ কাপড়টা তো পুরানো। তিঁনি বললেন : মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিত ব্যক্তিই নতুন কাপড়ের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। কাফন তো মৃত দেহ থেকে নিঃসৃত পুঁজের জন্য।"

৫. রেশম দ্বারা তৈরি কাফন : পুরুষকে রেশমের কাপড়ে কাফন দেয়া জায়েয নেই, মহিলাকে দেয়া জায়েয। রসূল সা. বলেছেন : স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মতের পুরুষদের হারাম, মহিলাদের জন্য হালাল।

বহু সংখ্যক আলেম রেশমের কাপড় দিয়ে মহিলার কাফন দেয়াও অপছন্দ করেছেন। কেননা এতে শরিয়তে নিষিদ্ধ সম্পদের অপচয় ও বাড়াবাড়ি হয়। তাদের মতে জীবিতাবস্থায় সাজ-সজ্জার উপকরণ হিসেবে আর মৃত্যুর পর কাফন দেয়া আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। হাসান, ইবনুল মুবারক ও ইসহাক এটাকে মাকরূহ মনে করেন। ইবনুল মুনযির বলেন : অন্য কেউ এর বিপরীত কথা বলেছেন বলে আমার মনে পড়েনা।

৬. কাফন নিজস্ব সম্পদ থেকে দিতে হবে : মৃত ব্যক্তি যদি কিছু সম্পত্তি রেখে গিয়ে থাকে তবে তা থেকেই তার কাফন দিতে হবে। যদি কোনো সম্পত্তি না রেখে গিয়ে থাকে তবে যে ব্যক্তি তার ভরণ পোষণের খরচ বহন করতো, তাকেই কাফনের খবচ বহন করতে হবে। তবে তার ভরণ পোষণ বহনকারী কেউ যদি না থেকে থাকে, তাহলে তার কাফনের ব্যবস্থা করা হবে মুসলমানদের বাইতুলমাল তথা সরকারি কোষাগার থেকে, নচেত মুসলমানরা নিজ উদ্যোগেই তার কাফনের ব্যবস্থা করবে। এক্ষেত্রে মহিলার বিধান পুরুষের মতোই। ইবনে হাযম বলেছেন : মহিলার কাফন ও কবর খননের খরচ তার নিজস্ব সম্পত্তি থেকেই মেটানো হবে। এটা তার স্বামীর দায়িত্ব নয়। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য নির্দেশ ছাড়া সকল মুসলমানের সম্পত্তিতে অন্যের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। রসূল সা. বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের জান ও মাল, অন্যের জন্য হারাম।" স্বামীর ওপর আল্লাহ স্ত্রীর শুধু খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থানের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যে ভাষায় আল্লাহ আমাদেরকে কাফনের বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন, তাতে কাফনকে পোশাক ও কবরকে বাসস্থান বলে অভিহিত করা হয়না।

মৃত ব্যক্তির জানাযা

১. জানাযার নামাযের বিধান : ফেকাহ্ শাস্ত্রীয় ইমামগণের সর্বসম্মত মত মৃত হলো, ব্যক্তির জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. এর আদেশ দিয়েছেন এবং মুসলমানরা তা মেনে চলেছে। বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট যখনই কোনো ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে আনা হতো, জিজ্ঞাসা করতেন সে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য কোনো উদ্বৃত্ত সম্পত্তি রেখে গেছে কি? যদি বলা হতো, সে তার ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত সম্পত্তি রেখে গেছে, তাহলে তিনি জানাযা পড়তেন। নচেত মুসলমানদের বলতেন : তোমরা তোমাদের সাথির জানাযা নামায পড়ো।

২. জানাযার নামাযের ফযিলত : ১. সকল সহীহ্ হাদিস গ্রন্থে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে ও মৃত দাফনে শরিক হয়, সে এক কীরাত সওয়াব পাবে। আর যে দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তার অনুসরণ করবে, সে দুই কীরাত সওয়াব পাবে। এর এক কীরাত বা ক্ষুদ্রতম কীরাত ওহুদ পাহাড়ের সমান। (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় ওহুদ পাহাড়ের সমান ভারী হবে।)

২. খাব্বাব রা. থেকে মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, খাব্বাব বলেন : হে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, আপনি কি শোনেননি আবু হুরায়রা কী বলেন? তিনি নাকি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি নিজের বাড়ি থেকে কোনো মৃত দেহের সাথে বের হয়, তার জানাযার নামায পড়ে, তারপর তার দাফন পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে, সে দুই কীরাত সওয়াব পাবে। প্রত্যেক কীরাত ওহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে চলে যায়, সে ওহুদ পাহাড়ের সমান সওয়াব পাবে। (এ থেকে প্রমাণিত হয়, নামায শেষে চলে যাওয়ার জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই।) একথা শুনে ইবনে উমর রা. খাব্বাবকে আয়েশার নিকট পাঠিয়ে জানতে চাইলেন আবু হুরায়রার কথা সত্য কিনা এবং খাব্বাবকে আদেশ দিলেন আয়েশা কী বলেছেন তা ফিরে এসে তাকে জানাতে। আয়েশা বললেন : আবু হুরায়রা সত্য বলেছে। ইবনে উমর রা. বললেন : আমরা অনেক কীরাত সওয়াব হারিয়েছি।

৩. জানাযার নামাযের শর্তাবলি : যেহেতু জানাযার নামায একটি নামায, তাই অন্য সকল ফরয নামাযের শর্তাবলি এখানেও বহাল। যেমন দৃশ্যমান নাপাকি থেকে মুক্ত হওয়া, অদৃশ্যমান ক্ষুদ্র ও বড় নাপাকি থেকে মুক্ত হওয়া, কেবলামুখি হওয়া ও সতর ঢাকা। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলতেন : পবিত্রাবস্থায় ব্যতীত জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়। অন্যান্য ফরয নামাযের সাথে এর পার্থক্য হলো, এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় শর্ত নয়। সব সময়ই তা পড়া যায় যখনই মৃতদেহ হাজির হয়। এমনকি হানাফি ও শাফেয়িদের মতে নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যায়। আহমদ, ইবনুল মুবারক ও ইসহাক সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও ঠিক দুপুরের সময় জানাযার নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করেন। অবশ্য যদি বিলম্বে মৃত দেহে বিকৃতি আসার আশংকা থাকে তাহলে তাদের মতে মাকরূহ হবেনা।

৪. জানাযার নামাযের রোকনসমূহ : জানাযার নামাযের কিছু রোকন রয়েছে, যা দ্বারা তার মূল সত্তা গঠিত হয়। এর কোনো একটি রোকনও যদি বাদ যায় তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে তা অগ্রহণযোগ্য হবে। এই আরকান বা মূল উপাদানগুলো হলো:

১. নিয়ত : কেননা আল্লাহ্ তায়ালা সূরা বাইয়েনাতে বলেছেন :

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

"তাদেরকে তো শুধু নিরংকুশভাবে আল্লাহর জন্য আনুগত্য নির্দিষ্ট করে তাঁর ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়েছে।" রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "কাজগুলো শুধু নিয়ত দ্বারাই নির্ণিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে শুধু তাই পায়।" - বুখারি।

ইতিপূর্বে নিয়তের পরিচয় দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, নিয়তের স্থান হলো মন। নিয়ত মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা শরিয়তে বাধ্যতামূলক নয়।

২. যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম তার দাঁড়িয়ে নামায পড়া : অধিকাংশ আলেমের নিকট এটা একটা রোকন বা মূল উপাদান। কাজেই যে ব্যক্তি বিনা ওযরে বাহনে আরোহন করে অথবা বসে বসে জানাযার নামায পড়ে তার নামায শুদ্ধ হবেনা। আল মুগনীতে বলা হয়েছে : বাহনে আরোহণপূর্বক জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়। কেননা তাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার বাধ্যবাধকতা রক্ষিত হয়না। এটা আবু হানিফা, শাফেয়ি ও আবু ছাওরের অভিমত। এ নিয়ে কোনো মতভেদ আমার জানা নেই। নামাযে দাঁড়ানো থাকাকালে অন্যান্য নামাযের মতো ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখা মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেন : এটা মুস্তাহাব নয়। তবে প্রথমোক্ত মতটিই উত্তম।

৩. চারটি তাকবীর : মুসলিম ও বুখারি জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. নাজ্জাশীর ওপর (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়লেন এবং নামাযে চারবার তাকবীর বললেন। তিরমিযি বলেন : রসূল সা. এর সাহাবি ও অন্যান্য আলেমদের অধিকাংশ এই হাদিস অনুসারেই কাজ করে থাকেন। তারা মনে করেন : জানাযার নামাযে চারবার তাকবীর বলতে হয়। এটা সুফিয়ান, মালেক, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকেরও অভিমত।

তাকবীরের সময় হাত উঁচু করা : জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর ব্যতিত আর কোনো তাকবীরে রফে ইদাইন বা হাত উঁচু না করা সুন্নত। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এর পক্ষ থেকে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়না যে, তিনি প্রথম তাকবীর ব্যতীত আর কোনো তাকবীরে হাত উঁচু করেছেন। মতভেদ ও সকল পক্ষের যুক্তি তুলে ধরার পর ইমাম শওকানি বলেন : মোটকথা, প্রথম তাকবীর ব্যতিত আর কোনো ব্যাপারে রসূল সা. থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়না যা দ্বারা প্রমাণ দর্শানো যেতে পারে। শুধুমাত্র সাহাবিদের কাজ ও কথা কোনো অকাট্য প্রমাণ নয়। তাই প্রথম তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাতেই হাত ওঠানো সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা অন্যান্য তাকবীরে হাত ওঠানোর বিধান শরিয়তে নেই। কেবল এক রোকন থেকে আরেক রোকনে যাওয়ার (দাঁড়ানো থেকে রুকুতে, রুকু থেকে সাজদায়) সময় হাত ওঠানোর পক্ষে বর্ণনা পাওয়া যায় অন্যান্য নামাযে। কিন্তু জানাযার নামাযে কোনো উঠাবসা নেই।

৪, ৫ : সূরা ফাতেহা ও রসূল সা. এর ওপর দরূদ ও সালাম নিঃশব্দে পাঠ করা : ইমাম শাফেয়ি তাঁর মুসনাদে আবু উমামা বিন সাহল থেকে বর্ণনা করেছেন : তাকে জনৈক সাহাবি জানিয়েছেন যে, জানাযার নামাযে সুন্নত হলো, ইমাম তাকবীর বলবে, তারপর সূরা ফাতেহা পড়বে প্রথম তাকবীরের পর নিঃশব্দে ও গোপনে। তারপর রসূল সা. এর ওপর দরূদ পড়বে। জানাযার তাকবীরসমূহে দোয়া করবে, কোনো তাকবীরেই কুরআন তেলাওয়াত করবেনা। তারপর গোপনে সালাম ফেরাবে। (অধিকাংশ আলেমের মতে কিরাত এবং রসূল সা. এর ওপর দরূদ ও সালাম গোপনে করাই সুন্নত। কিন্তু ইমাম তাকবীর ও সালাম ফেরানো সশব্দে করবে, যাতে মুক্তাদিরা শুনতে পায়।) ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে : বুখারি তালহা বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তালহা বলেন : আমি ইবনে আব্বাসের সাথে জানাযার নামায পড়লাম। তিনি সূরা ফাতেহা সহকারে পড়লেন এবং বললেন : এটা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। এ হাদিস

তিরমিযিও বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন : কিছু সংখ্যক সাহাবি ও অন্যান্য আলেম এ হাদিস অনুসরণ করেন। তারা তাকবীরে তাহরীমার পর সূরা ফাতেহা পড়া পছন্দ করেন। এটা ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাকেরও মত। কেউ কেউ বলেছেন : জানাযার নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়না। এতে শুধু আল্লাহর প্রশংসা, রসূল সা. এর প্রতি দরূদ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা হয়। ছাওরী ও অন্যান্য কুফাবাসী ফকীহর মতও তাই। যারা সূরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে, তাদের প্রমাণ হলো, রসূলুল্লাহ সা. একে নামায নামে আখ্যায়িত করে বলেছেন : তোমাদের সাথির ওপর নামায পড়। অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়েনা, তার নামায হয়না।

রসূল সা. এর প্রতি দরূদ ও সালামের ভাষা ও স্থান : রসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি দরূদ ও সালাম যে কোনো ভাষায় প্রেরণ করা যায়। কেউ যদি শুধু বলে : "আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মদ" (হে আল্লাহ মুহাম্মদের উপর দরূদ পাঠাও) তবে সেটাই যথেষ্ট হবে। তবে রসূল সা. এর পক্ষ থেকে প্রচলিত ভাষাই সর্বোত্তম। তা হচ্ছে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

এ দরূদ দ্বিতীয়, তাকবীরের পরেই পড়তে হবে। অবশ্য এর নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে হাদিস নেই।

৬. দোয়া : সকল ফকীহ একমত, দোয়া জানাযার নামাযের একটা রোকন তথা অপরিহার্য অংশ। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির ওপর নামায পড়বে তখন তার জন্য নির্দিষ্টভাবে দোয়া করো। -আবু দাউদ, বায়হাকি ইবনে হিব্বান।

এই দোয়া যতো ছোট আকারেরই হোক, যথেষ্ট হবে। তবে মুস্তাহাব হলো নিম্নে বর্ণিত দোয়া মাছুরা (রসূল সা. থেকে প্রচলিত দোয়া) সমূহের যে কোনো একটি পড়া :

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. এক মহিলার জানাযার নামাযে নিম্নরূপ দোয়া করেন :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ لَهَا، فَاغْفِرْلَهَا ذَنْبَهَا.

"হে আল্লাহ, তুমি এই মৃত ব্যক্তির প্রতিপালক, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ, তুমি তাকে জীবিকা দিয়েছো, তুমি তাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছ, তুমি তার প্রাণ সংহার করেছ এবং তুমি তার গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানো। আমরা তার জন্য সুপারিশকারী হিসেবে এসেছি। তুমি তার গুনাহ ক্ষমা করো।"

ওয়ায়িলা ইবনুল আসকা বলেন, রসূলুল্লাহ সা. জনৈক মুসলমানের উপর জানাযার নামায পড়লেন। তখন তাকে বলতে শুনেছি :

اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ. اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"হে আল্লাহ, অমুকের ছেলে অমুক তোমার তত্ত্বাবধানে ও তোমার প্রতিবেশিত্বের আশ্রয়ে চলে গেছে। কাজেই তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো। তুমি সত্যের ও প্রতিশ্রুতির রক্ষক। হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করো, তার উপর করুণা করো, তুমি তো ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" -আহমদ, আবু দাউদ।

আওফ ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, একটি জানাযার নামায পড়ার পর রসূল সা. কে বলতে শুনেছি :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ .

"হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করো, তার ওপর দয়া করো, তার গুনাহ মোচন করো, তাকে নিরাপদ করো, তাকে সম্মানিত করো, তার বাসস্থানের প্রশস্ততা দাও, তাকে পানি দিয়ে ও বরফ দিয়ে ধুয়ে দাও, তাকে সাদা কাপড় যেভাবে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় সেভাবে গুনাহ থেকে পরিষ্কার করো। তাকে দুনিয়ার বাড়ির চেয়ে উত্তম বাড়ি দাও। দুনিয়ার পরিবার পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিবার পরিজন দাও, দুনিয়ার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দাও এবং তাকে কবরের পরীক্ষা ও দোযখের আযাব থেকে মুক্তি দাও।" -মুসলিম।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূল সা. একটি জানাযার নামায পড়লেন এবং বললেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

"হে আল্লাহ, আমাদের জীবিতকে, মৃতকে, ছোটকে, বড়কে, পুরুষকে, নারীকে, উপস্থিতকে ও অনুপস্থিতকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্য থেকে যাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখবে, তাকে ইসলামের অনুসারী করে বাঁচিয়ে রাখো, আর যাকে মৃত্যু দেবে তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও। হে আল্লাহ, এর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করোনা এবং এর পরে আমাদেরকে বিপথগামী করোনা। -আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

মৃত ব্যক্তি যদি শিশু হয় তাহলে এই দোয়া করাও মুস্তাহাব : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا.

"হে আল্লাহ তাকে আমাদের জন্য অগ্রণী, বিনিময় ও সঞ্চিত সম্পদে পরিণত কর। -বুখারি।

নববী বলেছেন : মৃত ব্যক্তি বালক বা বালিকা হলে, "হে আল্লাহ, আমাদের মৃতকে, জীবিতকে....." দোয়াটি পড়বে। সেই সাথে এই দোয়া যোগ করবে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِاَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيْعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا، وَاَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوْبِهِمَا، وَلاَتَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ، وَلاَتَحْرِمْهُمَا اَجْرَهُ.

"হে আল্লাহ, তাকে তার মা বাবার জন্য বিনিময়, অগ্রণী, উপদেশ, শিক্ষা ও সুপারিশকারী বানাও, তার দ্বারা তাদের দাঁড়িপাল্লা ভারি করো, তাদের হৃদয়ে ধৈর্য ঢেলে দাও, তারপরে তার মা বাবাকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করোনা এবং তার সওয়াব থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করোনা।"

দোয়াগুলো পড়ার স্থান ও সময় : শওকানি বলেছেন : হাদিসে সুনির্দিষ্টভাবে এই দোয়াগুলো পড়ার স্থান ও কাল চিহ্নিত করা হয়নি। তাই কেউ ইচ্ছা করলে এসব দোয়া থেকে যেটি যেটি তার ইচ্ছা, সবগুলো তাকবীরের পর অথবা প্রথম তাকবীরের পর, দ্বিতীয় তাকবীরের পর বা তৃতীয় তাকবীরের পর এক সাথেই পড়ে নিতে পারে, অথবা যে কোনো দুটো তাকবীরের মাঝে এগুলোকে ভাগ করে নিতে পারে অথবা প্রত্যেক তাকবীরের পর এর একটা করে পড়ে নিতে পারে, যাতে হাদিসে বর্ণিত সকল দোয়ার ওপর আমল হয়ে যায়।

৭. চতুর্থ তাকবীরের পর দোয়া : চতুর্থ তাকবীরের পর দোয়া করা মুস্তাহাব, চাই তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়া পড়ুক বা না পড়ুক। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফার একটি মেয়ে মারা যায়। তিনি তার ওপর চার তাকবীর পাঠ করেন। চতুর্থ তাকবীরের পর দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ দাঁড়িয়ে দোয়া করেন। তারপর বললেন : রসূলুল্লাহ্ সা. এভাবেই জানাযার নামায পড়তেন। ইমাম শাফেয়ি বলেছেন : এরপর সে বলবে : اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ.

"হে আল্লাহ্, এর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করোনা এবং এরপর আমাদেরকে কোনো পরীক্ষায় নিক্ষেপ করোনা"। আবু হুরায়রার পুত্র বলেছেন : প্রথম যুগের মনীষীগণ চতুর্থ তাকবীরের পর বলতেন : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আল্লাহ্, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে শান্তি দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।"

৮. সালাম : একমাত্র আবু হানিফা ব্যতীত সকল ফকীহ্ একমত হয়ে বলেছেন, সালাম ফরয। তিনি বলেছেন : ডানে ও বামে সালাম করা ওয়াজিব- ফরয নয়। যারা এটিকে ফরয বলেন, তারা তাদের মতের সপক্ষে প্রমাণ দর্শান, জানাযার নামাযও নামায। আর সালাম দ্বারাই নামায সমাপ্ত করার নিয়ম। ইবনে মাসউদ বলেন : জানাযার সালাম ফেরানো নামাযের সালাম ফেরানোর মতোই। এর সর্বনিম্ন ভাষা হলো : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَوْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ.

ইমাম আহমদের মতে, একবার ডান দিকে সালাম ফেরানো সুন্নত। সামনের দিকে সালাম করলেও চলবে। রসূল সা.-এর দৃষ্টান্তও একবার সালাম ফেরানো। সাহাবিদের দৃষ্টান্তও অনুরূপ এবং কেউ তাদের বিরোধিতা না করাই এর প্রমাণ।

ইমাম শাফেয়ি দু'বার সালাম ফেরানোকে মুস্তাহাব মনে করেন। প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে এবং শেষবারে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাম করবে। ইবনে হাযম বলেন : দ্বিতীয় সালাম একটি যিকর ও সওয়াবের কাজ।

জানাযার নামাযের নিয়ম

জানাযার নামায আদায়কারী প্রথমে নামাযের শর্তাবলি পূরণ করবে। তারপর যে মৃত ব্যক্তি, এক বা একাধিক উপস্থিত হয়েছে তার/তাদের ওপর জানাযার নামায পড়ার নিয়ত করবে। তারপর প্রথমে হাত উঁচু করে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। তারপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর বলবে ও রসূল সা. এর ওপর দরূদ পাঠ করবে। তারপর তৃতীয় তাকবীর বলবে ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করবে। তারপর চতুর্থ তাকবীর বলবে, দোয়া করবে ও সালাম ফেরাবে।

১. পুরুষ ও মহিলা মৃত ব্যক্তির জানাযায় ইমাম কিভাবে দাঁড়াবে : সুন্নত হলো, ইমাম পুরুষ মৃত ব্যক্তির মাথা বরাবর এবং স্ত্রী লোকের শরীরের মাঝখান বরাবর দাঁড়াবে। কেননা আনাস রা. থেকে বর্ণিত : আনাস রা. জনৈক পুরুষের জানাযা পড়লেন। তার মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। এরপর আর একটি মহিলার মৃতদেহ এলো। তিনি তার জানাযা পড়লেন। তার মাঝখান বরাবর দাঁড়ালেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন : এভাবেই রসূল সা. পুরুষের জানাযায় আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি সেখানে দাঁড়াতেন এবং মহিলার জানাযায় আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি সেখানে দাঁড়াতেন। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। তাহাবী

বলেছেন : এটাই আমাদের নিকট সর্বোত্তম নিয়ম। কেননা রসূল সা. থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো এই নিয়মকেই সমর্থন করে।

একাধিক মৃত দেহের জানাযা : যখন একাধিক মৃত দেহের সমাবেশ ঘটবে এবং তাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই থাকবে, তখন তাদেরকে ইমাম ও কেবলার মাঝে একজনের পর আরেক জন কাতারবদ্ধ করে রাখবে, যাতে তারা সবাই ইমামের সামনে থাকে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম, তাকে ইমামের কাছাকাছি রাখবে এবং সকলের জানাযার নামায এক সাথে পড়বে।

আর যদি বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষের মৃতদেহ সমবেত হয়, তাহলে পুরুষদের আলাদাভাবে ও মহিলাদের আলাদাভাবে জানাযা পড়া জায়েয। আবার সকলের জানাযা এক সাথেও পড়া বৈধ। পুরুষদেরকে ইমামের সংলগ্ন স্থানে কাতারবন্দী করা হবে। আর মহিলাদেরকে রাখা হবে কেবলা সংলগ্ন স্থানে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : তিনি নয়জন মহিলা ও পুরুষের মৃতদেহের জানাযা একত্রে পড়েন। পুরুষদেরকে ইমামের সংলগ্ন স্থানে এবং মহিলাদেরকে কেবলার সংলগ্ন স্থানে রাখেন ও সবাইকে একই কাতারে কাতারবন্দী করেন। আলী রা.-এর মেয়ে ও উমরের স্ত্রী উম্মে কুলসুমের এবং তার এক ছেলে যায়েদের মৃতদেহ রাখা হয়। সেদিন ইমাম ছিলেন সাঈদ ইবনুল আস। সে সময় ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও কাতাদাহ জানাযাতে উপস্থিত। কিশোর যায়েদকে ইমামের সংলগ্ন স্থানে রাখা হলো। এক ব্যক্তি বলেছেন : আমার এটা অপছন্দ হলো। আমি ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ ও আবু কাতাদার দিকে তাকালাম। আমি বললাম : এটা কী হচ্ছে? তারা বললেন : এটাই সুন্নত। -নাসায়ী ও বায়হাকি।

হাদিসে রয়েছে : যখন কোনো বালক ও মহিলার জানাযা একত্রে পড়া হবে, তখন বালককে ইমামের সংলগ্ন স্থানে এবং মহিলাকে কেবলার সংলগ্ন স্থানে রাখা হবে। আর যখন পুরুষ, মহিলা ও বালকের সমাবেশ ঘটবে, তখন বালকদেরকে পুরুষদের সংলগ্ন স্থানে রাখা হবে।

তিনটে কাতার করা ও কাতার সোজা করা মুস্তাহাব : জানাযার নামাযিরা তিনটে কাতারে দাঁড়াবে (ন্যূনপক্ষে দুই কাতার) এবং কাতারগুলো সোজা হবে- এটা মুস্তাহাব। কেননা মালেক বিন হুবায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মুমিন যদি মারা যায় এবং তার উপর এমন একদল মুসলমান জানাযার নামায পড়ে, যাদের সংখ্যা তিন কাতারের সমান হয়, তাহলে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হয়।" এরপর মালেক ইবনে হুবায়রা লোক সংখ্যা কম হলে তাদেরকে তিন কাতারে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেন। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি। ইমাম আহমদ বলেন : নামাযির সংখ্যা কম হলে তাদেরকে তিন কাতারে দাঁড় করানো উচিত। লোকেরা বললো : নামাযি যদি চারজন হয় তাহলে তাদেরকে কিভাবে দাঁড় করাবে? তিনি বললেন : তাদেরকে দুই কাতারে দাঁড় করাবে, প্রত্যেক কাতারে দু'জন করে। তিনজন হওয়াকে অপছন্দ করা হয়েছে। কেননা তাহলে তো প্রত্যেক কাতারে একজন থাকবে।

জানাযার বড় জামাত হওয়া মুস্তাহাব : জানাযার জামাতে অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হওয়া মুস্তাহাব। কেননা আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মৃত ব্যক্তির ওপর একশো লোক যদি জানাযার নামায পড়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে, তবে তাদের সুপারিশ কবুল হবে। (অর্থাৎ তারা যদি তার জন্য নির্দিষ্টভাবে ও বিশেষভাবে গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করে তবে তার গুনাহ মাফ হবে।) - আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি। আর ইবনে

আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি : কোনো মুসলমান মারা যাওয়ার পর তার জানাযায় যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনা এমন চল্লিশ জন লোক সমবেত হয়, তবে আল্লাহ্ তার জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করবেন। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ।

জানাযার নামাযে যার কিছু অংশ ছুটে যায় : জানাযার নামাযে যে ব্যক্তির কোনো তাকবীর ছুটে যায়। তার জন্য ছুটে যাওয়া তাকবীর তাৎক্ষণিকভাবে কাযা করা মুস্তাহাব। কাযা না করলেও ক্ষতি নেই। ইবনে উমর, হাসান, আইয়ুব সাখতিয়ানী ও আওযায়ী বলেছেন : জানাযার কিছু তাকবীর যদি ছুটে যায় তবে তা কাযা করতে হবেনা। আল মুগনীর গ্রন্থকার শেষোক্ত এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : আমাদের প্রমাণ ইবনে উমরের উক্তি, যার বিরোধিতা কোনো সাহাবি করেছেন বলে জানা যায়নি। আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন : হে রসূলুল্লাহ্, আমি জানাযার নামাযে শরিক হই। কিন্তু কিছু তাকবীর আমি শুনতে পাইনা। তিনি বললেন : "যে তাকবীর শুনতে পাও, সেই তাকবীরেই শামিল হও। আর যেটা ছুটে যায় তার কোনো কাযা করতে হবেনা।" বস্তুত: এটা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। তাছাড়া যেহেতু এই তাকবীরগুলো একটানা, তাই দুই ঈদের তাকবীরের ন্যায় এগুলোর কোনো কাযা করতে হবেনা।

কার জানাযা পড়া যায় এবং কার জানাযা পড়া যায়না : ফকীহগণ একমত যে কোনো মুসলমান, চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক, বয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক, মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়া যাবে। ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলেমদের সর্বসম্মত মত শিশু যখন জীবিত বুঝা যাবে এবং তার কোনো তৎপরতা দ্বারা তার জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাবে (অতপর সেই শিশু মারা যাবে) তার জানাযা পড়া যাবে।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আরোহী মৃত দেহের পেছনে থাকবে, পদব্রজী তার সামনে নিকটেই ডানে বা বামে থাকবে। আর গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তানের জানাযা পড়া হবে এবং তার মা বাবার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করা হবে। -আহমদ ও আবু দাউদ।

এ হাদিসে আরো বলা হয়েছে : পদব্রজী মৃতদেহের পেছনে ও সামনে থাকবে এবং ডানে ও বামে কাছাকাছি থাকবে। অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে : আরোহী থাকবে মৃতদেহের পেছনে। আর পদযাত্রী যেখানে ইচ্ছা। আর শিশুর উপর জানাযার নামায পড়া হবে। -আহমদ, নাসায়ী ও তিরমিযি।

গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তানের জানাযার নামায : গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তান যদি চার মাস পূর্ণ না হয় তাহলে তাকে গোসলও করানো হবেনা, তার জানাযার নামাযও পড়া হবেনা। তাকে একটা ন্যাকড়ায় পেঁচিয়ে দাফন করা হবে। এটা অধিকাংশ ফকীহের মত।

তবে যদি তার বয়স চার মাস বা তার বেশি হয় এবং কান্নাকাটি বা অন্য কোনো উপায়ে তার জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তাকে গোসল করানো ও তার উপর জানাযার নামায পড়া হবে। কিন্তু কোনোভাবে যদি জীবনের লক্ষণ প্রকাশ না করে তাহলে হানাফি, মালেকি, হাসান ও আওযায়ীর মতে তার উপর জানাযার নামায পড়া হবেনা। কেননা তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকি জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : গর্ভচ্যুত সন্তান যদি শব্দ বা নড়াচড়া দ্বারা জীবনের প্রমাণ দিয়ে মারা যায় তবে তার ওপর জানাযার নামায পড়া হবে এবং সে উত্তরাধিকার পাবে। হাদিসে জানাযার নামায পড়ার জন্য মৃত্যুর পূর্বে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াকে শর্ত গণ্য করা হয়েছে। আহমদ, সাঈদ,

ইবনে সিরীন ও ইসহাকের মতে শুধু নামায নয়, তাকে গোসলও করাতে হবে। কেননা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদিসে এই মর্মে নির্দেশ রয়েছে। তাতে রয়েছে : গর্ভচ্যুত সন্তানের উপর জানাযার নামায পড়া হবে। তাছাড়া যেহেতু তা একটা সজীব প্রাণী, তার ভেতরে প্রাণ ঢুকানো হয়েছে। কাজেই জীবনের লক্ষণ প্রকাশকারী শিশুর মতো তার উপর জানাযার নামায পড়া হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. জানিয়েছেন, চার মাসে গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। প্রথমোক্তদের জবাবে তারা বলেন : হাদিসটি অস্পষ্ট এবং তা তার চেয়ে শক্তিশালী হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং তা দ্বারা প্রমাণ দর্শানো চলেনা।

শহীদের জানাযা : শহীদ হলো সেই ব্যক্তি, যে অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধের সময় তাদের হাতে নিহত হয়। অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন বহু সংখ্যক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তার ওপর জানাযার নামায পড়া হবেনা। এসব হাদিস সম্পূর্ণ সহীহ।

১. বুখারি জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ওহুদের শহীদদেরকে তাদের রক্ত সহই দাফন করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে গোসলও করাননি। তাদের জানাযার নামাযও পড়াননি।

২. আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন : ওহুদের শহীদদেরকে তাদের রক্ত সহই দাফন করা হয়েছে। তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয়নি। পক্ষান্তরে অপর কিছু সংখ্যক সহীহ হাদিস এমনও পাওয়া যায়, যা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রমাণ করে যে, শহীদের উপর জানাযার নামায পড়া হবে :

১. বুখারি উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : একদিন রসূলুল্লাহ সা. বেরিয়ে এলেন এবং ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের ওপর আট বছর পর অবিকল জানাযার নামাযের মতো নামায পড়লেন, যেন তিনি জীবিত ও মৃত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন।

২. আবু মালেক গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : ওহুদের নিহতদের মধ্য থেকে নয়জনকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে দশম জন ছিলেন হামযা রা.। তারপর রসূলুল্লাহ সা. তাদের উপর নামায পড়ছিলেন। তারপর তাদেরকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তারপর পুনরায় আরো নয়জনকে আনা হচ্ছিল। হামযা রা. তখনো তার স্থানেই ছিলেন। অবশেষে রসূল সা. তাদের ওপর জানাযার নামায পড়লেন। -বায়হাকি। বায়হাকি বলেন : এ হাদিস মুরসাল হলেও এ অধ্যায়ের সবচেয়ে সহীহ হাদিস।

এসব হাদিসের পরস্পর মতভেদের কারণে ফকীহদের মতামতও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। কেউবা সবকটি হাদিসকেই গ্রহণ করেছেন আবার কেউ কতক হাদিসকে অন্যান্য হাদিসের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

যারা সবকটি হাদিসকেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইবনে হাযম। তিনি জানাযা পড়া ও না পড়া দুটোই বৈধ বলে মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : শহীদের উপর জানাযা পড়লেও ভালো, না পড়লেও ভালো। ইমাম আহমদ থেকে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তার একটিও এই মতের প্রতিধ্বনি করে। ইবনুল কাইয়িম এই মতকে সঠিক বলে রায় দিয়েছেন। তিনি বলেন : এই মাসয়ালায় সঠিক মত হলো, যেহেতু জানাযার পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় রকমের হাদিস রয়েছে, তাই জানাযা পড়া ও না পড়া উভয় ব্যাপারেই স্বাধীনতা রয়েছে। এটাই ইমাম আহমদের একটি মত। এটাই তার মযহাবের মূলনীতির সাথে অধিকতর সাম স্যশীল। তিনি বলেন : ওহুদের শহীদদের ব্যাপারে বাহ্যত যা মনে হয়, তা হচ্ছে, দাফনের সময় তাদের উপর জানাযার নামায পড়া হয়নি। ওহুদে হামযার সাথে সত্তর জন নিহত হয়েছিলেন। কাজেই তাদের উপর জানাযার নামায পড়া হবে অথচ তা গোপন থাকবে এটা অসম্ভব এবং

অবৈধ। তাদের উপর জানাযার নামায পড়া হয়নি এই মর্মে জাবের বিন আব্দুল্লাহর বর্ণিত হাদিসটি বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট। তার পিতা আব্দুল্লাহও সেদিনকার নিহতদের একজন। সুতরাং জাবেরের ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে যতোটা পরিপক্ক তথ্য জানার কথা, অন্য কারো ততোটা নয়। আবু হানিফা, ছাওরী, হাসান, ইবনুল মুসাইয়াব জানাযা পড়ার রেওয়েতকে অগ্রগণ্য মনে করেন। তাদের মতে শহীদের জানাযা পড়া ওয়াজিব। আর মালেক, শাফেয়ী, ইসহাকও একটি বর্ণনা অনুসারে আহমদ এর বিপরীত মতকে অগ্রাধিকার দেন। তারা বলেন : শহীদের উপর জানাযা পড়া হবেনা। শাফেয়ী তার মতকে অগ্রাধিকার দিয়ে তদীয় গ্রন্থ আল উম্মে বলেন : "রসূলুল্লাহ সা. ওহুদের শহীদদের উপর জানাযার নামায পড়েননি এই মর্মে যে হাদিসগুলো এসেছে তা 'মুতাওয়াতির' বর্ণনায় এমনভাবে এসেছে যে চাক্ষুস বিবরণ মনে হয়। আর তিনি তাদের জানাযার নামায পড়েছেন এবং জানাযায় সত্তর বার তাকবীর বলেছেন মর্মে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা সহীহ নয়। যে ব্যক্তি এসব সহীহ হাদিসের বিপরীতে ঐ বর্ণনাগুলো তুলে ধরেছে তার নিজের উপর লজ্জিত হওয়া উচিত ছিলো। পক্ষান্তরে উকবা বিন আমেরের হাদিস নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ ঘটনা আট বছর পরে ঘটেছিল। সম্ভবত তিনি নিজের মৃত্যু আসন্ন জানতে পেরে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার ইচ্ছায় তাদের জন্য দোয়া করেছেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এটা কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত বিধি রহিত প্রমাণ করেনা। (অর্থাৎ শহীদের জানাযা সংক্রান্ত বিধি)

কাফেরদের সাথে যুদ্ধে আহত হয়ে সুস্থ জীবন যাপনের পর যে মারা যায় : যে ব্যক্তি যুদ্ধে আহত হয় এবং তার পর সুস্থ জীবন যাপন করে, তারপর মারা যায়, তাকে গোসলও করানো হবে, তার উপর জানাযার নামাযও পড়া হবে, যদিও তাকে শহীদ গণ্য করা হয়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. সাদ বিন মুয়াযকে গোসল করিয়েছিলেন এবং তার জানাযার নামাযও পড়েছিলেন। একটা তীরের আঘাতে তার হাতের রগ কেটে গিয়েছিল। তারপর তাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করেন। এরপর এক সময়ে তার ক্ষতস্থানটা ফুলে যায় এবং তিনি শহীদী মৃত্যু বরণ করেন।

কিন্তু আহত হবার পর যদি অসুস্থ জীবন যাপন করে, তারপর কথা বলে ও পানাহার করে, তারপর মারা যায়, তাহলে তাকে গোসলও করানো হবেনা, তার জানাযার নামাযও পড়া হবে। আল মুগনী ও ফুতুহুশ শাম গ্রন্থে বলা হয়েছে : এক ব্যক্তি বলেছে, আমি আলীর জন্য কিছু পানি নিলাম। আমার ইচ্ছা ছিলো আমার চাচাতো ভাইকে জীবিত পেলে ঐ পানি থেকে তাকে একটু খাওয়াবো। কিন্তু সহসা হারেস ইবনে হিশামকে পেলাম এবং তাকে পানি খাওয়াতে চাইলাম। এ সময় দেখলাম, এক ব্যক্তি তার দিকে তাকাচ্ছে। হারেস আমাকে ইংগিত করলো তাকে যেন পানি খাওয়াই। তাকে পানি খাওয়াতে তার কাছে গেলাম। দেখলাম, আরেকজন তার দিকে তাকাচ্ছে। অগত্যা সেও আমাকে ইংগিত করলো যেন আমি তাকে পানি খাওয়াই। শেষ পর্যন্ত তারা সবাই মারা গেলো। তাদের কেউই গোসল বা জানাযা পেলোনা। তারা সবাই যুদ্ধের পরে মারা যায়।

শরিয়তের দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর হওয়ায় যে মারা যায় তার জানাযা : যে ব্যক্তি শরিয়তের দণ্ডবিধি কার্যকর হওয়ার কারণে নিহত হয়, তাকে গোসল করানো হবে এবং তার জানাযার নামায পড়া হবে। কেননা বুখারি জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন : বনু আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করলো। রসূলুল্লাহ সা. তাকে উপেক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত সে নিজের অপরাধের ব্যাপারে বারবার সাক্ষ্য দিলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি পাগল নাকি? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি বিবাহিত?

সে বললো : হাঁ। তখন রসূলুল্লাহ সা. তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দিলেন এবং তাকে ঈদগাহে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। পাথরের আঘাতে এক পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে সে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলে তাকে পাকড়াও করে আবার পাথর মারা হলো এবং সে মারা গেলো। এরপর রসূলুল্লাহ সা. তার প্রশংসা করলেন এবং তার জানাযা পড়লেন। ইমাম আহমদ বলেছেন : গণিমতের মাল বন্টনের আগে আত্মসাতকারী ও আত্মহত্যাকারী ব্যতিত আর কারো জানাযার নামায রসূল সা. বর্জন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

গণিমতের মাল আত্মসাতকারী, আত্মহত্যাকারী ও অন্যান্য পাপাচারির জানাযা : অধিকাংশ আলেমের মতে, আত্মহত্যাকারী; গণিমতের মাল আত্মসাতকারী ও যাবতীয় পাপাচারির জানাযা পড়া হবে। নববী বলেছেন : কাযী বলেন, সকল শাস্তিপ্রাপ্ত মুসলমানের ওপর, আত্মহত্যাকারীর উপর এবং জারজ সন্তানের ওপর জানাযার নামায পড়া হবে। রসূল সা. আত্মসাতকারী ও আত্মহত্যকারীর জানাযা পড়েননি মর্মে যে হাদিস পাওয়া যায়, তার উদ্দেশ্য সম্ভবত এ কাজের জন্য তিরস্কার করা ও ভর্ৎসনা করা, যেমন তিনি ঋণ গ্রস্তের জানাযা পড়েননি। কিন্তু সাহাবিদেরকে জানাযা পড়ার আদেশ দিয়েছেন।

ইবনে হাযম বলেছেন : সকল মুসলমানের জানাযার নামায পড়া হবে, চাই সে সৎ হোক বা পাপী হোক, কোনো দণ্ডবিধিতে শাস্তিপ্রাপ্ত হোক বা বিদ্রোহে নিহত হোক বা যুদ্ধে নিহত হোক। সরকারি প্রশাসক বা অন্য কেউ তার জানাযা পড়বে। অনুরূপ, বেদাতী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি যদি কুফরের পর্যায়ে না গিয়ে থাকে এবং আত্মহত্যাকারী ও খুনীরও জানাযা পড়া হবে যদি সে মুসলমান অবস্থায় মারা যায়। চাই সে পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধীই হোক না কেন। কেননা রসূল সা. এর উক্তি : তোমাদের সাথির ওপর তোমরা নামায পড়ো" ব্যাপক অর্থবোধক উক্তি। প্রত্যেক মুসলমানই আমাদের সাথী। আল্লাহ বলেছেন : মুমিনরা পরস্পরের ভাই।" তিনি আরো বলেছেন : মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক।" সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাযার নামাযের বিপক্ষে কথা বলে, সে অত্যন্ত মারাত্মক কথা বলে। আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য লোকের চেয়ে একজন ফাসেক তার মুসলমান ভাইদের দোয়ার অধিকতর মুখাপেক্ষী।

সহীহ হাদিসে বর্ণিত, খয়বরে এক ব্যক্তি মারা গেলো। রসূল সা. বললেন : তোমরা তোমাদের সাথির জানাযা পড়ো। সে আল্লাহর পথে আত্মসাৎ করেছে। পরে তার জিনিসপত্র তল্লাশী করে একটা সুতা পাওয়া গেলো, যার দাম দুই দিরহামের বেশি নয়।

আতা থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত : তিনি জারজ সন্তানের, তার মায়ের, পরস্পরকে অভিসম্পাতকারী স্বামী স্ত্রীর, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানোর অপরাধে নিহতের জানাযা পড়েছেন। আতা বলেছেন : যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে, তার জানাযা আমি বর্জন করবোনা।

ইবরাহীম নখয়ী থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : মুসলমানদের কেবলামুখি হয়ে নামায পড়ে এমন এমন কারো জানাযা ইসলামের প্রথম যুগে বর্জন করা হতোনা। যে আত্মহত্যা করেছে, তার জানাযা পড়া হবে। যে শাস্তিস্বরূপ প্রস্তারাঘাতে নিহত হয়েছে, তার জানাযা পড়া সুন্নত। কাতাদা বলেছেন : লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এমন কারো জানাযা পড়তে কোনো আলেম অস্বীকার করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইবনে সিরীন বলেছেন : মুসলমানদের কেবলা মানে এমন কারো জানাযা উপেক্ষা করতে কাউকে দেখিনি।

আবু গালেব থেকে বর্ণিত, আবু উমামা বাহেলীকে বললাম : মদখোরের জানাযা পড়া যাবে কি? তিনি বললেন : হাঁ। কেননা হয়তো সে কখনো বিছানায় শুয়ে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং

তাতেই তার গুনাহ মাপ হয়ে গেছে। হাসান বলেছেন : যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে ও কেবলামুখি হয়ে নামায পড়েছে তার জানাযা পড়া হবে। এটা তো সুপারিশ মাত্র।

কাফেরের জানাযা : কোনো কাফেরের জানাযা পড়া জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَقَالَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ.

"তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়োনা এবং তার কবরের উপর দাঁড়িওনা। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে।" আল্লাহ আরো বলেছেন : "নবীর জন্য ও মুমিনদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, মোশরেকদের জন্য তারা দোযখবাসী জানার পরও ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তার আত্মীয় হয়।" আর ইবরাহীম যে তার পিতার জন্য ক্ষমা চেয়েছিল সেটা কেবল তার সাথে কৃত তার ওয়াদা পালনের জন্য। পরে যখন সে জেনেছে সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।" অনুরূপ, মোশরেকদের ছেলে মেয়েদেরও জানাযা পড়া হবেনা। কেননা তারা তাদের পিতামাতার বিধির আওতাভুক্ত। তবে আমরা যাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করেছি তাদের কথা স্বতন্ত্র যেমন তার বাবা মার একজন ইসলাম গ্রহণ করেছে। অথবা মা বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মারা গেছে বা বন্দী হয়েছে অথবা বাবা মার কোনো একজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ ধরনের ছেলেমেয়ে মারা গেলে তার জানাযা পড়া হবে।

কবরের উপর জানাযা : মৃত ব্যক্তির উপর তার দাফনের পূর্বে জানাযার নামায পড়া হয়ে থাকলেও দাফনের পর তার কবরের উপর যে কোনো সময় জানাযার নামায পড়া যায়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. ওহুদের শহীদদের উপর আট বছর পর জানাযা পড়েছেন। যায়েদ বিন ছাবেত রা. থেকে বর্ণিত : একদা আমরা রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে বের হলাম। যখন জান্নাতুল বাকীতে গেলাম, তখন তিনি একটা নতুন কবর দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার কবর? তাঁকে বলা হলো : অমুক মহিলার। তিনি মহিলাকে চিনলেন এবং বললেন : তোমরা আমাকে (তার মৃত্যু ও জানাযার) খবর জানাওনি কেন? সাহাবিগণ বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আপনি দুপুরে ঘুমাচ্ছিলেন। তাই আপনাকে কষ্ট দেয়া আমরা সমীচীন মনে করিনি। তিনি বললেন : এমন কাজ আর করোনা যতদিন আমি তোমাদের মধ্যে জীবিত আছি, ততদিন কেউ মারা গেলে আমাকে অবশ্যই জানাবে। কেননা আমার সালাত তার জন্যে রহমতস্বরূপ। তারপর তিনি কবরের কাছে এলেন এবং আমাদেরকে তার পেছনে কাতারবন্দী করলেন। অতপর তার ওপর চার তকবীর সহকারে জানাযা নামায পড়লেন। -আহমদ, নাসায়ী, বায়হাকি, হাকেম, ইবনে হিব্বান।

তিরমিযি বলেন, সাহাবিগণসহ, অধিকাংশ আলেম এই হাদিস অনুসারে কাজ করেছেন। শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাকের অভিমতও তদ্রূপ। হাদিসে আরো বলা হয়েছে : সাহাবিগণ দাফনের পর উক্ত মহিলার জানাযা পড়েছিলেন। রসূল সা. তার কবরের উপর জানাযার নামায পড়েন। সাহাবিগণ তো জানাযা ব্যতিত তাকে দাফন করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

রসূল সা. এর সাথে কবরের উপর সাহাবিগণের জানাযা পড়া থেকে প্রমাণিত হয়, এটা শুধু রসূল সা. এর সাথে নির্দিষ্ট নয়।

ইবনুল কাইয়েম বলেন : এই হাদিসগুলো শাব্দিকভাবে অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন হলেও এগুলোর বিপরীতমুখি হাদিস বর্তমান থাকায় এগুলো জটিল হাদিসে পরিণত হয়েছে। সে হাদিস হলো : তোমরা কবরগুলোর উপর বসোনা এবং নামায পড়োনা।" এটাও সহীহ্ হাদিস। যিনি একথা বলেছেন, তিনিই আবার কবরের উপর নামায পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ হাদিস দুটি পরস্পর বিরোধী নয়। মৃত ব্যক্তির লাশের উপর যে জানাযা নামায পড়া হয় তার জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট নেই। বরঞ্চ সে নামায মসজিদে পড়ার চেয়ে মসজিদের বাইরে পড়া উত্তম। সুতরাং তার কবরের উপর পড়া জানাযা তার লাশের উপর পড়া জানাযা নামাযেরই পর্যায়ভুক্ত। উভয় নামায একই মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই পড়া হয়েছে চাই নামায কবরের উপর পড়া হোক বা লাশের উপর পড়া হোক- তাতে কোনো পার্থক্য নেই। অথচ অন্যান্য নামাযের ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা অন্যান্য নামায কবরের উপর পড়া শরিয়ত সম্মত নয়। (শেষোক্ত হাদিসটিতে রসূল সা. এটা নিষেধ করেছেন)। কেননা এতে করে কবরকে মসজিদে পরিণত করার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এটা যারা করে, রসূল সা. তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। কাজেই যে কাজের কর্তাকে তিনি অভিসম্পাত করেছেন, যে কাজ থেকে সতর্ক করেছেন এবং যে কাজের কর্তাকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন, যেমন বলেছেন : "কেয়ামত সংঘটিত হবার সময় যারা জীবিত থাকবে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে, তারাই নিকৃষ্টতম মানুষ", সে কাজের সাথে এই কাজের তুলনা কীভাবে করা যায় (অর্থাৎ কবরের উপর জানাযার নামায সাধারণ নামায নয়) যা তিনি বারংবার করেছেন।

গায়েবানা জানাযা : অনুপস্থিত মৃত ব্যক্তির উপর গায়েবানা জানাযা পড়া যায়, চাই স্থানটা মৃত ব্যক্তি থেকে দূরে হোক বা কাছে হোক। জানাযা নামায আদায়কারী কেবলামুখি হয়ে দাঁড়াবে। যে স্থানে মৃত ব্যক্তি রয়েছে, সেটা যদি কেবলার দিকে না হয়, তাহলে তার ওপর নামায পড়ার নিয়ত করবে। তকবীর ও অন্য সব কাজ উপস্থিত মৃত ব্যক্তির উপর জানাযা পড়তে হলে যেভাবে করতে হয় সেভাবেই করবে। কেননা সব কটা সহীহ্ হাদিস গ্রন্থে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : যেদিন নাজ্জাশী মারা গেলেন, সেদিন রসূলুল্লাহ সা. তার জানাযা পড়ার জন্য লোকজনকে আহ্বান করলেন এবং তাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গেলেন। সেখানে সাহাবিগণকে কাতারবন্দী করলেন এবং চারটি তকবীর বললেন।" ইবনে হাযম বলেছেন : অনুপস্থিত মৃত ব্যক্তির উপর একজন ইমাম ও জামাত সহকারে জানাযা পড়া হবে। রসূল সা. নাজ্জাশীর জানাযা পড়েছিলেন, যিনি মারা গিয়েছিলেন আবিসিনিয়ায়। তার সাথে তার সাহাবিগণ কাতারবন্দী হয়ে নামায পড়েন। এটা তাদের সর্বসম্মত মত যা অলংঘনীয়। আবু হানিফা ও মালেক এ মতের বিরোধী। তবে তাদের মতের স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই।

মসজিদে জানাযার নামায : মসজিদে জানাযার নামায পড়তে বাধা নেই যদি মসজিদ অপবিত্র হবার আশংকা না থাকে। কেননা আয়েশা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন : রসূল সা. সুহাইল বিন বায়দার উপর মসজিদেই জানাযা পড়েছিলেন। আর সাহাবিগণ আবু বকর ও ওমরের জানাযা মসজিদেই পড়েছিলেন। এতে কেউ আপত্তি তোলেনি। কেননা এটা অন্যান্য নামাযের মতোই একটা নামায।" ইমাম মালেক ও আবু হানিফার নিকট এটি মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা পড়বে, সে কিছুই পাবেনা।" (অর্থাৎ সওয়াব পাবেনা।) তবে এ হাদিস রসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবিদের কাজের বিপরীত। তাছাড়া হাদিসটি দুর্বলও। আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন : এটি দুর্বল হাদিস। তবে আলেমগণ এ হাদিসকে সহীহ্ বলেছেন এবং বলেছেন : সুনানে আবু দাউদের বিশুদ্ধ কপিতে এ হাদিসটির ভাষা হলো : যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা পড়বে তার কোনো ক্ষতি হবেনা (অর্থাৎ গুনাহ

হবেনা)। ইবনে কাইয়েম বলেছেন : মসজিদে জানাযার নামায রসূল সা. এর নিয়মিত সুন্নত ছিলনা। তার আমলে ওযর ব্যতিত মসজিদের বাইরেই জানাযা পড়া হতো। কেবল মাঝে মাঝে মসজিদে পড়তেন, যেমন ইবনে বায়দার জানাযা। মসজিদের বাইরে ও ভেতরে উভয় পন্থায়ই জানাযা জায়েয। তবে মসজিদের বাইরে পড়াই উত্তম।

একাধিক কবরের মাঝখানে জানাযার নামায পড়া : কবরস্থানে কিছু সংখ্যক কবরের মাঝে জানাযার নামায পড়া অধিকাংশ আলেম মাকরূহ মনে করেন। আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা. থেকে এটি বর্ণিত। এ অভিমত আতা, নাসায়ী, শাফেয়ী, ইসহাক ও ইবনুল মুনযিরেরও। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, কবর ও হাম্মাম (পায়খানা, পেশাবখানা ও গোসলখানার একীভূত স্থানকে হাম্মাম বলা হয়।) ব্যতিত সমগ্র পৃথিবীটাই মসজিদ। আহমদ থেকে প্রাপ্ত এক বর্ণনায় বলা হয় : কবরস্থানের মাঝে জানাযার নামায পড়ায় বাধা নেই। কেননা রসূল সা. কবরস্থানে গিয়ে একটি কবরের উপর জানাযা পড়েছেন। জান্নাতুল বাকীর কবরসমূহের মাঝে আয়েশার কবরের উপর আবু হুরায়রা জানাযা পড়েছিলেন। সেই জানাযায় ইবনে উমরও উপস্থিত ছিলেন। উমর ইবনে আব্দুল আযীযও পড়েছেন।

মহিলারাও জানাযার নামায পড়তে পারবে : পুরুষের মতো মহিলারও জানাযা নামায পড়া বৈধ, চাই একাকিনী পড়ুক কিংবা জামাতের সাথে। উমর রা. উম্মে আব্দুল্লাহর (স্বীয় স্ত্রীর) জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে উম্মে আব্দুলাহ একাকিনী (জামাতে না পেয়ে) উতবার জানাযা পড়েন। আর আয়েশা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের মৃতদেহ নিয়ে আসতে বলেছিলেন তার জানাযা পড়ার জন্য। নববী বলেন : অন্যান্য নামাযের মতো জানাযাও জামাতে পড়া মহিলাদের জন্য সুন্নত হওয়া উচিত। হাসান বিন সালেহ, সুফিয়ান ছাওরী, আহমদ ও হানাফিগণও এই মত পোষণ করেন। মালেক বলেছেন : মহিলারা একাকিনী জানাযা পড়বে।

জানাযার নামাযের ইমামতিতে অগ্রাধিকার : জানাযার নামাযের ইমামতিতে কার অগ্রাধিকার এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একটি মত হলো : সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার মৃত ব্যক্তি যাকে ওসিয়ত করে যায় তার, তারপর শাসকের, তারপর পিতা ও তদুর্ধ্ব, তারপর পুত্র ও তদনিম্ন, তারপর নিকটতম পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়। এটা মালেকী ও হাম্বলীদের মত। অন্য মত হলো : সর্বপ্রথম পিতা, তারপর দাদা, তারপর ছেলে, তারপর পৌত্র, তারপর ভাই, তারপর ভ্রাতুষ্পুত্র, তারপর বাবা, তারপর চাচাতো ভাই, পৌত্রিক আত্মীয় ধারাক্রম অনুযায়ী। এটা শাফেয়ি ও আবু ইউসুফের মত। আবু হানিফা ও মুহাম্মদ বিন হাসানের মত হলো, প্রথমে প্রাদেশিক শাসক যদি উপস্থিত থাকে, তারপর বিচারক, তারপর এলাকার শাসক, তারপর মৃত মহিলার অভিভাবক। তারপর পৈত্রিক আত্মীয়তার ধারাক্রম অনুযায়ী নিকটতম আত্মীয়। তারপর অবশিষ্টদের মধ্যে নিকটতম। পিতা ও পুত্র এক সাথে উপস্থিত থাকলে পিতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

কফিন বহন ও শবযাত্রা

কফিন বহনে শরিয়ত মোতাবেক নিম্নোক্ত কাজগুলো বাঞ্ছনীয় : ১. কফিন বহন করে নিয়া যাওয়া ও তার অনুসরণ করা। সুন্নত হলো, শবের চারপাশে বহনকারীদের স্থান বদলানো, যাতে তারা সকল দিক ঘুরে আসে। ইবনে মাজাহ, বায়হাকি, ও আবু দাউদ তায়ালিসি ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন : ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃতদেহকে অনুসরণ করে (অর্থাৎ কবরে নিয়ে যায়) সে যেন খাটিয়ার সকল দিকে পর্যায়ক্রমে বহন করে। কেননা এটা সুন্নত। (সাহাবি কর্তৃক কোনো জিনিসকে সুন্নত আখ্যায়িত করার অর্থ দাঁড়ায়, ঐ জিনিস স্বয়ং

রসূল সা. কর্তৃক প্রচলিত) তারপর ইচ্ছা করলে স্বেচ্ছায় আরো এগিয়ে যাবে, নচেত বাদ দেবে। আর আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রোগীকে দেখতে যাও এবং শবযাত্রায় শরিক হও। এটা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। -আহমদ।

২. কফিন যাত্রায় ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততা : আবু হুরায়রা রা. থেকে সবকটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ বর্ণনা করেছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মৃতদেহকে তাড়াতাড়ি কবরে নিয়ে যাও। সে যদি ভালো লোক হয়, তাহলে তাকে তার উত্তম প্রতিদানের নিকট পৌঁছে দেবে। নচেত (অর্থাৎ মন্দ লোক হলে) তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে আপদ সরিয়ে ফেলবে। আহমদ, নাসায়ী প্রমুখ আবু বাকরা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু বাকরা বলেছেন : আমরা আমাদের সাথে রসূলুল্লাহ সা.কে শবযাত্রায় চলতে দেখেছি। মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আমরা ঘাড় দুলিয়ে জোরে জোরে চলছিলাম।" ইমাম বুখারি তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. এতো দ্রুত চলেছিলেন যে, আমাদের জুতোগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিল। এটা ঘটেছিল সাদ ইবনে মুয়াযের মৃত্যুর দিন।" ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে : মোটকথা হলো মৃতদেহকে দ্রুত কবরে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। তবে এমনভাবে দ্রুত নিয়ে যেতে হবে, যাতে মৃত দেহের কোনো ক্ষতি বা বিকৃতি ঘটা এবং বহনকারী ও অনুসারীদের মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট হওয়ার আশংকা না দেখা দেয়। আর এই দ্রুততার পরিণাম যেন পরিচ্ছন্নতা বিনষ্ট হওয়া ও মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া না হয়। কুরতুবী বলেছেন : হাদিসটির উদ্দেশ্য হলো, মৃতকে দাফন করতে যেন বিলম্ব না হয়। কেননা বিলম্ব অনেক সময় আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের জন্ম দেয়।

৩. মৃতদেহের সামনে দিয়ে, পেছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে ও বাম দিক দিয়ে নিকট দিয়ে চলা। এর প্রত্যেকটি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে।

অধিকাংশ আলেম সামনে সামনে চলা পছন্দ করেন। তারা বলেন : এটাই উত্তম। কেননা রসূল সা. আবু বকর ও উমর সামনে দিয়েই চলতেন। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ হানাফিদের মতে পেছনে পেছনে চলা উত্তম। কেননা রসূল সা. কর্তৃক মৃত দেহের অনুসরণের আদেশ দান দ্বারা এটাই বুঝা যায়। অনুসরণকারী তাকেই বলা হয় যে পিছে পিছে চলে।

আনাস ইবনে মালেক মনে করেন, সবই সমান। কেননা ইতিপূর্বে রসূল সা.-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে : আরোহী চলবে শবের পেছনে পেছনে, পদাতিক চলবে আগে, পিছে, ডানে ও বামে, কাছাকাছি অবস্থানে।

বলাবাহুল্য, সব পন্থাই বৈধ। বৈধ পন্থাগুলোর মধ্যেই এ মতভেদ সীমিত। এ পন্থাগুলোর মধ্যে উদারতা ও নমনীয়তাই কাম্য। কেননা আব্দুর রহমান বিন আবি আবযা থেকে বর্ণিত : আবু বকর ও উমর শবের আগে আগে চলতেন, আর আলী চলতেন পেছনে। তাই আলীকে বলা হলো : ওরা দুজন তো আগে আগে চলেন। আলী বললেন : ওরাও জানেন, আগে আগে চলার চেয়ে পেছনে পেছনে চলা উত্তম। যেমন পুরুষের একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাতে নামায পড়া উত্তম। তবে ওরা দুজন উদারপন্থী। মানুষের জন্য (দ্বীনকে) সহজ করতে চান।" -বায়হাকি, ইবনে আবি শায়বা। শবযাত্রায় অংশ নেয়ার সময় বিনা ওযরে বাহনে আরোহণ করাকে অধিকাংশ আলেম মাকরূহ মনে করেন। তবে ফিরতি যাত্রায় মাকরূহ মনে করেনা। কেননা ছাওবান বলেন : রসূল সা. যখন একটি মৃতদেহের সাথে চলছিলেন, তাকে একটা জন্তু এনে দেয়া হলো। কিন্তু তিনি তাতে আরোহণ করলেন না। তারপর যখন প্রত্যাবর্তন করলেন,

তখন একটা জন্তু এনে দেয়া হলে তার পিঠে আরোহণ করলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : যাওয়ার সময় ফেরেশতারা হেঁটে যাচ্ছিলেন। তারা হেঁটে যাওয়া অবস্থায় আমি জন্তুর পিঠে আরোহণ করতে পারি না। তারা যখন চলে গেলো, তখন আমি আরোহণ করলাম। -আবু দাউদ, বায়হাকি ও হাফেজ। আর রসূল সা. ইবনুদ দাহদাহের জানাযায় হেঁটে গেলেন এবং ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এলেন। -তিরমিযি। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত রসূল সা. এর উক্তি "আরোহী চলবে শবের পেছনে পেছনে" এই হাদিসের বিরোধী নয়। কেননা ঐ হাদিস দ্বারা হয়তো আরোহী হয়ে চলাকে মাকরূহ ও বৈধ প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য। হানাফিদের মতে, আরোহী হয়ে যাওয়াতে কোনোই আপত্তি নেই। তবে হেঁটে যাওয়াই উত্তম। অবশ্য ওযর থাকলে ভিন্ন কথা। আরোহীর জন্য সুন্নত হলো, শবের পেছনে থাকা। খাত্তাবী বলেন : আরোহীর শবের পেছনে থাকার প্রশ্নে কোনো মতভেদ আমার জানা নেই।

৫. জানাযা ও দাফন কাফনে যা যা মাকরূহ

জানাযা ও দাফন কাফনে নিম্নোক্ত কাজগুলো মাকরূহ :

১. উচ্চস্বরে যিকির করা বা কুরআন বা অন্য কিছু পাঠ করা। ইবনুল মুনযির বলেছেন : আমরা কায়েস ইবনে উবাদা থেকে বর্ণনা শুনেছি, তিনি বলেছেন : রসূল সা. এর সাহাবিগণ তিন সময়ে উচ্চস্বরে উচ্চারণ অপছন্দ করতেন। জানাযায় (জানাযার নামায, কাফন দাফন ও শবযাত্রাসহ) যিকরে ও যুদ্ধে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, সাঈদ বিন জুবাইর, হাসান, নাখয়ী, আহমদ ও ইসহাক জানাযার সময় "আপনারা মৃত ব্যক্তির মাগফেরাত কামনা করুন" এ কথা বলাও মাকরূহ মনে করেন। আওযায়ীর মতে এটি বিদয়াত।

ফুযাইল বিন আমর বলেছেন : ইবনে উমর একটি জানাযায় ছিলেন। সহসা শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি বলছে : আপনারা সবাই মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফেরাত কামনা করুন। আল্লাহ তাকে মাফ করবেন। ইবনে উমর তৎক্ষণাৎ বললেন : আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন না। নববী বলেন : জানাযার পর লাশ দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় প্রাচীন মনীষীদের নীরবতা অবলম্বনের নীতি সম্পূর্ণ সঠিক। তাই কোনো দোয়া, যিকর বা কুরআন পাঠ উচ্চস্বরে করা যাবেনা। জানাযা সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানে চিন্তার স্থিরতা ও মনের প্রশান্তি প্রয়োজন এবং সেজন্য নীরবতাই যথার্থ। এটা নির্ভুল মত। যতো বিরোধিতাই করা হোক, এই নীতি বর্জন করা উচিত নয়। জানাযার সময় এক ধরনের অজ্ঞ লোকেরা লম্বা করে টেনে টেনে বিভিন্ন সূরা কিরাত বা দোয়া পড়ে যা সম্পূর্ণ নিষেধ।

উচ্চস্বরে যিকির করা সম্পর্কে শেখ মুহাম্মদ আবদুহুর একটা ফতোয়া রয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন : মৃতদেহ বহনকারির জন্য উচ্চস্বরে যিকির করা মাকরূহ। আল্লাহর যিকির করতে চাইলে মনে মনে করবে। উচ্চস্বরে যিকির করা একটা নব উদ্ভাবিত জিনিস। যা রসূল সা., তার সাহাবিগণ, তাবেয়ীগণ এবং তাবে তাবেয়ীগণের আমলে ছিলনা। সুতরাং এটা বন্ধ করা অত্যাবশ্যক।

২. আগুন সাথে করে কফিনের অনুসরণ করা। কেননা এটা জাহেলিয়াতের কাজ। ইবনুল মুনযির বলেন : যতো জ্ঞানী গুণী মনীষীর কথা আমার মনে আছে, তারা সকলেই এটা অপছন্দ করতেন। বায়হাকি বলেছেন : আয়েশা, উবাদা ইবনে সামেত, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরি ও আসমা বিনতে আবু বকর মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করে গিয়েছেন যেন কেউ তাদের লাশের পেছনে পেছনে আগুন সহকারে না চলে। ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন : আবু মূসা আশয়ারি মুমূর্ষ অবস্থায় বলেছিলেন : তোমরা কোনো ধুপধুনী সহকারে আমার লাশের অনুসরণ করোনা।

লোকেরা বললো : এ বিষয়ে কি রসূল সা. এর কাছ থেকে কিছু শুনেছেন : তিনি বললেন : হা, রসূল সা. থেকে।"

অবশ্য দাফন প্রক্রিয়া যদি রাতের বেলা হয় এবং আলোর প্রয়োজনে আগুন জ্বালাতে হয় তাহলে ক্ষতি নেই। তিরমিযি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. রাত্রিকালে একটি কবরে গমন করলেন। তখন সেখানে তার জন্য একটা আলো জ্বালানো হলো।

৩. লাশকে মাটিতে রাখার আগে শবযাত্রীদের যাত্রা বিরতি দিয়ে কোথাও বসা : বুখারি বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো লাশ দাফনের জন্য যাত্রা করে, সে যেন বহনকারিদের ঘাড় থেকে লাশ নামানোর আগে না বসে। যদি বসে তবে তাকে উঠতে আদেশ দেয়া হবে। এরপর আবু সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমরা লাশ দেখবে, তখন ওঠো। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে, সে যেন লাশ মাটিতে রাখার আগ পর্যন্ত না বসে। সাঈদ মাকরারি থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন : আমরা একটা শবযাত্রায় ছিলাম। এই সময় আবু হুরায়রা মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং দুজনেই লাশ নামানোর আগে বসে পড়লেন। আবু সাঈদ এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেন, ওঠো। রসূল সা. আমাদেরকে এটা করতে (লাশ নামানোর আগে বসতে) নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা বললেন : উনি সত্য বলেছেন। হাকেম আরো বর্ণনা, করেছেন : মারওয়ানকে যখন আবু সাঈদ উঠতে বললেন তখন তিনি উঠলেন। তারপর বললেন : তুমি আমাকে উঠালে কেন? তখন তিনি হাদিসটি উল্লেখ করলেন। তারপর তিনি আবু হুরায়রাকে বললেন : তুমি আমাকে জানাওনি কেন? তিনি বললেন : আপনি ইমাম ছিলেন। আপনি যখন বসলেন, তখন আমিও বসলাম।"

এটা অধিকাংশ সাহাবি, তাবেয়ী, হানাফি, হাম্বলি এবং আওযায়ি ও ইসহাকের অভিমত। শাফেয়ি বলেছেন : শবযাত্রীদের জন্য লাশ নামানোর আগে বসা মাকরূহ নয়। তবে এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত, যে ব্যক্তি লাশের আগে আগে চলে, তার জন্য লাশ তার কাছে পৌঁছার আগে বসায় দোষ নেই। তিরমিযি বলেন : কোনো কোনো আলেম থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. এর সাহাবিগণ ও অন্যেরা লাশের আগে আগে চলে যেতেন এবং লাশ তাদের কাছে পৌঁছার আগেই তারা বসতেন। এটাই ইমাম শাফেয়ির মত। তারপর যখন লাশ পৌঁছে যেতো, তিনি উঠতেন না। আহমদ বলেছেন : কেউ যদি দাঁড়ায় আমি তাকে দোষ দেইনা, আর যদি বসে তবে তাতেও ক্ষতি নেই।

৪. লাশ অতিক্রম করার সময় দাঁড়ানো : আহমদ ওয়াকেদ বিন আমর বিন সাঈদ বিন মুয়ায থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : বনু সালেমা গোত্রে একটি জানাযা দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তখন নাফে বিন জুবাইর আমাকে বললেন : তুমি বসো। আমি তোমাকে অকাট্য প্রমাণ দিয়ে এ সম্পর্কে বলছি। মাহমুদ বিন হাকেম যুরকী আমাকে জানিয়েছেন : তিনি আলী বিন আবু তালেবকে বলতে শুনেছেন : রসূল সা. আমাদেরকে লাশ দেখে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজে বসলেন এবং আমাদেরকে বসতে আদেশ দিলেন। মুসলিমের বর্ণনার ভাষা এ রকম : আমরা রসূলুল্লাহ সা. কে দাঁড়াতে দেখলাম, তাই আমরা দাঁড়ালাম। তারপর তিনি বসলেন। তাই আমরা বসলাম। অর্থাৎ লাশ সম্পর্কে। তিরমিযি বলেছেন : আলীর এ হাদিস সহীহ, ভালো এবং চারজন তাবেয়ী একজন অপর জন থেকে বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো আলেম এ হাদিস অনুসারেই কাজ করেন। শাফেয়ি বলেন : এ বিষয়ে এটাই সবচেয়ে নির্ভুল বর্ণনা। এ হাদিস প্রথমোক্ত হাদিসকে রহিত করে যাতে বলা হয়েছে : "লাশ দেখলেই তোমরা উঠে দাঁড়াও। আহমদ বলেছেন : কেউ ইচ্ছা করলে দাঁড়াবে। ইচ্ছা করলে

বসবে। তার প্রমাণ হলো, রসূল সা. একবার দাঁড়িয়েছেন, আবার বসেছেন এই মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মালেকিদের মধ্য থেকে ইসহাক ইবনে হাবীব ও ইবনুল মাজেশুন আহমদের মতের সাথে একমত। নববী বলেন : দাঁড়ানোটা মুস্তাহাব- এটাই গৃহীত।

ইবনে হাযম বলেছেন : লাশ দেখার পর দাঁড়ানো মুস্তাহাব, যতোক্ষণ তা দর্শককে পেছনে রেখে চলে না যায় অথবা তাকে মাটিতে না রাখা হয়, চাই তা কাফেরের লাশ হোক না কেন। তবে না দাঁড়ালেও দোষ নেই। যারা মুস্তাহাব বলেন তাদের প্রমাণ হলো, সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে আমের বিন রবীয়া থেকে বর্ণিত হাদিস। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমরা লাশ দেখবে, তখন তার জন্য দাঁড়াবে, যতক্ষণ না তা তোমাদেরকে পেছনে রেখে চলে যায় কিংবা মাটিতে রাখা হয়। আর আহমদ বর্ণনা করেন : ইবনে উমর যখনই লাশ দেখতেন, অমনি উঠে দাঁড়াতেন, যতোক্ষণ না তা তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। আর বুখারি ও মুসলিম সাহল বিন হানিফ ও কায়েম বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে কাদেসিয়ায় বসেছিলেন : সহসা তাদের সামনে একদল লোক একটি লাশ নিয়ে গেলো। তা দেখে তারা উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাদেরকে বলা হলো : এ লাশ তো যিম্মীদের। (অর্থাৎ অমুসলিমদের) তারা উভয়ে বললেন : রসূলুল্লাহ সা. এর কাছ দিয়ে একটা লাশ অতিক্রম করেছিল। তা দেখে তিনি দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে বলা হলো : ওটা তো জনৈক ইহুদীর লাশ। রসূল সা. বললেন : ওটা একটা প্রাণ নয় কি? বুখারি আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন : ইবনে মাসউদ ও কয়েস লাশ দেখলে উঠে দাঁড়াতেন। এই উঠে দাঁড়ানোর তাৎপর্য কী? এর জবাব পাওয়া যায় আহমদ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম বর্ণিত হাদিসে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত এই হাদিসে রয়েছে : তোমরা উঠে দাঁড়াও সেই সত্তার সম্মানার্থে, যিনি আত্মাগুলোকে তুলে নেন।" ইবনে হিব্বানের ভাষা হলো : মহান আল্লাহর সম্মানার্থে, যিনি প্রাণগুলো সংহার করেন।" মোটকথা, আলেমগণ এই মাসয়ালায় দ্বিমত পোষণ করেছেন। কারো মতে, লাশের জন্য দাঁড়ানো মাকরূহ, কারো মতে মুস্তাহাব, কারো মতে, দাঁড়ানো ও না দাঁড়ানো দুটোরই স্বাধীনতা রয়েছে। এই তিন ধরনের মতামত পোষণকারিদের প্রত্যেকেরই প্রমাণ রয়েছে। এই মতামতগুলোর যেটি যার মনে ভালো লাগে, সেটি সে গ্রহণ করতে পারে।

৫. শবযাত্রায় মহিলাদের অংশগ্রহণ মাকরূহ : উম্মে আতিয়া রা. বলেন : আমাদেরকে লাশের সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, আর এটা আমাদের উপর বাধ্যতামূলকও করা হয়নি।" -আহমদ, বুখারি, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ। (অর্থাৎ আমাদের লাশের সাথে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়নি। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : এর অর্থ হলো, অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিসের মতো এটা তেমন জোর দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়নি। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়, লাশের সাথে যাওয়া মহিলাদের জন্য মাকরূহ করা হয়েছে। কিন্তু হারাম নয়। কুরতুবী বলেছেন : উম্মে আতিয়ার উক্তির বাহ্যিক অর্থ দাঁড়ায়, এটা মাকরূহ তানযিহি পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা। এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। মালেকের মতে এটা বৈধ। এটাই মদিনাবাসির অভিমত। এটা যে বৈধ তার প্রমাণ আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিস : রসূল সা. একটা শবযাত্রায় ছিলেন। সেখানে জনৈক মহিলাকে দেখে উমর রা. যখন চিৎকার করে উঠলেন, তখন রসূল সা. বললেন : হে উমর, ওকে থাকতে দাও।" -ইবনে মাজাহ ও নাসায়ী। মোহাল্লাব বলেছেন : উম্মে আতিয়ার হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, শরিয়তের নিষেধাজ্ঞাও বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে।)

আর আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন : "আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। সহসা তিনি জনৈক মহিলাকে দেখতে পেলেন। আমরা ভাবিনি তিনি তাকে

চিনেছেন। যখন আমরা পথের দিকে অগ্রসর হলাম, রসূল সা. থামলেন। অবশেষে মহিলা তার কাছে পৌঁছে গেলো। দেখলাম তিনি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। রসূল সা. বললেন : হে ফাতেমা, তুমি কি কারণে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ? ফাতেমা বললেন : আমি এই বাড়ির লোকদের কাছে এসেছিলাম। তাদের একজন মারা গেছে। তাই তাদের প্রতি সহানুভূতি ও শোক প্রকাশ করতে এলাম। রসূল সা. বললেন : তুমি বোধ হয় তাদের সাথে কবর পর্যন্ত গিয়েছ? ফাতেমা বললেন : আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই তাদের সাথে কবর পর্যন্ত যাওয়া থেকে। কারণ আপনাকে এ বিষয়ে অনেক কথা বলতে শুনেছি। রসূল সা. বললেন : তুমি যদি কবর পর্যন্ত যেতে, তবে বেহেশত দেখতে পেতেনা যতোক্ষণ না তোমার বাবার দাদা তা দেখতে পায়।" -আহমদ, হাকেম, নাসায়ী, বায়হাকি। আলেমগণ এ হাদিসটি সহীহ নয় বলে মন্তব্য করেছেন। কেননা এর সনদে রবীয়া বিন সাঈফ রয়েছেন, যিনি হাদিসের ব্যাপারে দুর্বল এবং তার সম্পর্কে বেশ কিছু আপত্তি বিদ্যমান।

আর ইবনে মাজাহ ও হাকেম আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আলী রা. বলেন : রসূল সা. একদিন বের হলেন। দেখলেন কিছু সংখ্যক মহিলা বসে আছে। তিনি বললেন : কি ব্যাপার, তোমরা বসে আছো কেন? তারা বললো : আমরা একটা লাশের অপেক্ষায় আছি। রসূল সা. বললেন : তোমরা কি মৃত দেহকে গোসল করাবে? তারা বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি বহন করে নিয়ে যাবে? তারা বললো, না। তিনি বললেন : তবে কি লাশকে কবরে নামাবে? তারা বললো : না। তিনি বললেন : তাহলে ফিরে যাও। ইতিমধ্যে তোমরা খানিকটা গুনাহ করে ফেলেছ। কোনো সওয়াব অর্জন করোনি।" এ হাদিসটিও বিতর্কিত। তথাপি ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, আবু উমামা, আয়েশা, মাসরুক, হাসান, নাখয়ী, আওযায়ী, ইসহাক, হানাফি, শাফেয়ি ও হাম্বলিগণ এই মতের সমর্থক।

ইমাম মালেকের মতে, কোনো বৃদ্ধ মহিলার জন্য কারো শবযাত্রায় যাওয়া আদৌ মাকরূহ নয়। আর কোনো যুবতীর জন্যও মাকরূহ নয় যদি মৃত ব্যক্তি তার এমন কেউ হয় যাকে হারানো তার জন্য অত্যন্ত দুঃসহ ব্যাপার, যদি সে যথেষ্ট পর্দা সহকারে বের হয় এবং যদি তার বের হওয়া কোনো বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ না হয়। পক্ষান্তরে ইবনে হাযম মনে করেন, অধিকাংশ আলেমের যুক্তি প্রমাণ ভ্রান্ত এবং মহিলাদের জন্য শবযাত্রায় যাওয়া বৈধ। তিনি বলেন : আমরা মহিলাদের শবযাত্রায় যাওয়া মাকরূহ মনে করিনা এবং তাদেরকে তা থেকে বিরতও রাখিনা। এ কাজ নিষিদ্ধ করা সম্বলিত সাহাবিদের কিছু উক্তি বর্ণিত হয়েছে, তবে তার কোনোটাই সহীহ নয়। ইতিপূর্বে বর্ণিত উম্মে আতিয়ার হাদিস সম্পর্কে তিনি বলেন, সনদের দিক দিয়ে এটি সহীহ হলেও এটি প্রমাণ দর্শানোর উপযুক্ত নয়। বড় জোর তা থেকে মাকরূহ প্রমাণিত হয়। বরঞ্চ এর বিপরীত মত নির্ভুলভাবে প্রমাণিত। যেমন আমরা শু'বার সূত্র থেকে বর্ণনা করেছি। ঐ সূত্রে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. একটি লাশ দাফনের অনুষ্ঠানে ছিলেন। সেখানে উমর রা. এক মহিলাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন। রসূল সা. উমরকে বললেন : হে উমর, ওকে থাকতে দাও। কেননা চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করে চলেছে, হৃদয় মর্মাহত এবং সময় নিকটবর্তী।" ইবনে আব্বাস থেকে সহীহ সনদে এ কাজ মাকরূহ নয় বলে বর্ণিত হয়েছে।

শরিয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে শবযাত্রায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা : আল-মুগনীর প্রণেতা বলেছেন : শবযাত্রায় যদি কোনো শরিয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে থাকে, যা দেখতে বা শুনতে হতে পারে। তাহলে প্রথমে দেখতে হবে, তা ঠেকানো সম্ভব কিনা। সম্ভব হলে করবে। আর যদি সম্ভব না হয়, তবে দুটি কর্মপন্থার একটি অবলম্বন করবে। একটি হলো, তার সমালোচনা করবে ও শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে। সমালোচনা দ্বারা তার কর্তব্য পালন সম্পন্ন

হবে এবং অংশগ্রহণ দ্বারা একটা অন্যায়ের কারণে ন্যায়সঙ্গত কাজ বর্জন থেকে বিরত থাকতে পারবে। দ্বিতীয়টি হলো, অংশগ্রহণ না করে ফিরে যাবে। কেননা এতে একটা শরিয়ত বিরোধী কাজ দেখা ও শোনা থেকে রেহাই পাবে, যা থেকে আত্মরক্ষা করতে সে সক্ষম।

৬. দাফন ও কবর খনন

১. শরিয়তে দাফনের বিধি : মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত মত হলো, মৃত ব্যক্তির দাফন ও তার দেহকে সমহিত করা ফরযে কেফায়া। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.

"আমি কি পৃথিবীকে জমা করার স্থান বানাইনি জীবিতদের ও মৃতদের?"

২. রাতে দাফন করা : অধিকাংশ আলেমের মতে রাতের বেলা দাফন করা দিনের বেলা দাফন করার মতোই। এ দুয়ে কোনো পার্থক্য নেই। যে লোকটি উচ্চস্বরে যিকির করতো, তাকে রসূলুল্লাহ সা. রাতের বেলা দাফন করেন। আর আলী রা. ফাতেমাকেও রাতের বেলা দাফন করেন। অনুরূপ, আবু বকর, উসমান, আয়েশা ও ইবনে মাসউদ রাতের বেলা সমাহিত হয়েছেন।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. একটি কবরের কাছে রাতের বেলা গমন করলেন। সেখানে তাকে একটা আলো জ্বালিয়ে দেয়া হলো। তিনি কেবলার দিক থেকে আলোটি ধরলেন এবং মাইয়্যেতকে লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন। তুমি খুবই কোমল হৃদয় ও অত্যধিক কুরআন অধ্যয়নকারী ছিলে। তিনি তার উপর চারবার তকবীর পড়লেন। -তিরমিযি। অধিকাংশ আলেম রাতের বেলা দাফন করা বৈধ বলে মত দিয়েছেন।

তবে রাতের বেলা দাফন করা বৈধ হবে তখনই, যখন রাতের বেলা দাফন করলে মৃত ব্যক্তির কোনো হক নষ্ট হবেনা এবং জানাযার নামাযের কোনো ক্ষতি হবেনা। তবে যখন এতে মৃত ব্যক্তির হক নষ্ট হবে, জানাযার নামাযের ক্ষতি হবে এবং তার যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন কোনো রকম বাধাগ্রস্ত হবে, তখন রাতের বেলা দাফন শরিয়তে নিষিদ্ধ ও মাকরূহ হয়ে যাবে। মুসলিম বর্ণনা করেছেন, একদিন রসূল সা. ভাষণ দিলেন। তিনি জনৈক সাহাবির কথা উল্লেখ করলেন, যে মারা গেছে, অত:পর রাতের বেলা তাকে যথেষ্ট দীর্ঘ নয় এমন কাফন পরানো হয়েছে এবং দাফন করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. তীব্র ভর্ৎসনা সহকারে বললেন, একেবারে অনন্যোপায় না হলে যেন রাতের বেলা কাউকে দাফন করা না হয়। আর ইবনে মাজাহ জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের মৃতদেরকে একেবারে অনন্যোপায় না হলে রাতের বেলা দাফন করোনা।

৩. সূর্যের উদয়, অস্ত ও মধ্যাকাশে থাকা অবস্থায় দাফন করা : আলেমগণ একমত, মৃতদেহ বিকৃত হওয়ার আশংকা থাকলে এই তিন সময় দাফন করা মাকরূহ হবেনা। অনুরূপ, বিকৃত হওয়ার আশংকা না থাকলেও অধিকাংশ আলেমের মতে এই তিন সময়ে দাফন করা বৈধ হবে যদি ইচ্ছাকৃত না হয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এই তিন সময়ে দাফন করলে তা মাকরূহ হবে। কেননা আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ, উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণনা করেন, উকবা রা. বলেছেন : তিনটে সময় আমাদের মৃত লোকদের জানাযা নামায পড়তে ও দাফন করতে রসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করতেন : সূর্য উদয়ের সময়, যতোক্ষণ তা পূর্ণভাবে প্রদীপ্ত না হবে ও উপরে উঠবে। দুপুরে যখন সূর্য মাথার উপরে আসবে

যতক্ষণ তা ঢলে না পড়ে এবং যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার নিকটবর্তী হয়, যতোক্ষণ তা ডুবে না যায়।" আর এ হাদিসের কারণে হাম্বলীরা বলেন : এই তিন সময় মৃতদের দাফন করা সর্বাবস্থায় মাকরূহ।

৪. কবরকে গভীর করা মুস্তাহাব : দাফনের উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি গর্তে মৃতদেহকে ঢেকে দেয়া, যা তার দুর্গন্ধ ছড়াতে দেবেনা এবং পশু ও পাখিকে তার কাছে যেতে দেবেনা। যেভাবে দাফন করলে এই উদ্দেশ্য সফল হবে, তাতেই ফরয আদায় হবে ও কর্তব্য পালিত হবে। তবে মাথা সমান গভীর কবর খনন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা নাসায়ী ও তিরমিযি হিশাম বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : আমরা ওহুদ যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট অভিযোগ পেশ করলাম। বললাম : হে রসূলুল্লাহ, প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা আলাদা কবর খনন করা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর। তিনি বললেন : গভীর করে ও সুন্দরভাবে খনন করো এবং দুজন তিনজন করে এক এক কবরে দাফন করো। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, কাকে আগে দাফন করবো। তিনি বললেন : তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশি কুরআন পড়তো তাকে আগে দাফন করো। হিশাম বলেন : আমার পিতা এক কবরে দাফনকৃত তিন জনের মধ্যে তৃতীয় জন ছিলেন। ইবনে আবি শায়বা ও ইবনুল মুনযির উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর রা. বলেছেন : কবর মাথা বরাবর গভীর ও প্রশস্ত করো। আর আবু হানিফা ও আহমদের মতে, মানব দেহের অর্ধেক পরিমাণ গভীর করবে। আরো বেশি করলে উত্তম।

৫. ফাড়া কবরের চেয়ে বগলী কবর অগ্রগণ্য : বগলী কবর হলো কবরের পাশে কেবলার দিকে মাটি চিরে আর একটা গর্ত বানানো। এই গর্তের মুখ কাঁচা মাটির ইট দিয়ে বন্ধ করে দিলে তা ছাদযুক্ত বাড়ি সদৃশ হবে। আর ফাড়া কবর হলো মাঝ বরাবর একটা লম্বা লম্বি গর্ত খনন করা, যার চারপাশ মাটি দিয়ে খাড়া করে বানানো হয়, তার ভেতরে লাশ রাখা হয় এবং তার উপরে কোনো কিছু দিয়ে ছাদ বানানো হয়। উভয় প্রকারের কবরই বৈধ। তবে বগলী কবর উত্তম। আহমদ ও ইবনে মাজাহ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন : যখন রসূল সা. ইন্তিকাল করলেন, তখন দু'জন লোক ছিলো। একজন বগলী কবরে পারদর্শী অপরজন ফাড়া কবরে সুদক্ষ। সবাই বললো : আমরা আল্লাহর নিকট ইসতিখারা (যেটা উত্তম তা প্রার্থনা) করবো এবং দু'জনের কাছেই দূত পাঠাবো। যেজন আগে আসবে তাকে কাজে লাগাবো : দু'জনের কাছে পাঠানো হলো। বগলী কবরওয়ালা আগে এলো। ফলে রসূলুল্লাহ সা. এর জন্য বগলী কবর করা হলো। এ হাদিস বগলী কবরের বৈধতা প্রমাণ করে। তবে বগলী কবরের অগ্রগণ্যতা প্রমাণিত হয় অন্য একটি হাদিস দ্বারা। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "বগলী কবর আমাদের জন্য, আর ফাড়া কবর অন্যদের জন্য।"

৬. মৃতকে কিভাবে কবরে ঢুকাবে : মৃতকে কবরে প্রবেশ করানোর সুন্নতী নিয়ম হলো : সম্ভব হলে তার দেহের শেষ ভাগ অর্থাৎ নিম্নাংশ আগে ঢুকানো। কেননা আবু দাউদ, ইবনে আবি শায়বা ও বায়হাকি আবদুল্লাহ বিন যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন : আবদুল্লাহ বিন যায়েদ একজন মৃতকে তার পায়ের দিক দিয়ে কবরে ঢুকালেন এবং বললেন এটাই সুন্নতী নিয়ম। এটা সম্ভব না হলে যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবেই ঢুকাবে। কেননা কুরআন বা হাদিসের কোনো উক্তি দ্বারা এর কোনো একটি পন্থা সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

৭. মৃতকে কবরে রেখে তার মুখ কেবলার দিকে ফেরানো মুস্তাহাব : সুবিদিত সুন্নত হলো : মৃতকে কবরে ডান কাতে শোয়ানো। আর তার মুখ কেবলার দিকে ফেরানো। যে ব্যক্তি এ

কাজ করবে, সে "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" বা "ওলা আ'লা সুন্নতি রসূলিল্লাহ" বলে কাফনের বাধন খুলে দেবে।

ইবনে উমর রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন : মৃতকে যখন কবরে রাখা হবে, তখন বলা হবে : "বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি (অথবা সুন্নতি) রাসূলিল্লাহ।" -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী।

৮. অধিকাংশ ফকীহর মতে মৃত ব্যক্তির জন্য কবরে কাপড়, বালিশ বা অনুরূপ অন্য কোনো জিনিস রাখা মাকরূহ : ইবনে হাযম মনে করেন, মৃতের শরীরের নিচে কবরের ভেতরে কাপড় বিছানোতে কোনো দোষ নেই। কেননা মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. এর কবরে একটা লাল চাদর বিছানো হয়েছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তার রসূলকে যেমন মানুষের অত্যাচার থেকে নিরাপদে রেখেছিলেন, তেমনি তার দাফনে কাপড় বিছানোরও অনুমতি দিয়েছিলেন, নিষেধ করেননি। আর তৎকালে যারা পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ ও মহৎ মানুষ ছিলেন, তারাও পূর্ণ ঐক্যমত্য সহকারে এ কাজটি করেছিলেন। তাদের কেউই এর বিরোধিতা করেননি। অবশ্য আলেমগণ মৃত ব্যক্তির মাথার নিচে একটা ইট, পাথর বা মাটি দিয়ে বালিশ বানিয়ে দেয়া এবং ডান গালের ওপর থেকে কাফন সরিয়ে তা মাটিতে রাখার পর ইট বা পাথরটির দিকে ডান গাল লাগিয়ে দেয়া মুস্তাহাব মনে করেন। উমর রা. বলেছিলেন : তোমরা যখন আমাকে কবরে নামাবে, তখন আমার গালকে মাটির সাথে লাগাবে। আর দাহ্হাক ওসিয়ত করেছিলেন তার কাফনের গিরে খুলে দিতে এবং তার গণ্ডদেশকে কাফনের ভেতর থেকে বের করতে। আলেমগণ মৃত ব্যক্তির পেছনে ইট বা মাটি দিয়ে হেলান দেয়ানো এবং চিৎ করে না শোয়ানো মুস্তাহাব মনে করেন। আবু হানিফা, মালেক ও আহমদের মতে মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে তাকে কবরে ঢুকানোর সময় তার উপর একখানা কাপড় লম্বা করে ছড়িয়ে দেয়া মুস্তাহাব মনে করেন। শাফেয়ির মতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের বেলায়ই এটা সমভাবে মুস্তাহাব।

৯. কবরে তিন মুঠ মাটি দেয়া মুস্তাহাব : যারা দাফনের কাজে শরিক হবে, তাদের প্রত্যেকের দু'হাত দিয়ে তিন মুঠো করে মাটি ছড়িয়ে দেয়া মুস্তাহাব। এই মাটি মৃত ব্যক্তির মাথার দিক থেকে ছড়াতে হয়। কেননা ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জনৈক মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন। তারপর তার কবরে এসে তার মাথার দিক দিয়ে তিন মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিলেন। অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে : রসূল রা. যখন তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমকে কবরে রেখেছিলেন তখন প্রথম মুঠো মাটি ছড়ানোর সময় বলেছিলেন : مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (এই মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি), দ্বিতীয় মুঠো মাটি ছড়ানোর সময় বলেছিলেন : وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ (এই মাটিতেই পুনরায় তোমাদেরকে ফেরত পাঠাবো) এবং তৃতীয় মুঠো মাটি নিক্ষেপের সময় বলেছিলেন : وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. (এবং এই মাটি থেকে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো)। এই শেষোক্ত রেওয়ায়াতের কারণে তিন ইমাম (আবু হানিফা, শাফেয়ী ও মালেক) এভাবে তিন মুঠোয় উক্ত তিন আয়াতাংশ পড়া মুস্তাহাব মনে করেছেন। কিন্তু হাদিসটি দুর্বল হওয়ার কারণে ইমাম আহমদ মনে করেন, মাটি ছড়ানোর সময় কিছুই পড়ার প্রয়োজন নেই।

১০. দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব : মৃত ব্যক্তির দাফন সমাপ্ত হলে তার জন্য দোয়া করা ও তাকে আল্লাহ ঈমানের ওপর অবিচল রাখুন কামনা করা মুস্তাহাব। কেননা এই অবস্থায় মৃত ব্যক্তি এটাই কামনা করে। উসমান রা. থেকে বর্ণিত :

রসূলুল্লাহ সা. দাফন সমাপ্ত করে মৃত ব্যক্তির কবরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতেন : তোমাদের ভাই-এর গুনাহ্ মাফ চাও এবং তার ঈমানের উপর দৃঢ়তা কামনা করো। কেননা সে এখন এটা কামনা করছে। আবু দাউদ, হাকেম ও বাযযার। আর রযীন আলী থেকে বর্ণনা করেছেন : যখন মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন হতো, তখন রসূল সা. বলতেন :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ نَزَلَ بِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهٖ فَاغْفِرْ لَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ .

'হে আল্লাহ, এই যে তোমার বান্দা তোমার অতিথি হয়েছে, তুমি তো শ্রেষ্ঠ অতিথিপরায়ণ। কাজেই তাকে ক্ষমা করো এবং তার প্রবেশ স্থানকে প্রশস্ত করো।' আর ইবনে উমর দাফনের পর কবরের উপর সূরা বাকারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ পড়া মুস্তাহাব মনে করতেন। -বায়হাকি।

১১. দাফনের পর "তাসকীন" করা (ঈমান শেখানো বা স্মরণ করানো) : কোনো কোনো আলেম ও ইমাম শাফেয়ি দাফন সমাপ্ত হওয়ার পর মৃত ব্যক্তিকে 'তাসকীন' করা (ঈমান শেখানো বা স্মরণ করানো) মুস্তাহাব মনে করেন। (অপ্রাপ্তবয়স্ক মৃত ব্যক্তি বাদে) সাঈদ বিন মানসুর রাশেদ বিন সা'দ থেকে, যামরা বিন হাবিব ও হাকীম বিন উমাইর থেকে বর্ণনা করেছেন- তারা বলেছেন : মৃত ব্যক্তির কবর সমতল করা সম্পন্ন হলে এবং দাফনে আগত জনতা চলে গেলে কবরের উপর মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলা মুস্তাহাব মনে করা হতো : "হে অমুক, বলো, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (তিনবার) হে অমুক বলো, আমার রব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ সা."। তারপর চলে যাবে। আর তাবারানি আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেছেন : তোমাদের কোনো ভাই যখন মারা যায় এবং তোমরা তার কবরের মাটি সমান করো, তখন তোমাদের একজন যেন তার কবরের ওপর দাঁড়ায় এবং বলে : "হে অমুক মহিলার সন্তান অমুক"। এটুকু বলার পর মৃত ব্যক্তি তা শোনে, কিন্তু জবাব দিতে পারে না। এরপর পুনরায় যখন বলা হয়, "হে অমুক মহিলার সন্তান অমুক," তখন সে কবরের মধ্যে উঠে বসে। তারপর যখন আবার বলা হয় : "হে অমুক মহিলার সন্তান অমুক, তখন সে বলে, "আল্লাহ আপনার উপর করুণা বর্ষণ করুন, আমাকে আদেশ দিন।" তবে তোমরা (পৃথিবীর লোকেরা) উপলব্ধি করতে পারোনা। এরপর বলা হবে : তুমি যে অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করে এসেছো, তা একটু স্মরণ করো : আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. তার বান্দা ও রসূল, এই বলে সাক্ষ্য দাও, আর তুমি আল্লাহকে প্রতিপালক মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলে, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মদকে নবী মেনে নিয়েছিলে আর কুরআনকে পথনির্দেশক মেনে নিয়েছিলে। এরপর মুনকার ও নকীর পরস্পরের হাত ধরে ও বলে : 'চলো, যাকে তার যুক্তিপ্রমাণ শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, তার কাছে আমাদের বসার অবকাশ নেই।" এ সময় এক ব্যক্তি বললো : হে রসূলুল্লাহ, যদি মৃত ব্যক্তির মায়ের নাম না জানা যায়? তিনি জবাব দিলেন : তাহলে তার মা হাওয়ার নাম বলবে এবং বলবে : হে হাওয়ার সন্তান অমুক। সিরিয়াবাসী আজো এই রীতি অনুসরণপূর্বক তালকীন করে থাকে। কিন্তু মালেকিগণ ও কিছু সংখ্যক হাম্বলি তালকীন করাকে মাকরূহ মনে করেন।

৭. কবর প্রসঙ্গ

কবরকে ভূপৃষ্ঠ থেকে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা সুন্নত। যাতে তাকে একটা কবর বলে চেনা যায়। এর চেয়ে বেশি উঁচু করা হারাম। কেননা মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন, ছুমামা বিন শুফাহ্ বলেছেন : আমরা রোমের রোড্স নামক স্থানে ফুযালা বিন উবাইদের সাথে ছিলাম। এ সময় আমাদের এক সাথি মারা গেলো। ফুযালার নির্দেশে তার কবর তৈরি করা

হলো এবং কবরকে মাটির সমান করা হলো। তারপর ফুযালা বললেন : আমি রসূল সা. কে কবরকে সমতল করার আদেশ দিতে শুনেছি।" আর আবুল হিয়াজ আল আসাদী বর্ণনা করেন : আলী বিন আবু তালেব আমাকে বললেন : যে কাজে রসূল সা. আমাকে প্রেরণ করেছিলেন, সেই কাজে কি তোমাকে প্রেরণ করবোনা? সে কাজটি হলো, কোনো মূর্তির মুখ বিকৃত না করে এবং কোনো কবরকে সমান না করে ছাড়বেনা। তিরমিযি বলেন : কিছু সংখ্যক আলেম এই হাদিস অনুসরণ করে থাকেন। কেবল কবর বলে চেনা যায় এর চেয়ে বেশি কবরকে উঁচু করা তারা মাকরূহ মনে করেন। এতোটুকু উঁচু করা যাবে এজন্য যেন কেউ তাকে পদদলিত না করে ও তার উপর না বসে। সঠিক সুন্নাহর অনুসরণপূর্বক মুসলিম শাসকগণ অতিরিক্ত উঁচু করে নির্মিত কবরের বাড়তি উঁচু অংশ ভেঙ্গে দিতেন। ইমাম শাফেয়ি বলেন : কবরে অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে যোগ করা আমি পছন্দ করিনা। কবরকে মাটির উপরে এক বিঘতের বেশি উঁচু করা, কবরকে পাকা করা, আস্তর করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা এতে অহংকার ও বিলাসিতা প্রকাশ পায়, যা মৃত্যুর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। মুহাজির ও আনসারদের কবর আমি পাকা বা আস্তর করা দেখিনি। বরঞ্চ অনেক শাসককে দেখেছি, কবরে পাকা স্থাপনা ভেংগে ফেলেছেন, অথচ ফকীহদেরকে এটা দূষণীয় মনে করতে দেখিনি। শওকানি বলেছেন : যতোটুকু অনুমতি আছে, তার চেয়ে কবরকে উঁচু করা হারাম। আহমদের শিষ্যগণ সবাই, শাফেয়ির শিষ্যদের একাংশ ও মালেক এই মতই ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন ও পরবর্তী মনীষীরা কবর পাকা করেছেন এবং কেউ প্রতিবাদ করেনি বলে এটা নিষিদ্ধ নয়- ইমাম ইয়াহিয়া ও মাহদী প্রমুখের এ উক্তি ভুল। কেননা বড়জোর তারা নিরবতা অবলম্বন করেছেন। আর নিরবতা কোনো প্রমাণ নয়, যখন তা কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য উক্তি বহির্ভূত বিষয়ে অবলম্বন করা হয়।

কবর উঁচু করার আরো যে কাজ উক্ত হাদিসের নিষিদ্ধ সেটি হচ্ছে- কবরে গম্বুজ এবং কবর সংলগ্ন সম্মেলন কক্ষ বানানো। এ জাতীয় স্থাপনা নির্মাণ কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করার পর্যায়ভুক্ত, যার কর্তাকে রসূলুল্লাহ সা. অভিসম্পাত করেছেন।

আর কবরে বিভিন্ন রকমের স্থাপনা নির্মাণ ও তার সৌন্দর্য বর্ধন থেকে ইসলামের কত যে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেজন্য ইসলাম আজো আক্ষেপ ও ফরিয়াদ করে। তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হলো, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা কবরকেন্দ্রিক এসব স্থাপনাকে ঘিরে এমন সব অলীক ধারণা বিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়েছে, যা পৌত্তলিকদের মূর্তি ও দেবদেবী সংক্রান্ত ধারণা বিশ্বাসের মতো। মুসলমান নামধারী এসব লোক তাদের এই ধারণা বিশ্বাসকে ক্রমান্বয়ে জোরদার করে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, এসব কবরকে বিভিন্ন রকমের কল্যাণ ও উপকারিতা সাধনে এবং বিভিন্ন রকমের অকল্যাণ ও বিপদ মুসিবত দূরীকরণে সক্ষম বলে মনে করে। এভাবে এসব কবরকে মনোবাঞ্ছনা পূরণ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির আখড়া বানানো হয়েছে এবং এগুলোর কাছে এমন সব জিনিস প্রার্থনা করা হয়, যা বান্দারা আল্লাহর কাছ থেকেই শুধু প্রার্থনা করে থাকে। এসব কবর ও তদসংশ্লিষ্ট স্থানকে তীর্থভূমি বানিয়ে সেখানে দলে দলে যাওয়া ও অবস্থান করা হয়, এগুলোকে হাত দিয়ে ভক্তিভরে স্পর্শ করা হয় ও এগুলোর কাছে মুক্তি ও আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। এক কথায়, জাহেলী সমাজের লোকেরা মূর্তি ও দেবদেবতার সাথে যেসব আচরণ করতো, তার কোনো কিছুই তারা বাদ রাখেনি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এমন জঘন্য অন্যায় ও ভয়াবহ কুফরী সত্ত্বেও এমন লোক খুবই বিরল, যে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে-এর প্রতি বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হবে এবং তাওহীদবাদী ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় ব্রতী হয়ে এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াবে- না কোনো আলেম, না কোনো ইসলামী শিক্ষার্থী, না

কোনো সেনাপতি বা রাজনৈতিক নেতা, না কোনো মন্ত্রী, না কোনো রাজা বাদশাহ্ বা শাসক। আমরা সন্দেহাতীতভাবে এমন সংবাদও পেয়েছি যে, এসব কবর বা মাজার প্রেমিকদের অনেকে বা অধিকাংশ, যখনই তার প্রতিপক্ষের দিক থেকে শপথ করার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তখন সে জেনে শুনেও আল্লাহর নামে মিথ্যে মিথ্যি শপথ করে। এরপর যখন বলা হয়, তোমার অমুক পীর, ওলী বা বুজুর্গের নামে শপথ করে বলো তো, তখন সে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে আল্লাহর নামে শপথকৃত উক্তি থেকে ফিরে আসে। অস্বীকার করেও আসল সত্যকে স্বীকার করে। (ভাবখানা এমন যেন আল্লাহর চেয়েও উক্ত পীর বা ওলীকে বেশি ভয় পায়) এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাদের শিরক সেসব ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের শিরকের চেয়েও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে, যারা আল্লাহকে দু'জন খোদার দ্বিতীয় জন বা তিন জন খোদার তৃতীয় জন বলে দাবি করে। সুতরাং মুসলিম জাহানের আলেমগণ, রাজা বাদশাহ্ ও শাসকগণের নিকট আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা, এতো বড় কুফরী চেয়ে ভয়াবহ বিপদ ইসলামের জন্য আর কী আছে? আল্লাহর পরিবর্তে যে কোনো সৃষ্টির পূজার চেয়ে আল্লাহর এই দীনের জন্য অধিক ক্ষতিকর আর কী হতে পারে? আর মুসলমানদের উপর এর চেয়ে মারাত্মক বিপদ আর কী আসতে পারে। আর এতো বড় প্রকাশ্য শিরকের প্রতিবাদ করা যদি আমাদের অপরিহার্য দীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য না হয় তাহলে আর কোন্ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আমাদের দায়িত্ব বলে গণ্য হবে? কবি আক্ষেপ করে যথার্থই বলেছেন :

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا - وَلٰكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِيْ

وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ - وَلٰكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِيْ رَمَادِ

"তুমি যদি কোনো জীবিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করতে, তবে তাকে অবশ্যই কথা শুনাতে সক্ষম হতে। কিন্তু যাকে তুমি সম্বোধন করছো সে তো প্রাণহীন, তুমি যদি আগুনে ফুঁক দিতে, তবে তা অবশ্যই জ্বলতো। কিন্তু তুমি ছাইতে ফুঁক দিয়ে চলেছ।"

আলেমগণ বরের ওপর নির্মিত মসজিদ ও গম্বুজ ভেংগে ফেলতে ফতোয়া দিয়েছেন। খাওয়াজির নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : কবরের উপর নির্মিত মসজিদ ও গম্বুজ ভেংগে ফেলার উদ্যোগ নেয়া ওয়াজিব। কেননা ওটা মসজিদে যিরারের চেয়েও ক্ষতিকর। এসব গম্বুজ ও মসজিদ রসূল সা.-এর বিরুদ্ধাচরণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। তিনি এগুলো নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন এবং উঁচু কবর ভেংগে দিতে আদেশ দিয়েছেন। কবরের ওপরের সকল বাতি সরিয়ে ফেলা ওয়াজিব। কবরে কোনো কিছু মানত করা ও ওয়াক্ফ করা অবৈধ। এ ফতোয়া বাদশাহ যাহেরের আমলে জারি করা হয়। তিনি যখন প্রাচীর ঘেরা কবরস্থানের সকল পাকা কবর ও স্থাপনা ভেংগে ফেলার সংকল্প নিলেন, তখন সে যুগের আলেমগণ একমত হয়ে ঘোষণা করলেন, এগুলো ভেংগে ফেলা শাসকের কর্তব্য।

কবরকে সমতল করা ও সামান্য উঁচু করা : ফকীহ্গণ কবরকে কিঞ্চিৎ উঁচু করা ও সমতল করা উভয়ই বৈধ বলে একমত হয়েছেন। তাবারি বলেছেন : কবরকে হয় মাটির সমান করতে হবে, নচেত মুসলমানদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করতে হবে। এছাড়া তৃতীয় কোনো পন্থা অবলম্বন করা আমি পছন্দ করিনা। কবরকে সমতল করা আর মাটির সমান করা এক কথা নয়। কোন্টি সর্বোত্তম সে ব্যাপারে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কাযী ইয়ায অধিকাংশ আলেম থেকে উদ্ধৃত করেছেন, সর্বোত্তম পন্থা হলো সামান্য উঁচু করা। কেননা সুফিয়ান নাম্মার তাকে বলেছেন, তিনি রসূল সা. এর কবর সামান্য উঁচু দেখতে পেয়েছেন। -বুখারি। এটা আবু হানিফা, মালেক, আহমদ, মুযনী ও বহু সংখ্যক শাফেয়ি আলেমের মত।

শাফেয়ী একথাও বলেছেন যে, যেহেতু রসূল সা. সমান করার আদেশ দিয়েছেন, তাই সমতল করাই উত্তম।

কবরকে কোনো নিদর্শন দ্বারা চিহ্নিত করা : কবরের উপর কোনো পাথর বা কাঠ জাতীয় কোনো জিনিস দ্বারা চিহ্নিত করা বৈধ। কেননা ইবনে মাজাহ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. উসমান বিন মাযউনের কবরকে একটা পাথর দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন। অর্থাৎ কবরের উপর পাথর স্থাপন করেছিলেন, যাতে কবরটি চেনা যায়। যাওয়াদ গ্রন্থে বলা হয়েছে : এর সনদ উত্তম। এটিকে আবু দাউদ মুত্তালিব বিন ওয়াদায়া থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে আরো আছে : তিনি পাথর নিজে বহন করে তার মাথার কাছে রেখেছিলেন। (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির মাথা বরাবর) এবং বলেছিলেন : এ দ্বারা আমার ভাই এর কবর চিনতে পারবো এবং তার কাছে আমার পরিবার পরিজনদের মধ্যে যারা মারা যাবে তাদেরকে দাফন করতে পারবো।" হাদিস থেকে জানা যায় : মৃত আত্মীয়দেরকে পাশাপাশি জায়গায় দাফন করা মুস্তাহাব, যাতে তাদের যিয়ারত করা সহজতর হয় এবং তাদের প্রতি অধিকতর মমত্ব সৃষ্টি হয়।

জুতা স্যান্ডেল খুলে কবরের কাছে যাওয়া : অধিকাংশ আলেমের মতে জুতা স্যান্ডেল পায়ে রেখে কবরের কাছে যাওয়া যায়। জারীর বিন হাযেম বলেছেন : আমি হাসান ও ইবনে সিরীনকে তাদের পাদুকা সহকারে কবরের কাছ দিয়ে চলতে দেখেছি। বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো বান্দাকে যখন কবরে রেখে তার সাথিরা চলে যায়, তখন সে তাদের পাদুকার আওয়ায শুনতে পায়।" এ হাদিস দ্বারা আলেমগণ কবরের কাছে জুতা পায়ে দিয়ে যাওয়ার বৈধতা প্রমাণ করেন। কেননা লোকেরা, যদি সেখানে জুতাসহ না যায় তাহলে জুতার শব্দ শোনার অবকাশ থাকেনা। অপরদিকে ইমাম আহমদ 'সিবতে'র (বিশেষ ধরনের গাছের পাতা) পাকানো চামড়ার জুতা পরে কবরের কাছে যাওয়াকে মাকরূহ আখ্যায়িত করেছেন। কেননা আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ রসূল সা. এর মুক্ত গোলাম বশীর থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে জুতা পায়ে কবরের কাছে ঘুরতে দেখলেন। তিনি বললেন : ওহে সিবতের পাকানো জুতা ওয়ালা, ধিক তোমাকে! তোমার জুতা খোলো।" তখন লোকটি তাঁর দিকে তাকালো। যখন চিনতে পারলো যে, তিনি রসূল সা. তখন কাল বিলম্ব না করে জুতা খুলে দূরে ছুঁড়ে মারলো। খাত্তাবী বলেছেন : সম্ভবত এই জুতা অপছন্দ করেছেন এর ভেতরে অহংকার ও আভিজাত্য থাকার কারণে। কেননা সিবতের জুতাকে বিলাসী ও অভিজাত লোকদের পরিধেয় জুতা মনে করা হয়। তিনি আসলে বিনয় ও নম্রতার পোশাকে কবরের কাছে যাওয়াকে পছন্দ করেছেন। আর ইমাম আহমদ জুতা পায়ে দিয়ে যাওয়াকে মাকরূহ মনে করেন তখনই, যখন কোনো ওযর না থাকে। যদি কোনো ওযর থাকে যা কবরের কাছে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে জুতা খুলতে বাধা দেয়, যেমন কাঁটা ও নাপাকি, তাহলে আর জুতা পায়ে দেয়া মাকরূহ থাকবেনা।

কবরকে আবৃত করা নিষিদ্ধ : কবরকে কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে দেয়া বৈধ নয়। কেননা এটা শরিয়তসম্মত উদ্দেশ্য ছাড়াই অর্থ ব্যয় ও বেহুদা কাজ এবং জনগণকে বিপথগামী করার নামান্তর। বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ সা. একদল যোদ্ধার সাথে বের হলেন। এই সময় আমি এক টুকরো নরম কাপড়ের চাদর দিয়ে দরজা ঢেকে দিলাম। এরপর তিনি ফিরে এসে চাদরটা দেখলেন। সংগে সংগে তা টেনে তুলে ফেললেন। তারপর বললেন : আল্লাহ আমাদেরকে মাটি ও পাথর ঢাকবার আদেশ দেননি।

কবরে বাতি জ্বালানো ও মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ : একাধিক সহীহ হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কবরে মসজিদ নির্মাণ করা ও বাতি জ্বালানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন :

১. বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল।

২. আহমদ আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ী, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন : যেসব মহিলাা কবর যিয়ারত করতে যায় এবং যারা কবরে মসজিদ বানায় ও বাতি জ্বালায়, তাদের উপর রসূল সা. অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

৩. আবদুল্লাহ বাজালী থেকে সহীহ মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূল সা. কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্য থেকে আমার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকুক- তা থেকে আমি আল্লাহর নিকট দায়মুক্ত। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার অন্তরংগ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেমন তিনি ইবরাহিমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলে। আমি যদি কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রহণ করতাম তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের ও পুণ্যবান লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করতো। তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করোনা। আমি তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করছি।

৪. সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ ইহুদী ও খৃস্টানদের অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

৫. বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, উম্মে হাবিবা ও উম্মে সালামা রসূল সা.কে জানালেন। হাবশায় থাকাকালে তারা একটা গীর্জা দেখেছিলেন, যার ভেতরে প্রচুর ছবি ছিলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ওদের (খৃস্টানদের) মধ্যে কোনো সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তার ভেতরে নানা রকমের ছবি খোদাই করতো। কেয়ামতের দিন তারা হবে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। আল মুগনীর গ্রন্থকার বলেছেন : কবরের উপর (অর্থাৎ কবর সংলগ্ন স্থানে) মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ নয়। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা কবর যিয়ারতকারিণীদেরকে, কবরে মসজিদ নির্মাণকারিদেরকে এবং কবরে প্রদ্বীপ জ্বালানো নারীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। -আবু দাউদ ও নাসায়ী।

এ কাজ যদি বৈধ হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ সা. যে ব্যক্তি এ কাজ করে তাকে অভিসম্পাত দিতেন না। তাছাড়া এতে কোনো উপকারিতা ব্যতিতই অর্থ ব্যয় করা হয়। আর কবরকে এতো বেশি ভক্তি প্রদর্শন করা হয়, যা মূর্তির প্রতি ভক্তির সাথে তুলনীয়। হাদিসের কারণে এবং রসূল সা. এর উক্তি "আল্লাহ ইহুদীদের উপর অভিসম্পাত করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করতো।"-এর কারণে কবরে মসজিদ নির্মাণ অবৈধ। এ হাদিস দ্বারা রসূল সা. ইহুদীদের মতো কার্যকলাপ করা থেকে সাবধান করেছেন। আর আয়েশা রা. বলেছেন : রসূল সা. এর কবরকে দর্শনীয় করা হয়নি শুধু এই উদ্দেশ্যে, যাতে তাকে মসজিদে পরিণত না করা হয়। তাছাড়া এ কারণেও যে, বিশেষভাবে কবরের কাছে নামায পড়া মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার নৈকট্য লাভের তৎপরতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা ইতিপূর্বে এই মর্মে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি মূর্তি পূজার সূচনা হয়েছিল মৃত ব্যক্তিদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে। যা তাদের প্রতিকৃতি বানানো, তাদেরকে স্পর্শ করা ও তাদের উপর নামায পড়ার আকারে চলতে থাকে। ইমাম বুখারি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন : নূহ (আ.) এর

জাতি যে উদ্‌, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর নামক মূর্তির পূজা করতো, সেগুলো আসলে সেই জাতির কতিপয় সৎ ও পুণ্যবান লোকের নাম ছিলো। তাদের মৃত্যুর পর লোকেরা তাদেরকে স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করার সদুদ্দেশ্য নিয়েই তাদের প্রতিকৃতি বানায়। কিন্তু কালক্রমে যখন তাদের সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞানের ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তখন শয়তান তাদের প্রতিকৃতি ও মূর্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা ও তার নৈকট্য অর্জন করাকে আকর্ষণীয় ও মোহনীয় করে উপস্থাপন করে। তার ওপর হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই বরকত ও কল্যাণ লাভ হবে বলে প্রলুব্ধ করে। লোকেরা সৎ লোকদের কবরগুলোর সাথে এভাবেই আচরণ করতো। আর এটা পৌত্তলিকদের কাছ থেকে ইহুদী-খৃস্টানদের কাছে এবং তাদের কাছ থেকে মুসলমানদের কাছে সংক্রমিত হয়। বস্তুত: এক্ষেত্রে আকার ও আকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও মূলত: মূর্তি হিসেবে এগুলো সবই সমান।

কবরের কাছে জন্তু যবাই করা মাকরূহ : শরিয়ত কবরের নিকট জীবজন্তু যবাই করা নিষিদ্ধ করেছে, যাতে জাহেলী সমাজের বলিদানের প্রথা থেকে মানুষ বিরত থাকে এবং পারস্পরিক বড়াই ও গর্বের প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত থাকে। আবু দাউদ আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইসলামে কোনো বলিদান নেই।" আবদুর রাজ্জাক বলেছেন : লোকেরা কবরের কাছে গরু বা ছাগল বলি দিতো।

খাত্তাবী বলেন : জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা মৃত দানশীল ব্যক্তির কবরে উট বলি দিতো আর বলতো : আমরা তার কৃতিত্বের প্রতিদান দিচ্ছি। কেননা সে জীবিতাবস্থায় উট বলি দিয়ে মানুষকে খাওয়াতো। এখন আমরা তার কবরে এগুলো বলি দিচ্ছি যাতে পশুপাখি এসে খেয়ে যায়। এভাবে জীবিতাবস্থায় সে যেমন গণভোজের আয়োজনকারি ছিলো, মৃত্যুর পরেও সে গণভোজের আয়োজনকারি থাকছে। জনৈক কবি বলেন : নাজ্জাশীর কবরে আমি আমার উটনীকে বলি দিয়েছি। তীব্র ধারালো চকচকে তরবারী দিয়ে, যাকে তার শানদাতারা অধিকতর নিখুঁতভাবে ধারালো করেছে। সেই ব্যক্তির কবরের উপর বলি দিয়েছি, যার আগে যদি আমি মরতাম, তবে সে আমার কবরে তার বহু সংখ্যক উটনী অবলীলাক্রমে বলি দিতো।" জাহেলী যুগের কিছু লোক মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ধারণা পোষণ করতো এবং মনে করতো, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার কবরের কাছে উট বলি দিলে সে কেয়ামতের দিন উষ্ট্রারোহী হয়ে পুনরুজ্জীবিত হবে, নচেত পদাতিক হয়ে পুনরুজ্জীবিত হবে।

কবরের উপর ও কবরের সাথে হেলান দেয়া ও কবরের উপর দিয়ে চলা নিষেধ : কবরের উপর বসা, তার উপর হেলান দেয়া ও তার উপর দিয়ে চলাফেরা বৈধ নয়। কেননা আমর ইবনে হাযম বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. আমাকে একটা কবরে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখে বললেন : এ কবরের বাসিন্দাকে কষ্ট দিওনা। -আহমদ। আর আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কোনো ব্যক্তির কবরের উপর বসার চেয়ে ঢের ভালো একটি জ্বলন্ত অংগারের উপর বসা। অতপর সেই অংগারে তার কাপড় পুড়ে চামড়া পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। ইবনে হাযম এবং আবু হুরায়রাসহ প্রাচীন মনীষীদের একটি দলের মতে একটা হারাম। কারণ এ কাজের জন্য শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এটা মাকরূহ। নববী বলেছেন : ইমাম শাফেয়ী তার "উম" নামক গ্রন্থে ও তার অধিকাংশ শিষ্যরা কবরে বসাকে মাকরূহ তানযিহী মনে করেন। ফকীহদের ভাষায় মাকরূহ দ্বারা মাকরূহ তানযিহী বুঝানোই অধিকতর প্রসিদ্ধ। তাদের অনেকেই এই মত

ব্যক্ত করেছেন। নাখয়ী, লাইছ, আহমদ ও দাউদসহ অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। কবরের উপর হেলান দেয়াও একই ধরনের মাকরূহ তানযিহী।

তবে সাহাবিদের মধ্য থেকে ইবনে উমর এবং ইমামদের মধ্য থেকে মালেক ও আবু হানিফা কবরের উপর বসা বৈধ মনে করেন। মালেক তার মুয়াত্তায় বলেন : কবরের উপর বসা থেকে নিষেধ করার কারণ আমাদের ধারণামতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন যথা পেশাব পায়খানা পূরণ থেকে বিরত রাখা হতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি একটা দুর্বল হাদিস উল্লেখ করেছেন। আহমদ এই ব্যাখ্যাকে দুর্বলও বলেছেন, গ্রহণযোগ্য নয় বলেছেন। নববী বলেছেন : এটা দুর্বল বা বাতিল ব্যাখ্যা। ইবনে হাযমও এটিকে একাধিক কারণে বাতিল করে দিয়েছেন।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া ব্যতিত অন্যান্য কারণে বসা নিয়েই এই মতভেদ। কিন্তু প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার (পেশাব বা পায়খানা) উদ্দেশ্যে বসা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। সকল ফকীহর মতেই তা হারাম। অনুরূপ অনিবার্য প্রয়োজনে কবরের উপর দিয়ে চলাচলের বৈধতার ব্যাপারেও ফকীহগণ একমত। এই অনিবার্য প্রয়োজনের একটা উদাহরণ হলো অন্য কবরের উপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া নিজের মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে পৌঁছানোই যায়না।

কবরকে আস্তর করা ও তার উপর লেখা নিষিদ্ধ : জাবের রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. কবরকে আস্তর বা চুনকাম করতে, তার ওপর বসতে ও তার উপর স্থাপনা নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। -আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ ও তিরমিযি। তিরমিযির বর্ণনায় পা দিয়ে মাড়ানোও নিষেধ করা হয়েছে। নাসায়ীর বর্ণনায় কবরে কোনো কিছু লেখা এবং স্থাপনায় কোনো কিছু সংযোজন করতেও নিষেধ করা হয়েছে। অধিকাংশ আলেম এই নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহ আর ইবনে হাযম হারাম অর্থে গ্রহণ করেছেন। বলা হয়েছে : এই নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য হলো, কবর হচ্ছে ধ্বংসের প্রতিক, স্থায়িত্বের প্রতিক নয়। কবরকে আস্তর বা চুনকাম করা পার্থিব সৌন্দর্যের অংশ। মৃত ব্যক্তির এর প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ বলেন : এর তাৎপর্য হলো, চুন আগুনে অধিকতর দহনশীল। তাই এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শেষোক্ত এই বিশ্লেষণের সমর্থনে যায়েদ বিন আরকামের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। এক ব্যক্তি তার ছেলের কবরকে পাকা করতে ও চুনকাম করতে চাইলে তিনি বললেন : তুমি একটা বাজে ও অন্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছ। যে জিনিসকে আগুনে স্পর্শ করেছে, তা কবরের কাছে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

তবে কবরকে মাটি দিয়ে লেপা বৈধ। তিরমিযি বলেছেন : হাসান বসরী ও শাফেয়ী কবরে মাটির প্রলেপ দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। জাফর বিন মুহাম্মদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. তার পিতার কবরকে মাটি থেকে এক বিঘত উঁচু করেন, তাকে গৃহের আংগিনা থেকে দেয়া লাল মাটির প্রলেপ দেন এবং তার উপর নুড়ি পাথর বিছিয়ে দেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু বকর আল নাজ্জাদ। হাফেয ইবনে হাজার তালখীসে এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।

আলেমগণ কবরের চুনকাম ও আস্তর করা যেমন মাকরূহ আখ্যায়িত করেছেন, তেমনি তারা কবরকে কাঠনির্মিত কফিন বা শবাধারে করে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করাকেও মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। মাটি আর্দ্র বা ভিজে হলে কবরকে ইট দিয়ে বা অনুরূপ অন্য কিছু দিয়ে নির্মাণ করা এবং কাঠের শবাধারে দাফন করা বৈধ হবে। মাকরূহ হবে না। মুগীরা ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ণিত : প্রাচীন আলেমগণ কাঁচা ইট পছন্দ এবং পাকা ইট অপছন্দ করতেন। বাঁশ ব্যবহার করা পছন্দ এবং কাঠ ব্যবহার অপছন্দ করতেন। হাদিসে কবরে কোনো কিছু লেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাহ্যত এই নিষেধাজ্ঞার অধীন কবরের উপর মৃত ব্যক্তির নাম বা অন্য যা কিছুই লেখা

হোক, কোনো পার্থক্য নেই। হাকেম এই হাদিস উল্লেখ করার পর বলেন : হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে তো সহীহ্। কিন্তু এর উপর আমল নেই। কেননা প্রাচ্যে ও প্রতিচ্যে মুসলমানদের নেতা ও শাসকগণ তাদের কবরে লেখেন। এটা নবীনরা প্রাচীনদের কাছ থেকে গহণ করেছেন। যাহাবি মন্তব্য করেছেন : এটা একটা নব্য উদ্ভাবিত জিনিস। তবে এটা নিষেধ বলে তারা জানতে পারেননি। হাম্বলি মাযহাবে কবরের ওপর লেখার নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ অর্থবোধক, চাই তা কুরআন হোক বা মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় হোক। শাফেয়ী হাম্বলিদের মতকে সমর্থন করে এ কথা সংযোজন করেছেন : কবর যখন কোনো আলেমের বা কোনো সৎ ব্যক্তির হয়, তখন তার নাম ও পরিচয় কবরের উপর লেখা বাঞ্ছনীয়। মালেকিগণ মনে করেন : কবরের উপর কুরআন লেখা হারাম। মৃত ব্যক্তির নাম ও মৃত্যুর তারিখ লেখা মাকরূহ। হানাফিদের মতে কবরের ওপর লেখা মাকরূহ তাহরিমী। তবে যদি আশংকা থাকে কবরের চিহ্ন হারিয়ে যাবে তাহলে মাকরূহ নয়।

ইবনে হাযম বলেছেন : মৃত ব্যক্তির নাম পাথরে খোদাই করা হলে মাকরূহ হবেনা। হাদিসে কবর খনন থেকে যে মাটি বের হয় তার চেয়ে বেশি মাটি দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বায়হাকি এ ব্যাপারে এভাবে শিরোনাম করেছেন : কবর থেকে যে মাটি বের হয় তার চেয়ে বেশি মাটি দাফনে ব্যবহার করা হবেনা, যাতে বেশি উঁচু হয়ে না যায় এ সংক্রান্ত অধ্যায়"। শওকানি ও শাফেয়ীও একই মত পোষণ করেন। শাফেয়ী বলেন : কবর থেকে বের হওয়া মাটির চেয়ে বেশি মাটি দাফনে ব্যবহার না করা মুস্তাহাব। যাতে কবর অতিমাত্রায় উঁচু না হয়ে যায়। তবে বেশি মাটি দিলে দোষের কিছু নেই।

এক কবরে একাধিক মৃতের দাফন : প্রাচীন মনীষীদের যে রীতি এ যাবত চলে আসছে, তা হলো প্রত্যেক মৃতকে পৃথক কবর দাফন করা হবে। একাধিক মৃতকে এক কবরে দাফন করা মাকরূহ। তবে মৃতের সংখ্যা বেশি হওয়া বা দাফনকারিদের সংখ্যা বা শক্তি কম হওয়ার কারণে প্রত্যেক মৃতকে পৃথক কবরে দাফন করা দুঃসাধ্য হলে একাধিক মৃতকে এক কবরে দাফন করা যাবে। কেননা আহমদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন আনসারগণ রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললেন : হে রসূলুল্লাহ। আমরা খুবই ক্লান্ত ও আহত। এখন আপনি আমাদেরকে কিভাবে শহীদদের দাফনের নির্দেশ দিচ্ছেন? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : চওড়া ও গভীর করে কবর খনন করো এবং এক কবরে দু'জন তিনজন করে দাফন করো। তারা বললেন : আগে কাকে দফান করবো? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি বেশি কুরআন পড়তো। ওয়াছেলা বিন আসমা থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন : একই কবরে নারী ও পুরুষকে দাফন করা হতো। প্রথমে পুরুষকে রাখা হতো, তার পেছনে রাখা হতো মহিলাকে।

সমুদ্রে মৃত ব্যক্তির দাফন : আল মুগনীতে বলা হয়েছে : যখন কেউ সামুদ্রিক জাহাজে বা নৌকায় মারা যায়। তখন ইমাম আহমদের মতে, জাহাজের লোকেরা যদি আশা করে, অচিরেই তাকে দাফন করার মতো স্থলভাগ পাওয়া যাবে, তাহলে তাকে একদিন বা দুইদিন আটকে রাখতে হবে। যতোক্ষণ লাশ বিকৃত হওয়ার আশংকা না দেখা দেয়। যদি স্থলভাগ না পাওয়া যায়, তবে তাকে গোসল করানো হবে, কাফনের পোশাক পরানো হবে, সুবাসিত করা হবে ও তার জানাযার নামায পড়া হবে। তারপর কোনো ভারি জিনিস বেধে দিয়ে পানিতে ফেলে দেয়া হবে। এটা আতা ও হাসানেরও অভিমত। হাসান বলেছেন : তাকে একটা বস্তায় পুরে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন : দুটো কাঠের পাতের মাঝে বেঁধে সমুদ্রে ফেলা উচিত, যাতে সমুদ্র তাকে ভাসিয়ে কিনারে নিয়ে যায়। এতে মৃত দেহ এমন কোনো দলের হাতে পড়তে পারে, যারা তাকে দাফন করবে। আর সমুদ্রে ফেলে দিলেও গুনাহ হবে না।

তবে বস্তায় পুরে সাগরে নিক্ষেপ করাই উত্তম। কেননা এতে মৃত দেহকে নগ্নতা থেকে রক্ষা করার মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়। দুটো পাতের মধ্যে বেঁধে ফেলে দেয়া তাকে বিকৃতি ও অবমাননার মুখে ঠেলে দেয়ার শামিল। এতে এমনও হতে পারে যে, লাশ সমুদ্রের কিনারে নগ্ন ও অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকবে। আবার কোনো মোশরেক সম্প্রদায়ের হাতেও পড়তে পারে। তাই আমরা যা বলেছি সেটাই শ্রেয়।

কবরের উপর গাছের ডাল পুতে দেয়া : কবরের উপর গাছের ডালপালা বা ফুল রাখার কোনো বিধান শরিয়তে নেই। তবে বুখারিতে ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সা. দুটো কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : এই দুই কবরের মৃত ব্যক্তিদ্বয় আযাব ভোগ করছে। এ আযাব কোনো বড় ধরনের কাজের জন্য নয়। একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অবলম্বন করতোনা। অপরজন চোগলখুরি করতো। অতপর দুই খণ্ড গাছের ডাল দুটো কবরে গেড়ে দিলেন এবং বললেন, হয়তো এ দুটো যতোক্ষণ না শুকাবে, ততোদিন, এ দু'জনের আযাব কিছুটা কমিয়ে দেয়া হবে। এ হাদিসের জবাবে খাত্তাবী বলেছেন : কবরে খেজুরের কাঁচা ডাল পোতা এবং "যতোক্ষণ তা না শুকায় ততোক্ষণ আযাব কম থাকতে পারে" বলে রসূল সা. এর উক্তির অর্থ হচ্ছে আযাব কমানোর জন্য রসূল সা. এর দোয়া ও প্রভাবে এটা একটা বরকতপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য হতে পারে। মনে হয়, রসূল সা. উক্ত ডাল দুটির আর্দ্রতাকে উভয়ের আযাব সীমিত করার উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এজন্য নয় যে, কাঁচা ডালে এমন কিছু আছে, যা শুকনো ডালে নেই। সাধারণ লোকেরা বহু দেশে তাদের মৃতদের কবরে খেজুরের পাতা বিছিয়ে দেয়। আমার মতে, তাদের এ কাজেরও কোনো যৌক্তিকতা নেই। বস্তুত খাত্তাবীর বক্তব্য সঠিক। রসূল সা. এর সাহাবিরাও এটাই উপলব্ধি করেছিলেন। কেননা একমাত্র বারীদা আসলামী ব্যতিত আর কারো সম্পর্কে জানা যায়না কোনো গাছের ডালপাতা বা ফুল কোনো কবরে রেখেছেন। বুখারিতে বর্ণিত, বারীদা তার কবরে দুটো কাঁচা ডাল রাখবার জন্য ওসিয়ত করেছিলেন। তাই বলে এটা শরিয়তের বিধান হতে পারেনা। কেননা তা যদি হতো, তাহলে এটা বারীদা ছাড়া অন্য সমস্ত সাহাবির অজানা থাকার কথা নয়। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : বারীদা হাদিসটিকে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করতেন, শুধু ঐ দুই মৃত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইবনে রশীদ বলেছেন : বুখারির বক্তব্য থেকে মনে হয়, কবরে গাছের ডাল স্থাপনের ব্যাপারটা উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এজন্যই তিনি এ বর্ণনার পরেই ইবনে উমরের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। একটি কবরে তাঁবু দেখে তিনি বলেছিলেন : এটা সরিয়ে নাও। ওর কৃতকর্মই ওকে ছায়া দেবে।" ইবনে উমরের এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, কবরে যা রাখা হয় তাতে কোনো উপকারিতা নেই। উপকারিতা আছে শুধু সৎ কর্মের।

মৃত মহিলার পেটে জীবিত সন্তান থাকলে তার দাফনের বিধান : যখন কোনো মহিলা তার পেটে জীবিত সন্তান থাকা অবস্থায় মারা যায়, তখন ঐ সন্তানের জীবিত উদ্ধার করার আশা থাকলে পেট কেটে তাকে বের করা ওয়াজিব। বিশ্বস্ত ও দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমেই এটা জানা যেতে পারে। মুসলিম অন্তসত্ত্বা কিতাবী মহিলা মারা গেলে : যে কিতাবী মহিলা মুসলিম পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে, সে মারা গেলে তাকে পৃথক জায়গায় কবর দেয়া হবে। বায়হাকি ওয়াছেলা বিন আসকা থেকে বর্ণনা করেছেন : জনৈক খৃস্টান মহিলা গর্ভে মুসলমান সন্তান থাকা অবস্থায় মারা যায়। তাকে খৃস্টান কবরস্থান ও মুসলমান কবরস্থান উভয় কবরস্থান থেকে দূরে পৃথক জায়গায় দাফন করা হয়। ইমাম আহমদ এ কাজটি পছন্দ করেন এবং যুক্তি দেখান, যেহেতু সে একজন কাফের মহিলা, তাই তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা চলবেনা।

কেননা তার আযাবে তারা কষ্ট পাবে। আর কাফেরদের কবরস্থানেও দাফন করা যাবেনা। কারণ ঐ কবরস্থানের অধিবাসীদের আযাবের কারণে তার পেটের মুসলমান সন্তান কষ্ট পাবে।

বাড়িতে দাফন করার চেয়ে কবরস্থানে দাফন করা উত্তম : ইবনে কুদামা বলেছেন : আবু আবদুল্লাহর অর্থাৎ ইমাম আহমদের নিকট মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা বাড়িতে দাফন করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। কেননা এটা তার উত্তরাধিকারীদের তুলনায় অন্যান্য জীবিতদের জন্য কম ক্ষতিকর, আখেরাতের বাসস্থানের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। মৃতের জন্য অধিকতর দোয়ার সুযোগ এনে দেয় এবং তার প্রতি অধিকতর মমত্ববোধ সৃষ্টি করে। সাহাবি, তাবেয়ীন ও তাদের পরবর্তীদেরকে সব সময় মরুভূমিতে কবর দেয়া হতো।

কেউ বলতে পারে, রসূলুল্লাহ সা.কে তার বাড়িতেই এবং তাঁর দুই সাথি (উমর ও আবু বকর)কে তাঁর পাশেই কবর দেয়া হয়। এর জবাব হলো, আয়েশা রা. বলেছেন : এটা করার উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁর কবরকে যেন মসজিদে পরিণত না করা হয়। -বুখারি। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সাহাবিদেরকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করতেন। আর তিনি নিজে যা করেছেন তা অন্যের কাজের চেয়ে উত্তম। সাহাবিগণ মনে করেছিলেন, বাড়িতে দাফন হওয়া শুধু রসূল সা. এর জন্যই নির্দিষ্ট। তাছাড়া এই মর্মে হাদিসও বর্ণিত হয়েছে যে, নবীরা যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই সমাহিত হন। উপরন্তু বাড়িতে সমাহিত হলে তাকে অধিক সংখ্যক রাতের আগন্তুক থেকে রক্ষা করা যাবে, আর অন্যান্য কবর থেকে তাঁর কবরকে পৃথক করা যাবে।

ইমাম আহমদকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, কেউ যদি ওসিয়ত করে যায়, তাকে তার বাড়িতে দাফন করতে? তিনি বলেন, তাকে কবরস্থানে অন্যান্য মুসলমানদের পাশে দাফন করা হবে।

মৃতদেরকে গালি গালাজ করা নিষিদ্ধ

মৃতদেরকে গালি দেয়াও বৈধ নয়, তাদের কৃত অন্যায় অনৈতিক কাজের আলোচনা করাও বৈধ নয়। বুখারি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা মৃতদের গালি দিওনা। কেননা তারা যা পাঠিয়েছে, তার কাছেই তারা পৌঁছে গেছে।"

আবু দাউদ ও তিরমিযি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের মৃতদের কৃত সৎ কাজগুলো আলোচনাা করো, তাদের কৃত অন্যায় কাজগুলোর আলোচনাা থেকে বিরত থাকো।"

তবে যে সকল মুসলমান প্রকাশ্যেই গুনাহর কাজ বা বিদয়াতী কাজ করতো, অথবা কোনো ফিতনা ফাসাদ বা নৈরাজ্যকর ও ক্ষতিকর কাজ করতো, তাদের সেসব অপকর্মের আলোচনায় যদি মুসলমানদের কোনো কল্যাণ বা উপকারিতা নিহিত থাকে, তবে তা করা বৈধ। উদাহরণ স্বরূপ, তাদের কার্যকলাপ থেকে মানুষকে সাবধান করা, তাদের কথাবার্তার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করা এবং তাদের অনুকরণ বর্জনে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু যদি কোনো উপকারিতা না থাকে, তবে মৃতের সমালোচনা বৈধ হবেনা। বুখারি ও মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. এর সাথে একদল মুসলমান একটা মৃতদেহের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃতের প্রশংসা করলো। রসূল সা. সঙ্গে সঙ্গে বললেন : অবধারিত হয়ে গেলো। এরপর চলতে চলতে আর একটা লাশকে তারা অতিক্রম করলেন। সাথিরা তার নিন্দা করলো। সংগে সংগে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : অবধারিত হয়ে গেলো। উমর রা. বললেন : "হে রসূলুল্লাহ, কী অবধারিত হয়ে গেলো? তিনি বললেন : একজনের তোমরা প্রশংসা করলে। তাই তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেলো। আর একজনের তোমরা নিন্দা করলে। সেজন্য তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেলো। তোমরা তো পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।"

কাফের মৃতদেরকে নিন্দা করা শুধু নয়, অভিসম্পাত করাও বৈধ। আল্লাহ বলেছেন :

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ... تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ -

"বনী ইসরাইলের যারা কুফরী করেছে তাদের উপর অভিসম্পাত!" আরো বলেছেন : "আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক।" ফিরাউন ও তার সমভাবাপন্নদের প্রতি অভিসম্পাত ও নিন্দা আল্লাহর কিতাবে প্রসিদ্ধ। কুরআনে বলা হয়েছে : أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ . "সাবধান, যালেমদের ওপর অভিসম্পাত।"

কবরের কাছে কুরআন পাঠ

কবরের কাছে কুরআন পাঠ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কী, তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী ও মুহাম্মদ একে মুস্তাহাব মনে করেন। যাতে মৃত ব্যক্তি কুরআনের সাহচর্যের বরকত লাভ করে। মালেকি মাযহাবের কাযী ইয়ায ও কুরাফী ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আহমদের মতে, এতে দোষের কিছু নেই। মালেক ও আবু হানিফা এটা অপছন্দ করেছেন এই যুক্তিতে যে, এর সপক্ষে কোনো সুন্নত তথা হাদিস নেই।

কবর দেয়ার পর পুনরায় খোঁড়া

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত, যে স্থানটিতে কোনো মুসলমানকে দাফন করা হয়, সেটি তার জন্য ওয়াকফ অর্থাৎ স্থায়ীভাবে বরাদ্দকৃত যতক্ষণ তার কিছু মাত্র হাড় বা গোশত সেখানে বিদ্যমান থাকবে। তার কিছু অংশও যদি অবশিষ্ট থাকে তবে তার সমগ্র দেহের জন্যই কবরটি নিষিদ্ধ থাকবে। (অর্থাৎ ঐ জায়গায় অন্য কোনো কবর দেয়া বা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।) কিন্তু যদি মৃত দেহ পুরান হয়ে পুরোপুরি মাটি হয়ে যায় তাহলে তার জায়গায় অন্য মৃতকে দাফন করাও যাবে এবং গাছের চারা লাগানো, চাষ করা, বাড়িঘর নির্মাণ ও অন্যান্য পন্থায় স্থানটি দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হবে। আর যদি কবর খনন করে মৃতের হাড়গোড় পাওয়া যায়, তাহলে খননকারি তার খনন কার্য পূর্ণ করবেনা। আর যদি খনন কার্য সম্পন্ন হয়ে গিয়ে থাকে এবং কোনো হাড়গোড় দেখা যায়, তাহলে কবরের পাশে কবর তৈরি করা হবে এবং তার সাথে অন্য মৃতকেও দাফন করা বৈধ হবে।

যাকে জানাযার নামায ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। তাকে কবর থেকে বের করা হবে এবং জানাযা পড়ে পুনরায় দাফন করে করা হবে- যদি কবরের উপর মাটি দেয়া না হয়ে থাকে। আর যদি মাটি দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে কবর খনন করা ও মৃতকে তা থেকে বের করা হানাফি, শাফেয়ী ও আহমদের একটি বর্ণনা অনুযায়ী হারাম হবে। তাকে বের না করে কবরে রেখেই জানাযা পড়া হবে। আহমদের অন্য বর্ণনা অনুযায়ী কবর খনন করে মৃতকে বের করে জানাযা পড়া হবে। কোনো বৈধ উদ্দেশ্যে কবর খনন করা তিন ইমামের নিকট বৈধ। যেমন কোনো জিনিস ভুলে কবরের মধ্যে ফেলে রেখে আসা, মৃতকে কেবলামুখি করে না শোয়ানো হয়ে থাকলে তাকে কেবলামুখি করে শোয়ানো এবং যাকে বিনা গোসলে দাফন করা হয়েছে তাকে গোসল করানো এবং ভালোভাবে কাফন পরানো। তবে এসব করতে গিয়ে মৃতদেহ ফেটে যাওয়ার আশংকা থাকলে পরিত্যাগ করা হবে।

এসব কাজ করার উদ্দেশ্যে কবর খুঁড়ে মৃতকে বের করার বিরোধিতা করেছেন হানাফি ইমামগণ। তারা এসব কাজকে মৃতদেহ বিকৃতকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মৃতদেহ বিকৃত করা যে হারাম, সেটাতো সুবিদিত। ইবনে কুদামা বলেছেন : যে মৃতদেহে পচন ধরেছে, সেটির ক্ষেত্রেই কবর খুড়ে মৃতদেহ বের করাকে বিকৃতকরণ গণ্য করা হবে এবং কবর খোড়া হবেনা।

আর যদি কাফন ছাড়া দাফন করা হয়ে থাকে, তাহলে দু'রকমের ব্যবস্থা করা যায় : একটি হলো, যেমন আছে তেমন রেখে দেয়া। কেননা কাফনের উদ্দেশ্য হলো মৃতকে আবৃত করা এবং মাটি দিয়ে আবৃত করার মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো, কবর খুঁড়ে মৃতকে বের করে কাফন পরানো। কেননা কাফন পরানো গোসলের মতোই ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ বলেছেন : খননকারি যদি তার কোদাল বা বেলচা ভুলে কবরে রেখে এসে থাকে তাহলে তা উদ্ধার করতে কবর খোঁড়া যাবে। তিনি বলেছেন : কোদাল, টাকা পয়সা বা অন্য কোনো জিনিস কবরে পড়ে গেলে তা আনার জন্য কবর খোঁড়া যাবে। তিনি বলেন : কবরে রেখে আসা জিনিস যদি দামি হয়, তাহলে কবর খোঁড়া হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, মৃতের অভিভাবকরা যদি জিনিসটির মূল্য দিয়ে দেয় তাহলে? তিনি বললেন : তারা যদি তার প্রাপ্য দিয়ে দেয় তাহলে সে আর কী চায়?

ইমাম বুখারি, জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে তার কবরে রাখার পর রসূল সা. তার কাছে এলেন, তারপর তিনি আদেশ দিয়ে তাকে কবর থেকে বের করালেন। তারপর তাকে নিজের হাঁটুর উপর রাখলেন, নিজের একটু থুথু তার উপর নিক্ষেপ করলেন এবং তাকে একটা জামা পরিয়ে দিলেন। জাবের থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার পিতার সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছিল। আমার কাছে এটা ভালো লাগেনি। তাই তাকে ওখান থেকে বের করলাম (৬ মাস পরে) এবং আলাদা একটা কবরে ঢুকালাম। বুখারি এ দুটি হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন এরূপ : " মৃতকে কি কোনো কারণে কবর থেকে বের করা যায়?"

আর আবু দাউদ আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন : আমরা তায়েফে যাওয়ার জন্য যখন বের হলাম তখন একটা কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় রসূল সা. বললেন : এটা আবু রিগালের কবর। সে এই হারাম শরিফের ভেতরে থেকে আক্রমণ প্রতিহত করছিল। পরে যখন সে বের হলো, অমনি তার জাতি যে দুর্ভাগ্যে নিপতিত ছিলো, সেও তাতে নিপতিত হলো। ফলে তাকে এখানে সমাহিত করা হলো। এর নিদর্শন হলো, তার সাথে স্বর্ণের একটা শাখা দাফন করা হয়েছে। তোমরা যদি তার কবর খুঁড়ো তাহলে তার কোছে ওটা পাবে। তৎক্ষণাৎ লোকেরা তার সন্ধানে দ্রুত বেরিয়ে পড়লো এবং স্বর্ণের শাখাটি বের করলো। খাত্তাবী বলেন : এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, মুসলমানদের উপকারের নিশ্চয়তা থাকলে মোশরেকদের কবর খোড়া বৈধ। এ ক্ষেত্রে তাদের পবিত্রতা মুসলমানদের পবিত্রতার মতো নয়।

কবর থেকে মৃতকে স্থানান্তর : শাফেয়িদের মতে শুধু মক্কা, মদিনা বা বাইতুল মাকদাসে মৃতকে স্থানান্তর করা যায়। অন্য কোনো জায়গায় তা করা যাবেনা। ঐ তিনটি শহরের অসাধারণ মর্যাদার কারণেই সেখানে স্থানান্তরকে এই ব্যতিক্রমী বৈধতা দেয়া হয়েছে। কেউ যদি এই শহরগুলো ব্যতিত অন্য কোথাও তার মৃতদেহ স্থানান্তরের ওসিয়ত করে, তবে সে ওসিয়ত বাস্তবায়িত করা যাবেনা। কেননা এতে তার দাফন শুধু বিলম্বিতই হবেনা বরং তা বিকৃত হবারও আশংকা রয়েছে।

অনুরূপ, কোনো ন্যায়সংগত উদ্দেশ্য ছাড়া মৃতদেহ কবর থেকে সরানো হারাম। উদাহরণ স্বরূপ, বিনা গোসলে দাফন করা হয়ে থাকলে, কেবলা ব্যতিত অন্যদিকে মুখ করে দাফন করা হয়ে থাকলে অথবা কবর ভিজে গেলে বা কবরে স্রোতের বা বন্যার পানি ঢুকলে মৃতকে কবর থেকে সরানো যেতে পারে। মিনহাজ গ্রন্থে বলা হয়েছে : অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতিত মৃতকে সরানো বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কবর খোড়া নিষিদ্ধ। অনিবার্য প্রয়োজনের উদাহরণ হলো,

দাফনের পর জানা গেলো : মৃতকে বিনা গোসলে, বল প্রয়োগে দখলকৃত জমিতে বা দুটি ছিনতাইকৃত কাপড়ে দাফন করা হয়েছিল। অথবা কবরে কোনো দ্রব্য বা সামগ্রী পড়ে গিয়েছিল অথবা মৃতকে কেবলা ছাড়া অন্যমুখি করে দাফন করা হয়েছিল। মালেকিদের মত হলো, কোনো সংগত প্রয়োজন হলো, যেমন সমুদ্রে ডুবে যাবে বা হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলবে এই আশংকা থেকে মুক্ত হওয়া। অথবা আপনজনেরা তার যিয়ারত করতে পারবে, অথবা আপনজনদের মধ্যেই সমাহিত হবে, এই সুবিধা নিশ্চিত হওয়া। অথবা স্থানান্তরিত জায়গায় বরকত লাভ করবে এই আশা ইত্যাদির কারণে মৃতের স্থানান্তর বৈধ। মৃতদেহ ফেটে যাবেনা, বিকৃত হবেনা বা তার হাড় ভেংগে যাবেনা এটা নিশ্চিত হলে উল্লিখিত কারণে মৃতকে স্থানান্তর করা বৈধ।

হানাফিদের মতে, এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরূহ। আর প্রত্যেক মৃতকে যে শহরে মারা গেছে সেই শহরের কবরস্থানে দাফন করা মুস্তাহাব। আর দাফনের আগে এক মাইল বা দু'মাইল দূরে মৃতকে স্থানান্তর করা যাবে। কেননা কখনো কখনো কবরস্থানের দূরত্বও দু'এক মাইল হয়ে থাকে। তবে বিনা ওযরে দাফনের পর স্থানান্তর করা হারাম। আর যদি কোনো মহিলার ছেলে মারা যায় এবং মহিলার আবাসিক শহর ব্যতিত অন্যত্র তার অনুপস্থিতিতে সমাহিত হয়, অথচ এটা সে সহ্য করতে অক্ষম এবং সে চায় তাকে স্থানান্তরিত করা হোক, তাহলে তার এ দাবি মানা যাবেনা। হাম্বলিরা বলেন : শহীদ যেখানে নিহত হয় সেখানেই তাকে দাফন করা মুস্তাহাব।

আহমদ জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : নিহতদেরকে তাদের নিহত হওয়ার স্থানেই দাফন করো। ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. উহুদে নিহতদেরকে তাদের নিহত হওয়ার স্থানে ফেরত পাঠানোর (অর্থাৎ স্থানান্তরের) আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু অন্য মৃতদেরকে সংগত কারণ ব্যতিত এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করা যাবেনা। এটা আওযায়ী ও ইবনুল মুনযিরের অভিমত। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা বলেছেন : আবু বকরের ছেলে আবদুর রহমান সেনাবাহিনীর সাথে থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তার লাশ মক্কায় এনে দাফন করা হয়। আয়েশা যখন মক্কায় এলেন তার কবরের কাছে এলেন। তারপর বললেন : আল্লাহর কসম, আমি তোমার কাছে উপস্থিত থাকলে তুমি যেখানে মারা গিয়েছ, সেখানেই তোমাকে দাফন করা হতো। আর তোমার দাফনে যদি উপস্থিত থাকতাম তবে তোমার কবর যিয়ারত করতামনা। কেননা তাতে মৃতদেহ অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলা পোহায় এবং বিকৃতির আশংকাও অপেক্ষাকৃত কম থাকে।' তবে কোনো সংগত উদ্দেশ্য থাকলে মৃতকে স্থানান্তর করা বৈধ। আহমদ বলেছেন : তার নিজ শহর থেকে মৃতকে অন্য শহরে স্থানান্তরে কোনো আপত্তি আছে বলে আমার জানা নেই। যুহরীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও সাঈদ বিন যায়েদকে আকীক থেকে মদিনায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

শোক সন্তপ্তদের সান্ত্বনা দান

শোক সন্তপ্তদেরকে সান্ত্বনা দেয়া ও ধৈর্যধারণে উদ্বুদ্ধ করা কর্তব্য। এজন্য যা যা বললে তারা সান্ত্বনা পাবে, দুঃখ লাঘব হবে এবং বিয়োগ বেদনা হালকা হবে, তা বলা উচিত। শোক সন্তপ্ত ব্যক্তি অমুসলিম হলেও তাকে সান্ত্বনা দেয়া মুস্তাহাব। কেননা ইবনে মাজাহ ও বায়হাকি আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মুসলমান তার ভাইকে তার বিপদ মুসিবতের জন্য সান্ত্বনা দিলে আল্লাহ তায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন পরম সম্মানের পোশাক পরাবেন।" উল্লেখ্য, সান্ত্বনা মাত্র একবার দেয়াই মুস্তাহাব।

মৃতের পরিবারের সকল সদস্য এবং ছোট বড় ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দেয়া কর্তব্য। (আলেমগণ সুন্দরী যুবতীকে পুরুষ কর্তৃক সান্ত্বনা দিতে নিষেধ করেছেন। তাকে সান্ত্বনা দেবে শুধু তার মাহরাম আত্মীয়গণ) সান্ত্বনা দাফনের আগেও দেয়া যাবে, পরেও দেয়া যাবে এবং তিনদিন পর্যন্ত দেয়া যাবে। অবশ্য শোকাহত ব্যক্তি যদি অনুপস্থিত থাকে তবে তিনদিন পরও সান্ত্বনা দেয়া যাবে।

সান্ত্বনার ভাষা : শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিদের দুঃখ ও বেদনাকে প্রশমিত করে ও ধৈর্যধারণে উদ্বুদ্ধ করে এমন যে কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে। তবে হাদিস থেকে যে ভাষা জানা যায় তার মধ্যে সীমিত থাকাই উত্তম। বুখারি উসামা বিন যায়েদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. এর এক মেয়ে তাঁর নিকট সংবাদ পাঠালো : আমার একটা ছেলে মারা গেছে। তাই আপনি আমাদের কাছে আসুন। রসূলুল্লাহ সা. তৎক্ষণাৎ সালাম জানিয়ে বার্তা পাঠালেন :

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ .

"আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তারই সম্পদ, যা দিয়েছেন তাও তারই সম্পদ, আর সবকিছুই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার নিকট থাকে। অতএব, সবার ধৈর্যধারণ করা ও সব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত।" (ইমাম নববী বলেছেন : এ হাদিস ইসলামের শ্রেষ্ঠ মূলনীতিসমূহের অন্যতম। ইসলামের বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ, খুঁটিনাটি বিধি, নৈতিক উপদেশ, বিপদে, আপদে, রোগব্যাধিতে, শোক দুঃখে ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধৈর্যধারণের শিক্ষা রয়েছে এ হাদিসে। প্রথমাংশের অর্থ হলো : আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তারই মালিকানাভুক্ত। সমগ্র বিশ্বজগতই আল্লাহর মালিকানা। কাজেই তিনি তোমাদের কিছু নেননি। তারই মালিকানাভুক্ত যে জিনিস তোমাদের নিকট আমানত হিসেবে ছিলো তা নিয়েছেন। দ্বিতীয়াংশের অর্থ হলো : তিনি যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা তাঁর মালিকানা থেকে বেরিয়ে যায়নি। বরং তা আল্লাহরই সম্পদ। তিনি এতে যখন যা ইচ্ছা রদবদল করতে পারেন। সকল জিনিসই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্ট। তিনি স্বয়ং ব্যতিত সবকিছুই নশ্বর। অতএব, দুঃখ বিলাপ ও আহাজারি করোনা। যাকে তিনি নিয়েছেন, তার নির্দিষ্ট আয়ু ফুরিয়ে গেছে। যার আয়ু ফুরিয়ে যায়, তার এক বিন্দু বিলম্ব হওয়া বা অগ্রিম চলে যাওয়া অসম্ভব। এসব যখন জানো, তখন ধৈর্যধারণ করো এবং বিপদ মুসবিতকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নাও।)

আর তাবারানি, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া, মুয়ায বিন জাবাল থেকে বর্ণনা করেছেন, মুয়ায বিন জাবালের একটি ছেলে মারা গেলো। রসূলুল্লাহ সা. তার নিকট একটা শোক বাণী পাঠালেন। তিনি লিখলেন : "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের সা. পক্ষ থেকে মুয়ায বিন জাবালের নিকট। তোমার ওপর সালাম। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। আমি তাঁর প্রশংসা করি। আল্লাহ তোমাকে বৃহত্তর প্রতিদান দিন এবং ধৈর্যধারণ করার শক্তি দিন। আর আমাদেরকে ও তোমাকে শোকর করার তওফীক দিন। কেননা আমাদের জীবন, সহায় সম্পদ ও পরিবার পরিজন আল্লাহ প্রদত্ত আনন্দদায়ক দানসমূহের অন্যতম এবং আমাদের নিকট গচ্ছিত তাঁর আমানত। আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমাকে আনন্দ ও গৌরব দান করুন এবং তাকে তোমার কাছ থেকে তুলে নেয়ার বিনিময়ে প্রচুর প্রতিদান দান করুন। তোমার উপর রহমত, করুণা ও হেদায়াত বর্ষণ করুন। তুমি যদি এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও, তাহলে ধৈর্যধারণ করো। তোমার অস্থিরতা ও বিলাপ যেন তোমার সওয়াব নষ্ট করে না দেয়। জেনে রেখো, বিলাপ ও শোক কোনো মৃতকে ফিরিয়ে আনবেনা, কোনো দুঃখ দূর করবেনা। আর যে বিপদ অবধারিত ছিলো, তাতো এসেই গেছে। তোমার ওপর আবারো

সালাম।" (হাদিসটি দুর্বল। কেননা মুয়াযের ছেলে রসূল সা. এর মৃত্যুর দু'বছর পর মারা গিয়েছিল।) ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেন : রসূল সা. যখন ইন্তিকাল করেন এবং সান্ত্বনা এলো, তখন লোকেরা এক বক্তাকে বলতে শুনলো : প্রত্যেক মুসিবতের সান্ত্বনা আল্লাহর কাছেই রয়েছে। প্রত্যেক মৃতের উত্তরাধিকারী রয়েছে এবং প্রত্যেক হারানো ব্যক্তির বা বস্তুর স্থলাভিষিক্ত রয়েছে। কাজেই তোমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করো। তাঁর কাছ থেকেই প্রত্যাশা করো। কেননা বিপন্ন হয়ে যে অস্থিরতা প্রকাশ করে, সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।" এ হাদিসের সনদ দুর্বল।

আলেমগণ বলেন : কোনো মুসলমান তার মুসলমান মৃত আত্মীয়ের জন্য সান্ত্বনা দিতে গেলে বলবে : "আল্লাহ তোমাকে বৃহত্তর সওয়াব দিন, তোমাকে উত্তম সান্ত্বনা দিন এবং তোমার মৃতকে ক্ষমা করুন।" আর কোনো মুসলমানকে তার মৃত অমুসলিম আত্মীয়ের জন্য সান্ত্বনা দিতে গেলে বলবে : "আল্লাহ তোমাকে বৃহত্তর সওয়াব ও উত্তম সান্ত্বনা দিন।" আর কোনো কাফেরকে তার মৃত মুসলিম আত্মীয়ের জন্য সান্ত্বনা দিতে গেলে বলবে : "আল্লাহ তোমাকে উত্তম সান্ত্বনা দিন এবং তোমার মৃতকে ক্ষমা করুন।" আর কোনো কাফেরকে তার কাফের আত্মীয়ের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিতে গেলে বলবে : "আল্লাহ তোমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন।"

সান্ত্বনার জবাবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বলবে : "আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন।" ইমাম আহমদের মতে, সান্ত্বনাদানকারির সাথে ইচ্ছা করলে হাতে হাত মেলাতেও পারে, নাও পারে। আর যদি দেখে, শোক সন্তপ্ত ব্যক্তি তার বিপদে অধীর হয়ে কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলছে, তবুও তাকে সান্ত্বনা দেবে। তার অন্যায় কাজের জন্য সে নিজের ন্যায়সংগত দায়িত্ব বর্জন করবেনা। তবে সে যদি তাকে এ ধরনের অবৈধ পন্থায় শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করে, তবে সেটাই হবে উত্তম।

শোক প্রকাশের জন্য সমাবেশ বা বৈঠক করা : সুন্নত হলো মৃতের আত্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিজনকে শোক, সমবেদনা ও সান্ত্বনার বাণী জানিয়ে সবাই নিজ নিজ কাজে চলে যাবে, শোক প্রকাশকারী বা শোকার্তদের কেউই এজন্য সমবেত হয়ে দীর্ঘ সময় একত্রে অবস্থান করবেনা। এটাই প্রাচীন মনীষীদের রীতি ও ঐতিহ্য। ইমাম শাফেয়ী তাঁর গ্রন্থ আল-উম্মে বলেন : আমি সমবেত শোক প্রকাশকে অপছন্দ করি, যদিও তাতে কান্নাকাটি না থাকে। কেননা তাতে মনের কষ্ট ও দুঃখ বাড়ে এবং শ্রম ও অর্থের অপচয় হয়। উপরন্তু ইতিপূর্বে ক্ষয়ক্ষতি যা হবার তাতো হয়েছেই। নববী বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী ও তার শিষ্যগণ বলেছেন : শোক প্রকাশের জন্য সমাবেশ অনুষ্ঠান মাকরূহ। অর্থাৎ মৃতের পরিবার পরিজনের একটা বাড়িতে এই উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া, যেন শোক প্রকাশকারিরা তাদের কাছে উপস্থিত হতে পারে। বরং প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজে চলে যাওয়া উচিত। পুরুষ স্ত্রী নির্বিশেষে সবার জন্যই এই সমাবেশ মাকরূহ। এর সাথে আর কোনো নতুন বিদআতী কর্মকাণ্ড না থাকলে এটা মাকরূহ তানযিহী। আর যদি এর সাথে কোনো বিদআতী হারাম কাজ যুক্ত হয়, যা সচরাচর প্রায়ই হয়ে থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট হারাম কাজে পরিণত হবে। এটা হবে একটা নতুন সংযোজন। আর সহীহ হাদিসে রয়েছে : প্রত্যেক নতুন জিনিসই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।"

আহমদ ও বহু সংখ্যক হানাফি আলেম এই মত পোষণ করেন। তবে প্রাচীন হানাফিগণ মনে করেন, মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে তিনদিন পর্যন্ত শোক সভা করায় কোনো বাধা নেই-যদি অন্য কোনো নিষিদ্ধ কাজ যুক্ত না থাকে।

কিছু লোক আজকাল শোক সভার সাথে সাথে শামিয়ানা টানায়। বিছানা বিছায় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গর্ব ও আভিজাত্য প্রকাশ করে থাকে। এসবই নব উদ্ভাবিত ও অন্যায় বিদআতী কাজ, যা মুসলমানদের বর্জন করা ওয়াজিব এবং এসব কাজে লিপ্ত হওয়া হারাম। বিশেষত এসব সমাবেশে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থী অনেক কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে এবং জাহেলী রীতিনীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, যেমন গানের মতো সুর করে কুরআন পাঠ এবং তেলাওয়াতের আদব ও সম্মান রক্ষা না করা, নিরবতা নষ্ট করে ধূমপান ইত্যাদির মাধ্যমে আসর মাতায়। শুধু এখানেই শেষ নয়। বরং বহু স্বেচ্ছাচারী লোক সীমালঙ্ঘন করে এবং প্রথম কয়েক দিনের অনুষ্ঠানে ক্ষ্যান্ত না হয়ে পুনরায় চল্লিশতম দিনে নতুন করে এই সব অপকর্ম ও বিদআতের সমাবেশ ঘটায়। তারপর প্রথম বছর সমাপ্তিতে প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অতপর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী করে। এভাবে আরো অনেক কিছু অনুষ্ঠিত হয়, যা বিবেক ও যুক্তি যেমন সমর্থন করেনা, তেমনি তার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহরও কোনো দলিল নেই।

৮. কবর যিয়ারত

পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত মুস্তাহাব। কেননা আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আবদুল্লাহ বিন বারিদা থেকে ও তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন কবর যিয়ারত করো। কেননা এটা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' শুরুতে নিষেধ করার কারণ ছিলো, অতি সম্প্রতি তারা জাহেলী যুগ অতিক্রম করে এসেছে এবং তখনো অন্যায় ও অশালীন কথাবার্তা বর্জন করার অভ্যাস তাদের মধ্যে পরিপক্ক হয়নি। পরে যখন তারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছে, তা দ্বারা প্রশান্তি অর্জন করেছে ও ইসলামের বিধি নিষেধ ভালোভাবে রপ্ত করেছে, তখন রসূল সা. তাদেরকে কবর যিয়ারতের অনুমতি দেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করে এতো কাঁদলেন যে, আশপাশের সবাইকেও কাঁদালেন। তারপর রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আমি আমার প্রতিপালকের নিকট অনুমতি চেয়েছি মায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। পরে অনুমতি চাইলাম, মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য। এবার আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। এটা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। -আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

আর যিয়ারতের উদ্দেশ্য যখন স্মরণ করা ও শিক্ষা গ্রহণ করা হয়, তখন কাফেরদের কবরও শুধু এই উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা বৈধ। আর যদি অত্যাচারী গোষ্ঠী হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তাদেরকে তাদের অত্যাচারের শাস্তিস্বরূপ ধ্বংস করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের কবর ও তাদের ধ্বংসের জায়গা দিয়ে অতিক্রম করার সময় কান্নাকাটি করা ও আল্লাহর নিকট আযাব ও গযব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা মুস্তাহাব। কেননা বুখারি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. যখন সাহাবিদেরকে সাথে নিয়ে সামূদ জাতির বিধ্বস্ত বস্তিত অতিক্রম করছিলেন, তখন বললেন : এসব আযাবপ্রাপ্তদের কাছে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া যেয়োনা। কাঁদতে না পারলে তাদের কাছে যেয়োনা, যেন তাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তোমাদের ওপর অবতীর্ণ না হয়।"

কবর যিয়ারতের পদ্ধতি : যিয়ারতকারি যখন কবরের কাছে পৌছবে, তখন মৃত ব্যক্তির মুখ সোজা দাঁড়াবে, তাকে সালাম করবে ও তার জন্য দোয়া করবে। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস উল্লেখযোগ্য :

১. বারীদা রা. থেকে বর্ণিত : যখন তারা কবরের দিকে যেতেন, তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তাদেরকে শিখাতেন, যেন তারা বলে :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، أَنْتُمْ فَرَطُنَا وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، وَنَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

"হে মুমিন ও মুসলমানদের আবাস ভূমির অধিবাসিগণ, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবে। তোমরা আমাদের অগ্রবর্তী, আর আমরা তোমাদের পদাংক অনুসারী। আমরা তোমাদের ও আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনাকারি।"

২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. মদীনার কবরগুলোর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং বললেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ. أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ .

"হে কবরবাসি, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তোমাদেরকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের অগ্রবর্তী আর আমরা তোমাদের অনুগামী।" -তিরমিযি।

৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, যেদিনই আয়েশার পালার রাত আসতো, রসূলুল্লাহ্ সা. শেষ রাতে ঘর থেকে জান্নাতুল বাকীর দিকে বেরিয়ে যেতেন। সেখানে গিয়ে বলতেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ .

"হে মুমিনদের কবরস্তানের অধিবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের জন্য যার ওয়াদা করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে অচিরেই আসবে একটু বিলম্বিতভাবে। আর আমরা ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ, বাকীর অধিবাসিদেরকে ক্ষমা করুন।" -মুসলিম।

৪. আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ্, কবরবাসিদেরকে কী বলবো? তিনি বললেন, বলবে

اَلسَّلَامُ عَلٰى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ .

"মুমিন ও মুসলমানদের বাসভূমির অধিবাসিদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্য থেকে যারা আগে চলে গেছে এবং যারা পেছনে রয়েছে, তাদের সবার উপর আল্লাহ করুণা বর্ষণ করুন। ইনশাল্লাহ, আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো।"

কিছু মূর্খ লোক কবরকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে, চুমু দেয় ও চারপাশে ঘোরে, এসব জঘন্য বিদয়াতী কাজ। এগুলো হারাম ও বর্জন করা ওয়াজিব। কেননা এসব একমাত্র কাবা শরিফের জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। কা'বা শরিফের সাথে কোনো নবী বা ওলীর কবরেরও তুলনা হয়না। তাদের অনুকরণেই শুধু কল্যাণ নিহিত। আর সমস্ত অকল্যাণ বিদআতী কর্মকাণ্ডে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. যখন কবর যিয়ারত করতেন, তখন কবরের অধিবাসিদের জন্য দোয়া করা, তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া এবং তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়ার

উদ্দেশ্যেই যিয়ারত করতেন। অথচ মোশারেকেরা মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করতো, তাদের নামে কসম খেয়ে আল্লাহর নিকট বিভিন্ন জিনিস চাইতো। মৃতের নিকট বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করতো ও সাহায্য চাইতো এবং তার কাছে মনের আকুতি পেশ করতো। এটা ছিলো রসূল সা. এর আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর আদর্শ ছিলো তাওহীদের ও মৃতের কল্যাণ কামনার। আর মোশরেকদের রীতি ছিলো শেরক, নিজেদের ক্ষতিসাধন ও মৃতের ক্ষতিসাধন। মৃতদের প্রসঙ্গে প্রার্থনাকারী তিন প্রকারের : মৃতের জন্য প্রার্থনাকারী। মৃতের ওসিলায় প্রার্থনাকারী। মৃতের কাছে প্রার্থনাকারী। এর মধ্যে প্রথমটিই কেবল মুসলিমদের প্রার্থনার রীতি। কেউ কেউ কবরস্থানে মৃতের কাছে অবস্থান করে দোয়া করাকে মসজিদের মধ্যে দোয়া করার চেয়ে ভালো মনে করে। তবে যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবিদের আদর্শ নিয়ে চিন্তা করবে, সে এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী তা বুঝতে পারবে।

মহিলাদের কবর যিয়ারত : ইমাম মালেক, কিছু সংখ্যক হানাফি আলেম, ইমাম আহমদের একটি অভিমত ও অধিকাংশ আলেমগণ মহিলাদের কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন। আয়েশা রা.-এর হাদিসে রয়েছে : হে রসূলুল্লাহ, তাদেরকে (কবরবাসিকে) কী বলবো? (অর্থাৎ কবর যিয়ারতের সময়)। ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন আয়েশা রা. কবরস্থান থেকে এলেন। আমি বললাম : হে উম্মুল মুমিনীন, কোথা থেকে এলেন? তিনি বললেন : আমার ভাই আবদুর রহমান বিন আবি বকরের কবর থেকে। আমি আয়েশা রা.কে বললাম : রসূলুল্লাহ সা. কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন : হাঁ, প্রথমে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে আবার কবর যিয়ারত করতে আদেশ দিয়েছেন। -হাকেম ও বায়হাকি। যাহাবি বলেছেন : হাদিসটি সহীহ। সহীহ বুখারি ও মুসলিমে আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. এক মহিলাকে একটি কবরের কাছে দেখলেন। সে তার মৃত শিশুর জন্য কাঁদছিল। তিনি মহিলাকে বললেন : "আল্লাহকে ভয় করো ও ধৈর্যধারণ করো।" মহিলা বললো : তুমি তো আমার বিপদের কোনো ধার ধারণা। তিনি চলে যাওয়ার পর মহিলাকে জানানো হলো, "আরে উনি তো রসূলুল্লাহ সা."। একথা শোনামাত্রই মহিলাটির উপর যেনো মৃত্যুর ভয় চেপে বসলো। সে তাৎক্ষণাৎ রসূল সা.-এর বাড়ির দরজায় গিয়ে উপনীত হলো। দেখলো দরজায় কোনো দারোয়ান নেই। সে রসূল সা. এর নিকট পৌঁছে বললো : "হে রসূলুল্লাহ, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। রসূল সা. বললেন : প্রথম আঘাতের সময়ই ধৈর্যধারণ করা আবশ্যক।" এ হাদিস থেকে জানা গেলো, রসূল সা. তাকে কবরের কাছে দেখেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো আপত্তি করেননি। সুতরাং প্রমাণিত হলো, মহিলাদের কবর যিয়ারত অবৈধ নয়। তাছাড়া, যেহেতু আখেরাতকে স্মরণ করানোই কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য এবং এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান প্রয়োজন, নারীদের চেয়ে পুরুষদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় নয়, বরং সমান তাই নারীদের কবর যিয়ারত অবৈধ নয়। কতক আলেম মহিলাদের কবর যিয়ারত মাকরূহ মনে করেন। কারণ তাদের ধৈর্য কম এবং আবেগ বেশি। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যেসব মহিলা অত্যধিক মাত্রায় কবর যিয়ারত করে তাদের উপর অভিসম্পাত।" -আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি। কুরতুবি বলেন : এ হাদিসে যে অভিসম্পাতের উল্লেখ রয়েছে, তা যে অত্যধিক মাত্রায় যিয়ারতকারিণীদের জন্য তা হাদিসের ভাষায় ব্যবহৃত صيغة المبالغة (মাত্রাধিক্য ব্যক্তকারি পদ) দ্বারাই স্পষ্ট। আর সম্ভবত এর কারণ হলো, এতে স্বামী ও সন্তানদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিজেদের প্রদর্শনী করে বাইরে বেড়ানো হয়। তাছাড়া কবরের কাছে গিয়ে সম্ভাব্য বিলাপ ও কাঁদাকাটি থেকে উদ্ভূত অবস্থা ইত্যাদিও এর কারণ হতে পারে। কেউ কেউ বলেন : এসব

সম্ভাব্য কারণ থেকে মুক্ত থাকলে মহিলাদের কবর যিয়ারতে বাধা নেই। কেননা মৃত্যুর স্মরণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজন। কুরতুবির বক্তব্যের পর্যালোচনা করে শওকানি বলেছেন : এ বিষয় সংক্রান্ত যে সকল হাদিস বাহ্যত পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, সেগুলোর সমন্বয় সাধনে কুরতুবির বক্তব্যের উপর নির্ভর করা উচিত।

মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারী আমলসমূহ

রসূলুল্লাহ সা. এর আত্মার প্রতি সওয়াব প্রেরণ করা কি বৈধ? এ ব্যাপারে সর্বসম্মত মত হলো, মৃত ব্যক্তি নিজে জীবিতাবস্থায় যেসব সৎ কাজের কারণ হয়ে থাকে, (অর্থাৎ সে নিজে প্রত্যক্ষভাবে যা করে অথবা পরোক্ষভাবে যেসব কাজ তার উদ্যোগে বা উৎসাহে সংঘটিত হয়ে থাকে) তা দ্বারা সে আখেরাতে উপকৃত হয়ে থাকে। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার সকল কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কেবল তিনটে জিনিস চালু থাকে : তার কৃত চলমান সদকা, তার প্রচারিত এমন জ্ঞান যা উপকারী অথবা সৎ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন : মৃত ব্যক্তির কৃত সৎকর্মের মধ্য থেকে যা যা তার মৃত্যুর পর তার কাছে পৌঁছে, তন্মধ্যে রয়েছে তার শেখানো ও প্রচারিত কোনো বিদ্যা বা জ্ঞান, তার রেখে যাওয়া কোনো সৎ সন্তান, উত্তরাধিকারিদের জন্য রেখে যাওয়া কোনো পুস্তক, তার নির্মিত কোনো মসজিদ, কিংবা পথিকের জন্য কোনো বানানো সরাইখানা, কিংবা তার খননকৃত কোনো জলাশয়, কিংবা তার সুস্থ থাকাকালে ও জীবিত থাকা অবস্থায় তার সম্পদ থেকে প্রদত্ত কোনো সদকা।" জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো নিয়ম ধারা চালু করবে, সে তার সওয়াব পাবে এবং যারা সেই ধারা অনুসরণ করে কাজ করবে, তাদের সওয়াবও সে পাবে। অথচ তাদের সওয়াব কিছুমাত্র কমবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো খারাপ রীতি চালু করবে, তার গুনাহ তার উপর বর্তাবে এবং যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের গুনাহও তার উপর বর্তাবে। অথচ তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কমবেনা।'

যেসব সৎ কাজ অন্যরা করে এবং মৃত ব্যক্তি তার সওয়াব পায়, সেগুলো হলো :

১. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা : মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ، وَلَاتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا، رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ.

অর্থ : আর যারা তাদের পরে এসেছে এবং বলেছে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের পূর্বে আমাদের যে সকল ভাই ঈমান সহকারে অতিবাহিত হয়েছে, তাদেরকেও ক্ষমা করো, আর মুমিনদের জন্য আমাদের মনে কোনো বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিওনা। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো ক্ষমাশীল, মমতাময়।" (সূরা : হাশর, আয়াত : ১০)

ইতিপূর্বে রসূল সা. এর এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে : তোমরা যখন মৃতের জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবে।" আর রসূল সা. এর এ দোয়াও উল্লেখ করা হয়েছে : হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত ও মৃত সবাইকে ক্ষমা করো।" প্রাচীনকালের ও পরবর্তীকালের আলেমগণ মৃতদের জন্য দোয়া করতেন, রহমত কামনা করতেন ও ক্ষমা চাইতেন। কেউ একাজ অপছন্দ করতেন না।

২. সদকা করা : ইমাম নববী বলেছেন : সদকার সওয়াব যে মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে, এটা

সর্বসম্মত মত- চাই তা সন্তানের পক্ষ হতে করা হোক বা অন্য কারো পক্ষ হতে। কেননা আবু হুরায়রা থেকে মুসলিম ও আহমদ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে বললো : আমার বাবা মারা গেছেন, তিনি কিছু সম্পত্তি রেখে গেছেন, কিন্তু কোনো ওসিয়ত করেননি। আমি যদি তার পক্ষ হতে সদকা করি তবে তা কি তার গুনাহর কাফফারা হবে? তিনি বললেন : হাঁ। আর সা'দ বিন উবাদা থেকে বর্ণিত, তাঁর মা যখন মারা গেলো, তখন বললেন : হে রসূলুল্লাহ, আমার মা তো মারা গেছে, আমি কি তার পক্ষ হতে সদকা করে দেবো? তিনি বললেন : হাঁ। সা'দ বললেন : কোন্ সদকা উত্তম? তিনি বললেন : পানি পান করানো। হাসান বলেন : মদিনায় যে খাবার পানির ব্যবস্থা দেখা যায়, তা সা'দের বংশধরদের।" -আহমদ, নাসায়ী প্রমুখ। তবে কবরের কাছে সদকা দেয়া শরিয়ত সম্মত নয়। জানাযার সময়ও সদকা দেয়া মাকরূহ।

৩. রোযা রাখা : বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বললো, হে রসূলুল্লাহ, আমার মা মারা গেছেন। এক মাসের রোযা তার দায়িত্বে রয়েছে। আমি কি ওটা তার পক্ষ হতে কাযা করতে পারি? রসূল সা. বললেন : তোমার মায়ের উপর যদি কোনো ঋণ থাকতো তবে তা কি তুমি পরিশোধ করতে? সে বললো, হাঁ। রসূল সা. বললেন : আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা তো আরো বেশি জরুরি।

৪. হজ্জ : বুখারিতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, জুহাইনা গোত্রের জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এলো এবং বললো : আমার মা হজ্জের মানত করেছিলেন। কিন্তু হজ্জ না করেই মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো। তুমি কি ভেবে দেখেছ, তার উপর কোনো ঋণ থাকলে তুমি তা শোধ করতে কিনা? শোধ করো, কারণ আল্লাহর ঋণ শোধ করা অধিকতর জরুরি।

৫. নামায : দার কুতনিতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমার মা বাবার জীবদ্দশায় আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতাম। এখন তাদের মৃত্যুর পর তাদের প্রতি কিভাবে ভালো ব্যবহার করবো? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : মৃত্যুর পরে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার হলো, তোমার নামাযের সাথে তাদের জন্য নামায পড়বে এবং তোমার রোযার সাথে তাদের জন্য রোযা রাখবে।

৬. কুরআন পাঠ করা : এটি আহলে সুন্নতের অধিকাংশের মত। নববী বলেছেন : শাফেয়ি মাযহাবের প্রখ্যাত মত হলো, এটা মৃতের কাছে পৌছে না। আহমদ বিন হাম্বল ও শাফেয়িদের একাংশের মত হলো, পৌছে। কুরআন পাঠ করার পর বলবে : হে আল্লাহ, আমি যা পাঠ করলাম, তার সমপরিমাণ সওয়াব অমুকের নিকট পৌছে দাও। ইবনে কুদামার গ্রন্থ আল মুগনিতে রয়েছে, আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন : মৃত ব্যক্তির কাছে সব রকমের সৎ কাজ পৌছে। কেননা বহু সংখ্যক ওহির বাণী এর পক্ষে রয়েছে। তাছাড়া মুসলমানরা এজন্য সমবেত হয়, কুরআন পাঠ করে এবং তা তাদের মৃত ব্যক্তির নিকট পাঠায়। সুতরাং এটা একটা ইজমা।

তবে যারা বলেন, কুরআন পাঠের সওয়াব মৃতের কাছে পৌছে, তাদের শর্ত হলো, তেলাওয়াতকারি তার তেলাওয়াতের কোনো পারিশ্রমিক নেবেনা। পাঠক যদি তার পাঠের জন্য পারিশ্রমিক নেয়, তাহলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য তা হারাম হয়ে যাবে এবং সে কুরআন পাঠের জন্য কোনো সওয়াবই পাবেনা। আহমদ, তাবারানি ও বায়হাকি আবদুর রহমান বিন শাবল থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা কুরআন পাঠ করো ও আমল করো। কুরআন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করোনা এবং তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করোনা। এর ওসিলায় সম্পদ এবং বর্ধিত সম্পদ উপার্জন করোনা।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন : ইবাদত দু'রকমের : আর্থিক ও শারীরিক। রসূলুল্লাহ সা. জানিয়েছেন, সদকার সওয়াব অন্য সকল আর্থিক ইবাদতের আগে এবং রোযার সওয়াব অন্য সকল শারীরিক ইবাদতের আগে মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে। শারীরিক ও আর্থিক এই উভয় প্রকারের সমন্বিত ইবাদত হজ্জও মৃতের নিকট পৌছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সুতরাং উক্ত তিন ধরনের ইবাদতই ওহির বাণী ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত।

৭. নিয়ত শর্ত : মৃতের জন্য যা কিছু পাঠানো হোক, সেজন্য অবশ্যই নিয়ত জরুরি। ইবনে আকীল বলেছেন : যখন নামায, রোযা বা কুরআন পাঠ মৃতের নামে পাঠাবে, তখন তা তার নিকট পৌছে ও তার উপকার সাধন করে। অবশ্য এজন্য শর্ত হলো, সওয়াব পৌছানোর নিয়ত করতে হবে। ইবনুল কাইয়্যেম এই মতটি সমর্থন করেছেন।

৮. মৃতের জন্য সর্বোত্তম উপঢৌকন : ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন : মৃতের জন্য সর্বোত্তম উপঢৌকন হলো যা সর্বাধিক উপকারী। যেমন তার পক্ষ থেকে কোনো দাস মুক্ত করা। তার পক্ষ থেকে রোযা থাকার চেয়ে তার পক্ষ থেকে সদকা করা উত্তম। আর যে সদকা গ্রহীতার কোনো বড় প্রয়োজন পূরণ করে এবং যে সদকা সব সময় চালু রাখা হয়, সেটাই সর্বোত্তম। এজন্যই রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সর্বোত্তম সদকা হলো, খাবার পানির ব্যবস্থা করা। তবে এটা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে খাবার পানির অভাব তীব্র এবং মানুষ পিপাসায় সচরাচর কষ্ট পায়। নচেত অনাহারীকে আহার করানোর চেয়ে নদীখালের পাশে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করা উত্তম সদকা বিবেচিত হবেনা। অনুরূপ আন্তরিকভাবে ও কাকুতি মিনতি সহকারে মৃতের জন্য দোয়া করা ও ক্ষমা চাওয়া সদকা করার চেয়ে উত্তম। যেমন জানাযার নামায পড়া ও কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করা।

মোটকথা, মৃতের জন্য সর্বোত্তম উপঢৌকন হচ্ছে তার পক্ষ থেকে দাস মুক্ত করা, সদকা করা, ক্ষমা চাওয়া, তার জন্য দোয়া করা ও তার পক্ষ হতে হজ্জ করা।

রসূলুল্লাহ সা. এর জন্য সওয়াব পাঠানো

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন : সাম্প্রতিককালের ফকীহদের কেউ কেউ একে মুস্তাহাব মনে করেন। আবার কেউ কেউ মুস্তাহাব তো দূরের কথা, বিদআত মনে করেন। কেননা সাহাবিগণ এটা করতেননা। রসূল সা. এর উম্মতের লোকেরা যে কোনো সওয়াবের কাজ করবে, তার সওয়াব তিনি পাবেনই। অথচ মূল কর্তার সওয়াব থেকে কিছুমাত্র কমানো হবেনা। কারণ তিনিই তাঁর উম্মতকে সকল সৎ কাজের দিকে আহ্বান করেছেন। আর প্রত্যেক সৎ কাজের আহ্বানকারি সেই সৎ কাজের সওয়াব পেয়ে থাকে, যা তার অনুসারী সম্পন্ন করে। অথচ কর্তার সওয়াব কিছুমাত্র কমানো হয়না। মুসলিম উম্মাহ প্রত্যেক সৎকাজের জ্ঞান ও বাস্তব দৃষ্টান্ত রসূল সা. এর কাছ থেকেই পেয়েছে। কাজেই তিনি তার অনুসারীদের কৃত সৎ কাজের সওয়াব পাবেনই- চাই কেউ তার জন্য পাঠাক বা না পাঠাক।

মুসলিম শিশু ও অমুসলিম শিশু

মৃত অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম শিশু মাত্রই জান্নাতবাসি। ইমাম বুখারি আদী বিন ছাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুনেছেন, যখন রসূল সা. এর ছেলে ইবরাহীম মারা গেলো, তখন তিনি বললেন : জান্নাতে তার জন্য একজন ধাত্রী রয়েছে।"

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মুসলমানের তিনটি সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ উক্ত সন্তানদের প্রতি তার রহমতের কারণে তাকে

জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, যে শিশুদের ওসিলায় তাদের পিতা বেহেশতে যাবে, সে শিশুরা তো অবশ্যই বেহেশতে যাবে। কেননা তারা তাদের পিতার বেহেশতে যাওয়ার কারণ। পক্ষান্তরে মোশরেক শিশু সন্তানেরাও মুসলমান শিশুদের মতোই। তারাও একইভাবে জান্নাতে যাবে। ইমাম নববী বলেছেন : এটাই সঠিক ও গবেষক আলেমদের পছন্দনীয় মত। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا .

অর্থ : কোনো রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি শাস্তি দেইনা।" (বনী ইসরাইল : আয়াত ১৫)

ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছার কারণে প্রাপ্তবয়স্কদেরকে যখন শাস্তি দেয়া হয়না, তখন অপ্রাপ্তবয়স্কদের শাস্তি দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। আহমদ খানসা বিনতে মুয়াবিয়া থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর ফুফু রসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করেন : হে রসূলুল্লাহ্ সা.! জান্নাতে কে কে যাবে? তিনি বললেন : নবী জান্নাতে যাবেন, শহীদ জান্নাতে যাবে এবং সদ্যপ্রসূত সন্তান জান্নাতে যাবে।

৯. কবরের প্রশ্ন

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাত (শীয়া ব্যতিত সকল মুসলমান) একমত, প্রত্যেক মানুষকেই মৃত্যুর পর কিছু প্রশ্ন করা হয়- চাই তাকে কবর দেয়া হোক বা না হোক। এমনকি কাউকে যদি হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলে কিংবা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয় এবং ছাই শূন্যে উড়িয়ে দেয়া হয়, অথবা সমুদ্রে ডুবে মারা যায়, তাহলেও তাকে তার কৃত কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং ভালো কাজ করে থাকলে ভালো ফল আর মন্দ কাজ করে থাকলে মন্দ ফল ভোগ করবে, নিয়ামত বা আযাব যেটাই হোক তার শরীর ও আত্মা উভয়ে এক সাথেই ভোগ করবে। ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন : মুসলমানদের প্রাচীন মনীষীগণ ও শীর্ষ ইমামগণের মত হচ্ছে, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি হয় নিয়ামত না হয় আযাব ভোগ করে এবং তা তার আত্মা ও দেহ উভয়েই ভোগ করে। রূহ বা আত্মা দেহ ত্যাগ করার পর আযাব অথবা নিয়ামত ভোগ করতে থাকে, রূহ কখনো কখনো দেহের সাথে মিলিত হয় এবং তার সাথে একত্রিত হয়েই নিয়ামত বা আযাব ভোগ করে। তারপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন রূহগুলো পুনরায় দেহগুলোর মধ্যে ফিরে আসবে এবং তারা তাদের কবর থেকে উঠে মহান বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। দেহগুলোতে আত্মার পুনপ্রবেশ ও মানুষের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানরা সম্পূর্ণরূপে একমত।

মুরুযী বলেছেন, ইমাম আহমদ রা. বলেছেন : কবরের আযাব অকাট্য সত্য। একমাত্র সেই ব্যক্তিই এটি অস্বীকার করতে পারে যে নিজেও বিপথগামী, অন্যকেও বিপথগামী করে। হাম্বল বলেছেন, আহমদকে কবর আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো সহীহ, আমরা এগুলো বিশ্বাস করি ও মান্য করি। বিশুদ্ধ সনদে যা কিছুই রসূল সা. এর নিকট থেকে পাওয়া যায়, তা আমরা মান্য করি। রসূল সা. যা কিছু এনেছেন, তা যদি আমরা না মানি, ফিরিয়ে দেই ও প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে সেটা হবে আমাদের পক্ষ হতে আল্লাহর আদেশ প্রত্যাখ্যান করার শামিল। আল্লাহ্ বলেছেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থ : রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা ৫৯, হাশর : আয়াত ৭)

আমি তাকে বললাম, কবরের আযাবও কি সত্য? তিনি বললেন : সত্য। কবরে আযাব দেয়া হয়। তিনি আরো বললেন : আমরা কবরের আযাবে বিশ্বাস করি, মুনকার নকীরের কথাও বিশ্বাস করি, এও বিশ্বাস করি যে, বান্দাকে কবরে প্রশ্ন করা হয়। আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ শাশ্বত বাণীর প্রতি ঈমান আনয়নকারিদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে অবিচল রাখেন।" কবর যেহেতু আখেরাতের জীবনেরই অংশ, তাই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, কবরে মুমিনদেরকে প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়ার ক্ষমতা ও দৃঢ়তা দান করবেন।

আহমদ বিন কাসেম বলেছেন, আমি বললাম : হে আবু আবদুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম আহমদ) আপনি কি মুনকার ও নকীরের প্রশ্ন করার কথা বিশ্বাস করেন? তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ! অবশ্যই বিশ্বাস করি এবং জনগণকে তা বলিও। আমি বললাম : ঠিক এই শব্দ মুনকার ও নকীর বলেন, না দুই ফেরেশতার কথা বলেন? তিনি বললেন : এটা এভাবেই চালু হয়েছে যে, তারা মুনকার (অপরিচিত) ও নকীর (অচেনা)।

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন, আহমদ ইবনে হাযম ও ইবনে হুরায়রার মত হলো, প্রশ্ন হবে শুধু রূহের ওপর এবং রূহের দেহে প্রবেশ করা ছাড়াই। কিন্তু অধিকাংশ আলেম ও ইমাম এ মতের বিরুদ্ধে। তারা বলেন : রূহকে শরীরে বা তার কোনো অংশে ফিরিয়ে নেয়া হয়। যদি তা শুধু রূহের উপর হতো, তাহলে শরীরের সাথে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকতোনা। আর মৃতের দেহ যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাতেও কিছু আসে যায়না। কেননা আল্লাহ শরীরের যে কোনো একটি অংশেও জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন এবং তার উপর প্রশ্ন হতে পারে। তিনি শরীরের বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলোকে একত্রিতও করতে পারেন। যারা বলেন, প্রশ্ন শুধু রূহের ওপর হয়, তাদের একথা বলার কারণ হলো, মৃত ব্যক্তিকে কবরে বসানো হোক বা অন্যকিছু করা হোক, কবরকে সংকুচিত বা সম্প্রসারিত করা হোক, এমনকি তাকে আদৌ কবরস্থ না করা হোক, যেমন শূলে চড়িয়ে যাকে মারা হয়, তাতে তার প্রশ্নের ওপর কোনো প্রভাব পড়েনা। প্রতিপক্ষ এর জবাবে বলেন : আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার কাছে এসবই সম্ভব। এমনকি আমাদের প্রাকৃতিক জগতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তির কথা ধরা যাক। সে তো স্বপ্নে সুখ ও দুঃখ দুইই অনুভব করে। অথচ তার পার্শ্ববর্তী মানুষটিও তা টের পায়না। বরঞ্চ জাগ্রত ব্যক্তিও কখনো কখনো যা শ্রবণ করে বা চিন্তা করে তাতে দুঃখ বা আনন্দ অনুভব করে। অথচ তার পার্শ্ববর্তী লোক তা টের পায়না। অদৃশ্যকে দৃশ্যের সাথে এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাকে তার পূর্ববর্তী অবস্থার সাথে তুলনা করার কারণেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ কবরের অবস্থা তার বান্দাদের চোখ ও কানের অগোচরে রেখেছেন এবং লুকিয়ে রেখেছেন। তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপই এটা করেছেন, যাতে এই ভয়ে তারা একে অপরকে কবরস্থ করতেই অনিচ্ছুক হয়ে না পড়ে। পার্থিব জীবনে শরীরের অংগ প্রত্যংগ পরকালীন জীবনের ঘটনা ও অবস্থা উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখেনা। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। অধিকাংশ আলেমের মতের পক্ষে একাধিক হাদিস রয়েছে। যেমন রসূল সা. বলেছেন : মৃত ব্যক্তি তার দাফনে অংশ গ্রহণকারিদের জুতোর আওয়াযও শুনতে পায়। আরো বলেছেন : কবরের চাপে তার পাঁজরের অস্থি এক পাশ থেকে আরেক পাশে চলে যায়। আরো বলেছেন : তাকে যখন হাতুড়ি দিয়ে পেটায় তখন সে তার শব্দ শুনতে পায়। আরো বলেছেন : মৃতের দুই কানের মাঝখানে আঘাত করা হয়। আরো বলেছেন : ফেরেশতাদ্বয় তাকে উঠিয়ে বসায়। এই কথাগুলো থেকে জানা যায়, কবরে আত্মা ও দেহের পুনর্মিলন ঘটে বলেই এসব শারীরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে কিছু সংখ্যক সহীহ হাদিস উদ্ধৃত করছি :

১. মুসলিম যায়েদ বিন ছাবেত থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ সা. বনু নাজ্জারের বাগানে নিজের খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে অবস্থান করছিলেন। আমরাও তার সাথে ছিলাম। সহসা খচ্চরটি ঢলে পড়লো এবং তাঁকে ফেলে দেয়ার উপক্রম করলো। দেখা গেলো, সেখানে ছয়টা বা পাঁচটা বা বারটা কবর রয়েছে। রসূল সা. বললেন : এই কবরের অধিবাসিদেরকে কে চেনে? এক ব্যক্তি বললো : আমি চিনি। তিনি বললেন : এরা কবে মারা গেছে? সে বললো : বিভিন্ন ঘটনায় আহত হয়ে মারা গেছে। তিনি বললেন : এই উম্মত তাদের কবরে কষ্ট ভোগ করে, এই ভয়ে তোমরা মৃতকে দাফন করাই ছেড়ে দেবে, এমন আশংকা যদি না থাকতো তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন তোমাদেরকে কবরের আযাবের যে শব্দ আমি শুনতে পাই, তা যেন তোমাদেরকেও শুনিয়ে দেন। তারপর তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন এবং বললেন : তোমরা আল্লাহর নিকট দোযখের আযাব থেকে আশ্রয় চাও। উপস্থিত সকলে বললো : আমরা দোযখের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও। সবাই বললো : আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিপদ ও পরীক্ষা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। সবাই বললো : আমরা গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিপদ ও পরীক্ষা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি বললেন : দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। তারা বললো : দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

২. বুখারি ও মুসলিম কাতাদা থেকে অতপর আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার স্বজনেরা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় তখন সে তাদের জুতোর আওয়ায সে শুনতে পায়, তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসে ও তাকে বসায়, তারপর তাকে বলে : এই ব্যক্তি মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে তুমি কী বলতে? মুমিন বলে : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, উনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন : ঐ দেখো তোমার দোযখের অবস্থান। ওটা পরিবর্তন করে আল্লাহ তোমাকে বেহেশতে অবস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তখন সে উভয় অবস্থান দেখতে পায়। আর কাফের ও মোনাফেককে বলা হয় : তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলতে? সে জবাব দেয় : আমি কিছুই জানিনা। লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন উভয় ফেরেশতা বলেন : তুমি জানতে না, যারা জানতো তাদের কাছে জিজ্ঞাসাও করোনি। তারপর তাকে লোহার বহু সংখ্যক হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয়। ফলে সে এমন জোরে চিৎকার করে যে, জিন ও মানুষ ছাড়া তার আশপাশের সবাই তা শুনতে পায়।

৩. বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বারা বিন আযেব থেকে বর্ণনা করেন : একজন মুসলমানকে যখন কবরে রাখা হয় এবং সে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ সা. তার রসূল, তখন তা হয় কুরআনের এই আয়াতেরই বাস্তব প্রতিফলন : "যারা শাশ্বত বাণীর ওপর ঈমান আনে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অবিচল রাখেন।" অপর বর্ণনার ভাষ্য হলো : এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাকে বলা হয় : তোমার প্রভু কে? সে বলে : আল্লাহ আমার প্রভু ও মুহাম্মদ আমার নবী। এটাই আয়াতে বলা হয়েছে :

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۔

অর্থ : যারা শাশ্বত বাণীর (কলেমায়ে তাইয়েবা) ওপর ঈমান আনে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অবিচল রাখেন।"

৪. মুসনাদে আহমদে ও সহীহ্ আবু হাতেমে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : মৃতকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তার স্বজনেরা চলে যাওয়ার সময় তাদের জুতোর আওয়ায সে শুনতে পায়। সে যদি মুমিন হয়, তবে তার নামায তার মাথার কাছে অবস্থান করে, রোযা ডান পাশে, যাকাত বাম পাশে এবং সদকা, স্বজনকে দেয়া উপহার, মহানুভবতা ও পরোপকার পায়ের কাছে অবস্থান করে। পরে যখন তার মাথার কাছ দিয়ে কেউ আসতে চায়, (অর্থাৎ আযাবের ফেরেশতা) তখন নামায বলে : আমার দিক দিয়ে প্রবেশ নিষেধ। অতপর ডান দিক দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা হলে রোযা বলে : আমার দিক দিয়ে ঢোকা যাবেনা। তারপর বাম দিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা হলে যাকাত বলে : আমার দিক দিয়ে প্রবেশের সুযোগ নেই। তারপর তার পায়ের দিক দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা হলে সদকা, পরোপকার, মহানুভবতা ও স্বজনকে দেয়া উপহার ইত্যাদি সৎ কাজ বলে : আমার দিক দিয়ে ঢোকা যাবেনা। এরপর মৃতকে বলা হয় : উঠে বসো। সে উঠে বসে। তখন সূর্য তার সামনে থাকে এবং তা অস্ত যাওয়ার উপক্রম করে। তখন তাকে বলা হয় : এই ব্যক্তি তো তোমাদের মধ্যেই ছিলো। তার সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কী? তার ব্যাপারে তোমার সাক্ষ্যই বা কী? সে বলে : আমাকে নামায পড়তে দাও। ফেরেশতাদ্বয় বলে : তুমি পরে নামায পড়বে। আমরা যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। এই ব্যক্তি তো তোমাদের মধ্যেই ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী এবং তোমার সাক্ষ্য কী বলো? সে বলে : উনি তো মুহাম্মদ সা.। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন আল্লাহর কাছ থেকে। তাকে বলা হয় : তুমি এর উপরই জীবন কাটিয়েছ, এর উপরই মৃত্যু বরণ করেছ এবং এর উপরই আল্লাহ্ চাহেন তো পুনরুজ্জীবিত হবে। তারপর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটা দরজা খুলে দেয়া হয়। তারপর তাকে বলা হয়, ওটা তোমার বাসস্থান এবং আল্লাহ তোমার জন্য যেসব নিয়ামত নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা ওখানে রয়েছে। তখন তার আনন্দ ও গর্ব বিপুলভাবে বেড়ে যায়। তারপর তার কবর সত্তর হাত প্রশস্ত করা হয় এবং তাকে আলোকিত করা হয়। অতপর দেহকে আগের মতো করে দেয়া হয়। আর তার রূহ বেহেশতের গাছে ঝুলন্ত পবিত্র পাখির ভেতরে ঢোকানো হয়। এটাই আল্লাহ্ বলেছেন :

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ .

অর্থ : যারা শাশ্বত বাণীর প্রতি ঈমান এনেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে অবিচল রাখেন।" (সূরা ইবরাহিম : আয়াত ২৭)

আর কাফের সম্পর্কে উল্লেখ করে ঠিক এর বিপরীত বিবরণ দেন এবং শেষে বলেন : অতপর তার কবর তার জন্যে সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে মৃতের একদিকের পাঁজর অন্যদিকে চলে যায়। এটাই হলো সেই সংকীর্ণ জীবনোপকরণ, যা আল্লাহ বলেছেন :

فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى .

অর্থ : তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে সংকীর্ণ জীবনোপকরণ এবং তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ করে ওঠাবো।" (সূরা তোয়াহা : আয়াত ১২৪)

৫. সহীহ বুখারিতে রয়েছে, সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. যখনই কোনো নামায পড়তেন (নামাযের পর) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। তারপর বলতেন : তোমাদের মধ্যে কেউ কি আজ রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ? কেউ কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বলতো। তখন রসূল সা. বলতেন : মাশাল্লাহ। (আল্লাহ যা চেয়েছেন দেখিয়েছেন) একদিন

আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন : তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছে? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : কিন্তু আমি আজ দেখেছি, দুই ব্যক্তি আমার কাছে এলো, আমার হাত ধরলো এবং আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে গেলো। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে। অপর এক ব্যক্তি একটি লোহার বাকানো শলাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লোহার শলাকাটি সে বসা লোকটির চোয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। অতপর পুনরায় অপর চোয়ালে একই কাজ করছে। এই সময় তার আগের চোয়াল জোড়া লেগে যাচ্ছে, অতপর পুনরায় আগের মতো করছে। আমি বললাম : এটা কী? তারা বললো : সামনে চলুন। তখন তারা চললো। শেষ পর্যন্ত আমরা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। তার মাথার উপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে একটা বড় পাথর। তা দিয়ে সে তার মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে। তাকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি গড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। অতপর লোকটি সেই পাথরটি আনার জন্য ছুটে যাচ্ছে। পাথর নিয়ে লোকটির কাছে সে ফিরে আসা পর্যন্ত তার মাথা জোড়া লেগে যাচ্ছে। অতপর সে তার কাছে গিয়ে পুনরায় আঘাত করছে। আমি বললাম এটা কী? তারা উভয়ে বললেন : সামনে চলুন। আমরা এগিয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত একটা চুল্লীর কাছে পৌঁছলাম। তার ওপরের ভাগটা সংকীর্ণ এবং নিচের অংশ প্রশস্ত। তার নিচ থেকে আগুন জ্বলছে। দেখা গেল, চুল্লীর ভেতরে কতকগুলো উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। নিচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা উঠে আসছে তাদের কাছে। লেলিহান শিখা যখন উঠে তাদের কাছে আসছে, তখন তারা ওপরের দিকে উঠে যেতে যেতে চুল্লী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে। অতপর যখন আগুন নিভে যাচ্ছে, তখন তারা আবার আগের জায়গায় চলে যাচ্ছে। আমি বললাম : এটা কী? তারা বললেন : সামনে এগিয়ে চলুন। আমরা এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে একটা রক্তের নদীর কিনারে পৌঁছলাম। নদীতে এক ব্যক্তি ভাসমান রয়েছে। আর নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি। তার সামনে একটা পাথর। যে লোকটি নদীর ভেতরে ভাসমান রয়েছে, সে এগিয়ে আসে। যখনই সে নদী থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, অমনি অপর লোকটি তার মুখে একটা পাথর ছুড়ে মারে এবং সে যেখানে ছিলো সেখানে তাকে ফেরত পাঠায়। প্রতিবারই সে যখন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে, তখন তার মুখের ওপর পাথর ছুড়ে মারছে। ফলে সে যেখানে ছিলো, সেখানে ফিরে যাচ্ছে। তখন আমি বললাম : এটা কী? তারা উভয়ে বললেন : সামনে চলুন। আমরা সামনে এগিয়ে চললাম। যেতে যেতে আমরা একটা সবুজ বাগানে পৌঁছলাম। সেখানে একটা বিরাট গাছ রয়েছে। গাছের গোড়ায় একজন বৃদ্ধ এবং বহু সংখ্যক ছেলেমেয়ে। গাছের কাছেই রয়েছে এক ব্যক্তি। তার সামনে আগুন রয়েছে, যা সে জ্বালাচ্ছে। তারা উভয়ে আমাকে নিয়ে গাছটির উপর আরোহণ করলেন এবং আমাকে নিয়ে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। সেই ঘরে অনেক যুবক ও বৃদ্ধ রয়েছে। তারপর পুনরায় তারা আমাকে নিয়ে আরো ওপরে আরোহণ করলেন। তারপর আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করালেন, যা আরো সুন্দর এবং আরো ভালো। আমি বললাম : আপনারা দু'জনে আজ আমাকে অনেক ঘোরালেন। এখন আমি যা যা দেখলাম তার রহস্য ব্যাখ্যা করুন। তারা উভয়ে বললেন : হাঁ। যাকে আপনি দেখলেন তার চোয়াল ফাড়া হচ্ছে, সে একজন মিথ্যাবাদী, মিথ্যা খবর প্রচারে অভ্যস্ত ছিলো। তারপর তার কাছ থেকে স্থানান্তরিত হতে হতে তা দিগ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তো। তাই তার সাথে কেয়ামত পর্যন্ত এরূপ আচরণ চলতে থাকবে। আর যার মাথা ফাটানো হচ্ছে দেখলেন, সে এমন এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআনের ইলম দিয়েছেন। কিন্তু সে রাতেও কুরআনের অধ্যয়ন ছাড়াই ঘুমিয়ে কাটিয়েছে এবং দিনেও তদনুসারে কাজ করেনি। তার সাথে কেয়ামত পর্যন্ত এ রকমই করা হবে। আর চুল্লীর মধ্যে যাদেরকে দেখলেন, তারা সব ব্যভিচারী। আর রক্তের

নদীতে যাকে দেখলেন, সে সুদখোর। আর গাছের গোড়ায় যে বৃদ্ধকে দেখলেন তিনি হলেন ইবরাহীম আ.। আর তার পাশের ছেলেমেয়েরা জনগণের ছেলেমেয়ে। আর যে ব্যক্তি আগুন জ্বালাচ্ছিল, সে দোযখের রক্ষক মালেক। আর প্রথম ঘরটি সাধারণ মুসলমানদের ঘর। আর এ ঘরটি শহীদদের ঘর। আর আমি জিবরীল এবং ইনি মিকাইল। এখন আপনার মাথাটা উঁচু করুন তো। আমি মাথা উঁচু করলাম। দেখলাম মেঘের মতো একটা প্রাসাদ। তারা দু'জন বললেন : ঐ প্রাসাদটা আপনার বাসস্থান। আমি বললাম : আমাকে আমার ঘরে প্রবেশ করতে দিন। তারা বললেন : আপনার আয়ুষ্কাল এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। এখনো আপনি তা শেষ করেননি। ইতিমধ্যে যদি আয়ুষ্কাল শেষ করে আসতেন, তাহলে আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করতে পারতেন।"

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন : এটা 'বরযখে'র (মৃত্যু ও কেয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ের) আযাবের বিবরণ। কেননা নবীদের স্বপ্ন বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিশীল।

৬. তাহাবি ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আল্লাহর জনৈক বান্দার কবরের উপর একশো বেত্রাঘাত করার আদেশ দেয়া হলো। লোকটি আল্লাহর কাছে এই শাস্তি হ্রাস করার জন্য দোয়া ও অনুনয় বিনয় করতে থাকলো। ফলে কমতে কমতে একটা বেত্রাঘাত অবশিষ্ট রইল। এরপর তার কবর তার ওপর আগুনে পূর্ণ হয়ে গেলো। এ শাস্তি তার উপর থেকে উঠে যাওয়ার পর সে সম্বিত ফিরে পেলো। তখন সে (ফেরেশতাদেরকে) বললো : তোমরা কী কারণে আমাকে বেত্রাঘাত করলে? তারা বললেন : তুমি পবিত্রতা ছাড়াই একটা নামায পড়েছিলে এবং এক ব্যক্তির ওপর যুলুম হতে দেখেছিলে। কিন্তু তাকে সাহায্য করোনি।"

৭. নাসায়ী ও মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. একটা শব্দ শুনতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : এই ব্যক্তি কবে মারা গেছে? লোকেরা বললো : জাহেলিয়ত যুগে মারা গেছে। একথা শুনে তিনি আনন্দিত হলেন এবং বললেন : এমন যদি না হতো যে, তোমরা পরস্পরকে দাফন করবেনা, তাহলে আমি দোয়া করতাম, যেন আল্লাহ তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনিয়ে দেন।"

৮. বুখারি, মুসলিম ও নাসায়ী ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি (সা'দ ইবনে মুয়ায) যার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছে, আকাশের দরজাগুলো খুলে গেছে এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তার নিকট উপস্থিত হয়েছে। কবর তাকে জড়িয়ে ধরেছে, অতপর ছেড়েও দিয়েছে।"

১০. রূহ কোথায় থাকে?

ইবনুল কাইয়্যেম একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। সেই অধ্যায়ে তিনি রূহ বা আত্মা কোথায় অবস্থান করে সে সম্পর্কে আলেমদের মতামত উল্লেখ করেছেন। তারপর যে মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য, তার উল্লেখ করে বলেছেন : বলা হয় বরযখে রূহগুলোর অবস্থানস্থলে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

কিছু সংখ্যক রূহ ইল্লিয়ীনের সর্বোচ্চ স্থানে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগণের রূহের সাথে থাকবে। এগুলো হচ্ছে নবীদের রূহ। নবীদের এই অবস্থানস্থলও পরস্পর থেকে ভিন্ন, যেমন মেরাজের রাতে রসূল সা. প্রত্যক্ষ করেছেন।

কিছু রূহ থাকবে বেহেশতে যত্রতত্র পরিভ্রমণরত সবুজ পাখিদের মধ্যে। এ রূহগুলোর একাংশ শহীদদের। বরঞ্চ শহীদদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যার রূহকে তার ঋণগ্রস্ত থাকার কারণে বেহেশতে প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা। যেমন মুসনাদে আহমদে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহাশ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো : হে রসূলুল্লাহ, আমি

যদি আল্লাহর পথে নিহত হই, তবে আমার কী ফল হবে? তিনি বললেন : বেহেশত। লোকটি যখন চলে যেতে উদ্যত হলো তখন বললেন : কিন্তু ঋণ ব্যতিত। জিবরীল আমাকে এই মাত্র এটা কানে কানে বললেন।

শহীদদের কাউকে কাউকে বেহেশতের দরজার উপরে আটকে দেয়া হবে। যেমন একটি হাদিসে রসূল সা. এরূপ আটকে দেয়ার দৃশ্য দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

শহীদদের কাউকে কাউকে কবরেও আটকে দেয়া হবে। যেমন এক ব্যক্তি একটা মূল্যবান চাদর চুরি করে পরে নিহত হয়। লোকেরা তখন বললো : তাকে অভিনন্দন। সে তো জান্নাতবাসি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহর কসম, যে চাদরটা সে চুরি করেছে, তা তার কবরে আগুন হয়ে জ্বলবে।" শহীদদের কারো কারো বাসস্থান হবে বেহেশতের দরজায়। যেমন ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : শহীদরা বেহেশতের দরজার কাছেই একটি নদীর কিনারে একটি সবুজ গম্বুজের ভেতরে থাকবে। সকালে বিকালে বেহেশত থেকে তাদের খাবার আসবে।" -আহমদ। ঠিক এর বিপরীত অবস্থা জাফর ইবনে আবু তালিবের। কেননা আল্লাহ তার দুই হাতের পরিবর্তে দুটি পাখা দান করবেন, যা দিয়ে তিনি বেহেশতে যেখানে যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়াবেন। (জাফরের দুটি হাত মুতার যুদ্ধে কাটা গিয়েছিল এবং তারপর তিনি শাহাদত বরণ করেন)।

কিছু কিছু রূহ পৃথিবীতেই আটকা পড়বে। ফলে তা সর্বোচ্চ ফেরেশতাদের অবস্থান স্থলে পৌঁছতে পারবেনা। কেননা এসব রূহ ছিলো নিম্নস্তরের ও দুনিয়ামুখি। দুনিয়ামুখি রূহ আকাশমুখি রূহের সাথে মিলিত হতে পারেনা। অনুরূপ, তা পার্থিব জীবনেও পরস্পরের সাথে মিলিত হতে পারেনা। আর যে আত্মা পৃথিবীর জীবনে আপন প্রতিপালকের পরিচয়, ভালোবাসা, স্মরণ, প্রীতি ও নৈকট্য লাভ করতে পারেনা, সেটাই নিম্নস্তরের ও দুনিয়ামুখি আত্মা। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা পৃথিবীতেই থাকে। যেমন উচ্চস্তরের আত্মা, যা দুনিয়ায় আল্লাহর ভালোবাসা, স্মরণ, নৈকট্য ও প্রীতি অর্জনে নিয়োজিত থাকবে, তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর তার সমগোত্রীয় উচ্চতর আত্মাগুলোর সাথে অবস্থান করে। সুতরাং মানুষ মাত্রই বরযখে ও আখেরাতে যাকে ভালোবাসে তার সাথেই থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বরযখে ও কেয়ামতের দিন আত্মাগুলোর একটির সাথে আরেকটিকে জুটি বানাবেন এবং মুমিনের রূহকে তার সমগোত্রীয় পবিত্র রূহের সাথে যুক্ত করবেন। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রূহ তার স্বগোত্রীয়, ভ্রাতৃপ্রতিম ও একই ধরনের কর্মের অধিকারী রূহের সাথে যুক্ত হয়।

কিছু রূহ থাকবে ব্যভিচারীদের চুল্লীতে, কিছু রূহ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটবে ও পাথরের আঘাত খাবে। সুতরাং ভালো হোক বা মন্দ হোক, রূহের আবাস এক হবেনা। কারো বাসস্থান ইল্লিয়ীনের সর্বোচ্চ স্তরে, আবার কোনো রূহ দুনিয়ামুখি ও নিম্নস্তরের, যা পৃথিবীর উর্ধ্বে উঠতে পারেনা।

এ সম্পর্কে হাদিসের গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করলে এবং এর প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে উল্লিখিত বক্তব্যের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে এবং ঐসব হাদিসের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য আছে বলে মনে হবেনা। কেননা সেগুলো সবই সঠিক এবং একটি অপরটির সমর্থন করে। কিন্তু রূহকে বুঝা, চেনা ও তার বিধি জানা আবশ্যক। এও জানা আবশ্যক যে, দেহের অবস্থা ও রূহের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। রূহ বেহেশতে অবস্থান করা সত্ত্বেও তা আকাশে থাকে, কবরের পার্শ্বেই থাকে এবং কবরের ভেতরকার দেহের সাথে যুক্ত থাকে। এটা অন্য সকল জিনিসের চেয়ে দ্রুত গতিতে চলাফেরা করে, স্থানান্তরে যাতায়াত করে, আরোহণ করে ও

নামে। কোনো রূহ অবাধ ও উন্মুক্তভাবে চলাচল করে, কোনো রূহ আটক থাকে। কোনো রূহ উচ্চস্তরের, কোনো রূহ নিম্নস্তরের। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রূহ রোগাক্রান্ত হয়, আবার সুস্থও থাকে। আনন্দ ও নিয়ামত ভোগ করে। আবার জীবদ্দশার চেয়ে মৃত্যুর পর এই দুঃখ কষ্ট অনেক বেশি হয়। সেখানে সে ভোগ করে আটকাবস্থা, মর্মবেদনা, শাস্তি, রোগ ও শোক। আবার আনন্দ, সুখ, প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দও ভোগ করে। বর্তমান দেহে রূহের অবস্থান এবং মায়ের পেটে তার দেহে রূহের অবস্থান আর বর্তমান দেহ থেকে রূহের বিচ্ছেদ ও মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পর তার দেহ থেকে রূহের বিচ্ছেদের অনেক পার্থক্য- যদিও বাহ্যত: তা সাদৃশ্যপূর্ণ।

রূহের চার জগৎ

এক. মাতৃগর্ভ। সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা, উৎকণ্ঠা ও তিন স্তরের অন্ধকার এর বৈশিষ্ট্য।

দুই. যেখানে তার জন্ম হয়েছে, ভালো ও মন্দ কাজ করেছে এবং তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণ সৃষ্টি হয়েছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন।)

তিন. বরযখ। এটি দুনিয়ার বাসস্থানের অপেক্ষা প্রশস্ততর ও বৃহত্তর।

চার. আখেরাত তথা জান্নাত ও দোযখ সম্বলিত চিরস্থায়ী আবাস। এটির পর কোনো আবাসের সৃষ্টি হবেনা। রূহকে আল্লাহ এসব স্থানে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত করেন এবং সর্বশেষে সেই চিরস্থায়ী আবাসে নিয়ে যান, যা তার উপযোগী, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যার উপযোগী কাজ করার যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে।

আত্মা বা রূহের জন্য এই আবাসগুলোর প্রত্যেকটিতে স্বতন্ত্র মর্যাদা সংরক্ষিত রয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহকে অশেষ অভিনন্দন। যিনি রূহের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৌভাগ্যদাতা ও দুর্ভাগ্যদাতা। তিনি তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের স্তরে এবং তার জ্ঞান, কাজ, শক্তি ও চরিত্রের মানে তারতম্য সৃষ্টি করেছেন। তাই যে ব্যক্তি আত্মাকে সঠিকভাবে চিনবে, সে অবশ্যই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই, সমগ্র রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর, সমস্ত কল্যাণ তাঁর হাতে, সকল জিনিস তাঁর দিকেই আবর্তিত, সকল শক্তি তাঁর, সকল ক্ষমতা তাঁর, সকল সম্মান ও মর্যাদা তাঁর, সমস্ত বিচক্ষণতা তাঁর, সর্বদিক দিয়ে সার্বিক পূর্ণতা একমাত্র তাঁর। যে নিজের রূহকে চিনবে, সে নবী ও রসূলগণকে মানবে এবং স্বীকার করবে যে, নবীরাই সেই মহাসত্য এনেছেন, যার সাক্ষ্য দেয় বিবেক ও বিশ্বপ্রকৃতি। আর যে জিনিস এই মহাসত্যের বিরোধিতা করে, সে জিনিস বাতিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যিকর

মুখ ও মন দিয়ে আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা, তাঁর প্রশংসা, তাঁর পূর্ণতাসূচক গুণাবলি স্মরণ এবং তাঁর মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের উপলব্ধি ও উল্লেখ করাকে যিকর বলা হয়।

১. আল্লাহ তায়ালা বেশি করো যিকর করার আদেশ দিয়েছে। তিনি বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً .

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে বেশি করে যিকর করো এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর গুণগান প্রকাশ করো।"

২. আল্লাহ তায়ালা আরো জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করে আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন। তিনি বলেছেন :. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।"

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা পোষণ করে আমি তেমনই।[১] আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি মনে মনে আমকে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি কোনো দলের সামনে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তার দলের চেয়েও ভালো দলের সামনে তাকে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় হবে আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। সে যদি আমার কাছে হেটে আসে তবে আমি তর দিকে দৌড়ে যাই।[২]

৩. আল্লাহকে যারা প্রতিনিয়ত স্মরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ একাগ্রচিত্ত ও অগ্রবর্তী বলে আখ্যায়িত করেছেন। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : একাগ্রচিত্তরা অগ্রবর্তী। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, একাগ্রচিত্ত বলতে আপনি কাদেরকে বুঝাচ্ছেন? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : যে সমস্ত নরনারী আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। - মুসলিম।

৪. প্রকৃতপক্ষে যিকরকারীরাই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত মুসলমান। কেননা আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে ও যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করেনা, এই দুইজন যথাক্রমে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।" - বুখারি।

৫. আল্লাহর যিকর বা স্মরণ যাবতীয় সৎ কর্মের সেরা। যাকে যিকরের তাওফীক দেয়া হয়েছে, তাকে আল্লাহ বন্ধুরূপে বরণ করে নেবেন বলে সনদ দেয়া হয়েছে। এজন্য রসূলুল্লাহ সা. সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকরে নিয়োজিত থাকতেন। তিরমিযি, আহমদ ও হাকেম বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.কে বললেন : ইসলামের বিধিবিধান আমার কাছে অনেক বেশি মনে হয়। আপনি আমাকে এমন একটি বিধি জানিয়ে দিন, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবো। তিনি তাকে

---

১. অর্থাৎ সে যদি মনে করে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন এবং এরূপ মনে করে দোয়া করে তবে তিনি দোয়া কবুল করেন। আর যদি সে ধারণা করে যে, তিনি ক্ষমা করবেন এবং ক্ষমা চায়, তবে তিনি ক্ষমা করেন। ইত্যাদি।

২. অর্থাৎ বান্দা যতোই আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহ ততোই দ্রুত গতিতে তার দিকে যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গলের হাত বাড়িয়ে দেন।

বললেন : তোমার মুখ সব সময় আল্লাহর যিকরে লিপ্ত থাকুক। তিনি তার সাহাবিদেরকে বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের সন্ধান দেবোনা যা তোমাদের সকল কাজের চেয়ে ভালো। তোমাদের বাদশাহ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধিকারি, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়ে তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর এবং শত্রুর মোকাবিলা করে শত্রুদেরকে হত্যা করা ও নিজেদের নিহত হওয়ার চেয়ে তোমাদের জন্য অধিক উত্তম? তারা বললেন : হে রসূলুল্লাহ! বলুন। তিনি বললেন তা হচ্ছে : আল্লাহর যিকর।

৬. আল্লাহর যিকর হচ্ছে আযাব থেকে মুক্তির পথ। মুয়ায রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মানুষ কখনো এমন কোনো কাজ করেনা, যা তাকে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি দিতে আল্লাহর যিকরের চেয়ে বেশি সক্ষম। - আহমদ।

৭. আহমদ আরো বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, ইত্যাকার যেসব যিকর দ্বারা তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো, তা আরশের চার পাশে হেলে দুলে ঘুরতে থাকবে। আর মৌমাছির মতো গুন গুন শব্দ করে যিকরকারীকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবে। তোমাদের কি এটা পছন্দ নয় যে, সেদিন তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মতো কিছু সম্বল তোমাদের হোক?

যিকরের পরিমাণ

আল্লাহ তায়ালা বেশি পরিমাণে যিকর করার আদেশ দিয়েছিন। যে সকল লোক আল্লাহর সৃষ্টিজগতের পর্যবেক্ষণ দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদেরকে তিনি বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত করার পর তাদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

"যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকর করে।" "যে সকল নরনারী অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।"

মুজাহিদ বলেছেন : শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে- সকল অবস্থায় আল্লাহর যিকর না করলে আল্লাহর অধিক যিকরকারী নরনারী হওয়া যায়না।

কী পরিমাণ যিকর করলে আল্লাহর অধিক যিকরকারী বলে গণ্য হওয়া যায় জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে ইবনুস সালাহ বলেছেন : বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত ও বর্ণিত যিকর ও দোয়া নিয়মিতভাবে সকালে ও বিকালে এবং দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় করলেই অধিক যিকরকারীরূপে গণ্য হওয়া যায়। উল্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইবনে আব্বাস রা. বলেন : আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর যে ইবাদতই ফরয করেছেন, তার একটা সীমা নির্দিষ্ট করেছেন এবং ওযর ও অসুবিধার সময় তা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কিন্তু যিকরকারির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। আল্লাহ যিকরের কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি, যেখানে পৌছে তা বন্ধ হয়ে যাবে আর যিকর করতে অক্ষম হওয়া ব্যতীত কাউকে যিকর থেকে অব্যাহতিও দেয়া হয়নি। বরঞ্চ শোয়া, বসা ও দাঁড়ানো অবস্থায়, দিনে ও রাতে, জলে ও স্থলে, স্বদেশ ও বিদেশ, দারিদ্র্যে ও প্রাচুর্যে, রোগে ও সুস্থাবস্থায়। গোপনে ও প্রকাশ্যে- এক কথায় সকল অবস্থায় যিকর করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর হুকুম পালনের যাবতীয় প্রচেষ্টাই আল্লাহর যিকরের আওতাভুক্ত : সাঈদ বিন জুবাইর রা. বলেছেন : আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত ও তাঁর হুকুম পালনে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহর যিকরকারী। প্রাচীন মনীষীদের কেউ কেউ এই অনির্দিষ্ট শব্দটিকে নির্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছেন। তাই তারা যিকরের কয়েকটি বিশেষ ধরনকে যিকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আতা। তিনি বলেছেন : যে সকল সভা সমাবেশে হালাল হারাম, ক্রয় বিক্রয়, নামায রোযা, হজ্জ, বিয়ে ও তালাক ইত্যাদির শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি শেখানো ও অবহিত করানো হয়, সেগুলো যিকরের মজলিস হিসেবেই গণ্য। কুরতুবি বলেছেন : ইসলামের জ্ঞান বিতরণ ও ইসলামের শিক্ষা স্মরণ করানোর মজলিসই যিকরের মজলিস। অর্থাৎ যে সকল সভা সমাবেশে আল্লাহর কালাম ও রসূলের সুন্নতের আলোচনা, অনুশীলন বা চর্চা হয় প্রাচীন পুণ্যবান ও সৎ ব্যক্তিগণের জীবনকথা আলোচিত হয় এবং সেসব প্রাচীন ত্যাগী ইমামগণের বাণী প্রচার করা হয়, যারা সকল ধরনের বিদআত, মনগড়া রীতিনীতি, খারাপ উদ্দেশ্য ও লোভলালসা থেকে মুক্ত।

যিকরের আদব বা পদ্ধতি : যিকরের উদ্দেশ্য হলো, মনের পবিত্রতা সাধন, প্রবৃত্তির বিশুদ্ধকরণ ও বিবেককে কলুষমুক্ত করণ। এদিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলেন :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.

"তুমি নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করে। আর আল্লাহর যিকর হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা আনকাবূত : আয়াত ৪৫)

অর্থাৎ অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার কাজে আল্লাহর যিকর নামাযের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহর যিকরকারির হৃদয়মন যখন আল্লাহর জন্য উন্মুক্ত হয় এবং তার স্মরণে যখন তার জিহ্বা সোচ্চার হয়, তখন আল্লাহ তাকে তার নূর দিয়ে সাহায্য করেন। ফলে তার ঈমান বহুগুণ বেড়ে যায় এবং তার মন সত্যের প্রতি পরিপূর্ণরূপে আস্থাশীল হয়। আল্লাহ বলেন :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

"যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের মন আল্লাহর যিকরে স্বস্তি লাভ করেছে (সেই অনুগত বান্দাদেরকেই আল্লাহ তার দিকে পথ প্রদর্শন করেন) জেনে রেখো, আল্লাহর যিকর দ্বারাই মন স্বস্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দ : আয়াত ২৮)

আর মন যখন সত্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় ও প্রশান্তি লাভ করে তখন তা আরো উচ্চতর ধাপে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় এবং তাঁর পথে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয়। তখন আর প্রকৃতির কোনো প্রলোভন ও পার্থিব লালসার কোনো হাতছানি তাকে তা থেকে বিরত রাখতে পারেনা। এ কারণেই যিকরের বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং মানব জীবনে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শুধুমাত্র মুখ দিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণের ফল এত ব্যাপক হতে পারে- এটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কেননা মুখের উচ্চারণের উপকারিতা খুবই সামান্য- যতোক্ষণ না মন তাকে সমর্থন করে। এজন্য আল্লাহ যিকরের সময় কী ধরনের আদব বা রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, সে ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ.

"তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো তোমার অন্তরে, সকাতরে ও সবিনয়ে, ভীতিসহকারে ও অনুচ্চ কণ্ঠে, সকালে ও সন্ধ্যায়। উদাসীন হয়োনা।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৫)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, যিকর গোপনে ও অনুচ্চ কণ্ঠে করা মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ সা. কোনো এক সফরে একদল মানুষকে উচ্চস্বরে দোয়া করতে শুনে বললেন : হে জনতা, তোমরা নিজেদের উপর সদয় হও। কেননা তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত প্রভুকে ডাকছোনা। তোমরা যাকে ডাকছো, তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী। তিনি তোমাদের বাহক ঘাড়ের চেয়েও নিকটতর।" অনুরূপ, এও জানা যায় যে, অত্যন্ত আগ্রহ ও ভীতির সাথে যিকর করা উচিত। যিকরের অন্যতম আদব হলো, যিকরকারির দেহ ও পোশাক পবিত্র ও সুগন্ধিযুক্ত হওয়া উচিত। কেননা এতে মন অধিকতর উৎফুল্ল ও সক্রিয় হয়। আর যিকরের সময় কিবলামুখি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা কিবলামুখি হয়ে যে কাজ করা হয়, তা সর্বোত্তম কাজ।

যিকরের সমাবেশগুলোতে যোগদান করা মুস্তাহাব : যিকরের সমবেশগুলোতে অংশগ্রহণ করা মুস্তাহাব। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস হলো :

১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন : যখন তোমরা বেহেশতের বাগানগুলোর কাছে দিয়ে যাও, তখন তার ফলমূল আহরণ করো। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, বেহেশতের বাগান কী? তিনি বললেন : যিকরের মজলিস। কারণ আল্লাহর কিছু ফেরেশতা দল রয়েছে, যারা যিকরের মজলিসগুলো খুঁজে বেড়ায়। যখন কোনো মজলিস খুঁজে পায়, অমনি তার চারপাশ ঘিরে অবস্থান নেয়।"

২. মুসলিম মুয়াবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবিদের একটি সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বললেন : তোমরা কী উদ্দেশ্যে এ সমাবেশের আয়োজন করেছো? তারা বললো : আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দীক্ষিত করে অনুগৃহীত করেছেন, সেজন্য আল্লাহকে স্মরণ ও তার প্রশংসা করছি। রসূল (সা) বললেন : আল্লাহ কসম, সত্যিই কি তাই? তোমরা কি এজন্যই সমবেত হয়েছো। শোনো, তোমাদের উপর কোনো অভিযোগের কারণে তোমাদেরকে শপথ দিয়ে একথা জিজ্ঞাসা করিনি। আসলে আমার কাছে জিবরিল এসে জানিয়েছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন।"

৩. মুসলিম আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, রসূল সা. বলেছেন : কোনো একটি দল যখনই আল্লাহর যিকরের জন্য সমবেত হয়, তখনই ফেরেশতা তাদের ঘিরে ফেলে। তাদের উপর আল্লাহর রহমত ও প্রশান্তি নাযিল হয় আর আল্লাহ তার কাছে উপস্থিত ফেরেশতাদের নিকট তাদের স্মরণ করেন।

একনিষ্ঠ মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ফযীলত : ১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : যখনই কোনো বান্দা একনিষ্ঠ মনে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, তখনই তার জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে যায়, যাতে তার এই কথাটা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যতোক্ষণ সে কবীরা গুনাহগুলো বর্জন করে। -তিরমিযি।

২. রসূল সা. বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করো। বলা হলো : হে রসূলুল্লাহ, আমাদের ঈমানকে কিভাবে নবায়ন করবো? তিনি বললেন : বেশি করে বলো : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"- আহমদ।

৩. রসূল সা. বলেছেন : সর্বোত্তম যিকর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বোত্তম দোয়া আলহামদু লিল্লাহ।- নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকেম।

কতিপয় যিকর-এর ফযীলত

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

এ দুটো কথা জিহ্বার উপর (অর্থাৎ উচ্চারণে) খুবই হালকা, দাঁড়িপাল্লায় খুবই ভারি এবং দয়াময় আল্লাহর কাছে অতীব প্রিয়।"-বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ .

একথাগুলো ঘোষণা করা আমার নিকট সূর্যের কিরণে আলোকিত (সমগ্র পৃথিবী ও তার অভ্যন্তরস্থ) যাবতীয় বস্তুর চেয়ে প্রিয়। -মুসলিম, তিরমিযি।

৩. আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হে আবু যর! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কথাটা কি, তাকি আমি তোমাকে বলবোনা? আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ সা. বলুন। তিনি বললেন। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কথাটা হলো سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ -মুসলিম, তিরমিযি। তিরমিযির ভাষ্য হলো : আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কথা হলো, আল্লাহ তার ফেরেশতাদের জন্য যা মনোনীত করেছেন : سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ .

৪. জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি বলবে :

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ .

তার জন্য বেহেশতে একটি খেজুর চারা রোপন করা হয়। -তিরমিযি।

৫. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ভালো কথাগুলোর কোনো ক্ষয় নেই, সেগুলো বেশি করে বলো। বলা হলো, হে রসূলুল্লাহ সা.! সে কথাগুলো কী কী? তিনি বললেন : আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ এবং লা-হাওলা অলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ বলা। নাসায়ী, হাকিম। হাকিম বলেছেন সূত্র সহীহ।

৬. আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে রাতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো (অর্থাৎ মেরাজের রাতে) আমি ইবরাহীম আ. এর সাথে মিলিত হলাম। তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ, তোমার উম্মতকে আমার পক্ষ হতে সালাম জানিয়ে দিও এবং তাদেরকে জানিও যে, বেহেশত হচ্ছে খুবই সুন্দর ভূমি ও সুমিষ্ট পানির স্থান। বেহেশত হচ্ছে, বিস্তীর্ণ ও সুপ্রশস্ত সমতল ভূমি। আর এর উদ্ভিদ হলো :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. -তিরমিযি ও তাবারানি। তাবারানিতে একথাটিও কথা সংযোজন করা হয়েছে : "লা-হাওলা অলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।"

৭. মুসলিমে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "চারটে কথা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার যেটি দিয়েই তুমি শুরু করো, ক্ষতি নেই। তা হচ্ছে :

سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ.

৮. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো রাতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটো পড়বে তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। -বুখারি ও মুসলিম। অর্থাৎ এই দুটো আয়াত পড়া তার ঐ রাত পুরো জেগে নামায পড়ার সমকক্ষ হবে। কেউ কেউ বলেন : যথেষ্ট হওয়ার অর্থ ঐ রাতের যাবতীয় বিপদ মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইবনে

খোযায়মা তাঁর সহীহ্ সংকলনে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটি উল্লেখ করার আগে এভাবে শিরোনাম দিয়েছেন : "রাতের নামাযের জন্য ন্যূনতম যেটুকু কুরআন পড়া যথেষ্ট, তার বিবরণ।"

৯. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমরা কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে সক্ষম? সাহাবিদেরে কাছে এর জবাব দেয়া কঠিন মনে হলো। তাঁরা বললেন : হে রসূলুল্লাহ্ সা. এটা আমাদের মধ্যে কে-ই বা পড়বে? রসূল সা. বললেন : সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। -বুখারি, মুসলিম।

১০. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশো বার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ পড়বে তার জন্য এটা দশটা গোলাম মুক্ত করার সমান হবে। তার জন্য একশোটা সওয়াব লেখা হবে। তার একশোটা গুনাহ্ মোচন করা হবে। এটা তার জন্য ঐ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে রক্ষা কবচ হবে এবং এর চেয়ে বেশি সৎকাজকারি ছাড়া আর কেউ তার চেয়ে উত্তম কর্ম সম্পাদনকারি বিবেচিত হবেনা। -বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

মুসলিম, তিরমিযি ও নাসায়ীর বর্ণনায় সংযোজিত হয়েছে : "আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশো বার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" বলবে, তার গুনাহর পরিমাণ যদি সমুদ্রের ফেনারাশির সমানও হয়, তথাপি তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

ইসতিগফার (গুনাহ মাফ চাওয়া)-এর ফযীলত : আনাস রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ বলেন : হে আদম সন্তান, তুমি আমাকে যখনই ডাকো ও আমার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করো। তোমার দ্বারা যা কিছুই ঘটে থাকুক, আমি তা ক্ষমা করি। এতে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করিনা। হে আদম সন্তান, তোমার গুনাহগুলো যদি (এতো বেশি হয় যে) আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। এতে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করিনা। হে আদম সন্তান, তুমি যদি সারা পৃথিবী ভরে যায় এতো গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আসো এবং আমার সাথে কাউকে শরিক না করেই আমার কাছে আসো, তবে আমি তোমার কাছে সারা পৃথিবী ভরে যায় এতো পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আসবো। -তিরমিযি।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : যে ব্যক্তি সর্বক্ষণ ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে, আল্লাহ্ তার সকল দুশ্চিন্তা দূরে করে দেন, সকল সংকট থেকে তাকে মুক্ত করেন এবং তাকে এমন উপায়ে জীবিকা দেন যে, সে কল্পনাও করতে পারেনা। -আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম।

যে সকল যিকর ব্যাপক অর্থবোধক ও বহুগুণ সওয়াবের কারণ হয় : ১. জুয়াইরিয়া রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. তার কাছ থেকে বের হলেন, তারপর দুপুর হয়ে গেলে ফিরে এলেন। জুয়াইরিয়া তখনো সেই জায়গায় বসে ছিলেন। রসূল সা. তাকে বললেন : একি! তুমি এখনো সেই অবস্থায় আছো যে অবস্থায় তোমাকে রেখে গিয়েছি? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রসূল সা. বললেন : তোমাকে রেখে যাওয়ার পর আমি চারটে কথা তিনবার বলেছি। সেগুলোর যদি ওজন দেয়া হয়, তবে তুমি এতকাল ধরে যতো (ভালো) কথা বলেছো, তার চেয়ে তার ওজন ভারী হবে। সেগুলো হলো : "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, আদাদা খালকিহী, ওয়া রিযাআ নাফসিহি, ওয়া যিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী"। (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার প্রশংসা সহকারে। তার সৃষ্টের সংখ্যার সমান, তার সন্তুষ্টির সমান। তার আরশের

সমান এবং বাণীসমূহ লিখতে যতো কালির প্রয়োজন হয় তার সমান)- মুসলিম, আবু দাউদ।

২. রসূলুল্লাহ সা.-এর একটি মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হলো। তার সামনে কতগুলো দানা বা পাথরের টুকরো ছিলো, যা দিয়ে সে আল্লাহর গুণগান করে। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন : আমি কি তোমাকে এমন দোয়া শিখাবো, যা তোমার কাছে এর চেয়ে সহজ ও উত্তম? তারপর তিনি বললেন তা হলো :

سُبْحَانَ اللّٰهَ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللّٰه عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الاَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللّٰه عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللّٰه عَدَدَ مَا هُوَ خَلِقٌ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلِ ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ. - আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহর জনৈক বান্দা বললো : "হে আমার প্রতিপালক তোমার জন্য সেরূপ প্রশংসা, যেরূপ তোমার মহত্ত্বের উপযোগী এবং যেরূপ তোমার সাম্রাজ্যের বিশালত্বের উপযোগী।" তার ফেরেশতাদ্বয়ের কাছে ব্যাপারটা জটিল মনে হলো। তারা কিভাবে এটা লিখবে তা বুঝতে পারলোনা। অগত্যা তারা উভয়ে আকাশে আরোহণ করলো। তারপর বললো : হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার বান্দা এমন একটা কথা বলেছে, যা আমরা কিভাবে লিখবো বুঝতে পারছিনা। আল্লাহ যদিও তার বান্দা কী বলেছে, তা সবার চেয়ে ভালো জানতেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করলেন : আমার বান্দা কী বলেছে? ফেরেশতারা বললেন : হে আমাদের প্রতিপালক, সে বলেছে : হে আমার প্রতিপালক, তোমার জন্য সেরূপ প্রশংসা, যেরূপ তোমার মহত্ত্বের উপযোগী এবং যেরূপ তোমার সাম্রাজ্যের বিশালত্বের উপযোগী।" আল্লাহ ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন : আমার বান্দা যা বলেছে, হুবহু তাই লিখে রাখো। যখন সে আমার সাথে মিলিত হবে, তখন আমি তাকে এর পুরস্কার দেবো। -আহমদ ও ইবনে মাজাহ।

আঙ্গুল দিয়ে গণনা করা তাসবীহর দানার চেয়ে উত্তম : ১. বুসাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হে মহিলাগণ, তোমরা সুবহানাল্লাহ বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলো, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং উদাসীন হয়োনা। তাহলে রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। আর তোমরা আঙ্গুল দিয়ে গণনা করো। কেননা আঙ্গুলগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং কথা বলানো হবে।- আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম। (এ থেকে প্রমাণিত হয়, দানাদার তাসবীহর চেয়ে হাতে গণনা করাই উত্তম। তবে দানাদার তাসবীহ দ্বারা গণনা করাও জায়েয আছে।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে ডান হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি। -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

যে মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়না এবং রসূল সা. এর প্রতি দরুদ পড়া হয়না সেখানে যোগদানে হুঁশিয়ারী : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে মজলিসে লোকেরা আল্লাহকে স্মরণ করেনা এবং রসূল সা. এর উপর দরুদ পড়া হয়না, সে মজলিস কেয়ামতের দিন তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। -তিরমিযি।

আহমদের বর্ণনার ভাষ্য হলো : যে মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়না, তা ক্ষতিকর হবে, যে সফরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়না তা ক্ষতির হবে, যে বিছানায় শুতে গিয়ে আল্লাহকে স্মরণ

করা হয়না, তা ক্ষতিকর হবে। অপর বর্ণনায়, মজলিসের লোকদের জন্য তা অনুশোচনার কারণ হবে-যদিও সওয়াবের জন্য তারা বেহেশতে প্রবেশ করে। ফাতহুল আল্লামে বলা হয়েছে : এ হাদিস প্রমাণ করে, যে কোনো মজলিসে আল্লাহর স্মরণ ও রসূল সা.-এর উপর দরুদ পড়া ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেছেন এটা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। কেননা কোনো ফরয বা ওয়াজিব তরক করা বা নিষিদ্ধ কাজ করা ছাড়া আযাবের হুঁশিয়ারী দেয়া হয়না। এ হাদিস থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর স্মরণ ও রসূলের প্রতি দরুদ উভয়ই ওয়াজিব।

মজলিসের বেহুদা কথাবার্তার কাফফারা : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসার পর সেখানে অনেক কথাবার্তা হয়, অতপর উক্ত মজলিস ত্যাগ করার পর বলে :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

তা ঐ মসলিসে যা কিছু বেহুদা ও অন্যায় কথাবার্তা হয়ে থাকুক, তার কাফফারা হয়ে যাবে।

কোনো মুসলমান ভাই এর গীবত করার পর করণীয় : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তুমি যার গীবত করেছ, তার জন্য আল্লাহর নিকট গুনাহ্ মাফ চাওয়াই তার কাফফারা। তুমি বলবে : "হে আল্লাহ্ আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।"

যার গীবত করা হয়েছে তার গুনাহ মাফ চাইলে ও তার সদগুণাবলির উল্লেখ করলে গীবতের কাফফারা হয়ে যায়। তাকে জানানোর ও ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

দোয়া করা

১. দোয়া করার আদেশ

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর নিকট দোয়া করা ও কাকুতি মিনতি করার আদেশ দিয়েছেন এবং দোয়া কবুল করা ও যা চাওয়া হয় তা দেয়ার ওয়াদা করেছেন।

১. আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও আহমদ নুমান বিন বশীর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দোয়া হচ্ছে ইবাদত। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .

অর্থ : তামরা আমার নিকট দোয়া করো। আমি কবুল করবো। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত বর্জন করে, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২. আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহর সা. সাহাবিগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো : আমাদের প্রতিপালক কোথায় আছেন? তখন আল্লাহ নাযিল করলেন :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ .

অর্থ : যখন আমার বান্দারা আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন (বলে দাও) আমি নিকটেই। যে আমাকে ডাকে, তার ডাক আমি কবুল করি।"

৩. তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে সম্মানজনক কিছুই নেই।

৪. তিরমিযি বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কামনা করে যে, আল্লাহ তার কঠিন বিপদ মুসিবত ও সংকটে তার দোয়া কবুল করবেন, তার উচিত সুখের দিনেও বেশি বেশি দোয়া করা।

৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. একটি হাদিসে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ বলেছেন : চারটি জিনিস রয়েছে, তার একটা আমার এবং অপরটি তোমার। আরেকটি আমার ও তোমার সম্মিলিত। আরেকটি তোমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে সম্মিলিত। যেটি এককভাবে শুধু আমার তা হচ্ছে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবেনা। আর যেটি তোমার, সেটির ব্যাপারে তুমি যা কিছু ভালো করবে তার প্রতিদান আমি তোমাকে দেবো। আর যেটি আমার ও তোমার মধ্যে সম্মিলিত সেটি হলো : তুমি দোয়া করবে, আর আমি কবুল করবো। আর যেটি তোমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে সম্মিলিত, তা হলো : তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবে। -আবু ইয়ালা।

৬. রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করেনা, তার ওপর আল্লাহ রাগান্বিত হন।

৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : কোনো সতর্কতা অদৃষ্ট থেকে রক্ষা করেনা। আর দোয়া আগত ও অনাগত উভয় রকমের বিপদ মুসিবতে সাহায্য করে। কখনো কখনো বিপদ মুসিবত নেমে আসার পর তার সাথে দোয়ার সাক্ষাৎ হয়। তারপর দোয়া ও বিপদ পরস্পরে লড়াই চালিয়ে যায় কেয়ামত পর্যন্ত। -বাযযার, তাবারানি।

৮. সালমান ফারসি রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : দোয়া ছাড়া অন্য কিছুই ভাগ্য বদলায়না এবং পরোপকার ছাড়া অন্য কিছুই আয়ু বাড়ায়না। তিরমিযি।

৯. আবু উয়ানা ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন : তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তখন বড় জিনিস চাইবে। কেননা আল্লাহর সামনে কিছুই বড় নয়।

২. দোয়ার আদব

দোয়ার কিছু আদব ও শর্ত রয়েছে, যা পালন করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে তা উল্লেখ করছি :

১. হালাল জীবিকা উপার্জন : হাফেয ইবনে মাবদুয়া ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এ আয়াতটি পাঠ করা হলো :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .

"হে মানবমণ্ডলি, পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র যা কিছু রয়েছে, তা থেকে আহার করো।" সঙ্গে সঙ্গে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন : হে রসূলুল্লাহ সা., আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমাকে এমন ব্যক্তিতে পরিণত করেন যার দোয়া কবুল হওয়া নিশ্চিত। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে সাদ, তুমি হালাল খাদ্য খাওয়া নিশ্চিত করো, তোমার দোয়া কবুল হওয়া নিশ্চিত হবে। সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, যে ব্যক্তি এক গ্রাম হারাম খাদ্য পেটে ঢুকাবে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কিছুই কবুল হবেনা। আর সুদ ও ঘুষ থেকে যার দেহে মাংস তৈরি হবে, তার জন্য দোযখই সর্বাধিক উপযোগী।"

মুসনাদে আহমদ ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হে জনমণ্ডলি, আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্য কিছু কবুল করেনা। আর আল্লাহ রসূলগণকে যা করতে আদেশ দিয়েছেন মুমিনদেরকেও তাই করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"হে রসূলগণ, হালাল জীবিকা থেকে খাদ্য গ্রহণ করো এবং সৎ কাজ করো। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি অবগত আছি।" আল্লাহ আরো বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .

"হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে আমি যে জীবিকা দিয়েছি, তার মধ্য থেকে হালাল জীবিকা আহার করো।" তারপর রসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে। এলোমেলো চুল ও ধুলিমাখা দেহ। অথচ সে যে খাদ্য গ্রহণ করে তা হারাম, যে পোশাক পরে তা হারাম এবং হারাম জিনিস দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট হয়। সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে : হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক। তার এ ডাক কিভাবে কবুল হবে?"

২. সম্ভব হলে কিবলামুখি হয়ে দোয়া করবে : রসূলুল্লাহ সা. ইস্তিস্কার নামাযের জন্য বের হয়ে কিবলামুখি হয়ে দোয়া করেছিলেন ও বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন।

৩. মর্যাদাপূর্ণ সময় ও পবিত্র পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে দোয়া করা : যেমন আরাফা দিবস, রমযান মাস, জুমার দিন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, সাহরির সময়, সাজদার অভ্যন্তরে, বৃষ্টির সময়, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, হক ও বাতিলের মধ্যে লড়াই এর সময়, আল্লাহর ভয় ও মন নরম হওয়ার সময়। আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূলুল্লাহ! কোন্ দোয়া আল্লাহ বেশি শোনেন? তিনি বললেন : রাতের শেষ ভাগে ও ফরয নামাযের পরে। -তিরমিযি

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বান্দা যখন সাজদায় থাকে তখনই তার প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে। সুতরাং এসময় তোমরা বেশি বেশি দোয়া করো। কেননা তা অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য। -মুসলিম

এ সম্পর্কে আরো বহু হাদিস রয়েছে যা প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলিতে ছড়িয়ে আছে।

৪. দু'হাত কাঁধ বরাবর উপরে তোলা : আবু দাউদ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, (আল্লাহর কাছে) কিছু চাওয়ার নিয়ম হলো, তোমার কাঁধ বরাবর অথবা তার কাছাকাছি তোমার দু'হাত তুলবে। আর ক্ষমা প্রার্থনার নিয়ম হলো এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা। আর ইবতিহালের নিয়ম হলো উভয় হাত প্রসারিত করা। (কোনো অভিযোগের নিষ্পত্তির সর্বশেষ উপায় হিসেবে উভয় পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে এক জায়গায় উপস্থিত করে এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে মিথ্যাচারের দায়ে অভিসম্পাত করাকে ইবতিহাল বলা হয়।)

মালেক বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাও, তখন তোমাদের হাতের তালু মেলে চাও, হাত উবুড় করে চেয়োনা।" আর সালমান থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের প্রতিপালক পরম কল্যাণময় ও মহান, তিনি খুবই লাজুক ও দয়াশীল। বান্দা যখন তার নিকট হাত তোলে, তখন তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।

৫. দোয়ার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি দরুদ পাঠ করা : আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযি ফুযালা বিন উবাইদ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা ও রসূল সা. এর প্রতি দরুদ না পড়েই নামাযে দোয়া করছে। তিনি বললেন : এই ব্যক্তি দোয়া করতে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। তারপর তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন : "তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন প্রথমে সে যন আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারপর রসূল-এর ওপর দরুদ পড়ে, তারপর নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দোয়া করে।

৬. একাগ্রতা, বিনয় ও কাকুতি মিনতিসহকারে এবং একেবারে গোপনীয়তা ও উচ্চ কণ্ঠের মধ্যবর্তী কণ্ঠে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।

আল্লাহ বলেন : وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا .

"তুমি তোমার দোয়া অত্যধিক উচ্চ কণ্ঠেও করোনা, আর একেবারে গোপনেও করোনা। এর মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো।" তিনি আরো বলেছেন :

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে কাকুতি মিনতিসহকারে ও গোপনে ডাকো। আল্লাহ সীমালংঘনকারিকে পছন্দ করেন না।"

ইবনে জরীর বলেছেন : تضرعا অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে অত্যধিক বিনয়, মিনতি ও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। আর خفية অর্থ মনের একাগ্রতা, আল্লাহর একত্বে ও প্রভুত্বে এমন অটল বিশ্বাসসহকারে যা শুধু আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সীমিত থাকে। মানুষকে প্রদর্শনের ইচ্ছা সহকারে নয়।

বুখারি ও মুসলিমে আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত, লোকেরা উচ্চ স্বরে দোয়া করলো। তা শুনে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে জনমণ্ডলি, তোমরা নিজেদের প্রতি কোমল আচরণ করো। তোমরা যাকে ডাকছো তিনি বধিরও নন, অনুপস্থিতও নন। তোমরা তো সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা

আল্লাহকে ডাকছো। যাকে তোমরা ডাকছো, তিনি তোমাদের বাহকজন্তুর ঘাড়ের চেয়ে নিকটবর্তী। হে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস, তোমাকে কি এমন একটা দোয়া শিখাবোনা, যা বেহেশতের একটি ভাণ্ডার? তা হচ্ছে, "লাহাওলা অলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।" আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : অন্তরগুলো এক একটা পাত্র বিশেষ। একটি অপরটি থেকে বড়। কাজেই হে জনগণ, তোমরা যখনই আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া করবে, তখন তা কবুল হবেই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে করবে। কেননা উদাসীন মনে যে দোয়া করে, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন না।"

৭. দোয়া যেন গুনাহ এবং রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করার জন্য না হয়। কেননা আবু সাঈদ রা. থেকে আহমদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মুসলমানন যখন আল্লাহর কাছে এমন কোনো দোয়া করে, যাতে কোনো গুনাহ নেই এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করার ইচ্ছা নেইদ তখন আল্লাহ তার দোয়ার জবাবে তিনটি জিনিসের যে কোনো একটি তাকে দেন : হয় সে যা চেয়েছে তা ত্বরিত দিয়ে দেন, অথবা তা তার আখেরাতের জন্য সঞ্চিত করে রাখেন অথবা তার ওপর থেকে অনুরূপ কোনো খারাপ পরিণতি হটিয়ে দেন। লোকেরা বললো : তাহলে আমরা কি আরো বেশি দোয়া করবো। রসূল সা. বললেন : আল্লাহ আরো বেশি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।

৮. দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো না করা : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ তাড়াহুড়ো না করে এবং এরূপ না বলে যে, এতো দোয়া করলাম কবুল হলোনা, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হয়।

৯. দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে দোয়া করা চাই : আবু দাউদ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. : তোমরা এভাবে দোয়া করোনা যে, হে আল্লাহ! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে ক্ষমা করো, যদি তোমার মনে চায় তবে আমার ওপর দয়া করো।" বরং যা চাইবে, তা দৃঢ়ভাবে চাইবে। কেননা আল্লাহকে কেউ বাধ্য করতে পারেনা।

১০. দোয়ায় ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ চয়ন। যেমন :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً، وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

হে আমদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়ায় ভালাই দাও, আখেরাতেও ভালাই দাও এবং দোযখের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও।"

রসূলুল্লাহ সা. ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া পছন্দ করতেন এবং অন্যগুলো বর্জন করতেন। ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এলো এবং বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., সবচেয়ে ভালো দোয়া কোন্‌টি? তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাওয়া এবং দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাওয়া। এরপর সে পুনরায় দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট এলো এবং তাকে একই প্রশ্ন করলো এবং তাকে উপরোক্ত জবাবই দেয়া হলো। তারপর রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার যখন গুনাহ মাফ করা হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা দেয়া হবে, তখন তুমি সফল হবে। ইবনে মাজায় আরো রয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এর চেয়ে উত্তম কোনো দোয়া নেই, যা দ্বারা বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা ও পরিত্রাণ চাই।"

১১. নিজের উপর, সন্তান সন্ততির উপর ও সহায় সম্পদের উপর কোনো বদদোয়া করবেনা : জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা নিজেদের উপর, সন্তান

সন্ততির উপর, গৃহ পরিচায়কদের উপর এবং ধনসম্পদের উপর বদদোয়া করোনা। আর এমন কোনো মুহূর্তে আল্লাহর সাথে তোমাদের বদদোয়াকে মিলিত করোনা। যখন আল্লাহর দান পাওয়া যায়। তাহলে সেই বদদোয়াও কবুল হয়ে যাবে।"

১২. তিনবার দোয়া করা : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তিনবার দোয়া করা ও তিনবার গুনাহ মাফ চাওয়া পছন্দ করতেন। -আবু দাউদ।

১৩. অন্যের জন্য দোয়া করার সময় প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করবে : আল্লাহ বলেছেন :

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ .

"হে প্রভু, আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী মুমিন ভাইদেরকে ক্ষমা করো।"

উবাই বিন কাব বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন কাউকে স্মরণ করতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতেন। -তিরমিযি।

১৪. দোয়ার শেষে দু'হাত দিয়ে মুখ মুছে নেয়া সম্পর্কে যতো বর্ণনা ও বক্তব্য আছে সবই জয়ীফ।

১৫. পিতা, রোযাদার, মুসাফির ও মযলুমের দোয়া কবুল হয় : আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনটি দোয়া সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়ে থাকে : পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও মযলুমের দোয়া। তিরমিযি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনজনের দোয়া ফেরত দেয়া হয়না- রোযাদার যখন ইফতার করে, ন্যায়বিচারক নেতা ও শাসক এবং মযলুমের দোয়া। মযলুমের দোয়া আল্লাহ মেঘের উপরে তুলে নেন, তার জন্য আকাশের সকল দরজা খুলে দেন এবং প্রতিপালক বলেন : আমার সম্মান ও প্রতাপের কসম তোমাকে আমি সাহায্য করবোই, যদিও তা কিছুক্ষণ পরে হয়।

১৬. এক মুসলমান ভাই কর্তৃক অপর মুসলমান ভাই এর জন্য অনুপস্থিতিতে দোয়া করা : মুসলিম ও আবু দাউদ সাফওয়ান বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন : সফওয়ান বলেন : আমি সিরিয়ায় গিয়ে আবুদ দারদার বাড়িতে গেলাম। কিন্তু তাকে পেলাম না। পেলাম তার স্ত্রী উম্মুদ দারদাকে। তিনি বললেন : আপনি কি চলতি বারে হজ্জ করতে ইচ্ছুক? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আমাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবেন। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলতেন : মুসলমান ভাই কর্তৃক অপর মুসলমান ভাই এর জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করা হলে তা কবুল হয়। তার মাথার কাছেই একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে। যখনই তার ভাই এর জন্যে সে দোয়া করে, নিয়োজিত ফেরেশতা বলে : আমীন, আমিও তোমার জন্য অনুরূপ দোয়া করছি। সফওয়ান বলেন : এরপর বাজারের দিকে গেলাম। সেখানে আবুদ দারদাকে পেলাম। তিনিও রসূল সা. এর একই রকম উক্তি আমাকে শোনালেন।

আবু দাউদ ও তিরমিযিতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : একজন অনুপস্থিত ব্যক্তি আরেক জন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য যে দোয়া করে, সেই দোয়াই সবচেয়ে দ্রুত কবুল হয়।

আবু দাউদ ও তিরমিযিতে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট থেকে উমরার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন এবং বলেন : হে আমার ভাই, তোমার দোয়ার সময় আমাকে ভুলে যেওনা। উমর রা. বলেন : রসূল সা. এর এই উক্তি -- (যাতে তিনি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। তা) আমাকে এতো আনন্দ দিয়েছে যে, আমি পুরো পৃথিবীটা পেলে যতো আনন্দ পেতাম, এতে এতোটাই আনন্দ পেয়েছি।

১৭. দোয়া কবুল হবার আশায় যেসব কথার মাধ্যমে দোয়া শুরু করাকে বিভিন্ন হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ : বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

"হে আল্লাহ, আমি এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে তোমার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তোমার কাছেই সকল প্রয়োজন চাওয়া হয়। তুমিই সেই আল্লাহ, যার কোনো সন্তানও নেই, জনকও নেই এবং কেউ যার সমকক্ষ নেই।" রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি আল্লাহর সেই ইসমে আযম (শ্রেষ্ঠ নাম) এর দোহাই দিয়ে দোয়া করছো, যার দোহাই দিয়ে চাইলেই দেয়া হয় এবং দোয়া করলেই কবুল হয়।-আবু দাউদ, তিরমিযি।

মুযায় বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : "ইয়া যাল জালাল ওয়াল ইকরাম" (হে মহিয়ান ও গরিয়ান) তিনি বললেন : তোমার আহ্বান কবুল হয়েছে। এখন কী চাইবে চাও।" -তিরমিযি।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. আবু আইয়াশ যায়দ বিন সামেত যুরকীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন সে নামায পড়ছিল এবং বলছিল :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ .

"হে আল্লাহ, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হে স্নেহময়, হে দানশীল, হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, হে মহিয়ান ও গরিয়ান, হে চিরঞ্জীব হে চিরস্থায়ী।" রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি আল্লাহর সেই শ্রেষ্ঠ নাম ধরে ডেকেছ যে নাম ধরে তাকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নামে কিছু চাইলে তিনি তা দেন। -আহমদ।

মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এই পাঁচটি কথার মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকবে, সে যা চাইবে, আল্লাহ তাকে তা দেবেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

৩. সকাল বিকালের দোয়া

সকাল বেলার দোয়ার সময় ফজর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং বিকালের দোয়ার সময় আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত।

১. মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে . سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ একশোবার বলবে, কেয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম কোনো সম্বল নিয়ে কেউ আসবে না কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিত, যে একই দোয়া পড়েছে বা এর চেয়ে বেশি পড়েছে।"

২. মুসলিম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বিকাল বেলা বলতেন :

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ

اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبْرِ، رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ .

"আমি আল্লাহর জন্য সন্ধ্যাকালে প্রবেশ করলাম, আর আল্লাহর রাজ্য সন্ধ্যাকালে প্রবেশ করলো। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই, রাজত্ব একমাত্র তারই, প্রশংসাও একমাত্র তারই, তিনি সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রতিপালক। এই রাতের এবং এই রাতের পরের যাবতীয় কল্যাণ আমি তোমার কছে চাই, আর এই রাত ও রাতের পরের যাবতীয় অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আমার প্রভু! অলসতা ও খারাপ বার্ধক্য থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, দোযখের আযাব থেকে ও কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" আর সকাল বেলাও তিনি অনুরূপ বলতেন।

৩. আবু দাউদ আব্দুল্লাহ বিন হাবিব থেকে বর্ণনা করছেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন : বলো। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ সা. কী বলবো? তিনি বললেন : সকালে ও বিকালে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এবং সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ো। তোমার সব কিছুতেই তা যথেষ্ট হবে।

৪. আবু দাউদ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সাহাবিগণকে শিক্ষা দিতেন তোমরা সকাল বেলা বলবে :

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

"হে আল্লাহ, তোমার সাহায্যেই আমাদের সকাল হয়েছে, তোমার সাহায্যেই আমাদের সন্ধ্যা হয়েছে, তোমার সাহায্যেই আমরা বাঁচি, তোমার সাহায্যেই আমরা মরি, আর তোমার সাহায্যেই আমাদের পুনরুত্থান হবে।"

আর সন্ধ্যায় বলবে : اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"হে আল্লাহ! তোমার সাহায্যেই আমাদের সন্ধ্যা হয়েছে, তোমার সাহায্যেই আমাদের সকাল হয়েছে, তোমার সাহায্যেই আমরা বাঁচি, তোমার সাহায্যেই আমরা মরি এবং তোমার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে।"

৫. সহীহ বুখারিতে শাদ্দাদ বিন আওস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সাইয়িদুল ইসতিগফার অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ لِيْ. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ .

"হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতিত আর কোনো ইলাহ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা, আমি যথাসাধ্য তোমার অঙ্গীকার পালনে যত্নবান, আমি নিজের কৃতকর্মের কু-পরিণাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আমার উপর তোমার নিয়ামতের কথা আমি স্বীকার করি, আমার গুনাহর কথাও তোমার নিকট স্বীকার করি, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারেনা।"

যে ব্যক্তি সকাল বেলা এটা পড়বে এবং সেই দিন মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এটা পড়বে এবং সেই দিন রাতে মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে।

৬. তিরমিযিতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। আবু বকর সিদ্দিক রা. রসূলুল্লাহ সা. কে

বললেন, সকালে সন্ধ্যায় পড়ার জন্য আমাকে একটা দোয়া শিখিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, বলো :

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ، وَاَنْ نَقْتَرِفَ سُوْءًا عَلٰى اَنْفُسِنَا اَوْ نَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ .

"হে আল্লাহ, গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে অবগত, তুমি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সকল জিনিসের প্রতিপালক ও বাদশাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমার প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা থেকে এবং শয়তানের কু-প্ররোচনা ও ফাঁদ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আর তোমার আশ্রয় চাই যেন নিজের জন্য কিংবা কোনো মুসলমানের জন্য কোনো খারাপ পরিণতি ডেকে না আনি।"

এ দোয়া সকালে, সন্ধ্যায় ও ঘুমানোর সময় বিছানায় গিয়ে পড়বে। (হাদিসটি হাসান সহীহ)

৭. তিরমিযিতে আরো বর্ণিত হয়েছে উসমান বিন আফফান রা. থেকে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এমন কোনো বান্দা নেই যে সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে এই দোয়া পড়বে এবং তারপরও কোনো জিনিস তার ক্ষতি সাধন করবে :

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

"সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আকাশে ও পৃথিবীতে কোনো জিনিস কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনা, আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

৮. তিরমিযিতে আরো বর্ণিত, ছাওবান ও অন্যান্যদের থেকে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

"আমি আল্লাহকে প্রতিপালক, মুহাম্মদ সা. কে নবী ও ইসলামকে দ্বীন হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিলাম। যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ ঘোষণা দেবে, তাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহর দায়িত্ব।"

৯. তিরমিযিতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় একবার বলবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ .

"হে আল্লাহ আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি, তোমার আরশ বহনকারিদেরকে সাক্ষী রাখছি, তোমার ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমার সকল সৃষ্টিকে সাক্ষী রাখছি যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, তুমি এক, তোমার কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রসূল।" আল্লাহ তার এক চতুর্থাংশ দোযখ থেকে মুক্তি দেবেন, আর যে ব্যক্তি এ ঘোষণা দু'বার বলবে, আল্লাহ্ তার অর্ধেককে দোযখ থেকে মুক্তি দেবেন, আর যে ব্যক্তি তিনবার বলবে, আল্লাহ তার তিন চতুর্থাংশকে মুক্তি দেবেন, আর যে ব্যক্তি চারবার বলবে, আল্লাহ তাকে পুরোপুরিভাবে দোযখমুক্ত করবেন।

১০. আবু দাউদে আব্দুল্লাহ বিন গানাম থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ .

"হে আল্লাহ, আমি বা তোমার সৃষ্টির অন্য কেউ আজকের এই সকালে যে নিয়ামত লাভ করে থাকুক। তা একমাত্র তোমার কাছ থেকেই লাভ করেছি বা করেছে। তোমার কোনো শরিক নেই, তোমার জন্যই প্রশংসা এবং তোমার জন্যই কৃতজ্ঞতা।" যে ব্যক্তি একথাগুলো সকালে বলবে : সে সেই দিনের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতে সক্ষম হবে, আর অনুরূপ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় বলবে, সে সেই রাতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায়ে সক্ষম হবে।

১১. আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেমে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. সকালে ও সন্ধ্যায় যে দোয়া পড়া কখনো বাদ দিতেন না, তা হচ্ছে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللّٰهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আমার দীনে, আমার দুনিয়ায়, আমার পরিবারে ও আমার সম্পদে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমার গোপনীয় বিষয়গুলো গোপন রাখো এবং আমার প্রভার প্রতিপত্তিকে নিরাপদ করো। হে আল্লাহ! আমাকে আমার সম্মুখ থেকে, পশ্চাত থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে, ওপর থেকে রক্ষা করো। আর তোমার মহত্ত্বের কাছে আশ্রয় চাই যেন নিচ থেকে আমাকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া না হয়।"

১২. আব্দুর রহমান বিন আবু বকরা তাঁর পিতাকে বললেন : বাবা, আমি তো আপনাকে প্রতিদিন সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিনবার পড়তে শুনি :

اَللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اَللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اَللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

"হে আল্লাহ আমাকে আমার দেহে নিরাপত্তা দাও; আমার কানে নিরাপত্তা দাও, আমার চোখে নিরাপত্তা দাও। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।"

আবু বকরা বললেন : আমি রসূল সা. কে এ দোয়াগুলো পড়তে শুনেছি। তাই আমি তার সুন্নতের অনুসরণ করতে ভালোবাসি। -আবু দাউদ।

আর ইবনুস্ সুন্নী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে তিনবার বলবে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَأَتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিয়ামত, নিরাপত্তা ও আবরণ লাভ করেছি। তাই তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার উপর তোমার নিয়ামত, নিরাপত্তা ও আবরণ সম্পূর্ণ করো। তার উপর এই জিনিসগুলো সম্পূর্ণ করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে পড়ে।" আর আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা কি কেউ আবু যমযমের মতো হতে পারোনা? লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., আবু যমযম কে? রসূল সা. বললেন : সে প্রতিদিন সকালে বলতো :

اَللّٰهُمَّ وَهَبْتُ نَفْسِي وَعِرْضِي لَكَ.

"হে আল্লাহ! আমি আমার জীবন ও সম্মান তোমার হাতে সোপর্দ করলাম।"

এরপর তাকে যে গালি দিতো সে তাকে গালি দিতোনা। তার ওপর যে যুলুম করতো, তার উপর সে যুলুম করতোনা এবং তাকে যে প্রহার করতো, সে তাকে প্রহার করতোনা। আর আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে সাতবার করে বলবে : حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তার উপরই আমি নির্ভর করলাম। তিনিই বিশাল ও মহান আরশের অধিপতি" দুনিয়া ও আখেরাতে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

তলক বিন হাবীব বলেন, এক ব্যক্তি আবুদ দারদার কাছে এলো এবং বললো : হে আবুদ দারদা, তোমার বাড়ি পুড়ে গেছে। আবুদ দারদা রা. বললেন : পোড়েনি। আল্লাহ এমন কাজ করতে পারেননা। আমি রসূল সা. এর কাছ থেকে কিছু দোয়া শিখেছি। যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে তা পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোনো বিপদ আসবেনা। আর যে ব্যক্তি দিনের শেষভাগে তা পড়বে, সকাল পর্যন্ত তার উপর কোনো বিপদ আসবেনা। সেই দোয়া হলো :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতিত আর কোনো ইলাহ্ নেই। তোমার উপর নির্ভর করলাম। তুমি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ যা চান তা হয়, আর তিনি যা চাননা, তা হয়না। মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত কারো কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। আমি জানি আল্লাহ সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ সব জিনিস সম্পর্কে জ্ঞানী। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা থেকে আশ্রয় চাই এবং এমন প্রতিটি প্রাণীর ক্ষয়ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই, যাকে তুমি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছো। নিশ্চয় আমার প্রভু সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।"

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে : আবুদ দারদা বললেন! তোমরা আমার সাথে চলো। অত:পর তিনিও তার সাথিরা রওনা হয়ে গেলো এবং তার বাড়িতে উপস্থিত হলো। দেখা গেলো, তার বাড়ির চারপাশের সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। অথচ তার বাড়ি কিছু হয়নি।

৪. বিভিন্ন সময় ও উপলক্ষের দোয়া

ঘুমানোর দোয়া : ১. বুখারি হুযায়ফা ও আবু যর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. যখন বিছানায় ঘুমাতে যেতেন বলতেন : بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوْتُ.

"হে আল্লাহ! তোমার নামে বাঁচি ও মরি।" আর যখন ঘুম থেকে উঠতেন, বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"সেই আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেয়ার পর জীবন জীবন দিয়েছেন এবং তাঁর কিদেই প্রত্যাবর্তন।" তাঁর রীতি ছিলো, ডান হাত গালের নিচে রেখে শুতেন এবং তিনবার বলতেন : اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

"হে আল্লাহ, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবে, সেদিন তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। আরো বলতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّكُلِّ ذِيْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ .

"হে আল্লাহ! আকাশ পৃথিবী ও মহান আরশের অধিপতি, আমাদের প্রভু এবং সকল জিনিসের প্রভু, বীজ বিদীর্ণকারী। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী। তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্যেক দুর্বৃত্তের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তুমি অনাদি, তোমার আগে কিছু ছিলনা। তুমি অনন্ত, তোমার পরে কিছু নেই। তুমি বিজয়ী, তোমার ঊর্ধ্বে কেউ নেই। তুমি গোপন, তোমার অন্তরালে কেউ নেই, আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং দারিদ্র থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও।" তিনি আরো বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا، وَاٰوَانَا، فَكَمْ، مِمَّنْ لَاكَافِيَ وَلَامُؤْوِيَ.

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ান, পান করান, আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং আমাদেরকে আশ্রয় দেন। কেননা এমন অনেকে আছে, যাদের কোনো আশ্রয়দাতা নেই এবং যাদের জন্য কেউ যথেষ্ট হয়না।"

তিনি প্রতিরাতে যখন বিছানায় যেতেন, দু'হাতের তালুকে একত্রিত করে সূরা ইখলাস, নাস ও ফালাক পড়ে ফুঁক দিতেন। তারপর হাত দু'খানা দিয়ে যতোদূর সম্ভব তার শরীর মুছে নিতেন, প্রথমে মাথা ও মুখ ও তারপর শরীরের সম্মুখের অংশ তিনবার মুছে নিতেন।

তিনি শয়নকারিকে এই দোয়া পড়ার আদেশ দিতেন : "হে আমার প্রভু! তোমার নামে আমি আমার শরীর বিছানায় রাখলাম, আবার তোমার নামেই তা ওঠাবো। তুমি যদি আমার প্রাণ রক্ষা করো, তবে তার ওপর রহম করো। আর যদি তা তুলে নাও তবে তোমার সৎ বান্দাদেরকে তুমি যা যা দিয়ে সংরক্ষণ করো, আমার প্রাণকে তা দ্বারা সংরক্ষণ করো।" তিনি ফাতেমা রা. কে বললেন : তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবর বলবে। তিনি আয়াতুল কুরসি পড়ারও উপদেশ দেন এবং বলেন : যে ব্যক্তি এটা পড়ে, তার ওপর সর্বক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রহরী নিয়োজিত থাকে।

তিনি বারা রা. কে বললেন : তুমি যখন বিছানায় যাবে, তখন নামাযের ওযুর মতো ওযু করবে, তারপর ডান পাঁজর নিচে দিয়ে শুবে এবং বলবে :

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَامَلْجَاَ وَلَا مَنْجَي مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ .

"হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফেরালাম। আমার যাবতীয় বিষয় তোমার কাছে অর্পণ করলাম। তোমার প্রতি ভীতি ও আশা পোষণ করে আমার পিঠ তোমার দিকে রাখলাম। তোমার কাছ থেকে আশ্রয় ও মুক্তি পাওয়ার

স্থান তুমি ছাড়া আর কারো কাছে নেই। যে কিতাব তুমি নাযিল করেছো এবং যে রসূল তুমি পাঠিয়েছো, তার ওপর ঈমান আনলাম।" তারপর বললেন : এরপর যদি তুমি মারা যাও তবে ইসলামের ওপরই মারা যাবে এবং একথাগুলোকে তোমার শেষ কথায় পরিণত করবে।

ঘুম থেকে জাগার দোয়া : রসূলুল্লাহ সা. ঘুম থেকে ওঠা ব্যক্তিকে এই দোয়া পড়ার আদেশ দিয়েছেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ عَلَىَّ رُوْحِيْ، وَعَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ، وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ

"আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমার নিকট আমার আত্মাকে ফেরত পাঠিয়েছেন, আমার দেহকে নিরাপদ করেছেন এবং আমাকে তার যিকর করার অনুমতি ও ক্ষমতা দিয়েছেন।" তিনি নিজে ঘুম থেকে জেগেই বলতেন :

لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اَللّٰهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ، وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

"তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র। হে আল্লাহ! আমার গুনাহর জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাই। তোমার রহমত কামনা করি। হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, আর আমাকে যখন সঠিক পথে নিয়েছো, তখন আমার মনকে আর বিপথগামি করোনা। আর আমাকে তোমার পক্ষ হতে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।"

সহীহ সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রাতে যার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং আর ঘুম আসেনা, শুধু এপাশ ওপাশ করতে থাকে, সে যদি বলে : এবং তারপর যদি বলে :

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، أَوْ دَعَا، أُسْتُجِيْبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ .

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, বা অন্য কোনো দোয়া করে, তবে তা কবুল করা হবে। আর যদি সে ওযু করে ও নামায পড়ে তবে তার নামায কবুল করা হয়।

অনিদ্রা, আতংক ও ভীতির দোয়া : আমর বিন শোয়েব তার বাবার কাছ থেকে এবং তার বাবা তার দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায় তখন সে যেনো বলে :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ.

"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কলেমাগুলোর কাছে আশ্রয় চাই তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের ক্ষতি থেকে, শয়তানগুলোর কুপ্ররোচনা থেকে এবং আমার নিকট শয়তানগুলোর আগমন থেকে," তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবেনা। ইবনে উমর রা. এটি তার বয়োপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদেরকে শেখাতেন আর যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো মাদুলীতে এটা লিখে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।

খালেদ বিন ওলীদ রা. অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হলে রসূল সা. তাকে বললেন : আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিবোনা যা বললে তোমার ঘুম আসবে? তুমি বলবে :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضَلَّتْ،

كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا. أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، أَوْ أَنْ يَبْغِي عَلَيَّ. عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

"হে আল্লাহ! সাত আকাশ ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার প্রতিপালক, ভূমণ্ডলসমূহ ও তার মধ্যে আরো যা কিছু রয়েছে তার প্রতিপালক, তুমি তোমার সকল সৃষ্টির ক্ষতি ও উপদ্রব থেকে আমাকে আশ্রয় দাও, যেনো তাদের কেউ আমার ওপর বাড়াবাড়ি করতে বা আগ্রাসন চালাতে না পারে। তোমার আশ্রয় তো পরাক্রমশালী, তোমার প্রশংসা মর্যাদাবান, আর তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই।" তাবারানি।

তাবারানি ও ইবনুস সুন্নী বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট নিজেকে নির্জনতাজনিত ভয়ভীতির শিকার বলে ব্যক্ত করলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি পড়বে :

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ، جَلَّلْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ.

মহান বাদশাহ মহাপবিত্র আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি, ফেরেশতাদের ও জিবরীলের প্রভু, তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতাপ ও পরাক্রম দ্বারা মহিমান্বিত করেছেন।" লোকটি এ কথাগুলো বলার পর তার ভীতি আল্লাহ্ দূর করে দিলেন।

খারাপ স্বপ্ন দেখলে : জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে, তখন সে বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলে বলবে : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই) এবং পাশ পরিবর্তন করে শোয়। -মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার ভালো লাগে, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো স্বপ্ন। সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করা উচিত এবং যে স্বপ্ন দেখেছে, তা জানানো উচিত। আর যদি এমন স্বপ্ন দেখে, যা অপ্রীতিকর ও অপছন্দনীয়, তবে তা শয়তানের দেখানো স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের কুফল থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত এবং কাউকে তা না জানানো উচিত। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবেনা। -তিরমিযি।

কাপড় পরার সময়ের দোয়া : ইবনুস সুন্নী বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো কাপড়, জামা, চাদর বা পাগড়ি পরতেন, তখন বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ. وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই পোশাকের এবং এর মালিকের কল্যাণ কামনা করি। আর এই পোশাক ও এর মালিকের অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

বিন আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো নতুন কাপড় পরে এবং তারপর বলে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এটি পরালেন ও দিলেন, অথচ এটি লাভ করার আমার কোনো শক্তি ও ক্ষমতা ছিলনা।" আল্লাহ্ তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেন। অনুরূপ

বিসমিল্লাহ বলাও মুস্তাহাব। কেননা বিসমিল্লাহ ব্যতিত যে কাজই শুরু করা হয়, তা ক্রটিপূর্ণ হয়।

নতুন কাপড় পরার দোয়া : আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. যখনই কোনো নতুন কাপড় কিনতেন, তখন তাকে তার নামে নামকরণ করতেন, যেমন পাগড়ি, জামা বা চাদর। তারপর বলতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

"হে আল্লাহ! তুমি এটি আমাকে পরিয়েছো সেজন্য তোমার প্রশংসা। তোমার কাছে এর ও যার জন্য এটা বানানো হয়েছে তার কল্যাণ চাই। আর তোমার কাছে এর ও যার জন্য এটা বানানো হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। -আবু দাউদ, তিরমিযি।

তিরমিযি উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো নতুন পোশাক পরে এবং বলে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ.

"সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার শরীরের গোপনীয় অংশ ঢাকার জন্য ও আমার জীবনে সৌন্দর্যমণ্ডিত হবার জন্য এই পোশাক পরিয়েছেন", তারপর পুরানো কাপড়টা দান করে দেয়। সে আল্লাহর হেফাযতে ও তার প্রহরাধীনে থাকবে। আর জীবিত বা মৃত সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে আছে বলে গণ্য হবে।

কাউকে নতুন কাপড় পরা অবস্থায় দেখলে যা বলবে : সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. উম্মে খালেদকে একটা কালো চাদর পরিয়ে দেয়ার পর বললেন : এটি পরে পুরান করে ফেলো। আর সাহাবিগণ বলতেন : "যে কাপড় পরে পুরান করে, আল্লাহ তাকে নতুন কাপড় দেন।"

রসূলুল্লাহ সা. উমর রা.কে নতুন কাপড় পরা দেখে বললেন : নতুন কাপড় পরো, প্রশংসনীয়ভাবে জীবন যাপন করো এবং শহীদ ও সৌভাগ্যশালী হয়ে মৃত্যুবরণ করো।" ইবনে মাজাহ, ইবনুস সুন্নী।

পোশাক খোলার সময়ের দোয়া : ইবনুস সুন্নী আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আদম সন্তানের দেহের গোপনীয় অংশ জিনদের চোখ থেকে আড়াল করার জন্য কাপড় খোলার ইচ্ছা করার সময় বলবে : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ. "আল্লাহর নামে, যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।"

বাড়ি থেকে বের হবার সময়কার দোয়া : আবু দাউদ আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় যে ব্যক্তি বলবে :

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

(আল্লাহর নামে যাত্রা) শুরু করলাম, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহর ব্যতিত কারো কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই)। তাকে বলা হয় : তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা হলো। তখন শয়তান তার কাছ থেকে সরে যায় এবং এক শয়তান আরেক শয়তানকে বলে : যার জন্য স্বয়ং আল্লাহ যথেষ্ট, যাকে সুপথে চালিত করা হয়েছে এবং যাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, তাকে কিভাবে বিপথগামি করা সম্ভব?

মুসনাদে আহমদে আনাস রা. বাড়ি থেকে বের হবার এই দোয় বর্ণনা করেছেন :

بِسْمِ اللّٰهِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ، اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

"আল্লাহর নামে চললাম, আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আল্লাহকে আঁকড়ে ধরেছি, আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, আল্লাহ ব্যতিত কারো কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

উম্মে সালামা রা. থেকে আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন, উম্মে সালামা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, তখনই আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ .

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যেনো আমি বিপথগামী না করি এবং আমাকে কেউ বিপথগামি না করে। যেন আমি কারো পদস্থলন না ঘটাই এবং কেউ আমার পদস্খলন না ঘটায়। যেনো আমি কারো উপর যুলুম না করি এবং আমার উপর কেউ যুলুম না করে। যেনো আমি কারো সাথে অশোভন আচরণ না করি এবং আমার সাথে কেউ অশোভন আচরণ না করে।"

বাড়িতে প্রবেশের দোয়া : সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, জাবের রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি : কোনো ব্যক্তি যখন নিজের বাড়িতে প্রবেশের সময় ও খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে : এখানে রাতেও থাকার সুযোগ নেই, রাতের খাবারেরও অবকাশ নেই। আর যখন বাড়িতে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ করেনা তখন শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে : তোমরা এখানে রাতে থাকতে পারবে। আর যদি খাবারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করে, তাহলে শয়তান বলে : তোমরা রাতে থাকতেও পারবে, খাবারও পাবে।"

আবু দাউদে মালেক আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কেউ নিজের বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন তার বলা উচিত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সর্বোত্তম প্রবেশ স্থল চাই ও সর্বোত্তম নির্গমন স্থল চাই। আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম আল্লাহর নামে বের হলাম। আর আমদের প্রভু আল্লাহর উপর ভরসা করলাম।" তারপর নিজের পরিবারকে সালাম করবে।

তিরমিযিতে আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আমাকে রসূল সা. বললেন হে বৎস! যখন তুমি নিজের পরিবার পরিজনের কাছে যাবে, তখন তাদেরকে সালাম করবে। এটা তোমার ও তোমার বাড়ির অধিবাসীদের জন্য বরকতময় হবে।

খুশির ঘটনা ঘটলে যা বলবে : নিজের সহায় সম্পদে ও সন্তানদের মধ্যে কোনো খুশির ঘটনা ঘটতে দেখলে বলবে : مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. (আল্লাহ যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই।) তাহলে তাতে সে আর অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে দেখবে না। আর যদি অপ্রীতিকর কিছু দেখে, তবে বলবে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ "সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা।" আল্লাহ বলেছেন : "তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন বললে না, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত কারো কোনো ক্ষমতা নেই।"

ইবনুস্ সুন্নীতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো বান্দাকে আল্লাহ তার পরিবার, ধনসম্পদ ও সন্তান সংক্রান্ত কোনো নিয়ামত দিলে সে যদি বলে : مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ . (আল্লাহ যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে। আল্লাহ ব্যতিত কারো কোনো ক্ষমতা নেই।) তাহলে তাতে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো মুসিবত দেখতে পাবেনা।" আনাস রা. থেকে আরো বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন আনন্দের কিছু দেখতেন, বলতেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ . "সকল প্রশংসা আল্লাহর যার অনুগ্রহে সকল সৎকাজ পূর্ণতা লাভ করে।" আর যখন দুঃখজনক কিছু দেখতেন, বলতেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ "সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা।" ইবনে মাজাহ।

আয়নায় চেহারা দেখার সময় যা বলবে : আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন আয়েনায় দৃষ্টি দিতেন, বলতেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ .

"সকল প্রশংসা আল্লাহর। হে আল্লাহ! আমার চেহারা যেমন সুন্দর করেছো, তেমনি আমার স্বভাব চরিত্র সুন্দর করো।"

আনাস রা. থেকে বর্ণিত : আয়না দেখে রসূল সা. বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَوّٰى خَلْقِيْ فَعَدَّلَهُ، وَكَرَّمَ صُوْرَةَ وَجْهِيْ فَحَسَّنَهَا. وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

"সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার দেহ সৌষ্ঠব ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন, আমার চেহারাকে সুন্দর ও সম্মানিত করেছেন এবং আমাকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বিপদাপন্ন মানুষকে দেখে যা বলবে : তিরমিযি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো বিপন্ন মানুষকে দেখে নিম্নরূপ বলবে তার ঐ বিপদ ঘটবেনা : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً،

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমার ওপর আপতিত মুসিবত থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তার অনেক সৃষ্টির ওপর আমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।"

নববী বলেছেন, আলেমগণ বলেছেন : এই দোয়াটি গোপনে শুধু নিজেকে শুনিয়ে বলা উচিত এবং বিপন্ন ব্যক্তিকে শুনতে না দেয়া উচিত যাতে সে মনে কষ্ট না পায়। তবে তার বিপদটা যদি কোনো অপরাধের শাস্তি হয় বা গুনাহর কাজ হয় এবং তাকে শুনানোতে কোনো অসুবিধা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তাকে শুনানো যেতে পারে।

মোরগের ডাক, গাধার ডাক ও কুকুরের ডাক শুনে যা বলবে : বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। কেননা সে শয়তানকে দেখেছে। আর যখন মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ কামনা করবে। কারণ সে একজন ফেরেশতা দেখেছে।" আবু দাউদের হাদিসে বলা হয়েছে : যখন তোমরা রাতে চেনা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ও গাধার ডাক শুনবে, তখন তাদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। কেননা তারা যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাওনা।

বাতাস ও ঝড়ের সময় যা বলবে : আবু দাউদ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : বাতাস আল্লাহর রহমত থেকে উদ্ভূত। তবে এটা রহমত নিয়েও আসে, আযাব নিয়েও আসে। তাই যখন তা চলতে দেখবে তখন তাকে গালি দিওনা। আল্লাহর কাছ থেকে তার উপকারিতা চাও এবং তার অপকারিতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

সহীহ মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, যখন ঝড় প্রবাহিত হতো, তখন রসূলুল্লাহ সা. বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

"হে আল্লাহ! আমি এর উপকারিতা চাই, এর ভেঁতরের উপকারিতা চাই এবং যে উদ্দেশ্যে তা পাঠিয়েছো তার উপকারিতা চাই। আর তার ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই। যে উদ্দেশ্যে তা পাঠিয়েছো তার ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

মেঘের গর্জন শুনে যা বলবে

ইবনে উমর রা. থেকে তিরমিযি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন মেঘের গর্জন ও বজ্রধ্বনি শুনতেন, তখন বলতেন : اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার গযব দ্বারা ধ্বংস করো না, তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করোনা এবং তার আগে আমাদেরকে নিরাপত্তা দাও।

চাঁদ দেখার দোয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে তাবারানি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. নতুন চাঁদ দেখে বলতেন :

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

"আল্লাহ আকবার! হে আল্লাহ, এই নতুন চাঁদকে আমাদের উপর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলাম এবং তোমার পছন্দনীয় কাজের জন্য প্রেরণার উৎস বানাও। (হে নতুন চাঁদ) আমাদের ও তোমার প্রভু আল্লাহ।

আবু দাউদে কাতাদা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন :

هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَكَ.

এটা কল্যাণ ও হেদায়েতের নতুন চাঁদ, এটা কল্যাণ ও হেদায়েতের নতুন চাঁদ। যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার ওপর আমরা ঈমান এনেছি", তিনবার। তারপর বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا..

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি অমুক মাস নিয়ে গেলেন এবং অমুক মাস নিয়ে এলেন।"

কঠিন বিপদ, সংকট, দুশ্চিন্তা ও দুর্যোগে যা বলবে : ১. বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বিপদ মুসিবত ও দুশ্চিন্তায় নিপতিত হলে বলতেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

"আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই যিনি মহান, অতি ধৈর্যশীল। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু এবং মহান আরশের অধিপতি।"

২. তিরমিযিতে হাসান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো কঠিন বিপদে, সংকটে বা অতি জরুরি কাজের সম্মুখীন হতেন, তখন বলতেন : يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

"হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, তোমার দয়ার উসিলায় আমি সাহায্য ও মুক্তি চাই।"

৩. তিরমিযিতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, যখন রসূলুল্লাহ সা. কোনো কঠিন সংকটের মুখোমুখি হতেন, তখন আকাশের দিকে মাথা তুলে বলতেন : سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.
আর যখন খুব কাকুতি মিনতিসহকারে দোয়া করতেন তখন বলতেন : يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

৪. আবু দাউদে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি এই বলে দোয়া করবে :

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِىْ إِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِى كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

"হে আল্লাহ, তোমার রহমতের আশা করি, এক মুহূর্তের জন্যও তুমি আমাকে আমার নিজের ওপর সমর্পণ করোনা। আমার সকল দুরাবস্থার পরিবর্তন করে দাও। তুমি ব্যতীত আর কোনো ত্রাণকর্তা নেই।"

৫. আবু দাউদে আসমা বিনতে উমাইস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমাকে কি এমন কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব যা দুশ্চিন্তার সময় পড়বে?

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا أُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا.

"আল্লাহ, আল্লাহ তিনি আমার প্রতিপালক, তার সাথে আমি কাউকে শরীক করবোনা।" এটা সাতবার বলবে।

৬. তিরমিযিতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মাছওয়ালা (হযরত ইউনুস আ.) যখন মাছের পেটে ছিলেন তখন দোয়া করেছিলেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

"তুমি ব্যতিত আর কোনো ত্রাণকর্তা নেই, তুমি পবিত্র, আমি যালিম।" কোনো ব্যক্তি এই দোয়া করেছে, অথচ তা কবুল হয়নি, এমন কখনো হয়নি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : আমি এমন একটি কথা জানি, যা যে কোনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সংকটাপন্ন ব্যক্তি বললে আল্লাহ তা থেকে তাকে মুক্তি দেবেনই। সেটি হচ্ছে আমার ভাই ইউনুস আলাইহিস সালামের দোয়া।

৭. আহমদ ও ইবনে হিব্বান ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো বান্দা যদি কোনো দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয় এবং সে বলে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ عَبْدُكَ إِبْنُ عَبْدِكَ إِبْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ إِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهٗ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهٗ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ إِسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلَاءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّىْ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান, তোমার বান্দির সন্তান, আমার কপাল তোমার সামনে পতিত, আমার ভেতরে তোমার ফায়সালা কার্যকর। তোমার বিচার সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত, তোমার প্রত্যেক নামের ওসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করি, যে নামে তুমি নিজেকে নামকরণ করেছ, অথবা তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তোমার কোনো সৃষ্টিকে শিখিয়েছো অথবা তোমার অদৃশ্য গুণে তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছো। তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার বুকের জ্যোতি, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার উপায় এবং আমার

সমস্যার সমাধানে পরিণত করো।) -তাহলে আল্লাহ্ তার দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করবেন এবং তার পরিবর্তে আনন্দ দান করবেন।

শত্রুর মুখোমুখি হওয়া ও শাসকের ভয়ের সম্মুখীন হলে যা বলবে

আবু দাউদ ও নাসায়ী আবু মূসা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন কারো দ্বারা ক্ষতির ভয় করতেন তখন বলতেন : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমাকে তাদের ঘাড়ের উপর রাখছি এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি।"

ইবনুস্ সুন্নী বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. একটি সামরিক। অভিযানে গিয়ে বললেন :

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِيْنُ.

"হে বিচার দিবসের মালিক, আমি শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই।"

আনাস রা. বলেন, এরপর আমি দেখলাম, ফেরেশতারা লোকদেরকে সামনে থেকে ও পেছন থেকে হত্যা করছে।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কোনো শাসক বা অন্য কাউকে ভয় পাও, তখন বলো :

لَا إِلٰهَ إِلَّا الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّيْ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ.

"আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি পরম দয়ালু ও সহনশীল। আমার প্রভু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি সাত আসমানের প্রভু ও মহান আরশের প্রভু। তুমি ব্যতিত কোনো মাবুদ নেই, তোমার প্রতিবেশি সম্মানিত ও তোমার প্রশংসা মহিমান্বিত।"

বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম আ. কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি খুবই উত্তম অভিভাবক। এই কথাটি মুহাম্মদ সা.ও তখন বলেছিলেন, যখন লোকেরা বলেছিলো, শত্রুরা তোমাদের জন্য বিরাট বাহিনী সমবেত করেছে।

আওফ বিন মালেক রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. দুই ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। তাদের একজন সে যাওয়ার সময় বললো : আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি চমৎকার অভিভাবক। রসূল সা. বললেন : আল্লাহ্ তায়ালা ঋণগ্রস্ততার জন্য তিরস্কার করেন। তবে তুমি অবশ্যই কাজ করবে। আর যখন কোনো সংকট এসে পড়ে তখন বলবে : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি চমৎকার অভিভাবক।

যখন কোনো কাজ কঠিন মনে হয় : আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলতেন :

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا.

"হে আল্লাহ তুমি যে কাজ সহজ বানাও তাছাড়া কিছুই সহজ নয়। তুমিই কঠিন কাজ সহজ করতে পারো।

যখন জীবিকা উপার্জন কষ্টকর হয় : ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কারো যখন জীবিকা উপার্জন কঠিন হয়ে পড়ে তখন সে যেন বাড়ি থেকে বের হবার সময় বলে :

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِي وَمَالِيْ وَدِيْنِي . اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ حَتّٰى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ، وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ .

"আমার জীবন, সম্পদ ও দীনের ব্যাপারে আল্লাহর নামে বের হলাম। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট করে দাও, আর আমার জন্য যা নির্ধারিত হয়েছে, তাতে তুমি বরকত দাও। যেন তুমি যাকে বিলম্বিত করেছ, তা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা আমি পছন্দ না করি এবং তুমি যা ত্বরান্বিত করেছো, তাকে বিলম্বিত করা আমি পছন্দ না করি।"

ঋণগ্রস্ত হলে যা বলবে : ১. তিরমিযি আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, জনৈক মুকাতাব (নির্দিষ্ট মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি লাভের প্রতিশ্রুতপ্রাপ্ত দাস) তাঁর কাছে এসে বললো : আমি আমার মুক্তিপণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে গিয়েছি, তাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আলী রা. বললেন : আমি কি তোমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দেবোনা, যা আমাকে রসূলুল্লাহ সা. শিখিয়েছেন? তোমার ওপর পাহাড় সমান ঋণ থাকলেও আল্লাহ তা তোমার পক্ষ থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন। তুমি পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

"হে আল্লাহ, তোমার হালাল জীবিকা দ্বারা আমাকে হারাম থেকে মুক্ত করে দাও, আর তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে তুমি ব্যতিত অন্যদের কাছ থেকে মুখাপেক্ষাহীন করে দাও।"

২. আবু সাঈদ রা. বলেছেন : একদিন রসূলুল্লাহ সা. মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে আবু উমামা নামক জনৈক আনসারী সাহাবির সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন : হে আবু উমামা, ব্যাপার কী? তোমাকে নামাযের সময় ছাড়াই মসজিদে দেখতে পাচ্ছি কেন? সে বললো : হে আল্লাহর রসূল, ঋণ ও দুশ্চিন্তায় আমি হিমসিম খাচ্ছি। তিনি বললেন : তোমাকে কি এমন একটা দোয়া শিখিয়ে দেবোনা, যা পড়লে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূর ও ঋণ পরিশোধ করে দেবেন? সে বললো : হে রসূলুল্লাহ, শিখিয়ে দিন। রসূল সা. বললেন : সকালে ও বিকালে পড়বে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ .

"হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কার্পণ্য থেকে এবং ঋণের প্রাবল্য ও মানুষের দাপট থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" আবু উমামা বলেন : এরপর আমি এটি পড়লাম এবং আল্লাহ আমাকে দুশ্চিন্তামুক্ত ও ঋণমুক্ত করে দিলেন।

অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে যা বলবে :

ইবনুস সুন্নী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : প্রত্যেক ব্যাপারেই, এমনকি জুতোর ফিতের ব্যাপারেও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ . "আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারি" বলবে কারণ জুতোর ফিতের ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটলে তাও একটা মুসিবত ঘটে।

মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দৃঢ়চেতা ও শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যে জিনিস তোমার জন্য উপকারী, তার প্রতি আগ্রহী হও। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং হীনবল হয়োনা। যখন কোনো বিপদে পড়ো, তখন "যদি এরূপ করতাম তাহলে এটা হতোনা" বলোনা। বরং বলো : "আল্লাহ এটাই ভাগ্যে রেখেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন সেটাই করেছেন। কেননা "যদি" শব্দটা শয়তানের পথ খুলে দেয়।

ঈমান নিয়ে শয়তান সন্দেহ সৃষ্টি করলে : ১. বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কারো কারো কাছে শয়তান এসে এভাবে কুপ্ররোচনা দেয় : এটা কে সৃষ্টি করলো? ওটা কে সৃষ্টি করলো? এমনকি এক সময় সে বলে : তোমার আল্লাহকে সৃষ্টি করলো? এ পর্যায়ে এসে তার থেমে যাওয়া উচিত এবং আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত, বলা উচিত : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

২. সহীহ হাদিসে আছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : লোকেরা ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এ প্রশ্নও করে : আল্লাহ তো জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যার মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগবে সে যেনো বলে : اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি।

ক্রোধের সময় যা বলবে : বুখারি ও মুসলিম সুলায়মান বিন সারাদ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট বসে ছিলাম। তখন দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালাগাল করছিল। একজনের মুখ ক্রোধে লাল ও তার ঘাড়ের রগ ফুলে উঠছিল। রসূল সা. বললেন : আমি এমন কথা জানি, যা ঐ ব্যক্তি বললে তার রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সে যদি বলে : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. তাহলে তার রাগ চলে যাবে।

৫. কতিপয় ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া

আয়েশা রা. বলেছেন : 'রসূলুল্লাহ সা. ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া পছন্দ করতেন।' এসব দোয়ার মধ্য থেকে অতীব প্রয়োজনীয় কয়েকটি উল্লেখ করছি :

আনাস রা. বলেছেন : রসূল সা. অধিকাংশ সময় যে দোয়া করতেন, তা হলো :

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দাও, আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও।" মুসলিম বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রোগে ভুগতে ভুগতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পাখির ছানার মতো হাল্কা হয়ে গেলো। রসূল সা. তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি কোনো দোয়া করে থাকো? সে বললো : হাঁ, আমি দোয়া করতাম : হে আল্লাহ, তুমি আমাকে আখেরাতে যে শাস্তি দিতে চাও, তা আমাকে দুনিয়াতেই ত্বরিৎ দিয়ে দাও। রসূল সা. বললেন : সুবহানাল্লাহ, এটা তুমি সহ্য করতে পারবেনা। বরং তুমি বলো : হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও, আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।

আহমদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেন, সা'দ তার এক ছেলেকে বলতে শুনলেন : হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে বেহেশত চাই, তার কক্ষগুলো চাই, অমুক চাই, অমুক চাই, আর দোযখ থেকে আশ্রয় চাই, তার শেকল থেকে মুক্তি চাই, বেড়ি থেকে মুক্তি চাই ইত্যাদি। শুনে সা'দ বললেন

: তুমি আল্লাহর কাছে অনেক ভালো ভালো জিনিস চেয়েছো, আর অনেক খারাপ জিনিস থেকে আশ্রয় চেয়েছো। আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি : কিছু লোক এমন আবির্ভূত হবে, যারা দোয়ায় অনেক বাড়াবাড়ি করবে। আল্লাহকে কেবল এটুকু বলাই যথেষ্ট :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে সব রকমের কল্যাণ চাই, যা আমি জানি এবং যা আমি জানিনা- উভয় রকমের। আর সব রকমের অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাই, যা আমি জানি এবং যা আমি জানিনা উভয় রকমের।"

ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেন, রসূল সা.-এর অন্যতম দোয়া ছিলো এই :

رَبِّ أَعِنِّي وَلَاتُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَاتَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ وَلَاتَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدَى لِيْ وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ أَوَّاهًا، إِلَيْكَ مُنِيْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ، وَسَدِّدْ لِسَانِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ.

হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করোনা। আমাকে বিজয়ী করো, আমাকে পরাজিত করোনা। আমার পক্ষে কৌশল প্রয়োগ করো, আমার বিপক্ষে কৌশল প্রয়েগা করোনা। আমাকে সৎপথ দেখাও। সৎপথ আমার জন্য সহজ করো। যে ব্যক্তি আমার শত্রুতা করে, তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো। হে আল্লাহ, আমাকে তোমার প্রতি অতিমাত্রায় কৃতজ্ঞ করো, তোমার অতিমাত্রায় স্মরণকারি বানাও, তৌফিক দাও যেন তোমাকে অত্যধিক ভয় করি। অতিমাত্রায় আনুগত্য করি। তোমার জন্য অত্যধিক নিবেদিত থাকি, তোমার প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহান্বিত থাকি, হে আমার প্রভু, আমার তওবা কবুল করো, আমার গুনাহ ধুয়ে ফেলো, আমার দোয়া কবুল করো, আমার যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করো, আমার ভাষাকে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করো, আমার হৃদয়কে সরল ও সঠিক পথ দেখাও, আমার বুকে যদি কারো বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ থাকে, তবে তা দূর করে দাও।"

যায়েদ বিন আরকাম রা. থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি তোমাদেরকে রসূল সা. যা বলেছেন শুধু তাই বলছি। তিনি বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، إِنَّكَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا.

"হে আল্লাহ, আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, অতিবার্ধক্য ও কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, আমার প্রবৃত্তিকে সংযম ও খোদাভীতি দাও, তাকে পবিত্র করো, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী, তুমি তার অভিভাবক ও আশ্রয়। হে আল্লাহ, যে জ্ঞানে কোনো উপকার নেই, যে হৃদয়ে বিনয় নেই, যে অন্তরে সন্তোষ নেই এবং যে দোয়া কবুল হয়না, তা থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত, রসূল সা. বললেন : হে জনগণ, তোমরা কি সর্বাত্মক দোয়া করতে চাও? লোকেরা বললো : হে রসূল, হাঁ। তিনি বললেন : তাহলে বলো :

اَللّٰهُمَّ أَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

"হে আল্লাহ, তোমাকে স্মরণ করতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে এবং তোমার ইবাদত সুন্দরভাবে করতে আমাদের সাহায্য করো।" আহমদ বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন : তোমরা সদা সর্বদা বলবে : يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ। আহমদ আরো বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. বলতেন : يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারি, তোমার দীনের উপর আমার হৃদয়কে অবিচল রাখো। ইবনে উমর রা. বলেছেন, রসূল সা. বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ .

"হে আল্লাহ, তোমার নিয়ামত হাতছাড়া হওয়া, তোমার দোয়া ও নিরাপত্তা বিলুপ্ত হওয়া, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলতেন :

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ .

"হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছো তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করো, যে জ্ঞান উপকারী তা আমাকে প্রদান করো, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা এবং দোযাখবাসির দুর্দশা থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

মুসলিমে বর্ণিত, ফাতেমা রা. রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে একজন খাদেম চাইলেন। রসূল সা. তাকে বললেন, বলো :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنِّيْ الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ .

হে আল্লাহ, সাত আকাশ ও মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রভু ও সকল জিনিসের প্রভু, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারি, বীজের অংকুরোদগমকারি। এমন প্রতিটি জিনিসের অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাই, যা তুমি নিজের বশীভূত করে রেখেছো। তুমিই সর্বপ্রথম, তোমার পূর্বে কেউ ছিলনা। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কেউ থাকবেনা, তুমি সবার উপরে, তোমার উপরে কেউ নেই। তুমি সবচেয়ে গোপনীয়, তোমার চেয়ে গোপনীয় কিছু নেই। আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে ধনী বানিয়ে দাও।"

আরো বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সা. বলতেন : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

"হে আল্লাহ, আমি তোমার নির্ভুল পথের সন্ধান চাই, তাকওয়া চাই, আত্মসংযম চাই ও সচ্ছলতা চাই।"

তিরমিযি ও হাকেম ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. প্রায়ই কোনো বৈঠক থেকে উঠে তাঁর সাথিদের জন্য নিম্নোক্ত দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا، وَلَاتَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلَاتَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَاتُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَايَرْحَمُنَا .

"হে আল্লাহ, তোমার এমন ভয় আমাদের মধ্যে বণ্টন করো, যা আমাদের মধ্যে ও তোমার নাফরমানির মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তোমার যে ইবাদত ও আনুগত্য আমাদেরকে তোমার জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং যে দৃঢ় ঈমান আমাদের জন্য দুনিয়ায় সমস্ত বিপদ মুসিবত হাল্কা করে দেবে, তা আমাদের মধ্যে বণ্টন করো। আমাদের চোখ, কান ও শক্তি দ্বারা আমাদেরকে আজীবন উপকৃত করো। আমাদের মধ্য থেকে যারা আমাদের উত্তরাধিকারি, তাদেরকেও এ দ্বারা উপকৃত করো। যে ব্যক্তি আমাদের উপর যুলুম করেছে, তার কাছ থেকে আমাদের প্রতিশোধ নাও। আমাদের শত্রুর উপর আমাদেরকে বিজয়ী করো আমাদের দীনের ব্যাপারে আমাদেরকে বিপদে ফেলোনা। দুনিয়াকে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বানিওনা এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ প্রান্ত বানিওনা। যে আমাদের উপর দয়া করবেনা তাকে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল করোনা।"

৬. রসূল সা.-এর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ

মহান আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ, তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠাও।"

বুখারি বর্ণনা করেছেন : আবুল আলিয়া বলেন : আল্লাহর সালাত প্রেরণের অর্থ ফেরেশতাদের সামনে তাঁর প্রশংসা করা, আর ফেরেশতাদের সালাত প্রেরণের অর্থ দোয়া করা। তিরমিযি, সুফিয়ান ছাওরী ও একাধিক আলেমের মতে আল্লাহর সালাত অর্থ রহমত, আর ফেরেশতাদের সালাত অর্থ গুনাহ মাফ চাওয়া।

ইবনে কাছীর বলেছেন : এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদের সামনে তাঁর নবীর মর্যাদা কতো বড়, তা জানানো। তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি তার ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদের সামনে তাঁর প্রশংসা করেন এবং ফেরেশতারা তাঁর ওপর সালাত ও সালাম পাঠায়। মুমিনদেরকে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন, যাতে দুনিয়াবাসি ও আকাশবাসি সকলের দরূদ ও সালাম একত্রিত হয়। এ বিষয়ে বহু হাদিস পাওয়া যায়। কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করছি:

১. মুসলিমে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রসূল সা. কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার সালাত পাঠায়, আল্লাহ এর ওপর দশবার সালাত পাঠান।

২. তিরমিযি ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : কেয়ামতের দিন আমার ঘনিষ্ঠতম হবে সেই ব্যক্তি, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ পড়তো। তিরমিযি বলেছেন : এটি একটি

ভালো হাদিস। অর্থাৎ সে হবে আমার সুপারিশ লাভের সবচেয়ে বেশি যোগ্য এবং আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থানকারি।

৩. আবু দাউদ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা আমার কবরকে বিলাপের স্থানে পরিণত করোনা। আমার জন্য দরূদ পড়ো। কেননা, তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে।

৪. আবু দাউদ ও নাসায়ী আওস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেন : জুমার দিন তোমাদের শ্রেষ্ঠ দিনগুলোর একটি। কাজেই এদিন আমার জন্য বেশি করে দরূদ পড়ো। তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে? আপনি তো তখন বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহ তায়ালা নবীদের দেহ ভক্ষণ মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন।

৫. আবু দাউদে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখনই কেউ আমার প্রতি সালাম পাঠায়, তখন আল্লাহ আমার কাছে আমার প্রাণ ফেরত পাঠান, যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।

৬. ইমাম আহমদ আবু তালহা আনসারী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. কে একদিন সকালে খুব উৎফুল্লমনা ও খোশ মেজাজে দেখা গেলো। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ, আজ সকালে আপনি উৎফুল্লমনা ও খোশ মেজাজে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি বললেন : হাঁ, আজ আমার নিকট আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে একজন দূত এলো এবং বললো : আপনার উম্মতের যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তার জন্য দশটি সওয়াব লিখবেন, তার দশটা গুনাহ মাফ করে দেবেন, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং দরূদ পাঠকের উপরও অনুরূপ দরূদ পাঠ করবেন (অর্থাৎ রহমত নাযিল করবেন)।

৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার ও আমার অনুসারী পরিবার পরিজনের উপর দরূদ পড়ার পর যে চাইবে যে, তাকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করা হোক, সে যেন এই দরূদটি পড়ে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . -আবু দাউদ, নাসায়ী।

৮. উবাই বিন কা'ব রা. থেকে বর্ণিত, রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সা. উঠে বলতেন : হে জনগণ, আল্লাহকে স্মরণ করো। আল্লাহকে স্মরণ করো, কাঁপানো ঘটনা এসে পড়লো। (অর্থাৎ শিংগার প্রথম ফুঁক আসল) তার পরপরই আসছে পরবর্তী ঘটনা (অর্থাৎ শিংগার দ্বিতীয় ফুঁক।) মৃত্যু তার ভেতরকার সকল উপকরণ নিয়ে আসছে। মৃত্যু তার ভেতরকার সকল উপকার নিয়ে আসছে। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ, আমি আপনার উপর দরূদ বাড়াতে ইচ্ছুক। কী পরিমাণ দরূদ পড়বো? তিনি বললেন : তোমার যতোটা ইচ্ছা। আমি বললাম : সিকি পরিমাণ? তিনি বললেন : তোমার যতোটা মনে চায়। তবে সিকির চেয়ে বাড়াতে পারতো সেটা তোমার জন্য ভালো। আমি বললাম : অর্ধেক? তিনি বললেন : তোমার যতো ইচ্ছা। আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম : তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন : তোমার যতোটা ইচ্ছা। তবে আরো যদি বাড়াতে পারো ভালো হয়। আমি বললাম, আমি আমার পুরো বৈঠকটা জুড়েই আপনার উপর দরূদ পড়বো। তিনি বললেন :

তাহলে তোমার সমস্ত দুঃখ দূর করার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। -তিরমিযি।

রসূলুল্লাহ সা.-এর নাম শুনে প্রতিবার দরূদ ও সালাম পাঠানো কি বাধ্যতামূলক : তাহাবি ও হালিমীসহ একদল আলেম মনে করেন, রসূল সা.-এর নাম যতোবার শোনা হবে, ততোবারই তাঁর উপর দরূদ পড়তে হবে। এর প্রমাণ তিরমিযিতে আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সেই ব্যক্তি অপদস্থ হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হলো, অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়লোনা। সেই ব্যক্তি অপদস্থ হোক, যার কাছে রমযান মাস এলো, কিন্তু সে রমযান থাকতে নিজের গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারলোনা। সেই ব্যক্তি অপদস্থ হোক, যে তার পিতামাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে, কিন্তু তাঁরা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করায়নি (অর্থাৎ পিতামাতার খিদমত দ্বারা নিজের জন্য বেহেশতে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেনি)। আবু যর কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হলো, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়লোনা, সে সবচেয়ে কৃপণ।"

অন্যদের মতে, একটি বৈঠকে একবার দরূদ পড়াই ওয়াজিব। এরপর বৈঠকের অবশিষ্ট সময়ে আর না পড়লেও চলবে। তবে পড়া মুস্তাহাব। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূল সা.- বলেছেন : কোনো দল বা গোষ্ঠী কোনো বৈঠকে মিলিত হলে এবং সেই বৈঠকে আল্লাহর যিকর করা ও রসূলের প্রতি দরূদ পড়া নাহলে সেই বৈঠক কেয়ামতের দিন তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা মাফ করে দেবেন। -তিরমিযি। তিরমিযি বলেছেন হাদিসটি হাসান।

প্রতিবার রসূলুল্লাহর সা. নাম উল্লেখ করার সাথে সাথে দরূদ ও সালাম উল্লেখ করা মুস্তাহাব : আলেমগণ যতবার রসূল সা.-এর নাম লেখা হয় ততোবার তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠানো মুস্তাহাব মনে করলেও তার সপক্ষে এমন কোনো প্রামাণ্য হাদিস নেই, যা দ্বারা প্রমাণ দর্শানো যেতে পারে। খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের স্বহস্তে লেখা এমন বহু লেখা দেখেছি, যাতে তিনি রসূল সা.-এর নাম উল্লেখ করেও তাঁর উপর দরূদ লেখেননি। তবে আমি শুনেছি যে, তিনি মৌখিকভাবে দরূদ পড়তেন।

সালাত ও সালাম দুটোই এক সাথে পাঠানো : নববী বলেছেন : রসূল সা.-এর উপর যখন কেউ দরূদ পড়বে, তখন দরূদ ও সালাম দুটোই পড়া উচিত। শুধু দরূদ বা শুধু সালাম বলে ক্ষ্যান্ত হওয়া উচিত নয়। কাজেই "আলাইহিস সালাত ও সালাম" বলবে। (পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : "হে মুমনিগণ, তোমরা নবীর উপর দরূদ পাঠাও ও সালাম পাঠাও।")

নবীদের উপর দরূদ পড়া : নবীদের উপর ও ফেরেশতাদের উপর পৃথকভাবে দরূদ পড়া মুস্তাহাব। নবী ব্যতিত অন্যদের উপর নবীদের সাথে যুক্ত করে দরূদ পড়া যাবে। এটা আলেমদের সর্বসম্মত মত। রসূল সা. এর এ উক্তি আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ ·

"হে আল্লাহ, নবী মুহাম্মদ ও তাঁর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীনদের উপর দরূদ পাঠাও।" যারা নবী নয়, তাদের উপর পৃথকভাবে দরূদ পাঠানো মাকরূহ। কাজেই উমর-এর জন্যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা উচিত হবেনা।

সালাত ও সালামের ভাষা : মুসলিম আবু মাসউদ আনসারী থেকে বর্ণনা করেন, বশীর বিন সা'দ বললো : হে রসূল, আল্লাহ আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পড়ার আদেশ দিয়েছেন।

কিভাবে দরূদ পড়বো? এ কথা শুনে রসূল সা. এতো দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করলেন যে, আমরা মনে মনে বলছিলাম, বশীর এ প্রশ্নটা না করলেই ভালো হতো। কিছুক্ষণ পর রসূলুল্লাহ সা. বললেন, এভাবে দরূদ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

এ ছাড়া আর সালাম তো তোমাদের জানাই আছে। ইবনে মাজাহ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তোমরা যখন রসূলুল্লাহ সা.-এর উপর দরূদ পড়বে, তখন উত্তম দরূদ পড়ো। কেননা তোমরা জাননা, হয়তো তা তাঁর কাছে পেশ করা হয়। লোকেরা ইবনে মাসউদকে বললো : তাহলে আমাদেরকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, বলো :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ . وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ. اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُوْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

অর্থ : হে আল্লাহ, তোমার সমস্ত দরূদ, রহমত ও বরকত নবীদের সরদার, অতীতের সকল মনীষীর নেতা, শেষ নবী, তোমার বান্দা ও রসূল, কল্যাণের ইমাম, কল্যাণের পথপ্রদর্শক ও রহমতের নবী মুহাম্মদের উপর পাঠাও। হে আল্লাহ, তাকে এমন উচ্চ মর্যাদা দাও, যা দেখে অতীতের সকলে তাকে ঈর্ষা করবে। হে আল্লাহ, মুহাম্মদের উপর দরূদ পাঠাও যেমন পাঠিয়েছো ইবরাহীম ও স্বজনদের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান প্রশংসিত।"

৭. সফরের বরকত ও দোয়া

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "সফর করো সুস্থ থাকবে, অভিযানে যাও, সচ্ছলতা লাভ করবে।" -আহমদ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখনই কেউ সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন তার বাড়ির দরজায় দুটো পতাকা শোভা পায়; একটা পতাকা থাকে একজন ফেরেশতার হাতে। আরেকটা পতাকা থাকে শয়তানের হাতে। সে যদি আল্লাহর প্রিয় কাজে বের হয়ে থাকে, তাহলে পতাকাধারি ফেরেশতা তার অনুসরণ করে। ফলে সে সর্বক্ষণ উক্ত ফেরেশতার পতাকার নিচে থাকবে যতোক্ষণ না বাড়িতে ফিরে আসে। আর যদি সে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজের জন্য বের হয়ে থাকে, তবে তার অনুসরণ করে পতাকাধারি শয়তান। কাজেই সে যতোক্ষণ বাড়ি না ফিরবে ততোক্ষণ শয়তানের পতাকার নিচে থাকবে। -আহমদ ও তাবারানি।

সফরে বের হবার পূর্বে পরামর্শ করা ও ইস্তিখারা করা : সফরে বের হবার আগে সফরকারির সৎ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা উচিত। কেননা আল্লাহ বলেছেন : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ "কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।" মুমিনদের গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ "পারস্পরিক পরামর্শ করাই তাদের নীতি।"

কাতাদা বলেছেন : কোনো জনগোষ্ঠী যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর পরামর্শ করে, তখন আল্লাহ তাদেরকে সর্বাধিক সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আদম সন্তানের সৌভাগ্যের লক্ষণ হলো সে আল্লাহর কাছে সৎ ও কল্যাণকর কাজের সুযোগ ও সাহায্য চায় অর্থাৎ ইস্তিখারা করে)। আদম সন্তানের সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো, আল্লাহ যা ফয়সালা করেন তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে। আদম সন্তানের দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, সে আল্লাহর সাথে ইস্তিখারা বর্জন করে। আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য এই যে, সে আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হয়। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : যে ব্যক্তি ইস্তিখারা করে (সৎ ও কল্যাণকর কাজ করার জন্যে আল্লাহর কাছে সুযোগ ও সাহায্য চায়) ও স্রষ্টার সাথে পরামর্শ করে, সে কখনো অনুতপ্ত হয়না।

ইস্তিখারার নিয়ম : ফরয ব্যতীত যে কোনো দু'রাকাত নামায পড়বে, চাই তা তাহিয়াতুল মসজিদ (নফল) বা প্রচলিত সুন্নত নামাযই হোক না কেন। দিন বা রাতের যে কোনো সময়ে এ নামায পড়া যাবে। সূরা ফাতেহার পরে যে কোনো আয়াত বা সূরা পড়া চলবে। তারপর আল্লাহর প্রশংসা ও রসূল সা. এর উপর দরূদ পড়বে। তারপর বুখারি কর্তৃক জাবের রা. থেকে বর্ণিত দোয়াটি পড়বে। জাবের রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরাগুলো শেখাতেন, ঠিক সেভাবেই সকল কাজে* ইস্তিখারা করা শেখাতেন। তিনি বলতেন : যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন ফরয ব্যতিত যে কোনো দু'রাকাত নামায পড়ে, তারপর সে যেনো বলে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ- وَعَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ، فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، وَعَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ.

"হে আল্লাহ, আমি তোমার জানা মতে যেটা ভালো তা করতে তোমার সাহায্য চাই। তোমার ক্ষমতার মধ্য থেকে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা চাই এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে যৎকিঞ্চিৎ চাই। বস্তুত তুমিই তো সকল ক্ষমতার অধিকারি। আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তুমি তো সকল গুণের অধিকারি। আমার কোনো গুণ নেই। তুমি তো অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারি। হে আল্লাহ, তুমি যদি জানো যে, এই কাজটি (এখানে নিজের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করবে) আমার জন্য আমার ধর্মীয় দিক, আর্থিক দিক ও পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর, তাহলে এটিকে আমার ক্ষমতার আয়ত্তাধীন করে দাও। একে আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও। তারপর এতে বরকত দাও। আর যদি জানো যে, এটা আমার জন্য অশুভ ও অকল্যাণকর, আমার ধর্মীয়, আর্থিক ও পরিণাম সকল দিক দিয়ে ক্ষতিকর, তাহলে এটিকে আমার কাছ থেকে এবং আমাকে এ কাজ থেকে

---

* শওকানি বলেছেন : এ দ্বারা সব ধরনের কাজ বুঝা যায়। এ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে করে কোনো কাজকে অবহেলা করা ও ইস্তিখারা বর্জন করা অনুচিত। কেননা এমন অনেক কাজ থাকতে পারে, যাকে মানুষ গুরুত্ব হীন মনে করে। অথচ তা করতে গিয়ে ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। কখনো বা বর্জন করাতেও বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। এজন্য রসূল সা. বলেছেন : তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কল্যাণ চেয়ে দোয়া করো। এমনকি তোমাদের জুতোর ফিতে সম্পর্কে হলেও করো।

দূরে সরিয়ে দাও। অতপর যেখানেই আমার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে, সেখানে আমার জন্য কল্যাণ আয়ত্তাধীন করে দাও। তারপর তার উপর আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।"

এই নামাযে কোনো নির্দিষ্ট আয়াত বা সূরা পড়া যেমন জরুরি নয়, তেমনি কোনো আয়াত বা সূরা একাধিকবার পড়া মুস্তাহাব হবারও কোনো প্রমাণ নেই।

নববী বলেন : ইস্তিখারার পর যে কাজ করার জন্য পূর্ণ সম্মতি ও মনস্তুষ্টি সহকারে প্রেরণা আসবে, সেটাই করা উচিত। ইস্তিখারার পূর্বে যে ব্যাপারে মনস্তুষ্টি ও সম্মতি ছিলো, তার উপর নির্ভরশীল থাকা অনুচিত। বরং নিজের মনোনীত পন্থা সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত। তা না হলে তো আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করাই নিরর্থক হয়ে যায়। এতে বরং আল্লাহর কাছে সঠিক পথনির্দেশ চাওয়া, নিজের জ্ঞান ও শক্তি নেই বলে স্বীকৃতি। তাছাড়া এতে সকল শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারি আল্লাহ- এই স্বীকারোক্তি অসত্য প্রমাণিত হয়। এসব স্বীকারোক্তিতে সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে নিজের জ্ঞান, শক্তি-সমর্থ ও নিজের পছন্দকে বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

বৃহস্পতিবারে সফর করা মুস্তাহাব : বুখারি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো সফরে যাওয়ার সংকল্প করতেন, তখন বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্য কোনো দিন প্রায়ই বের হতেননা।

সফরে বের হবার আগে নামায পড়া মুস্তাহাব : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যখন কোনো সফরে যাওয়ার মনস্থ করে, তখন সে যদি দু'রাকাত নামায পড়ে, তাহলে সেই নামায হয়ে থাকে তার পরিবার পরিজনের কাছে রেখে যাওয়া তার সর্বোত্তম প্রতিনিধি।"- তাবারানি।

সাথি পরিবেষ্টিত অবস্থায় সফর করা উচিত : ইবনে উমর থেকে আহমদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. একাকী অবস্থান করতে নিষিদ্ধ করেছেন। একাকী রাত কাটাতে বা সফর করতে রসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন।

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : একজন আরোহী একজন শয়তান, দু'জন আরোহী দু'জন শয়তান, আর তিনজন একটা কাফেলা।" বর্ণনা আমর ইবনে শুয়াইব।

পরিবারের নিকট থেকে বিদায় নেয়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা এবং দোয়া চাওয়া মুস্তাহাব : ১. ইবনুস্ সুন্নী ও আহমদ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সে তার পরিবার পরিজনকে বলবে : আমি সেই আল্লাহর কাছে তোমাদের আমানত রেখে যাচ্ছি, যার কাছে রক্ষিত কোনো আমানত নষ্ট হয়না।"

২. আহমদ উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন আল্লাহর নামে কোনো জিনিস আমানত রাখা হয়, তখন আল্লাহ তার হেফাজত করেন।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা যখন সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নাও, তখন তোমাদের ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নাও। কেননা আল্লাহ তাদের দোয়ায় কল্যাণ রেখেছেন।

৪. সুন্নত হলো, পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও মুসাফিরকে বিদায় জানাতে আসা লোকেরা এই দোয়াটি পড়বে : أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ "আমি তোমার দীনকে, তোমার আমানতকে ও তোমার সর্বশেষ আমলগুলোকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখলাম।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন রসূলুল্লাহ সা. কাউকে বিদায় জানাতেন, তখন তার হাত ধরে রাখতেন। লোকটি হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি তার হাত ছাড়তেন না। -তিরমিযি।

৫. আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এক ব্যক্তি এলো এবং বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., আমি সফরে যেতে ইচ্ছুক, তাই আমাকে কিছু রসদপত্র দিন। তিনি বললেন : আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া দ্বারা রসদ দিন। সে বললো : আরো কিছু বলুন। রসূল সা. বললেন : তোমার গুনাহ মাফ করা হবে। সে বললো : আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন : তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহ যেনো তোমার জন্য সৎ কাজ সহজ করে দেন।"

৬. আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., আমি সফরে যেতে ইচ্ছুক আমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে দিন। তিনি বললেন : আল্লাহকে ভয় করবে, উঁচু স্থানে উঠতে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তারপর লোকটি যখন চলে গেলো তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ, এই ব্যক্তির পথের দূরত্ব কমিয়ে দাও এবং তার সফরকে সহজ করে দাও।"

সফরকারির কাছে দোয়া চাওয়া : উমর রা. বলেছেন : আমি রসূল সা. এর কাছ থেকে উমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন এবং বললেন : হে আমার ভাই, তোমার নিজের জন্যে দোয়া করার সময় আমাদের জন্যে দোয়া করতে ভুলোনা। উমর রা. বলেন : (হে আমার ভাই) এই কথাটা আমাকে এতো আনন্দ দিয়েছে যে, তার বিনিময়ে আমাকে সারা দুনিয়া দেয়া হলেও আমি তা পছন্দ করবোনা।

সফরের দোয়া : মুসাফির বাড়ি থেকে বের হবার সময় যে দোয়া পড়া মুস্তাহাব তা হলো :

بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ.

"আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। হে আল্লাহ, নিজে গোমরাহ হওয়া এবং অন্যকে গোমরাহ করা থেকে; নিজের পদস্খলন ও অন্যের পদস্খলন থেকে; নিজে যুলুম করা ও অন্যের যুলুমের শিকার হওয়া থেকে এবং কারো সাথে অসদাচরণ করা বা কারো অসদাচরণের শিকার হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

রসূল সা. থেকে বর্ণিত দোয়াগুলো থেকে যেটা ভালো মনে করে পড়বে মুসাফির। তাঁর কয়েকটি দোয়া নিম্নে দেয়া হলো :

১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো সফরে যেতে চাইতেন তখন বলতেন :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الضُّبْنَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ، اَللّٰهُمَّ اَطْوِلَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ.

"হে আল্লাহ, তুমি সফরে আমার সাথি, আর আমার পরিবারে আমার প্রতিনিধি। আমি তোমার কাছে পাথেয়বিহীন সফরসংগী থেকে তোমার আশ্রয় চাই। প্রত্যাবর্তনকালে বিপর্যয় থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, আমার দূরত্বকে কমিয়ে দাও এবং সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও।" আর যখন প্রত্যাবর্তন করতে চাইতেন, তখন বলতেন : আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।" আর যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন : ফিরে এলাম, তওবা করলাম, আমাদের প্রতিপালকের কাছে, আমাদের কোনো গুনাহ তিনি অবশিষ্ট রাখবেন না।" -আহমদ, তাবারানি, বাযযার।

২. আব্দুল্লাহ বিন সারজাস বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখন সফরে বের হতেন তখন বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوَرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ .

"হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে, প্রত্যাবর্তনকালীন দুর্ঘটনা থেকে, পরিশুদ্ধির পর বিপর্যস্ততা ও বিশৃঙ্খলা থেকে, মজলুমের বদ দোয়া থেকে এবং সম্পদে ও স্বজনে খারাপ দৃশ্য দেখা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। -আহমদ, মুসলিম।

মুসাফির বাহনে আরোহণের সময় যে দোয়া পড়বে : আলী বিন রবীয়া বলেন : আলী রা. কে দেখেছি, একটি জন্তু তার কাছে কাছে আনা হলো আরোহণের জন্য। যখন তিনি পাদানিতে পা রাখলেন, বললেন : 'বিসমিল্লাহ।' তারপর তার ওপর আরোহণ করে বললেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ .

"আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে অনুগত করতে সক্ষম ছিলামনা। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে।" তারপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ ও তিনবার আল্লাহু আকবার বললেন। তারপর বললেন :

سُبْحَانَكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِي، إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

"তুমি পবিত্র। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো। তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারেনা।" তারপর তিনি হাসলেন। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন, কী কারণে হাসলেন? তিনি বললেন : আমি যা করলাম, রসূলুল্লাহ সা.কে তদ্রূপ করতে দেখেছি। তারপর রসূলুল্লাহ সা. হাসলেন। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ সা. হাসলেন কেন? তিনি বললেন : কোনো বান্দা যখন বলে : হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ মুগ্ধ হন এবং বলেন : আমার বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারেনা। -আহমদ, ইবনে হিব্বান, হাকেম।

আযাদি বলেছেন : ইবনে উমার রা. তাকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. যখন কোনো সফরে যাওয়ার জন্য তার উটে আরোহণ করতেন, তখন তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন, তারপর বলতেন :

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰي، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ .

"তিনি পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা তাকে অনুগত করতে পারতামনা। আমরা আমাদের প্রতিপালকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো। হে আল্লাহ, আমরা এই সফরে তোমার কাছে তাকওয়া ও সততা চাই, যে কাজ তুমি পছন্দ করো তাই করার ক্ষমতা চাই। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এই সফর সহজ করে দাও। এর দূরত্ব সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ, এই সফরে তুমিই সংগী, আমার পরিবারে তুমিই প্রতিনিধি।

হে আল্লাহ, সফরের কষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর প্রত্যাবর্তনের সময়ের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" আর যখন ফিরে আসতেন, তখন উপরোক্ত কথাগুলো ছাড়াও বলতেন : তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী হয়ে ফিরে আসছি। -আহমদ ও মুসলিম।

রাত হলে মুসাফির যা বলবে : ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূল সা. যখন সফরে বা অভিযানে থাকতেন এবং রাত হতো, তখন বলতেন :

يَا أَرْضُ، رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ .

"হে পৃথিবী, আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার অভ্যন্তরে যেসব জিনিস লুকিয়ে থাকে তার অনিষ্ট থেকে। তোমার ভেতরে যা যা সৃষ্ট হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে। তোমার ওপর দিয়ে যা কিছু চলাচল করে তার অনিষ্ট থেকে। প্রত্যেক সিংহ ও হিংস্র জানোয়ারের অনিষ্ট থেকে। বিষধর সাপ ও বিচ্ছুর অনিষ্ট থেকে। নগরবাসীর অনিষ্ট থেকে এবং প্রত্যেক পিতা ও সন্তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। -আহমদ, আবু দাউদ।

মুসাফির কোথাও যাত্রাবিরতি করলে যা বলবে : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, মুসাফির কোথাও যাত্রাবিরতি করার সময় বলবে : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ.

"আল্লাহর সমস্ত পূর্ণাংগ বাণীগুলোর কাছে (অর্থাৎ কুরআনের কাছে) তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।" তাহলে সে ঐ জায়গা থেকে বিদায় নেয়ার সময় পর্যন্ত কোনো প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। -বুখারি ও আবু দাউদ ছাড়া সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

মুসাফির যখন কোনো জায়গা বা গ্রাম দেখতে পায় এবং সেখানে প্রবেশ করতে চায়, তখন যে দোয়া পড়বে : আতা বলেন : মূসা আ.-এর জন্য সমুদ্র বিদীর্ণ করে দিয়েছিলেন যে আল্লাহ, তার কসম খেয়ে কাব বলেছেন : সুহাইব তাকে জানিয়েছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখনই কোনো জনপদ দেখে সেখানে প্রবেশ করতে চাইতেন। তখন তার দিকে তাকিয়েই বলতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا .

"হে আল্লাহ! সাত আকাশ ও তার ছায়ার নিচে যা কিছু আছে, তার প্রতিপালক সাত পাল্লা পৃথিবী ও তারা যা কিছু বহন করে চলে তার প্রতিপালক, শয়তান ও তারা যাদেরকে গোমরাহ করে তাদের প্রতিপালক, বাতাস ও বাতাস যা কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় তাদের প্রতিপালক, তোমার কাছে এই জনপদ ও এই জনপদে বিদ্যমান সবকিছু থেকে কল্যাণ চাই, এই গ্রামের অধিবাসীদের অনিষ্ট থেকে এবং এই গ্রামে বিদ্যমান সবকিছুর অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" -নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও হাকেম।

ইবনে উমর রা. বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে সফর করছিলাম। তিনি যখনই কোনো জনপদ দেখতেন এবং তাতে প্রবেশ করতে চাইতেন, তখন তিনবার বলতেন :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا إِلَيْنَا.

"হে আল্লাহ. এই গ্রামে আমাদের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্য দান করো (তিন বার)। হে আল্লাহ, এই গ্রামের ফলমূল আমাদেরকে আহার করাও, এর অধিবাসীদের কাছে আমাদেরকে এবং এর সৎ অধিবাসীদেরকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও।" -তাবারানি।

আয়েশা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. যখনই এমন কোনো জনপদ দেখতেন যেখানে তিনি প্রবেশ করতে চাইতেন, বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهٖ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلٰى أَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا إِلَيْنَا.

"হে আল্লাহ, তোমার কাছে এই জনপদের ও এই জনপদে তুমি যা কিছু সঞ্চিত করে রেখেছো তার সুফল চাই, আর এই জনপদের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে এবং এখানে তুমি যা কিছু সঞ্চিত করে রেখেছো, তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, এই জনপদের ফলমূল আমাদেরকে আহার করাও। এর বিপদ মুসিবত ও রোগব্যাধি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। এর অধিবাসীদের নিকট আমাদের প্রিয় বানাও এবং এর সৎ অধিবাসীদেরকে আমাদের প্রিয় বানাও। -ইবনুস সুন্নী।

শেষ রাতে মুসাফির যা বলবে : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল সা. যখন প্রবাসে থাকতেন এবং রাত হতো, তখন বলতেন :

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحُسْنِ بَلَائِهٖ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ.

"আল্লাহর প্রতি আমাদের প্রশংসা এবং তাঁর উত্তম নিয়ামতসমূহের প্রতি আমাদের প্রশংসায় একজন সাক্ষী রয়েছে। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সঙ্গে থাকো এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আল্লাহর নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় চাই।" -মুসলিম।

মুসাফির কোনো উঁচু জায়গায় আরোহণ, নিচু জায়গায় অবতরণ বা প্রত্যাবর্তন করলে যা বলবে : বুখারি জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : আমরা যখন ওপরে উঠতাম, 'আল্লাহু আকবার' বলতাম। আর যখন নীচে নামতাম 'সুবহানাল্লাহ' বলতাম।

বুখারি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন হজ্জ বা ভ্রমণ থেকে ফিরতেন, তখন উঁচু গিরিপথে উঠলে বা নিচের দিকে জায়গায় নামলেই তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর বলতেন :

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ، وَنَصَرَعَبْدَهٗ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

"আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা ফিরেছি, আমরা তওবা করেছি, আমরা ইবাদতকারী, আমরা সিজদাকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী, আল্লাহ তার ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সকল শত্রুবাহিনীকে তিনি একাই পরাভূত করেছেন।

মুসাফির যখন নৌযানে আরোহণ করবে তখন যা বলবে : ইবনুস সুন্নী হুসাইন রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : আমার উম্মত যখন নৌযানে আরোহণ করবে তখন তাদেরকে পানিতে ডোবা থেকে রক্ষা করতে পারে এই দোয়া : بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ. "(আল্লাহর নামে এই নৌযানের অভিযাত্রা ও বিরতি, নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু) তারপর এই আয়াত পাঠ করতেন :

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"তারা আল্লাহ্কে যথোচিত মর্যাদা দেয়নি, কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর মুঠোর মধ্যে থাকবে, আর সমস্ত আকাশ তাঁর ডান হাত দিয়ে গুটিয়ে ফেলা হবে। তিনি পবিত্র, তিনি মহান, তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি মুক্ত।"

সমুদ্র যখন উত্তাল থাকে, তখন সমুদ্র ভ্রমণে যাওয়া নিষিদ্ধ : রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ঘরের ছাদের চারপাশে দেয়াল নেই, রাতের বেলায় সেই ছাদে আরোহণ করে কেউ যদি পড়ে মারা যায়, আল্লাহ্ তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্জন করেন। আর যে উত্তাল সাগরে ভ্রমণে গিয়ে মারা যায়, আল্লাহ্ তারও দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত। -আহমদ।

হজ্জ

১. হজ্জের মর্যাদা ও ফরযিয়াত

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

"সর্বপ্রথম মানুষের জন্য যে ঘর প্রস্তুত করা হয়, তা হলো, বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত ঘর। তা বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের উৎস। তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি। যেমন মাকামে ইবরাহীম। যে ব্যক্তি এই ঘরে প্রবেশ করেবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে। মানব জাতির উপর আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কর্তব্য এই ঘরে হজ্জ আদায় করা যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে তার উপর। আর যে ব্যক্তি কুফরি করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী থেকে মুখাপেক্ষাহীন।

আল্লাহর হুকুম পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তওয়াফ, সাঈ, আরাফায় অবস্থান ও অন্য সকল ইবাদত সম্পাদনের জন্য মক্কায় গমন করার নাম হজ্জ। এটি ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ও অকাট্য ফরযসমূহের অন্যতম। কেউ যদি হজ্জের ফরয হওয়া অস্বীকার করে তবে সে কাফের ও ইসলাম পরিত্যাগকারি গণ্য হবে। অধিকাংশ আলেমের মতে হিজরি ৬ষ্ঠ বর্ষে হজ্জ ফরয হয়। কারণ এ বছরই এ আয়াতটি নাযিল হয় : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন করো।"

ইবনুল কাইয়্যেমের মতে নবম বা দশম হিজরিতে হজ্জ ফরয হয়।

হজ্জের ফযীলত : রসূল সা.-এর বিভিন্ন হাদিসে হজ্জ আদায়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞাসা করা হলো : এরপর? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞাসা করা হলো : তারপর? তিনি বললেন : কবুল হওয়ার যোগ্য হজ্জ।' কবুল হওয়ার যোগ্য হজ্জ (হজ্জ মাবরূর) হচ্ছে, যে হজ্জের সাথে কোনো পাপ মিশ্রিত হয়না। হাসান বলেছেন : হজ্জ মাবরূর হচ্ছে সেই হজ্জ, যা থেকে ফিরে আসার পর মানুষ দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

একটি বর্ণনায় এসেছে যে, হজ্জে মাবরূর হচ্ছে, যে হজ্জে মানুষকে খাদ্য খাওয়ানো হয় এবং বিনম্র ভাষায় কথা বলা হয়।

বিভিন্ন হাদিসে হজ্জকে জিহাদের সমতুল্য আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন : হাসান বিন আলী রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এলো। সে বললো : আমি ভীরু এবং দুর্বল। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এমন জিহাদে চলে এসো, যাতে কোনো অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা নেই। তা হলো হজ্জ। –তাবরানি।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : দুর্বল, বৃদ্ধ ও মহিলাদের উপযোগী জিহাদ হচ্ছে হজ্জ। –নাসায়ী।

আয়েশা রা. বললেন, হে রসূলুল্লাহ সা., আপনি তো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করেন। তাহলে আমরা মহিলারা জিহাদ করিনা কেন? তিনি বললেন : তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো হজ্জ মাবরূর। –বুখারি, মুসলিম।

আয়েশা রা. বললেন : হে রসূলুল্লাহ সা. আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদ ও লড়াই করতে পারিনা? তিনি বললেন : তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম জিহাদ হলো হজ্জ মাবরূর। আয়েশা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছ থেকে একথা শোনার পর আমি আর হজ্জ বাদ দেইনা। -বুখারি ও মুসলিম।

বিভিন্ন হাদিসে এসেছে হজ্জ গুনাহ্ মুছে দেয়। যেমন : আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জ করলো, এবং কোনো অশ্লীল কাজ বা গুনাহের কাজ করলোনা, সে যখন বাড়িতে ফিরবে তখন সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো হয়ে বাড়িতে ফিরবে (অর্থাৎ নিষ্পাপ অবস্থা)। -বুখারি ও মুসলিম।

আমর ইবনুল আ'স বলেন, যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামকে ঢুকালেন, তখন রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে উপস্থিত হলাম। তাঁকে বললাম : আপনার হাত এগিয়ে দিন, আমি আপনার কাছে বায়য়াত হবো। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি বললেন : তোমার কি হলো আমর? আমি বললাম : আমার অতীতের গুনাহ মাফ করা হোক। তিনি বললেন : তুমি কি জাননা ইসলাম তার আগেকার সবকিছু মুছে দেয়? হিজরতও তার আগেকার সবকিছু মুছে দেয়। হজ্জও তার পূর্বের সবকিছু মুছে দেয়। – মুসলিম।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা হজ্জ ও ওমরা একাদিক্রমে করো। এই দুটো গুনাহগুলোকে মাফ করে দেয় যেমন কামারের ভাপর লোহা, স্বর্ণ ও রূপার মরিচা দূর করে দেয়। হজ্জ মাবরূরের বদলা জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। -নাসায়ী, তিরমিযি।

হাজিগণ আল্লাহর প্রতিনিধি ও মেহমান। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হাজীরা ও ওমরাকারিরা আল্লাহর প্রতিনিধি ও মেহমান। তারা কোনো দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করেন, আর মাফ চাইলে মাফ করে দেন। -নাসায়ী, ইবনে মাজাহ; ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান। ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বানের ভাষা হলো : আল্লাহর প্রতিনিধি তিনজন : হাজী, ওমরাকারি ও আল্লাহর পথে জিহাদকারি।

হজ্জের সওয়াব জান্নাত। এ প্রসঙ্গে রয়েছে কয়েকটি হাদিস।

বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। আর হজ্জ মাবরূরের বদলা জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এই ঘর (কা'বা) ইসলামের খুঁটি। যে ব্যক্তি এই ঘরের উদ্দেশ্যে হজ্জ বা ওমরা করতে বের হবে, সে আল্লাহর বিশেষ নিরাপত্তায় থাকবে। আল্লাহ যদি তাকে এই সময়ে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি তাকে বাড়িতে ফেরত পাঠান তবে প্রচুর সওয়াব ও গনিমত সহকারে ফেরত পাঠাবেন।

হজ্জে অর্থ ব্যয়ের সওয়াব অনেক : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হজ্জে অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর

পথে অর্থ ব্যয় করার মতো। প্রতিটা দিরহামের জন্য সাত শো গুণ সওয়াব পাওয়া যাবে। ইবনে আবি শায়বা, আহমদ, তাবারানি বায়হাকি।

হজ্জের ফরযিয়াত

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হজ্জ বারবার করা জরুরি নয়। জীবনে হজ্জ একবারই ফরয হয়। তবে মানত করলে ভিন্ন কথা। মানত পালন করা জরুরি। আর যদি কেউ স্বেচ্ছায় বাড়তি হজ্জ করে তবে তা নফল হবে। আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাদের সামনে নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন : "হে জনতা, আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ করো। তখন একজন বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., প্রতি বছর? রসূলুল্লাহ সা. নীরব রইলেন। লোকটি তিনবার কথাটা বললো। তারপর রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আমি যদি বলতাম; হ্যাঁ তাহলে তো প্রতি বছরই ফরয হয়ে যেতো। অথচ তোমরা তা পারতেনা। তারপর বললেন : আমি যা বলিনি, তা নিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞাস করোনা। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী রসূলদের অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্যই ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার জন্যই ধ্বংস হয়েছে। কাজেই আমি যখন তোমাদেরকে কোনো আদেশ দেই, তখন তা যতোদূর পারো মেনে চলো। আর যখন কোনো কাজ করতে নিষেধ করি, তখন তা বর্জন করো। –বুখারি ও মুসলিম।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : হে জনগণ, তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। আকরা বিন হাবেস উঠে বললেন : হে রসূলুল্লাহ সা. প্রতি বছর'? তিনি বললেন : আমি যদি তাই বলতাম, তাহলে প্রতি বছরই ফরয হতো, ফরয হলেও তোমরা তা করতে পারতেনা। হজ্জ একবারই। বেশি করলে তা নফল। -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম।

তাৎক্ষণিকভাবে ফরয হয়, না বিলম্বে : শাফেয়ী, সাওরী, আওযায়ী ও মুহাম্মদের মত হলো, হজ্জ জীবনে যে কোনো সময় করা যায়। যার ওপর হজ্জ ফরয হয়েছে, সে বিলম্বে করলে গুনাহ হবেনা। মৃত্যুর আগে যখনই করুক, আদায় হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. হজ্জকে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্বিত করেছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীগণ এবং বহু সংখ্যক সাহাবিও দিলেন। অথচ হজ্জ ফরয হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরিতে। তাৎক্ষণিকভাবে ফরয হলে তিনি তা বিলম্বিত করতেন না। ইমাম শাফেয়ী বলেন : এ থেকেই আমরা প্রমাণ পাই হজ্জ সারা জীবনে একবার ফরয। শুরু হয় বয়োপ্রাপ্তিতে এবং মৃত্যুর পূর্বে আদায় করলেই হয়। আর আবু হানিফা, মালেক, আহমদ, শাফেয়ী মাযহাবের কোনো কোনো ইমাম ও আবু ইউসুফ বলেন : হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে ফরয। [কেননা ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তার তাড়াতাড়ি হজ্জ আদায় করা উচিত। কেননা কেউ রোগাক্রান্ত হতে পারে, অনেক সময় বাহন খোয়া যেতে পারে, কিংবা নতুন নতুন ব্যস্ততা দেখা দিতে পারে। – আহমদ, বায়হাকি, তাহাবি ও ইবনে মাজাহ। রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন : তোমরা দ্রুত ফরয হজ্জ আদায় করো। কেননা তোমরা জানোনা কখন কার কী ঘটে যায়। -আহমদ, বায়হাকি, বায়হাকির হাদিসে বলা হয়েছে : কেউ জানেনা কখন কার কী রোগ ব্যাধি হয় বা প্রয়োজন দেখা দেয়।] যারা হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে ফরয হয় বলে মনে করেন, তারা এ হাদিস দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জ করাকে মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় বলে ব্যাখ্যা করেন। তারা মনে করেন, যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তার জন্য হজ্জ আদায়ে যতোটা সম্ভব দ্রুত করা মুস্তাহাব।

২. হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলি

ফকীহগণ একমত যে, হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ হওয়া জরুরি :

১. মুসলমান হওয়া, ২. বয়োপ্রাপ্ত হওয়া, ৩. বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন (পাগল না হওয়া), ৪. স্বাধীন হওয়া (গোলাম না হওয়া), ৫. আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকা।

যার মধ্যে এই শর্তগুলো উপস্থিত নেই, তার উপর হজ্জ ফরয হবেনা। মুসলমান হওয়া। বয়োপ্রাপ্ত হওয়া ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া সকল ইবাদত পালনের জন্যেই অপরিহার্য শর্ত।

হাদিসে রয়েছে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিন ব্যক্তির কোনো পাপ পুণ্য লেখা হয়না : ঘুমন্ত ব্যক্তি যতোক্ষণ না জাগে, শিশু যতোক্ষণ না বয়োপ্রাপ্ত হয় এবং পাগল যতোক্ষণ বিবেক বুদ্ধি ফিরে আসে।

স্বাধীনতা হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত। কেননা এটা এমন একটা ইবাদত, যাতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। এতে সামর্থ্য থাকা জরুরি। অথচ দাস তার মনিবের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকে এবং তার প্রয়োজনীয় সামর্থ্য থাকেনা। সামর্থ্য একটা শর্ত। কেননা, আল্লাহ বলেন :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً .

"আল্লাহর জন্য কা'বায় হজ্জ পালন করা মানুষের কর্তব্য, যে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে তার জন্য।"

সামর্থ্য কিভাবে নির্ণয় করা হবে : হজ্জ ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত যে সামর্থ্য, তা নিম্নোক্ত জিনিসগুলো দ্বারা নির্ণিত হবে :

১. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া। অর্থাৎ বার্ধক্য, প্রতিবন্ধিত্ব বা বিকলাঙ্গতা, অথবা নিরাময়ের আশা নেই এমন রোগ হেতু হজ্জ করতে অক্ষম হলে। এ ব্যক্তির প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য থাকা সাপেক্ষে নিজের পক্ষ হতে অন্য কাউকে দিয়ে হজ্জ করানো জরুরি। 'বদলী হজ্জ সংক্রান্ত অধ্যায়ে সামনে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে।

২. হজ্জে যাওয়া আসার পথ নিরাপদ হওয়া, যেন হাজীদের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। ডাকাত বা রোগ মহামারীর কারণে জীবন বিপন্ন হবার আশংকা থাকলে কিংবা অর্থ সম্পদ ছিনতাই হওয়ার ভয় থাকলে হজ্জের সামর্থ্য নেই বলে বিবেচিত হবে।

পথে যেসব কর, চাঁদা ইত্যাদি আদায় করা হয়, সেগুলো হজ্জ থেকে অব্যাহতি লাভের উপযুক্ত ওযর গণ্য হয় কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী প্রমুখের মতে, এটা হজ্জ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য ওযর, চাই যতো কম অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন। মালেকী মাযহাব অনুযায়ী এটা ওযর গণ্য হবেনা। তবে এটা যদি হজ্জ যাত্রীর অস্তিত্বই বিপন্ন কিংবা চলাচল অসম্ভব করে তোলে কিংবা বারবার আদায় করা হতে থাকে, তাহলে ওযর গণ্য হবে।

৩, ৪. হজ্জ যাত্রির প্রয়োজনীয় অর্থ ও বাহনের অধিকারী হতে হবে। অর্থের পরিমাণ : অর্থের পরিমাণ এরূপ হওয়া চাই যেন তা দ্বারা তার শরীর সুস্থ থাকে এবং যাদের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত, তাদের ব্যয় নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে নির্বাহ করতে পারে। এটা তার ফরয হজ্জ আদায় করা ও বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য। মৌলিক প্রয়োজন দ্বারা পোশাক, বাসস্থান, বাহন ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের সরঞ্জামাদি বুঝানো হয়েছে। (ব্যবহার্য পোশাক, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও বসবাসের ঘর– চাই তা যতো বড় ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত হোক, হজ্জের খাতিরে বিক্রি করা যাবেনা।)

আর বাহনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো, তা যেন তার যাওয়া ও আসা উভয়ের প্রয়োজন পূরণের যোগ্য হয়, চাই তা স্থলপথে, নৌপথে বা আকাশপথে হোক। আর এটা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার বাড়ি অনেক দূরে থাকার কারণে হেঁটে যাতায়াত করতে অক্ষম। যে ব্যক্তির বাড়ি মক্কার এতো কাছে অবস্থিত যে, হেঁটেই যাতায়াত করতে পারে, তার জন্য স্বতন্ত্র বাহনের ব্যবস্থা থাকা শর্ত নয়। কেননা রাস্তা খুব কম থাকায় হেঁটেই যাতায়াত করা সম্ভব। কোনো কোনো হাদিসে দেখা যায়, রসূলুল্লাহ সা. হজ্জে যাতায়াতের সামর্থ্য দ্বারা বাহন ও হজ্জের ব্যয় নির্বাহযোগ্য অর্থ বুঝিয়েছেন। আনাস রা. বলেন : জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূলুল্লাহ সা. যাতায়াতের সামর্থ্য কী অর্থ? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : বাহন ও হজ্জের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের অর্থ। –দার কুতনি।

আলী রা. থেকে বর্ণিত, হে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জের ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থ ও বাহনের অধিকারী হওয়ায় আল্লাহর ঘরে পৌঁছতে সক্ষম, তথাপি হজ্জ করলোনা, সে ইহুদি হয়ে মরুক বা খৃষ্টান হয়ে মরুক, তাতে কিছুই এসে যায়না। কেননা আল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে, তার ওপর হজ্জ করা আল্লাহর পক্ষ হতে ফরয। –তিরমিযি।

বাহন ও পাথেয় সংক্রান্ত এই হাদিসগুলো যদিও সবই দুর্বল, তথাপি অধিকাংশ আলেম হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য যাতায়াতের বাহন ও হজ্জের ব্যয় নির্বাহের অর্থ থাকা দূরবর্তী লোকদের হজ্জের জন্য শর্তরূপে নির্ধারণ করেছেন। তাই যার বাহনের ব্যবস্থা নেই ও ব্যয় নির্বাহের অর্থ নেই, তার উপর হজ্জ ফরয নয়।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : এই হাদিসগুলোর কতক নিখুঁত সনদে ও কতক ত্রুটিপূর্ণ সনদে বর্ণিত। তবে সঠিকভাবে এগুলো প্রকাশ করে যে, বাহন ও পাথেয় (অর্থাৎ যাতায়াত ব্যবস্থা ও হজ্জের ব্যয় নির্বাহের অর্থের উপরই হজ্জ ফরয হওয়া নির্ভর করে– যদিও রসূলুল্লাহ সা. জানতেন যে, বহু লোক হেঁটেই হজ্জ করতে পারে।

তাছাড়া, আল্লাহ তায়ালার উক্তি "যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে" এ দ্বারা হয় তিনি সকল ইবাদতের যে ধরনের সামর্থ্য শর্ত, হজ্জেও সেই ধরনের সামর্থ্য বুঝিয়েছেন অর্থাৎ সাধারণ সামর্থ্য, নচেত বাড়তি কোনো সামর্থ্য। যদি প্রথমটি বুঝানো হতো, তাহলে এই শর্ত আরোপের প্রয়োজন হতোনা যেমন নামায রোযা সংক্রান্ত আয়াতে প্রয়োজন হয়নি। সুতরাং বুঝা গেলো, বাড়তি কোনো সামর্থ্য বুঝানো হয়েছে। আর সেটা আর্থিক সামর্থ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

আরো একটা কথা এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। তা হলো, হজ্জ এমন একটা ইবাদত, যা সম্পাদনে বেশ খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। সুতরাং এটি ফরয হওয়া পাথেয় ও বাহনের উপর নির্ভরশীর, যেমন জিহাদ। যেমন জিহাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِلٰى قَوْلِهِ : وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ .

(জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকাতে) তাদের কোনো অপরাধ নেই, যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ, যদি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি তাদের আনুগত্য ও আন্তরিকতা থাকে। সৎ লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

"অপরাধ নেই তাদের, যারা আপনার কাছে এসেছিল যেন আপনি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করেন। আপনি বলেছিলেন : আমার কাছে কোনোই বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাবো।....."

'মুহাযযাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে : বাহন ও পাথেয় সংগ্রহ করার মতো অর্থ যদি কেউ পেয়েও যায়, কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য সেই অর্থ তার প্রয়োজন, তাহলেও তার উপর হজ্জ ফরয হবেনা, চাই সে ঋণ ত্বরিৎ পরিশোধ হোক অথবা বিলম্বে পরিশোধযোগ্য হোক, কেননা যে ঋণ ত্বড়িৎ পরিশোধযোগ্য, তা তার জন্য অবিলম্বে পরিশোধ করা জরুরি, আর হজ্জ তো বিলম্বেও করা যায়। তাই ঋণ পরিশোধকে হজ্জের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আর যে ঋণ বিলম্বে পরিশোধযোগ্য তাও তার উপরই আবর্তিত। তার সেই অর্থ যদি হজ্জে ব্যয় করা হয়, তাহলে ঋণ পরিশোধের জন্য সে আর প্রয়োজনীয় অর্থ পাবেনা। আর যদি একটা বাড়ি কেনার জন্য তার ঐ টাকার প্রয়োজন হয়, অথচ সেই রকম একটা বাড়ি তার জন্য অপরিহার্য, অথবা একজন গৃহ পরিচারক পরিবারের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার উপর হজ্জ ফরয হবেনা। আর যদি তার বিয়ে করার প্রয়োজন হয়, যা না করলে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার ভয়ে ভীত, তাহলেও তার আগে বিয়ে করা উচিত। কেননা এর প্রয়োজন তাৎক্ষণিক। আর যদি কোনো বাণিজ্যিক পণ্যের জন্য তার ঐ অর্থের প্রয়োজন হয়, যাতে সে ব্যবসায়ের মাধ্যমে তা থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আবুল আব্বাসের মতে, তার হজ্জ ফরয নয়। কেননা গৃহ পরিচারক ও বাড়ির মতো এটা অপরিহার্য। আর আল-মুগনীতে বলা হয়েছে : যদি কোনো ব্যক্তির কাছে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পাওনা থাকে এবং সে তাকে এমনভাবে দেয়, যা তার হজ্জ করার জন্য যথেষ্ট, তাহলে তার হজ্জ ফরয হবে। কেননা সে সমর্থ। আর যদি কোনো অভাবী মানুষের কাছে পাওনা থাকে অথবা ঋণ আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে হজ্জ ফরয হবেনা। শাফেয়ীদের মতে, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য একজনকে বিনামূল্যে কোনো বাহন দিতে রাজি হয়, তাহলে তা গ্রহণ করতে সে বাধ্য নয়। কেননা এটা গ্রহণ করায় তার ওপর দাতার খোঁটার ঝুঁকি থাকে। আর খোঁটার ঝুঁকি বহন করা কষ্টকর। অবশ্য তার সন্তান যদি তাকে এমন কোনো অর্থ দিতে প্রস্তুত হয়, যা দ্বারা সে হজ্জ করতে সমর্থ হয়, তাহলে তার হজ্জ করা ফরয হবে। কেননা এখানে কোনো খোঁটার আশংকা ছাড়াই সে হজ্জ করতে সমর্থ। হাম্বলীরা বলেন : অন্যের দান গ্রহণ করে হজ্জ করা জরুরি নয় এবং এতে সে সমর্থ হবেনা, চাই দাতা আপন হোক বা পর হোক এবং চাই সে তাকে বাহন, পাথেয় বা নগদ অর্থ দিক।

৫. হজ্জে যাওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে এমন কিছু যেন না ঘটে। যেমন কোনো সরকার বা ক্ষমতাবানের জেল জুলুম ইত্যাদি।

অপ্রাপ্ত বয়স্কের ও দাসের হজ্জ : দাস ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের ওপর হজ্জ ফরয নয়। কিন্তু তারা হজ্জ করলে তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু ইসলামের হজ্জ ফরয হলে তা থেকে তারা অব্যাহতি পাবেনা। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে কোনো শিশু বা বালক যদি হজ্জ করে, তারপর বয়োপ্রাপ্ত হয়, তখন (তার হজ্জ ফরয হলে) তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে। যে কোনো দাস হজ্জ করার পর স্বাধীন হলে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে। -তাবারানি। ছায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন : আমার পিতা বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে হজ্জ করেছেন। তখন আমার বয়স ছিলো সাত বছর। আহমদ, বুখারি, তিরমিযি। তিরমিযি আরো বলেছেন : আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, শিশু যদি বয়োপ্রাপ্তির আগে হজ্জ করে, তবে বয়োপ্রাপ্তির পর

তাকে আবার হজ্জ করতে হবে। অনুরূপ, দাস যদি পরাধীন অবস্থায় হজ্জ করে, তারপর মুক্তি পায়, তবে হজ্জের সামর্থ্য অর্জন করলে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : জনৈক মহিলা একটা শিশুকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সা.-র কাছে গেলো এবং জিজ্ঞাসা করলো : এই শিশু কি হজ্জ করতে পারবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ *, তবে সেজন্য তুমি সওয়াব পাবে। **

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে হজ্জ করেছিলাম। আমাদের সাথে মহিলা ও শিশুরাও ছিলো। আমরা তাদের পক্ষ হতে তালবিয়া পড়েছি এবং পাথর মেরেছি। - আহমদ, ইবনে মাজাহ।

শিশু বা বালক যদি কিছুটা বুদ্ধিমান হয় এবং ন্যায় অন্যায় বাছ বিচারের ক্ষমতা অর্জন করে, তাহলে সে নিজে ইহরাম বাঁধবে, হজ্জের যাবতীয় কর্তব্য নিজেই সম্পাদন করবে। নচেত তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ইহরাম করবে। তার পক্ষ হতে তালবিয়া পড়বে, তাওয়াফ ও সাঈ করবে, আরাফায় অবস্থান করবে এবং তার পক্ষ হতে পাথর মারবে।

আর আরাফায় অবস্থানের আগে যদি সে বয়োপ্রাপ্ত হয় অথবা আরাফায় থাকা অবস্থায় বয়োপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার আর পুনরায় হজ্জ করতে হবেনা। দাস যখন মুক্তি পায় তখন তার অবস্থাও তদ্রূপ। মালেক ও ইবনুল মুনযিরের মতে, পনুরায় হজ্জ করতে হবে। কেননা ইহরাম নফলভাবে বাঁধা হয়েছিল। তা ফরয আকারে পরিবর্তিত হবেনা।

মহিলার হজ্জ : পুরুষের ন্যায় মহিলার ওপরও হজ্জ ফরয, যদি হজ্জ ফযর হওয়ার শর্তাবলি পুরোপুরিভাবে উপস্থিত থাকে। শর্তাবলি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মহিলার ক্ষেত্রে, একটা অতিরিক্ত শর্ত হলো, তার স্বামী বা কোনো মাহরাম পুরুষ তার সাথে হজ্জে যেতে হবে। (মাহরাম মানে-যাদের সাথে বিয়ে চিরতরে হারাম, যেমন ভাই, বোন, পিতা, কন্যা, মা, ছেলে) আপন বাবা, আপন ফুফু, আপন ভাতিজা ভাতিজী, ভাগ্নে ভাগ্নি ইত্যাদি)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : একজন মাহরাম সংগী ব্যতীত কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করবেনা এবং কোনো মহিলা মাহরাম ব্যতিত কারো সাথে সফর করবেনা। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. আমার স্ত্রী হজ্জ করতে চলে যাচ্ছে। এদিকে আমি অমুক যুদ্ধে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করিয়েছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো। বুখারি, মুসলিম। ***

ইয়াহিয়া বিন উব্বাদ বলেছেন : রায় থেকে এক মহিলা ইবরাহীম নাখয়ীর নিকট চিঠি লিখলো যে, আমি ইসলামের অন্যতম ইবাদত হজ্জ এখনো পালন করিনি। আমার পর্যাপ্ত সম্পদ আছে। কিন্তু কোনো মাহরাম সংগী নেই। তিনি তাকে জবাব দিলেন : আপনি সেই ব্যক্তিদের একজন, যার জন্য আল্লাহ হজ্জ আদায়ের পথ খোলা রাখেননি।

---

* অধিকাংশ আলেমের মত; অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ইবাদত ও সৎ কাজ করলে সে তার সওয়াব পাবে এবং তা তার আমলনামায় লেখা হবে। কিন্তু তার খারাপ কাজ লেখা হয়না এবং তার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হয়না। হযরত উমরের মতও তদ্রূপ।

** অর্থাৎ তুমি যে তাকে হজ্জে সহযোগিতা করছো ও তাকে শিক্ষা দিচ্ছো সেজন্য।

*** রসূলুল্লাহ সা.-এর এই আদেশটি মুস্তাহাব নির্দেশক। কেননা স্বামী বা মাহরামের স্ত্রীর সাথে সফরে যাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কেননা হজ্জের সফর অত্যন্ত শ্রম সাপেক্ষ ও ব্যয় সাপেক্ষ। কোনো ব্যক্তি নিজের অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে অন্যের ফরয আদায়ে সাহায্য করতে বাধ্য নয়।

আবু হানিফা ও তার শিষ্যবর্গ, ইবরাহীম নাখয়ী, হাসান, ছাওরী, আহমদ, ও ইসহাকের মতে মহিলাদের হজ্জ ফরয হওয়া ও হজ্জের সামর্থ্য লাভের জন্য এটা (স্বামী বা মাহরাম সাথি লাভ) অপরিহার্য শর্ত।

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন : শাফেয়ী মাযহাবের সুপরিচিত মত হলো, স্বামী বা মাহরাম অথবা নির্ভরযোগ্য মহিলাদের সফরসংগী হওয়া শর্ত। কেউ কেউ বলেছেন : একজন মহিলার সফর সংগী হওয়া যথেষ্ট, যদি সে নির্ভরযোগ্য হয়। কারাবিসী ও মুহাযযাবে বলা হয়েছে : পথ নিরাপদ হলে একাকিনী সফরে যাওয়াও মহিলার জন্য বৈধ। তবে এসবই ফরয বা ওয়াজিব হজ্জ ও ওমরার ব্যাপারে প্রযোজ্য।

'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে : ইমামদের একটি দল বলেছেন : বৃদ্ধা মহিলার কোনো মাহরাম সংগী ব্যতীত সফর করা জায়েয। নির্ভরযোগ্য সংগী পেলে কিংবা পথ নিরাপদ হলে স্বামী বা মাহরাম সফরসংগী ব্যতীত নারীর সফর বৈধ এই মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বুখারিতে আদী বিন হাতেম থেকে বর্ণিত হাদিসকে উপস্থাপন করা হয়। আদি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে উপস্থিত, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তার কাছে এসে নিজের ক্ষুধার কথা জানালো। কিছুক্ষণ পর আরেকজন এলো, সে ফরিয়াদ জানালো, তার ওপর ডাকাতের হামলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে আদি, তুমি কি হিরা দেখেছো? (কুফার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম) আদী বললেন : আমি দেখিনি, তবে এই নামটি শুনেছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন, যদি তোমার আয়ু দীর্ঘ হয়, তবে অবশ্যই দেখবে, একটি মহলিা একা হিরা থেকে যাত্রা করে মক্কায় এসে পবিত্র কা'বার তওয়াফ করবে। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সে ভয় পাবেনা। এর প্রমাণ হিসেবে একথাও বলা হয় যে, উমর রা. তার শেষ হজ্জ করার পর রসূলুল্লাহ সা. এর স্ত্রীগণকে হজ্জ করার অনুমতি দিয়ে গেছেন এবং তাদের সাথে উসমান ও আব্দুর রহমান বিন আওফকে পাঠিয়েছেন। উসমান ঘোষণা করেছিলেন : খবরদার, কেউ যেন উম্মুল মুমিনীনদের কাছে না আসে, তাদের দিকে না তাকায়। অথচ তারা তখন নিজ নিজ উটের হাওদায় ছিলেন।

আর যখন কোনো মহিলা একাকী সফরে বের হয় ও হজ্জ করে এবং তার সাথে স্বামী বা মাহরাম না থাকে তখন তার হজ্জ শুদ্ধ হবে। 'সুবুলুস সালামে' বলা হয়েছে : ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : মাহরাম ব্যতীত মহিলার হজ্জ এবং সামর্থ্যহীন ব্যক্তির হজ্জ শুদ্ধ। মোটকথা, সামর্থ্য না থাকার কারণে যার ওপর হজ্জ ফরয হয়নি যেমন দরিদ্র, রোগী, পংগু, যার সবকিছু ডাকাতে লুণ্ঠন করেছে এবং যে মহিলার মাহরাম সংগি জোটেনি ইত্যাদি। তারা যখন হজ্জের সকল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, তখন তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তবে এদের ভেতরে কতক রয়েছে যারা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠভাবে হজ্জ সম্পাদন করে, যেমন পদব্রজে হজ্জ সম্পাদনকারি। আবার কতক লোক রয়েছে, যারা অর্থনৈতিকভাবে হজ্জ সম্পাদন করে। যেমন ভিক্ষা করে হজ্জ সম্পাদনকারি এবং মাহরাম সংগী ব্যতীত হজ্জ সম্পাদনকারিণী মহিলা। এদের সকলেরই হজ্জ শুদ্ধ হবে। কেননা হজ্জের যোগ্যতা তাদের মধ্যে উপস্থিত। গুনাহ যদি কিছু হয়ে থাকে, তবে তা পথে হয়ে থাকতে পারে, মূল কাজে (অর্থাৎ হজ্জে) নয়। 'আল মুগনী'তে বলা হয়েছে : অসমর্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট করে পাথেয় ও বাহন ছাড়াই রওনা হয়ে যায় এবং হজ্জ সম্পাদন করে, তবে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে ও যথেষ্ট হবে।

হজ্জের জন্য স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ : স্ত্রীর ওপর হজ্জ ফরয থাকলেও তা সম্পাদনের জন্য স্বামীর অনুমতি নেয়া মুস্তাহাব। যদি অনুমতি দেয়, তাহলে তো কথাই নেই। হজ্জ করতে চলে যাবে। আর যদি অনুমতি না দেয়, তাহলেও অনুমতি ছাড়াই হজ্জে যাবে। কেননা ফরয হজ্জে বাধা দেয়ার অধিকার স্বামীর নেই। কারণ হজ্জ একটা ইবাদত, যা স্ত্রীর

ওপর ফরয হয়েছে। আর সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা বৈধ নয়। স্ত্রী ইবাদত করলে ত্বরিৎ হজ্জ সম্পন্ন করবে। প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া যেমন তার এখতিয়ারভুক্ত, তেমনি হজ্জ করাও। কেউ তাকে বাধা দিতে পারেনা বা বিলম্বিত করতে বাধ্য করতে পারেনা। মানতের হজ্জও তদ্রূপ। কেননা তাও ফরয হজ্জের মতোই স্ত্রীর ওপর বাধ্যতামূলক। তবে নফল হজ্জ থেকে বাধা দেয়ার অধিকার ও ক্ষমতা স্বামীর রয়েছে। কেননা দার কুতনিতে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত : জনৈক মহিলার স্বামী ও সম্পদ দুই-ই ছিলো। তার স্বামী তাকে হজ্জে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছিলনা। তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : স্বামীর অনুমতি ব্যতিত সে হজ্জে যেতে পারবেনা।

ফরয বা ওয়াজিব হজ্জ সম্পাদন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় : যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয ছিলো কিংবা হজ্জের মানত করেছিল, কিন্তু হজ্জ সম্পন্ন করার আগেই মারা গেছে, তার অভিভাবকের উপর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ব্যয় করে এমন এক ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা কর্তব্য, যে তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবে, যেমন তার ঋণ পরিশোধ করা অভিভাবকের দায়িত্ব।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, জুহায়না গোত্র থেকে জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো : আমার মা হজ্জের মানত করেছিলেন কিন্তু হজ্জ আদায় করার আগেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জটা সম্পন্ন করতে পারি? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো। আচ্ছা, তোমার মায়ের ওপর ঋণ থাকলে তুমি কি সে ঋণ পরিশোধ করতেনা! আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করো। ঋণ ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহই অগ্রাধিকারী। –বুখারি।

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির ওপর যদি ফরয বা ওয়াজিব হজ্জ থেকে থাকে, তবে তার পক্ষ থেকে সেটা আদায় করা জরুরি চাই সে ওসিয়ত করে থাকুক বা না করে থাকুক। কেননা ঋণ মাত্রই পরিশোধ করা শর্তহীনভাবে অপরিহার্য। অনুরূপ, কাফফরা, যাকাত ও মানত প্রভৃতি আর্থিক দায় পরিশোধ করাও ওয়াজিব। এটা ইবনে আব্বাস, যায়দ বিন ছাবেত, আবু হুরায়রা ও শাফেয়ীর অভিমত। যখন হজ্জ ও ঋণ একত্রিত হয়ে যাবে। অথচ পরিত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারা উভয়টা পরিশোধ করা সম্ভব নয়, তখন হজ্জকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "আল্লাহর পাওনা পরিশোধ করা অগ্রগণ্য।"

ইমাম মালেকের মতে, মৃত ব্যক্তি যখন ওসিয়ত করে যায়, তখনই তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো ওয়াজিব। কেননা হজ্জ এমন একটা ইবাদত, যাতে শারীরিক শ্রম প্রাধান্য পায়, তাই এতে প্রতিনিধি গ্রহণযোগ্য নয়। ওসিয়ত করে গেলে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে হজ্জ করতে হবে।

বদলী হজ্জ : যে ব্যক্তি হজ্জের সামর্থ্য লাভ করে পরবর্তী সময়ে রোগ বা বার্ধক্যের কারণে অসমর্থ হয়ে পড়ে, তার বদলী হজ্জ করানো কর্তব্য। কেননা সে নিজের অক্ষমতার কারণে হজ্জ করার আশা পরিত্যাগ করেছে। তাই সে মৃত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত। তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ হজ্জ করবে। কেননা ফজল ইবনে আব্বাসের হাদিসে বলা হয়েছে, বিদায় হজ্জে খাসয়াম গোত্রের জনৈক মহিলা বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু আমার পিতা এতোটা বুড়ো হয়ে গেছেন যে, উটের উপর স্থির হয়ে বসতেই পারেন না। এমতাবস্থায় আমি কি তার প্রতিনিধি হয়ে বদলী হজ্জ করতে পারি? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হ্যাঁ। –সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

তিরমিযি বলেছেন : এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ সা. থেকে বিশুদ্ধ সনদে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামসহ অধিকাংশ মনীষী এই হাদিস অনুসারে আমল করেন এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা জরুরি মনে করেন। ছাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকও এই মতের পক্ষপাতি।

মালেক বলেন : যখন তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানোর ওসিয়ত করবে তখনই বদলী হজ্জ করানো হবে। আহমদ, হানাফী, শাফেয়ী ও ইবনুল মুবারকসহ কেউ কেউ বলেন জীবিত ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে হজ্জ করতে অক্ষম হয়ে গেলে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করানো যাবে। উপরোক্ত হাদিস থেকে জানা গেলো, মহিলারা মহিলা বা পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে। কুরআন বা হাদিসে এর বিপক্ষে কিছু বলা হয় নাই।

প্রতিবন্ধী, বিকলাংগ বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে জর্জরিত ব্যক্তি যখন সুস্থ ও কর্মক্ষম হয় : রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানোর পর সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে সে তার ফরয হজ্জ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তাকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করতে হবেনা। কেননা এতে দু'বার হজ্জ ফরয হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। এটা আহমদের মত।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে ঐ বদলী হজ্জ তার দায়মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবেনা। কেননা এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সে আরোগ্য লাভ থেকে পুরোপুরি হতাশ ছিলনা। সর্বশেষ অবস্থাটাই বিবেচনায় নিতে হয়। ইবনে হাযম প্রথমোক্ত মতটিকে অগ্রগণ্য আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. যখন পদব্রজে বা বাহনে আরোহণ করে হজ্জ আদায়ে সক্ষম এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে সে আল্লাহর ঋণ থেকে দায়মুক্ত হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন, তখন নিঃসন্দেহে তার ঋণ পরিশোধিত হয়েছে এবং সে দায়মুক্ত হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। আর একথাও সন্দেহাতিতভাবে বলা যায় যে, যে ফরয আদায় হয়ে গেছে এবং যা থেকে অব্যাহতি অর্জিত হয়েছে, তা পুনরায় করার দায়িত্ব একমাত্র কুরআন বা হাদিসের কোনো দ্ব্যর্থহীন ভাষ্য ব্যতীত অর্পিত হতে পারেনা। আর এ ক্ষেত্রে পুনরায় হজ্জ করা দরকার মর্মে কুরআন বা হাদিসে আদৌ কোনো ভাষ্য নেই। যদি এমনটি করার প্রয়োজন থাকতো, তাহলে রসূলুল্লাহ সা. অবশ্যই তা খোলাখুলিভাবে বলতেন। কেননা একজন বৃদ্ধ মানুষ এক সময় বাহনে আরোহণ করতে সক্ষম না থাকলেও যে কোনো সময় সক্ষম হয়ে যেতেও পারে, একথা সুবিদিত হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সা. যখন পুনরায় ফরয হজ্জ করতে হবে একথা জানাননি, তখন এ ফরয পুনরায় সম্পাদন করার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার কোনো বৈধতা নেই। ইতিপূর্বে তার পক্ষ থেকে যে বদলী হজ্জ করা হয়েছে, তার মাধ্যমেই তার দায়িত্ব বিশুদ্ধভাবে পালিত হয়েছে।

বদলী হজ্জের শর্ত : যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করবে, তার জন্য শর্ত হলো, সে যেনো পূর্বে নিজের হজ্জ আদায় করে। কেননা ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি বলছে : "শাবরুমার পক্ষ থেকে লাব্বায়েক।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ?" সে বললো : না। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আগে নিজের হজ্জ করো। তারপর শাবরুমার হজ্জ করো। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

এটা অধিকাংশ আলেমের মত যে, যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ করেনি, অন্যের পক্ষ হতে হজ্জ করা তার জন্য শুদ্ধ হবেনা।

হজ্জ ফরয থাকা সত্ত্বেও হজ্জের মানত করা : ইবনে আব্বাস ও ইকরামা ফতোয়া দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের ওপর ফরয হজ্জের দায় অর্পিত থাকা সত্ত্বেও সেটি করার আগে মানত

করা হজ্জ আদায় করে, তার ফরয হজ্জ ও মানতের হজ্জ দুটোই আদায় হয়ে যাবে এবং দুটো থেকেই সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ইবনে উমর রা. এবং আতা ফতোয়া দিয়েছেন, সে প্রথমে ফরয হজ্জ এবং পরে মানতের হজ্জ আদায় করবে।

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা ও বিয়ে না করা ইসলামসম্মত নয় : ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইসলামে কারো চিরকুমার থাকা ও হজ্জবিহীন থাকা অনুমোদিত নয়।" অর্থাৎ হজ্জের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে জীবন কাটিয়ে দেয়া এবং খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদের অনুসরণে বিয়ে করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চিরকুমার থাকা ইসলামের অনুমোদিত রীতি নয়। এ হাদিস থেকে এই মতের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি হজ্জ করেনি সে অন্যের পক্ষে বদলী হজ্জ করতে পারেনা। এ ধরনের ব্যক্তি অন্যের পক্ষে বদলী হজ্জ করলে সেটি তার নিজের হজ্জে পরিগণিত হবে। সে নিজের ফরয থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে ও অব্যাহতি লাভ করবে। এভাবে হজ্জবিহীন না থাকার বিধান বাস্তবায়িত হবে। এটা আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত। কিন্তু মালেক ও ছাওরী বলেন : তার হজ্জ তার নিয়ত অনুযায়ী হবে। হাসান বসরী, আতা, নাখয়ী এবং আসহাবুর রায় (যুক্তিবাদী)দের অভিমতও তদ্রূপ।

হজ্জের জন্য ঋণ গ্রহণ : আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. বলেছেন : হজ্জ করেনি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি হজ্জের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারবে? তিনি বললেন : না। –বায়হাকি।

হারাম মাল দ্বারা হজ্জ : অধিকাংশ আলেমের মতে, হারাম সম্পদ দ্বারা হজ্জ করলে হজ্জ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তবে হজ্জকারি গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ বলেন : হজ্জ সম্পন্ন হবেনা। বস্তুত, এই মতটিই সর্বাধিক শুদ্ধ মত। কেননা সহীহ হাদিসে এসেছে : আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতিত কবুল করেননা। আর আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন কেউ হালাল সম্পদ দ্বারা হজ্জ করতে রওনা হয়ে যায় এবং পা'দানিতে পা রেখে বলে : "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা" (আমি উপস্থিত হে আল্লাহ আমি উপস্থিত) তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক বলে : আল্লাহ তোমার হজ্জ পুন:পুন: কবুল করেছেন। কেননা তোমার পাথেয় হালাল, তোমার বাহন হালাল, তোমার হজ্জ নিষ্কলুষ ও গুনাহমুক্ত। আর যখন কেউ হারাম সম্পদ দ্বারা হজ্জ করতে রওনা হয়ে যায় এবং পা'দানিতে পা রেখে বলে : লাব্বাইক, তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক বলে : আল্লাহ তোমার হজ্জ কবুল করবেননা। তোমার পাথেয় হারাম, তোমার সম্পদ হারাম, তোমার হজ্জ গুনাহ দ্বারা কলুষিত, এর কোনো প্রতিদান পাবেনা।

পদব্রজের না বাহনযোগের হজ্জ উত্তম : হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে লিখেছেন : ইবনুল মুনযির বলেছেন : পদব্রজে হজ্জ করা উত্তম, না বাহনযোগে হজ্জ করা উত্তম'-এ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। অধিকাংশের মতে, বাহনযোগে হজ্জ করা উত্তম। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এরূপ করতেন, তাছাড়া এতে দোয়া করা ও কাকুতি মিনতি করা অধিকতর সহজ হয় এবং এর উপকারিতাও অপেক্ষাকৃত বেশি। ইসহাক বিন রাহওয়াই বলেন : পদব্রজে হজ্জ করাই উত্তম। কারণ এতে কষ্ট বেশি। আবার একথাও বলা চলে যে ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে পদব্রজের হজ্জ ও বাহনযোগে হজ্জের মর্যাদা বিভিন্ন রকম হতে পারে। বুখারি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. জনৈক বৃদ্ধকে দেখলেন, তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে হজ্জ করছে। তিনি বললেন : এই ব্যক্তির কী হয়েছে? লোকেরা বললো : সে পদব্রজে হজ্জ করার মানত করেছে।

রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহর মহত্ত্ব ও মর্যাদার দাবি, তার মতো ধনী ব্যক্তি যেন নিজেকে কষ্ট না দেয়। তিনি উক্ত বৃদ্ধকে বাহনযোগে হজ্জ করার আদেশ দিলেন।

হজ্জের সময় হাজীদের পারস্পরিক বেচাকেনা, আয় রোজগার ও বিভিন্ন জিনিস ভাড়া দেয়া : হাজীরা হজ্জ ও ওমরা করার সময় পারস্পরিক ক্রয়বিক্রয়, ভাড়া দেয়া ও আয় রোজগার করলে কোনো ক্ষতি নেই। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা মিনা, আরাফা ও আরাফার পার্শ্ববর্তী যুল মাজায বাজারে হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন জিনিস কেনাবেচা করতো। কিন্তু তারা ভয় পেতো ইহরাম অবস্থায় বেচাকেনা করায় হজ্জের কোনো ক্ষতি হয় কিনা। এজন্যই আল্লাহ নাযিল করলেন : "তোমাদের কোনো দোষ নেই, যদি (হজ্জের মৌসুমে) আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো। (অর্থাৎ আয় রোজগার করো) –বুখারি, মুসলিম ও নাসায়ী। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : লোকেরা মিনায় বেচাকেনা করতোনা। অর্থাৎ গুনাহর ভয়ে ছেড়ে দিয়েছিল– এজন্য 'তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো।' এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে আরাফাত থেকে বলে যাওয়ার পর ব্যবসায় বাণিজ্য করার আদেশ দেয়া হলো। -আবু দাউদ। আবু উমামা তাইমী ইবনে উমর রা. কে বললেন : আমি হজ্জের সময় বাহন জন্তু ভাড়া দিয়ে থাকি। বিভিন্ন লোক আমাকে বলে : তোমার হজ্জ হবেনা। ইবনে উমর রা. তাকে বললেন : তুমি কি ইহরাম ও তালবিয়া করোনা? তুমি আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করোনা, আরাফাত থেকে রওনা হয়ে যাওনা এবং কংকর নিক্ষেপ করোনা? সে বললো : অবশ্যই করি। ইবনে উমর রা. বললেন : তাহলে তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয়েছে। ইবনে উমর আরো বললেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে তুমি যে ধরনের প্রশ্ন আমাকে করেছো, সে ধরনের প্রশ্ন করেছিল। তিনি কোনো জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ পর আয়াত নাযিল হলো : "তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি আল্লাহ অনুগ্রহ অন্বেষণ করো"। তখন রসূলুল্লাহ সা. ঐ লোকটাকে ডেকে আনতে বললেন। সে এলে তাকে এ আয়াত পড়ে শুনালেন এবং বললেন : তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয়েছে। –আবু দাউদ। ইবনে আব্বাস রা. কে এক ব্যক্তি বললো : আমি জনসাধারণের বিভিন্ন কাজ মজুরী নিয়ে করে দেই এবং তাদের সাথে হজ্জও করি। আমার কি সওয়াব হবে? ইবনে আব্বাস বললেন : হ্যাঁ, "তারা তাদের কৃতকর্মের ফলের ভাগ পাবে এবং আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী" -বায়হাকি, দার কুতনি।

৩. রসূলুল্লাহ সা.-এর হজ্জ

মুসলিম বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন বলেছেন : আমরা জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. এর কাছে গেলাম। তিনি সমবেত লোকদের হালহাকিকত জিজ্ঞাসা করলেন। এক পর্যায়ে আমাকেও জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম : আমি মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন। সংগে সংগে তিনি আমার মাথার দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন : হে ভাতিজা, তোমাকে স্বাগতম, কী জিজ্ঞাসা করতে চাও করো। তিনি তখন অন্ধ হয়ে গেছেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। তখন নামাযের ওয়াক্ত হলো। তিনি আমাদেরকে নামায পড়ালেন। তারপর আমি বললাম : আমাকে বলুন, রসূলুল্লাহ সা. কিভাবে হজ্জ করতেন? তখন তিনি হাত দিয়ে কথা বলতে লাগলেন। অর্থাৎ : হাত দিয়ে নয় গুণলেন। তারপর বললেন : রসূলুল্লাহ সা. হজ্জ না করেই মদিনায় নয়টি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। তারপর দশম বছরে ঘোষণা করা হলো, রসূলুল্লাহ সা. হজ্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঘোষণা হওয়া মাত্রই মদিনায় বহু লোক সমবেত হলো। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা, রসূলুল্লাহর সা. সাথে হজ্জ করবে। আমরা তাঁর সাথে সফরে বেরিয়ে যুল হুলায়ফাতে এলাম। এই সময়ে আবু বকর রা. এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন, যার নাম রাখা হলো মুহাম্মদ বিন

আবু বকর। তিনি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে দূত মারফত জানতে চাইলেন, এখন তিনি কী করবেন? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : গোসল করো, রক্তপাত থামানোর জন্য একটা প্রশস্ত কাপড় দিয়ে লজ্জাস্থান বন্ধ করে তার সামনের ও পেছনের দুই প্রান্ত বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধো। এরপর রসূলুল্লাহ সা. নামায পড়লেন। নামাযের পর তাঁর উটনী 'কাসওয়ার' পিঠে আরোহণ করলেন। তাঁর উটনী যখন তাঁকে নিয়ে চলা শুরু করলো, তখন মরু প্রান্তরে পৌঁছে আমি তাঁর সামনে, ডানে ও বামে ও পেছনে যতদূর চোখ যায় দৃষ্টি দিলাম, দেখলাম, বিপুল সংখ্যক লোক বাহনে আরোহণ করে ও পদব্রজে চলছে। রসূলুল্লাহ সা. আমাদের মাঝ দিয়ে চলছেন এবং তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছে। তিনি নাযিল হওয়া আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছেন। তিনি তদনুসারে যে রূপ আমল করেন, আমরাও তদ্রূপ আমল করে চলছি। তিনি উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তেন :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَاشَرِيْكَ لَكَ.

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার আহ্বানে উপস্থিত হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি, তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি, তোমার কোনো শরিক নেই, আমরা হাজির হয়েছি। সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত ও সাম্রাজ্য তোমারই। তোমার কোনো শরিক নেই।'

লোকেরা এই তালবিয়া সমস্বরে পড়তে লাগলো। রসূলুল্লাহ সা. তাদের তালবিয়ার কোনো অংশ ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন না। তিনি নিজের তালবিয়া পড়ছিলেন। জাবের রা. বলেন : আমরা হজ্জ ব্যতিত আর কিছু করতে চাইছিলাম না। আমরা ওমরা কী জিনিস তাও জানতামনা। অবশেষে যখন আমরা তাঁর সাথে কাবাগৃহে উপনীত হলাম, তখন তিনি রুকনে ইয়ামানীকে হাত দিয়ে ধরলেন, তিনবার রমল করলেন এবং স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন চারবার। তারপর মাকামে ইবরাহীমে গিয়ে পড়লেন : "তোমরা মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ো।" তিনি মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও পবিত্র কা'বার মধ্যস্থলে রাখলেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামায পড়লেন, তাতে সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূন পড়লেন তারপর রুকনে ইয়ামানীতে ফিরে এলেন, তা হাত দিয়ে ধরলেন, তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাফার দিকে চলে গেলেন।

অতপর যখন সাফার কাছাকাছি পৌঁছলেন, তখন বললেন : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ "সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্যতম।" তারপর বললেন : আল্লাহ সাফা দিয়ে শুরু করেছেন। আমিও সাফা দিয়ে শুরু করছি।" অতপর তিনি সাফা দিয়ে শুরু করলেন। সাফার উপর আরোহণ করলেন, সেখান থেকে কা'বা শরিফকে দেখতে পেলেন, কিবলার দিকে মুখ করলেন, আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করলেন ও আল্লাহু আকবার বললেন। তারপর বললেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ○

আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তারই, প্রশংসাও তাঁরই, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিজের কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুদলগুলোকে একাই পরাজিত করেছেন।" তারপর দোয়া করলেন। এভাবে তিনবার দোয়া করলেন : তারপর মারওয়ায় নামলেন। তারপর যখন বাতনুল ওয়াদীতে তার দু'পা দাঁড়ালো, তখন তিনি সাঈ করলেন। তারপর আমরা যখন আরোহণ করলাম, তখন তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। তারপর যখন মারওয়ায় এলেন, তখন সাফায় যা যা করেছিলেন তাই করলেন। মারওয়ায় শেষ চক্কর দেয়ার পর বললেন : আমি যেটা পরে করলাম তা যদি আগে করতাম তাহলে কুরবানির জানোয়ার নিয়ে আসতামনা এবং একে ওমরায় পরিণত করতাম। সুতরাং

তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানির জন্তু নেই, সে ইহরাম খুলে ফেলুক এবং একে ওমরায় পরিণত করুক। একথা শুনে খাসয়াম গোত্রের সুরাকা বিন মালেক উঠে দাঁড়ালো এবং বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., এ ব্যবস্থা কি শুধু এ বছরের জন্য, না চিরদিনের জন্য। তখন রসূল সা. তার এক হাতের আঙ্গুলের মধ্যে অপর হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে বললেন : হজ্জের মধ্যে ওমরা প্রবেশ করেছে দু'বার। না, বরং এটা চিরদিনের জন্য।"

আলী রা. রসূল সা. এর জন্য ইয়ামান থেকে কোরবানীর উটের পাল সাথে নিয়ে এসে রসূলুল্লাহর সা. সাথে হজ্জে শরিক হলেন। তখন আমরা ফাতেমা রা. কে ইহরাম খুলে ফেলতে ও রঙ্গীন পোশাক পরতে দেখলাম। তিনি চোখে সুরমাও লাগালেন। এতে আলী রা. অসন্তোষ প্রকাশ করলে ফাতেমা বললেন : আমার আব্বা আমাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন। পরবর্তী সময় আলী রা. ইরাকে বলতেন : ফাতেমা যে কাজ করেছে তা রসূল সা.কে জানানোর জন্য এবং রসূল সা. সম্পর্কে ফাতেমা যে কথা বলেছে, তা সঠিক কিনা জিজ্ঞাসা করার জন্য আমি রসূল সা. এর কাছে গিয়েছিলাম। আমি রসূলুল্লাহ সা.কে বললাম, ফাতেমার একাজ আমি অপছন্দ করেছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ফাতেমা ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে? তুমি যখন হজ্জের নিয়ত করেছো, তখন কী বলেছো? আলী রা. বলেন : আমি জবাব দিলাম, হে আল্লাহ, তোমার রসূল যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন, আমি সেই উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধছি। রসূল সা. বললেন : আমার সাথে তো কুরবানির জন্তু আছে। তাই আমরা ইহরাম, খুলবোনা। জাবের রা. বলেন : যে উটের পাল আলী পাঠিয়েছিলেন তাতে ছিলো একশো উট। এরপর সাহাবিগণ সবাই ইহরাম খুললেন এবং চুল ছেঁটে ফেললেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সা. ও যারা কুরবানির জন্তু এনেছিলেন তারা ইহরাম খুললেননা। জিলহজ্জ মাসের আট তারিখে সবাই মিনা অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। রসূল সা. উটে আরোহণ করেছেন এবং মিনায় গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা পড়লেন। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই সূর্য উঠলো। রসূল সা. নামেরায় তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপনের আদেশ দিলেন। এরপর রসূল সা. যাত্র করলেন। কুরাইশের কোনো সন্দেহ ছিলনা যে, রসূল সা. মাশআরিল হারামে (মুযদালিফার একটা পাহাড়) অবস্থান করবেন। যেমন কুরাইশরা জাহেলিয়াতের যুগে করতো।* অতপর রসূল সা. মুযদালিফা ছাড়িয়ে গিয়ে আরাফাতে পৌঁছালেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন নামেরায় তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতপর সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়লো, তখন তাঁর উট কাসওয়াকে আনতে আদেশ দিলেন এবং আরাফাতের ময়দান বাতনুল ওয়াদীতে পৌঁছলেন। সেখান থেকে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন :

"তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের জন্যে পবিত্র তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই শহর এবং তোমাদের এই মাস যেমন পবিত্র। জেনে রাখো জাহেলিয়াতের প্রতিটি জিনিস বাতিল, জাহেলিয়াতের সকল হত্যা বাতিল (অর্থাৎ প্রতিশোধ বাতিল), আমাদেরর সর্বপ্রথম যে হত্যার

* জাহেলিয়াত যুগে কুরাইশ মুযদালিফার পাহাড় মাশআরুল হামামে অবস্থান করতো এবং আরাফাতের ময়দান পর্যন্ত যেতোনা। অথচ অন্যান্য আরবরা মুযদালিফা অতিক্রম করে আরাফাতে গিয়ে অবস্থান করতো। কুরাইশ ভেবেছিল রসূল (সা.) তাদের অনুকরণপূর্বক মুযদালিফায় অবস্থান করবেন। কিন্তু তিনি মুযদালিফা অতিক্রম করে আরাফাতে গিয়ে অবস্থান করলেন। কেননা আল্লাহ বলেছেন : তোমরা সেই জায়গায় চলে যাও যেখানে সকল মানুষ গিয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ আচরণ যেখানে গিয়েছে অর্থাৎ আরাফাতে। কুরাইশ মুযদালিফায় অবস্থান করতো এজন্য যে মুযদালিফা হারামের আওতাধীন। তারা বড়াই করে বলতো : আমরা আল্লাহর হারাম শরিফের অধিবাসী। তাই আমরা এখান থেকে বাইরে যাবোনা।

প্রতিশোধ আমি বাতিল করছি তা হচ্ছে, রবিয়া ইবনুল হারেসের হত্যা। সে বনু সাদের দুধ পালিত ছিলো, হুযাইল তাকে হত্যা করেছিল। জাহেলিয়তের সুদ বাতিল। সর্বপ্রথম যে সুদ আমি বাতিল করছি, তা হচ্ছে, আমাদের সুদ, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এ সুদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর যিম্মাদারিতে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর বাণীর ভিত্তিতে তাদের লজ্জাস্থানকে তোমরা নিজেদের জন্য হালাল করেছ। এখন তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের বিছানায় অন্য কাউকে আসতে দেবেনা, যা তোমরা অপছন্দ করো। যদি তা করে, তাহলে তাদেরকে এতোটুকু প্রহার করতে পারো, যা কষ্টদায়ক না হয়। তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের সুব্যবস্থা করা তোমাদের কর্তব্য। তোমাদের কাছে আমি এমন একটা জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবেনা। তা হলো আল্লাহর কিতাব তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কী বলবে? লোকেরা বললো : আমরা সাক্ষ্য দেবো, আপনি আল্লাহর বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের শুভ কামনা করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ সা. তার তর্জনী আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে এবং পরক্ষণে তা জনতার দিকে ঘুরিয়ে তাদের প্রতি ইংগিত করে "হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো" তিনবার বললেন। তারপর আযান দেয়া হলো। তারপর ইকামত দেয়া হলো। তারপর তিনি যোহরের নামায পড়ালেন। তারপর পুনরায় ইকামত দেয়া হলো এবং আসরের নামায পড়ালেন। এ দুই নামাযের মাঝে আর কোনো নামায পড়লেন না।*

এরপর রসূলুল্লাহ সা. উটের ওপর আরোহণ করলেন, অবস্থান স্থলে পৌঁছলেন, তাঁর উটনী কাসওয়ার পেট পাহাড়গুলোর দিকে রাখলেন। সমবেত জনতা জমায়েত হওয়ার স্থানকে নিজের সম্মুখে রাখলেন এবং কিবলামুখি হলেন।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আরাফাতে অবস্থান করলেন, তারপর ক্রমান্বয়ে সূর্যের হলুদ রং মিলিয়ে গেলো এবং তিনি উসামাকে নিজের পেছনে বসালেন। রসূলুল্লাহ সা. উটনীকে ধাক্কা দিলেন। লাগাম জোরে টানলেন এবং ডান হাত উঁচিয়ে বললেন : হে জনমণ্ডলী, প্রশান্তি, প্রশান্তি।' যখন পথিমধ্যে কোনো পাহাড়ের কাছে পৌঁছেন, লাগামকে শিথিল করেন। এভাবে চলতে চলতে মুযদালিফায় এলেন। সেখানে এক আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন এবং এই দুই নামাযের মাঝে আর মাঝে কিছুই পড়লেন না। তারপর রসূল সা. শুয়ে পড়লেন। অবশেষে ভোর হলো এবং সকাল হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হওয়া এক আযান ও এক ইকামতে ফজরের নামায পড়ালেন। তারপর পুনরায় কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করলেন এবং মাশআরুল হারামে (মুযদালিফায়) পৌঁছে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লেন। ভোর পুরোপুরি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাশআরুল হারামে অবস্থান করলেন। যখন প্রভাত আরো উজ্জ্বল হলো, তখন সূর্য না উঠতেই উটনীকে ধাক্কা দিলেন এবং ফযলকে পেছনে বসালেন। ফযল ছিলেন খুবই সুদর্শন যুবক। রসূল সা. যখন উটনীকে যাত্রার সংকেতস্বরূপ ধাক্কা দিলেন তখন তার কাছ দিয়ে মহিলারা যেতে লাগলো এবং ফযল তাদের দিকে তাকাতে লাগলো। এ সময় রসূলুল্লাহ সা. তাঁর হাত ফযলের মুখের উপর রাখলেন। ফযল তৎক্ষণাৎ নিজের মুখ অন্যদিকে ফেরালো এবং দেখতে লাগলো। রসূল সা.

* এ থেকে প্রমাণিত হয়, আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে যোহর ও আছর একত্রিত করতে হবে। এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মাহর সর্বসম্মত মত রয়েছে। তবে এর কারণ কী তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও কতক শাফেয়ী ইমামের মতে, এর কারণ ইবাদতের বিধান। তবে শাফেয়ী ইমামগণের অধিকাংশের মতে, সফর সংক্রান্ত জটিলতাই এর কারণ।

পুনরায় তার মুখের উপর হাত রাখলেন এবং তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি বাতনে মুহাসসার এলেন। এবার উটকে সামান্য নাড়া দিলেন। তারপর তিনি মধ্যবর্তী রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন, যা বড় জামরার উপর দিয়ে বেরিয়েছে (অর্থাৎ আরাফাতে যাওয়ার সময় যে রাস্তা ব্যবহার করেছিলেন। তা থেকে ভিন্ন রাস্তা। ঈদের মতো আরাফাতেও যাওয়া ও আসার পথ ভিন্ন হওয়া সুন্নত)। তিনি গাছের নিকট অবস্থিত জামরায় পৌঁছলেন এবং তার প্রতি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি কংকর আল্লাহু আকবর বলে নিক্ষেপ করছিলেন এবং বাতনুল ওয়াদি থেকে নিক্ষেপ করছিলেন (অর্থাৎ মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফাকে ডান দিকে ও মক্কাকে বাম দিকে রেখে পাথর নিক্ষেপ করেন)। তারপর চলে গেলেন কুরবানির জায়গায়। সেখানে স্বহস্তে তেষট্টিটি জন্তু কুরবানি দিলেন। তারপর আলী রা.কে দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আলী রা. অবশিষ্ট কুরবানি দিলেন এবং রসূল সা. কে তার কুরবানিতে শরিক করলেন। তারপর প্রত্যেক উট থেকে খানিকটা গোশত নিয়ে ডেগচিতে করে রান্না করা হলো। রসূল সা. ও আলী রা. তার গোশত ও ঝোল খেলেন। এরপর রসূলুল্লাহ সা. উটে চড়লেন। পবিত্র কাবায় তাওয়াফে এফাযা করলেন এবং মক্কায় যোহরের নামায পড়লেন। তারপর বনু আব্দুল মুত্তালিবের কাছে এসে যমযমের পানি পান করালেন এবং বললেন, হে বনু আব্দুল মুত্তালিব, তোমরা বালতি ও রশি দিয়ে পানি তোলো। আমার যদি এ আশংকা না থাকতো যে, জনগণ যমযমের পানি পান করানোকে হজ্জের অংশ মনে করে ভিড় করবে এবং তোমাদেরকে পানি পান করানোর কাজ থেকে বিচ্যুত করবে, তাহলে আমি তোমাদের সাথে পানি তুলতাম ও পান করাতাম। কেননা এটা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এ সময় বনু আব্দুল মুত্তালিব রসূল সা. কে এক বালতি পানি দিলো এবং তিনি তা থেকে পান করলেন।"

আলেমগণ বলেছেন : এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল বিশাল হাদিস। কাযী ইয়ায বলেছেন : এ হাদিসে যে ফেকাহ সংক্রান্ত বিধিমালা রয়েছে, তার উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। এ হাদিস নিয়ে ইবনুল মুনযির একটি বিরাট গ্রন্থ লিখেছেন। যাতে দেড় শতাধিক ফিকহী বিধি রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : বিস্তারিত অনুসন্ধান চালালে আরো বেশি বিধি রচনা করা যেতো।

আলেমগণ বলেছেন : এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, (১) ইহরামের গোসল হায়েয ও নেফাসধারিণী মহিলাদের জন্যও সুন্নত, অন্যদের জন্যতো বটেই। (২) হায়েয ও নেফাসধারিণীদের রক্তস্রাব থেকে শরীর ও পোশাক পবিত্র রাখার জন্য যোনিমুখে বিশেষ ধরনের কাপড় বাঁধা উচিত। (৩) তাদের উভয়ের ইহরাম শুদ্ধ। (৪) ইহরাম ফরয বা নফল নামাযের পরে বাঁধা উচিত। (৫) ইহরামকারিকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তে হবে। (৬) রসূলুল্লাহ সা. যে তালবিয়া পড়তেন, তার মধ্যেই সীমিত থাকা উচিত। তবে কিছু বাড়ানোতে ক্ষতি নেই। যেমন উমর রা. বলতেন : হে অঢেল নিয়ামতের মালিক, হে চমৎকার অনুগ্রহের মালিক, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার ভয়ে উপস্থিত এবং তোমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উপস্থিত।" (৭) হাজী সাহেবের প্রথমে মক্কায় গিয়ে তওয়াফে কুদুম করা। (৮) তওয়াফের আগে হাজরে আসওয়াদ হাত দিয়ে ধরা। (৯) তওয়াফে কুদুমের প্রথম তিন চক্করে রমল করা অর্থাৎ উভয় রুকনে ইয়ামানীর বাইরে অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলা এবং তার পরে স্বাভাবিক গতিতে চলা। (১০) তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে গিয়ে আয়াত পাঠ করা : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى "মাকামে ইবরাহীমকে তোমরা নামাযের স্থান বানাও।" অত:পর মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও কাবা শরিফের মাঝে রেখে দু'রাকাত নামায পড়া উচিত। নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম।

(১১) হাদিসটি থেকে এও জানা গেলো যে, মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় যেমন হাজরে আসওয়াদ ধরা সুন্নত, তেমনি বের হবার সময়ও। আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, হাজরে আসওয়াদ ধরা সুন্নত। অনুরূপ, তওয়াফের পর সাঈ করবে, যা সাফা থেকে শুরু করবে এবং তার উপরে আরোহণ করবে। কিবলামুখি হয়ে অবস্থান করবে। আল্লাহর যিকর করবে। তিনবার দোয়া করবে। চিহ্নিত দুই স্তম্ভের মাঝে রমল করবে। এই রমল সাঈর সাত চক্করের সকল চক্করে করতে হবে। তওয়াফে কুদুমের মতো শুধু প্রথম তিন চক্করে নয়। সাফার ন্যায় মারওয়ারও উপরে আরোহণ করা চাই এবং যিকর ও দোয়া করা চাই। এগুলো সম্পন্ন করলেই ওমরা পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর চুল ছাঁটলে বা কামালে ইহরাম খুলে যাবে। সাহাবিগণও এভাবেই হজ্জ করেছেন। তাদেরকে হজ্জ ও ওমরা এক সাথে করতে রসূল সা. আদেশ দিয়েছেন। তবে যিনি হজ্জে কেরান করেন, তিনি চুল ছাঁটাইবেনও না, কামাবেনও না। তিনি ইহরাম অব্যাহত রাখবেন। তারপর যিনি উমরা আদায়ের পর ইহরাম খুলেছেন (অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ করার নিয়ত করেছেন) তিনি জিলহজ্জের অষ্টম দিনে ইয়াওমুত তারবিয়াতে হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধবেন। তিনি ও কেরান হজ্জকারী ইহরাম বেঁধে মিনায় যাবেন। মিনায় এই দিনের যোহর থেকে পরদিন ফযর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ও রাত যাপন করা সুন্নত। এটা জিলহজ্জের নবম রাত।

৯ই জিলহজ্জ আরাফা দিবস। এই দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়ে মিনা থেকে বের না হওয়া এবং সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার আগে আরাফাত ময়দানে প্রবেশ না করা সুন্নত। রসূলুল্লাহ সা. যোহর ও আসরের নামায পড়ার পর নামেরাতে অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যা আরাফাতের বাইরে অবস্থিত। এ দুই নামায পড়ার আগে তিনি আরাফার ময়দানের অবস্থান স্থলে প্রবেশ করেননি। এ দুই নামাযের মাঝখানে কিছু নামায পড়া এবং জনতাকে উদ্দেশ্য করে ইমাম সাহেবের খুতবা দেয়া সুন্নত। এটা হজ্জের অন্যতম সুন্নত খুতবা। দ্বিতীয় সুন্নত খুতবা হলো জিলহজ্জের সাত তারিখে যোহরের নামাযের পর কাবা শরিফের সামনে প্রদত্ত খুতবা। তৃতীয় সুন্নত খুতবা হলো কুরবানির দিনের খুতবা। চতুর্থ সুন্নত খুতবা হলো জিলহজ্জের তেরো তারিখের খুতবা।

হাদিসে আরাফাত সংক্রান্ত কিছু সুন্নত ও আদবের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে হলো :

- যোহর ও আসরের নামায পড়ার পর আরাফাতের ময়দানের অবস্থান স্থলে যাওয়া।
- আরাফাতে বাহনের ওপর অবস্থান করা উত্তম।
- টিলাগুলোর কাছে রসূল সা. এর অবস্থানের জায়গার নিকটে অবস্থান করা।
- কেবলামুখি হয়ে অবস্থান করা।
- সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা।
- অবস্থানকালে সর্বক্ষণ আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকা, বুক পর্যন্ত হাত তুলে দোয়া করা, সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর ধীরে ও শান্তভাবে আরাফাত থেকে প্রস্থান করা, অবস্থানকারী অন্যান্যরা যদি তার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে এসব কাজ করার আদেশ দেয়া।

মুযদালিফায় পৌঁছার পর যাত্রাবিরতি করা, মাগরিব ও এশা এশার ওয়াক্তে এক আযানে ও দুই ইকামতে পড়া এবং এ দুই নামাযের মাঝে কোনো নফল না পড়া। এ দুই নামায এক সাথে পড়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। মতভেদ রয়েছে শুধু তার কারণ সম্পর্কে। কারো মতে, এটা একটা ইবাদত। কারো মতে, সফরে থাকাই এর কারণ। মুযদালিফায় অবস্থানের অন্যতম সুন্নত হলো সেখানে রাত যাপন। এটা যে ইবাদত সে সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ

রয়েছে এটা সুন্নত না ওয়াজিব সে ব্যাপারে। আরেকটি সুন্নত হলো মুযদালিফায় ফজরের নামায পড়া, তারপর সেখান থেকে যাত্রা করা। যাত্রা করার পর মাশআরুল হারামে এসে যাত্রাবিরতি করা ও দোয়া করা। এখানে কিছু সময় অবস্থান করাও ইবাদত।

তারপর প্রভাত অত্যধিক উজ্জ্বল হওয়ার পর সেখান থেকে রওনা হওয়া। বাতনুল মুহাসসারে পৌঁছালে দ্রুত যাওয়া। কেননা ওটা আবরাহা বাদশার হাতিবাহিনীর ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হওয়ার স্থান। সেখানে থামাও উচিৎ নয়। ধীরে চলাও বাঞ্ছনীয় নয়।

তারপর যখন জামরাতুল আকাবাতে পৌঁছবে, তখন বাতনুল ওয়াদিতে অবস্থান করবে এবং জামরায় শীমের বীজের আকারের সাতটি নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করবে। নিক্ষেপ করার সময় প্রতিটিতে আল্লাহু আকবর বলবে।

তারপর সেখান থেকে কুরবানির জায়গায় যাবে এবং নিজের সাথে কুরবানির জন্তু থাকলে তা সেখানে কুরবানি করবে। কুরবানির পর মাথার চুল কামাবে। তারপর মক্কায় এসে তওয়াফে যিয়ারত করবে। এরপর তার জন্য ইহরাম দ্বারা যা কিছু হারাম হয়ে গিয়েছিল, তার সবই হালাল হবে, এমনকি স্ত্রী সহবাসও।

তবে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তওয়াফে যিয়ারত না করলে স্ত্রী সহবাস ব্যতীত আর সব কাজ হালাল হবে। এ হলো রসূল সা. এর হজ্জ। এ হজ্জ যে করবে তাকে এর অনুসরণ করতে হবে। কেননা রসূল সা. বলেছেন : "তোমাদের ইবাদত আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো।" তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণে হজ্জ সম্পন্ন করলেই সঠিক ও নিখুঁত হজ্জ হবে।

এবার হজ্জের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে আলেমদের মতামত ও সকল মযহাবের বিধি বিধান সর্বস্তরে আলোচনা করা যাচ্ছে।

৪. মীকাত

মীকাত দু'রকমের : সময়ের মীকাত ও স্থানের মীকাত।

সময়ের মীকাত : সময়ের মীকাত বলতে সেই সময়গুলোকে বুঝায় যে সময়ের মধ্যে হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক এবং সেই সময়ের বাইরে হজ্জের কোনো কাজ শুদ্ধ হবেনা। এর বিবরণ আল্লাহ কুরআন মজিদে দিয়েছেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَقَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ .

"ওরা তোমাকে চাঁদ মাসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, ওগুলো হচ্ছে মানুষের জন্য ও হজ্জের জন্য কর্মসূচি নির্ণয়ের সময়।" তিনি আরো বলেছেন : "হজ্জ হলো কয়েকটা নির্ধারিত মাস।" অর্থাৎ হজ্জের সময় কয়েকটা পরিচিত মাস।

আলেমগণ একমত যে, হজ্জের মাস দ্বারা শাওয়াল ও জিলকদ মাসকে বুঝানো হয়েছে। জিলহজ্জ মাস নিয়ে একটু মতভেদ রয়েছে। পুরো জিলহজ্জ মাসই হজ্জের সময়, না এর দশ দিন?

প্রথমটি ইমাম মালেকের এবং দ্বিতীয়টি ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, হানাফী, শাফেয়ী ও আলেমদের অভিমত। ইবনে হাযম মালেকের মতকে অগ্রগণ্য মনে করেন। তিনি বলেন, আয়াতে বলা হয়েছে : "কয়েকটা নিষিদ্ধ মাস।" বহুবচনে ব্যবহৃত কয়েকটা নির্দিষ্ট মাস দ্বারা দুই মাস বুঝানো সম্ভব নয়। তাছাড়া কংকর নিক্ষেপ হজ্জেরই অন্যতম কাজ, যা জিলহজ্জের আওতাধীন। এটা করা হয় জিলহজ্জ মাসের তের তারিখে। আর তওয়াফে যিয়ারত যা হজ্জের অন্যতম ফরয কাজ, এটাও সর্বসম্মতভাবে পুরো জিলহজ্জে মাসে করা যায়। সুতরাং

সময়ের মীকাত যে তিন মাস সে ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। উপরোক্ত মতভেদের ফলাফল প্রকাশ পাবে দশই জিলহজ্জের পরে সম্পাদিত হজ্জের কার্যকলাপে। যারা বলে পুরো জিলহজ্জ মাসই মীকাত, তাদের মতানুসারে এই বিলম্বের জন্য 'দম' দেয়া লাগবেনা। আর যারা বলে, জিলহজ্জের দশ তারিখ পর্যন্ত মীকাত সীমাবদ্ধ, তাদের মতানুসারে বিলম্বের জন্য দম দেয়া লাগবে।

হজ্জের মাসগুলো আসার আগে ইহরাম বাঁধা : ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, জাবের ও শাফেয়ীর মতে, হজ্জের মাসগুলোর বাইরে ইহরাম বৈধ হবেনা। (হজ্জের মাসগুলোর বাইরে হজ্জের ইহরাম বাঁধা হলে তা ওমরার ইহরামে গণ্য হবে- হজ্জের জন্য তা যথেষ্ট হবেনা।)

ইমাম বুখারি বলেছেন : ইবনে উমর রা. এর মতে, হজ্জের মাস হচ্ছে শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্জের প্রথম দশদিন। আর ইবনে আব্বাসের মতে, হজ্জের মাসগুলোতে ব্যতিত হজ্জের ইহরাম না করা সুন্নত। ইবনে জরির ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন : হজ্জের মাসগুলোতে ছাড়া হজ্জের ইহরাম বাঁধা বৈধ নয়।

হানাফি মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের মতে, হজ্জের মাসগুলোর আগমনের পূর্বে ইহরাম বাঁধা শুদ্ধ, কিন্তু মাকরূহ। শওকানি প্রথমোক্ত মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা হজ্জের কাজগুলো করার জন্য কয়েকটা পরিচিত মাসকে নির্দিষ্ট করেছেন। এই নির্দিষ্ট করার কারণে হজ্জের মাসগুলো আগমনের পূর্বে ইহরাম বাঁধা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ইহরাম হজ্জের একটা কাজ। যিনি দাবি করবেন যে, ঐ মাসগুলোর আগমনের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েয, তাকে তার এই দাবির পক্ষে অবশ্যই প্রমাণ দর্শাতে হবে।

স্থানের মীকাত : স্থানের মীকাত হলো সেসব স্থান, যেখান থেকে হজ্জ বা ওমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ইহরাম বাঁধতে হয় এবং ইহরাম ব্যতিত কোনো হজ্জযাত্রী বা ওমরা যাত্রীর সেই স্থান অতিক্রম করা জায়েয নয়। রসূলুল্লাহ সা. এই স্থানগুলোকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মদিনাবাসির মীকাত হচ্ছে যুলহুলায়ফা যা মক্কা থেকে ৪৫০ কি.মি. উত্তরে। সিরিয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন জুহফাকে, যা মক্কা থেকে ১৮৭ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এ জায়গাটা মক্কা থেকে ২০৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত রাবেগের কাছাকাছি অবস্থিত। জুহফার চিহ্ন মুছে যাওয়ার পর মিশরবাসী, সিরিয়াবাসী এবং মিশর ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে গমনাগমনকারীদের জন্য রাবেগই মীকাতে পরিণত হয়েছে। নাজদবাসীর মীকাত হলো কারনুল মানাযিল (মক্কার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটা পাহাড়, যেখান থেকে আরাফাত দেখা যায়। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ৯৪ কি. মি.)। আর ইয়ামানবাসীর মীকাত ইয়ালামলাম। মক্কার ৫৪ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত এটা একটা পাহাড়ের নাম। আর ইরাকবাসীর মীকাত যাতু ইরক। এটি মক্কা থেকে ৯৪ কি. মি. উত্তর পূর্বে অবস্থিত এটি জায়গা।

এ হচ্ছে রসূল সা. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্ধারিত মীকাতসমূহ। এ স্থানগুলো দিয়ে অতিক্রমকারী প্রত্যেকের জন্যই এগুলো নির্ধারিত, চাই তারা সেখানকার অধিবাসী হোক অথবা অন্য কোনো অঞ্চলের অধিবাসী হোক। (উদাহরণ স্বরূপ কোনো সিরিয়াবাসী যদি হজ্জ করতে ইচ্ছুক হয় এবং মদিনায় প্রবেশ করে তবে তার মীকাত হবে যুলহুলায়ফা। কেননা যুলহুলায়ফা হয়েই তাকে যেতে হবে। তার আসল মীকাত রাবেগে যাওয়া পর্যন্ত ইহরাম বিলম্বিত করা তার জন্য বৈধ হবেনা। যদি তা করে তবে গুনাহ হবে এবং অধিকাংশ আলেমের মতে তার ওপর 'দম' (কুরবানি) দেয়া ওয়াজিব হবে।) রসূল সা. দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : এই মীকাতগুলো এ

অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের মধ্য হতে এবং এ অঞ্চলগুলো দিয়ে যাতায়াতকারীদের মধ্য হতে যারা হজ্জ ও ওমরা করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য।" আর যদি কেউ এসব অঞ্চলের অধিবাসী না হয়েও হজ্জ বা ওমরার জন্য মক্কা যেতে ইচ্ছুক হয়, তবে সে এসব স্থান থেকে ইহরাম করবে। আর যে ব্যক্তি মক্কায় থাকে, তার মীকাত তার মক্কাস্থ বাসস্থান। হজ্জ করতে চাইলে সেখান থেকে ইহরাম করবে। আর ওমরা করতে চাইলে তার মীকাত হেরেম শরিফের সীমানার বাইরে। হারাম শরিফ থেকে বেরিয়ে তাকে সেখানে চলে যেতে হবে এবং ইহরাম করে আসতে হবে। অন্তত পক্ষে তাকে 'তানয়ীম' পর্যন্ত যেতে হবে। আর যে ব্যক্তি মক্কা ও মীকাতের মাঝখানে বাস করে তার বাসস্থানই তার জন্য মীকাত। ইবনে হাযম বলেন : যার মক্কা গমনের পথ এসব মীকাতের কোনো একটির মধ্য দিয়েও অতিক্রম করেনা, সে জলপথ বা স্থলপথের যে কোনো জায়গা থেকে ইহরাম করবে।

মীকাতের পূর্বে ইহরাম : ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত, যে ব্যক্তি মীকাতের পূর্বে ইহরাম করে, তার ইহরাম বৈধ। তবে মাকরূহ। কেননা সাহাবায়ে কেরামের উক্তি "রসূল সা. মদিনাবাসীর জন্য যুলহুলায়ফাকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন" এসব মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এবং এতে কোনো হেরফের ও কমবেশি করতে নিষেধ করে। কাজেই হেরফের যদি হারাম নাও হয়। তবে অন্তত তা বর্জন করা শ্রেয় অবশ্যই।

৫. ইহরাম

ইহরামের সংজ্ঞা : ইহরাম বলা হয় হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করাকে অথবা উভয়টার নিয়ত করাকে। এটা হজ্জের রুকন অর্থাৎ ফরয ও অবিচ্ছেদ্য অংগ। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .

"তাদেরকে শুধু এই আদেশই দেয়া হয়েছে যেন তারা একান্তভাবে আল্লাহর আনুগত্যের লক্ষ্যেই তাঁর ইবাদত করে।" আর রসূল সা. বলেছেন : নিয়ত দ্বারাই আমল স্থির হয়। প্রত্যেক মানুষ যা নিয়ত করে শুধু তাই পায়।" নিয়তের হাকীকত বা তাৎপর্য নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে (ওযু অধ্যায় দেখুন)। সেখানে বলা হয়েছে নিয়তের স্থান হলো মন। ইবনুল হুমাম বলেছেন : কোনো বর্ণনাকারী রসূল সা.কে একথা বলতে শোনেনি যে, আমি ওমরা বা হজ্জের নিয়ত করলাম।

ইহরামের জন্য কিছু নিয়ম বিধি বা আদব রয়েছে, যা মেনে চলা আবশ্যক। নিম্নে এই নিয়মবিধিগুলোর উল্লেখ করছি :

১. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা : নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, বোগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কামানো, ওযু বা গোসল করা। গোসল করাই উত্তম। আর দাড়ি ও মাথার চুল পরিচ্ছন্ন করা। এসব কাজ দ্বারাই পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হতে পারে। ইবনে উমর রা. বলেছেন : ইহরামের ইচ্ছা করলে এবং মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলে গোসল করা সুন্নত। -বাযযার, দার কুতনি, হাকেম।

ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হায়েয ও নেফাসধারিণীরা ইহরামের গোসলের নিয়তে গোসল করবে। এতেই তার ইহরাম করা ও হজ্জ বা ওমরার সকল কাজ করা বৈধ হবে। তবে হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাবা শরিফের তওয়াফ করতে পারবেনা। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি। (এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহদিস অবস্থায় ওযু প্রয়োজন এরূপ অপবিত্রাবস্থায় ইহরাম চলবে।

২. সেলাই করা কাপড় বর্জন ও ইহরামের দুটো কাপড় পরিধান করা। এই দুটো কাপড়ের একটি হলো, মাথা ব্যতীত দেহের ওপরের অর্ধাংশ আচ্ছাদনকারী চাদর এবং শরীরের নিম্নের অর্ধাংশ আচ্ছাদনকারী সেলাইবিহীন লুঙ্গি। দুটোই সাদা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সাদা কাপড় আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূল সা. ও তার সাহাবিগণ বাহন থেকে নামা, তেল ব্যবহার করা এবং চাদর ও লুংগি পরিধান করার পর রওনা হলেন। -বুখারি।

৩. শরীরে ও পোশাকে সুগন্ধি লাগানো। চাই ইহরামের পরেও তাতে তার প্রভাব অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক। কোনো কোনো আলেম এটা মাকরূহ মনে করলেও এ হাদিস তাদের অভিমত খণ্ডন করে। আয়েশা রা. বলেন : "ইহরাম অবস্থায় রসূল সা. এর চুলের সিঁথি সুগন্ধি দ্রব্যের কারণে যেভাবে চকচক করছিল, সে দৃশ্য যেনো আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি। -বুখারি, মুসলিম।

বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে আরো বর্ণনা করেন, ইহরামের পূর্বে আমি রসূল সা.কে ইহরামের জন্য এবং কংকর নিক্ষেপের পর তাঁর ইহরাম খোলার জন্য কা'বা শরিফের তওয়াফের পূর্বে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।' আয়েশা রা. বলেন : আমরা রসূল সা.-এর সাথে মক্কায় গিয়েছি, তখন ইহরামের সময় আমরা আমাদের কপালকে মেসক দ্বারা সুবাসিত করতাম। তারপর যখন আমাদের কেউ ঘর্মাক্ত হতো, তখন ঐ মেসক তার মুখমণ্ডল দিয়ে প্রবাহিত হতো। রসূল সা. তা দেখতেন। কিন্তু আমাদেরকে নিষেধ করতেন না। -আহমদ ও আবু দাউদ।

৪. দু'রাকাত নামায। ইহরামের সুন্নত হিসেবে নিয়ত করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর 'কাফেরুন' এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়বে।

ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূল সা. যুলহুলায়ফাতে দু'রাকাত নামায পড়তেন। -মুসলিম।

এ সময় ফরয নামায পড়লে আর কোনো নামায পড়ার প্রয়োজন হবেনা, যেমন মসজিদে প্রবেশ করেই কেউ ফরয নামায পড়লে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ার প্রয়োজন হয়না।

ইহরাম কয় প্রকার ও কি কি : ইহরাম তিন প্রকার : ১. কিরান, ২. তামাত্তু ও ৩. ইফরাদ। এই তিন প্রকারের ইহরামের সবকটাই সর্বসম্মত বৈধ।

আয়েশা রা. বলেছেন : বিদায় হজ্জের বছর আমরা রসূল সা.-এর সাথে বের হলাম। তখন আমাদের কেউবা ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে। কেউ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছে, আবার কেউ শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছে রসূল সা. শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলেন। যে ব্যক্তি শুধু ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, যা তার তওয়াফ কুদুম অর্থাৎ মক্কায় পৌঁছেই তওয়াফ করে ইহরাম মুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, অথবা হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছে, সে তাওয়াফে কুদুম দ্বারা ইহরামমুক্ত হয়নি। কেবল ১০ই জিলহজ্জ তারিখে কুরবানি ও চুল কামানোর মাধ্যমেই সে ইহরাম থেকে মুক্ত হতো।' -আহমদ, বুখারি, মুসলিম, মালেক।

কিরান ও তার অর্থ : মীকাত থেকে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের উদ্দেশ্য ইহরাম বাঁধা এবং তালবিয়ার সময়ে বলা : "লাব্বাইকা বিহাজ্জিন ওয়া উমরাতিন" (হজ্জ ও উমরা উভয়ের উদ্দেশ্যে বান্দা হাজির) এই ইহরামের কারণে ইহরামকারী হজ্জ ও ওমরার যাবতীয় কাজ করা পর্যন্ত ইহরামের অবস্থায় থাকা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

তামাত্তু ও তার অর্থ : হজ্জের মাসগুলোতে ওমরা করা ও ওমরা করার বছরেই হজ্জ সমাধা করার নাম তামাত্তু। একে তামাত্তু (উপকৃত হওয়া) নামকরণ করার কারণ হলো, এ পদ্ধতিতে

একজন ইহরামকারী একই বছরের হজ্জের মাসে হজ্জ ও ওমরা উভয় ইবাদত সমাধা করতে পারে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন না করেই। তাছাড়া ইহরামকারী ওমরা শেষে ইহরামমুক্ত হয়ে একজন সাধারণ মানুষের মতো সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে।

তামাত্তুর পদ্ধতি হলো, মীকাত থেকে শুধু ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে হয় এবং তালবিয়া পড়ার সময় বলতে হয় : লাব্বাইকা বি উমরাতিন" (ওমরার জন্য বান্দা হাজির)

এ ইহরামের ফলে ইহরামকারীকে মক্কায় পৌঁছা কা'বার তওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা (চক্কর দেয়া) চুল কামানো বা ছাঁটা, অতপর ইহরাম মুক্ত হওয়া এবং ইহরামের কাপড় খুলে স্বাভাবিক কাপড় পরা এবং যা কিছু ইতিপূর্বে ইহরাম দ্বারা তার উপর হারাম হয়েছিল, তা হালাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ইহরামের অবস্থায় থাকতে হয়। তারপর যখন ৮ই জিলহজ্জ সমাগত হয়, তখন মক্কা থেকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধতে হয়।

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আলেমের মতে, তামাত্তু হলো, এক ব্যক্তি কর্তৃক একই সফরে একই বছরের হজ্জের মাসগুলোতে হজ্জ ও ওমরা একসাথে করা এবং প্রথমে ওমরা করা। এই শর্তগুলোর একটিও বাদ পড়লে তামাত্তু হবেনা।

ইফরাদের অর্থ : হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তি কর্তৃক মীকাত থেকে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা এবং "লাব্বাইক বিহাজ্জ" (হজ্জের জন্য বান্দা হাজির) বলে তালবিয়া পড়ার নাম ইফরাদ। ইফরাদের ইহরামকারী হজ্জের যাবতীয় কাজ সমাধা হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকে। এরপর ইচ্ছা করলে সে ওমরা করতে পারবে।

তিন প্রকার ইহরামের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম : সর্বোত্তম ইহরাম কোন্‌টি তা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (আর এই মতভেদের কারণ হলো, রসূল সা. কোন্‌টি করেছেন তা নিয়ে মতভেদ। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, তিনি কিরান করেছেন। কেননা তিনি কুরবানির জন্তু সাথে নিয়ে গেছেন) শাফেয়ী মযহাবের মতে, ইফরাদ ও তামাত্তু কিরানের চেয়ে ভালো। কেননা তামাত্তু অথবা ইফরাদকারী হজ্জ ও ওমরা দুটোই পূর্ণাংগভাবে আদায় করতে সক্ষম। কিন্তু কিরানকারী শুধু হজ্জের কাজ আদায় করে থাকে। শাফেয়ীগণ আরো বলেছেন : তামাত্তু ও ইফরাদ সম্পর্কে দু'রকমের মত রয়েছে : একটি মত হলো : তামাত্তু ভালো। অপর মতে ইফরাদ ভালো। হানাফিগণ বলেন : তামাত্তু ও ইফরাদের চেয়ে কিরান ভালো। আর ইফরাদের চেয়ে তামাত্তু ভালো। মালেকীদের মতে, তামাত্তু ও কিরানের চেয়ে ইফরাদ ভালো। আর হাম্বলীদের নিকট তামাত্তু ও কিরান ইফরাদের চেয়ে ভালো। হাম্বলীদের মতটাই জনসাধারণের জন্য সহজতর ও অধিকতর নমনীয়। আর এটাই রসূল সা. নিজের জন্য কামনা করতেন এবং সাহাবিদেরকে করতে আদেশ দিতেন।

মুসলিম জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন, জাবের রা. বলেন : আমরা রসূলের সাহাবিরা শুধুমাত্র হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধতাম। রসূলুল্লাহ সা. জিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকালে এসে আমাদেরকে ইহরাম খোলার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন : হালাল হয়ে যাও এবং স্ত্রীদের কাছে যাও। তিনি এটাকে বাধ্যতামূলক করেননি। তবে স্ত্রীদেরকে স্বামীদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আমরা বললাম : আরাফা দিবসের মাত্র পাঁচদিন বাকি থাকতে আমাদেরকে এ রকম আদেশ কেন দেয়া হলো? আমরা আমাদের স্ত্রীদের কাছে যাবো। তারপর এমন অবস্থায় আরাফায় হাজির হবো যে আমরা তখনো অপবিত্র থাকবো। একথা শুনে রসূল সা. আমাদের সামনে এরূপ ভাষণ দিলেন : তোমরা তো জানো, আমি তোমাদের চেয়েও বেশি আল্লাহকে ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশি সত্যবাদী, তোমাদের চেয়ে বেশি পুণ্যবান! আমার সাথে যদি

কুরবানির জন্তু না থাকতো, তাহলে আমিও তোমাদের মতো ইহরামমুক্ত হয়ে যেতাম। আমি নিজের ব্যাপারে যদি শৈথিল্যকামী হতাম, তাহলে সাথে করে কুরবানির জন্তু আনতামনা। সুতরাং তোমরা ইহরাম খোলো। অতএব আমরা ইহরাম খুললাম এবং আদেশ শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।

সাধারণভাবেও ইহরাম বাঁধা জায়েয : যে ব্যক্তি ইহরামের এই প্রকারভেদ ও বিশদ বিবরণ না জানার কারণে এই তিন ধরনের ইহরামের কোনো একটির নাম উল্লেখ ছাড়াই কেবল আল্লাহর অর্পিত ফরয আদায়ের নিয়ত করে সাধারণভাবে ইহারাম বাঁধে, তার ইহরাম বৈধ ও শুদ্ধ হবে। আলেমগণ বলেন : কেউ যদি শুধু অন্যদের দেখাদেখি ইবাদতের নিয়তে ইহরাম বাঁধে ও তালবিয়া পড়ে, কোনো নাম উল্লেখ না করে এবং মনে মনেও কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ইহরামের চিন্তা না করে, ইফরাদ, কিরান বা তামাত্তু কোনোটারই উল্লেখ না করে, তার হজ্জও শুদ্ধ হবে। সে এই তিনটের যে কোনো একটা করতে পারে।

কিরান ও তামাত্তুকারীর তওয়াফ ও সা'ঈ এবং হারাম শরিফবাসীর জন্য শুধুই ইফরাদ : ইবনে আব্বাসকে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন : বিদায় হজ্জে আনসার, মুহাজির ও রসূলুল্লাহ সা. এর স্ত্রীগণ ইহরাম বাঁধলেন। আমরাও ইহরাম বাঁধলাম। যখন মক্কায় উপস্থিত হলাম, তখন রসূল সা. বললেন : হজ্জের জন্য কৃত তোমাদের ইহরামকে ওমরার জন্যও ইহরামে পরিণত করো। তবে যে ব্যক্তি কুরবানির জন্তুর সাথে করে নিয়ে এসেছে, তার কথা আলাদা। আমরা আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করলাম, সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করলাম; স্ত্রীদের কাছে গেলাম ও পোশাক পরলাম। রসূল সা. বললেন : যে ব্যক্তি কুরবানির জন্তু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, সে উক্ত জন্তু কুরবানির নির্দিষ্ট জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত ইহরামমুক্ত হবেনা। তারপর ৮ই জিলহজ্জের সন্ধ্যায় আমাদেরকে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে আদেশ দেয়া হলো। হজ্জের কাজগুলো সমাধা করার পর আমরা মক্কায় এলাম এবং কা'বার তওয়াফ করলাম ও সাফা মারওয়ার সা'ঈ করলাম। এ পর্যন্ত আমরা হজ্জ সমাধা করলাম এবং আমাদের ওপর কুরবানির হুকুম অবশিষ্ট রইল। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ.

"যে ব্যক্তি ওমরা দ্বারা হজ্জ পর্যন্ত উপকৃত হয়, সে যেন সাধ্যমত কুরবানি করে। যে ব্যক্তি কুরবানি করতে অক্ষম হয়, সে যেন হজ্জের দিনগুলোতে তিন দিন এবং দেশে ফিরে সাত দিন রোযা রাখে।" কুরবানির জন্য ছাগল যথেষ্ট। অতপর তারা এক বছরে দুটো ইবাদত হজ্জ ও ওমরা সমাধা করলেন। আল্লাহ তায়ালা এটা তাঁর কিতাবে ও রসূলের সুন্নতে নাযিল করেছেন আর মক্কাবাসী ব্যতিত সকল মানুষের জন্য বৈধ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন :

ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

"এ ব্যবস্থা তাদের জন্য, যাদের পরিবার পরিজন মসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়।" আর যে মাসগুলোকে আল্লাহ হজ্জের মাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তা হলো শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্জ। এই মাসগুলোতে যে ব্যক্তি তামাত্তু করবে তার উপর কুরবানি অথবা রোযার হুকুম রয়েছে। -বুখারি।

১. এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হারাম শরিফের অধিকবাসীদের জন্য তামাত্তু ও কিরান কোনোটাই নয়। তারা হজ্জ করলেও ইফরাদ ওমরা করলেও ইফরাদ করবে। (তবে মালেক,

শাফেয়ী ও আহমদের মতে, মক্কাবাসী তামাত্তু ও কিরান করতে পারে। এটা তাদের জন্য মাকরূহ নয়।)

এটা ইবনে আব্বাস ও আবু হানিফার মত। তারা উপরোক্ত আয়াতের বরাত দিয়ে থাকেন। মসজিদুল হারামের অধিবাসী বলতে কি বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মালেকের মতে, তারা মক্কাবাসী। তাহাবি এই মতকে অগ্রাধিকার দেন। ইবনে আব্বাস ও তাউস প্রমুখের মতে, এর অর্থ হারাম শরিফ থেকে কসর আদায় করতে হয় যত দূরত্বে তন্মধ্যে ন্যূনতম দূরত্বের অধিবাসী। ইবনে জারির এই মত সমর্থন করেছেন। হানাফীদের

মতে, যার পরিবার পরিজন মীকাত বা তার চেয়ে কম দূরে অবস্থান করে। উল্লেখ্য যে, বসবাসের স্থানই ধর্তব্য, জন্মস্থান নয়।

হাদিস থেকে এ-ও জানা যায় যে, তামাত্তুকারীকে সর্বপ্রথম ওমরার জন্য তওয়াফ ও সাঈ করতে হবে। এতে তার তওয়াফে কুদুমের প্রয়োজন থাকবেনা। এরপর আরাফায় অবস্থানের পর তওয়াফে যিয়ারত ও তারপর সা'ঈ করতে হবে।

কিরান সম্পর্কে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, তার জন্য হজ্জের কাজগুলোই যথেষ্ট। তাকে আরাফায় অবস্থানের পর শুধু একবার তওয়াফে যিয়ারত করতে হবে এবং একবার সাঈ করতে হবে। এই এক তওয়াফ ও এক সাঈ তার হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য যথেষ্ট। যেমন, ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (পার্থক্য শুধু এই যে, কিরানে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়ত করতে হয়। আর ইফরাদে শুধু হজ্জের।)

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধে, তার জন্য এক তওয়াফ ও এক সা'ঈ যথেষ্ট। -তিরমিযি।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধে, তার জন্য এক তওয়াফ ও এক সা'ঈ যথেষ্ট। -তিরমিযি।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. আয়েশাকে বলেছেন : তোমার কা'বায় এবং সাফা ও মারওয়ার তওয়াফ তোমার হজ্জ ও ওমরার জন্য যথেষ্ট।

আবু হানিফার মতে, হজ্জ ও ওমরার জন্য দুটো করে তওয়াফ ও সা'ঈ জরুরি। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটি অগ্রগণ্য। কেননা তার প্রমাণ অধিকতর শক্তিশালী।

এ হাদিস থেকে আরো জানা যাচ্ছে, কিরান ও তামাত্তুকারী উভয়ের কুরবানি করা জরুরি।

অন্ততপক্ষে একটা ছাগল কুরবানি করতে হবে। এটা করতে অক্ষম হলে হজ্জের ভেতরে তিনটে রোযা এবং দেশে ফিরে আসার পর সাতটা রোযা রাখতে হবে। হজ্জের সময়ে যে তিনটে রোযা রাখতে হবে, তা আরাফার দিনের আগে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে রাখা উত্তম। কোনো কোনো আলেম, যথা তাউস ও মুজাহিদ, শাওয়ালের শুরুতে রাখাও বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। ইবনে উমরের রা. মতে এই তিন রোযা এভাবে রাখা উচিত : ৮ই জিলহজ্জের আগে এক দিন, ৮ই জিলহজ্জ এবং ৯ই জিলহজ্জ। একদিন যদি রোযা না রাখে অথবা ঈদের আগে এর অংশ বিশেষ রাখে, তবে তার জন্য আইয়ামে তাশরিকে বাকি রোযাগুলো রাখা বৈধ। কেননা আয়েশা রা. ও ইবনে উমর রা. বলেছেন : আইয়ামে তাশরিকে রোযা রাখা জায়েয নেই। তবে যে ব্যক্তি কুরবানি দিতে পারেনা তার জন্য জায়েয। -বুখারি।

আর যখন হজ্জের ভেতরে তিনটি রোযা রাখা সম্ভব হয়না, তখন তা পরে কাযা করতে হবে। অবশিষ্ট সাত রোযা দেশে ফিরে এসে রাখতে হবে। কেউ বলেন : নিজের কাফেলার কাছে ফিরলে রাখা যাবে। শেষোক্ত মতানুসারে পথিমধ্যেই রোযা রাখা জায়েয। এই দশটা রোযা

এক নাগাড়ে রাখা জরুরি নয়। আর যখন নিয়ত করবে ও ইহরাম করবে, তখন তাকে তালবিয়া পড়তে হবে।

৬. তালবিয়া : (লাব্বাইকা বলা)

তালবিয়া সংক্রান্ত বিধান : আলেমগণ একমত যে, তালবিয়া হজ্জের একটি শরয়ী বিধান। উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : হে মুহাম্মাদের বংশধর, তোমাদের মধ্যে য ব্যক্তি হজ্জ করবে, সে যেন তার হজ্জে তালবিয়া পড়ে। -আহমদ, ইবনে হিববান। (যমখশারীর মতে, লাব্বাইকা শব্দের অর্থ হলো, বান্দা সর্বক্ষণ তোমার আনুগত্যে বহাল আছে)

শরিয়তে লাব্বাইকা বলা কতখানি জরুরি, কোন্ সময় বলতে হয় এবং বিলম্বিত হলে কী হবে, ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী ও আহমদের মতে এটা সুন্নত এবং ইহরামের সাথে সাথে এটা বলা মুস্তাহাব। কেউ যদি হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করে এবং তালবিয়া উচ্চারণ না করে, তবে তার হজ্জ ও ওমরা শুদ্ধ হবে। কোনো কাফফারা ইত্যাদি তাকে দিতে হবেনা। কেননা শাফেয়ী ও আহমদের মতে, ইহরাম শুধু নিয়ত দ্বারাও শুদ্ধ হয়।

হানাফিদের মতে, তালবিয়া বা তার স্থলাভিষিক্ত বা তার কাছাকাছি অর্থবোধক দোয়া বা তাসবীহ এবং কুরবানির জন্তু নিয়ে যাওয়া ইহরামের অন্যতম শর্ত। তাই তালবিয়া বা তাসবীহ ব্যতীত এবং কুরবানির জন্তু ব্যতিত ইহরাম শুদ্ধ হয়না। হানাফীদের এই উক্তির ভিত্তি এই যে, তাদের নিকট ইহরাম হচ্ছে নিয়ত ও হজ্জের কোনো একটা কাজের সমন্বিত রূপ। তাই যখন কেউ ইহরামের নিয়ত করবে এবং হজ্জের কোনো না কোনো কাজ করবে, যেমন তাসবীহ বা তালবিয়া পড়বে অথবা তালবিয়া না পড়ে কুরবানির জন্তু সাথে নিয়ে যাবে, তখন তার ইহরাম বাঁধার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে তালবিয়া পড়া বাদ দেয়ার কারণে দম (কুরবানি) দিতে হবে। মালেকী মাযহাবের সুপরিচিত মত হলো, তালবিয়া পড়া ওয়াজিব। তালবিয়া ত্যাগ করা বা ইহরামের অব্যবহিত পর তালবিয়া না পড়ায় যার কুরবানি দেয়া সামর্থ্য আছে তার ওপর কুরবানি দেয়া ওয়াজিব।

তালবিয়ার ভাষা : ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. এর তালবিয়া ছিলো এরূপ :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَاشَرِيْكَ لَكَ.

নাফে বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এতে সংযোজন করতেন : লাব্বাইকা, লাব্বাইকা, লাব্বাইকা, ওয়া সাদাইকা, ওয়াল খাইরু বিয়াদাইকা, লাব্বাইকা ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু।" আলেমগণ রসূল সা. এর তালবিয়ার মধ্যে তালবিয়াকে সীমিত রাখা মুস্তাহাব মনে করেন। এর ওপর অতিরিক্ত ভাষা সংযোজনে তাদের মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, সংযোজনে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা ইবনে উমর রা. সহ বহু সাহাবি সংযোজন করতেন, রসূল সা. তা শুনেও কিছু বলতেন না। -আবু দাউদ, বায়হাকি।

মালেক ও আবু ইউসুফ রসূল সা. এর তালবিয়ার ওপর সংযোজনকে মাকরূহ মনে করেন।

তালবিয়ার ফযীলত : ইবনে মাজাহ্ জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : কোনো ইহরামকারী যদি পুরো দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত তালবিয়া পড়ে কাটিয়ে দেয়, তবে তার গুনাহগুলো উধাও হয়ে যায়। ফলে সে সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।

তাবারানি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : কোনো

তালবিয়াকারী তালবিয়া করলেই সুসংবাদ পায় এবং কোনো তকবীরদাতা তকবীর দিলেই (আল্লাহু আকবর বললে) সুসংবাদ পায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূলুল্লাহ, বেহেশতের সুসংবাদ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

সাহল বিন সাদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কোনো মুসলমান তালবিয়া পড়লে তার ডানে ও বামে যতো গাছ, পাথর বা নুড়িপাথর আছে, সবাই তার সাথে সাথে তালবিয়া পড়ে, যতক্ষণ না পৃথিবী এখান থেকে আর এখান থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। -ইবনে মাজাহ, বায়হাকি, তিরমিযি ও হাকেম।

তালবিয়া উচ্চস্বরে পড়া মুস্তাহাব : যায়দ বিন খালেদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : আমার কাছে জিবরীল এসেছে এবং বলেছে : আপনার সাথিদেরকে আদেশ দিন উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়ুক। এটাই হজ্জের নিদর্শন। -ইবনে মাজাহ, আহমদ, ইবনে খুযায়মা ও হাকেম।

আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কি ধরনের হজ্জ উত্তম? তিনি বললেন : উচ্চস্বরে তালবিয় পড়া ও জন্তু কুরবানি করা হয় যে হজ্জে। -তিরমিযি, ইবনে মাজাহ।

আবু হাযেম বলেন : রসূল সা.এর সাহাবিগণ যখন ইহরাম বাঁধতেন, তখন রওহা পর্যন্ত পৌঁছাতে না পৌঁছতেই তাদের আওয়াজ প্রচণ্ড আকার ধারণ করতো। এসব হাদিসের ভিত্তিতে অধিকাংশ আলেম উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া পছন্দ করেন।

ইমাম মালেক বলেছেন : ছোট ছোট মসজিদগুলোতে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া হবেনা। শুধু নিজেকে শুনানো যথেষ্ট। কেবল মিনার মসজিদ ও মসজিদুল হারামে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বে। এ হলো পুরুষদের জন্য।

মহিলারা এমনভাবে তালবিয়া পড়বে যে, সে নিজে ও পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি শুধু শুনতে পাবে। এর চেয়ে জোরে পড়া মাকরূহ। আতা বলেন : পুরুষরা উচ্চস্বরে ও মহিলারা শুধু নিজেকে শুনিয়ে তালবিয়া পড়বে।

যেসব ক্ষেত্রে তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব : বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অবস্থায় তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব। যেমন বাহনে আরোহণের সময়, বাহন থেকে নামার সময় যখনই কোনো উচ্চ জায়গায় আরোহণ করা হয়, কোনো নিচু জায়গায় অবতরণ করা হয়, কিংবা কোনো আরোহীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। প্রত্যেক নামাযের শেষে এবং শেষ রাতে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, সর্বাবস্থায় এটা পড়া মুস্তাহাব।

তালবিয়ার সময় : ইহরামকারী ইহরামের সময় থেকেই তালবিয়া পড়া শুরু করবে এবং কুরবানির দিনের সর্বশেষ জামরাতুল আকাবায় প্রথম কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখবে। প্রথম কংকরের পর তালবিয়া বন্ধ করবে। কেননা রসূল সা. জামরায় পৌঁছা পর্যন্ত ক্রমাগত তালবিয়া পড়তেন। -সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

এটা হানাফী, শাফেয়ী, ছাওরী ও অধিকাংশ আলেমের অভিমত।

আহমদ ও ইসহাক বলেন : সবকটা কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়বে, তারপর বন্ধ করবে। মালেক বলেন : আরাফার দিন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়া পর্যন্ত তালবিয়া পড়বে, তারপর বন্ধ করবে। এ হচ্ছে হজ্জের ক্ষেত্রে। কিন্তু ওমরাকারী হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়বে। কেননা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. ওমরায় তালবিয়া পড়া বন্ধ করতেন হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময়। -তিরমিযি।

অধিকাংশ আলেম এর ওপরই আমল করতেন*

তালবিয়ার পর রসূল সা.-এর প্রতি সালাত পাঠ এবং দোয়া করা : কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর থেকে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তির তালবিয়া পড়া শেষ হলে রসূল সা.-এর প্রতি সালাত বা দরূদ পড়া মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ সা. তালবিয়ার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও তার সন্তোষ চাইতেন এবং খারাপ মানুষ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। -তাবারানি।

৭. মুহরিমের জন্য যেসব কাজ বৈধ :

১. গোসল করা ও ইহরামের কাপড় বদলানো : ইবরাহিম নাখয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের ইমামগণ যখন মাইমুনের কূয়ার কাছে আসতেন, তখন গোসল করতেন এবং ভালো পোশাক পরতেন। ইবনে আব্বাস জুহফার গোসলখানায় যখন প্রবেশ করতেন, তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। তাকে বলা হলো : আপনি ইহরাম অবস্থায় গোসলখানায় ঢুকছেন? তিনি বললেন : আল্লাহ তায়ালার আমাদের শরীরের ময়লা ও আবর্জনার প্রয়োজন নেই।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, ইহরামকারী গোসল করবে এবং নিজের কাপড় ধৌত করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে হুনাইন বলেন : ইবনে আব্বাস ও মিসওয়ার আবওয়াতে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। ইবনে আব্বাস বললেন : ইহরামকারী তার মাথা ধুয়ে ফেলবে। মিসওয়ার বললেন : ইহরামকারী মাথা ধুবেনা। এরপর ইবনে আব্বাস আমাকে আবু আইয়ুব আনসারীর কাছে পাঠালেন। তাকে দেখলাম, পুকুরের দুই প্রান্তের মাঝে গোসল করছেন এবং একটা কাপড় নিয়ে চলেছেন। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন : তুমি কে? আমি বললাম, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে হুনাইন। ইবনে আব্বাস আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, রসূল সা. ইহরামে থাকা অবস্থায় কিভাবে গোসল করতেন? আবু আইয়ুব কাপড়ের উপর হাত রাখলেন এবং তা মাথার ওপর থেকে সরালেন। ফলে তার মাথা আমার সামনে উন্মোচিত হলো। তারপর বললেন : মানুষ মাত্রেই নিজের গায়ে পানি ঢালে। আমি ঢালছি। এই বলে তিনি মাথায় পানি ঢাললেন। তারপর নিজের হাত দ্বারা মাথা রগড়ালেন। হাত একবার সামনে একবার পেছনে নিলেন। তারপর বললেন : রসূল সা. কে এভাবেই গোসল করতে দেখেছি। -তিরমিযি ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

বুখারি তাঁর বর্ণনায় সংযোজন করেছেন : এরপর আমি ইবনে আব্বাস ও মিসওয়ারের কাছে ফিরে গেলাম। তখন মিসওয়ার ইবনে আব্বাসকে বললেন : আমি আর কখনো আপনার সাথে তর্ক করবোনা। শওকানি বলেছেন, এ হাদিস প্রমাণ করে যে, ইহরামকারীর জন্য গোসল করা বৈধ। গোসলের সময় হাত দিয়ে মাথা ঢাকাও জায়েয। ইবনুল মুনযির বলেছেন : ইহরামকারীর বীর্যপাতজনিত অপবিত্রাবস্থা হলে গোসল করা ওয়াজিব- এ ব্যাপারে সবাই একমত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থায় গোসল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর স্বপ্নদোষ হওয়া ছাড়া আর কোনো কারণে ইহরাম অবস্থায় মাথা ধুতেননা। মালেক থেকে বর্ণিত : ইহরামকারীর জন্য পানিতে মাথা ডুবিয়ে দেয়া মাকরূহ। ময়লা পরিষ্কারের সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করা বৈধ। শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে গোসলা করা ইহরামকারীর জন্য বৈধ। অনুরূপ, চুলের বেণি বা খোপা ভাংগা ও চিরুনী দেয়া জায়েয। রসূল সা. আয়েশা রা. কে বলেছিলেন, তোমার চুলের গোছা ভাংগ এবং চিরুনী করো। -মুসলিম।

---

* তিরমিযি বলেছেন : মীকাত থেকে ইহরাম করলে হারাম শরিফে প্রবেশ করা মাত্র তালবিয়া বন্ধ করবে। আর জারানা বা তানয়ীম থেকে ইহরাম করলে মক্কার আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করা মাত্র তালবিয়া বন্ধ করবে।

নববী বলেন : আমাদের মতে চুলের গোছা ভাংগা ও চিরুনী দেয়া ইহরামকারীর জন্য বৈধ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো কোনো চুল উপরে না যায়। তবে বিনা ওযরে চিরুনী দেয়া মাকরূহ। তবে নিজের মালপত্র মাথায় বহন করায় দোষ নেই।

২. খাটো পাজামা পরা : বুখারি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি (আয়েশা) ইহরামকারীর জন্য খাটো পাজামা পরায় কোনো দোষ আছে বলে মনে করতেন না। (এটা আয়েশা রা.–এর নিজস্ব মত। অধিকাংশের মত এই যে, (সেলাই করা পোশাক হিসেবে) পাজামা ও খাটো পাজামায় কোনো পার্থক্য নেই। দুটোই ইহরামকারীর জন্য নিষিদ্ধ। ফাতহুল বারী)

৩. মুখ ঢাকা : শাফেয়ী ও সাঈদ বিন মানসুর কাসেম থেকে বর্ণনা করেছেন : উসমান রা. যায়দ বিন ছাবেত ও মারওয়ান ইহরাম অবস্থায় মুখ ঢাকতেন। তাউস বলেন : ধুলাবালি থেকে রক্ষা পেতে ইহরামকারী মুখ ঢাকতে পারবে। মুজাহিদ বলেছেন : ইহরাম অবস্থায় প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলে সাহাবিগণ মুখ ঢেকে চলতেন। কেউ এতে আপত্তি করতেন না।

৪. নারীর জন্য মোজা পরা : আবু দাউদ ও শাফেয়ী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল সা. মহিলাদের জন্য মোজা পরার অনুমতি দিয়েছেন।

৫. ভুলক্রমে মাথা ঢাকা : শাফেয়ীগণ বলেন : কেউ যদি ভুলক্রমে মাথা ঢাকে অথবা ভুলক্রমে জামা পরে, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আতা বলেন; তার কোনো কাফফারা ইত্যাদি দিতে হবেনা। তবে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। হানাফীগণের মতে, তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। না জেনে অথবা ভুলক্রমে সুগন্ধি ব্যবহার করলেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ীদের মূলনীতি হলো অজ্ঞতা ও ভুল যে কোনো নিষিদ্ধ কাজে ওযর হিসেবে গণ্য। যার কারণে কোনো ফিদিয়া দিতে হয়না। তবে তাতে যদি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় যেমন শিকার করা অথবা চুল কামানো ও নখ কাটা, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

৬. রক্ত মোক্ষণ, ফোড়া ফুটো করা, দাঁত ফেলা ও রগ কাটা : রসূল সা. ইহরাম অবস্থায় মাথার মাঝখানে রক্ত মোক্ষণ করিয়েছিলেন। এর প্রমাণ আছে।*

মালেক বলেন : প্রয়োজনে ফোড়ায় ছিদ্র করা, ক্ষতস্থান বাঁধা ও রগ কাটাতে ক্ষতি নেই।
ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : ইহরামকারী দাঁত ফেলতে ও ফোড়া ফাটাতে পারে।

নববী বলেছেন : ইহরামকারী যদি বিনা প্রয়োজনে রক্ত মোক্ষণ করাতে চায়, তবে দেখতে হবে তাতে চুল কাটা জড়িত হয় কিনা। যদি হয় তার এ ধরনের রক্ত মোক্ষণ চুল কাটা জড়িত হওয়ার কারণে হারাম। তা না হলে অধিকাংশ আলেমের মতে হারাম নয়। কিন্তু মালেকের মতে মাকরূহ। হাসানের মতে চুল কাটা জড়িত না হলেও এজন্য ফিদিয়া দিতে হবে। যদি রক্ত মোক্ষণ জরুরি হয়ে থাকে তাহলে চুল কাটা ঠিক হবে। কিন্তু ফিদিয়া দিতে হবে। যাহেরী মযহাবের মতে শুধুমাত্র মাথার চুল কাটা পড়লে ফিদিয়া দিতে হবে।

৭. মাথা ও শরীর চুলকানো : আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : তাকে ইহরামকারী শরীর চুলকাতে ও রগড়াতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : হ্যাঁ, বরং ভালোভাবে চুলকানো ও রগড়ানো উচিত। বুখারি, মুসলিম ও মালেক। মালেক সাংযোজন করেছেন : আয়েশা বলেন : যদি আমার হাত বেঁধে রাখা হতো তাহলে আমি পা দিয়ে চুলকাতাম ও রগড়াতাম। ইবনে আব্বাস, জাবের সাঈদ, আতা, ও ইবরাহিম নাখয়ী থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

---

* ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : চুলের অংশ বিশেষ কামানো ছাড়া রক্ত মোক্ষণ করা সম্ভব নয়।

৮-৯. আয়না দেখা ও সুগন্ধি শুঁকা : বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : ইহরামকারী সুগন্ধি শুঁকতে পারবে, আয়নাও দেখতে পারবে এবং তেল ও ঘি খাওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারবে।

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রা. থেকে বর্ণিত, তিনি ইহরাম অবস্থায় আয়না দেখতেন এবং মেসওয়াক করতেন।

ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলেমগণ একমত যে, ইহরামকারীর জন্য তেল, চর্বি ও ঘি খাওয়া বৈধ এবং সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মাখানো অবৈধ। আর হানাফীদের মতে, এমন ঘরে অবস্থান করা মাকরূহ, যেখানে আতর জাতীয় সুগন্ধি দ্রব্য রয়েছে, চাই তার ঘ্রাণ শুকার ইচ্ছা থাক বা না থাক। হাম্বলী ও শাফেয়ীদের মতে, ঘ্রাণ শুঁকার ইচ্ছা থাকলে হারাম, নচেত হারাম নয়।

শাফেয়ী মযহাবের মতে, সুগন্ধি বিক্রেতার কাছে এমন জায়গায় বসা জায়েয, যেখানে বাতাসে সুগন্ধি ছড়ায়। এটা ইচ্ছাকৃতভাবে সুগন্ধি ব্যবহারের পর্যায়ে পড়েনা। তবে এটা বর্জন করা মুস্তাহাব। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে, যেখানে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এটা বর্জন করা মুস্তাহাব নয়। যেমন কাবার নিকটে বসা যা সুবাসিত করা হয়ে থাকে। সেখানে এটা মাকরূহ নয়। কেননা কাবার নিকটে বসা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সহায়ক। সুতরাং একটা ঠিক কাজে সুবাস বর্জন মুস্তাহাব নয়। কোনো শিশি, বোতল বা নেকড়ায় বেধে সুগন্ধি দ্রব্য বহন করা বৈধ এবং কোনো ফিদিয়া দেয়া লাগবেনা।

১০-১১. ইহরামকারীর কোমরে টাকার থলি বেঁধে চলা ফেরা করা : ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : ইহরামকারীর টাকার থলি বহন ও আংটি পরাতে ক্ষতি নেই।

১২. সুরমা লাগানো : ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : চোখ দিয়ে পানি পড়ুক বা না পড়ুক ইহরামকারী এমন সুরমা ব্যবহার করতে পারবে, যাতে কোনো সুগন্ধি নেই। সাজসজ্জার জন্য না হয়ে চিকিৎসার জন্য সুরমা ব্যবহার সর্বসম্মতভাবে বৈধ।

১৩. ইহরামকারীর ছাতা, তাঁবু, ছাদ বা অনুরূপ যে কোনো বস্তুর ছায়ায় অবস্থান : আব্দুল্লাহ ইবনে আমের রা. বলেন : আমি উমর রা. এর সাথে বেরিয়েছিলাম। তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় গাছের সাথে চামড়ার বিছানা টানিয়ে। তার ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছিলেন। -ইবনে আবি শায়বা।

উম্মে হুসাইন রা. বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি। সে সময় উসামা ও বিলালকে দেখলাম। তাদের একজন রসূল সা. এর উটনীর বলগা ধরে রেখেছে। আর অপরজন তাঁর কাপড় উঁচিয়ে তাঁকে উত্তপ্ত রোদ থেকে আড়াল করছে। এভাবে তিনি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন। আহমদ ও মুসলিম।

আতা বলেন : ইহরামকারী রোদ থেকে নিজেকে ছায়ায় রাখবে এবং বৃষ্টি ও বাতাস থেকে নিজকে রক্ষণ করবে। ইবরাহিম নখয়ী বলেন : আসওয়াদ বিন ইয়াদ বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে নিজের মাথার উপর একটা কম্বল রেখেছিলেন। তখন তিনি ইহরামে ছিলেন।

১৪. মেহেদী দ্বারা রং লাগানো : হাম্বলীদের মতে, ইহরামকারী নারী হোক বা পুরুষ হোক, তার জন্য মাথা ছাড়া শরীরের আর কোনো জায়গায় মেহেদী দ্বারা রং লাগানো হারাম নয়। শাফেয়ী মাযহাবের মতে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় দুই পা ও দুই হাত ব্যতিত পুরুষের দেহের সকল অংশে মেহেদীর রং লাগানো জায়েয। বিনা প্রয়োজনে হাত ও পায়ে মেহেদীর রং লাগানো হারাম। মাথায় গাঢ় মেহেদী রং লাগাবেনা। ইহরামরত অবস্থায় মহিলার জন্য মেহেদীর রং লাগানো মাকরূহ। তবে স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী ইদ্দত চলাকালে মেহেদীর রং লাগানো হারাম।'

অনুরূপ নকশা করে মেহেদী লাগানো হারাম। হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মতে, ইহরামকারী পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, শরীরের কোনো অংশেই মেহেদীর রং লাগানো জায়েয নয়। কেননা এটা একটা সুগন্ধি যা ইহরামকারীর জন্য হারাম। মাওলা বিনতে হাকীমের মাতা বলেন : রসূলুল্লাহ সা. উম্মে সালমা রা. কে বললেন : তুমি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করোনা। মেহেদী স্পর্শ করোনা। কেননা ওটা সুগন্ধি। -তাবারানি ও বায়হাকি।

১৫. শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে চাকরকে মারধর করা : আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে হজ্জে বেরিয়েছিলাম। যখন আরাযে পৌঁছলাম, তখন রসূল সা. এবং আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। আয়েশা রা. রসূলুল্লাহ সা. এর পাশে বসলেন এবং আমি আবু বকরের পাশে বসলাম। রসূল সা. ও আবু বকরের সফরের সরঞ্জমাদি এক সাথেই ছিলো এবং আবু বকরের একজন চাকরের কাছে ছিলো। আবু বকর রা. তাঁর চাকরের অপেক্ষায় ছিলেন। সে উপস্থিত হলো। কিন্তু তার সাথে তার উটটা ছিলনা। তিনি বললেন : তোমার উটটা কোথায়? সে বললো : গত রাতে সেটি হারিয়ে ফেলেছি। আবু বকর রা. বললেন : একটা মাত্র উট। তাও হারিয়ে ফেলেছিস? বলেই তাকে প্রহার করলেন। রসূল সা. তা দেখে মুচকি হাসতে লাগলেন। বললেন : এই ইহরামকারীকে দেখো। কী করেছে? রসূল সা. শুধু এই ইহরামকারীকে দেখো কী করছে একথা বলছিলেন আর মুচকি হাসছিলেন। এর বেশি কিছুই বলছিলেন না। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

১৬. মাছি, আঠালি ও পিঁপড়ে হত্যা করা : এক ব্যক্তি আতাকে জিজ্ঞাসা করলো গা বেয়ে ওঠা আঠালি ও পিঁপড়ে ইহরাম চলাকালে হত্যা করা যাবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন : যা তোমার শরীরের অংশ নয়, তা ফেলে দাও। ইবনে আব্বাস রা. বললেন : ইহরামকারী ছোট বড় সব রকমের আঠালি হত্যা করতে পারবে। ইহরামকারীর উটের শরীর থেকে আঠালি ফেলে দেয়া জায়েয। ইকরামা বলেছেন : তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ইবনে আব্বাস তাকে একটা উটের আঠালি ফেলার আদেশ দিলেন। এ আদেশ ইকরামা অপছন্দ করলেন। ইবনে আব্বাস বললেন : যাও, উটটা যবাই করো। ইকরামা তৎক্ষণাৎ সেটি যবাই করলেন। ইবনে আব্বাস তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন : এখন এই উটটার ছোট বড় কতোগুলো আঠালি তুমি হত্যা করলে?

১৭. পাঁচটা ব্যতিক্রমী প্রাণী এবং প্রত্যেক কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা : আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : পাঁচটা প্রাণী ব্যতিক্রমী। হারাম শরিফের ভেতের ও বাইরে তাদেরকে ইহরাম চলাকালে হত্যা করা যাবে। কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর। -মুসলিম ও বুখারি। বুখারি এগুলোর সাথে সাপও সংযোজন করেছেন।

ফসল থেকে ছোট কাকও ইহরাম অবস্থায় হত্যা করা আলেমদের সর্বসম্মত মতানুসারে বৈধ। দংশনকারী কুকুর বলতে এমন জন্তুকে বুঝায়, যা মানুষকে কামড়ায়, ভয় দেখায় ও মানুষের উপর হামলা করে, যেমন সিংহ ও বাঘ।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ، وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ .

"লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কি কি জিনিস তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্র জিনিসসমূহ এবং যেসব শিকারি পশু পাখিকে তোমরা শিকারের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছো, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।" শিকারি পশুপাখি দ্বারা সেসব হিংস্র পশু ও পাখিকে বুঝায় যাদেরকে শিকার ধরে আনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যেমন কুকুর ও বাজপাখি। হানাফী মাযহাবের মত হলো, কুকুর শব্দ দ্বারা শুধু কুকুর ও বাঘকেই বুঝানো হবে, অন্য কিছু নয়। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : যেসব প্রাণী স্বভাবগতভাবেই মানুষকে কষ্ট দেয়, যেমন সাপ, বিচ্ছু। ইঁদুর, কাক ও কামড়ানো কুকুর সেগুলোকে হত্যা করা ইহরামকারীর জন্য বৈধ।

তাছাড়া সেসব মানুষ ও জীবজন্তুকেও জাতিরোধ করা বৈধ, যারা তাকে নির্যাতন ও উৎপীড়ন করে। এমনকি এদের কেউ যদি তার ওপর আক্রমণ চালায় এবং তার সাথে যুদ্ধ না করা ব্যতিত সে নিবৃত হয়না, তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও বৈধ। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি নিজের মান সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।' উকুন ও মশা যখন ইহরামকারীকে কামড়ায়, তখন তাকে হত্যা করা তার জন্য বৈধ। এতে তাকে কোনো কাফফারা দিতে হবেনা। তবে তাকে হত্যা করার চেয়ে তাড়িয়ে দেয়া উত্তম। আলেমদের অধিকাংশের মতে, বাঘ ও সিংহের ন্যায় হিংস্র প্রাণী হত্যা করলেও কোনো কাফফারা দিতে হবেনা। মাথায় কোনো অশ্বস্তি না থাকা সত্ত্বেও উকুন বাছা এক ধরনের বিনোদন। এটা করা অনুচিত। তবে করলে কোনো কাফফরা দিতে হবেনা।

৮. মুহরিমের জন্যে যা যা নিষিদ্ধ

শরিয়ত মুহরিম বা ইহরামকারীর জন্য কিছু কাজ নিষিদ্ধ ও হারাম করেছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. স্ত্রী সহবাস এবং স্ত্রী সহবাসের প্ররোচনা ও কামোত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন যাবতীয় কাজ যেমন চুম্বন, যৌন আবেগ সহকারে স্পর্শ করা এবং পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীকে সহবাস সম্পর্কীয় কথাবার্তা বলা।

২. মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে ঠেলে দেয় এমন যে কোনো গুনাহর কাজ করা।

৩. সফর সংগী, চাকর বাকর ইত্যাদির সাথে ঝগড়া করা ও কটু বাক্য উমরণ করা। কেননা আল্লাহ বলেছেন : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .

যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করবে, সে যেন কোনো অশ্লীল কথা বা কাজ, গুনাহর কাজ ও ঝগড়া ঝাটি হজ্জের মধ্যে না করে। (ঝগড়া ঝাটি দ্বারা অন্যায় ঝগড়া বুঝানো হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে বিতর্ক করা মুস্তাহাব বা ওয়াজিব।)

বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি এমনভাবে হজ্জ করলো যে, তার মাঝে কোনো অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ কাজ করলোনা, সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে।"

৪. যে কোনো সেলাই করা পোশাক পরা। যেমন জামা, পাজামা, টুপি ইত্যাদি। অনুরূপ শান শওকতের রংগীন পোশাক জুতা ও মোজা পরা।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইহরামকারী জামা, পাগড়ি, টুপি, সুগন্ধি মাখানো কাপড় ও মোজা পরবেনা। তবে যার জুতা নেই, সে মোজার পায়ের গিরে পর্যন্ত অংশ কেটে ফেলে দিয়ে মোজা পরতে পারে। যাতে মোজা গিরের নিচে থাকে। বুখারি ও মুসলিম।

আলেমগণ একমত যে, এই বিধি শুধু পুরুষদের বেলায় প্রযোজ্য। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য নয়। তারা এসব পোশাক পরতে পারে। কেবল সুগন্ধি মাখানো কাপড়, নিকাব ও হাত মোজা পরতে পারবেনা। কেননা ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. মহিলাদেরকে ইহরাম অবস্থায় হাত মোজা, নিকাব ও সুগন্ধি মাখানো কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তারপর হলুদসহ যে কোনো রং এর কাপড়, রেশম গহনা, জামা, পাজামা, বা মোজা পরতে পারে। আবু দাউদ, বায়হাকি, হাকেম।

বুখারি বলেছেন : আয়েশা রা. ইহরাম অবস্থায় হলুদ পোশাক পরেছেন। তিনি বলেছেন : মহিলাদের নাক ও মুখ আবৃত করা যাবেনা এবং জাফরান বা অন্য কোনো সুগন্ধি যুক্ত পোশাক পরা যাবেনা। জাবের রা. বলেন : আমি হলুদ পোশাককে সুগন্ধিযুক্ত মনে করিনা। আয়েশা রা. গহনা, কালো কাপড়, গোলাপী সুগন্ধ মাখানো পোশাক ও মোজা পরা মহিলাদের জন্য দূষণীয় মনে করতেন না।

বুখারি জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন! রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইহরামকারী নারী নিকাব পরবেনা ও হাত মোজা পরবেনা।

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত, নারীর ইহরাম তার চেহারায় ও হাতের তালুতে। আলেমগণ বলেছেন কোনো জিনিস দিয়ে যদি মুখ ঢেকে রাখে, তবে তাতে ক্ষতি নেই। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন, মুখ খোলার শর্ত আরোপ করা দুর্বল ও ভিত্তিহীন। ছাতা ইত্যাদি দিয়ে পুরুষের দৃষ্টি থেকে মুখ আড়াল করা বৈধ। তবে ফেতনার (গুনাহর প্ররোচনা) আশংকা থাকলে মুখমণ্ডলকে দৃষ্টির আড়াল করা ওয়াজিব।

আয়েশা রা. বলেছেন : আমরা রসূল সা. এর সাথে ইহরাম সহ চলতাম। তখন পুরুষ উষ্ট্রারোহীরা আমাদের কাছ দিয়ে যেতো। যখন তারা আমাদের মুখোমুখি হতো, তখন আমরা আমাদের মুখে ঘোমটা দিতাম। তারা চলে গেলে আবার মুখ খুলতাম। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। আতা, মালেক, ছাওরী, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক মুখের ওপর কাপড় ঝুলিয়ে দেয়ার পক্ষে।

যে ব্যক্তি লুংগী চাদর ও জুতা সংগ্রহ করতে পারেনা, সে যা পায় তাই পরবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আরাফাতে ভাষণ দিলেন। ভাষণে বললেন : যে ব্যক্তি (সেলাইবিহীন) লুংগী সংগ্রহ করতে পারেনি, সে যেনো পাজামা পরে আর যখন জুতা সংগ্রহ করতে পারেনা, তখন সে যেনো মোজা পরে। -আহমদ, বুখারি, মুসলিম। আহমদ কর্তৃক বর্ণিত অপর হাদিসে রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি ইযার (সেলাইবিহীন লুংগী) সংগ্রহ করতে পারেনা, পাজামা সংগ্রহ করতে পারে, সে যেনো পাজামাই পরে। আর যে জুতা সংগ্রহ করতে পারেনা, মোজা সংগ্রহ করতে পারে, সে যেনো মোজাই পরে। এ হাদিসে মোজা ছোট পরার আদেশ নেই।

এটাই আহমদের মত। তিনি ইহরামকারীকে পাজামা ও মোজা পরার অনুমতি দিয়েছেন যখন সে জুতা ও লুংগী সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়। এ অবস্থায় তাকে কোনো কাফফারাও দিতে হবেনা। অধিকাংশ আলেমের অনুসৃত মত হলো, যে ব্যক্তির জুতা নেই, সে মোজা পরবে গিরে পর্যন্ত কেটে। কেননা এতে মোজা জুতার মতো হয়ে যায়। হানাফীদের মতে, যার লুংগী নেই

সে পাজামা ফেড়ে ও সেলাই খুলে ফেলে ব্যবহার করবে। সেলাইসহ পরলে ফিদিয়া দিতে হবে। মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন : পাজামার সেলাই খুলতে হবেনা, যেভাবে আছে, সেভাবেই পরবে এবং ফিদিয়া দিতে হবেনা। জাবের রা. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন। যখন ইযার সংগৃহীত হবেনা, তখন পাজামা পড়বে আর যখন জুতা সংগৃহীত হবেনা, তখন সে মোজা পরবে এবং গিরের নিচ পর্যন্ত রেখে মোজার উপরের অংশ কেটে ফেলবে। -নাসায়ী।

পাজামা পরার পর যদি লুংগী যোগাড় হয়, তাহলে পাজামা খুলে ফেলতে হবে। কিন্তু চাদর সংগৃহীত না হলে জামা পরা যাবেনা। কেননা সে যখন জামা পরবে তখন পাজামার সাথে লুংগী পরতে পারবেনা।

৫. নিজের বিয়ের জন্য অথবা অন্যের বিয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া : ইহরাম অবস্থায় এ ধরনের চুক্তি করলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং এর উপর কোনো আইনানুগ প্রভাব পড়বেনা। কেননা মুসলিম উসমান রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইহরামকারী নিজেও বিয়ে করবেনা, অন্য কাউকেও বিয়ে করাবেনা, বিয়ের প্রস্তাবও দেবেনা। তিরমিযিতে প্রস্তাব দেবেনা একথা নেই। এই হাদিস অনুযায়ী মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক। ইহরামকারীর জন্য বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেন এবং বিয়ে করলে তা বাতিল গণ্য করেন। "রসূলুল্লাহ সা. ইহরাম অবস্থায় মাইমুনাকে বিয়ে করেছেন" এই মর্মে যে হাদিস বর্ণিত আছে, মুসলিম বর্ণিত হাদিস তার বিপক্ষে। মুসলিমের হাদিসে আছে যে রসূলুল্লাহ সা. ইহরামমুক্ত অবস্থায় তাকে বিয়ে করেছেন। তিরমিযি বলেছেন : রসূল সা. কর্তৃক মাইমুনাকে বিয়ে করার ঘটনা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারণ তিনি তাকে মক্কার পথে বিয়ে করেছেন। তাই কেউ কেউ বলেছেন : তা ছিলো তিনি ইহরামমুক্ত অবস্থায় তাকে বিয়ে করেছেন। তবে এই বিয়ের খবর প্রচারিত হয় তার ইহরাম অবস্থায়। তারপর তাঁর বাসর হয় 'সারাফে' ইহরাম মুক্ত অবস্থায়।

হানাফীদের মতে, ইহরাম অবস্থায় বিয়ের আকদ করা বৈধ। কেননা ইহরাম মহিলার বিয়ের আকদকে নিষিদ্ধ করেনা। সহবাসকে নিষিদ্ধ করে। বিয়ের আকদের বৈধতা ইহরামের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়না।

৬ ও ৭. নখ কাটা, চুল কামানো বা ছাঁটা-চাই তা মাথার চুল হোক বা অন্য কোনো চুল হোক। কেননা আল্লাহ বলেছেন : وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ .

"তোমরা কুরবানির জন্তু কুরবানির জায়গায় না পৌছা পর্যন্ত তোমাদের মাথা কামিওনা।" বিনা ওযরে ইহরামকারীর নখ কাটা যে হারাম সে ব্যাপারে সকল আলেম একমত। তবে নখ যদি ভেংগে গিয়ে থাকে, তাহলে তা ফেলে দেয়া যাবে। এজন্য কোনো ফিদিয়া দিতে হবেনা। চুল রাখা যদি কষ্টদায়ক হয়, তাহলে তা ফেলে দেয়া বৈধ। তবে ফিদিয়া দিতে হবে। কিন্তু চোখের ভ্রু যদি ইহরামকারীর জন্য কষ্টদায়ক হয়, তাহলে তা ফিদিয়া ছাড়াই ফেলে দেয়া যাবে। কিন্তু মালেকীদের মতে, ফিদিয়া দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهٖٓ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .

"তোমাদের কেউ রুগ্ন হলে অথবা মাথা ব্যথায় অশান্তি হলে তাকে রোযা, সদকা কিংবা কুরবানির মাধ্যমে ফিদিয়া দিতে হবে।

৮. পুরুষ বা মহিলার কাপড় বা শরীরে সুগন্ধি মাখানো : ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, উমর রা. মোয়াবিয়ার শরীর থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ পেলেন। অথচ মোয়াবিয়া তখন ইহ্‌রামের অবস্থায়। তিনি তাকে বললেন : যাও, ওটা ধুয়ে এসো। কেননা আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি হজ্জ করে, সে ধুলোমলিন ও সুগন্ধিহীন থাকে। -বাযযার।

রসূলুল্লাহ্ সা. আরো একজনকে তিনবার বলেছিলেন : তোমার গায়ে যে সুগন্ধি রয়েছে, তা ধুয়ে ফেলো।

ইহ্‌রাম অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে গোসল দেয়া ও কাফন পরানোর সময় সুগন্ধি লাগানো যাবেনা। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. ইহ্‌রাম অবস্থায় মৃত এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন : তোমরা ওর মাথা ঢেকোনা এবং ওকে সগন্ধি মেখোনা। কেয়ামতের দিন সে যখন পুনরুজ্জীবিত হবে, তখন লাব্বাইকা লাব্বাইকা বলতে থাকবে। তবে ইহ্‌রামের পূর্ব থেকে তার শরীরে ও কাপড়ে সুগন্ধির কিছু রেশ অবশিষ্ট থাকলে তাতে কোনো আপত্তি নেই। যে উদ্ভিদ সুগন্ধির উদ্দেশ্যে জন্মেনা, যেমন আপেল ইত্যাদির গাছ তার মধ্যে বিদ্যমান সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়ার অনুমতি আছে। কেননা যেসব উদ্ভিদে সুগন্ধি প্রত্যাশা করা হয়না এবং সুগন্ধি গ্রহণও করা হয়না, আপেল ইত্যাদির গাছ তারই সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে কা'বা শরিফের গায়ে লেগে থাকা সুগন্ধি কোনো ইহ্‌রামকারীর গায়ে লেগে গেলে তার হুকুম কি হবে, সে সম্পর্কে সালেহ্ বিন কায়সান বলেন : আমি আনাস বিন মালেককে দেখেছি, তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর কাপড়ে কাবার সুগন্ধি লেগে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা ধোননি। আতা বলেছেন : এটা ধোয়ারও প্রয়োজন নেই, কোনো ফিদিয়া বা কাফফারাও দেয়া লাগবেনা। তবে শাফেয়ী মাযহাবের মতানুসারে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কাবা শরীফের সুগন্ধি নিজের কাপড়ে বা দেহে লাগায় অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে লেগে যায় কিন্তু ধোয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধুয়ে ফেলেনা, সে গুনাহ্‌র কাজ করে এবং তাকে ফিদিয়া দিতে হবে।

৯. সুগন্ধিযুক্ত রং মাখা কাপড় পরা : সুগন্ধিযুক্ত রং মাখা কাপড় পরা সর্বসম্মতভাবে হারাম এ ধরনের কাপড় পরতে হলে ধুয়ে পরতে হবে। যাতে তা থেকে কোনো সুগন্ধি বের না হয়।

কেননা নাফে থেকে ইবনে আব্দুল বার ও তাহাবি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : "যাফরান বা অনুরূপ কোনো সুগন্ধি মাখা কাপড় না ধুয়ে ইহ্‌রাম অবস্থায় পরোনা।"

যে সকল ব্যক্তি অন্যদের জন্য অনুসরণীয় ও আদর্শ স্থানীয় তাদের জন্য এ ধরনের পোশাক (ধৌত করা অবস্থায়ও) পরা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা এতে সাধারণ মানুষ নিষিদ্ধ সুগন্ধিযুক্ত পোশাক পরার প্ররোচনা লাভ করতে পারে। কেননা মালেক নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাবের মুক্ত গোলাম আসলাম বলেছেন : উমর রা. তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র পরিধানে একটা রং মাখানো পোশাক দেখতে পেলেন। তালহা তখন ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। উমর রা. বললেন, হে তালহা, এই রং মাখানো কাপড় কেন? তালহা বললেন : হে আমিরুল মুমিনীন ওটাকে লাল রং এর মুক্তা দ্বারা রঙ্গীন করা হয়েছে। উমর রা. বললেন, তোমরা হচ্ছো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যাদেরকে সাধারণ মানুষ অনুসরণ করে থাকে। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি যদি এই পোশাক দেখে তবে অবশ্যই বলবে : তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ ইহ্‌রামকালে রঙ্গীন পোশাক পরতো।' সুতরাং তোমরা এ ধরনের রঙ্গীন পোশাক পরোনা।"

কোনো রান্না করা খাবারে বা পানীয়ে যদি সুগন্ধিযুক্ত কিছু দেয়া হয়, কিন্তু তাতে কোনো স্বাদ, গন্ধ বা রং অবশিষ্ট না থাকে, তবে ইহ্‌রামকারী তা খেলে তাকে কোনো ফিদিয়া দিতে হবেনা।

কিন্তু ঘ্রাণ অবশিষ্ট থাকলে শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে তা খেয়ে ফিদিয়া দিতে হবে। হানাফীদের মতে ফিদিয়া দিতে হবেনা। কেননা সে তো সুগন্ধি উপভোগ করতে ইচ্ছা করেনি।

১০. শিকার : করা ইহরামকারীর জন্য জলজ প্রাণী শিকর করা, শিকার দেখিয়ে দেয়া ও তার গোশত খাওয়া বৈধ। কিন্তু স্থলজাত প্রাণী শিকার করা, হত্যা করা, যবাই করা, দর্শনীয় হলে দেখিয়ে দেয়া, দর্শনীয় না হলে তার সন্ধান দেয়া অথবা আতংকিত করে পালাতে প্ররোচিত করা হারাম। স্থলজাত প্রাণীর ডিম নষ্ট করা, ক্রয় বিক্রয় করা ও তার দুধ দোহানোও হারাম। (যে সকল প্রাণী স্থলে জন্মে ও সন্তান জন্ম দেয়, তা স্থলজাত প্রাণী, চাই তা পানিতে বাস করুক না কেন। জলজ প্রাণী ঠিক এর বিপরীত। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। শাফেয়ীদের মতে যে প্রাণী শুধু স্থলে অথবা জলে ও স্থলে উভয় জায়গায় বাস করে, তা স্থলজ প্রাণী। আর যে প্রাণী পানিতে ছাড়া বাসই করেনা তা জলজ প্রাণী।) আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا .

"তোমাদের ও পথিকদের ভোগের উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য জলজ প্রাণী শিকার করা ও খাওয়া হালাল করা হয়েছে। আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থলের শিকার ধরা যতোক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে।" (উল্লেখ্য যে, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে শুধুমাত্র হালাল বনজ প্রাণী ও হালাল পাখি শিকর করা হারাম। এ ছাড়া অন্য সকল স্থলজ প্রাণী শিকার ও হত্যা করা বৈধ। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ আলেমের মতে, হাদিসে নিষিদ্ধ পাঁচটি প্রাণী যথা : কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও কামড়ানো কুকুর ব্যতীত আর সকল প্রাণী হারাম শরিফের বাইরে বা ভেতরে হত্যা করা হারাম, চাই তা হালাল জন্তু হোক বা হারাম জন্তু হোক।)

১১. ইহরামকারীর উদ্দেশ্যে, তার সাহায্যে বা তাঁর ইংগিতে শিকার করা জন্তুর গোশত খাওয়া ইহরামকারীর জন্য হারাম। কেননা বুখারি ও মুসলিম কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সা. হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন। তাঁর সাথে সাহাবিদের একটি দলও বেরুলো। আবু কাতাদাসহ একটি দলকে তিনি পৃথক করে দিয়ে বললেন : তোমরা সমুদ্রের কিনার দিয়ে চলতে থাকো, যতোক্ষণ না আমরা পরস্পরের সাথে মিলিত হই। তারা সমুদ্রের কিনার ধরে চলতে লাগলো। যখন তারা রওয়ানা হলো, তখন আবু কাতাদা ছাড়া সবাই ইহরাম বাঁধলো। চলার পথে তারা কতকগুলো বুনো গাধা দেখতে পেলো। আবু কাতাদা গাধাগুলোর ওপর হামলা করে একটি মাদী গাধাকে হত্যা করলো। সবাই যাত্রা বিরতি করে ঐ গাধার গোশত খেলো। তারা প্রশ্ন তুললো : আমরা তো ইহরামকারী। আমাদের কি শিকারের গোশত খাওয়া ঠিক হলো? মাদী গাধার উদ্বৃত্ত গোশত তারা সাথে করে নিয়ে গেলো। যখন রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে উপস্থিত হলো, তখন বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমরা ইহরাম বেঁধেছিলাম কিন্তু আবু কাতাদা ইহরাম বাঁধেনি। পরে আমরা যখন এক পাল বুনো গাধার সাক্ষাৎ পেলাম, তখন আবু কাতাদা তাদের ওপর আক্রমণ চালালো এবং একটা মাদী গাধাকে হত্যা করলো। তারপর আমরা যাত্রা বিরতি করলাম এবং গাধার গোশত খেলাম। তারপর আমরা প্রশ্ন তুললাম যে, ইহরাম অবস্থায় আমাদের শিকারের গোশত খাওয়া কি বৈধ? আমরা উদ্বৃত্ত গোশত সাথে করে নিয়ে এসেছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমাদের কেউ কি আবু কাতাদাকে আক্রমণ করতে আদেশ বা ইংগিত দিয়েছিল? তারা বললো : না! রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে তোমরা অবশিষ্ট গোশত খেয়ে ফেলো।

ইহরামকারীর জন্য এমন শিকারের গোশত খাওয়া বৈধ যা সে নিজেও শিকার করেনি, তার জন্যও শিকার করা হয়নি। সে শিকার দেখিয়েও দেয়নি। শিকার ধরতে সাহায্যও করেনি। জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : স্থলজ প্রাণী তোমাদের জন্য ইহরাম অবস্থায়

খাওয়া হালাল। যদি তোমরা স্বয়ং তা শিকার না করে থাকো, কিংবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়ে থাকে।" আহমদ ও তিরমিযি। কিছু আলেমের মতে, এই হাদিস অনুযায়ী ইহরামকারী নিজে শিকার না করলে বা তার জন্য শিকার করা না হয়ে থাকলে তার জন্য শিকারের গোশত খাওয়া বৈধ। শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, মালেক ও অধিকাংশ ইমাম এই মতের পক্ষে। তবে ইহরামকারী নিজে শিকার করলে বা তার জন্য শিকার করা হলে চাই তার অনুমতি নিয়ে করা হোক বা অনুমতি ছাড়া করা হোক, হারাম। কোনো ইহরামমুক্ত ব্যক্তি নিজের জন্য শিকার করলে এই ইহরামকারীর উদ্দেশ্যে শিকার না করলে, অতপর তার গোশত ইহরামকারীকে উপহার দিলে বা তার কাছে বিক্রি করলে তা ইহরামকারীর জন্য হারাম হবেনা।

আবদুর রহমান তাইমী বলেছেন : আমরা তালহার সাথে সফরে বেরুলাম। আমরা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। এ সময় তালহাকে একটা পাখি উপহার দেয়া হলো। তখন তালহা নিদ্রিত। আমাদের কেউ কেউ তা খেলো, কেউ কেউ বর্জন করলো। তালহা যখন জেগে উঠলো, তখন যারা খেয়েছে তাদেরকে সমর্থন জানালো এবং বললো, আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে এটা খেয়েছি। - আহমদ ও মুসলিম।

ইহরামকারীর জন্য শিকারের গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ মর্মেও কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন সা'আব বিন জাস্সামার হাদিসে বলা হয়েছে, তিনি রসূলুল্লাহ সা. কে একটা বুনো গাধা উপহার দিলেন। তিনি তখন আবওয়া বা ওয়াদ্দানে অবস্থান করছিলেন। রসূলুল্লাহ সা. উপহারটি তার কাছে ফেরৎ পাঠালেন। রসূল সা. যখন সা'বের মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলেন। তখন বললেন : আমরা এটা এজন্যই ফেরত দিয়েছি যে, আমরা ইহরামে আছি।" সকল হাদিসের সমন্বয় করলে বুঝা যায়। এটি ইহরামমুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ইহরামকারীর উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়েছিল বলেই ফেরত দেয়া হয়েছিল।

ইবনে আব্দুল বার বলেন : এই মতের প্রবক্তাদের যুক্তি এই যে, এই ব্যাখ্যা অনুসারে এই বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদিস সহীহ প্রমাণিত হয়। এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে হাদিসগুলোর মধ্যে কোনো স্বার্থবিরোধিতা বা সাংঘর্ষিকতা থাকেনা। হাদিসগুলোকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা উচিত। যাতে এগুলোর প্রয়োগের কোনো পথ যতোক্ষণ পাওয়া যায়, ততোক্ষণ কোনো হাদিস অন্য হাদিসের বিরোধী বলে চিহ্নিত না হয়। ইবনুল কাইয়েম এই মতকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন : সাহাবিদের সমস্ত কথা ও কাজ শুধুমাত্র এই ব্যাখ্যাকেই সঠিক প্রমাণ করে।

৯. ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ করলে তার বিধান

যে ব্যক্তি ওযর তথা অনিবার্য কারণবশত ইহরামে যেসব কাজ নিষিদ্ধ স্ত্রী সহবাস ব্যতিত তার কোনো একটা করার প্রয়োজন বোধ করে, যেমন ঠাণ্ডা বা গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মাথা কামানো, সেলাই করা কাপড় পরা, ইত্যাদি। তার জন্য একটা ছাগল যবাই করা, অথবা মাথা প্রতি অর্ধ সা' করে ছয় জন মিসকীনকে খাবার দেয়া। অথবা তিন দিন রোযা রাখা জরুরি। এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটি করা তার ইচ্ছাধীন। স্ত্রী সহবাস ব্যতিত ইহরামের জন্য নিষিদ্ধ আর কোনো কাজ করলে হজ্জ বাতিল হয়না।

কা'ব বিন আজরা থেকে বর্ণিত, হুদাইবিয়ার সময় রসূল সা. তার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : তোমার মাথার কীটগুলো তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে বুঝি। সে বললো : হা। রসূল সা. বললেন : মাথা কামিয়ে ফেলো, তারপর একটা ছাগল কুরবানি করো অথবা তিন দিন রোযা রাখো অথবা ছয় জন মিসকীনকে তিন সা খোরমা খাওয়াও। -বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ।

অন্য বর্ণনায় এই সাহাবি বললেন : আমার মাথায় কীটের যন্ত্রণা আমাকে পীড়া দিচ্ছেন। তখন হুদাইবিয়ার বছর চলছিল এবং আমি রসূল সা. এর সাথে ছিলাম। এমনকি এ কারণে আমার দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশংকা দেখা দিলো। তখন আল্লাহই তায়ালা নাযিল করলেন : তোমাদের

কেউ যদি রোগ জর্জরিত হয় অথবা তার মাথায় কোনো পীড়া থাকে, তাহলে সে যেনো রোযা সদকা বা কুরবানির মাধ্যমে তার ফিদিয়া দেয়।" এরপর রসূলুল্লাহ সা. আমাকে ডাকলেন এবং বললেন : তোমার মাথা কামাও, তারপর তিনদিন রোযা রাখো অথবা ছয় জন মিসকীনকে ষোল রতল কিসমিস দান করো অথবা একটা ছাগল কুরবানি করো। আমি মাথা কামিয়ে ফেললাম তারপর কুরবানির করলাম।"

ইমাম শাফেয়ীর মতে ওযরধারী ও ওযরহীন উভয়কেই ফিদিয়া দিতে হবে। আবু হানিফার মতে, ওযরহীন ব্যক্তি সামর্থ থকলে কুরবানি করা ওয়াজিব, অন্যায় নয়।

আংশিক চুল কাটলে : আতা বলেছেন, ইহরামকারী তিনটে বা তার বেশি পশম উপড়ালে তার ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব। আর শাফেয়ী বলেছেন, একটা পশমে এক মুদ, দুইটা পশমে দুই মুদ ও তিনটা পশমে একটা ছাগল কুরবানি করা ওয়াজিব।

তেল মাখালে : আল মুসওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে : খাঁটি তেল বা খাঁটি সেবকা দিয়ে শরীর মর্দন করলে আবু হানিফার মতে কুরবানি ওয়াজিব চাই যে অংগই করা হোক না কেন। আর শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী সুগন্ধিযুক্ত নয় এমন তেল দ্বারা মাথার চুল ও দাড়ি মর্দন করলে ফিদিয়া দিতে হবে। শরীরের যে কোনো জায়গায় মর্দন করা হোক, ফিদিয়া দিতে হবেনা।

ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত নিষিদ্ধ পোশাক পরলে বা সুগন্ধি লাগালে ক্ষতি নেই : ইহরামকারী যখন নিষিদ্ধ বস্তুর কথা না জেনে বা নিজের ইহরামের কথা ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ কাপড় পরে বা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তখন তার ফিদিয়া দেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা ইয়ালা বিন উমাইয়া বলেন : জারানাতে এক ব্যক্তি রসূল সা. এর কাছে উপস্থিত হলো। তখন তার গায়ে একটা জুব্বা এবং দাড়ি ও মাথার চুল হলুদ রং এ রচিত ছিলো। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ আমি একটি ওমরার ইহরাম বেধেছি। আমার বেশভূষা যা আছে তাতো দেখতেই আছেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার হলুদ রংটা ধুয়ে ফেলো জুব্বাটা খুলে ফেলো এবং তুমি হজ্জে যা যা করেছিলে, ওমরাতেও তাই করো।" -ইবনে মাজাহ ব্যতীত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ। আতা বলেছেন : অজ্ঞতাবশত বা ভুলক্রমে নিষিদ্ধ পোশাক পরলে বা সুগন্ধি লাগালে কোনো কাফফারা দিতে হবেনা। -বুখারি।

কিন্তু শিকার করা নিষিদ্ধ একথা না জানার কারণে বা ভুলে যাওয়ার কারণে শিকার হত্যা করলে তার সমান বদলা দিতে হবে। (অর্থাৎ কুরবানি দিতে হবে।) কারণ এর ক্ষতিপূরণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ। আর্থিক ক্ষতিপূরণে জানা অজানা ও ভুল ও স্ব-ইচ্ছা সমান। যেমন মানুষের আর্থিক ক্ষতি সাধন করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

স্ত্রী সহবাসে হজ্জ বাতিল : আলী, উমর ও আবু হুরায়রা রা. হজ্জের ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাসকারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে ফতোয়া দিলেন যে, উভয়কে হজ্জ যথাযথভাবে সমাপ্ত করতে হবে। অতপর পরবর্তী বছর পুনরায় হজ্জ ও কুরবানি করতে হবে। আবুল আব্বাস তাবারি বলেছেন : ইহরামকারী প্রথম ইহরামমুক্ত হবার আগেই স্ত্রী সহবাস করলে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে চাই তা আরাদায় অবস্থানের আগে করুক বা পরে করুক। নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাকে হজ্জের অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে, তাকে একটা উট কুরবানি করতে হবে এবং পরবর্তী বছর হজ্জের কাজা করতে হবে। স্ত্রী যদি নফল ইহরাম করে থাকে তবে তাকে হজ্জ চালিয়ে যেতে হবে, পরবর্তী বছর কাযা করতে হবে এবং কুরবানিও করতে হবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। কোনো কোনো আলেম বলেন, তাদের উভয়ের একটা কুরবানিই দিতে হবে। আতাও এই মত পোষণ করেন। বগবী বলেছেন : রমযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে যেমন কাফফারা দিতে হয়, পুরুষকে এখানেও তেমনি কাফফারা দিতে হবে। পরবর্তী বছর যখন তারা কাযা হজ্জ করতে বেরুবে, তখন যে স্থানে আগের বছর সহবাস সংঘটিত হয়েছিল সে স্থানে উভয়ের পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করা মালেক ও আহমদের

মতে ওয়াজিব এবং হানাফী ও শাফেয়ী মতে মুস্তাহাব। আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে এরূপ করা চাই। উট কুরবানি করতে অক্ষম হলে গরু, গরু দিতে অক্ষম হলে সাতটা ছাগল দেবে। তাতেও অক্ষম হলে উটকে টাকার হিসাবে এবং টাকাকে খাদ্যের হিসাবে মূল্যায়ণ করতে হবে এবং প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ হিসাবে সদকা করতে হবে। এতেও অক্ষম হলে প্রত্যেক মুদের বিনিময়ে একটা করে রোযা রাখবে। যুক্তিবাদীদের অভিমত হলো। আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সহবাস করলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে একটা ছাগল অথবা একটা উটের এক সপ্তমাংশ দান করতে হবে। আর আরাফায় অবস্থানের পরে সহবাস করলে হজ্জ বাতিল হবেনা, তবে তাকে একটা উট কুরবানি করতে হবে। কিরাণ হজ্জকারী যখন তার হজ্জ নষ্ট করে, তখন ইফরাদ হজ্জকারীর ওপর যা যা ওয়াজিব হয়, তার ওপরও সেসব জিনিস ওয়াজিব হবে। কিরান হজ্জই তাকে কাযা করতে হবে এবং কিরানের কুরবানি থেকে সে অব্যাহতি পাবেনা। অধিকাংশ আলেমের মতে, প্রথম ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার পর সহবাস করলে হজ্জ বাতিল হবেনা এবং তাকে কাযাও করতে হবেনা। কারো কারো মতে কাযা করা ওয়াজিব এবং তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। এটা ইবনে উমর, হাসান ও ইবরাহিমের অভিমত। এখন ফিদিয়া হিসেবে উট না ছাগল দিতে হবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস ও আতার মতে উট ওয়াজিব। উট ইকরামার মত ও শাফেয়ীর দুই মতের একটি, যা হানাফীদের মধ্য হতে আল মাবসুত ও আল বাদায়ের লেখক গ্রহণ করেছেন। শাফেয়ীর অপর মতানুসারে ছাগল দেয়া ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম মালেকেরও মত। আর যখন ইহরামকারীর স্বপ্নদোষ হয় কিংবা সহবাসের কথা চিন্তা করায় বা কোনো মহিলার দিকে দৃষ্টি দেয়ার উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ও বীর্যপাত হয়, তখন শাফেয়ী মযহাব অনুসারে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবেনা। অন্যেরা বলেন : যে ব্যক্তি কামোত্তেজনা সহকারে স্পর্শ করে বা চুমু দেয়, তার উপর ছাগল কুরবানি করা ওয়াজিব, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। ইবনে আব্বাস রা. এর মতে, তার উপর কুরবানি ওয়াজিব। মুজাহিদ বলেন : এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে এলো এবং বললো : আমি ইহরাম বেঁধেছি। এমতাবস্থায় আমার কাছে অমুক মহিলা সেজেগুজে এলো। ফলে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলামনা। আমার ওপর কামোত্তেজনা প্রবল হলো। একথা শুনে ইবনে আব্বাস হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন। তারপর বললেন : তুমি একজন কামোন্মাদ। তোমার কোনো সমস্যা নেই। একটা কুরবানি করো ব্যাস তোমার হজ্জ সম্পন্ন হয়ে গেলো। -সাঈদ বিন মানসুর।

শিকার হত্যার ক্ষতিপূরণ : আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদার ৯৫ আয়াতে বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا ۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ○

“হে ঈমানদারগণ তোমরা ইহরামে থাকা অবস্থায় শিকার হত্যা করোনা। তোমাদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করলে তাকে হত্যাকৃত জন্তুর সমান বিনিময় হিসেবে দিতে হবে। তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বিচারক এর নিষ্পত্তি করবে। সে জন্তুটি হাদিয়া হিসেবে কা'বায় পৌছাতে হবে। অথবা, তাকে কাফফারা হিসেবে কয়েকজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে অথবা এর সমপরিমাণ রোযা রাখতে হবে, যেন সে তার কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে তা আল্লাহর মাফ করেছেন। তবে কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।'

ইবনে কাছীর বলেছেন : অধিকাংশ আলেমের মতে, ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃত যেভাবেই শিকার হত্যা করা হোক, বিনিময় প্রদান ওয়াজিব। যুহরি বলেছেন : ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যাকারীর ব্যাপারে কুরআন তার ফায়সালা দিয়েছে। আর ভুলক্রমে হত্যাকারীর ওপর সুন্নত কার্যকর রয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপর বিনিময় ওয়াজিবরূপে ধার্য করেছে এবং তাকে গুনাহগার আখ্যায়িত করেছে এই উক্তির মাধ্যমে : যেন সে তার কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করে।' আর রসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের ফায়সালা সম্বলিত সুন্নত ভুলক্রমে শিকার হত্যাকারীর উপর বিনিময় ধার্য করেছে। যেমনটি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপর কুরআন বিনিময় ধার্য করেছে। তাছাড়া শিকার হত্যা একটা ক্ষতি। আর ক্ষতি সাধন ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা ভুলক্রমেই হোক, ক্ষতিপূরণ দিতেই হয়। তবে পার্থক্য এই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যাকারী গুনাহগারও বটে, কিন্তু ভুলক্রমে হত্যাকারী গুনাহগার বলে নিন্দিত নয়। মুসওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে। তাকে হত্যাকৃত জন্তুর সমান বিনিময় হিসেবে দিতে হবে। আবু হানিফা এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, শিকার হত্যাকারীকে বিনিময় দিতে হবে হত্যাকৃত জন্তুর সমমূল্যের। আর বিনিময়টা যাতে সমমূল্যের হয়, সে জন্য বিনিময় ধার্য করতে হবে দু'জন ন্যায় বিচারক ব্যক্তিকে। হয় অনুরূপ একটা জন্তু দিয়ে বিনিময় দিতে হবে, যা হাদিয়ার আকারে কা'বায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নচেত মিসকীনদের খাদ্য হিসেবে কাফফারা দিতে হবে। আর ইমাম শাফেয়ীর ব্যাখ্যা হলো : শিকার হত্যাকারীর ওপর বিনিময় দেয়া ওয়াজিব হবে, যা আকার আকৃতিতে হত্যাকৃত জন্তুর সমান হবে এবং একই জাতের জন্তু হবে। আর এদিক দিয়ে তা সমান কিনা তা স্থির করবে দু'জন ন্যায়বিচারক ব্যক্তি। আর এই বিনিময়কে হাদিয়া হিসেবে কা'বায় পৌঁছানো হবে। নচেত এই বিনিময় হবে কোনো কাফফারা বা কাফফারার সমান রোযা।

উমর ও পূর্বতন মনীষীগণের ফায়সালা : মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি উমর রা. এর কাছে এলো এবং বললো : আমি ও আমার এক সাথী পাহাড়ী পথের একটি গর্তে দুটো ঘোড়া দাবড়িয়ে দিয়ে একটা হরিণ হত্যা করলাম। তখন আমরা দু'জনই ইহরামে ছিলাম। এ কাজটা আপনি কেমন মনে করেন? উমর রা. তার পাশের এক ব্যক্তিকে বললেন : এসো আমি ও তুমি এর ফায়সালা করি। তারপর তারা দু'জনে ফায়সালা করলেন যে, লোকটিকে একটি মাদী ছাগল দিতে হবে। একথা শুনে লোকটি এই বলতে বলতে বিদায় হতে উদ্যত হলো "ইনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন, একটা হরিণের ব্যাপারেও ফায়সালা করতে পারেন না, আর এক ব্যক্তিকে ডেকে আনেন তার সাথে ফায়সালা করতে।' উমর রা. লোকটির কথা শুনলেন এবং তাকে কাছে ডাকলেন। তাকে বললেন : তুমি কি সূরা মায়েদা পড়ো? সে বললো : না। তিনি বললেন। এই ব্যক্তিকে চিনো, যে আমার সাথে ফায়সালায় অংশ নিলো? সে বললো : না। উমর রা. বললেন : তুমি যদি আমাকে জানাতে যে, সূরা মায়েদা পড়েছো, তাহলে আমি তোমাকে এমন প্রহার করতাম যাতে ব্যথা পাও। তারপর বললেন : আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেন : يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ .

"তার ব্যাপারে দু'জন ন্যায়বিচারক ব্যক্তি ফায়সালা করবে ....." আর ইনি হচ্ছেন আব্দুর রহমান বিন আওফ।

প্রাচীন মনীষীগণ স্থির করেছেন যে, উটপাখী হত্যা করলে একটা উট, বুনো গাধা, বুনো গরু, ও পাহাড়ী জাগল হত্যা করলে একটা গরু এবং খরগোশ কবুতর, ঘুঘু পাখী, বুনো মোরগ, ও দাবসী নামক পাখী হত্যা করলে একটা ছাগল কুরবানি করতে হবে। আর হায়েনা হত্যায় একটা ভেড়া। হরিণ হত্যায় একটা মাদী ছাগল, খরগোশ হত্যায় চার মাসের উর্ধ্বের মাদী ছাগল, শিয়াল হত্যায় এক বছরের ছাগল এবং ইয়ারবু নামক ইঁদুর সদৃশ জন্তু হত্যায় চার মাস বয়সী মাদী ছাগল দিতে হবে।

বিনিময় সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে যা করণীয় : সাঈদ বিন মানসুর ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : সূরা মায়েদার উক্ত ৯৫নং আয়াত অনুযায়ী ইহরাম অবস্থায় কেউ শিকার হত্যা করলে তার সমান বিনিময় নির্ধারণ করতে হবে। বিনিময় যদি তার কাছে থেকে থাকে তাহলে তা যবাই করবে ও তার গোশত সদকা করে দেবে। আর যদি বিনিময় না থাকে, তবে বিনিময়কে নগদ অর্থের হিসাবে মূল্যায়ণ করতে হবে, তারপর সেই অর্থের সমান খাদ্য নির্ধারণ করতে হবে এবং খাদ্যের প্রত্যেক অর্ধ সার বিনিময়ে একটা করে রোযা রাখবে। ধরা যাক, সে একটা হরিণ বা তদ্রূপ কোনো জন্তু হত্যা করলো, তাকে একটা ছাগল দিতে হবে, যা মক্কায় যবাই করা হবে। নচেত ছয় জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। তা না পারলে তিন দিন রোযা রাখবে। আর যদি একটা পাহাড়ি ছাগল হত্যা করে, তাহলে তাকে একটা গরু দিতে হবে। গরু দিতে না পারলে বিশজন মিসকীনকে খাওয়াবে। তাও না পারলে বিশটা রোযা রাখবে। আর যদি একটা উট পাখি কিংবা বুনো গাধা বা অনুরূপ কোনো জন্তু হত্যা করে, তাহলে তাকে একটা উট দিতে হবে। উট দিতে না পারলে ত্রিশজন মিসকীনকে খাওয়াবে। তাও না পারলে ত্রিশটি রোযা রাখবে। ইবনে আবি হাতেম, ইবনে জারীর।

খাওয়ানো ও রোযা রাখার পদ্ধতি : মালেক বলেন : শিকার হত্যাকারীর বিনিময় দান সম্পর্কে আমি সর্বোত্তম যেকথা শুনেছি তা হলো, হত্যাকৃত শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে দেখতে হবে, এই মূল্যে কি পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়। এরপর প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ পরিমাণ খাওয়াবে। অথবা প্রত্যেক মুদের বাবদে একদিন রোযা রাখবে, আর দেখবে মিসকীনের সংখ্যা কতো। মিসকীনের সংখ্যা যদি দশজন হয় তাহলে দশদিন রোযা রাখবে। আর যদি তাদের সংখ্যা বিশ হয়, তাহলে বিশটি রোযা রাখবে।

যৌথভাবে শিকার হত্যা : যখন একটি দল ইচ্ছাকৃতভাবে যৌথ উদ্যোগে একটা শিকার হত্যা করে, তখন তাদেরকে একটা বিনিময়ই দিতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন : হত্যাকৃত জন্তুর সমান বিনিময় দিতে হবে। ইবনে উমর রা. কে একটি হায়েনা হত্যাকারী দল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যাদের সবাই ইহরামে ছিলো। তিনি বললেন : সবাই মিলে একটা ভেড়া যবাই করো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : দলের প্রত্যেক সদস্যের পক্ষ থেকে একটি করে? তিনি বললেন : না সকলের পক্ষ থেকে একটি।

হারাম শরিফে শিকার ও গাছ কাটা : ইহরামকারী ও ইহরামমুক্ত নির্বিশেষে সকলে ওপরই হারাম শরিফে শিকার করা, শিকারকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া, সাধারণত মানুষের চেষ্টায় উৎপাদিত হয়নি এমন গাছ কাটা, উদ্ভিদ কাটা, এমনকি কাটাওয়ালা গাছ পর্যন্ত কাটা হারাম। একমাত্র সুগন্ধিযুক্ত ইযখির ও সানামকী গাছ কাটা, উপড়ানো ও নষ্ট করা জায়েয। বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ের দিন বললেন : এই শহর পবিত্র ও সম্মানিত, এর কোনো কাঁটাযুক্ত গাছ ও কোনো উদ্ভিদ কাটা যাবেনা। এর কোনো শিকারকে তাড়িয়ে দেয়া যাবেনা এবং কোনো হারানো জিনিস কুড়ানো যাবেনা। তবে শুদ্ধ ঘোষণাকারীর জন্য কুড়ানো বৈধ। আব্বাস বললেন : ইযখির বাদে, কেননা এটা জনগণের জন্য একটা অপরিহার্য বস্তু। এটা বাড়ির জন্য ও কামারের জন্য জরুরি।' তখন রসূল সা. বললেন : হ্যা, ইযখির বাদে।

শওকানি বলেছেন, কুরতুবি বলেছেন : ফকীহগণ নিষিদ্ধ গাছকে মানুষের চেষ্টা ছাড়া প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহর তৈরি গাছের মধ্যে সীমিত রেখেছেন। যে সকল গাছ মানুষের চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে তা কাটা

যাবে। শাফেয়ী বলেন : সবকিছুতেই বিনিময় দেয়া জরুরি। ইবনে কুদামা এই মতকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন।

প্রথম শ্রেণীর গাছ অর্থাৎ মানুষের চেষ্টা ছাড়া শুধু প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন গাছ কাটার বিনিময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, মালেক বলেন : এতে কোনো বিনিময় নেই। কেবল গুনাহ হবে। আতা বলেন : ক্ষমা চাইবে। আবু হানিফা বলেন : এর মূল্য অনুপাতে একটা উপহার অর্থাৎ জন্তু আদায় করা হবে। শাফেয়ী বলেছেন : বড় গাছ হলে একটা গরু এবং ছোট গাছে ছাগল দিতে হবে। মানুষের চেষ্টা ছাড়া আপনা আপনি ভাংগা ডাল, আপনা আপনি উপড়ে যাওয়া গাছ ও ঝরা পাতা কাজে লাগানো যাবে বলে আলেমগণ রায় দিয়েছেন।

ইবনে কুদামা বলেছেন : হারামের সীমানার ভেতরে মানুষের উৎপাদিত ফসল, তরকারি ও সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ করা, কাটা ও তা লালন পালন করার ব্যাপারে আলেমদের সর্বসম্মত সম্মতি রয়েছে। রওযা নাদিয়া গ্রন্থে আছে : মক্কার হারাম শরিফে শিকার করা ও গাছ কাটায় ইহরামমুক্ত ব্যক্তির গুনাহ হবে। তবে কোনো বিনিময় দিতে হবেনা। তবে যে ব্যক্তি ইহরাম থাকে, শিকারের জন্য আল্লাহ তায়ালার ঘোষিত বিনিময় দেয়া তার জন্য অপরিহার্য। তবে মক্কার গাছ কাটার জন্য কোনো বিনিময় দিতে হবেনা। কেননা এর স্বপক্ষে কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই। অতপর ইবনে কুদামা বলেছেন : মোদ্দাকথা হলো, শিকার হত্যায় নিষেধাজ্ঞা ও গাছ কাটার নিষেধাজ্ঞার মাঝে এবং বিনিময় বা মূল্য দেয়ার বাধ্যবাধকতার মাঝে কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। বরং এই নিষেধাজ্ঞাই প্রকাশ করে যে, শিকার করা ও গাছ কাটা হারাম। আর বিনিময় ও মূল্য বিনা প্রমাণে ওয়াজিব হয়না। সূরা মায়েদার উপরোক্ত ৯৫নং আয়াত ব্যতিত এর আর কোনো প্রমাণ নেই। অথচ এ প্রমাণে শুদ্ধ বিনিময়ের উল্লেখ রয়েছে। কাজেই বিনিময় ছাড়া অন্য কিছু দিতে হবেনা।

১০. মক্কার হারাম শরিফের সীমানা

মক্কার হারাম শরিফের সুনির্দিষ্ট সীমানা রয়েছে। এই সীমানা সমগ্র মক্কা নগরীকে বেষ্টন করে রেখেছে। এর পাঁচ দিকে পাঁচটা প্রতীক রয়েছে। এই প্রতীকগুলো হলো রাস্তার দু'পাশে এক মিটার উপরে রক্ষিত কয়েকটি পাথর। উত্তর দিক থেকে এর সীমানা হলো মক্কা থেকে ছয় কি: মি: দূরে অবস্থিত তানয়ীম। দক্ষিণে এর সীমানা ১২ কি: মি: দূরে অবস্থিত আদাহ। পূর্ব দিক থেকে এর সীমা ১৬ কি: মি: দূরে অবস্থিত জিরানা। উত্তর পূর্ব দিকে সীমানা ১৪ কি: মি: দূরে অবস্থিত 'ওয়াদি নাখেলা'। আর পশ্চিম দিকে সীমানা ১৫ কি: মি: দূরে অবস্থিত 'শুমাইছী' এরই পূর্ব নাম হুদাইবিয়া। যেখানে 'বাইয়াতুর রিদওয়ান' সংঘটিত হয়।

মুহিবুদ্দীন তাবারি উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন : মক্কার হারাম শরিফের এই সীমানা চিহ্নগুলো ইবরাহিম আ. স্থাপন করেছিলেন এবং জিবরাঈল আ. তাকে এগুলো দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর এ সীমানা আর কেউ নাড়ায়নি। যখন কুসাই এলেন, তখন তিনি এর সংস্কার করলেন। এরপর আর কেউ সীমানা নাড়ায়নি। অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ সা. এলেন, তখন তিনি মক্কা বিজয়ের বছর তামীম বিন উসাউদ খাযায়ীকে পাঠালেন এবং তিনি সীমানা চিহ্নগুলো সংস্কার করলেন। এরপর এই সীমানা আর কেউ নাড়ায়নি। অবশেষে যখন উমর রা. এলেন তখন তিনি কুরাইশের চার জন নেতাকে পাঠালেন। তারা হলেন : মাহরামা বিন নওফেল, সাঈদ বিন ইয়ারবু, হুয়াইতিব বিন আব্দুল উযযা ও আযহার বিন আবদ আওফ। তারা এ চিহ্নগুলো সংস্কার করলেন। এরপর মুয়াবিয়াও এর সংস্কার করেন। তারপর আব্দুল মালেক এর সংস্কারের আদেশ জারি করেন।

১১. মদিনার হারাম শরিফ

মক্কার হারাম শরিফে শিকার ও গাছপালা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি মদিনার শিকার ও গাছপালা নিষিদ্ধ।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইবরাহিম আ. মক্কাকে নিষিদ্ধ ও নিরাপদ নগরীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর আমি মদিনাকে নিষিদ্ধ ও নিরাপদ নগরীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি এর দুটো পাথুরে ভূমির মাঝখানে। এর কোনো কাঁটাযুক্ত গাছ কাটা হবেনা এবং কোনো প্রাণী শিকার করা হবেনা। - মুসলিম।

আর আহমদ ও আবু দাউদ আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূল সা. মদিনা সম্পর্কে বলেছেন : কেউ এর গাছ কাটবেনা, কেউ এর শিকার তাড়াবেনা, এখানে পাওয়া কোনো হারানো জিনিস কুড়াবেনা, কেবল যে ব্যক্তি তা ঘোষণা করবে সে ব্যতিত। কোনো ব্যক্তি লড়াইর জন্য এখানে অস্ত্র বহন করবেনা, এখানে কেউ কোনো গাছ কাটবেনা কেবল যে ব্যক্তি তার উটকে খাওয়াতে চায় সে ব্যতিত। "বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেন : "ঈর পাহাড় থেকে ছূর পাহাড় পর্যন্ত মদিনা একটি সম্মানিত নগরী।" আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : মদিনার দুই পাথুরে ভূখণ্ডের মাঝে রসূল সা. মদিনাকে সম্মানিত করেছেন এবং মদিনার চার পাশে বারো মাইল এলাকাকে সুরক্ষিত এলাকা বানিয়েছেন। দুই পাথুরে ভূখণ্ড পূর্ব দিকের পাথুরে ভূখণ্ড ও পশ্চিম দিকের পাথুরে ভূখণ্ডের মাঝে মদিনার হারাম শরিফের আয়তন বারো মাইল বলে ধারণা করা হয় যা ঈর থেকে ছূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ঈর হলো মীকাতের নিকটবর্তী একটি পাহাড় আর ছূর উত্তর দিকে ওহুদের পার্শ্ববর্তী পাহাড়।

রসূলুল্লাহ সা. মদিনাবাসীকে কৃষি সরঞ্জমাদি, বাহনের সরঞ্জমাদি, ইত্যাকার অপরিহার্য জিনিসপত্র তৈরি করার জন্য গাছ গাছালি কাটার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের পশুদের খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ঘাস কাটারও অনুমতি দিয়েছেন।

আহমদ জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মদিনা তার দুই পাথরে ভূখণ্ডের মাঝে নিষিদ্ধ নগরী, এর সম্পূর্ণটাই সুরক্ষিত পশুকে খাওয়ানোর জন্য ব্যতিত এর কোনো গাছ কাটা যাবেনা।"

মক্কার হারাম শরিফের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা মক্কাবাসী তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসে স্বয়ং সম্পূর্ণ। কিন্তু মদিনাবাসী তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। মদিনার হারাম শরিফের শিকার হত্যায় ও গাছ কাটায় কোনো বিনিময় দিতে হয়না। কিন্তু গুনাহ হয়।

বুখারিতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন : মদিনা এখান থেকে ওখান পর্যন্ত সুরক্ষিত সম্মানিত নগরী। এর কোনো গাছ কাটা হবেনা। এখানে কোনো নতুন জিনিসের উদ্ভব ঘটানো হবেনা। যে ব্যক্তি এখানে কোনো নতুন জিনিসের উদ্ভব ঘটাবে, তার ওপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। যে ব্যক্তি মদিনার কোনো গাছ কর্তিত দেখতে পায়, তার জন্য কর্তিত অংশ নেয়া বৈধ। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত : তিনি আকীকে তার বাসভবনে গেলেন। সেখানে একটা ক্রীতদাসকে দেখলেন একটা গাছ কাটছে বা লাঠি দ্বারা গাছের পাতা পাড়ছে। তিনি তার কাছ থেকে তা কেড়ে নিলেন। পরে দাসটির আপন জনেরা এসে সা'দকে অনুরোধ করলো দাসটির কাছ থেকে কেড়ে নেয়া জিনিস ফেরত দিতে। সা'দ বললেন : আল্লাহর রসূল সা. যা আমাকে দান করেছেন, তা আমি কখনো দেবোনা। আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। শেষ পর্যন্ত তিনি তা ফেরত দিলেন না। মুসলিম আবু দাউদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন : মদিনার হারাম শরিফে তোমরা যাকে শিকার করতে দেখবে। তার কাছ থেকে তোমরা তা কেড়ে নিতে পারো।

আর কোনো নিরাপদ হারাম আছে কি?

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : মক্কা ও মদিনার এই দুই হারাম ব্যতিত সারা পৃথিবীতে আর কোনো হারাম শরিফ নেই। বাইতুল মাকদাস বা অন্য কোনো স্থান হারাম নয়। মক্কা ও মদিনা ব্যতিত পৃথিবীর আর কোনো স্থান হারাম নামে আখ্যায়িতও নয়। অজ্ঞ লোকেরা যদিও বাইতুল মাকদাসকে হারামুল মাকদাস এবং খলীল নগরীকে হারামুল খলীল নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু এ দুটি বা অন্য কোনো স্থান মুসলমানদের সর্বসম্মত মত অনুসারে হারাম তথা নিরাপদ স্থান নয়। সর্বসম্মত হারাম হচ্ছে মক্কার হারাম শরিফ। অধিকাংশ আলেমের নিকট মদিনাও হারাম এবং এর পক্ষে রসূল সা. থেকে প্রচুর হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তায়েফের 'উজা' (وجاء) হচ্ছে একমাত্র তৃতীয় স্থান, যার হারাম হওয়া মুসলমানদের মধ্যে বিতর্কিত। শাফেয়ী ও শওকানিসহ কেউ কেউ এটিকে হারাম মনে করেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম ইমাম ও মনীষী একে হারাম মনে করেন না।

১২. মদিনার উপর মক্কার শ্রেষ্ঠত্ব

অধিকাংশ আলেমের মতে মক্কা মদিনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযি আব্দুল্লাহ বিন আদী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : আল্লাহর কসম, তুমি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম ভূখণ্ড এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়তম ভূখণ্ড। আমাকে যদি তোমা থেকে বহিষ্কৃত করা না হতো, তবে আমি বের হতামনা।" তিরমিযি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : আমার নিকট তোমার চেয়ে ভালো ও প্রিয় নগরী আর নেই। আমার জাতি যদি আমাকে তোমা থেকে বের করে না দিতো, তবে আমি তোমার যমীনে ব্যতীত আর কোথাও বসবাস করতামনা।"

১৩. ইহরাম ব্যতিত মক্কায় প্রবেশ

যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরা করতে ইচ্ছুক নয়, তার জন্য ইহরাম ব্যতিত মক্কায় প্রবেশ বৈধ চাই তার প্রবেশ এমন কোনো প্রয়োজনে হোক, যা ঘন ঘন দেখা দেয়, যেমন কাঠ ঘাস ও পানির সরবরাহকারী ও সংগ্রহকারী শিকারী ইত্যাদি অথবা ঘন ঘন দেখা দেয়না, যেমন ব্যবসায়ী পর্যটক ইত্যাদি এবং চাই সে নিরাপদ ব্যক্তি হোক অথবা আতংকগ্রস্ত হোক। ইমাম শাফেয়ীর দুটি মতের মধ্যে এটি বিশুদ্ধতর মত। তার শিষ্যরা এই মত অনুসারেই ফতোয়া দিয়ে থাকেন।

মুসলিমের হাদিসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. কালো পাগড়ি মাথায় দিয়ে বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি কোনো এক সফর থেকে ফিরে বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

ইবনে শিহাব বলেছেন : বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশে কোনো বাধা নেই। ইবনে হাযম বলেছেন : বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ বৈধ। কেননা রসূল সা. শুধুমাত্র হজ্জ ও ওমরা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরা পালনে ইচ্ছুক নয়, তার জন্য মীকাত নির্ধারণ করেননি। আল্লাহ ও তার রসূল সা. কোথাও এ মর্মে আদেশ দেননি যে, মক্কায় বিনা ইহরামে প্রবেশ করা যাবেনা। সবার জন্য ইহরাম বাধ্যতামূলক করা হলে তা হবে শরিয়ত বহির্ভূত একটা বিধি।

১৪. মক্কা শরিফ ও মসজিদুল হারামে প্রবেশের জন্য যা যা করা মুস্তাহাব

মক্কায় প্রবেশের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করা মুস্তাহাব :

১. গোসল করা। বর্ণিত আছে, ইবনে উমর রা. মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করতেন।

২. আয যাহের অঞ্চলের যীতুয়াতে রাত যাপন। কেননা রসূলুল্লাহ সা. সেখানে রাত্র যাপন করছেন। নাফে বলেছেন : ইবনে উমরও এরূপ করতেন। -বুখারি ও মুসলিম।

৩. সর্বোচ্চ গিরিপথ ছানিয়া কিদা দিয়ে প্রবেশ করা। রসূলুল্লাহ সা. মুয়াল্লার দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন। যার পক্ষে এটা সহজ সাধ্য হয়, সে এই পথ দিয়ে প্রবেশ করবে। নচেত যেদিক দিয়ে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব সেদিক দিয়ে প্রবেশ করবে। এতে কোনো বাধা নেই।

৪. কোনো নিরাপদ জায়গায় জিনিসপত্র রেখে আল্লাহর ঘরে যাওয়া এবং বনু শায়বার প্রবেশ দ্বার বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করা এবং একাগ্রতা ও কাকুতি মিনতি সহকারে বলা :

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ وَسَلِّمْ.

“মহামহিম আল্লাহর নিকট তারা মহিমান্বিত সত্তার নিকট তার অনাদি ও অনন্ত পরাক্রমের নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ মুহাম্মদের উপর ও তাঁর বংশধর ও অনুসারিদের ওপর রহমত ও সালাম পাঠাও। হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করো এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দুয়ার খুলে দাও।”

৫. আল্লাহর ঘরের ওপর দৃষ্টি পড়া মাত্রই হাত উঁচু করে বলবে :

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا، وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ، أَوْ اعْتَمَرَهُ وَتَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا.

“হে আল্লাহ, এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করো, এ ঘরের প্রতাপ বৃদ্ধি করো, যে সকল হাজি ও ওমরাকারী এ ঘরকে সম্মান করবে তাদেরও সম্মান ও নেক আমল বৃদ্ধি করো।” -শাফেয়ী কর্তৃক বর্ণিত। তারপর বলবে :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

“হে আল্লাহ, তুমি শান্তি, তোমার কাছ থেকেই শান্তি আসে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে শান্তিতে জীবন যাপন করাও।”

৬. এরপর হাজরে আসওয়াদের কাছে যাবে এবং তাকে বিনা শব্দে চুমু দেবে। চুমু দিতে না পারলে হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে ও হাতকে চুমু দেবে। তাও করতে না পারলে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করবে।

৭. তারপর হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে তওয়াফ শুরু করবে।

৮. তাহিয়াতুল মসজিদ নামায পড়বেনা। কেননা এখানে তওয়াফই তাহিয়াতুল মসজিদ (মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অভিবাদন)। তবে ফরয নামায শুরু হয়ে গেলে বা আসন্ন হলে ইমামের সাথে তা পড়বে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : “যখন জামাতে নামায শুরু হয় তখন ফরয ব্যতিত আর কোনো নামায নেই।” অনুরূপ যদি আশংকা হয় নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবে তা হলে আগে ফরয নামায পড়ে নেবে তারপর তওয়াফ করবে।

১৫. তওয়াফ

তওয়াফের নিয়ম : ১. বগলের নিচে দিয়ে বাম কাঁধে চাদর জড়িয়ে (যদি চাদর গায়ে থাকে) হাত উঁচু করে হাজরে আসওয়াদকে বরাবর রেখে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে, তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে অথবা তার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে, কা'বা শরিফকে বামে রেখে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে তওয়াফ শুরু করা :

بِسْمِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَإِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ص

আল্লাহর নামে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, তোমার প্রতি ঈমান সহকারে। তোমার কিতাবকে মান্য করে, তোমার সাথে কৃত অংগীকার পূরণার্থে এবং তোমার নবীর সুন্নত পালনার্থে (তওয়াফ শুরু করছি)।

২. যখন তওয়াফ শুরু করবে, তখন প্রথম তিন চক্করে রমল করা মুস্তাহাব। রমলের নিয়ম হলো, জোরে জোরে ঘন ঘন পা ফেলে কা'বার নিকটবর্তী হবার চেষ্টা সহকারে হাঁটবে। অবশিষ্ট চারটি চক্করে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবে। রমল করতে অসমর্থ হলে কিংবা তওয়াফকারীদের ভিড়ের কারণে কা'বার নিকটবর্তী হতে না পারলে যেভাবে সহজতর হয় সেভাবেই তওয়াফ করবে। সাত চক্করের প্রত্যেক চক্করে রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা এবং হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া কিংবা স্পর্শ করা মুস্তাহাব।

৩. তওয়াফের সময় যতো বেশি পারা যায় দোয়া ও যিকর করা। যে দোয়া ও যিকর নিজের মনোপূত তা করা এবং কোনো নির্দিষ্ট দোয়া ও যিকর কিংবা তওয়াফ গাইডের শেখানো দোয়া ও যিকরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকা মুস্তাহাব। কেননা শরিয়ত প্রণেতা আমাদের জন্য কোনো নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট দোয়া ও যিকর করা বাধ্যতামূলক করেননি। কেউ কেউ যেভাবে প্রথম চক্করের জন্য কিছু নির্দিষ্ট দোয়া ও যিকর এবং দ্বিতীয় চক্করের জন্য অন্য কিছু নির্দিষ্ট দোয়া ও যিকরের উপদেশ দেয় তার কোনো ভিত্তি নেই। রসূলুল্লাহ সা. এর কাছ থেকে এ ধরনের কোনো নির্দিষ্ট দোয়া ও যিকর পাওয়া যায়নি। তওয়াফকারীর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে নিজের জন্য, নিজের ভাই বন্ধুদের জন্য যেমন ইচ্ছা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ চেয়ে দোয়া করতে পারে। হাদিস থেকে যে কটি দোয়া জানা গেছে, তা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

১. রসূলুল্লাহ সা. থেকে মরফু সূত্রে বর্ণিত : যখন হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করবে তখন বলবে :

اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ .

"হে আল্লাহ, তোমার প্রতি ঈমান সহকারে, তোমার কিতাবের প্রতি মান্যতা সহকারে। তোমার সাথে কৃত অংগীকার পালনের উদ্দেশ্যে এবং তোমার নবীর সুন্নতের অনুসরণের লক্ষ্যে, বিসমিল্লাহ, আল্লাহ আকবর।"

২. ইবনে মাজাতে বর্ণিত, তওয়াফ শুরু করেই বলবে :

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ .

৩. রুকনে ইয়ামানীর কাছে পৌঁছলে বলবে :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও, আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দাও।" - আবু দাউদ, শাফেয়ী।

৪. ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : যখনই হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসবে, আল্লাহু আকবর বলবে এবং রমলের সময় বলবে : হে আল্লাহ, এ হজ্জকে হজ্জ মাবরুর (যে হজ্জ সকল গুনাহ থেকে মুক্ত করে) বানাও। সকল গুনাহ মাফ করো এবং সকল চেষ্টা সাধনা কবুল করো। আর তওয়াফের প্রত্যেক চক্করে বলবে : "হে আল্লাহ, মাফ করো ও দয়া করো। যতো গুনাহর কথা তুমি জান তা সব মাফ করো। তুমিই তো সবচেয়ে প্রতাপশালী। সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দাও, আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং দোযখের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও।" ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : তিনি (ইবনে আব্বাস) উভয় রুকনের মাঝে বলতেন :

"হে আল্লাহ যে জীবিকা তুমি দিয়েছো, তাতেই আমাকে তৃপ্তি দাও। তাতে বরকত দাও এবং আমার যা কিছু হারিয়েছে তার চেয়ে উত্তম জিনিস দ্বারা ক্ষতিপূরণ করো।" হাফেয সাঈদ বিন মানসূর এবং হাকিম।

৫. তারপর যখন সাত চক্কর তওয়াফ সমাপ্ত করবে তখন মাকামে ইবরাহিমের নিকট দু'রাকাত নামায পড়বে এবং পবিত্র কুরআনের এই অংশটি পড়তে থাকবে : وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. "মাকামে ইবরাহিম (ইবরাহিমের দাঁড়ানোর জায়গা) থেকে একটি জায়গা নামাযের জন্য নির্বাচন করো।" এর মাধ্যমে তওয়াফ সমাপ্ত হয়। তওয়াফকারী যদি ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী হয় তাহলে এই তওয়াফকে 'তওয়াফ কুদুম' (আগমনের তওয়াফ), তওয়াফুত্ তাহিয়া (অভিবাদনের বা শ্রদ্ধা ভাজনের তওয়াফ) এবং তাওয়াফুদ দুখুল (প্রবেশের তওয়াফ) নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ তওয়াফ হজ্জের রুকন অর্থাৎ অপরিহার্য অংশ নয় এবং ওয়াজিব নয়। আর কিরান বা তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর জন্য এ তওয়াফ 'ওমরার তওয়াফ' হিসেবে গণ্য। এ তওয়াফ দ্বারা তার তওয়াফুত তাহিয়া ও তওয়াফ কুদুমও আদায় হয়ে যাবে। কিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীকে এরপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করার মধ্য দিয়ে ওমরা সমাপ্ত করতে হবে।

তওয়াফকারীর কুরআন তেলাওয়াত : তওয়াফকারী তওয়াফের সময় কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। কারণ তওয়াফ আল্লাহর যিকরের জন্যই শরিয়তে বিধিবদ্ধ হয়েছে। আর কুরআন হলো যিকর।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহর ঘরে ও সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ এবং কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য আল্লাহর স্মরণকে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া আর কিছু নয়। - আবু দাউদ, তিরমিযি।

তওয়াফের ফযিলত : বায়হাকি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহ তাঁর মহিমান্বিত ঘরে এসে হজ্জ আদায়কারীদের জন্য একশো বিশিষ্ট রহমত বরাদ্দ করেছেন। ষাটটি তওয়াফকারীর জন্য, চল্লিশটি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং বিশটি দর্শকদের জন্য। (অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের প্রতি দৃষ্টিপাতকারীদের জন্য)

তওয়াফ কয় প্রকার ও কী কী : তাওয়াফ চার প্রকার। যেমন : ১. তওয়াফ কুদুম, ২. তওয়াফ ইযাকা, ৩. তওয়াফ বিদা ও ৪. নফল তওয়াফ। এসব তাওয়াফ করা প্রত্যেক হাজির কর্তব্য। মক্কায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যতো বেশি সম্ভব নফল তওয়াফ করা ও মসজিদুল হারামে নামায পড়া দরকার। কেননা মসজিদুল হারামের নামাযের সওয়াব অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশি। নফল তওয়াফে রমল ও চাদর বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধে জড়ানো জরুরি নয়। মসজিদুল হারামে যতোবার প্রবেশ করা হয়, ততোবার তওয়াফ দ্বারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করা সুন্নত। অন্যান্য মসজিদের বেলায় 'তাহিয়াতুল মসজিদ'-এর দু'রাকাত নফল দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।

তওয়াফের 'কিছু শর্ত', কিছু সুন্নত ও কিছু আদব রয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

তওয়াফের শর্তাবলি : তওয়াফের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পালন করা আবশ্যক :

১. সর্বপ্রকারের নাপাকি থেকে : যথা ছোট নাপাকি থেকে (ওযুর মাধ্যমে) বড় নাপাকি থেকে (গোসলের মাধ্যমে) এবং নাপাক রক্ত থেকে (সংশ্লিষ্ট জায়গা ধুয়ে ফেলার মাধ্যমে) পবিত্র হওয়া। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তওয়াফ এক প্রকার নামায। ব্যতিক্রম শুধু এই যে, আল্লাহ এতে কথা বলা বৈধ করেছেন। যে ব্যক্তি কথা বলছে, সে যেনো ভালো বিষয়ে ছাড়া কথা না বলে।" তিরমিযি, দার কুতনি। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. তার কাছে গিয়ে

দেখলেন, আয়েশা কাঁদছেন। তিনি বললেন : তোমার কি হায়েয হয়েছে? আয়েশা বললেন! হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : এটা এমন একটা জিনিস, যা আল্লাহ আদমের মেয়েদের জন্য অনিবার্য করে দিয়েছেন। সুতরাং অন্যান্য হাজি যা যা করে, তুমি তার সবই করো। কেবল কা'বা শরিফে তওয়াফ করোনা যতোক্ষণ না গোসল করো। -মুসলিম।

আয়েশা রা. আরো বলেন : রসূলুল্লাহ্ সা. যখনই মক্কায় আসতেন। সর্বাগ্রে ওযু করে আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করতেন। - বুখারি ও মুসলিম। যে ব্যক্তি এমন নাপাকি বহন করে যা দূর করা সম্ভব নয়। যেমন অবিরাম পেশাব-এর রোগ এবং মহিলাদের ইস্তিহাযা রোগ, যা অবিরাম রক্তস্রাব ঘটায়, সে তওয়াফ করতে পারবে। এতে কোনো কাফফারা দিতে হবেনা। এটা সর্বসম্মত মত।

মালেক বর্ণনা করেন : এক মহিলা আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলো। সে বললো : আমি আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। মসজিদুল হারামের দরজার কাছে আসতেই আমার রক্তস্রাব শুরু হয়ে গেছে। তাই আমি ফিরে গেলাম। তারপর আমি তা থেকে মুক্ত হলাম। তারপর আবার তওয়াফ করতে এলাম। কিন্তু যখনই মসজিদুল হারামের দরজার কাছে এসেছি, অমনি স্রাব শুরু হলো। এভাবে তিনবার হলো। আব্দুল্লাহ বললেন : এটা শয়তানের পক্ষ থেকে একটা আঘাত। অতএব তুমি গোসল করো, একটা নেকড়া দিয়ে স্রাবের মুখে পট্টি বাঁধ এবং তওয়াফ করো। (হানাফীদের মতে ছোট নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া তওয়াফের শর্ত নয়। এটা ওয়াজিব এবং একটা কুরবানি (দম) দ্বারা এর ক্ষতি পূরণ হয়। ছোট নাপাকি নিয়ে বিনা ওযুতে তওয়াফ করলে তওয়াফ শুদ্ধ হবে এবং একটা ছাগল কুরবানি করা ওয়াজিব হবে। আর বড় নাপাকি নিয়ে অথবা ঋতুবতী অবস্থায় তওয়াফ করলে তাও শুদ্ধ হবে কিন্তু একটা উট কুরবানি করতে হবে এবং মক্কায় অবস্থান কালে কাযা করতে হবে। আর কাপড় বা শরীরে লেগে থাকা নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া সুন্নত মাত্র।)

২. শরীরের গোপনীয় অংশ আবৃত করা : আবু হুরায়রা রা. বলেছেন : বিদায় হজ্জের আগের যে হজ্জটিতে রসূল সা. আবু বকর রা.কে হজ্জের আমির নিযুক্ত করেছিলেন, সেই হজ্জে আবু বকর আমাকে একটি দলের সদস্য করে মক্কায় পাঠালেন। এই দলের দায়িত্ব ছিলো এই মর্মে ঘোষণা দেয়া যে, এ বছরের পর কোনো মোশরেক আর হজ্জ করতে পারবেনা এবং কা'বা শরিফে কোনো ব্যক্তি উলংগ হয়ে তওয়াফ করতে পারবেনা। বুখারি ও মুসলিম। (হানাফীদের মতে, শরীরের গোপনীয় অংশ ঢাকা শর্ত নয়, ওয়াজিব। কেউ যদি নগ্ন হয়েও তওয়াফ করে। তবে তা শুদ্ধ হবে এবং তা কাযা করতে হবে। তবে মক্কা থেকে বের হয়ে গেলে একটা ছাগল কুরবানি করতে হবে।)

৩. তওয়াফে সাতটি চক্কর পূর্ণ করতে হবে। কোনো চক্করে এক কদম যদি বাকি থাকে, তবে তওয়াফ শুদ্ধ হবেনা। আর যদি চক্করের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হয়। তাহলে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যাটি ধরে গণনা করবে। যাতে সাতটি চক্কর নিশ্চিত হয়। তওয়াফ শেষ করার পর সন্দেহ হলে তার আর কিছুই করণীয় থাকবেনা। তওয়াফ শুদ্ধ হবে।

৪. হাজরে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ শুরু করা এবং হাজরে আসওয়াদ এসে শেষ করা।

৫. বাইতুল্লাহ (কা'বা) কে বাম দিকে রেখে তওয়াফ করতে হবে। ডান দিকে রেখে তওয়াফ করলে তওয়াফ শুদ্ধ হবেনা। কেননা জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. যখন মক্কায় এলেন। হাজরে আসওয়াদের কাছে এলেন এবং তা স্পর্শ করলেন। তারপর তার ডান দিক দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তিন চক্করে রমল করলেন এবং চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে চললেন। (ঘাড় ঝুলিয়ে জোরে জোরে হাঁটার নাম রমল। হানাফীদের মতে, তওয়াফের রুকন অর্থাৎ অপরিহার্য সর্বনিম্ন পরিমাণ হজ্জে চার চক্কর। বাকি তিন চক্কর ওয়াজিব এবং তা বাদ পড়লে একটা ছাগল কুরবানি দিয়ে ক্ষতি পূরণ করা যায়।) মুসলিম।

৬. তওয়াফ বাইতুল্লাহর (কা'বার) বাইরে দিয়ে করতে হবে। হাজরে ইসমাঈলের ভেতরে তওয়াফ করলে তওয়াফ শুদ্ধ হবেনা। কেননা হাজরে ইসমাঈল ও সাজরাওয়ান বাইতুল্লাহর অংশ। (হাজরে ইসমাঈল কা'বার উত্তরে একটি অর্ধবৃত্তাকার বেষ্টনীতে আবদ্ধ। এই হাজরে ইসমাঈল পুরোটা বাইতুল্লাহর অংশ নয়। এর প্রায় তিন মিটার বাইতুল্লাহর অংশ। চার সাজরাওয়ান হচ্ছে কা'বার ভিত্তির সংলগ্ন স্থাপনটির নাম, যার ওপর কা'বার পর্দার রিং রাখা হয়।) আল্লাহ তায়ালা বাইতুল্লাহর পাশে তওয়াফ করতে বলেছেন। বাইতুল্লাহর ভেতরে নয়। তিনি বলেছেন : তারা যেনো প্রাচীন কা'বা গৃহের তওয়াফ করে।" (তওয়াফ শব্দের অর্থই কোনো জিনিসের বাইরের পাশ দিয়ে ঘোরা) সম্ভব হলে বাইতুল্লাহর কাছাকাছি থেকে তওয়াফ করা মুস্তাহাব।

৭. বিরতিহীনভাবে তওয়াফ করা মালেক ও আহমাদের মতে শর্ত। বিনা ওযরে স্বল্প বিরতি এবং ওযর থাকলে কিছুটা বেশি বিরতি দেয়াতে ক্ষতি নেই। হানাফী ও শায়েফীদের মতে বিরতিহীন তওয়াফ করা সুন্নত, শর্ত নয়। বিনা ওযরে তওয়াফের মাঝখানে দীর্ঘ বিরতি দিলে তওয়াফ বাতিল হবেনা। বিরতির পূর্বে যতটুকু তওয়াফ করা হয়েছিল বিরতি পর বাকিটুকু করে তওয়াফ শেষ করবে। সাঈদ বিন মনসূর বর্ণনা করেন : হামিদ বিন যায়দ বলেছেন : আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে দেখেছি। বাইতুল্লাহর তিন বা চার চক্কর তওয়াফ করে বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং তার জনৈক খাদেম তাকে বাতাস করছে। কিছুক্ষণ পর তিনি উঠলেন এবং তওয়াফের যেটুকু সম্পন্ন করেছিলেন তার পরবর্তী অংশ সম্পন্ন করলেন। শাফেয়ী ও হানাফী মতানুসারে তওয়াফের মাঝখানে ওযু ছুটে গেলে ওযু করে নেবে এবং তওয়াফের অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন করবে। নতুন করে শুরু করার প্রয়োজন নেই, চাই বিরতি যতো দীর্ঘ হোক না কেনো।

ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাইতুল্লাহর তওয়াফ করছিলেন। ইতিমধ্যে নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গেলো। তিনি জামাতের সাথে নামায পড়লেন। তারপর তওয়াফের যেটুকু বাকি ছিলো তা শেষ করলেন। আতা বললেন : কোনো ব্যক্তি তওয়াফের একাংশ শেষ করার পর জানাযা উপস্থিত হলে তওয়াফ স্থগিত করে জানাযার নামায পড়ে নেবে। তারপর তওয়াফে ফিরে যাবে এবং যেটুকু বাকি ছিলো তা সম্পূর্ণ করবে।

তওয়াফের সুন্নতসমূহ : তওয়াফের কিছু সুন্নত রয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. তওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে নামাযের মতো দু'হাত উঁচু করে আল্লাহু আকবর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। হাজরে আসওয়াদের উপর দু'হাত রেখে তা স্পর্শ করে ও বিনা শব্দে চুমু দিয়ে তার ওপর কপাল রাখবে। কপাল রাখা সম্ভব না হলে শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করবে ও চুমু দেবে অথবা নিজের কাছে থাকা কোনো জিনিস দ্বারা স্পর্শ করবে ও তাকে চুমু দেবে। অথবা তার দিকে কোনো লাঠি ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করবে। এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি :

ইবনে উমর রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করলেন ও তাকে স্পর্শ করলেন। তারপর নিজের ঠোঁটদ্বয় রাখলেন এবং দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। উমরও রা. দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। তখন রসূল সা. বললেন : হে উমর এই জায়গাতেই বেশি করে চোখের পানি ফেলতে হয়। -হাকেম।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, উমর রা. হাজরে আসওয়াদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন : আমি জানি তুমি একটা পাথর। যদি না দেখতাম আমার প্রিয় নবী তোমাকে চুমু দিচ্ছেন ও স্পর্শ করছেন, তবে আমি তোমাকে স্পর্শও করতামনা, চুমুও দিতামনা। আল্লাহ বলেছেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. "আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।" -আহমদ এবং অন্যান্য।

নাফে বলেন, ইবনে উমর রা. কে দেখেছি প্রথমে হাজরে আসওয়াদ হাত দিয়ে স্পর্শ করেছেন।

তারপর হাতকে চুমু খেয়েছেন এবং বলেছেন : রসূল সা. কে এরূপ করতে দেখার পর থেকে আমি কখনো এরূপ করা বন্ধ করিনি। -বুখারি ও মুসলিম।

সুয়াইদ বিন গাফলা রা. বলেছেন, উমর রা. কে দেখেছি হাজরে আসওয়াদকে চুমু খেতেন এটা সব সময় অব্যাহত রাখতেন এবং বলতেন : রসূলুল্লাহ সা. কে তোমার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ও সমাদরকারী দেখেছি। মুসলিম।

ইবনে উমর রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বাইতুল্লায় এসেই হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করতেন এবং বলতেন : 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর।' আহমদ

আবুত তুফাইল বলেছেন : রসূল সা. কে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে দেখেছি এবং তার কাছে থাকা একটা বাঁকা মাথা বিশিষ্ট লাঠি ধারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করছেন। অতপর সেই লাঠিকে চুম্বন করেছেন। মুসলিম।

বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, উমর রা. হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতেন। তারপর বলতেন : আমি জানি তুমি একটা পাথর। কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারোনা। আমি যদি না দেখতাম রসূলুল্লাহ সা. তোমাকে চুম্বন করছেন, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতামনা।

খাত্তাবি বলেন : এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, সুন্নতের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক যদিও তার কোনো কারণ বা যুক্তি জানা না যায়। যখনই কোনো সুন্নত কেউ জানতে পারবে, তখন তার যুক্তি না বুঝলেও তা পালন করা তার জন্য অপরিহার্য। অবশ্য মোটামুটিভাবে এটা সবার জানা আছে যে, রসূল সা. কর্তৃক হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার উদ্দেশ্য তাকে সম্মান প্রদর্শন করা। তার যথাযথ মর্যাদা দান ও তার দ্বারা বরকত লাভ করা ব্যতিত কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা কিছু পাথরকে অন্যান্য পাথরের উপর কিছু শহর ও স্থানকে অন্যান্য শহর ও স্থানের উপর এবং কিছু রাত দিন ও মাসকে অন্যান্য রাত দিন ও মাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এসব কিছুর ভিত্তি হলো, আল্লাহর রসূলের প্রদর্শিত কার্যধারার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য।

কোনো কোনো হাদিসে একটা কথা বলা হয়েছে, যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। সেটি হলো : "হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত।" এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে, আল্লাহর কাছে সে একটা প্রতিশ্রুতি লাভ করবে। রাজা বাদশারা যেমন কাউকে মিত্র হিসেবে পেতে চাইলে বা কারো সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হলে তার সাথে হাত মিলিয়ে সে ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে অথবা রাজা বাদশাদের হাতে যেমন হাত দিয়ে বায়াত করা হয়, এটাও তেমনি। অনুরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাত চুম্বন করে যেমন চাকর নকররা তার নৈকট্য লাভ করে, এটাও তারই সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

কিন্তু মুহাল্লাব বলেছেন : "হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত, এ দ্বারা যে বান্দার সাথে তিনি ইচ্ছা করেন হাত মেলান।" অবশ্য কথিত এই হাদিসটি উমর বা তার উক্ত হাদিস দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কেননা আল্লাহর হাত থাকতে পারে এমন কথা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত। হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার আদেশ দিয়েছেন শুধু এজন্য যেনো কে কতটা আল্লাহর অনুগত তা চাক্ষুসভাবে পরীক্ষা হয়ে যায়। আদমকে সাজদা করতে ইবলিসকে আদেশ দানের ঘটনার মধ্যে এর নজীর বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, ইবরাহিম আ. কর্তৃক কাবার যেসব পাথর স্থাপিত হয়েছিল তার মধ্য থেকে হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত আর কোনো পাথর অবশিষ্ট আছে কিনা, নিশ্চিতভাবে জানা যায়না।

হাজরে আসওয়াদের কাছে প্রতিযোগিতা করা জায়েয। হাজরে আসওয়াদে কাউকে কষ্ট না দেয়ার শর্তে প্রতিযোগিতা করাতে কোনো দোষ নেই। ইবনে উমর রা. প্রতিযোগিতা করতে

গিয়ে নিজের নাককে রক্তাক্ত করে ফেলেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ সা. উমর রা.-কে বলেছিলেন : ওহে আবু হাফস, তুমি অতিশয় শক্তিশালী মানুষ। তুমি হাজরে আসওয়াদের কাছে প্রতিযোগিতা করোনা তাহলে তুমি দুর্বলকে কষ্ট দেবে। তবে যখন জায়গাটা নির্জন পাও তখন হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করো। নচেৎ তকবীর দাও এবং সামনে এগিয়ে যাও। সুনানু শাফেয়ী।

২. তওয়াফের আরেকটি সুন্নত হলো, ইযতিবা করা (চাদরের মধ্যাংশ ডান বগলের নিচে ও চাদরের দুই প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর রাখা)। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাহাবিগণ জারানা থেকে ওমরা করলেন। তারা তাদের চাদর বগলের নিচে ও চাদরের প্রান্তভাগ বাম কাঁধের উপর রাখলেন। - আহমদ, আবু দাউদ।

এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। আলেমগণ এর যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, ইযতিবা তওয়াফে রমল করার সহায়ক। মালেক বলেন! এটা মুস্তাহাব নয়। কেননা কেউ এটা করেছেন বলে তিনি জানেনওনা। দেখেনওনি তওয়াফের নামাযে সর্বসম্মতভাবে ইযতিবা মুস্তাহাব নয়।

৩. আরেকটি সুন্নত হলো, তওয়াফের প্রথম তিন চক্কর রমল করা এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটা। (রমল হলো, ঘাড় দুলিয়ে দ্রুত গতিতে ও ঘন পা ফেলে হাঁটা, যাতে শক্তিমত্তা ও সাহসিকতা প্রকাশ পায়।)

ইবনে উমর রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন চক্কর রমল সহকারে এবং চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে তওয়াফ করেছেন। -আহমদ ও মুসলিম।

যদি কেউ প্রথম তিন চক্করে রমল ত্যাগ করে, তবে পরবর্তী চার চক্করে তা কাযা করতে হবেনা। ইযতিবা ও রমল শুধুমাত্র ওমরার তওয়াফে এবং হজ্জের যে তওয়াফের পর সাফা ও মারওয়ার সাঈ করতে হয় সেই তওয়াফে পুরুষদের জন্য করণীয়। শাফেয়ীদের মতে তওয়াফ কুদুমে রমল করে তার পর সাঈ করলে তওয়াফে ইফাযাতে পুনরায় ইযতিবা ও রমল করার প্রয়োজন নেই। আর যদি তওয়াফে কুদুমের পর সাঈ না করে থাকে এবং তওয়াফে যিয়ারতের পর পর্যন্ত সাঈকে বিলম্বিত করে থাকে, তাহলে তওয়াফে যিয়ারতে রমল ও ইযতিবা করতে হবে।

মহিলাদের কোনো ইযতিবা নেই কেননা এতে তাদের শরীরের গোপনীয় অংশ প্রকাশিত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। মহিলাদের রমলের ও প্রয়োজন নেই। কেননা ইবনে উমর রা. বলেছেন : মহিলাদের বাইতুল্লার ও সাফা মারওয়ায় রমল করার প্রয়োজন নেই।

রমলের যৌক্তিকতা কি ? ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদিসে এর যৌক্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ্ সা. একবার এমন অবস্থায় মক্কায় এলেন যে, মুসলমানদেরকে মদিনার জ্বর দুর্বল করে দিয়েছিল। মোশরেকরা প্রচার করলো যে তোমাদের কাছে এমন এক দল লোক আসবে, যারা জ্বরের কারণে দুর্বল হয়ে গেছে এবং খুবই খারাপ পরিণতির শিকার হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা রসূল সা. কে মোশরেকদের এই রটনার কথা জানিয়ে দিলেন। এর ফলে রসূল সা. মুসলমানদেরকে আদেশ দিলেন, যেনো তারা প্রথম তিন চক্করে রমল করে এবং উভয় রুকনের মাঝে (অর্থাৎ রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে) স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে বললেন। মোশরেকরা যখন তাদের রমল করা দেখলো, তখন তারা পরস্পরকে বললো। এদের সম্পর্কেই কি তোমরা বলেছিলে যে, জ্বর তাদেরকে কাহিল করে ফেলেছে? ওরা তো দেখছি আমাদের চেয়েও শক্তিশালী। ইবনে আব্বাস বলেন : মুসলমানদের শক্তি যাতে বেশি ক্ষয় না হয় এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য সকল চক্করে রমল করতে আদেশ দেননি। বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ।

উপরোক্ত কারণ দূর হয়ে যাওয়ায় উমর রা. এর মনে হয়েছিল যে, এখন রমল ত্যাগ করা যেতে পারে। কেননা আল্লাহ পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে বিজয়, স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কিন্তু

পরে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রসূল সা. এর জীবদ্দশায় যেমন রমল চালু ছিলো এখনও তেমনি থাকুক যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মধ্যে এই প্রেরণা উজ্জীবিত থাকে। মুহিব্বুদ্দীন তাবারি বলেছেন : কোনো বিশেষ কারণে শরিয়তের কোনো বিধান কার্যকর হতে পারে। কিন্তু পরে সেই কারণ দূর হয়ে গেলেও ঐ বিধান বহাল থাকে।

যায়দ বিন আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর রা. বললেন : আজও আমরা রমল করি এবং ঘাড় অনাবৃত করি যখন আল্লাহ্ ইসলামকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং কুফর ও তার ধারক বাহকদেরকে বিতাড়িত করেছেন? কারণ আমরা রসূল সা. এর আমলে যে কাজ করতাম, তা কখনো ত্যাগ করবোনা।

৪. রুকনে ইয়ামানীকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা তওয়াফের একটি সুন্নত। ইবনে উমর রা. বলেছেন : আমি যে দিন রসূল সা. কে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করতে দেখেছি, তারপর থেকে আমি এই দুটিকে স্পর্শ করা ত্যাগ করিনি, সুখে দুঃখে কোনো অবস্থায়ই নয়। - বুখারি ও মুসলিম।

তওয়াফকারী এই দুটি রুকনকে স্পর্শ করে এজন্য যে, এ দুটির বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হাজরে আসওয়াদের দুটো বৈশিষ্ট্য হলো : প্রথমত, এটি ইবরাহিম আ. এর নির্মিত স্থাপনার উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত এটি তওয়াফের শুরু ও শেষ বিন্দু। এর ঠিক বিপরীতে অবস্থিত রুকনে ইয়ামানীও ইবরাহিম আ. এর ভিত্তির উপর নির্মিত। আবু দাউদ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা রা. বলেছেন : হাজরে আসওয়াদের অংশ বিশেষ বাইতুল্লাহর অংশ। ইবনে উমর রা. বললেন : আল্লাহর কসম আমার ধারণা, আয়েশা রা. এ কথাটা রসূল সা.-এর কাছ থেকেই শুনে থাকবেন। আমি মনে করি রসূল সা. এ কারণেই এ দুটি স্পর্শ করা ত্যাগ করেননি। তবে এ দুটো বাইতুল্লাহর ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আর এজন্যই লোকেরা হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে তওয়াফ করে। আর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত যে, রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা মুস্তাহাব এবং তওয়াফকারী অন্য দুটি রুকন স্পর্শ করবেনা।

ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী বিপুলভাবে গুনাহ মোচন করে।

তওয়াফের পর দু'রাকাত নামায : প্রত্যেক তওয়াফের পর চাই ফরয বা নফল যে রকম তওয়াফই হোক না কেনো মাকামে, ইবরাহিমের কাছে অথবা মসজিদের অন্য যে কোনো স্থানে, দু'রাকাত নামায পড়া সুন্নত। আবু হানিফার মতে এ নামায ওয়াজিব।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. যখন মক্কায় আসলেন, বাইতুল্লায় সাত চক্কর তওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহিমে এসে পড়ছেন : তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ করো। তারপর মাকামে ইবরাহিমের পেছনে নামায পড়তেন। তারপর হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা স্পর্শ করতেন। তিরমিযি।

এই নামাযের প্রথম রাকাতে ফাতেহার পর সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। এটা রসূল সা. থেকে প্রমাণিত। মুসলিম

এই দু'রাকাত নামায সবসময় পড়া যায়। এমনকি নিষিদ্ধ সময়েও কেননা জুবায়ের বিন মুতয়িম থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হে বনু আবদ মানাফ কাউকে এই ঘর তওয়াফ করতে এবং দিন ও রাতের যে কোনো সময়ে এখানে নামায পড়তে বাধা দিওনা। -আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি। এটা শাফেয়ী ও আহমদের মাযহাব।

তওয়াফের পরে নামায মসজিদুল হারামে পড়া সুন্নত হলেও তার বাইরে পড়াও জায়েয। বুখারি

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : উম্মে সালামা উটের পিঠে চড়ে তওয়াফ করেছেন এবং সেখান থেকে বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়েননি। মালেক বর্ণনা করেন যে, উমর রা. এ দু'রাকাত যুতুয়াতে গিয়ে পড়েছেন। বুখারি বলেছেন : উমর রা. হারাম শরিফের বাইরেও নামায পড়েছেন। আর তওয়াফের পর যদি ফরয নামায পড়ে, তা হলে এই দু'রাকাত পড়ার প্রয়োজন নেই। এটা শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত ও আহমদের মত। মালেক ও হানাফীরা বলেছেন : অন্য কোনো নামায এই দু'রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হয়না।

মক্কার হারাম শরিফে নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াত : মসজিদুল হারামে মুসল্লী নামায পড়বে আর তার সামনে দিয়ে নারী ও পুরুষ যাতায়াত করবে এটা সম্পূর্ণ জায়েয। এমনকি মাকরূহও নয়। এটা মসজিদুল হারামের বৈশিষ্ট্য। কাছীর বিন কাছীর বিন মুত্তালিব বিন বিদায়া থেকে বর্ণিত : তিনি রসূল সা. কে বনু তাহমের সংলগ্ন এলাকায়, নামায পড়তে দেখেছেন। অথচ লোকজন তার সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে এবং তাঁর সামনে কোনো সুতরাও (আড়াল) ছিলনা।

সুফিয়ান বিন উবাইনা বলেছেন : রসূল সা. ও কা'বার মাঝে কোনো সুতরা ছিলোনা। - আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

মহিলাদের সাথে পুরুষদের তওয়াফ : বুখারি ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে জুরাইজ বলেন : আমাকে আতা জানিয়েছেন যে, ইবনে হিশাম যখন নারীদেরকে পুরুষদের সাথে তওয়াফ করতে নিষেধ করলেন তখন তিনি (আতা) বললেন : আপনি কিভাবে মহিলাদেরকে নিষেধ করছেন? অথচ রসূল সা.-এর স্ত্রীরা পুরুষদের সাথে তওয়াফ করতেন। আমি বললাম : পর্দার আগে না পরে? তিনি বললেন : আমি তাদের পর্দার পরে পেয়েছি।

আমি বললাম : নারীরা কিভাবে পুরুষদের সাথে মিশতো?

তিনি বললেন : মহিলারা পুরুষদের সাথে মিশতোনা। আয়েশা রা. পুরুষদের থেকে পৃথকভাবে তওয়াফ করতেন। মিশতেন না তাদের সাথে। জনৈক মহিলা বললেন : হে উম্মুল মুমিনীন, চলুন হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করি। আয়েশা রা. বললেন : তুমি যাও। এই বলে তিনি তার সাথে যেতে অস্বীকার করলেন।

মহিলারা ছদ্মবেশে রাতের বেলা বের হতো এবং পুরুষদের সাথে তওয়াফ করতো। তবে তারা যখন বাইতুল্লায় প্রবেশ করতো, তখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো। তারা ঢোকার সাথে সাথে পুরুষদেরকে বের করে দেয়া হতো যেনো মহিলারা নির্জনে ও পুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে পারে। কেননা আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : তিনি জনৈকা মহিলাকে উপদেশ দিলেন, হাজরে আসওয়াদে ভিড় করোনা। নির্জন দেখলে স্পর্শ করো। ভিড় দেখলে হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসে দূর থেকে আল্লাহু আকবর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো এবং কাউকে কষ্ট দিওনা।

তওয়াফকারীর বাহনে আরোহণ : হেঁটে তওয়াফ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাহনে আরোহণের কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে আরোহণ করা বৈধ। কেননা ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বিদায় হজ্জে একটা উটে আরোহণ করে তওয়াফ করলেন এবং একটা মাথা বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন। -বুখারি ও মুসলিম। জাবের রা. থেকে বর্ণিত : রসূল সা. তাঁর উটনীর পিঠে চড়ে বিদায় হজ্জে বাইতুল্লাহ ও সাফা মারওয়া তওয়াফ করলেন, যাতে জনগণ তাকে দেখতে পায়। তিনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁরা তাকে প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে। কেননা লোকেরা তার পাশে ভিড় জমিয়েছিল।

সাধারণ তওয়াফকারীদের সাথে কুষ্ঠ রোগীর তওয়াফ : মালেক বর্ণনা করেবেন যে, উমর

ইবনুল খাত্তাব রা. জনৈক কুষ্ঠ রোগিণীকে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে দেখলেন। দেখে তাকে বললেন : ওহে আল্লাহর বান্দী, মানুষকে কষ্ট দিওনা। তুমি নিজের বাড়িতে বসে থাকলেই ভালো হতো। অতপর মহিলা বাড়ি গিয়ে বসে রইল। পরে এক সময়ে এক ব্যক্তি ঐ মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে মহিলাকে বললো : যে ব্যক্তি তোমাকে নিষেধ করেছিল সে মারা গেছে। এখন বের হও। মহিলা বললো : আমি তাঁর জীবিতাবস্থায় আনুগত্য করবো আর মৃত্যুর পর তাঁর কথা অমান্য করবো এজন্য আমি প্রস্তুত নই।

১৬. যমযমের পানি পান করা

তওয়াফকারী যখন তওয়াফ সম্পন্ন করবে এবং মাকামে ইবরাহিমে দু'রাকাত নামায পড়বে, তখন যমযমের পানি পান করা তার জন্য মুস্তাহাব।

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. যমযমের পানি পান করলেন এবং বললেন : এটা বরকতময়, তৃপ্তিদায়ক ও রোগ নিরাময়কারী। জিবরাইল মেরাজের রাতে এই পানি দিয়ে রসূল সা.-এর হৃদয় ধুয়ে দিয়েছিলেন। আর তাবারানি ও ইবনে হিব্বান ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হচ্ছে যমযমের পানি।

যমযমের পানি পান করার সময় রোগ থেকে মুক্তি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণের নিয়ত করা সুন্নত। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তা সফল হবে। সুয়াইদ বিন সাঈদ বলেছেন : আমি মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে দেখেছি, যমযমের কূয়ার কাছে এলেন। তা থেকে পানি পান করলো, তারপর কিবলামুখি হয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে সে উদ্দেশ্য সফল হবে।' আমি এটা কেয়ামতের পিপাসার জন্য পান করছি। তারপর পান করলেন। -আহমদ ও বায়হাকি। আর ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে সে উদ্দেশ্য সফল হবে। তুমি যদি রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে তা পান করো, আল্লাহ তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। তৃপ্তি লাভের জন্য যদি পান করো, তবে আল্লাহ তোমাকে পরিতৃপ্ত করবেন। আর যদি তোমার পিপাসা মেটানোর জন্য পান করো তবে আল্লাহ পিপাসা মিটিয়ে দেবেন। এ কূয়া জিবরাইল খনন করেছেন এবং ইসমাঈলকে পান করানোর জন্য আল্লাহ এর আবির্ভাব ঘাটয়েছেন। -দার কুতনি ও হাকেম। হাকেম একথাও সংযুক্ত করেছেন : তুমি যদি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে এ পানি পান করো, তবে আল্লাহ তোমাকে আশ্রয় দেবেন।"

যমযমের পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করা, কিবলামুখি হয়ে পান করা এবং পেট পুরে পান করা, পান করার পর আলহামদুলিল্লাহ বলা ও ইবনে আব্বাসের দোয়া পড়া মুস্তাহাব।

আবু মুলাইকা বলেন : এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে এলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কোথা থেকে এলে? সে বললো : যমযমের পানি পান করে এলাম। তিনি বললেন : যেভাবে যমযমের পানি পান করা উচিত, সেভাবে পান করেছ তো? সে বললো : কিভাবে? তিনি বললেন : যখন যমযমের পানি পান করতে চাইবে, তখন কিবলামুখি হবে। আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিন নিঃশ্বাসে পেট ভরে পান করবে। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমাদের ও মুনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তারা যমযম থেকে পেট ভরে পানি পান করেনা।" ইবনে মাজাহ, দার কুতনি আর ইবনে আব্বাস যমযমের পানি পান করার সময় এ দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ .

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী তিনি, প্রশস্ত জীবিকা ও সকল রোগ থেকে মুক্তি চাই।"

যমযম কূয়ার ইতিহাস : বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : যখন হাজেরা ও তার ছেলের তীব্র পিপাসা লাগলো এবং হাজেরা মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তখন একটা আওয়ায শুনতে পেলেন। তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললেন। চুপ করো এবং পুনরায় সে আওয়াযটা শুনতে চেষ্টা করলেন। তখন আবারো সেই আওয়াযটা শুনতে পেলেন। হাজেরা বললেন : আমি শুনতে পেয়েছি। তোমার কাছে কোনো সাহায্য যদি থেকে থাকে বলো। সহসা যমযমের স্থানে জনৈক ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে অথবা ডানা দিয়ে মাটি খুঁড়লো। অমনি পানি বেরিয়ে এলো। তখন হাজেরা চৌবাচ্চা বানিয়ে পানি জমা করতে এবং হাতের আজলা ভরে তার মশকে পানি ভরতে লাগলেন। যতোই আজলা ভরে পানি নিচ্ছিলেন ততোই পানি উথলে উঠছিল। ইবনে আব্বাস রা. বলেন : রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি যদি যমযমকে ছেড়ে দিতেন, অথবা যদি তা থেকে আজলা ভরে পানি না নিতেন, তাহলে যমযম প্রবহমান ঝর্ণা হতোনা। তারপর হাজেরা নিজে পানি পান করলেন এবং তার ছেলেকে পান করালেন। তারপর ফেরেশতা তাকে বললো : তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এ ভয় পেয়োনা। এখানে আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু ও তার পিতা তাকে পুনঃনির্মাণ করবে। এই ঘরের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন না। আল্লাহর ঘর তখন একটা টিলার মতো ছিলো। বন্যার ঢল তার দিকে ধেয়ে আসতো, তারপর তা তার ডান দিকে ও বাম দিকে চলে যেতো।

মুলতাযামের নিকট দোয়া করা মুস্তাহাব : যমযমের পানি পান করার পর মুলতাযামের নিকট গিয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব। বায়হাকি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস কাবার দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে কা'বার সাথে লেগে থাকতেন ও তা জড়িয়ে ধরতেন এবং বলতেন : হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মাঝখানে কা'বার প্রাচীর জড়িয়ে ধরে দোয়া করবে। যে ব্যক্তি এই দুটির মাঝখানে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে। আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দেবেন। আমর ইবনে শুয়াইবের দাদা বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা.কে দেখেছি, তাঁর মুখ ও বুক মুলতাযামের সাথে সেঁটে দিতেন।

কেউ কেউ বলেন : হাতীমই মুলতাযাম। বুখারির মতে হাজরে আসওয়াদই হাতীম। এর প্রমাণ হিসেবে মেরাজের হাদিস পেশ করেন যাতে রসূল সা. বলেছেন : আমি যখন হাতীমে ঘুমিয়ে ছিলাম, হয়তোবা বলেছেন : হাজরে আসওয়াদের কাছে ঘুমিয়ে ছিলাম। বুখারি বলেছেন : হাজরে আসওয়াদই হাতীম।

কা'বার অভ্যন্তরে ও হাজারে ইসমাঈলে প্রবেশ করা মুস্তাহাব : বুখারি ও মুসলিম ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ সা. উসামা ও উসমান বিন তালহা কা'বা শরিফের ভেতরে প্রবেশ করলেন। দরজা বন্ধ করলেন। তারপর যখন দরজা খুললেন, বিলাল আমাকে জানালো যে, রসূলুল্লাহ সা. কা'বার ভেতরে দুই ইয়ামানী স্তম্ভের মাঝে নামায পড়েছেন। আলেমগণ এ থেকে প্রমাণ করলো যে, কা'বার ভেতরে প্রবেশ করা ও নামায পড়া সুন্নত। তবে তারা একথাও বলেছেন যে, এটা সুন্নত হলেও হজ্জের অংশ নয়। কেননা ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : হে জনতা, বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা তোমাদের হজ্জের অন্তর্ভুক্ত নয়। -হাকেম। আর যে ব্যক্তি কা'বায় প্রবেশ করার সুযোগ পায়না, তার জন্য হাজরে ইসমাঈলে প্রবেশ করা ও সেখানে নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা তার একটা অংশ কা'বা শরিফের অংশ।

আহমদ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রা. বললেন : হে রসূল, আপনার পরিবারের সকলেই বাইতুল্লায় ভেতরে প্রবেশ করেছেন। কেবল আমি করিনি। রসূল সা. বললেন : কা'বার চাবি রক্ষক উসমান বিন তালহার ছেলে শায়বাকে খবর পাঠাও, সে তোমার জন্য দরজা খুলে দেবে। আয়েশা শায়বার কাছে লোক পাঠালেন। শায়বা বললো : আমরা জাহেলী যুগেও ওটা খুলতে পারিনি, ইসলামের যুগেও নয়।

তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তুমি হাজরে ইসমাঈলে নামায পড়ো। কেননা তোমার দেশবাসী বাইতুল্লাহকে যখন সংস্কার করেছে তখন পূর্ণাংগভাবে সংস্কার করতে পারেনি। তারা এর একটা অংশ (হাজরে ইসমাঈলকে) বাইরে রেখে দিয়েছে।

১৭. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ

কিভাবে এটি শরিয়তের বিধিবদ্ধ হলো : বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : ইবরাহিম আ. তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য ছেলে ইসমাঈলকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর উভয়কে বাইতুল্লাহর নিকট যমযমের উপরে একটা বিশাল গাছের নিচে রাখলেন। তখন মক্কায় কোনো মানুষের বসতি ছিলনা এবং পানিও ছিলনা। ইবরাহিম আ. তাদের উভয়ের নিকট খোরমা ভর্তি একটা ব্যাগ এবং পানি ভর্তি একটা মশক রেখে বিদায় হয়ে চলে যেতে লাগলেন। ইসমাঈলের মা তাকে অনুসরণ করে গেলেন এবং বললেন : হে ইবরাহিম, আপনি আমাদেরকে এই জনমানবহীন ও শস্যলতাহীন ভূমিতে রেখে কোথায় চলে যাচ্ছেন? তিনি তাকে কয়েকবার একথা বললেন। কিন্তু ইবরাহিম তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না। তখন হাজেরা বললেন : আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ আদেশ দিয়েছেন? ইবরাহিম বললেন : হাঁ। তখন হাজেরা বললেন : তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অন্য হাদিসে আছে, হাজেরা বললেন : আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহিম আ. বললেন : আল্লাহর কাছে। হাজেরা বললেন : আমি সন্তুষ্ট। তারপর হাজেরা ফিরে এলেন।

এরপর ইবরাহিম চলতে লাগলেন। যখন পাহাড়ের রাস্তার কাছে পৌছিলেন যেখানে কেউ তাকে দেখতে পায়না। তখন বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে হাত তুলে এই দোয়া করলেন :

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ . رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ .

"হে প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরকে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট একটা চাষাবাদহীন উপত্যকায় রেখে এসেছি। হে প্রভু, ওখানে রেখে এসেছি এজন্য যেনো তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং মানুষের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে কিছু ফল ও ফসল দাও, যেনো তারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।"

আর ইসমাঈলের মা গাছটির নিচে বসে রইলেন তার ছেলেটিকে নিজের পাশে রাখলেন এবং তার ছোট পুরানো পানির মশকটি ঝুলিয়ে রাখলেন, যাতে তা থেকে প্রয়োজনের সময় পানি পান করতে পারেন এবং ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারেন। এক সময় মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে তার দুধও শুকিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। আর তার ছেলের ক্ষুধা তীব্র হলো। হাজেরা হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন এবং দূরে সরে যেতে লাগলেন। তার দিকে তাকাতেও তার ভালো লাগছিলনা। তাই ছেলেকে রেখে অন্য কোথাও রওনা হলেন। নিকটতম পাহাড় সাফার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি উপত্যকার দিকে দৃষ্টি দিলেন। কোথাও কাউকে দেখা যায় কিনা? না, কাউকেই তিনি দেখতে পেলেন না। এরপর তিনি সাফা থেকে নামলেন। নেমে যখন উপত্যকায় পৌঁছিলেন, তখন তাঁর জামার কোচা টেনে উঁচু করলেন এবং অতিশয় ক্লান্ত ও

বিপর্যস্ত মানুষের মতো হন্যে হয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। দৌড়ে উপত্যকা পার হলেন। পুনরায় মারওয়ায় এলেন। মারওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এভাবে সাতবার সাফা ও মারওয়ায় চক্কর দিলেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন : এজন্যই মানুষ এ দুই পাহাড়ের মাঝে চক্কর দিয়ে থাকে।

সাফা ও মারওয়ার মাঝে চক্কর দেয়া সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : সাফা ও মারওয়ার মাঝে চক্কর দেয়া সংক্রান্ত শরিয়তের বিধান নিয়ে আলেমদের তিনটে মত পাওয়া যায়। :

১. সাহাবিদের মধ্য থেকে ইবনে উমর, জাবের ও আয়েশা রা. এবং ইমামদের মধ্য থেকে মালেক, শাফেয়ী ও একটি বর্ণনা অনুযায়ী আহমদ বলেছেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা হজ্জের একটি রুকন তথা ফরয। কোনো হাজি এটা বাদ দিলে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং কোনো কুরবানি ইত্যাদি দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হবেনা। তাদের এ মতের পক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি পেশ করেছেন :

বুখারি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন : উরওয়া আয়েশা রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এ আয়াত নিয়ে ভেবে দেখেছেন কি?

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا .

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্যতম। তাই যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরা করবে, সে এই দুটির তওয়াফ করলে আপত্তি নেই।" আল্লাহর কসম, এ থেকে তো বুঝা যায়, সাফা ও মারওয়ায় তওয়াফ না করলেও আপত্তি নেই। আয়েশা রা. বললেন : হে আমার ভাইপো, তুমি ভুল বললে। তুমি এ আয়াতের যেভাবে ব্যাখ্যা করলে, তাতে তো এটাই দাঁড়ায় যে, তওয়াফ না করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এ আয়াত আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মানাত দেবীর পূজা করতো এবং তার নামে তালবিয়া পড়তো। ইসলাম গ্রহণের পর সেই তালবিয়া পাঠকারীরা সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করতে সংকোচ বোধ করতো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা রসূলুল্লাহ সা.কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। বললো : হে রসূলুল্লাহ, আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ (সাঈ) করতে সংকোচ বোধ করতাম। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন : সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্যতম ...."

আয়েশা রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তওয়াফ চালু করেছেন। কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝের তওয়াফ (সাঈ) বর্জন করার অধিকার কারোর নেই।

মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. ও মুসলমানরা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করেছেন। তাই এটা সুন্নতে পরিণত হয়েছে। যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করবেনা, আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।

বনু আবদুদ্ দারের জনৈক মহিলা হাবিবা বলেছেন : একদল কুরাইশী মহিলার সাথে আবু হুসাইনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, রসূলুল্লাহ সা. সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করছেন। তার দৌড়াদৌড়ির প্রচণ্ডতায় তার লুংগি তার কোমরে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। আমি তা দেখে বললাম : আমি রসূলুল্লাহর সা. হাঁটু দেখতে পাচ্ছি। তাকে বলতে শুনলাম : "তোমরা সাঈ করো। কেননা আল্লাহ তোমাদের জন্য সাঈ বাধ্যতামূলক করেছেন। ইবনে মাজাহ, আহমদ, শাফেয়ী।

আর যেহেতু সাঈ হজ্জ ও ওমরা উভয়টিতেই ইবাদত হিসেবে অংগীভূত, তাই বাইতুল্লাহর তওয়াফের মতো এটিও হজ্জ ও ওমরা উভয়ের রুকন তথা অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অপরিহার্য কর্তব্য বা ফরয।

২. পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস. আনাস, ইবনে যুবায়ের, ইবনে সিরীন ও একটি বর্ণনা অনুযায়ী আহমদের মত হলো, এটি সুন্নত। আর সুন্নত হওয়ার কারণে এটি তরক করলে কোনো ফিদিয়া বা কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হয়না।

এই মতের প্রবক্তাদের প্রমাণ কুরআনের উল্লিখিত উক্তি : "সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করলে কোনো আপত্তি নেই।" কোনো কাজের কর্তাকে একথা বলা যে, "এই কাজ করলে আপত্তি নেই" স্বতই প্রমাণ করে যে, ঐ কাজ ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং এ দ্বারা কাজটি 'মুবাহ' অর্থাৎ করা ও বর্জন করা সমান। করলেও গুনাহ নেই, না করলেও গুনাহ নেই। তবে 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন' এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাজটি সুন্নত।

যেহেতু এটা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ইবাদত, যা বাইতুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তাই কংকর নিক্ষেপের ন্যায় রুকনে পরিণত হয়নি।

৩. আবু হানিফা, ছাওরী ও হাসানের মতে এটি ওয়াজিব, রুকন বা ফরয নয়। এটি তরক করলে হজ্জ বা ওমরা বাতিল হবেনা। তবে তরক করলে দম দিতে অর্থাৎ একটা ছাগল কুরবানি করতে হবে। আল মুগনীর প্রণেতা এই মতকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন। তিনি বলেছেন :

এটা অগ্রগণ্য। কেননা যিনি এটিকে ওয়াজিব বলে রায় দিয়েছেন, তার প্রদর্শিত প্রমাণ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, এটা শর্তমুক্ত ওয়াজিব। এমন ওয়াজিব নয় যে, এটি বাদ দিলে মূল দায়িত্ব পালিতই হবেনা।

আয়েশা রা. যে বক্তব্য দিয়েছেন অন্যান্য সাহাবির বক্তব্যে তার বিরোধিতা করা হয়েছে।

বনু আবদুদ দারের মহিলা হাবিবার হাদিসটি যদিও বিতর্কিত, তথাপি তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটি বাধ্যতামূলক বা ওয়াজিব।

সাফা ও মারওয়া সংক্রান্ত আয়াতটি কিছু লোকের সাঈ সংক্রান্ত সংকোচ দূর করার জন্য এসেছে। কেননা তারা জাহেলি যুগে সাফা ও মারওয়ায় রক্ষিত দুটো মূর্তির পূজার খাতিরে ঐ দুই পাহাড়ের মাঝে সাঈ করতো। তাই ওখানে সাঈ করলে গুনাহ হবে কিনা ভেবে তারা শংকিত ছিলো।

সাঈর শর্তাবলি : সাঈর বিশুদ্ধতার জন্য কয়েকটি শর্ত পালন করা জরুরি :

১. সাঈ সবসময় তওয়াফের পরে হওয়া চাই।
২. সাঈ সাত চক্কর পূর্ণ করা চাই।
৩. সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় প্রতিটি চক্কর শেষ করা চাই।

৪. সাঈ সবসময় সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী পথে করা চাই। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. এরূপ করেছেন এবং বলেছেন : "তোমরা তোমাদের ইবাদতগুলো আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো।" সুতরাং কেউ তওয়াফের আগে সাঈ করলে কিংবা মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করে সাফায় শেষ করলে অথবা সাফা ও মারওয়ার মাঝখানের নির্ধারিত পথ ছাড়া অন্যত্র সাঈ করলে সাঈ শুদ্ধ হবেনা। (হানাফী মযহাব অনুযায়ী ৩ ও ৪ নং কাজ দুটি শর্ত নয়, বরং ওয়াজিব। কেউ তওয়াফের আগে সাঈ করলে অথবা মারওয়া থেকে চক্কর শুরু করে সাফায় শেষ করলে সাঈ বাতিল হবেনা। তবে দম দিতে হবে।)

সাফায় আরোহণ : সাঈর বিশুদ্ধতার জন্য সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করা শর্ত নয়। তবে উভয় পাহাড়কে সাঈর আওতাভুক্ত করা ওয়াজিব। তাই যাওয়া ও আসার সময় উভয় পাহাড়ে লাগাতে হবে। কোনো অংশ সাঈর আওতাভুক্ত করতে ব্যর্থ হলে সাঈ বিশুদ্ধ হবেনা, যতক্ষণ না তা এর আওতায় আসবে।

সাঈর চক্করগুলো এক নাগাড়ে করা : সাঈর চক্করগুলো ক্রমাগতভাবে ও এক নাগাড়ে করা শর্ত নয়। (তবে ইমাম মালেকের মতে চক্করগুলোর মাঝে বেশি বিরতি না দিয়ে এক নাগাড়ে

করা শর্ত।) এমন কোনো সমস্যা যদি দেখা দেয় যা এক নাগাড়ে সাঈ করার পথে বাধার সৃষ্টি হয়, অথবা নামায শুরু হয়ে যায়, তাহলে সেই কারণে সাঈতে বিরতি দেয়া জায়েয হবে। যখন বাধা দূর হবে, তখন যে কয় চক্কর সম্পন্ন হয়েছে, তার সাথে অবশিষ্ট চক্করগুলো যুক্ত করে সাঈ পূর্ণ করবে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করছিলেন। সহসা তার পেশাবের প্রয়োজন দেখা দিলো। তিনি এক পাশে সরে গিয়ে পানি চাইলেন, ওযু করলেন, তারপর অবশিষ্ট চক্করগুলো সম্পন্ন করলেন। -সাঈদ বিন মানসূর।

অনুরূপ, তওয়াফ ও সাঈর মাঝেও বিরতিহীন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা শর্ত নয়। আল মুগনিতে বলা হয়েছে : ইমাম আহমদ বলেছেন : তওয়াফের পর বিশ্রাম করা পর্যন্ত কিংবা বিকাল পর্যন্ত সাঈ বিলম্বিত করাতে কোনো ক্ষতি নেই। আতা ও হাসান মনে করতেন : যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেছে, সে সাফা ও মারওয়ার সাঈকে বিকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করতে চাইলে করতে পারে। সাঈদ ও কাসেম এরূপ করেছেন। কেননা সাঈর চক্করগুলোর যখন বিরতিহীন ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা নেই, তখন সাঈ ও তওয়াফের মাঝে এর বাধ্যবাধকতা না থাকা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। সাঈদ বিন মানসূর বর্ণনা করেছেন, উরওয়া বিন যুবাইরের স্ত্রী সওদা সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন। তারপর তিন দিনের মধ্যে তিনি তার তওয়াফ কাযা করেন। কারণ তিনি খুবই বিশালদেহী ছিলেন।

সাঈর জন্য পবিত্রতা : অধিকাংশ আলেম বলেন : সাফা ও মারওয়ার সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. ঋতুবতী আয়েশা রা.কে বলেছিলেন : অন্যান্য হাজী যা যা করে, তুমি তার সবই করতে পারো। কেবল বাইতুল্লাহর তওয়াফ গোসল না করা পর্যন্ত করবেনা। - মুসলিম। আর আয়েশা রা. ও উম্মে সালমা রা. বলেছেন : নারী যখন বাইতুল্লাহর তওয়াফ ও তওয়াফের পর দু'রাকাত নামায আদায় সম্পন্ন করে এবং তারপর ঋতুবতী হয়। তখন তার সাফা ও মারওয়ার তওয়াফ সম্পন্ন করা উচিত। - সাঈদ বিন মানসুর। তবে সকল ইবাদতেই পবিত্রাবস্থা বজায় রাখা মুস্তাহাব। কেননা পবিত্রতা শরিয়তে খুবই কাঙ্ক্ষিত বিষয়।

সাঈতে হেঁটে চলা ও বাহনে চলা : সাঈ হেঁটেও করা যাবে, বাহনে চড়েও করা যাবে। তবে হেঁটে করা উত্তম। ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস থেকে জানা যায় যে, তিনি হেঁটে সাঈ করতেন। তারপর যখন মানুষের ভিড় বেড়ে গেলো, তখন বাহনে আরোহণ করে করতে শুরু করলেন, যাতে লোকেরা তাকে দেখতে পায় এবং জিজ্ঞাসা করতে পারে। আবুত তুফাইল ইবনে আব্বাস রা.কে বললেন : আমাকে বলুন, বাহনে আরোহণ করে সাফা ও মারওয়ার তওয়াফ (সাঈ) করা সুন্নত কি? কেননা আপনার জনগণ এটাকে সুন্নত দাবি করে।

ইবনে আব্বাস রা. বললেন : তাদের দাবি সত্যও, মিথ্যাও। আবুত তুফাইল বললেন : এ কী বলছেন : সত্যও, মিথ্যাও? ইবনে আব্বাস বললেন : রসূলুল্লাহ্ সা. এর ওপর মানুষের ভিড় বেড়ে গিয়েছিল। লোকেরা এসে বলতো, এই যে মুহাম্মদ, এই যে মুহাম্মদ। এমনকি যুবতী মেয়েরাও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো। রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর সামেন ভিড় করা লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দিতেননা। যখন ভিড় বেড়ে গেলো, তখন বাহনে আরোহণ করলেন। হেঁটে চলা ও দৌড়ে চলা উত্তম। (সমতল ভূমিতে দুই খুঁটির মাঝখানে দৌড়াবে, আর অবশিষ্ট জায়গায় হেঁটে চলবে।) সাঈতে বাহনে আরোহণ বৈধ হলেও মাকরূহ। তিরমিযি বলেছেন : আলেমদের একটি দল বাইতুল্লাহ্ ও সাফা মারওয়ায় বিনা ওযরে বাহনে আরোহণ করে তওয়াফ করা অপছন্দ করেছেন। এটা ইমাম শাফেয়ীরও মত। মালেকীদের মতে, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে বাহনে আরোহণ করে সাঈ করে, সময় থাকলে তার পুনরায় সাঈ করা জরুরি। সময় না থাকলে তাকে দম দিতে হবে। কেননা হেঁটে চলতে সক্ষম ব্যক্তির হেঁটে সাঈ করা তাদের

নিকট ওয়াজিব। আবু হানিফাও এই মতের প্রতিনিধিত্ব করে বলেন : রসূলুল্লাহ সা. এর বাহনে আরোহণের কারণ ছিলো তাঁর পাশে জনগণের অতিমাত্রায় ভিড় করা ও ঘিরে ধরা। এটা একটা ওযর। এজন্য আরোহণ করা বৈধ।

চিহ্নিত দুটো খুঁটির মাঝে দৌড়ানো মুস্তাহাব

দুই চিহ্নিত খুঁটির মাঝে ছাড়া সাফা ও মারওয়ার সাঈ হেঁটে করা মুস্তাহাব। দুই খুঁটির মাঝে রমল করা মুস্তাহাব। ইতিপূর্বে হাবিবার হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে : "রসূলুল্লাহ সা. এতো জোরে দৌড়াতেন যে, তাঁর পরনের লুংগি প্রবল ঘুরপাক খাচ্ছিলো।"

তবে জোরে দৌড়ানো ছাড়া সাঈ বা তওয়াফ করলে তা শুদ্ধ হবে। সাঈদ বিন জুবাইর রা. বলেন : আমি ইবনে উমরকে সাফা ও মারওয়ার মাঝে ধীরে হাঁটতে দেখেছি। তারপর তিনি বললেন : "যদি ধীর স্থিরভাবে হেঁটে থাকি, তাহলে তা জায়েয হবে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ সা.কে ধীরে হাঁটতে দেখেছি। আর যদি দ্রুত দৌড়ে থাকি তবে রসূলুল্লাহ সা.কে আমি দ্রুত দৌড়াতেও দেখেছি। আমি তো অতিশয় বৃদ্ধ মানুষ।" আবু দাউদ, তিরমিযি।

একমাত্র পুরুষদের জন্যই এটা মুস্তাহাব। মহিলাদের জন্য দ্রুত চলা নয় বরং স্বাভাবিক গতিতে চলা মুস্তাহাব।

শাফেয়ী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : কিছু মহিলাকে দ্রুত চলতে দেখে আয়েশা রা. বললেন : তোমাদের মহিলাদের জন্য কি আমাদের নিকট কোনো আদর্শ নেই? তোমাদের জন্য জোরে জোরে চলা জরুরি নয়।

কা'বার দিকে মুখ করে সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ ও দোয়া করা : সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করা ও কেবলামুখি হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ সা. এর সম্পর্কে বর্ণিত : তিনি সাফার দরজার দিক থেকে বের হলেন, তারপর সাফার কাছাকাছি পৌঁছেই সাফা ও মারওয়া সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করলেন : "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন।" তারপর বললেন : আল্লাহ যেভাবে শুরু করেছেন, আমি সেভাবে শুরু করবো। তারপর সাফা দিয়ে শুরু করলেন এবং সাফার উপরে আরোহণ করলেন। আরোহণ করে যখন বাইতুল্লাহকে দেখতে পেলেন তখন কেবলামুখি হয়ে তিনবার করে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ বললেন। তারপর বললেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، اَلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

তারপর এর মাঝে দোয়া করলেন এবং তিনবার এই দোয়া পড়লেন। তারপর নেমে এসে মারওয়ার দিকে গেলেন। তার উপর আরোহণ করলেন। বাইতুল্লাহর দিকে দৃষ্টি দিলেন। এভাবে সাফায় যা যা করেছিলেন, মারওয়ায়ও তা তা করলেন।

নাফে বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে সাফায় থাকা অবস্থায় এরূপ দোয়া করতে শুনেছি :

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ : اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، وَإِنِّيْ أَسْأَلُكَ - كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلْإِسْلَامِ - أَنْ لَاتَنْزِعَهُ مِنِّيْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِيْ وَأَنَا مُسْلِمٌ .

"হে আল্লাহ, তুমি বলেছো, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। তুমি তো ওয়াদা ভংগ করোনা। আমি তোমার কাছে চাই, আমাকে যেমন ইসলামে দিক্ষিত করেছো তেমনি মৃত্যু পর্যন্ত আমার কাছ থেকে ইসলামকে ছিনিয়ে নিওনা।"

সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে যে দোয়া করা মুস্তাহাব : সাফা ও মারওয়ার মাঝে দোয়া করা, আল্লাহকে স্মরণ করা ও কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সা. তার সাঈ চলাকালে এই দোয়া করতেন : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ. "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো ও দয়া করো এবং আমাকে সর্বাপেক্ষা সঠিক পথে চালাও।" এই দোয়াও বর্ণিত হয়েছে : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো ও দয়া করো। তুমি পরম সম্মানিত ও মহৎ।"

তওয়াফ ও সাঈর মাধ্যমে হজ্জ ও ওমরার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। ইহরামকারী যদি তামাত্তু হজ্জকারী হয়, তবে সে এরপর চুল কামিয়ে বা ছেঁটে ইহরামমুক্ত হবে। আর কিরান হজ্জকারী হলে তার ইহ্রাম ১০ই জিলহজ্জ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কিরানকারী এই সাঈ করলে তার আর ফরয তওয়াফের পর সাঈ করতে হবেনা। তামাত্তুকারী হলে ফরয তওয়াফের পর পুনরায় সাঈ করবে এবং সে ৮ই জিলহজ্জ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবে।

১৮. মিনায় গমন

৮ই জিলহজ্জ মিনায় যাওয়া সুন্নত। হাজি যদি কিরানকারী হয় অথবা ইফরাদকারী হয় তবে সে ইতিপূর্বে কৃত ইহরামসহই মিনায় যাবে। আর যদি তামাত্তুকারী হয় তবে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং মীকাতে যা যা করেছিল তা করবে। সুন্নত হলো, সে যে জায়গায় অবস্থান করে সেখান থেকেই ইহরাম করবে। মক্কায় থাকলে মক্কা থেকে এবং মক্কার বাইরে থাকলে সেখান থেকেই ইহরাম করবে। হাদিসে এসেছে : "যার বাসস্থান মক্কার বাইরে সে তার বাসস্থান থেকেই ইহরাম করবে। আর যার বাসস্থান মক্কায় সে মক্কা থেকেই ইহরাম করবে।" আর মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় বেশি করে দোয়া করা ও তালবিয়া পড়া এবং মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা পড়া ও রাত যাপন মুস্তাহাব। ৯ তারিখ সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত মিনা থেকে বের না হওয়া মুস্তাহাব, যাতে রসূলুল্লাহ সা. এর অনুকরণ নিশ্চিত হয়। এর কোনো একটি বা সবগুলো তরক করলে সুন্নত তরক করা হবে। এজন্য কোনো কাফফারা দিতে হবেনা। ইবনুল মুনযিরের বর্ণনা অনুসারে আয়েশা (রা) ৮ই জিলহজ্জ রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে বের হননি।

৮ই জিলহজ্জের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়া বৈধ : হাসান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ৮ই জিলহজ্জের একদিন বা দু'দিন আগেই মক্কা থেকে মিনায় চলে যেতেন। কিন্তু মালেক এটা অপছন্দ করেছেন। তিনি ৮ই জিলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত মক্কায় থাকাটাও অপছন্দ করেছেন। অবশ্য মক্কায় জুমার সময় হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। সেরূপ ক্ষেত্রে মক্কা থেকে বের হবার আগে জুমা পড়ে নেয়া কর্তব্য।

১৯. আরাফার উদ্দেশ্যে যাত্রা

৯ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর 'দব' এর রাস্তা ধরে আল্লাহ আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ও তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফাত রওয়ানা হওয়া সুন্নত।

মুহাম্মদ বিন আবু বরর ছাকাফি বলেন : মিনা থেকে আরাফাত যাওয়ার সময় আমি আনাস রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে কিভাবে তালবিয়া পড়তেন? তিনি বললেন : যার ইচ্ছ হতো তালবিয়া পড়তো, কেউ তাতে আপত্তি করতোনা। যার ইচ্ছা হতো তকবীর বলতো, কেউ তাতে আপত্তি করতোনা। যার ইচ্ছা হতো কলেমা তাইয়েবা পড়তো, কেউ তাতে আপত্তি করতোনা। - বুখারি প্রভৃতি হাদিস।

আরাফায় অবস্থানের উদ্দেশ্যে নামেরাতে যাত্রা বিরতি করা ও তার কাছেই গোসল করা মুস্তাহাব। সূর্য ঢলে পড়ার পরই আরাফায় অবস্থানের সময় শুরু। এর পূর্বে আরাফায় না ঢোকা মুস্তাহাব।

২০. আরাফায় অবস্থান

আরাফার দিনের ফযিলত : জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যিলহজ্জের দশ দিনের চেয়ে ভালো দিন আল্লাহর কাছে আর নেই। এক ব্যক্তি বললো : আল্লাহর পথে জিহাদে কাটানো কতগুলো দিনের চেয়েও কি এই দশ দিন ভালো? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এ দশ দিন আল্লাহর পথে জিহাদে অতিবাহিত দিনগুলোর চেয়েও ভালো। আর আরাফার দিনের চেয়ে ভালো দিন আল্লাহর কাছে আর নেই। এ দিন আল্লাহ সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন। তারপর আকাশবাসীর সামনে পৃথিবীবাসীদের নিয়ে গর্ব করেন। তিনি বলেন : আমার বান্দাদের দিকে দৃষ্টি দাও। তারা এলোমেলো চুলে ধুলামলিন দেহে দুপুর না হতেই আমার নিকট এসেছে। তারা এসেছে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। তারা আমার রহমতের আশা করে। অথচ আমার আযাব তারা দেখেনি। ইয়াওমে আরাফায় যতো বিপুল সংখ্যক লোক দোযখ থেকে মুক্তি পায়, ততো কোনো দিন পায়না" -আবু ইয়ালা, বাযযার, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান।

ইবনুল মুবারক আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. এমন সময় আরাফায় অবস্থান নিলেন যে সূর্য তখন প্রত্যাবর্তনে উদ্যত। (অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেছে।) তিনি বললেন : "হে বিলাল, আমার কথা শোনার জন্য জনতাকে নীরব হতে বলো।" বিলাল দাঁড়িয়ে বললেন : "আপনারা চুপ করুন। রসূলুল্লাহ সা. ভাষণ দিবেন। মনোযোগ দিয়ে শুনুন।" লোকেরা নীরব হয়ে গেলো। তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : হে জনতা, আমার কাছে এই মাত্র জিবরীল এসেছিলেন। তিনি আমাকে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম জানালেন। তারপর বললেন : আল্লাহ আরাফাবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। মাশয়ারুল হারামবাসীকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর তাদের সকল ক্ষতির প্রতিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।" একথা শুনে উমর রা. দাঁড়ালেন। তিনি বললেন : হে রসূল, এ সুসংবাদ কি শুধু আমাদের জন্য? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এটা তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পর কেয়ামত পর্যন্ত যারা আরাফায় আসবে তাদের সকলের জন্য। উমর রা. বললেন : আল্লাহর মহানুভবতা প্রচুর ও উৎকৃষ্ট। আর মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আরাফার দিনে আল্লাহ তার যতো বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন, তার চেয়ে বেশি আর কোনো দিন দেননা। আল্লাহ তায়ালা এই দিন নিকটবর্তী হন। ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন : এরা কী চায়? আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আরাফার দিনে শয়তানকে যতো বেঁটে, লজ্জিত ও ক্ষিপ্ত হতে দেখা গেছে, বদরের দিন ব্যতিত আর কোনো দিন তাকে এমন দেখা যায়নি। আর এর কারণ শুধু এই যে, এই দিন সে আল্লাহর অশেষ রহমত নাযিল হতে ও তার বান্দাদের বড় বড় গুনাহ মাফ হতে দেখেছে। একমাত্র বদরের দিন তাকে এ রকম ক্ষিপ্ত ও লজ্জিত দেখা গেছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূলুল্লাহ, বদরের দিন সে কী দেখেছিল? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : সে দেখেছে, জিবরীল ফেরেশতাদের বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। - মালেক।

আরাফায় অবস্থান সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : আলেমগণ একমত যে, আরাফায় অবস্থান হজ্জের শ্রেষ্ঠতম রুকন। কেননা আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জনৈক ঘোষণাকারীকে এই মর্মে ঘোষণা করতে আদেশ দিলেন যে, হজ্জ হলো আরাফা। (অর্থাৎ ইয়াওমে আরাফায় অবস্থানকারীর হজ্জই বিশুদ্ধ হজ্জ।) যে ব্যক্তি ৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাতে ও ফজর হওয়ার আগে আরাফায় অবস্থান করবে, তার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আরাফার যে কোনো অংশে ৯ তারিখের দিনে বা রাতে এক মুহূর্তের জন্য হলেও অবস্থান করতেই হবে।)

উকুফে আরাফার (আরাফায় অবস্থানের) সময় : অধিকাংশ আলেমের মতে, ৯ই জিলহজ্জের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর থেকে দশই জিলহজ্জের ফজর পর্যন্ত আরাফায় অবস্থানের সময়। এই সময় রাত ও দিনের যে কোনো অংশে অবস্থান যথেষ্ট হবে। তবে দিনে অবস্থান করলে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অবস্থান অব্যাহত রাখতে হবে। তবে রাতে অবস্থান করলে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যতোক্ষণ ইচ্ছা অবস্থান করতে পরে। শাফেয়ী মযহাব অনুসারে রাত পর্যন্ত অবস্থান করা সুন্নত।

অবস্থানের উদ্দেশ্য : অবস্থানের উদ্দেশ্য হলো আরাফার যে কোনো অংশে উপস্থিতি, চাই ঘুমিয়ে হোক, জেগে হোক, শুয়ে হোক, বসে হোক, পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে থাকা অবস্থায় হোক বা বাহনে আরোহী হয়ে হোক পবিত্র অবস্থায় হোক অথবা অপবিত্র অবস্থায় হোক, যথা ঋতুবতী মহিলারা কিংবা বীর্যপাতজনিত অপবিত্র পুরুষ। যে ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আরাফায় অবস্থান করে এবং আরাফা থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার সংজ্ঞা ফেরেনি, তার সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আবু হানিফা ও মালেক বলেছেন : তার অবস্থান শুদ্ধ। শাফেয়ী, আহমদ, হাসান, আবুজর, ইসহাক ও ইবনুল মুনযির বলেন : শুদ্ধ হবেনা। কেননা এটা হজ্জের রুকন। সুতরাং সঙজ্ঞাহীন ব্যক্তির দ্বারা অন্য কোনো রুকন যেমন শুদ্ধ হয়না। তেমনি এটাও শুদ্ধ হবেনা।

তিরমিযি উপরোক্ত ইবনে ইয়ামারের হাদিস উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সুফিয়ান ছাওরী বলেন : সাহাবিগণসহ সকল আলেমদের আমল ইবনে ইয়ামারের হাদিস অনুসারে। অর্থাৎ জিলহজ্জের দশ তারিখের ফজরের পূর্বে যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করলনা তার হজ্জ হবেনা। সূর্যোদয়ের পরে এলে হজ্জ হবেনা। এটা ওমরায় পরিণত হবে। তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। এটা শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের মত।

আরাফার প্রস্তরময় স্থানে অবস্থান করা মুস্তাহাব : আরাফার যে কোনো স্থানে অবস্থান করাই যথেষ্ট ও শুদ্ধ। কেননা সমগ্র আরাফার ময়দানই অবস্থানের জায়গা কেবল পশ্চিমে অবস্থিত 'বাতনে আরাফা' নামক ময়দান বাদে। কেননা সেখানে অবস্থান সর্বসম্মতভাবে অশুদ্ধ। প্রস্তরপূর্ণ জায়গাগুলোতে বা তার সন্নিকটে অবস্থান করা মুস্তাহাব। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এই জায়গায়ই অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন : আমি এখানে অবস্থান করলাম। তবে সমগ্র আরাফাত ময়দানই অবস্থানের স্থান। - আহমদ, মুসলিম আবু দাউদ। জাবালুর রহমতে আরোহণ করা এবং সেখানে অবস্থান করা অন্যান্য জায়গার চেয়ে ভালো এরূপ ধারণা করা ভুল। এটা সুন্নত নয়।

গোসল করা মুস্তাহাব : আরাফাতে অবস্থানের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরাফায় বিকালে অবস্থানের জন্য গোসল করতেন। - মালেক। উমর রা. আরাফার ময়দানে তালবিয়া পড়তে পড়তে গোসল করেছেন।

অবস্থানের নিয়ম-কানুন ও দোয়া : পূর্ণ পবিত্রতা বজায় রাখা, কেবলামুখি থাকা, বেশি করে তওবা ইসতিগফার ও যিকর করা, নিজের জন্য, অন্যের জন্য এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের যা কিছু মনে চায়। আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ভীতিসহকারে ও মনোযোগসহকারে দু'হাত তুলে দোয়া করবে।

উসামা বিন যায়েদ বলেছেন : "আমি আরাফাতে রসূলুল্লাহ সা. এর সহ-আরোহী ছিলাম। তিনি হাত উঁচু করে দোয়া করতে বলেছেন। - নাসায়ী।

আমর বিন শুয়াইব তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন : আরাফাতের দিন রসূলুল্লাহ সা. যে দোয়াটি সবচেয়ে বেশি পড়তেন তা হলো :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

আহমদ, তিরমিযি। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আরাফার দিনের দোয়া হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দোয়া। আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীরা যেসব দোয়া করতেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দোয়া হলো :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

(আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর, তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান)। হুসাইন ইবনে হাসান বলেন : আমি সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়াওমে আরাফার শ্রেষ্ঠ দোয়া কী? তিনি বললেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ....

আমি বললাম : এতো আল্লাহর প্রশংসা। এটা দোয়া নয়। (অর্থাৎ এতে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হয়নি।) তিনি বললেন : তুমি মালেক বিন মানযুরের হাদিস জানো? ঐ হাদিসেই এর ব্যাখ্যা রয়েছে। আমি বললাম : হাদিসটি কি আপনি আমাকে বলুন। তিনি বললেন : হাদিসটি হলো : আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা যখন আমার ওপর প্রশংসা করতে গিয়ে নিজের জন্য কিছু চাওয়ার সুযোগ পায়না। তখন আমি প্রার্থনাকারীদেরকে যা দেই, তার চেয়েও ভালো জিনিস তাকে দেই।" তিনি বললেন : এটাই উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা। পুনরায় সুফিয়ান বললেন : তুমি কি জানোনা উমাইয়া ইবনে আবিস্ সাল্ত যখন আবদুল্লাহ বিন জাদয়ানের কাছে তার দান পাওয়ার জন্য এসেছিলেন তখন কি বলেছিলেন? হুসাইন বলেন। না। তিনি বললেন : উমাইয়া বলেছিলেন : "আমি কি নিজের চাহিদার উল্লেখ করবো, না আপনার লজ্জা আমার জন্য যথেষ্ট। লজ্জা তো আপনার বৈশিষ্ট্য। মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতাও আপনার বৈশিষ্ট্য। কেননা আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আপনর বংশ মর্যাদা অতীব মহৎ ও উত্তম। যখন কেউ আপনাকে একদিন প্রশংসা করে তার সেই প্রশংসা করাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।" এরপর সুফিয়ান বললেন : হে হুসাইন, এ হলো সৃষ্টি অবস্থা। প্রশংসা করেই সে ক্ষান্ত হয়। চাওয়ার প্রয়োজন মনে করেনা। তাহলে স্রষ্টা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

বায়হাকি আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আরাফায় আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যে দোয়া সবচেয়ে বেশি করতেন এবং আমি যে দোয়া সবচেয়ে বেশি করি তা হলো :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا. اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ، وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ وَشَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ.

"আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজ্য তাঁরই, প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ, আমার চোখে নূর দাও, কানে নূর দাও, হৃদয়ে নূর দাও। হে আল্লাহ, আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দাও। আমার কাজ সহজ করে দাও। হে আল্লাহ, আমি তোমার আশ্রয় চাই অন্তরের কুপ্ররোচনা থেকে, কবরের আযাব থেকে। রাতের বেলা প্রবেশকারীর অনিষ্ট থেকে, দিনের বেলায় প্রবেশকারী অনিষ্ট থেকে। বহমান বাতাসের অনিষ্ট থেকে এবং যুগের ধ্বংসাত্মক জিনিসসমূহের অনিষ্ট থেকে।"

তিরমিযি বর্ণনা করেছেন : ইয়াওমে আরাফায় রসূলুল্লাহ সা. সর্বাধিক যে দোয়া আরাফার ময়দানের নিজের অবস্থান স্থলে বসে করতেন তা হলো :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ نَقُوْلُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ، وَنُسُكِيْ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِيْ، وَإِلَيْكَ مَآبِيْ، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيْحُ .

"হে আল্লাহ, তুমি যেমন বলো সেভাবেই তোমার প্রশংসা, আমরা যেভাবে বলি তার চেয়ে উত্তম। হে আল্লাহ, তোমার জন্যই আমার নামায, তোমার জন্যই আমার কুরবানি তোমার জন্যই আমার জীবন, তোমার জন্যই আমার মরণ, তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন, তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে, বুকের কুপ্ররোচনা থেকে, বাতিল কার্যকলাপ থেকে এবং বহমান বাতাসের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

আরাফায় অবস্থান ইবরাহিম আ.-এর সুন্নত : মিরবা আনসারী বলেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা তোমাদের ইবাদতের স্থানগুলোতে অবস্থান করো। কেননা তোমরা ইবরাহিমের উত্তরাধিকার থেকে কিছুটা উত্তরাধিকার পেয়েছো। - তিরমিযি।

আরাফার রোযা : বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. আরাফার দিনে রোযা রাখেননি। উপরন্তু তিনি বলেছেন : আরাফার দিন, ঈদের দিন ও আইয়ামুত তাশরিক আমরা মুসলমানদের উৎসব। এ দিনগুলো পানাহারের দিন। এও প্রমাণিত যে, তিনি আরাফাতের ময়দানে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

এসব হাদিস থেকে অধিকাংশ আলেম এই মর্মে প্রমাণ দর্শিয়েছেন যে, আরাফার দিন হাজিদের জন্য রোযা না রাখা মুস্তাহাব, যাতে সে দোয়া ও যিকরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পায়। আর আরাফার দিনে রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে যে হাদিসগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো যারা হজ্জ করতে আরাফার ময়দানে যায়নি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যোহর ও আসরের নামায একত্রিত করা : সহীহ হাদিসে এসেছে রসূলুল্লাহ সা. আরাফায় যোহর ও আসরের নামায একত্রিত করেছেন। আযান হলো, ইকামত হলো, তারপর তিনি যোহর পড়লেন, তারপর পুনরায় ইকামত হলো, তারপর আসরের নামায পড়লেন। আসওয়াদ ও আলকামা বলেছেন : আরাফায় ইমামের সাথে যোহর ও আসর পড়া হজ্জের পূর্ণতা দান করে। ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলেমগণ একমত যে, ইমাম আরাফায় যোহর ও আসর একত্রে (অর্থাৎ একই সাথে যোহরের ওয়াক্তে) পড়বে। অনুরূপ করবে, ইমামের সাথে যারা নামায পড়বেনা তারাও। কেউ যদি ইমামের সাথে এই দুই নামায একত্র না করে তবে একা একাই একত্র করবে। ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত : তিনি মক্কায় বাস করতেন। তারপর যখন তিনি মিনায় যেতেন অথবা নামায কসর করতেন। আমর ইবনে দিনার থেকে বর্ণিত : জাবের বলেছেন : আরাফায় নামায কসর করো। - সাঈদ বিন মানসুর।

২১. মুযদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফা থেকে প্রস্থান

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর শান্তভাবে আরাফাত থেকে রওয়ানা হওয়া সুন্নত। রসূলুল্লাহ সা. শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে আরাফাত ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর উটনীর লাগাম ধারণ করেছিলেন, তারপর বলেছিলেন : হে জনতা, তোমরা ধীরে পদক্ষেপে চলো। দ্রুত চলাতে কোনো সওয়াব নেই। - বুখারি ও মুসলিম। বুখারি ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেন যে, জনগণের সাথে বিনম্র ব্যবহারের অভ্যাসের কারণেই তিনি ধীর গতিতে চলতেন। যখনই রাস্তা একটু ফাঁকা পেতেন অমনি কিছুটা দ্রুত চলতেন।

এ সময় তালবিয়া ও যিকর মুস্তাহাব। কেননা জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত তালবিয়া পড়তেন।

আশয়াস বিন সুলাইম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : আমি ইবনে উমরের সাথে আরাফাত থেকে মুয্দালিফায় এসেছিলাম। মুযদালিফায় আসা পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত তালবিয়া পড়ছিলেন। একটুও ক্লান্ত হননি। - আবু দাউদ।

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা এক ওয়াক্তে পড়া : মুযদালিফায় পৌছার পর রসূল সা. এক আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশা পড়েছেন। মাঝে কোনো নফল পড়েননি।

মুসলিমের হাদিসে এসেছে : রসূলুল্লাহ সা. মুযদালিফায় এসে মাগরিব ও এশা এক আযানে ও দুই ইকামতে পড়লেন। মাঝে কোনো নামায পড়লেন না। এই একত্রিকরণ সর্বসম্মতভাবে একটি সুন্নত।

কেউ যদি প্রত্যেক নামায স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়ে, তাহলে তা নিয়ে মতভেদে রয়েছে। অধিকাংশ আলেমদের মতে এটা জায়েয। তবে রসূল সা.-এর কাজকে অগ্রগণ্য বলে অভিহিত করেছে। ছাওরী ও যুক্তবাদী আলেমগণ বলেছেন : মাগরিব যদি মুযদালিফা ব্যতিত অন্য কোথাও পড়ে তবে তা দোহরাতে হবে। তারা যোহর ও আসর স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়াকে জায়েয বলেছেন। কিন্তু মাকরূহ হবে বলে রায় দিয়েছেন।

মুযদালিফায় অবস্থান ও রাত্রি যাপন : জাবের রা.-এর হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সা. যখন মুযদালিফায় এলেন তখন মাগরিব ও এশা পড়লেন। তারপর শুয়ে পড়লেন এবং যখন ভোর হলো, উঠে ফজর পড়লেন। তারপর কাসওয়ায় আরোহণ করলেন এবং মাশয়ারুল হারামে এলেন। তারপর প্রভাত খুব ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই রইলেন। তারপর সূর্যোদয়ের আগে রওয়ানা হলেন। তিনি এখানে সারা রাত জেগেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মুযদাফিলায় রাত্র যাপন ও অবস্থান সম্পর্কে হাদিস থেকে এটুকুই জানা গেছে। রাখাল ও পানি সরবরাহকারীরা বাদে সকলের ওপরই মুযদালিফায় রাত যাপন ওয়াজিব বলে আহমদ রায় দিয়েছেন। রাখাল ও পানি সরবরাহকারীদের উপর এটা ওয়াজিব নয়। অবশিষ্ট ইমামগণ বলেছেন, মুযদালিফায় অবস্থান সকলের জন্য ওয়াজিব। রাত্র যাপন ওয়াজিব নয়। অবস্থান দ্বারা যে কোনো উপায়ে উপস্থিতি বুঝানো হয়েছে। চাই দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক, চলমান অবস্থায় হোক বা ঘুমন্ত অবস্থায় হোক।

হানাফী মাযহাবের মত হলো, ১০ই জিলহজ্জের ফজরের পূর্বে মুযদালিফায় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। উপস্থিত না হলে দম দিতে হবে। অবশ্য ওযর থাকলে ভিন্ন কথা। ওযর থাকলে উপস্থিত হওয়া জরুরি নয়। কোনো দমও দিতে হবেনা। আর মালেকীদের মত হলো, কোনো ওযর না থাকলে আরাফা থেকে মিনা যাওয়ার পথে মুযদালিফায় রাতের বেলা ফজরের পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য হলেও যাত্রা বিরতি করা ওয়াজিব। ওযর থাকলে বিরতি ওয়াজিব নয়।

শাফেয়ীদের মতে আরাফায় অবস্থানের পর ১০ই জিলহজ্জের পূর্বের রাতের দ্বিতীয়ার্ধে মুযদালিফায় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। মুযদালিফায় অবস্থান করা শর্ত নয়। এমনকি স্থানটি মুযদালিফা কিনা তাও জানা শর্ত নয়। শুধু ওখান দিয়ে অতিক্রম করাই যথেষ্ট। চাই জায়গাটা মুযদালিফা, একথা জানুক বা না জানুক। প্রথম ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়া অত:পর প্রভাত হওয়া পর্যন্ত মাশয়ারুল হারামে অবস্থান করা সুন্নত। সূর্যোদয়ের পূর্বে আকাশ খুব পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত এখানে অবস্থানপূর্বক বেশি করে দোয়া ও যিকর করা সুন্নত। আল্লাহ বলেন :

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ . ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

"তারপর যখন তোমরা আরাফা থেকে রওয়ানা হবে তখন মাশয়ারুল হারামের নিকটে আল্লাহর যিকর করো। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে সেভাবে আল্লাহর যিকর করো। ইতিপূর্বে তো তোমরা গোমরাহ ছিলে। তারপর লোকেরা যে পথ ধরে চলে, তোমরাও সেই পথ ধরে চলো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওয়ানা হও। মুহাসসারে এলে দ্রুত গতিতে তা অতিক্রম করবে।

মুযদালিফায় অবস্থানের জায়গা : সমগ্র মুযদালিফাই অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান কেবল মুহাসসার নামাক উপত্যকা বাদে। (এটি মিনা ও মুযদালিফার মাঝে অবস্থিত।)

জুবাইর বিন মুতয়াম রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সমগ্র মুযদালিফাই অবস্থানের যোগ্য স্থান। তবে মুহাসসার থেকে দ্রুত পার হয়ে যাও।" -আহমদ।
কুযাহ নামক পাহাড়ের নিকট অবস্থান করা সর্বোত্তম।

আলী রা. বর্ণনা করেছেন : যখন 'কুযাতে' রসূলুল্লাহ সা.-এর ভোর হলো, তখন তিনি কুযাহ'তে এলেন এবং সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি বললেন : "সমগ্র কুযাহ অবস্থানের যোগ্য এবং সমগ্র কুযা' অবস্থানের যোগ্য।" - আবু দাউদ, তিরমিযি। (কুযাহ মুযদালিফার একটি জায়গা। জাহেলি যুদ্ধে কুরাইশ যখন আরাফাতে অবস্থান করতোনা তখন এখানে অবস্থান করতো। জাওহারীর মতে, এটি মুযদালিফার একটি পাহাড়ের নাম। বহু সংখ্যক ফকীহর নিকট এটাই মাশয়ারুল হারাম।)

২২. ইয়াওমুন নাহর (১০ই জিলহজ্জ)-এর কার্যাবলি

ইয়াওমুন নাহরের (কুরবানির দিনের) কাজগুলো নিম্নরূপ ধারাবাহিকতার সাথে পালন করতে হবে : প্রথমে কংকর নিক্ষেপ। তারপর কুরবানি। তারপর চুল কামানো। তারপর বাইতুল্লাহর তওয়াফ। এই ধারাবাহিকতা সুন্নত। তবে এর কোনো একটি কাজকে যদি অপর কাজের আগে করা হয় তাহলে কোনো কাফফারা বা দম দেয়া লাগবেনা। এটা অধিকাংশ আলেমের মত এবং শাফেয়ী মাযহাবের মত।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বিদায় হজ্জে মিনায় অবস্থান করলেন। সেখানে লোকেরা তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো : হে রসূল! আমি অজ্ঞতাবশত কুরবানির আগেই মাথা কামিয়েছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ঠিক আছে, কুরবানি দিয়ে দাও। কোনো ক্ষতি হবেনা। তারপর আরেকজন এলো। সে বললো : হে রসূল! আমি না জেনে শুনে কংকর নিক্ষেপের আগে কুরবানি করে ফেলেছি। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : ঠিক আছে, কংকর নিক্ষেপ করো, কোনো ক্ষতি হবেনা। এভাবে রসূলুল্লাহ সা.কে যে কাজের কথাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিলো যে, আগে বা পরে করা হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন : করে নাও, ক্ষতি নেই।

আবু হানীফা বলেন : ধারাবাহিকতা ঠিক না রেখে এক কাজের আগে আরেক কাজ করলে দম দিতে হবে। "কোনো ক্ষতি নেই" একথার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : ফিদিয়া বা দম না দিলেও কোনো গুনাহ হবেনা।

ইহরাম মুক্ত হওয়ার দুই পর্যায় : ইয়াওমুন নাহর অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জ তারিখে জামরায় কংকর নিক্ষেপ এবং মাথার চুল ছাটা বা ন্যাড়া করা দ্বারা ইহরামকারীর জন্য ইহরাম দ্বারা যা যা হারাম হয়ে গিয়েছিল, তার প্রায় সব হালাল হয়ে যায়। এরপর তার জন্য একমাত্র স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সুগন্ধি ব্যবহার ও সেলাই করা কাপড় পরা ইত্যাদি বৈধ হয়ে যায়। এটা

ইহরাম মুক্ত হওয়ার প্রথম পর্যায়। এরপর যখন তওয়াফে এযাফা বা তওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করবে, তখন তার জন্য স্ত্রী সহবাসসহ সবকিছুই বৈধ হয়ে যায়। এটা ইহরাম মুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়।

২৩. কংকর নিক্ষেপ

মিনায় শয়তানকে লক্ষ্য করে যে কংকর নিক্ষেপ করা হয় তা তিন জায়গায় নিক্ষেপ করা হয়:
১. জামরাতুল আকাবা : মিনায় প্রবেশের সময় সর্বপ্রথম যেটি বাম দিকে দৃষ্টিগোচর হয়।
২. জামরাতুল উসতা বা মধ্যবর্তী জামারা : এটি প্রথমটির পরে ১১৬৭৭ মিটার দূরে অবস্থিত।
৩. জামরাতুস সুগরা : এটি দ্বিতীয়টি থেকে ১৫৬০৪ মি: দূরে মাসজিদুল খায়ফের নিকটে অবস্থিত।

কংকর নিক্ষেপের গোড়ার কথা : বায়হাকি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন কুরবানি করতে মিনায় এলেন, তখন জামরাতুল আকাবার নিকট তাঁর সামনে শয়তান আবির্ভূত হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে লক্ষ্য করে সাতটা কংকর নিক্ষেপ করলেন। অমনি সে মাটির নিচে ডেবে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পুনরায় দ্বিতীয় জামরায় আবির্ভূত হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে লক্ষ্য করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। ফলে সে মাটির নিচে ধ্বসে গেলো। তারপর পুনরায় তৃতীয় জামরায় আবির্ভূত হলো। তিনি এবারও তাকে লক্ষ্য করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। ফলে সে মাটির নিচে ধ্বসে উধাও হয়ে গেলো। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : তোমরা শয়তানকে লক্ষ্য করে কংকর নিক্ষেপ করবে এবং ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণ করবে। – ইবনে খুযায়মা, হাকেম।

কংকর নিক্ষেপের যুক্তি : ইমাম আবু হামেদ গাযযালী রহ. ইহয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখেছেন : কংকর নিক্ষেপের সময় নিক্ষেপকারীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর ও রসূলের আদেশ পালন, আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকাশ, নিছক আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ও উদ্বুদ্ধ হওয়ার নমুনা প্রদর্শন এবং এতে নিজের প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই এই মনোভাব ব্যক্ত করা। উপরন্তু এর মাধ্যমে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে নিজের সাদৃশ্য প্রমাণ করার ইচ্ছাও পোষণ করা উচিত। সেখানে অভিশপ্ত ইবলিস তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার হজ্জের ব্যাপারে তাঁর মনে সন্দেহ সৃষ্টি অথবা তাকে কোনো গুনাহে লিপ্ত করতে চেয়েছিল। তাই আল্লাহ তাকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে ইবরাহিম আ. কে আদেশ দিয়েছিলেন।

তোমার মনে যদি এরূপ চিন্তা আসে যে, ইবরাহিম আ.-এর সামনে শয়তান আবির্ভূত ও উপস্থিত হয়েছিল বলে তিনি পাথর মেরেছিলেন। কিন্তু আমার সামনে তো শয়তান আসেনি। আমি কেন পাথর মারবো? এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলে জেনে নিও, এটা শয়তানেরই প্ররোচনা এবং এটা তার পক্ষ থেকেই এসেছে। এ ধারণা সে-ই তোমার মনে ঢুকিয়েছে, যাতে পাথর নিক্ষেপে তোমার প্রেরণা ও উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যায় এবং তোমাকে বুঝানো যায় যে, এতে কোনো লাভ নেই এবং এটা একটা বাহুল্য কাজ। এতে তুমি কেনো লিপ্ত হবে? এ চিন্তাধারা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য কঠোর সংকল্প নিয়ে পাথর নিক্ষেপ করো। এভাবেই তুমি শয়তানকে পরাভূত করতে পারবে। জেনে রাখো, বাহ্যত যদিও দেখা যাচ্ছে, তুমি আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করছো, কিন্তু আসলে তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ শয়তানের মুখের ওপর এবং তার মেরুদণ্ড ভেংগে দিচ্ছো। কেননা মহান আল্লাহর আদেশ পালন ও তাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ছাড়া আর কোনো উপায়ে তুমি শয়তানকে পরাভূত করতে পারোনা। আর এই আদেশ পালনে তোমার প্রবৃত্তি যেন তোমাকে কিছু মাত্র পিছু হটাতে না পারে এবং আল্লাহর হুকুমই যেন তোমাকে সকল বাধা মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাতে যথেষ্ট হয়।

কংকর নিক্ষেপ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : অধিকাংশ আলেমের মতে কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব, হজ্জের রুকন নয়। এটা তরক করলে দম দিয়ে অর্থাৎ একটা ছাগল কুরবানি করে এর ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। কেননা আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সা. কে দেখেছি নিজের উটের ওপর বসে ইয়াওমুন নাহরে (১০ই জিলহজ্জ তারিখে) কংকর নিক্ষেপ করছেন এবং বলছেন : তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের ইবাদতের পদ্ধতি শিখে নাও। কেননা আমি জানিনা, এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করতে পারবো কিনা। আব্দুর রহমান তাইমী বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বিদায় হজ্জে আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেনো আংগুল দিয়ে ছোড়া যায় এমন ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করি। – তাবারানি।

কংকরের আকৃতি কেমন হবে এবং কোন্ জাতের : উপরোক্ত হাদিসে বলা হয়েছে নিক্ষেপ কংকরের আকৃতি হবে আংগুল দিয়ে নিক্ষেপণযোগ্য শিমের বিচির মতো ক্ষুদ্র। এজন্য আলেমগণ মনে করেন, অনুরূপ ক্ষুদ্র আকৃতির কংকর বা নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। বড় আকারের পাথর নিক্ষেপ করলে অধিকাংশ আলেমের মতে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে। আহমদ বলেছেন : ক্ষুদ্র কংকর না হলে আদায় হবেনা। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এগুলোই নিক্ষেপ করতে আদেশ করেছেন এবং বড় পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

আবু দাউদ বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হে জনতা, তোমরা একে অপরকে হত্যা করোনা। কংকর যখন নিক্ষেপ করবে, তখন ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করবে। (অর্থাৎ বড় আকারের পাথর নিক্ষেপ করলে তা হাজিদের গায়ে পড়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।) ইবনে আব্বাস রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাকে বললেন : আমাকে দাও, আমার জন্য পাথর কুড়াও।" তখন আমি তার জন্য শিমের বিচির মতো ছোট ছোট নুড়ি পাথর কুড়িয়ে আনলাম। পাথরগুলো যখন রসূলুল্লাহ সা. এর হাতে দিলাম, তখন তিনি বললেন : এ রকম ছোট পাথরই তো চাই। সাবধান, তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা। কেননা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। (কেউ কেউ বড় পাথর নিক্ষেপ করে শয়তানের প্রতি নিজের প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করে। এটা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে।)– আহমদ, নাসায়ী। অধিকাংশ আলেমের মতে এ হাদিসগুলো অগ্রগণ্যতা ও মুস্তাহাব নির্দেশক। তারা এ ব্যাপারে একমত যে, পাথর ছাড়া অন্য কিছু যথা লোহা, শিসা ইত্যাদি নিক্ষেপ অবৈধ। কিন্তু হানাফীদের মত এর বিপরীত। তাদের মতে, মাটি থেকে নির্গত যে কোনো জিনিস যথা পাথর, মাটি, ইট, পোড়ামাটি নিক্ষেপ বৈধ। কেননা কংকর নিক্ষেপ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর ভাষা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবিগণ কাজের মাধ্যমে যা দেখিয়ে গেছেন সেটা সর্বোত্তম। তবে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এমন নয়। প্রথম মতটি অগ্রগণ্য (অর্থাৎ পাথর জাতীয় জিনিসই নিক্ষেপ করতে হবে– লোহা, ইট ইত্যাদি নিক্ষেপ করা চলবেনা), কেননা রসূলুল্লাহ সা. ক্ষুদ্র পাথর নিক্ষেপ করেছেন এবং আংগুল দিয়ে ছুড়ে মারা যায় এমন ক্ষুদ্র পাথর নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই পাথরের যতো শ্রেণী ও প্রকার হোক চলবে, কিন্তু পাথর ছাড়া অন্য কিছু চলবেনা।

কংকর বা নুড়ি পাথর কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে : ইবনে উমর রা. মুযদালিফা থেকে কংকর সংগ্রহ করতেন। সাঈদ বিন জুবাইরও তদ্রূপ করতেন এবং বলতেন, মুযদালিফা থেকেই এগুলো যোগাড় করা হতো। শাফেয়ী মুযদালিফা থেকে নেয়া মুস্তাহাব মনে করেন। আহমদ বলেছেন : যেখান থেকে ইচ্ছা নুড়ি পাথর সংগ্রহ করো। আতা ও ইবনুল মুনযিরের মতও তদ্রূপ। কেননা ইতিপূর্বে বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রসূলুল্লাহ সা. কংকর কুড়িয়ে দিতে

বলেছেন। কিন্তু কোথা থেকে তা বলেননি। জামারায় অন্যদের নিক্ষেপিত পাথর কুড়িয়েও কংকর মারা যায়। কিন্তু তা মাকরূহ। এটা হানাফী, শাফেয়ী ও আহমদের মত। ইবনে হাযম বলেন : এটা মাকরূহ নয়। অনুরূপ তার মতে বাহনের ওপর বসে কংকর নিক্ষেপও বৈধ এবং মাকরূহ নয়। অন্যের নিক্ষিপ্ত কংকর কুড়িয়ে নিক্ষেপ করা বৈধ হওয়ার কারণ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহ এটাকে নিষিদ্ধ করেনি। তিনি আবার বলেন : কেউ হয়তো বলবে, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জামরার কংকরগুলোর মধ্য থেকে যেগুলো কবুল হয়, তা ওপরে তুলে নেয়া হয়। আর যা কবুল হয়না তা ওখানে পড়ে থাকে (কাজেই পড়ে থাকা কবুল না হওয়া পাথর কুড়িয়ে নিক্ষেপ করা ঠিক নয়)। যদি কবুল হওয়া পাথর তুলে নেয়া না হতো তাহলে ওখানে এতদিন বিশাল পাহাড় হয়ে যেতো এবং চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যেতো। এর জবাবে আমি বলবো : ঠিক আছে, তাতে কী হয়েছে? এসব কংকর যদি একজনের কাছ থেকে কবুল না করা হয়ে থাকে, তবে আরেক জনের কাছ থেকে কবুল করা হবে। কখনো কখনো একজনের সদকা কবুল হয়না। কিন্তু সেই সদকা গ্রহণকারী পুনরায় তা সদকা করে দিলে তা কবুল হয়ে যায়। বাহনের ওপর বসে কংকর নিক্ষেপ বৈধ এজন্য যে, কুদামা বিন আবদুল্লাহ বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে ১০ই জিলহজ্জ তার একটি লালচে রং এর উটনীর পিঠে চড়ে কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। কাউকে মারপিটও করতে হয়নি, তাড়াতেও হয়নি, এদিক সরো ওদিক যাও ইত্যাদি বলে হাঁকাহাঁকিও করতে হয়নি।

কংকরের সংখ্যা : নিক্ষেপণযোগ্য কংকরের সংখ্যা হবে সত্তর অথবা উনপঞ্চাশ। তন্মধ্য থেকে সাতটি নিক্ষেপ করা হবে প্রথম জামারা অর্থাৎ জামরাতুল আকাবায় ১০ই জিলহজ্জ তারিখে। তারপর এগারোই জিলহজ্জ তিন জামারাতে সাতটা করে মোট একুশটি নিক্ষেপ করা হবে। অনুরূপ ১২ই জিলহজ্জ তারিখে তিন জামারায় প্রতিটিতে ৭টি করে, মোট একুশটি কংকর নিক্ষেপ করা হবে। অনুরূপ, প্রতি জামারায় সাতটি করে সর্বমোট একুশটি নিক্ষেপ করা হবে ১৩ই জিলহজ্জ তারিখেও। এভাবে কংকরের সংখ্যা হবে সত্তর। তবে কেউ যদি ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের পর ১৩ তারিখে আর নিক্ষেপ না করে, তবে তা বৈধ হবে। এভাবে হাজি কর্তৃক নিক্ষেপিত কংকরের সংখ্যা দাঁড়ায় উনপঞ্চাশ। আহমদের মযহাব অনুসারে সাতটা কংকর নিক্ষেপও যথেষ্ট। আতা বলেন : পাঁচটা কংকর নিক্ষেপ যথেষ্ট। মুজাহিদ বলেন : ছয়টা কংকর নিক্ষেপ যথেষ্ট। এজন্য কোনো কাফফার দিতে হবেনা। সাঈদ বিন মালেক বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে হজ্জে অংশ নেয়ার পর যখন ফিরেছি তখন আমাদের কেউ কেউ বলতো : আমি ছয়টা পাথর নিক্ষেপ করেছি। কেউ বলতো : সাতটা নিক্ষেপ করেছি। এতে কেউ কাউকে তিরস্কার করতোনা।

কংকর নিক্ষেপের দিন : কংকর নিক্ষেপের দিন তিন দিন বা চার দিন। ১০ই জিলহজ্জ এবং আইয়ামে তাশরিকের দুই বা তিন দিন। আল্লাহ বলেন :

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ أَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى.

তোমরা নির্দিষ্ট কতক দিনে আল্লাহর যিকর করো। যে ব্যক্তি দু'দিনেই কাজ সম্পন্ন করে তার কোনো গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি (১৩ তারিখ পর্যন্ত) বিলম্বিত করতে চায়, তারও কোনো গুনাহ নেই।

১০ই জিলহজ্জের কংকর নিক্ষেপ : কংকর নিক্ষেপের নির্বাচিত সময় হলো ১০ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুর পর্যন্ত। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এই দিনের দুপুরের আগেই কংকর

নিক্ষেপ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের কাছে গিয়ে বললেন : সূর্যোদয়ের পরে ব্যতীত ছোট জামারায় (জামারাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করোনা। –তিরমিযি।

দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিলম্বিত করলেও তা বৈধ হবে। ইবনে আব্দুল বার বলেন : আলেমগণ একমত যে ব্যক্তি ১০ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করবে, তার কংকর নিক্ষেপ বৈধ হবে। অবশ্য এটা মুস্তাহাব নয়।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : মিনায় ১০ই জিলহজ্জ তারিখে রসূলুল্লাহ সা. কে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতো। এক ব্যক্তি বললো : আমি সন্ধ্যার পর কংকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি বললেন : কোনো ক্ষতি নেই। –বুখারি

কংকর নিক্ষেপকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করা যাবে কি : যখন কোনো ওযরের কারণে দিনের বেলা কংকর নিক্ষেপ সম্ভব হয়না, তখন রাত পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ বিলম্বিত করা বৈধ। কেননা মালেক নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন : ইবনে উমরের স্ত্রী সুফিয়্যার এক মেয়ের মুযদালিফায় নেফাস শুরু হলো। ফলে সেই মেয়ে ও সুফিয়া মুযদালিফায় থেকে গেলেন এবং ১০ই জিলহজ্জের সূর্যাস্তের পর মিনায় পৌঁছলেন। ইবনে উমর রা. তাদেরকে আদেশ দিলেন কংকর নিক্ষেপ করতে। তিনি তাদেরকে কোনো কাফফারা দিতে বলেননি। তবে ওযর না থাকলে বিলম্বিত করা মাকরূহ। রাতে নিক্ষেপ করলে হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকের একটি রেওয়ায়াত অনুযায়ী দম দেয়া লাগবেনা। ইতিপূর্বে ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদিসই তার প্রমাণ।

আহমদের মতানুসারে কংকর নিক্ষেপ যদি এতোটা বিলম্বিত করে যে, ১০ই জিলহজ্জ দিন পার হয়ে যায়, তাহলে রাতে কংকর নিক্ষেপ করা যাবেনা। পরের দিন সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর নিক্ষেপ করতে হবে।

দুর্বল ও ওযরধারীদের জন্য ১০ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত দুপুরের পর কংকর নিক্ষেপের অনুমতি : রাতের প্রথমার্ধের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ। তবে নারী, শিশু, দুর্বল ওযরধারী ও পশুপালকদের জন্য ১০ই জিলহজ্জ মধ্যরাত থেকে জামারাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের অনুমতি রয়েছে।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. উম্মে সালামা রা. কে ১০ই জিলহজ্জ রাতে কংকর নিক্ষেপের জন্য পাঠালেন। উম্মে সালামা ফজরের আগে কংকর নিক্ষেপ করে চলে আসলেন। –আবু দাউদ, বায়হাকি, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. উটের রাখালদেরকে রাতে কংকর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছেন। –বাযযার। উরওয়া রা. বলেন : ১০ই জিলহজ্জ তারিখে রসূলুল্লাহ সা. উম্মে সালামার কাছে বারবার ঘুরলেন এবং তাকে আদেশ দিলেন যেন দ্রুত পাথর নিক্ষেপ করে মক্কায় চলে আসেন এবং মক্কায় ফজরের নামায পড়েন। সেদিনটি তার পালা ছিলো। তাই রসূলুল্লাহ সা. চেয়েছিলেন উম্মে সালামা তাঁর সংগী হোন।– শাফেয়ী ও বায়হাকি। আতা বলেন : আসমা সম্পর্কে এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জামারায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন। আমি বললাম : আমরা রাত্রে জামারায় কংকর নিক্ষেপ করেছি। আসমা বললেন : রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে আমরাও এ রকম করতাম। – আবু দাউদ।

তাবারি বলেছেন : উম্মে সালামা ও আসমার হাদীস থেকে শাফেয়ী প্রমাণ দর্শিয়েছেন যে, মধ্য রাতের পর যাত্রা করা বৈধ– তাঁর এই মত সঠিক।

ইবনে হাযম বলেছেন : রাতে কংকর নিক্ষেপ শুধু মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। পুরুষদের জন্য নয়, চাই সবল পুরুষ হোক বা দুর্বল পুরুষ হোক।

কিন্তু হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাদের ওযর আছে, তাদের জন্য রাতে যাত্রা করা ও কংকর নিক্ষেপ করা বৈধ। ইবনুল মুনযির বলেছেন : সূর্যোদয়ের পরে ছাড়া কংকর নিক্ষেপ না করা সুন্নত। যেমন রসূলুল্লাহ সা. করতেন। ফজর হওয়ার আগে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয নেই। কেননা এটা সুন্নতের বিরোধী। তবে যে ব্যক্তি ফজরের আগে কংকর নিক্ষেপ করবে, তার আর এটা দোহরাতে হবেনা। কেননা এটা শুদ্ধ হবেনা- এমন কথা কেউ বলেছে বলে জানিনা।

জামারার উপর থেকে কংকর নিক্ষেপ : আসওয়াদ বলেন : আমি উমর রা-কে দেখেছি জামারার ওপর থেকে কংকর নিক্ষেপ করেছেন। আতা বলেছেন : জামারার উপর থেকে কংকর নিক্ষেপ করা বৈধ।

জিলহজ্জের তিন দিনে কংকর নিক্ষেপ : তিন দিন ব্যাপী কংকর নিক্ষেপের সবচেয়ে ভালো সময় হলো সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. সূর্য হেলে পড়ার সময় অথবা তার পরে কংকর নিক্ষেপ করেছেন। –আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযি। –বায়হাকি নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন : ইবনে উমর রা. বলতেন : আমরা এই তিনদিন সূর্য হেলে পড়ার পর ছাড়া কংকর নিক্ষেপ করিনা।

কংকর নিক্ষেপকে কেউ যদি রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করে, তবে তা মাকরূহ হবে। তবে রাতে নিক্ষেপ করলে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করবে, তারপর নয়।

এটা ইমাম আবু হানিফা ব্যতিত সকল ইমামের সর্বসম্মত মত। আবু হানিফার মতে, তৃতীয় দিন সূর্য হেলার আগে কংকর নিক্ষেপের অনুমতি আছে। কেননা ইবনে আব্বাস বলেছেন : বিদায়ী যাত্রার শেষ দিনে সূর্য উত্তপ্ত হলে কংকর নিক্ষেপ ও মিনা থেকে বিদায় হওয়া জায়েয।

আইয়ামে তাশরিকে কংকর নিক্ষেপের পর অবস্থান করা : কংকর নিক্ষেপের পর কেবলামুখি হয়ে অবস্থান করা। আল্লাহর নিকট দোয়া করা, আল্লাহর প্রশংসা করা এবং নিজের জন্য, সকল মুমিন ভাই এর জন্য গুনাহ মাফ চাওয়া মুস্তাহাব।

আহমদ ও বুখারি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন : মসজিদুল খায়েফের পার্শ্ববর্তী প্রথম জামারাতে যখন কংকর নিক্ষেপ করতেন, তখন সাতটা কংকর নিক্ষেপ করতেন, প্রত্যেক কংকরের সাথে আল্লাহু আকবার বলতেন, তারপর বাতনুল ওয়াদীতে বাম দিকে চলে যেতেন, সেখানে কেবলামুখি হয়ে দু'হাত উঁচু করে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন, পুনরায় রওনা হয়ে আকাবার নিকটবর্তী জামারাতে এসে সাতটা কংকর নিক্ষেপ করতেন, প্রত্যেকটা কংকরে আল্লাহু আকবার বলতেন, অতঃপর আর অবস্থান না করে চলে যেতেন। হাদিসে আছে, তিনি আকাবার জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর অবস্থান করতেন না। অবস্থান করতেন শেষ জামারা দুটিতে কংকর নিক্ষেপের পর। আলেমগণ আবস্থানের জন্য একটা মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। সেটি হলো : যে কংকর নিক্ষেপের পর সেই দিন আর কোনো কংকর নিক্ষেপ নেই, তার পরে কোনো অবস্থান নেই। আর যে কংকর নিক্ষেপের পর একই দিন আরো কংকর নিক্ষেপ আছে, তারপর অবস্থান করতে হবে। ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. যখন আকাবার জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতেন, তখন সামনে চলে যেতেন, অবস্থান করতেন না।

কংকর নিক্ষেপ ধারাবাহিকতা : রসূলুল্লাহ সা. থেকে বিশ্বস্ত সনদে প্রমাণিত যে, তিনি মিনার সংলগ্ন প্রথম জামারায় কংকর নিক্ষেপ শুরু করতেন, তারপর তার সন্নিহিত মধ্যবর্তী জামারায় কংকর নিক্ষেপ করতেন, তারপর আকাবার জামারায় কংকর নিক্ষেপ করতো। তিনি বলেছেন : তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের ইবাদতগুলো গ্রহণ করো।" এ থেকে তিনজন ইমাম প্রমাণ দর্শিয়েছেন যে, জামারাগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা শর্ত এবং রসূলুল্লাহ সা.

যেরূপ ধারাবাহিকভাবে নিক্ষেপ করেছেন, সেভাবেই নিক্ষেপ করতে হবে। তবে হানাফীদের গৃহীত মত হলো, ধারাবাহিকতা সুন্নত; শর্ত নয়।

প্রতিটি কংকরের সাথে তকবীর ও দোয়া এবং কংকরকে আংগুলের মাঝে ধরে রাখা মুস্তাহাব : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও ইবনে উমর রা. জামারাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের সময় বলতেন : হে আল্লাহ, আমার হজ্জকে গুনাহমুক্ত হজ্জ বানাও এবং আমার গুনাহ মাফ করো। ইবরাহিম বলেছেন : আকাবার জামারা করার পর এই দোয়াটি পড়া পুরুষদের জন্য পছন্দ করা হতো। ইবরাহিমকে বলা হলো : প্রত্যেক জামারাতেই আপনি এই দোয়া করেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। দোয়াটি হলো : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا

আতা বলেছেন : যখনই কংকর নিক্ষেপ করো তকবীর বলবে, তকবীরের অব্যবহিত পর কংকর নিক্ষেপ করবে।

মুসলিমে জাবের রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. প্রতিটা কংকরের সাথে তকবীর বলতেন।

ফাতহুল বারীতে আছে : এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তাবকীর না দিলে কোনো কাফফারা লাগবেনা।

সালমান বিন আহওয়াসের মাতা বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা.কে আকাবার জামারার নিকট উটের ওপর আরোহী অবস্থায় দেখেছি, তাঁর আংগুলের মাঝে কংকর দেখেছি, সেই কংকর তিনি নিক্ষেপ করলেন, আর তার সাথে অন্যেরাও নিক্ষেপ করলো।

কংকর নিক্ষেপে অন্যকে প্রতিনিধি করা : কোনো ব্যক্তির যদি এমন কোনো ওযর যথা রোগ ইত্যাদি থাকে, যা তাকে কংকর নিক্ষেপে অক্ষম করে দেয়, তবে সে নিজের পক্ষ থেকে কাউকে পাথর নিক্ষেপ করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

জাবের রা. বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে নারী ও শিশুসহ হজ্জ করেছি। আমরা শিশুদের পক্ষ হতে তালবিয়া পড়তাম এবং কংকর নিক্ষেপ করতাম। -ইবনে মাজাহ।

মিনায় রাত যাপন : তিন ইমামের মতে (আবু হানিফা ব্যতীত) ১০, ১১, ১২ জিলহজ্জ এই তিন রাত অথবা ১১ ও ১২ জিলহজ্জ এই দুই দিবাগত রাত মিনায় যাপন করা ওয়াজিব। হানাফীদের নিকট রাত যাপন সুন্নত।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : তোমার কংকর মারা যখন সম্পন্ন হয়, তখন যেখানে ইচ্ছা রাত যাপন করো। -ইবনে আবি শায়বা। মুজাহিদ বলেন : রাতের প্রথম ভাগ মক্কায় ও শেষ ভাগ মিনায় অথবা প্রথম ভাগ মিনায় ও শেষ ভাগ মক্কায় কাটানো যেতে পারে। ইবনে হাযম বলেন : যে ব্যক্তি মিনার রাতগুলো মিনায় যাপন করেনা, সে অন্যায় করে। তবে এজন্য কোনো কাফফারা নেই। এটা সর্বসম্মত মত যে, যাদের ওযর আছে, যেমন পানি সরবরাহকারী ও উটের রক্ষক, তাদের রাত যাপনের বাধ্যবাধকতা নেই। তাই তারা রাত যাপন বর্জন করলে তাদের ওপর কোনো কাফফারাও নেই। বুখারি প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালনার্থে মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের অনুমতি চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন। আসেম বিন আদী থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. রাখালদেরকে মিনায় রাত যাপন বর্জনের অনুমতি দিয়েছেন। -তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে কবে ও কখন : মিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের নির্ধারিত সময় তিন ইমামের মতে ১২ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের পর সূর্যাস্তের পূর্বে। আর হানাফীদের মতে, ১৩ই জিলহজ্জ ফজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় প্রত্যাবর্তন করা যাবে। তবে

সূর্যাস্তের পর রওনা হওয়া মাকরূহ। এটা সুন্নতের পরিপন্থী। কিন্তু তাতে কোনো কাফফারা দিতে হবেনা।

২৪. কুরবানির পশু বা হাদি

হাদি : আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানির জন্য হারাম শরিফে হাদিয়াস্বরূপ যে পশু পৌঁছানো হয়, তাকে শরিয়তের পরিভাষায় আল-হাদ্‌য়ু, বা হাদি বলা হয়। আল্লাহ বলেন :

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، وَلَا دِمَاؤُهَا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ.

"উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি। এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উমরণ করো। তারপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা থেকে কিছু নিজেরা খাও এবং কিছু খাওয়াও দরিদ্রজনকে এবং যে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি চায় তাকেও খাওয়াও। আমি এভাবেই এই পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যেন তোমরা শোকর করো। আল্লাহর কাছে এগুলোর গোশতও পৌঁছেনা, রক্তও পৌঁছেনা। তাঁর কাছে পৌঁছে শুধু তোমার তাকওয়া।"

উমর রা. বলেছেন : তোমরা (কুরবানির পশু) হাদিয়া পাঠাও। কারণ আল্লাহ হাদিয়া পছন্দ করেন, রসূলুল্লাহ সা. একশো উট নফল হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

শ্রেষ্ঠ হাদিয়া : আলেমগণ একমত যে, হজ্জের সময়ে প্রেরিত হাদিয়া পশু ছাড়া অন্য কিছু থেকে দেয়া বৈধ নয়। উট, গরু ও ছাগল ভেড়া– চাই পুরুষ হোক বা মাদী হোক– হাদিয়া পাঠানো যায়। এর মধ্যে সর্বোত্তম হাদিয়া উট, তারপর গরু, তারপর ছাগল বা ভেড়া। কেননা উট আকারে সবচেয়ে বড় হওয়ায় তা দরিদ্রদের জন্য অধিকতর লাভজনক। অনুরূপ গরু, ছাগল, ভেড়ার চেয়ে বেশি লাভজনক। এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি উটের সাত ভাগের এক ভাগ, গরুর সাত ভাগের এক ভাগ ও একটা ছাগল এর কোন্‌টি উত্তম, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে দরিদ্রদের জন্য যেটা বেশি লাভজনক, সেটাই যে উত্তম– এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

ন্যূনতম হাদিয়া : হারাম শরিফের উদ্দেশ্যে উক্ত তিন প্রকারের মধ্য থেকে যে কোনো পশু হাদিয়া পাঠানো যায়। রসূলুল্লাহ সা. একশোটা উট নফল হাদিয়া হিসেবে কুরবানি করতে পাঠিয়েছিলেন। ন্যূনতম পক্ষে একজনের পক্ষ থেকে যে হাদিয়া পাঠানো যায় তা হচ্ছে একটা ছাগল, একটা উটের সাত ভাগের একভাগ কিংবা একটা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ। কেননা গরু বা উট সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানি দেয়া যায়।

জাবের রা. বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে হজ্জ করেছিলাম। তখন আমরা সাতজনের পক্ষ থেকে উট এবং সাতজনের পক্ষ থেকে গরু কুরবানি করেছিলাম। –আহমদ, মুসলিম। কুরবানির শরিকদের সবাই আল্লাহর নৈকট্যকামী হবে – এটা শর্ত নয়। তাদের কতক আল্লাহর নৈকট্য চায়, কতক শুধু গোশত চায়, এমন হলেও কুরবানি বৈধ হবে। কিন্তু হানাফীরা এ মতের বিরোধী। তাদের নিকট সকল শরিকের আল্লাহর নৈকট্যকামী হওয়া শর্ত।

উট হাদিয়া দেয়া কখন ওয়াজিব : একমাত্র বীর্যপাতজনিত অপবিত্রতাসহ বা হায়েয ও নেফাসসহ তওয়াফে যিয়ারত করলে, আরাফাতে অবস্থানের পর ও চুল কামানোর আগে স্ত্রী

সহবাস করলে অথবা উট কুরবানির মানত করলেই উট হাদিয়া পাঠানো ওয়াজিব হয়। আর উট না পাওয়া গেলে সাতটা ছাগল কিনতে হবে।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এলো এবং বললো : আমার একটা উট কুরবানির দায় রয়েছে। উট কেনার ক্ষমতাও আমার রয়েছে। কিন্তু কেনার জন্য উট পাচ্ছিনা। তখন রসূলুল্লাহ সা. তাকে আদেশ দিলেন যেনো সাতটা ছাগল কিনে কুরবানি দেয়। – আহমদ, ইবনে মাজাহ।

হাদিয়ার প্রকারভেদ : হাদিয়া দুই প্রকারে : মুস্তাহাব ও ওয়াজিব। মুস্তাহাব হাদিয়া হচ্ছে মুফরিদ হাজী ও মুফরিদ ওমরাহকারীর হাদিয়া। আর ওয়াজিব হাদিয়া হচ্ছে পাঁচ প্রকার :

১ ও ২. কিরান হজ্জ ও তামাত্তু হজ্জকারী ওপর কুরবানির হাদিয়া ওয়াজিব।

৩. হজ্জের কোনো ওয়াজিব তরককারীর ওপর কুরবানি ওয়াজিব হয়। যেমন কংকর নিক্ষেপ, মিকাত থেকে ইহরাম, আরাফায় অবস্থানকালে রাত ও দিন একত্রিতকরণ, মুযদালিফায় রাত যাপন, মিনায় রাত যাপন, বিদায়ী তওয়াফ ইত্যাদি তরক করলে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়।

৪. ইহরাম করার পর সহবাস ব্যতীত যে সকল কাজ হারাম হয়। যেমন, সুগন্ধি গ্রহণ ও চুল কামানো ইত্যাদির কোনো একটি করলে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়।

৫. হারাম শরিফের সীমার মধ্যে শিকার করলে বা গাছ কাটলে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়। এর প্রত্যেকটি যথাস্থানে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিয়ার শর্তাবলি : হাদিয়া পাঠানোর জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পালন করা জরুরি :

১. হাদিয়াস্বরূপ প্রদত্ত পশু যদি ভেড়া ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তাহলে তা 'ছানী' হতে হবে। ভেড়া হলে তা 'জাযা' অর্থাৎ ছয় মাস বয়সের হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চা হলেই চলবে। উটের মধ্য থেকে পাঁচ বছর, গরুর মধ্য থেকে দু'বছর এবং মাদী ছাগল থেকে পুরো এক বছর বয়স্ক পশুকে 'ছানী, বলা হয়। এসব পশু থেকে পাঠালে ছানী পাঠালে চলবে।

২. শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে হবে। কানা, খোঁড়া, দাদ বা চর্মরোগধারী ও জীর্ণশীর্ণ পশু হলে চলবেনা।

হাসান বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যখন সুস্থ পশু কেনে, কিন্তু কুরবানির দিনের আগে তা অন্ধ, খোঁড়া বা জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়, তাহরে সেটাই যবাই করা উচিত। তাতেই কুরবানি শুদ্ধ হবে। –সাঈদ বিন মানসুর।

হাদিয়া নির্বাচনের মুস্তাহাব পদ্ধতি : মালেক হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা তার সন্তানদেরকে বলতেন : হে আমার ছেলেরা তোমরা এমন উট আল্লাহর জন্য হাদিয়া পাঠিওনা, যা তোমাদের কোনো প্রিয় বন্ধুকে দিতে লজ্জা পাও। মনে রেখো, আল্লাহ সকল প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তির চেয়ে প্রিয় ও সম্মানিত। সাঈদ বর্ণনা করেন, ইবনে উমর একটা উটনীর পিঠে আরোহণ করে সমগ্র মক্কা শহরে ঘুরলেন। তার পর তার প্রশংসা করলেন। উটনীটা তার ভালো লাগলো। তিনি তা থেকে নেমে তাকে চিহ্নিত করলেন ও হাদিয়া পাঠালেন।

হাদিয়া বা কুরবানির পশুকে চিহ্নিত করা : দুই পদ্ধতিতে কুরবানির পশুকে চিহ্নিত করা হয় : ইশয়ার : উট বা গরুর কুঁজ থাকলে কুঁজের যে কোনো এক পাশ চিরে রক্ত বের করে দিয়ে একটা চিহ্ন তৈরি করা, যাতে ঐ জন্তুটি হাদিয়া বা কুরবানির পশু বলে চিহ্নিত হয় এবং কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

তাকলীদ : কুরবানির পশুর গলায় এক টুকরো চামড়া বা অন্য কোনো প্রতিক ঝুলিয়ে দেয়া, যাতে ওটা হাদিয়া বা কুরবানির পশু বলে পরিচিত হয়। রসূলুল্লাহ সা. একবার এক পাল মেশ

হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই মেষ পাল হিজরি ৯ সালের হজ্জে আবু বকরের সাথে পাঠিয়েছিলেন। তিনি কুরবানির পশুর গলায় প্রতিক ঝুলিয়ে দিয়ে ও কুঁজ চিরে চিহ্নিত করে হুদাইবিয়ার দিন ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত সকল আলেম এটিকে সুন্নত মনে করেন।

পশুকে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা : এর যৌক্তিকতা হলো আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান প্রদর্শন করা, প্রকাশ করা, প্রচার করা যে, এগুলো কুরবানির পশু, যা আল্লাহর ঘরে পাঠানো হচ্ছে, তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানি করা ও তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য।

হাদিয়ার পশুর পিঠে আরোহণ : কুরবানির উটে আরোহণ ও অন্যান্যভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ। কেননা আল্লাহ বলেছেন : لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"তোমাদের জন্য এসব পশুতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রচুর উপকারিতা রয়েছে, তারপর এগুলো প্রাচীন কাবাগৃহে পৌঁছবে।"

দাহহাক ও আতা বলেন : এই উপকারিতা হলো প্রয়োজনমত এগুলোর ওপর আরোহণ এবং এগুলোর দুধ, ও পশম ব্যবহার করা। নির্দিষ্ট সময় হলো : প্রতিক পরানোর পর 'হাদিয়ার পশু' হওয়া পর্যন্ত। আর প্রতীক কা'বাগৃহে পৌঁছা অর্থ মিনায় কুরবানির দিন পৌঁছা ও যবাই হওয়া।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন একটা উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে বললেন : ওর ওপর আরোহণ করো। সে বললো : এটা একটা কুরবানির উটনী। তিনি বললেন : আরে, তাতে কি হয়েছে, আরোহণ করো। এভাবে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার বললেন । – বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী।

এটি আহমদ, ইসহাক ও মালেকের মযহাব। শাফেয়ী বলেছেন : খুব তীব্র প্রয়োজন হলে এর ওপর আরোহণ করা যায়।

কুরবানির সময় : কুরবানির সময় নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে এর সময় হলো ১০ই জিলহজ্জ ও তার পরবর্তী আইয়ামুত্ তাশরিক ১১,১২ ও ১৩ই জিলহজ্জ। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আইয়ামে তাশরিকের সকল দিন কুরবানির দিন। –আহমদ

যদি সময় পার হয়ে যায়, তবে কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট পশুকে কাযা হিসেবে যবাই করবে। মালেক ও আহমদের নিকট কুরবানির পশু যবাইর সময় কুরবানির দিনসমূহ, চাই ওয়াজিব কুরবানি হোক বা নফল। তামাত্তু ও কিরানের হাদিয়ার ব্যাপারে হানাফীদের অভিমত এটাই। পক্ষান্তরে মানত, কাফফারা ও নফল কুরবানির জন্য যে কোনো সময় যবাই করা যায়। ইবরাহিম নখয়ী প্রমুখের মতে এর সময় ১০ জিলহজ্জ থেকে জিলহজ্জ মাসের শেষ পর্যন্ত।

কুরবানির স্থান : হাদিয়ার পশু, চাই ওয়াজিব হোক বা নফল হোক, হারাম শরিফের বাইরে কোথাও যবাই করা যাবেনা। হারাম শরিফের যে কোনো স্থানে যবাই করা যাবে।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সমগ্র মিনা কুরবানির স্থান এবং সমগ্র মুযদালিফা অবস্থানের স্থান। মক্কার সকল ওলি গলি ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ চলাচলের পথ ও কুরবানির স্থান। – আবু দাউদ ইবনে মাজাহ।

তবে হাজি সাহেবদের জন্য সর্বোত্তম স্থান মিনা এবং ওমরাকারীদের সর্বোত্তম স্থান মারওয়া। কেননা এটা উভয়ের ইহরাম মুক্ত হওয়ার স্থান।

মালেক থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এই মিনা যবাই করার স্থান, সমগ্র মিনা যবাইর স্থান, আর ওমরায় এই মারওয়া এবং মক্কার সকল গিরিপথ ও ওলি গলি যবাইর স্থান।

উটকে বুকে ও অন্যান্য পশুকে কণ্ঠনালীতে যবাই করা মুস্তাহাব : উটকে দাঁড়ানো ও বাম হাত বাঁধা অবস্থায় (পশুর হাত অর্থ সামনের পা) যবাই করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে নিম্নের হাদিসগুলো লক্ষণীয় :

যিয়াদ বিন জুবাইর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন : ইবনে উমর এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে দেখলেন, সে তার উটনীকে বসিয়ে যবাই করছে। তিনি বললেন : ওকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে বেঁধে নাও। এটা তোমাদের নবীর সুন্নত।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. ও তার সাহাবিগণ উটকে বাম পা বেঁধে ও অবশিষ্ট পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে যবাই করতেন। – আবু দাউদ।

ইবনে আব্বাস রা. "তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো অবস্থা তাদের ওপর আল্লাহর নাম উমরণ করো" এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ. অর্থাৎ তিন পায়ের ওপর দাঁড় করানো অবস্থায়......" –হাকেম।

পক্ষান্তরে গরু ও ছাগল শুইয়ে যবাই করা মুস্তাহাব। যে জন্তুকে কণ্ঠনালী কেটে যবাই করতে হবে তাকে যদি বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয় আর যে পশুকে বুকে ছুরিকাঘাত করে যবাই করতে হবে, তাকে যদি কণ্ঠনালী কেটে যবাই করা হয়, তাহলে কেউ বলেন, মাকরূহ হবে, কেউ বলেন : মাকরূহ হবেনা। দক্ষতার সাথে যবাই করতে পারলে কুরবানি দাতার নিজের যবাই করা মুস্তাহাব। নচেত সে উপস্থিত থেকে যবাই প্রত্যক্ষ করবে।

কসাইকে কুরবানির পশুর গোশত দ্বারা পারিশ্রমিক দেয়া যাবেনা : যবাইকারীকে কুরবানির পশু থেকে পারিশ্রমিক দেয়া যাবেনা। তবে তাকে তা থেকে কিছু সদকা হিসেবে দেয়া যাবে। কেননা আলী রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমি কুরবানির উট যবাইর সময় তার সামনে দাঁড়াই, তার চামড়া ও তার গায়ের চট বিতরণ করে দেই এবং কসাইকে পশু থেকে কিছু না দেই। আলী রা. বললেন : তাকে আমরা নিজেদের থেকেই দিয়ে থাকি। – সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ।

হাদিস থেকে এটাও প্রমাণিত যে : কুরবানির পশুর যবাই, গোশত বিলি বণ্টন এবং তার চামড়া ও তার গায়ের চট বিতরণের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ। কিন্তু পারিশ্রমিক হিসেবে কসাইকে পশু থেকে কিছু দেয়া বৈধ নয়। নিজের পকেট থেকে তাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। (কুরবানির পশুর চামড়া ও তার যে কোনো অংশ বিক্রি করা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ।) আর হাসান বর্ণনা করেছেন যে, কসাইকে চামড়া দেয়াতে ক্ষতি নেই।

কুরবানির পশুর গোশত থেকে খাওয়া : কুরবানির পশুর গোশত থেকে খাওয়ার জন্য আল্লাহ স্বয়ং আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. "তা থেকে তোমরা খাও এবং দুস্থ দরিদ্রকে খাওয়াও।" এ আদেশ স্পষ্টতই ওয়াজিব ও নফল উভয় প্রকারে কুরবানিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের ফকীহগণ এ বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেন। আবু হানিফা ও আহমদের মতে, তামাত্তু ও কিরান হজ্জের কুরবানির গোশত ও নফল কুরবানির গোশত খাওয়া জায়েয। এ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের কুরবানির গোশত খাওয়া কুরবানি দাতার জন্য বৈধ নয়। মালেকের মতে, কুরবানি দাতার হজ্জ যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে বা সময় চলে যাওয়ায় হজ্জ হাতছাড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে ইতিপূর্বে পাঠানো পশুর গোশত সে খেতে পারবে। তামাত্তু হজ্জের কুরবানির গোশতও খেতে পারবে। কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যাজনিত অক্ষমতার ফিদিয়াস্বরূপ এবং শিকার করার শাস্তিস্বরূপ প্রদত্ত কুরবানির গোশত ব্যতিত এবং মিসকীনদের জন্য মানতকৃত কুরবানি ব্যতিত ও হারাম শরিফে পৌঁছার আগে

হজ্জ [illegible] মারা যাওয়া পশুর বাবদ [illegible] কুরবানির গোশত ব্যতীত আর সকল কুরবানির গোশত খাওয়া যাবে। [illegible] মতে শিকার করার শাস্তি, হজ্জ নষ্ট করার ফিদিয়া, তামাত্তু ও কিরানের কুরবানি এবং নিজের ওপর আরোপিত মানতের কুরবানির গোশত খাওয়া জায়েয নেই। অনুরূপ যে কোনো ওয়াজিব কুরবানির গোশত খাওয়া জায়েয নেই। তবে নফল কুরবানির গোশত খেতেও পারবে, খাওয়াতেও পারবে, সদকা ও হাদিয়াস্বরূপ বণ্টন করতেও পারবে।

কুরবানির গোশতের কী পরিমাণ খাওয়া বৈধ : হাদিয়াস্বরূপ কুরবানির পশু প্রেরক হাজির নিজের প্রেরিত পশুর গোশত যে পরিমাণ ইচ্ছা খাওয়া বৈধ, সে উক্ত পশুর গোশত যতো ইচ্ছা খেতে পারবে। অনুরূপ যতো ইচ্ছা হাদিয়া ও সদকারূপেও বণ্টন করতে পারবে। কারো কারো মতে, অর্ধেক নিজে খাবে ও অর্ধেক সদকা করবে। কারো কারো মতে এক তৃতীয়াংশ নিজে খাবে, এক তৃতীয়াংশ হাদিয়া দেবে ও এক তৃতীয়াংশ সদকা করবে।

২৫. মাথার চুল কামানো বা ছাঁটা

চুল কাটা ও ছাটার বিধান কুরআন, হাদিস ও ইজমা তথা উম্মতের সর্বসম্মত রায় দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ .

"আল্লাহ তাঁর রসূলের স্বপ্নকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। তোমরা অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। তখন তোমাদের কেউ মাথা মুড়াবে, কেউ চুল কাটবে। তখন তোমাদের কোনো ভয় থাকবেনা।"

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহ মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর রহমত করেন। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ আর যারা চুল কেটেছে, তাদের উপরও? রসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহ মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর রহমত করুন। লোকেরা বললো : হে রসূলুল্লাহ সা., আর যারা চুল কাটে তাদের উপরও? তিনি বললেন : আল্লাহ মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর রহমত করুন। লোকেরা পুনরায় বললো : হে রসূলুল্লাহ সা. যারা চুল কেটেছে তাদের উপরও? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যারা চুল কেটেছে তাদের উপরও আল্লাহ রহম করুন।* বুখারি ও মুসলিমে আরো বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. মাথা মুড়িয়ে ফেললেন, আর সাহাবিদের একাংশ মাথা মুড়ালো এবং আরেক অংশে চুল কাটালো।"

মাথা মুড়ানো দ্বারা ক্ষুরের সাহায্যে চুল কামানো অথবা উপরে ফেলা বুঝায়। এমনকি মাথার তিনটে চুল কামালেও বৈধ হবে। আর চুল কাটা দ্বারা মাথার চুল থেকে আংগুল পরিমাণ ছেটে ফেলা বুঝায়। অধিকাংশ আলেম এ সম্পর্কে শরিয়তের বিধি নিয়ে মতভেদে লিপ্ত। তাদের অধিকাংশের মতে, এটা ওয়াজিব এবং এটা তরক করলে এর ক্ষতি পূরণে দম বা কুরবানি দিতে হবে। শাফেয়ীদের মতে এটা হজ্জের অন্যতম রুকন (অর্থাৎ ফরয)।

মাথা মুড়ানোর সময় : হাজিদের জন্য এর নির্দিষ্ট সময় হলো ১০ই জিলহজ্জ আকাবার

---

* মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করার কারণ হলো, মুড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এর মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে জোর দেয়া। কেননা এটা ইবাদত ও দাসত্বের পূর্ণাঙ্গ নমুনা পেশ করে এবং আল্লাহর কাছে বিনয়ের ব্যাপারে অধিকতর বিনয় ও আন্তরিকতার প্রমাণ দেয়। পক্ষান্তরে যে চুল ছোট করে কাটে, সে নিজের জন্য কিছুটা সৌন্দর্য অবশিষ্ট রাখে। তথাপি সবার শেষে তাদের জন্য তার দোয়ার কিছু অংশ বরাদ্দ করেছেন, যাতে তার উম্মতের কোনো হাজি বা ওমরাকারী তার নেক দোয়া থেকে বঞ্চিত থেকে না যায়।

জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর। কুরবানির পশু সংগে থাকলে (বা পূর্বা[illegible] যবাই-এর পর চুল কামাবে।

মুয়াত্তার বর্ণিত হাদিসে এসেছে : রসূলুল্লাহ সা. যখন মিনায় তার পশু কুরবানি করলেন। তখন বললেন : আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে চুল কামানোর জন্য। – আহমদ, তাবরানি

ওমরার ক্ষেত্রে এর নির্ধারিত সময় হলো সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর এবং যার সাথে কুরাবনির পশু আছে তার জন্য তা যবাই করার পর। এটি হারাম শরিফের অভ্যন্তরে হওয়া ওয়াজিব। আর আবু হানিফা, মালেক ও আহমদের মতে কুরবানির দিনগুলোতে হওয়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে শাফেয়ী, মুহাম্মদ এবং আহমদের প্রসিদ্ধ মতানুসারে চুল কামানো ও কাটা হারাম শরিফে ও কুরবানির দিন ছাড়া হওয়া ওয়াজিব। চুল কামানো কুরবানির দিনগুলো পর পর্যন্ত বিলম্বিত করলেও চলবে, কোনো কাফফারা দেয়া লাগবেনা।

চুল কামানোতে যা যা করা মুস্তাহাব : চুল কামানোর বেলায় ডান দিক থেকে শুরু করা, তার পর বা দিকে করা, কেবলামুখি হওয়া এবং চুল কামানো শেষ হওয়ার পর তকবীর বলা ও নামায পড়া মুস্তাহাব। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন : আমি হজ্জের পাঁচটি জায়গায় ভুল করেছিলাম। ভুল ধরিয়ে দিয়েছিল একজন নাপিত। আমি যখন মাথা কামানোর ইচ্ছা করলাম, তখন জনৈক নাপিতের কাছে গেলাম। তাকে বলালম : তুমি মাথা কামাতে কত নেবে? সে বললো : আপনি ইরাকী নাকি? আমি বলালম : হ্যাঁ। সে বললো : ইবাদতের কাজে দর কষাকষি করা যায়না। বসুন, আমি বসলাম, তবে কেবলামুখি হয়ে নয়। নাপিত বললো : আপনার মুখ কেবলার দিকে ঘোরান। তারপর আমি স্থির করেছিলাম, আমার মাথা বাম দিক থেকে কামানো শুরু করবো। নাপিত বললো : আপনার মাথার ডান দিকটা ঘুরিয়ে দিন। আমি ঘুরিয়ে দিলাম, সে চুল কামাতে লাগলো। আমি চুপ চাপ বসে রইলাম। এরপর সে বললো : তকবীর বলুন। আমি তকবীর বলতে বলতে উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। সে বললো : কোথায় যেতে চান? আমি বলালম : আমার কাফেলায়। সে বললো : আগে দু'রাকাত নামায পড়ুন, তারপর যান। আমি বললাম : আমি ওখানে যা কিছু দেখলাম, তা একজন নাপিতের বুদ্ধি দ্বারা সংঘটিত হওয়ার কথা নয়। তুমি আমাকে যে ক'টা আদেশ দিলে তা কোথা থেকে পেয়েছ? সে বললো : আতা ইবনে আবি রিবাহ এ রকমই করেন। – তাবারি।

টাক মাথার উপর ক্ষুর ঘোরানো মুস্তাহাব : অধিকাংশ আলেমের মতে, টাক পড়া ব্যক্তি, যার মাথায় মোটেই চুল নেই, তার মাথায় ক্ষুর ঘোরানো মুস্তাহাব। ইবনুল মুনযির বলেছেন : আলেমদের মধ্য হতে যতো জনের নাম আমার মনে পড়ে, তারা সবাই একমত যে, টাক মাথা ওয়ালা তার মাথার উপর ক্ষুর ঘোরাবে। আবু হানিফা বলেছেন : তার মাথার উপর ক্ষুর খোরানো ওয়াজিব। **নখ কাটা ও গোঁফ ছাটা মুস্তাহাব।**

যে ব্যক্তি চুল কামায় বা ছাঁটায়, তার জন্য গোঁফ ছাটা ও নখ কাটা মুস্তাহাব। ইবনে উমর রা. যখন কোনো হজ্জে বা ওমরায় চুল মুড়াতেন, তখন তিনি তার দাড়ি গোঁফও ছাটাতেন। ইবনুল মুনযির বলেছেন : এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ সা. যখন মাথা মুড়াতেন, তখন তার নখও কেটে ফেলতেন।

মহিলাদের প্রতি চুল ছাঁটার আদেশ এবং কামানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা : আবু দাউদ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মহিলাদের চুল কামাতে হবেনা, চুল ছাঁটতে হবে। ইবনুল মুনযির বলেন : এ বিষয়টিতে আলেমদের মধ্য মতৈক্য রয়েছে। কেননা মহিলাদের বেলায় মাথা কামানো চেহারার বিকৃতি ঘটানোর পর্যায়ভুক্ত।

মহিলারা মাথার চুল কতোটুকু ছোট করবে : ইবনে উমর রা. বলেছেন : কোনো মহিলা যখন চুল ছোট করার ইচ্ছা করবে, তখন তার চুলকে তার মাথার সামনের দিকে জমা করবে, তারপর তা থেকে আংগুল পরিমাণ ছেটে ফেলবে। আতা বলেন : কোনো মহিলা যখন তার চুল ছোট করবে, তখন সে তার চুলের প্রান্তভাগ থেকে ছেটে ফেলবে। – সাঈদ বিন মানসুর।

কেউ বলেন : মহিলারা কতটুকু ছাটবে তার কোনো ধরাবাধা পরিমাণ নেই। শাফেয়ী বলেন : ন্যূনপক্ষে তিনটে চুল ছাটা যথেষ্ট।

২৬. তওয়াফে এফাযা বা তওয়াফে যিয়ারত

এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর এজমা হয়েছে যে, তওয়াফুল এফাযা হজ্জের একটা রুকন তথা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো হাজি এটা করতে ব্যর্থ হলে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ বলেন : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ "তারা যেন প্রাচীন ঘরটির তওয়াফ করে।" ইমাম আহমদের মতে এজন্য নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা জরুরি। আর তিন ইমামের মতে, হজ্জের নিয়তই এর ওপর বলবত হবে, হাজির পক্ষ থেকে এটা বিশুদ্ধ ও যথেষ্ট হবে – যদিও সে সুনির্দিষ্টভাবে এই তওয়াফের নিয়ত না করে। অধিকাংশ আলেমের মতে, এর সাতটি চক্কর সব কটাই ফরয ও রুকন। আবু হানিফার মতে, সাতটি থেকে চারটি চক্কর হজ্জের রুকন। এ চারটা বাদ দিলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। অবশিষ্ট তিন চক্কর রুকন নয়, কিন্তু ওয়াজিব। কেউ এই তিনটে বা তার কোনো একটা তরক করলে সে ওয়াজিব তরককারী হবে। তার হজ্জ বাতিল হবেনা। তবে তাকে দম দিতে হবে।

তওয়াফে এফাযার সময় : শাফেয়ী ও আহমদের মতানুসারে এর সময় শুরু হয় ১০ই জিলহজ্জ দিবাগত মধ্য রাত থেকে এবং এর শেষ সময় নির্ধারিত নেই। তবে এই তওয়াফ না করা পর্যন্ত সহবাস হালাল হবেনা। আইয়ামে তাশরিক থেকে একে বিলম্বিত করলে কোনো দম বা কুরবানি ওয়াজিব হবেনা। তবে মাকরূহ হবে। দশই জিলহজ্জের দুপুরে পূর্বাহ্নে এর জন্য সর্বোত্তম সময়। আবু হানিফা ও মালেকের মতে ১০ই জিলহজ্জের ফজর থেকেই এর সময় শুরু হয়। কিন্তু এর শেষ সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আবু হানিফার মতে, কুরবানির দিনগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো দিন এটা সম্পন্ন করা ওয়াজিব। এ দিনগুলোর পরে করলে দম দেয়া লাগবে। মালেক বলেন : আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন পর্যন্ত একে বিলম্বিত করাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে ত্বরান্বিত করা উত্তম। এর সময় জিলহজ্জ মাসের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপরও যদি আরো বিলম্বিত করা হয়, তবে দম দিতে হবে কিন্তু হজ্জ বিশুদ্ধ হবে। কেননা সমগ্র জিলহজ্জ মাস তার মতে হজ্জের মাস।

মহিলাদের জন্য তওয়াফুল এফাযা ত্বরান্বিত করা : মহিলারা যদি ঋতুস্রাবের আশংকাবোধ করে, তবে ১০ই জিলহজ্জে এটা সমাধা করা মুস্তাহাব। আয়েশা রা. মহিলাদের ১০ই জিলহজ্জেই তওয়াফুল এফাযা সম্পন্ন করার আদেশ দিতেন, যাতে হঠাৎ ঋতুস্রাব এসে জটিলতার সৃষ্টি না করে। আর আতা বলেছেন : মহিলারা যদি ঋতুস্রাবের আশংকা করে, তাহলে জামারায় কংকর নিক্ষেপেরও পূর্বে এবং কুরবানি দেয়ারও পূর্বে বাইতুল্লাহর তওয়াফে এফাযা করে ফেলা উচিত। এমন ওষুধ ব্যবহারে কোনো দোষ নেই, যাতে ঋতু বিলম্বিত হয় এবং তওয়াফ সমাধা করা যায়।

সাঈদ বিন মানসুর ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কোনো মহিলা যদি তার মাসিক ঋতুস্রাব বিলম্বিত করার জন্য ওষুধ খরিদ করে, যাতে সময়মত দেশে ফিরতে পারে, তাহলে তাতে কোনো বাধা আছে কিনা, ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন : এতে

কোনো বাধা নেই। তিনি এজন্য মহিলাদেরকে আরাক গাছের রস খেতে বলেন। তাবারি বলেন : এরূপ ক্ষেত্রে যদি ঋতুস্রাবকে বিলম্বিত করার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ঋতুস্রাবের মেয়াদ শেষ করার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা বিলম্বিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। অনুরূপ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবকে এগিয়ে আনারও ব্যবস্থা করা জরুরি।

মুহাসসাবে যাত্রা বিরতি

জাবালুন নূর ও হুজুনের মধ্যবর্তী উপত্যকার নাম মুহাসসাব। রসূলুল্লাহ সা. মিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে মুহাসসাব উপত্যকায় যাত্রা বিরতি করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানে তিনি যোহর আছর মাগরিব ও এশা পড়েন এবং কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন। ইবনে উমরও এরূপ করতেন। এখানে যাত্রা বিরতি করা মুস্তাহাব কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। আয়েশা রা. বলেন : রসূলুল্লাহ সা. মুহাসসাবে যাত্রা বিরতি করেছিলেন শুধু এজন্য যেন তার যাত্রা সহজতর হয়, এটা কোনো সুন্নত নয়। যে কেউ ইচ্ছা করলে এখানে যাত্রা বিরতি করতে পারে, আবার নাও করতে পারে।

খাত্তাবি বলেন : এটা এক সময় করা হতো। পরে পরিত্যক্ত হয়েছে। তিরমিযি বলেন : কেউ কেউ এখানে যাত্রা বিরতি করা মুস্তাহাব মনে করেন, ওয়াজিব নয়। এখানে যাত্রা বিরতির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শোকর আদায় করা। কেননা তিনি এখানে তার নবীকে তার সেসব শত্রুর উপর বিজয় দান করেছিলেন, যারা বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবকে এই মর্মে কসম খেয়ে এক ঘরে করেছিল যে, তারা যতোক্ষণ রসূলল্লাহ সা.-কে তাদের হাতে সমর্পণ না করবে ততোক্ষণ আরবের অন্যান্য গোত্র তাদের ক্রয়বিক্রয় ও বিয়ে শাদী করবেনা। ইবনুল কাইয়েম বলেন : মুহাসসাব উপত্যকায় যাত্রা বিরতির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সা. যে স্থানে শত্রুরা কুফরীকে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের শত্রুতাকে বিজয়ী করেছিল, সেই একই স্থানে ইসলামের নিদর্শনাবলিকে বিজয়ী ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এটাই রসূলুল্লাহ সা. এর অভ্যাস ছিলো, তাওহীদের নিদর্শনাবলিকে তিনি কুফর ও শিরকের নিদর্শনাবলির লীলাভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন। যেমন তিনি লাত ও উমর পূজার জায়গায় তায়েফের মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

২৭. ওমরা

ওমরার শাব্দিক অর্থ যিয়ারত অর্থাৎ ভ্রমণ। এখানে পবিত্র কা'বার ভ্রমণ তার চারপাশে তওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ এবং চুল কাটাসহ গোটা কর্মসূচিকে বুঝানো হয়েছে। আলেমরা একমত যে, এটা শরিয়ত প্রবর্তিত একটি ইবাদত।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রমযানের একটা ওমরা একটা হজ্জের সমান। (অর্থাৎ রমযানে একটি ওমরা করার সওয়াব একটা নফল হজ্জের সওয়াবের সমান। তবে এ দ্বারা ফরয হজ্জের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবেনা।) –আহমদ, ইবনে মাজাহ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : এক ওমরা থেকে আর এক ওমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। একটা হজ্জ মাবরূরের (গুনাহমুক্ত হজ্জ) প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। –আহমদ, বুখারি, মুসলিম। রসূলুল্লাহ সা.-এর এক হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে : "তোমরা হজ্জ ও ওমরা একটির পর একটি অব্যাহতভাবে করো।"

বারংবার ওমরা করা : নাফে' বলেছেন : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে যুবাইরের আমলে বহু বছর যাবত বছরে দুটো করে ওমরা করতেন।

কাসেম বলেছেন : আয়েশা রা. এক বছরে তিনটে ওমরা করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, এতে কেউ কি তাঁর প্রতি দোষারোপ করেছেন? কাসেম বললেন : সুবহানাল্লাহ! তিনি না উম্মুল মুমিনীন? এজন্য অধিকাংশ আলেমের মতে বারংবার ওমরা করায় দোষের কিছু নেই। কিন্তু ইমাম মালেক বছরে একবারের বেশি ওমরা করা মাকরূহ মনে করেন।

হজ্জের পূর্বে ও হজ্জের মাসগুলোতে ওমরা করা জায়েয : হজ্জের মাসগুলোতে হজ্জ ছাড়া শুধু ওমরা করা জায়েয। উমর রা. শওয়াল মাসে ওমরা করে মদিনায় ফিরে এসেছিলেন হজ্জ না করেই। অনুরূপ, হজ্জের পূর্বে ওমরা করাও জায়েয, যেমন উমর রা. করতেন। তাউস বলেন : জাহেলী যুগের মানুষ হজ্জের মাসে ওমরাকে সবচেয়ে বড় গুনাহর কাজ মনে করতো এবং বলতো : সফর মাস যখন অতিক্রান্ত হবে, উটের পায়ের ঘা যখন শুকিয়ে যাবে, রাস্তা থেকে হজ্জের চিহ্ন যখন মুছে যাবে এবং হাজিরা ফিরে আসবে, তখন যার ওমরা করার ইচ্ছা, তার জন্য ওমরা বৈধ হবে। ইসলামের আগমনের পর জনগণকে হজ্জের মাসগুলোতে ওমরা করার আদেশ দেয়া হলো। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মাসে ওমরা চালু হয়ে গেলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের ওমরার সংখ্যা : ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বারটা ওমরা করেছেন, প্রথমটি হুদাইবিয়ার ওমরা, দ্বিতীয়টি ওমরাতুল কাযা, তৃতীয়টি জিরানা থেকে এবং চতুর্থটি তাঁর হজ্জের সাথে।-আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

ওমরা সম্পর্কে শরিয়তের বিধি : হানাফি ও মালেকি মযহাবে ওমরা সুন্নত। কেননা জাবের রা. বলেছেন : রসূলুল্লাহ সা. কে ওমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কি ওয়াজিব। তিনি বললেন : না।

শাফেয়ী ও আহমদের মতে, ওমরা ফরয। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ করো।" যেহেতু হজ্জে ও ওমরার জন্য এক সাথেই আদেশ দেয়া হয়েছে, তাই এটা ফরয। তবে প্রথমোক্ত মতটি অগ্রগণ্য (অর্থাৎ সুন্নত)। তিরমিযি শাফেয়ীর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, ওমরা সম্পর্কে এমন কোনো বিশুদ্ধ হাদিস নেই যা থেকে এটি নফল প্রমাণিত হয়।

ওমরার সময় : অধিকাংশ আলেমের মতে, সারা বছরই ওমরার সময়। তাই বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা জায়েয। তবে আবু হানিফার মতে, আরাফার দিন, ১০ই জিলহজ্জ এবং আইয়ামে তাশরিকের তিন দিন ওমরা মাকরূহ। আবু ইউসুফের মতে, আরাফার দিন ও পরবর্তী তিন দিন ওমরা মাকরূহ। হজ্জের মাসে যে ওমরা বৈধ, সে ব্যাপারে সবাই একমত।

বুখারি ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে হজ্জের পূর্বে ওমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : হজ্জের পূর্বে ওমরা করায় কোনো বাধা নেই। রসূলুল্লাহ সা. হজ্জের পূর্বে ওমরা করতেন।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত : আয়েশা রা. ঋতুবতী অবস্থায় বাইতুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত হজ্জ ও ওমরার যাবতীয় কাজ করেছেন। পবিত্র হওয়ার পর তিনি তওয়াফ করলেন এবং বললেন : হে রসূলুল্লাহ সা. আপনারা হজ্জ ও ওমরা দুটোই করে আসবেন। আর আমি শুধু হজ্জ করে আসবো নাকি? একথা শুনে রসূলুল্লাহ সা. আব্দুর রহমানকে (আয়েশার সহোদর) আদেশ দিলেন আয়েশার সাথে তানয়ীম পর্যন্ত যেতে। তার পর তিনি জিলহজ্জ মাসের মধ্যেই হজ্জের পর ওমরা করলেন। ওমরার সর্বোত্তম সময় রমযান মাস। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ওমরার ইহরামের মীকাত : প্রথমে দেখতে হবে, যে ব্যক্তি ওমরা করতে ইচ্ছুক, সে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হজ্জের মীকাতসমূহের বাইরে অবস্থান করছে, না ভেতরে? যদি বাইরে হয়, তাহলে তার পক্ষে ইহরাম ছাড়া এই মীকাত অতিক্রম করা বৈধ নয়। কেননা বুখারি বর্ণনা করেছেন : যায়েদ ইবনে জুবাইর আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের রা. নিকট এলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে ওমরা করা আমার জন্য বৈধ হবে? তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ সা. নাজদবাসীর জন্য 'কারণ', মদিনাবাসীর জন্য 'যুল হুলাইফা' ও সিরিয়াবাসীর জন্য 'জুহফা' নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তার অবস্থান হয় মীকাতের অভ্যন্তরে, তাহলে ওমরার জন্য তার মীকাত হলো হারাম শরিফের সীমানার বাইরে, যদিও ওমরাকারী হারাম শরিফের মধ্যে অবস্থান করে। বুখারিতে এসেছে : আয়েশা রা. তানয়ীমে চলে গেলেন এবং সেখানে ইহরাম করলেন। আর এটা রসূলুল্লাহ সা. এর নির্দেশ ছিলো।

২৮. বিদায়ী তওয়াফ

বিদায়ী তওয়াফকে তাওয়াফুস সদরও বলা হয়। কেননা এটা হাজিদের মক্কা ত্যাগের প্রাক্কালে করতে হয়। এই তওয়াফে কোনো রমল নেই। এটা মক্কায় থেকে মক্কার বাইরে যাওয়ার জন্যে হাজির করণীয় সর্বশেষ কাজ। যখন সে মক্কা থেকে বিদায় নিতে চায়, তখনই এটি করতে হয়। (যারা মক্কায় অবস্থান করে তাদের বেলায় বিদায়ী তওয়াফ প্রযোজ্য নয়।)

মালেক তাঁর গ্রন্থ মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন, উমর রা. বলেছেন : হজ্জের সর্বশেষ কাজ হলো বাইতুল্লাহর তওয়াফ। (আর রওযাতুল নাদিয়াতে বলা হয়েছে : এই তাওয়াফের মূল কথা হলো বাইতুল্লাহর সম্মান। কেননা হজ্জের শুরুও হয় তওয়াফ দিয়ে (তওয়াফুল কুদুম) আর শেষও হয় তওয়াফ দিয়ে। এভাবে হজ্জের সফরের মূল উদ্দেশ্য বাইতুল্লাহর তওয়াফ, এটাই চিত্রিত করা হয়েছে।)

মক্কাবাসী ও ঋতুবর্তী মহিলার ক্ষেত্রে এ তওয়াফ প্রযোজ্য নয়। এ তওয়াফ ত্যাগ করায় তাদেরকে কোনো কাফফারাও দিতে হবেনা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : কোনো মহিলা হাজির ঋতুস্রাব শুরু হলে তাকে বিদায়ী তওয়াফ ছাড়াই) বিদায় হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। –বুখারি, মুসলিম।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : জনগণকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তাদের সর্বশেষ দায়িত্ব আল্লাহর ঘরে পালন করে। তবে ঋতুবতী মহিলার দায়িত্ব কিছুটা হালকা করা হয়েছে।–বুখারি ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. এর স্ত্রী সুফিয়া ঋতুবতী হলেন, (হজ্জের সময়) রসূলুল্লাহ সা. কে একথা জানানো হলে তিনি বললেন : তবে কি সুফিয়া আমাদেরকে আটকে রাখবে? লোকেরা জানালো যে, তিনি চলে গেছেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই।

শরিয়তের বিধান : আলেমগণ একমত যে, বিদায়ী তওয়াফ শরিয়তের অঙ্গীভূত একটা ইবাদত। কেননা মুসলিম ও আবু দাউদ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, লোকেরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো। এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমরা বাইতুল্লাহর সাথে সর্বশেষ দায়িত্ব পালন না করে বিদায় হয়োনা।

কিন্তু বিদায়ী তওয়াফ সম্পর্কে শরিয়তের বিধি কি, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে :

ইমাম মালেক, দাউদ, ও ইবনুল মুনযির বলেছেন : এটা সুন্নত। এটা তরক করলে কোনো কাফফারা দিতে হয়না। ইমাম শাফেয়ীর মতও এটাই।

আর হানাফী, হাম্বলী ও একটি বর্ণনা অনুযায়ী শাফেয়ীর মতে এটা ওয়াজিব এবং এটা তরক করলে দম দিতে হবে।

বিদায়ী তওয়াফের সময় : বিদায়ী তওয়াফের সময় তখনই হয়, যখন হাজিগণ তাদের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেন এবং ফেরত সফরের সিদ্ধান্ত নেন, যাতে বাইতুল্লাহর তওয়াফই তার শেষ কাজ হয়। যেমন ইতিপূর্বের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদায়ী তওয়াফ সম্পন্ন হলে তৎক্ষণাত বিদায়ী সফর শুরু করবে। এর পর আর কোনো কেনা বেচা করবেনা এবং মক্কায় কোনো সময় কাটাবেনা। এসব করলে পুনরায় বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। অবশ্য পথিমধ্যেই কোনো প্রয়োজন মেটালে কিংবা খাদ্য বা অনুরূপ কোনো অত্যাবশ্যকীয় জিনিস কিনলে তওয়াফ দোহারাতে হবেনা। কেননা এতে তার বিদায়ী তওয়াফকে বাইতুল্লাহর শেষ কাজে পরিণত করা ব্যাহত হবেনা।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত দোয়াটি বিদায়ী তওয়াফকারীর পড়া মুস্তাহাব :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِيْ عَلٰى مَا سَخَّرْتَ لِيْ مِنْ خَلْقِكَ، وَسَيَّرْتَنِيْ فِيْ بِلَادِكَ حَتّٰى بَلَّغْتَنِيْ بِنِعْمَتِكَ إِلٰى بَيْتِكَ، وَأَعَنْتَنِيْ عَلٰى أَدَاءِ نُسُكِيْ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيْتَ عَنِّيْ فَازْدَدْ عَنِّيْ رِضًا، وَإِلَّا فَمِنَ الْآنَ فَارْضَ عَنِّيْ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِيْ. فَهٰذَا أَوَانُ انْصِرَافِيْ إِنْ أَذِنْتَ لِيْ غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ، وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ، وَلَا عَنْ بَيْتِكَ. اَللّٰهُمَّ فَاصْحَبْنِي الْعَافِيَةَ فِيْ بَدَنِيْ، وَالصِّحَّةَ فِيْ جِسْمِيْ، وَالْعِصْمَةَ فِيْ دِيْنِيْ، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِيْ، وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِيْ وَاجْمَعْ لِيْ بَيْنَ خَيْرَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"হে আল্লাহ, আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার ছেলে, তোমার বান্দীর ছেলে, তোমার সৃষ্টির মধ্যে থেকে যে সৃষ্টিকে আমার অনুগত করেছো, তার উপর আমাকে আরোহণ করিয়েছ, তুমি আমাকে তোমার পৃথিবীতে সফর করিয়েছ এবং অবশেষে তোমার ঘরে পৌঁছায়েছ, এটা তোমারই অনুগ্রহ। আর আমাকে আমার ইবাদত আদায়ে সহায়তা করেছ, তুমি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে আরো বেশি সন্তুষ্ট হও, নচেত এখন থেকে তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও তোমার ঘর থেকে দূরে চলে যাওয়ার আগে। এখন আমার বিদায় হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে যদি তুমি আমাকে অনুমতি দাও। তোমার ও তোমার ঘরের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নেই, কিছু নেই, তোমার কাছ থেকেও তোমার ঘর থেকে আমি-বিমুখ নই। হে আল্লাহ, আমার দেহে পরিপূর্ণ সুস্থতা দাও, আমার দীনদারীতে পাকাপোক্ত থাকার ক্ষমতা দাও। আমাকে উত্তম পরিণতি দাও, আমাকে তোমার অনুগত রাখো। যতোদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখো, আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বময় কল্যাণ দাও, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।"

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন : বিদায়ী তওয়াফের মাধ্যমে বাইতুল্লাহকে বিদায় জানানোর সময় মুলতাযামে (হাজরে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মাঝখানে) কিছুক্ষণ অবস্থান করা আমি পছন্দ করি।

২৯. হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি

যখন কোনো হজ্জ আদায়েচ্ছু ব্যক্তি মীকাতের কাছাকাছি হবে, তখন তার গোঁফ ছোট করা, চুল ছাটা, নখ কাটা, গোসল করা, ওযু করা, সুগন্ধি লাগানো এবং ইহরামের পোশাক পরা

মুস্তাহাব। মীকাতে পৌঁছার পর দু'রাকাত নামায পড়বে ও ইহরাম বাঁধবে, ইফরাদ হজ্জ করতে চাইলে শুধু হজ্জ, তামাত্তু করতে চাইলে শুধু ওমরা এবং কিরান করতে চাইলে হজ্জ ওমরা উভয়টির নিয়ত করবে। এই ইহরাম ফরয ও হজ্জের রুকন। এটি ছাড়া হজ্জ ও ওমরা আদায় হবেনা। কিন্তু কি ধরনের হজ্জ করবে, ইফরাদ, না কিরান, না তামাত্তু, সেটা স্থির করা ফরয নয়। হজ্জের ধরন উল্লেখ না করে সাধারণভাবে নিয়ত করলে ইহরাম শুদ্ধ হবে। সাধারণভাবে নিয়ত করার পর উক্ত তিন ধরনের হজ্জের যে কোনোটি করতে পারবে।

ইহরাম বাঁধা মাত্রই তার জন্য উচ্চ কণ্ঠে তালবিয়া পড়া শরিয়তের হুকুম। যখনই কোনো উঁচু জায়গায় আরোহণ করবে কিংবা নিচু উপত্যকায় নামবে, কাউকে দেখবে, শেষ রাতে এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তালবিয়া পড়বে। ইহরামকারীর জন্য সহবাস ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী যে কোনো কাজ এবং সহযাত্রিদের সাথে ঝগড়া, তর্ক ও বিবাদ বিসম্বাদ থেকে বিরত থাকা এবং নিজে বিয়ে না করা এবং অন্যকে বিয়ে না দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। ইহরামকারীকে সেলাই করা পোশাক ও পায়ের গিরের ওপরের কোনো অংশ আবৃত করে এমন জুতা পরা পরিহার করতে হবে। ইহরামকারী মাথা ঢাকতে পারবেনা। সুগন্ধি লাগাতে পারবেনা। কোনো চুল বা পশম কামাতে পারবেনা। কোনো নখ কাটতে পারবেনা, স্থলের কোনো শিকার ধরা বা বধ করার চেষ্টা করতে পারবেনা। হারাম শরিফের কোনো গাছ বা ঘাসপাতা কাটতে পারবেনা।

তারপর যখন মক্কায় প্রবেশ করবে তখন মক্কায় উঁচু স্থান দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। সম্ভব হলে তার আগে যাহেরে অবস্থিত যীতুয়ার কূয়া থেকে গোসল করাও মুস্তাহাব। তারপর কা'বার দিকে রওনা হবে এবং 'বাবুস সালাম' দিয়ে প্রবেশ করবে। প্রবেশের সময় মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়বে, মসজিদে প্রবেশের আদব ও নিয়ম পালন করবে, তালবিয়া পড়বে এবং একাগ্রতা ও বিনয়সহকারে প্রবেশ করবে। কা'বার ওপর দৃষ্টি পড়া মাত্র দু'হাত উঁচু করে আল্লাহর অনুগ্রহ চাইবে এবং এজন্য নির্ধারিত মুস্তাহাব দোয়া পড়বে।

এরপর সরাসরি হাজরে আসওয়াদের দিকে যাবে, তাতে বিনা শব্দে চুমু দেবে অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করবে এবং হাতকে চুমু দেবে। এর কোনোটা সম্ভব না হলে দূর থেকে হাত দিয়ে ইশারা করবে।

তারপর হাজরে আসওয়াদ সোজাসুজি দাঁড়াবে, হাদিস ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত দোয়া পড়বে, দোয়া মাছুরা পড়বে, অতপর তওয়াফ শুরু করবে। প্রথম তিন চক্করে (ইতিপূর্বে বর্ণিত নিয়মে) ইযতিবা ও রমল করবে এবং অবশিষ্ট চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে ও ধীরে সুস্থে করবে। প্রত্যেক চক্করে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সুন্নত।

তওয়াফ শেষ হলে "ওয়াত্তাখিযু মিন মাকামি ইবরাহিমা মুসাল্লা" (মাকাকে ইবরাহিমকে নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ করো) এই আয়াত পড়তে পড়তে মাকামে ইবরাহিমে যাবে, সেখানে দু'রাকাত তওয়াফের নামায পড়বে। তারপর যমযমে আসবে, সেখানে থেকে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করবে। তারপর 'মুলতাযামে' আসবে, তারপর দুনিয়া ও আখেরাতের সঠিক কল্যাণসহ যা মনে চাইবে তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। তারপর হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবে ও চুমু দেবে।

তারপর সাফার দরজা দিয়ে সাফার দিকে চলে যাবে। যাওয়ার সময় পড়বে "ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শায়ারিল্লাহ" (সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন)।" সাফার উপর আরোহণ করবে, সেখান থেকে কা'বার দিকে মুখ করবে, হাদিস থেকে প্রাপ্ত দোয়া পড়বে,

তারপর সেখানে থেকে নামবে, তারপর সাঈ করার চত্তরটিতে যিকর ও ইচ্ছা অনুযায়ী দোয়া করতে করতে সাঈ করবে। চিহ্নিত দুই খুঁটির মাঝখানে পৌঁছলে জোরে জোরে হাঁটবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হাঁটতে মারওয়া চলে যাবে। সিঁড়িতে উঠে কা'বার দিকে মুখ করবে, মুখ করে যিকর ও দোয়া করবে। এভাবে এক চক্কর পূর্ণ করবে। একইভাবে সাঈ করতে করতে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। এই সাঈ ওয়াজিব এবং এটা তরক করলে দম দিতে হবে, চাই পুরো তরক করুক বা অংশ বিশেষ তরক করুক।

এরপর ইহরামকারী যদি তামাত্তুকারী হয়, তবে সে তার মাথা কামাবে অথবা ছাঁটবে। এর মাধ্যমে তার ওমরা পূর্ণ হবে। এরপর ইহরাম দ্বারা তার উপর যেসব কাজ নির্দিষ্ট ছিলো তা হালাল হয়ে যাবে, এমনকি স্ত্রী–সহবাসও। কিন্তু কিরানকারী ও ইফরাদকারীর ইহরাম বহাল থাকবে।

তারপর জিলহজ্জের আট তারিখে তামাত্তুকারী তার বাসস্থান থেকেই ইহরাম করবে। সে ও অন্য যারা আগের ইহরামে বহাল আছে, তারা মিনা অভিমুখে যাত্রা করবে এবং মিনায় রাত যাপন করবে।

অতপর যখন সূর্য উঠবে তখন সেখানে থেকে আরাফাত রওনা হয়ে যাবে, মসজিদে নামেরার কাছে গিয়ে যাত্রাবিরতি করবে, গোসল করবে এবং ইমামের সাথে জামাতে যোহর ও আসর যোহরের সময় একত্র পড়বে এবং কসর পড়বে। ইমামের সাথে পড়া সম্ভব হলে এভাবে পড়বে। নচেত কসর ও দুই নামাযকে একত্রে যোহরের সময় পড়বে যেভাবে সম্ভব। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পরে ব্যতীত আরাফায় অবস্থান করবেনা। আরাফাতের প্রস্তরপূর্ণ স্থানে বা তার কাছাকাছি অবস্থান করবে। কেননা এটা রসূলুল্লাহ সা. এর অবস্থানের স্থান। আরাফায় অবস্থান হজ্জের শ্রেষ্ঠতম রুকন। জাবালুর রহমতে আরোহণ করা সুন্নতও নয়, উচিতও নয়। কেবলামুখি হয়ে থাকবে এবং যিকর ও কাকুতি মিনতি সহকারে দোয়া করতে থাকবে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়।

অতপর সন্ধ্যা নেমে আসার পর মুযদালিফা অভিমুখে রওনা হবে, সেখানে মাগরিব ও এশা এশার সময়ে পড়বে এবং রাত যাপন করবে। ফজর হওয়া মাত্রই মাশয়ারুল হারামে বস্থান নেবে এবং সকাল পুরোপুরি উজ্জ্বল হওয়ার আগ পর্যন্ত বেশি করে আল্লাহর যিকর করতে থাকবে, এখান থেকে কংকর সংগ্রহ করে যাত্রা শুরু করবে এবং মিনায় ফিরে যাবে। মাশয়ারুল হারামে অবস্থান করা ওয়াজিব এবং তা তরক করলে দম দিতে হবে।

সূর্যোদয়ের পর আকাবার জামরায় সাতটা কংকর নিক্ষেপ করবে। এরপর সম্ভব হলে তার পশু কুরবানি করবে। অতপর মাথার চুল কামাবে অথবা ছোট করবে। চুল কামানো বা ছাঁটার মাধ্যমে একমাত্র স্ত্রী সহবাস ব্যতীত আর যতো কাজ তার জন্য নিষিদ্ধ ছিলো, সবই হালাল হয়ে যাবে। অতপর মক্কায় ফিরে যাবে। সেখানে তওয়াফে এফাযা করবে। এটা একটা রুকন ও ফরয তওয়াফ তওয়াফে কুদুমের ন্যায়। এ তওয়াফ সম্পন্ন করবে। এ তওয়াফকে তওয়াফে যিয়রাতও বলা হয়। আর তামাত্তুকারী হলে তওয়াফে ইযাফার পরে সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করবে। আর ইফরাদকারী বা কিরানকারী হলে এবং তওয়াফে কুদুম করে থাকলে তার এ সময় সাঈ করতে হবেনা। এই তওয়াফের পর তার জন্য স্ত্রী সহবাসসহ সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ হালাল হয়ে যাবে।

এরপর পুনরায় মিনায় ফিরে যাবে ও রাত্র যাপন করবে। এই রাত্র যাপন ওয়াজিব। এটা তরক

করলে দম দিতে হবে। আর যখন ১১ই জিলহজ্জ সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়বে, তিনটি জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবে। মিনার সাথে সংলগ্ন জামরা থেকে শুরু করবে, তারপর মধ্যবর্তী জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে। কংকর নিক্ষেপের পর কিছুক্ষণ অবস্থান করে দোয়া ও যিকর করবে। তারপর আকাবার জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে। এই কংকর নিক্ষেপের পর তার কাছে অবস্থান করবেনা। সবকটা জামরায় সাতটা করে কংকর নিক্ষেপের কাজ সূর্যাস্তের আগেই সমাধা করে ফেলা উত্তম। ১২ই জিলহজ্জ তারিখেও তদ্রূপ করবে। এরপর দুটো কাজের যে কোনো একটা করার স্বাধীনতা তার থাকবে : হয় ১২ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগে মক্কায় চলে যাবে, নচেত মিনায় রাত যাপন ও সেই সাথে পরবর্তী দিন ১৩ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করবে। কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। এটা তরক করলে দম দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা যায়। যখন মক্কায় ফিরবে এবং স্বদেশে ফেরার ইচ্ছা করবে, তখন তওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তওয়াফ করবে। বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব। বিদায়ী তওয়াফ তরক করে যে ব্যক্তি মক্কা ছেড়ে চলে যাবে, সে যদি মীকাত অতিক্রম না করে এবং তার পক্ষে যদি মক্কায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে ফিরে গিয়ে বিদায়ী তওয়াফ করবে, নচেত একটা ছাগল কুরবানি করবে।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো, তা থেকে জানা গেলো যে, হজ্জ ও ওমরার কাজ হলো, মীকাত থেকে ইহরাম করা, তওয়াফ, সাঈ, চুল কাটা, এগুলো করলে ওমরা শেষ হয়। এর উপর বৃদ্ধি পায় হজ্জ, আরাফায় অবস্থান, মিনায় কংকর নিক্ষেপ, তওয়াফে এফাযা, মিনায় রাত যাপন, মুযদালিফায় রাত যাপন, কুরবানি, চুল কামানো বা ছাটা। এই হচ্ছে হজ্জ ও ওমরার সংক্ষিপ্ত সার।

দ্রুত দেশে ফেরা মুস্তাহাব : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : সফর হচ্ছে আযাবের একটা অংশ। তোমাদের পানাহার এ দ্বারা বিঘ্নিত হয়। কাজেই তোমরা যখন সফরের উদ্দেশ্য অর্জন করো, তখন দ্রুত তোমাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। –বুখারি, মুসলিম।

আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার হজ্জ সম্পন্ন করে, তখন তার দ্রুত নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। কেননা এটা তার জন্য অধিকতর পুরস্কার নিশ্চিত করবে।–দারু কুতনি। আর মুসলিম বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : মুহাজির তার যাবতীয় ইবাদত (হজ্জ ওমরা কুরবানি ইত্যাদি) সম্পন্ন করার পর তিন দিন অবস্থান করবে।

৩০. ইহসার

ইহসার শব্দের অর্থ বাধা দেয়া, আটক করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ করো। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কুরবানির জন্য যা কিছু সহজে হস্তগত হয় তাই কুরবানি করো।"

হুদাইবিয়াতে যখন রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবিদের মসজিদুল হারামে গমন থেকে বাধা দেয়া ও বিরত রাখা হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ দ্বারা ওমরার ক্ষেত্রে তওয়াফ থেকে অথবা হজ্জের ক্ষেত্রে আরাফায় অবস্থান বা তওয়াফে এফাযা থেকে বাধা দেয়া ও বিরত রাখা বুঝানো হয়েছে।

যে যে কারণে হজ্জ ও ওমরা থেকে বাধা দেয়া হলে তা ইহসার হিসেবে গণ্য হবে তা নিয়ে মতভেদ হয়েছে।

মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন : ইহসার শত্রু কর্তৃক সংঘটিত হলেই তা শরিয়তের দৃষ্টিতে ইহসার বলে গণ্য হবে। কেননা আয়াতটি নাযিল হয়েছেই রসূলুল্লাহ সা. কে বাধা দানের ঘটনা প্রসঙ্গে। ইবনে আব্বাসের মতও তদ্রূপ। তিনি বলেছেন : শত্রু কর্তৃক বাধা দান ব্যতীত আর কোনো বাধা দান ইহসার নয়।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মত, তাদের মধ্যে আহমদ ও হানাফী ইমামগণ রয়েছেন– ইহসার যে কোনো প্রতিবন্ধকতা থেকেই সংঘটিত হতে পারে, যা হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তির হজ্জে গমন প্রতিহত করে। যেমন কোনো শত্রু, চাই সে কাফের হোক বা কোনো রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তি, রোগব্যাধি যা স্থানান্তরে বাধ্য করে, আন্দোলন, ভয়, খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পথিমধ্যে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, পথিমধ্যে স্ত্রীর মুহরিম সংগীর মৃত্যু, ইত্যাকার এমন ওযর, যা সফরকে অসম্ভব করে তোলে। এমনকি এক ব্যক্তিকে পথিমধ্যে সাপ বা বিচ্ছু ইত্যাদিতে দংশন করলে তার সম্পর্কেও ইবনে মাসউদ ফতোয়া দেন যে, সে ইহসারের শিকার বা বাধাপ্রাপ্ত। ইবনে মাসউদ ও তাঁর সমমনা অধিকাংশ আলেমের যুক্তি এই যে, "কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হয়" আয়াতের এ অংশটিতে বাধার ধরন সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, তাই বাধাটা যে ধরনেরই হোক, তা বাধা বলে গণ্য হবে। যদিও আয়াতটি রসূলুল্লাহ সা. এর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা উপলক্ষেই নাযিল হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ সা. শত্রু কর্তৃকই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আয়াতে যখন কারণ অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, তখন নাযিল হওয়ার কারণের মধ্যে তা সীমিত থাকবেনা ও নির্দিষ্ট হয়ে যাবেনা। বস্তুত অন্যান্য মত অপেক্ষা এই মতটিই অধিকতর শক্তিশালী।

বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে একটা ছাগল কুরবানি করতে হবে : উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্টভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সহজলভ্য জন্তু কুরবানি করতে হবে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ সা. যখন বাধাপ্রাপ্ত হলেন, তখন চুল কামালেন, স্ত্রীদের সাথে মিলিত হলেন এবং তাঁর সংগে করে আনা জন্তু কুরবানি করলেন। তারপর পরবর্তী বছর ওমরা করলেন। –বুখারি।

অধিকাংশ আলেম এ হাদিস থেকে প্রমাণ করেছেন যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর একটি ছাগল, বা গরু বা উট কুরবানি করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম মালেক বলেন : ওয়াজিব নয়। 'ফাতহুল আল্লাম' গ্রন্থে ইমাম মালেকের মত সমর্থন করে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, সকল বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে কুরবানির পশু ছিলনা। কেবল রসূলুল্লাহ সা. মদিনা থেকে নফল হাদিয়াস্বরূপ কুরবানির পশু সাথে করে এনেছিলেন। একথাই আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন তার এই উক্তিতে : তারা তোমাদেরকে বাধা দিয়েছে কুরবানির জন্য অপেক্ষমান পশুগুলোকে সেগুলোর যবাই করার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে।" এ আয়াতে কুরবানি করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়না।

বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কুরবানি করবে কোথায় : ফাতহুল আল্লাম গ্রন্থে বলা হয়েছে : হুদাইবিয়ার দিন পশু কুরবানি করা হয়েছিল হারাম শরিফের ভেতরে না বাইরে, তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। "তারা তোমাদেরকে বাধা দিয়েছে কুরবানির পশুগুলোকে সেগুলোর যবাই করার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে" আয়াতের এ অংশে স্পষ্টতই প্রমাণ করে, হারাম শরিফের বাইরে যবাই করা হয়েছিল।

তথাপি বাধাপ্রাপ্তের কুরবানির স্থান নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। প্রথমত, অধিকাংশ আলেমের মত : বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করছে, সেখানেই যবাই করবে, চাই হারাম শরিফের ভেতরে হোক বা বাইরে। দ্বিতীয়ত, হানাফীদের মত : শুধু হারাম শরিফেই কুরবানি করতে হবে। তৃতীয়ত ইবনে আব্বাস ও একটি দলের মত, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পশুকে হারামে পাঠাতে

সক্ষম হয়, তবে সেখানে পাঠানোই ওয়াজিব এবং হারাম শরিফে পৌঁছে ওগুলো সেখানে যবাই না হওয়া পর্যন্ত সে ইহরাম মুক্ত হবেনা। আর যদি হারাম শরিফে পাঠাতে না পারে তাহলে যেখানে সে বাধাপ্রাপ্ত বা অবরুদ্ধ আছে সেখানেই যবাই করবে।

বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয না হলে তার কাযা করার প্রয়োজন নেই : "যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য পশু কুরবানি দাও" এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বেঁধেছে, তারপর বাইতুল্লায় যাওয়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তার উপর একটি সহজলভ্য পশু, ছাগল বা তদূর্ধ্ব কোনো জন্তু, কুরবানি করা ওয়াজিব। সে যদি ফরয হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে থাকে, তাহলে তাকে তার কাযা করতে হবে। আর যদি ফরয হজ্জ আদায়ের পর আরেকটি হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে থাকে, তবে কাযা করতে হবেনা। ইমাম মালেক বলেছেন : তিনি জানতে পেরেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. তার সাহাবিদের সাথে নিয়ে হুদাইবিয়ায় এসেছিলেন, তারা তাদের সাথে করে আনা পশু কুরবানি করেছিলেন, মাথা মুড়িয়েছিলেন এবং বাইতুল্লাহর তওয়াফ করা ও কুরবানির পশু বাইতুল্লায় পৌঁছার আগেই তারা ইহরাম মুক্ত হয়েছিলেন। এরপর তিনি উল্লেখ করেননি যে, রসূলুল্লাহ সা. তার কোনো সাহাবিকে বা তাঁর সংগে আগত কাউকে কোনো কিছু কাযা করার আদেশ দিয়েছিলেন বা দোহরানোর আদেশ দিয়েছিলেন কিনা। অথচ হুদাইবিয়া হারাম শরিফের বাইরে অবস্থিত। –বুখারি।

ইমাম শাফেয়ী বলেন : সুতরাং যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত ও অবরুদ্ধ হবে সেখানেই যবাই করে ইহরাম মুক্ত হতে পারবে এবং কোনো কিছু তাকে কাযা করতে হবেনা। কেননা আল্লাহ কোনো কাযার কথা উল্লেখ করেননি। তাছাড়া যেহেতু আমরা নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পেরেছি। হুদাইবিয়ার বছর রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে বহু সংখ্যক পরিচিত পুরুষ ছিলো, এরপর তারা ওমরাতুল কাযাও আদায় করেছেন, কিন্তু তাদের কেউ কেউ মদিনায় ওমরাতুল কাযা আদায় থেকে বিরত থেকেছে, অথচ তাদের শারীরিক বা আর্থিক কোনো সমস্যা ছিলনা। যদি কাযা করা জরুরি হতো, তাহলে তাদেরকে আদেশ দিতেন যেন কাযা আদায়ে বিরত না হয়। শাফেয়ী আরো বলেন : পরবর্তী বছরের ওমরাকে ওমরাতুল কাযা নামকরণের কারণ এটা নয় যে, ইহসারের কারণে পরিত্যক্ত ওমরার কাযা করা জরুরি, বরং তার কারণ এই যে, ঐ ওমরা সংঘটিত হয়েছিল রসূলুল্লাহ সা. ও কুরাইশের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতার ভিত্তিতে।

রোগ বা অনুরূপ ওযর দেখা দিলে ইহরাম মুক্ত হবো এই শর্তে ইহরাম : বহু সংখ্যক আলেম বলেছেন, ইহরামকারীর ইহরাম করার সময় এরূপ শর্ত আরোপ করা বৈধ যে, সে রোগাক্রান্ত হলে ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা ইবনে আব্বাস রা. থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. জনৈক মহিলাকে বলেছেন : তুমি হজ্জ করো এবং এরূপ শর্ত আরোপ করো যে, যেখানেই রোগ আমাকে আটকে দেবে, সেখানেই আমি ইহরাম মুক্ত হবো। সুতরাং যখন কেউ রোগ বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং সে ইতিপূর্বে তার ইহরামে যদি অনুরূপ শর্ত আরোপ করে থাকে, তাহলে সে ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবে। এতে তাকে কোনো দমও দিতে হবেনা, রোযাও রাখতে হবেনা।

৩১. হারামাইনের মর্যাদা

কা'বা শরিফে পর্দা বা গিলাফ পরানো : লোকেরা জাহেলী যুগে কা'বা শরিফে পর্দা পরাতো। ইসলাম এসে পর্দাকে বহাল রেখেছে। ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন : জাহেলী যুগে কা'বা শরিফকে লাল রং এর চামড়া দিয়ে তৈরি মাটিতে বিছানো পর্দা দিয়ে মোড়ানো হতো। তারপর রসূলুল্লাহ

সা. তাকে ইয়ামানী কাপড় পরান। উমর ও উসমান রা. মিশরীয় কাপড় 'কাবাতী' পরাতেন। তারপর হাজ্জাজ রেশমী গেলাফ পরান। বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কা'বায় গিলাফ পরায়, সে ছিলো তুববা বংশীয় আসয়াদ আল-হিময়ারী।

মালেক বর্ণনা করেছেন : ইবনে উমর রা. তার উটনীকে সাদা পাতলা মিশরীয় কাপড় কাবাতী, নামাত ও ইয়ামানী কাপড় পরাতেন। তারপর ঐ কাপড় কা'বায় পাঠাতেন এবং কা'বায় তা পরাতেন। ওয়াকেদী আরো বর্ণনা করেছেন : লোকেরা কা'বা শরিফের জন্য পোশাক হাদিয়া পাঠাতো এবং ইয়ামানী নকশাযুক্ত চাদর পরা উট হাদিয়া পাঠাতো, অতপর সেই চাদরগুলোকে বাইতুল্লায় গিলাফ হিসেবে পাঠানো হতো। পরে ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া রেশমী গিলাফ পরালো। ইবনুয যুবাইর সেই পদাংক অনুসরণ করেন।

প্রতি বছর কা'বায় গিলাফ পরানোর জন্য মুসয়াব ইবনুয যুবাইরের নিকট রেশমী গিলাফ পাঠানো হতো। তিনি আশুরার দিন গিলাফ পরাতেন। সাঈদ বিন মানসূর বর্ণনা করেন : উমর রা. প্রতি বছর কা'বার গিলাফ খুলে ফেলতেন, সেগুলো হাজিদের মধ্যে বিতরণ করতেন, এবং হাজিরা মক্কার গাছে টানিয়ে তা দ্বারা ছায়া বানাতেন।

কা'বা শরীফকে সুবাসিত করা : আয়েশা রা. বলেছেন : তোমরা আল্লাহর ঘরকে সুবাসিত করো। এটা তাকে পবিত্র করার শামিল। ইবনুয যুবাইর কা'বার অভ্যন্তরভাগকে পুরোপুরি সুবাসিত করেন। তিনি প্রতিদিন এক রতল সুগন্ধি কাঠ জ্বালিয়ে এবং প্রতি শুক্রবার দুই রতল সুগন্ধি কাঠ জ্বালিয়ে সুবাসিত করতেন।

হারাম শরিফে গুনাহর কাজ থেকে নিষেধ করা : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ .

"যে ব্যক্তি এর ভেতরে গুনাহ করতে চাইবে, তাকে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাবো।"

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : হারাম শরিফে খাদ্য গোলাজাত করা গুনাহর কাজ।" বুখারি বর্ণনা করেন : উমর রা. বলেছেন : খাদ্য গোলাজাত করা আল্লাহ নাফরমানি।" আহমদ বর্ণনা করেছেন : ইবনে উমর ইবনে যুবায়েরের কাছে এলেন। তখন তিনি হাজরে আসওয়াদের সামনে বসে ছিলেন। তিনি বললেন : হে ইবনুয যুবাইর, আল্লাহর পবিত্র হারামে গুনাহ থেকে সাবধান। আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি : কুরাইশের এক ব্যক্তি হারাম শরিফকে হালাল বানিয়ে ফেলবে। (অর্থাৎ সেখানে গুনাহ সংঘটিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করবে)। অন্য বর্ণনায় : কুরাইশের এক ব্যক্তি এর ভেতরে গুনাহ সংঘটিত করবে, তার গুনাহগুলো যদি সকল জিন ও মানুষের গুনাহর সাথে ওযন করা হয় তবে তার ওযন বেশি হবে। কাজেই সাবধান, তুমি যেন সেই ব্যক্তি না হও।"

মুজাহিদ বলেছেন : মক্কায় যেমন সৎ কাজের সওয়াব বহু গুণ বাড়ে, তেমনি খারাপ কাজের গুনাহও বহু গুণ বাড়ে। ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হলো : কোনো খারাপ কাজের গুনাহ কি একটার বেশি লেখা হয়? তিনি বললেন : না, কেবল মক্কায় ব্যতিত। মক্কার মর্যাদার জন্য এটা করা হয়।

কা'বা শরিফে আগ্রাসনের ভবিষ্যদ্বাণী : বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : একটি সেনাবাহিনী কা'বার উপর আক্রমণ চালাবে। তারা যখন মরুভূমিতে থাকবে, তখন তাদের প্রথম জন থেকে শেষ জন সমেত সবাইকে মাটির নিচে

ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ সা., এটা কেমন কথা, তাদের ভেতরে তো খারাপ লোক ও সৎ লোক উভয়ই থাকবে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : প্রথম জন থেকে শেষ জনকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে তার নিয়ত অনুযায়ী কেয়ামতের দিন ওঠানো হবে। (যাদের আক্রমণের ইচ্ছা ছিলনা তারা আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু দুনিয়ার আযাব থেকে রেহাই পাবেনা।)

তিন মসজিদ অভিমুখে সফর মুস্তাহাব : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তিনটি মসজিদ ব্যতিত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকসা। –বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ।

আবু যর রা. বলেন, আমি বললাম : হে রসূলুল্লাহ সা., পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন : মসজিদুল হারাম। বললাম : তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন : মসজিদুল আকসা। আমি বললাম : এ দুটোর মধ্যে কত দিনের ব্যবধান? বললেন : চল্লিশ বছর। এরপর যেখানেই তোমার নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ো। কেননা সেখানেই আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে।

এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর বৈধ হওয়ার একমাত্র কারণ হলো, এগুলোতে এতো বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে, যা অন্য কোনোটার নেই।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার মসজিদে একটি নামায মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম। আর মসজিদুল হারামে একটি নামায অন্য সসল মসজিদের এক লক্ষ নামাযের চেয়ে উত্তম। – আহমদ।

আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং তা থেকে একটিও বাদ পড়বেনা তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি, আযাব থেকে মুক্তি ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে। –আহমদ, তাবারানি।

হাদিসে আরো বলা হয়েছে : বাইতুল মাকদিসে নামাযের সওয়াব, মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী ব্যতিত অন্য সকল মসজিদের তুলনায় পাঁচশো গুণ বেশি।

১. মসজিদে নববীতে প্রবেশের ও রওযা মুবারক যিয়ারতের নিয়ম ও আদব : ১. মসজিদে নববীতে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে, ভাবগম্ভীরতাসহকারে, সুগন্ধি মেখে, সুন্দর পোশাক পরে, ডান পা প্রথমে ঢুকিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। আর প্রবেশের সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়া মুস্তাহাব :

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

“মহান আল্লাহর কাছে, তার সুমহান সত্তার কাছে, তাঁর অনাদি অনন্ত রাজত্বের কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ, মুহাম্মদ ও তার বংশধরের ওপর দরূদ ও সালাম পাঠাও। হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করো এবং আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।”

২. প্রথমে রওযা শরিফে গিয়ে পূর্ণ আদব ও একাগ্রতা সহকারে সেখানে তাহিয়াতুল মসজিদ নামায পড়বে। এটাও মুস্তাহাব।

৩. তাহিয়াতুল মসজিদ নামায শেষ হলে পবিত্র কবরের দিকে মুখ করে ও কেবলা পেছনে রেখে রসূলুল্লাহ সা. কে নিম্নরূপ সালাম দেবে :

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَ اللّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلْقِ اللّٰهِ مِنْ خَلْقِهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاقَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ . اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَمِيْنُهُ وَخِيْرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ . وَاَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ .

"হে আল্লাহর রসূল, আপনার উপর সালাম। হে আল্লাহর নবী, আপনার উপর সালাম। হে সৃষ্টির সেরা, আপনার উপর সালাম, হে আল্লাহর বন্ধু, আপনার উপর সালাম। হে নবীদের নেতা, আপনার উপর সালাম, হে বিশ্বপ্রভুর রসূল, আপনার উপর সালাম। হে গৌরবান্বিত মানুষদের নেতা, আপনাকে সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর বান্দা, রসূল, বিশ্বস্ত ও সৃষ্টির সেরা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত ফিরিয়ে দিয়েছেন, উম্মতের হিত কামনা করেছেন এবং আল্লাহ্র পথে যথাযথভাবে জিহাদ করেছেন।"

৪. তারপর ডান দিকে হাতখানেক সরে দাঁড়াবে। আবু বকর সিদ্দিক রা. কে সালাম দেবে, তারপর আরো হাত খানেক সরে দাঁড়াবে এবং উমর ফারুক রা. কে সালাম জানাবে।

৫. এরপর কেবলামুখি হয়ে নিজের জন্য, নিজের বন্ধু, ভাই ও অন্য সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করবে। তারপর এখান থেকে চলে যাবে।

৬. যিয়ারতকারীর কর্তব্য যেন তার আওয়ায নিজে শুনতে পায় এর চেয়ে বেশি উঁচু না করে। প্রহরীর কর্তব্য, উঁচু শব্দ করা থেকে ভদ্রভাবে বিরত রাখবে। বর্ণিত আছে, উমর রা. দুই ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে দেখলেন। তিনি বললেন, আমি যদি জানতাম তোমরা এই শহর থেকেই এসেছো, তাহলে তোমাদেরকে এমন প্রহার করতাম যে ব্যথা পাও।

৭. কবরকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবেনা এবং চুমু দেবেনা। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এটা করতে নিষেধ করেছেন।

আবু দাউদ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে এবং আমার কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করানো। আমার উপর দরূদ পাঠাও। কেননা তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের প্রেরিত দরূদ আমার নিকট পৌঁছে। আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান এক ব্যক্তিকে দেখলেন, রসূলুল্লাহ সা. এর কবরে অন্য এক ব্যক্তির প্রতিনিধি হয়ে দোয়া পাঠাচ্ছে। তিনি বললেন, হে অমুক, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থল বানিওনা, তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদ পাঠাও। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে। সুতরাং তুমি এবং স্পেনে যে ব্যক্তি রয়েছে, উভয়ে সমান।

রওযা মুবারকে বেশি করে নফল ইবাদত করা মুস্তাহাব : বুখারি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানে রয়েছে বেহেশতের একটি রওযা (বাগান)। আমার মিম্বর আমার হাউসের উপর অবস্থিত। (অর্থাৎ আমার রওযায় বেশি করে ইবাদত ও ইসলামী জ্ঞান বিতরণ করলে তা ঐ স্থানটিকে বেহেশতের বাগানে পরিণত করবে।)

মসজিদে কুবা পরিদর্শন ও সেখানে নামায পড়া মুস্তাহাব : রসূলুল্লাহ্ সা. প্রত্যেক শনিবার এখানে আসতেন এবং দু'রাকাত নামায পড়তেন। তিনি সবাইকে এরূপ করতে উৎসাহ দিতেন এবং বলতেন : যে ব্যক্তি নিজের বাড়ি থেকে পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদে কুবায় আসবে ও সেখানে নামায পড়বে। সে একটি ওমরার সমান সওয়াব পাবে। –আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

মদিনার ফযিলত : বুখারি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : ঈমান মদিনায় সেভাবে গুটিয়ে এসে পুঞ্জীভূত হবে, যেভাবে সাপ তার গর্তে গুটিয়ে থাকে। তাবারানি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : মদিনা হচ্ছে ইসলামের গম্বুজ, ঈমানের ঘর, হিজরতের ভূখণ্ড এবং হালাল ও হারামের আশ্রয়স্থল। উমর রা. বলেন : মদিনার মূল্য বেড়ে গেছে। তাই তার জন্য সাধনা তীব্রতর হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমরা সবর করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমি তোমাদের খাদ্যে বরকত কামনা করেছি, তোমরা খাও ও বিভেদে লিপ্ত হয়োনা। কেননা একজনের খাদ্য দু'জনের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে, দুজনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে এবং চারজনের খাদ্য পাঁচজন ও ছয়জনের জন্য যথেষ্ট হয়ে তাকে। বরকত থাকে দল ও সংহতির মধ্যে। স্বজনদের দুঃখ ও কষ্টে যারা ধৈর্যধারণ করে, আমি তার জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবো। আর যে ব্যক্তি জামাত থেকে বের হবে, আল্লাহ্ তার পরিবর্তে ঐ জামাতে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে আনবেন। আর যে ব্যক্তি জামাতের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি পোষণ করবে, আল্লাহ্ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দেবেন যেভাবে পানিতে লবণ গলে যায়। –বাযযার।

মদিনায় মৃত্যুর ফযিলত : তাবারানি ছাকীফ গোত্রীয় জনৈক এতিম মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে কেউ মদিনায় মৃত্যু বরণ করতে পারে, সে যেনো তাই করে। কেননা যে ব্যক্তি মদিনায় মৃত্যু বরণ করবে, কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো।"

যায়েদ বিন আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর রা. দোয়া করতেন : হে আল্লাহ্, আমাকে তোমার পথে শাহাদত দান করো এবং তোমার নবীর হারামে আমাকে মৃত্যু দাও।" -বুখারি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত